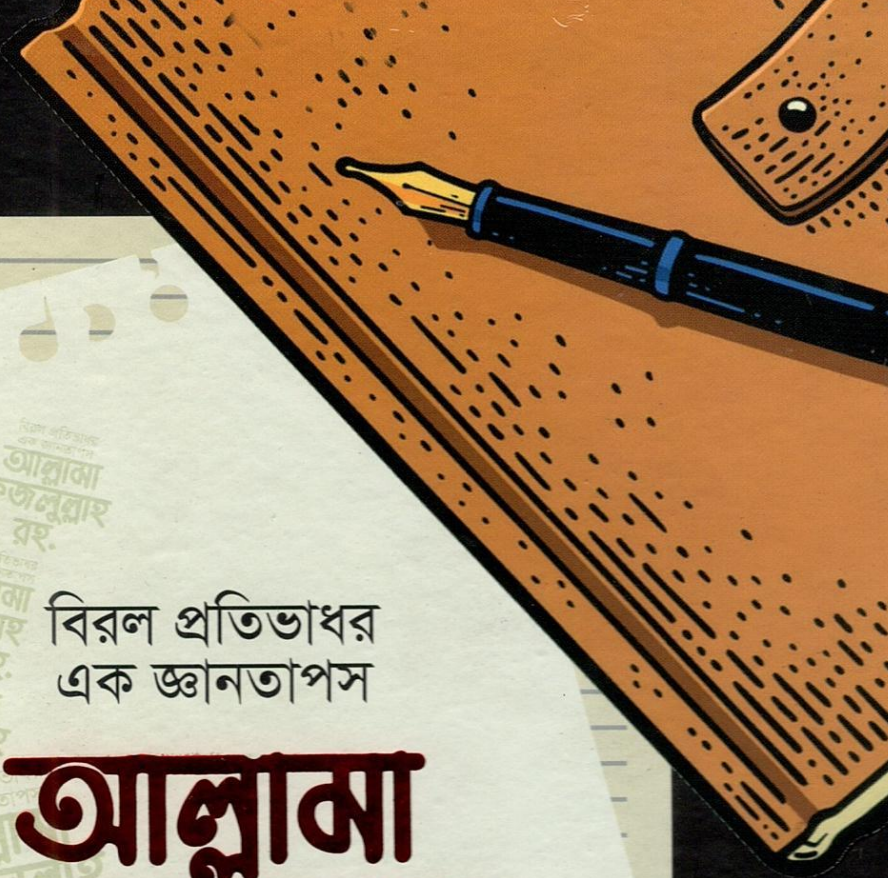

বিরল প্রতিভাধর
এক জ্ঞানতাপস

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.

বিরল প্রতিভাধর
এক জ্ঞানতাপস

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.

গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

বিরল প্রতিভাধর এক জ্ঞানতাপস

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

ফাযেল, মাযাহির উলুম সাহারানপুর, ভারত

সার্বিক তত্ত্বাবধান

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি

সংকলন

আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন

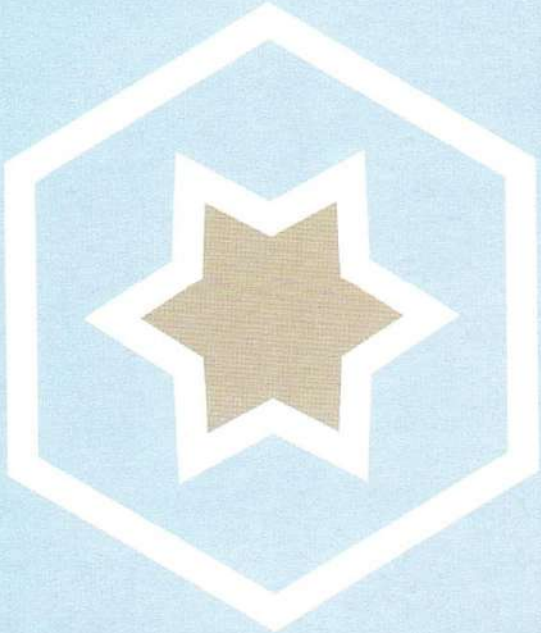

বিরল প্রতিভাধর এক জ্ঞানতাপস

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

বিরল প্রতিভাধর এক জ্ঞানতাপস

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

বিরল প্রতিভাধর এক জ্ঞানতাপস

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

সার্বিক তত্ত্বাবধান

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি

সংকলন

আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক

সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন

সার্বিক সহযোগিতায়

আলাউদ্দিন কবির ও মাহমুদ মুজিব

প্রকাশনা

গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
ও আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

আল-কলম [ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং]
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

প্রকাশকাল

২০২২ খৃস্টাব্দ

মূল্য

১০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র

Biral Protibhadhar Ek Giyantapos Allama Fazlullah (R.)
Published by: Center for Research & Publication (CRP)
International Islamic University Chittagong (IIUC) &
Allama Fazlullah Foundation, Chattogram, Bangladesh.
Print: Al-Qalam [Design & Printing] Anderkilla, Ctg.
First Print : 2022
Price : Taka 1000.00 / US $ 25 Only

উৎসর্গ

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সহধর্মিণী
মহিয়সী নারী **মরহুমা রহীমা খাতুন**।
যিনি একজন ধর্মপরায়ণ ও পরহেজগার মহিলা
ছিলেন এবং আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) শিক্ষা ও
গবেষণামূলক কর্মে নীরবে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

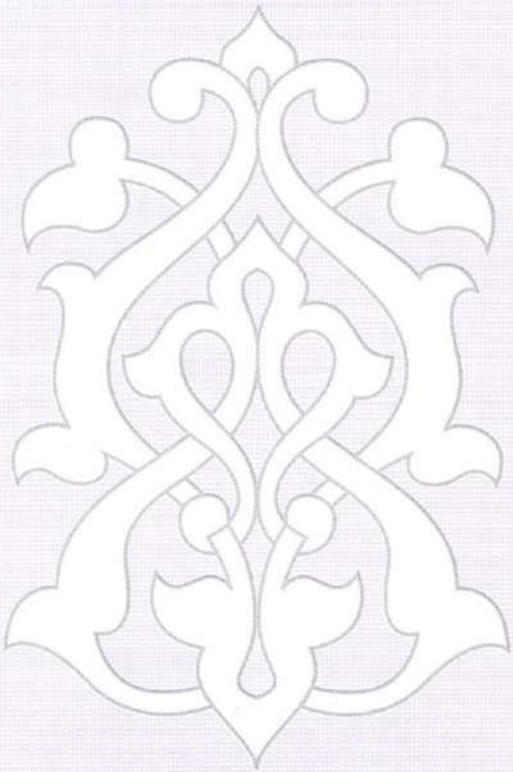

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতিব
আল্লামা ওবায়দুল হক জালালাবাদী রহ. -এর

বাণী

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) (১৮৯৮-১৯৭৯) খ্রিষ্টাব্দ) একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, ভাষাবিদ, ব্যাকরণবিদ, কবি, রাজনীতিবিদ ও দক্ষ শিক্ষক ছিলেন। তিনি আরবি, ফারসি এবং উর্দু ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন। তিনি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা থেকে হায়ার স্ট্যান্ডার্ড (Higher Standard) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষার জন্যে ভারত উপমহাদেশের অন্যতম দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাযাহির উলুম সাহারানপুরে ভর্তি হন। তিনি ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে কৃতিত্বের সাথে সর্বশেষ সনদ লাভ করেন। তখন ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী এবং উস্তাযুল উলামা ওয়া আল-মাশাইখ (নাযিমে মাদ্‌রাসা) মাওলানা আব্দুর লতীফ ও অন্যান্য বুযুর্গ উলামায়ে কেরাম মাযাহির উলূম সাহারানপুরের শোভা বর্ধন করছিলেন। আল্লামা ফজলুল্লাহর স্মৃতিকে ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখার জন্যে সর্বপ্রথম 'নাযেমে আলা একাডেমী' গঠিত হয়। পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠানটি "আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন" এ রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এটি একটি ধর্মীয় ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এর কর্মপরিধি ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত। এ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. এর বর্ণিল জীবনের স্মৃতি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে "বিরল প্রতিভাধর এক জ্ঞানতাপস আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ." নামে একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত। এর উদ্যোক্তাদের সাধনা সাফল্যের মহিমায় মণ্ডিত হোক। আমিন।

ওবায়দুল হক

(আল্লামা) ওবাইদুল হক রহ.
খতিব, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক
প্রফেসর এমিরিটার্স সিরাজুল হক-এর

বাণী

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীদ্বয়ের যুগ-সন্ধিকাল, আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যমুখিতা পুষ্ট দ্বান্দ্বিকতার সমাহার বলে খ্যাত-ইসলামি সংস্কৃতি সবেমাত্র রেনেসাঁস গত অভিযাত্রায় উদ্যোগী-তখনকার দৈগ্ধ-তৎপর ওলামাদের একজন ছিলেন মরহুম আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর "বিরল প্রতিভাধর এক জ্ঞানতাপস আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ." নামে জীবনী প্রকাশের উদ্যোগে আমি প্রীত এবং উৎসাহিত বোধ করছি; এজন্য যে, অগ্রযাত্রা রুদ্ধ ইসলামি সভ্যতার বিকাশলগ্ন হিন্দুস্তানি মুসলমানদের মধ্যে তখন স্পষ্টতর হয়ে উঠে। অনুরূপ কর্মতৎপর ব্যক্তিবর্গের 'জীবন-কর্ম' এর ওপর প্রকাশনা বর্তমান ত বটেই; ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও অপরিহার্য। আমি এ মহতী উদ্যোগের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ডা. সিরাজুল হক
অধ্যাপক- ইসলামিক স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বিশ্বখ্যাত আরবি সাহিত্যিক ও মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারক আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী (মুদ্দাজিল্লুহু)-এর

বাণী

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যেই। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (সা.)-এর ওপর এবং তাঁর সকল সাহাবি ও অনুসারীদের ওপর।

ভারত উপমহাদেশের অন্যতম সর্বগুণী ও সর্বযোগ্য মনীষী হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর স্মরণে 'বিরল এক প্রতিভাধর জ্ঞানতাপস আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.' নামে একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।

আমার মতো অধমের আসলে তাঁর মতো মনীষী সম্পর্কে কিছু লেখার অধিকার নেই! কেননা তিনি আমার সরাসরি শিক্ষক না হলেও শিক্ষকের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না। তিনি ছিলেন আমাদের শিক্ষক ও মুরব্বি, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, কুতবে জামান হযরত মুফতি আযীযুল হক (রহ).; শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী রহ.; তাফসিরে মা'আরিফুল কুরআন রচয়িতা মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ.; ভারতের

দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হাকিমুল ইসলাম কারী তৈয়ব রহ.; দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মুহতামিম ও থানভী রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব রহ.; উপমহাদেশের বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান, খতিবে আজম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ রহ.; গারাঙ্গিয়ার বড় পীর সাহেব হুজুর হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ রহ. এবং নেজামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. প্রমুখের সমসাময়িক এক বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন।

এসব মনীষী আলেম ও পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে ছিলো তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এঁদের প্রত্যেকেই তাঁর শাস্ত্রগত ও সাহিত্যগত স্বতন্ত্র ও অনন্য অবস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য আলেমদের মধ্যে গণ্য হতেন। এবং পাকিস্তান পতনের পর তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় মনীষীদের একজন। এমন এক মনীষীর জীবন সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মকে অবহিত করা আমাদের, বিশেষত তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরীদের একান্ত দায়িত্ব বটে।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানি ও তাওফিকে তাঁরই সুযোগ্য দুই পুত্র – প্রফেসর ড. মাওলানা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি ও অধ্যাপক ড. মাওলানা আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন সাহেবের যৌথ সম্পাদনায় বহুল প্রতীক্ষিত জীবনীগ্রন্থটি অবশেষে প্রকাশ হতে যাচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে এটি আমার জন্যে অত্যন্ত খুশির খবর!

পরিশেষে দোয়া করি, আল্লাহপাক যেনো জীবনীগ্রন্থটির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন এবং গ্রন্থটি প্রকাশে সম্পৃক্ত আমার 'স্নেহধন্য সহোদরদ্বয়'কে আরো অধিক পরিমাণে ইলমি ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করার তাওফিক দেন। আমিন!

শুভেচ্ছাসহ

(আল্লামা) মুহাম্মদ সুলতান যওক (নদভী)
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম।

ইউ এস টি সি, চট্টগ্রাম-এর প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য
জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম-এর

বাণী

দুই শতাব্দীর উপনিবেশিক শাসন-শোষণ এর কষাঘাতে বিমূঢ় মুসলিম বিশ্বে সবেমাত্র উপমহাদেশের আত্মিক, আধ্যাত্মিক এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত অগ্রসেনানীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহ।

হক্ব-ভাষানী-নাজিম উদ্দীন, চিত্তরঞ্জন দাশ সহ ইকবাল, থানবী, শেখুল হিন্দ প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য মাহাত্মনদের দৈব প্রসাদপুষ্ট এ মহান ব্যক্তিত্ব প্রায় চার দশক কাল (এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ) বিখ্যাত চুনতী হাকীমিয়া আলীয়া মাদরাসার কর্ণধার স্বরূপ অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এ সময়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক ও টীকা গ্রন্থাদি রচনা করেন এবং আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষায় বিশাল পরিমাণের কাব্যগাঁথাসহ এক বর্ণাঢ্য উত্তরাধিকার পরবর্তীদের জন্য রেখে যান। তিনি ১৯৭৯ সনে ইহলোক ত্যাগ করেন এবং চুনতীতেই সমাহিত হন।

তাঁর জীবনী প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

এ মহতী উদ্যোগের সর্বাত্মক সার্থকতা কামনা করছি।

মহান আল্লাহ তালার শ্রেষ্ঠ প্রতিদান তিনি লাভ করুন।

জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, ইউ এস টি সি, চট্টগ্রাম

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া চট্টগ্রাম-এর মহাপরিচালক
হযরতুল আল্লাম মুফতি আব্দুল হালিম বুখারী (রহ.)-এর

বাণী

সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে, রহমত ও শান্তি অবতীর্ণ হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আমিনের ওপর এবং শান্তি বর্ষিক হোক তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির ওপর।

মনীষী ব্যক্তিত্ব হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর স্মরণে 'বিরল এক প্রতিভাধর জ্ঞানতাপস আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.' নামে একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।

আমার জন্যে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, তাঁর মতো এক মনীষী ব্যক্তিত্বের ওপর দু'কলম লেখার সুযোগ পেয়েছি। এই মাটি যাঁদের জন্ম দিয়ে গৌরবান্বিত হয়েছে। যাঁদেরকে আল্লাহপাক সৃজনশীল প্রতিভা দান করেছে। কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও উসুলে ফিকহসহ শরিয়তের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় রয়েছে যাঁদের কীর্তির ছাপ; তিনি ছিলেন সেসব মনীষী ও শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম।

এমন এক মনীষীর জীবন সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মকে অবহিত করা আমাদের, বিশেষত তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরীদের একান্ত দায়িত্ব বটে। আলহামদুলিল্লাহ, জীবনীটি সম্পাদনা করেছেন, আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর সুযোগ্য দুইপুত্র– প্রফেসর ড. মাওলানা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি ও অধ্যাপক ড. মাওলানা আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন সাহেব।

পরিশেষে, আল্লাহপাক প্রকাশিতব্য জীবনীটির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে উপকৃত করুন এবং গ্রন্থটির প্রকাশক ও সম্পাদক আমার প্রিয়ভাজন দুই কৃতী সহোদরকে আরো অধিক পরিমাণে ইলমি ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

মা'আস-সালাম

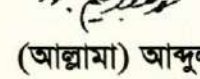

(আল্লামা) আব্দুল হালীম বুখারী
সাবেক মহাপরিচালক: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Ahmed Farid
Vice-Chancellor of
Manarat International University, Dhaka
Ex Bangladesh Ambassador at UAE

MESSAGE

Moulana Fazlullah was a Remarkable Person. He was a scholar of very high caliber and a man of versatile pursuits. His scholarship encompassed deep knowledge of message, interpretation and explanation of al-Qura'n al Karim, al0Hadis, Usul al Fiqh on the one Hand and on the other, Linguistics, Grammar and classical Arabic, Persian and Urdu literature and poetry.

He was born in 1898 and died in 1979. In course of his long career, this octogenarian scholar devoted himself to endless pursuits of knowledge in various noted institutions of then Bengal and northern India. In every one of these he obtained higher degrees with distinction.

He was appointed a teacher in Akara Alia Madrasah, in Twenty-Four Pagans West Bengal. Soon he rose to the position of the Principal. After Serving There With distinction for over a decade, he decided to return home and joined Chunati Hakimia Alia Madrasah in Lohagara, Chittagong as Superintendent. As recognition of his great scholarship and distinguished serves, later on he was appointed its Nazem-e Ala.

He was so well respected as a pious person and a venerable scholar that after his death a foundation was created in the name of Allama Fazlullah Foundation. This Foundation has continued to serve the Ummah through a divers Group of charitable projects and activities.

I am very pleased to learn of the publishing his biography book to discuss his life and contributions and congratulate the Sponsors and wish it all success.

Ahmed Farid

Ahmed Farid
Vice-Chancellor
Manarat International University
Dhaka

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর সুযোগ্য শিষ্য, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক,
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর সাবেক প্রো-ভিসি
প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক-এর

বাণী

সকল প্রশংসা সে মহামহিম আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন তাবৎ সৃষ্টি জগৎ- তথা বিশাল সৌরজগৎ ও মহাশূন্যে বিদ্যমান লক্ষ-কোটি গ্রহ-নক্ষত্র, তারকারাজি, চন্দ্র-সূর্য, পৃথিবী, সাগর-মহাসাগর, বৃক্ষরাজি, পশু-পক্ষী, মৎস্যকুল এবং ফেরেশতা, জিন আর আঠারো হাজার মাখলুকাত। অতঃপর এ বিশ্বজগতে মানুষ নামক মাটির তৈরি এক ক্ষুদ্র জীব সৃষ্টি করে তাদেরকে সৃষ্টির সেরা তথা 'আশরাফুল মাখলুকাত' এর মহামর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আর এ মানবজাতির মধ্য হতেই বাছাই করেছেন লক্ষাধিক নবী-রাসুল, যাঁরা হলেন শ্রেষ্ঠ মানবসন্তান বা সেরার সেরা। তাছাড়া মানবকুলের মধ্য হতে যাঁরা জ্ঞানের অধিকারী তাদেরকে দান করেছেন অন্যদের চাইতে অধিকতর মর্যাদা। এ প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ ঘোষণা করছেন- 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী আর যাদেরকে জ্ঞান দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা দান করেন।' (৫৮:১১)

তিনি আরো এরশাদ করেছেন, 'বলো, যারা জ্ঞানের অধিকারী আর যারা জ্ঞানের অধিকারী নয় তারা কি সমান হবে?' (৩৯:৯) অর্থাৎ কখনো সমান মর্যাদার অধিকারী হবে না।
আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের মধ্য হতে সত্যপন্থী নিষ্ঠাবানরাই এ (শরিআহ) জ্ঞানের পতাকাকে সমুন্নত রাখবে।' (আবু হুরাইরা বর্ণিত, তাবারানী) অর্থাৎ যুগে যুগে ইসলামি জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরাই নবী-রাসুলদের প্রকৃত উত্তরসুরী।

শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এ শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত একজন ইসলামি জ্ঞানের পতাকাবাহী ও নবুওয়াতি ফল্গুধারার উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। যিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বিতরণ করার মহান ব্রতে উৎসর্গতপ্রাণ ছিলেন। এভাবে আমরা বলতে পারি যে, তিনি সে বিরল সৌভাগ্যবানদের অন্যতম ছিলেন যাদেরকে নবুওয়াতি জ্ঞানের পতাকাবাহি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যে সকল মহিয়ান ওস্তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণের কারণে আমি নিজেকে বিশেষভাবে ধন্য মনে করি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- আল্লামা শায়খ সাইয়িদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদি বরকতি, আল্লামা শায়খ আবদুস সাত্তার বিহারী, আল্লামা শায়খ আবদুর রহমান কাশগড়ী, আল্লামা শায়খ সুলতান মাহমুদ (এয়ার কমোডর এজি মাহমুদের পিতা), আল্লামা শায়খ ওবায়দুল হক জালালাবাদি, আল্লামা আবদুল খালেক ইসলামাবাদি, শায়খ আলাউদ্দিন আল আযহারি, শায়খ আবদুর রহিম, ড. সিরাজুল হক, ড. মুস্তাফিজুর রহমান এবং আল্লামা ফজলুল্লাহ প্রমুখ।

মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহর সাথে আমার সংশ্লিষ্টতা শুধুমাত্র ওস্তাদ-শাগরেদ সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং এ সম্পর্ক ছিলো বহুমাত্রিক। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে, (এক) আমার নানাজান মরহুম শাহ মাওলানা নজির আহমদের বিশেষ উদ্যোগে চুনতিতে ১৯৩৭ সালে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা চুনতিরই আরেক সিংহপুরুষ, গাজি-এ বালাকোট মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) এর পূণ্যময় স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করতঃ 'হাকিমিয়া মাদরাসা' নামকরণ করা হয়। শাহ মাওলানা নজির আহমদ যতোদিন জীবিত ছিলেন তিনিই ছিলেন এই মাদরাসার সভাপতি এবং মাদরাসার সকল শিক্ষক

তাঁর হাতেই নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্য হতে যোগ্যতম ছাত্রদেরকে বাছাই করে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরূপে নিয়োগ দান করতেন এবং তাঁদের বেতন নিজের ব্যক্তিগত ফান্ড হতে আদায় করতেন। মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠার দু'বছরের মধ্যেই তা একটি সিনিয়র মাদরাসারূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৩৯ সালে ফাযিল শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা হয়। সম্ভবত তিনি ওস্তাদ ফজলুল্লাহকে ১৯৪৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানের প্রবীণ (সুপারিনটেনডেন্ট) রূপে নিয়োগ দান করেন। ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতা থেকে দেশে ফিরে আসার পরপরই চুনতি মাদরাসাতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসার প্রবীণ হিসেবে নিয়োজিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) শাহ মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) এর সরাসরি ছাত্র ছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার কাছে নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই। তবে এ ব্যাপারে দুটি ইঙ্গিত প্রণিধানযোগ্য, যাতে ধারণা করা যায় যে, সম্ভবত, তিনি শাহ মাওলানা নজির আহমদের ছাত্র ছিলেন। (এক) আল্লামা ফজলুল্লাহর কাব্যসমগ্র তথা 'কুল্লিয়াত'-এর বিভিন্ন স্থানে তাঁকে শাহ মাওলানা নজির আহমদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 'উস্তাদ' বিশেষণটির ব্যবহার করতে দেখা গেছে। (দুই) তিনি ফাযিল শ্রেণি পর্যন্ত মুহসিনিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। আর শাহ মাওলানা নজির আহমদ দারুল উলুম মাদরাসায় যোগদানের পূর্বে কিছুদিন মুহসিনিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছিলেন বলে জানা যায়। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, তিনিও শাহ মাওলানা নজির আহমদের ছাত্র ছিলেন। শাহ মাওলানা নজির আহমদ ১৯৪৪ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আল্লামা ফজলুল্লাহ ১৯৪৫ সালে চুনতি মাদরাসা ত্যাগ করে পুনরায় তাঁর পুরাতন প্রতিষ্ঠানে ফিরে যান বলে জানা যায়।

[দুই]

আল্লামা ফজলুল্লাহ ১৯৪৫ সালে চুনতি মাদরাসা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমার আব্বা মাওলানা আবু তাহের ১৯৪৩-৪৫ সালে চুনতি মাদরাসার প্রধান পদ ছেড়ে আল্লামা ফজলুল্লাহর মাদরাসা ত্যাগ করার পর উক্ত পদে ১৯৪৬ সালে যোগদান করেন। আবার ১৯৬২ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদ ছেড়ে আমার আব্বাজান চলে যাওয়ার পর ১৯৬৩ সালে চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসায় প্রশাসনিক প্রধানের পদে যোগদান করেন আল্লামা ফজলুল্লাহ।

পুনরায় তিনি চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসায় নাযেমে আলা (রেক্টর) পদে কর্মরত থাকাকালীন ১৯৭৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করি। এভাবে দেখা যায় যে, ১৯৩৭ সালে আমার নানাজান কর্তৃক হাকিমিয়া মাদরাসাটির গোড়াপত্তনের পর ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সভাপতি হিসেবে তিনি ছিলেন পরিচালনার সর্বোচ্চ দায়িত্বে, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত আল্লামা ফজলুল্লাহ ছিলেন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্বে, ১৯৪৬ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আমার আব্বা ছিলেন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্বে, আবার ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত আল্লামা ফজলুল্লাহ ছিলেন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত। আবার ১৯৭৬ সালে এসে আমি এবং ওস্তাদ ফজলুল্লাহ উভয়েই সমান্তরালভাবে দুটি সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত হওয়ার পর মাদরাসা প্রশাসনে দুটি পরিবারের সম্মিলন ঘটে।

পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে দেশে ফিরে আসার পর থেকে ১৯৮৬ সালে গাজীপুরের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত আমি মাদরাসার সেক্রেটারির দায়িত্বে থেকে চুনতি মাদরাসার খেদমত করেছি। তাছাড়া আমার মামা মাওলানা হাবীব আহমদও পঞ্চাশের দশক থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কখনো সেক্রেটারি আবার কখনো প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত থেকে উল্লেখযোগ্য সেবা দান করেছিলেন।

[তিন]

আমার আর ওস্তাদ ফজলুল্লাহর মধ্যে সবচে পবিত্র যে সম্পর্কটি ছিলো তা হচ্ছে ওস্তাদ শাগরেদ সম্পর্ক। উস্তাদ ফজলুল্লাহ ১৯৬৩ সালে চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন; তখন আমি আলিম পরীক্ষার্থী। ফাযিল শ্রেণিতে তিনি আমাদেরকে আল্লামা ইকবাল বিরচিত 'শিকওয়াহ ও জওয়াবে শিকওয়াহ' এর পাঠদান করতেন। তিনি যখন শ্রেণিকক্ষে উক্ত কাব্যগ্রন্থ হতে আবৃত্তি করতেন তখন মনে হতো আমরা যেনো খোদ রচয়িতার মুখেই এ কাব্যগ্রন্থের আবৃত্তি শুনছি। তিনি যে বিষয়টির পাঠদান করতেন সে বিষয়টির পুরোপুরি হক আদায় করেই পাঠদান করতেন।

[চার]

১৯৭২ সালে তৎকালীন দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করে শাহ হাফেজ আহমদ (প্রকাশ চুনতির শাহ সাহেব) সিদ্ধান্ত নিলেন একটি বিশাল আকারের মাহফিলে

সীরাতুন্নবির আয়োজনের, যার মাধ্যমে জনগণকে নবীজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা যায়। প্রথম বছরের প্রভূত সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি পরবর্তী বছর তিনদিন ব্যাপী এ মাহফিল অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তখন উস্তাদ ফজলুল্লাহ বললেন, 'সীরাত মাহফিলকে অর্থবহ করতে হলে আলোচনাগুলো হতে হবে পূর্ব নির্ধারিত এবং বিষয়ভিত্তিক। পরবর্তীতে এ মাহফিলের ব্যাপ্তি প্রতি বছর দু'দিন করে বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৯ দিনে এসে থামে। এভাবে অনেক নতুন নতুন বিষয়বস্তুর প্রস্তাবনা এবং দেশের খ্যাতনামা বক্তাদের তালিকা তৈরি এবং তাঁদের সাথে যোগাযোগের এক বিশাল কর্মসূচি হাতে নিতে হয়। বিষয়বস্তুর তালিকা তৈরির তত্ত্বাবধানে ছিলেন ওস্তাদ ফজলুল্লাহ ১৯৭৩ থেকে নিয়ে ১৯৭৭ সালে আমার বিদেশ গমন পর্যন্ত এ দায়িত্বটি তিনি আমার ওপরই অর্পণ করেছিলেন। এর পাশাপাশি সীরাত মাহফিল চলাকালে মঞ্চ পরিচালনার দায়িত্বও পালন করতে হতো। এগুলো ছিলো এক মহীরূহসম ব্যক্তিত্ব আল্লামা ফজলুল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততার এক গৌরবময় স্মৃতি। যে কারণে আমার জীবনের ওপর যাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান তাঁদের মধ্যে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন।

আমার জন্য একটি দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিলো এই যে, ১৯৭৯ সালে তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন আমি ছিলাম সুদূর আফ্রিকা মহাদেশের নীলনদস্নাত সুদান নামক দেশে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে অবস্থানরত। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিলো আমি যেনো আমার পিতাকেই হারিয়েছি। আমার মনে পড়ে আমি পরদিন প্রত্যুষে তাঁর স্মরণে আরবিতে একটি (শোকগাঁথা) মর্সিয়া রচনার উদ্দেশ্যে বসে পড়ি এবং পুরোদিন এ কাজে আত্মনিয়োগ করে একটি সুন্দর মর্সিয়া রচনার কাজ সম্পন্ন করি। প্রকৃতপক্ষে এ ক্বসিদাটি রচনা ছিলো আমার জীবনের প্রথম আরবি কাব্য রচনার অভিজ্ঞতা। এ মর্সিয়াটি দেখে ভাষাবিদদের অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, উক্ত কসিদাটি ভাষা ও অলঙ্কারশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি উচ্চাঙ্গের ক্বসিদা হয়েছে। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীতে আমি বেশ ক'জন বিদগ্ধ গুণীজনের স্মরণে মর্সিয়া রচনা করেছি। সেগুলোও উচ্চমানের ক্বসিদা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আল্লামা ফজলুল্লাহর পূণ্যময় স্মৃতিকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিককালে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উস্তাদের কনিষ্ঠ ছেলে অনুজপ্রতীম ড. মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন ফোনযোগে আমাকে অনুরোধ জানায় উক্ত স্মারকের জন্য একটি নাম প্রস্তাবের। আমি প্রস্তাব করি 'বিরল প্রতিভাধর এক জ্ঞানতাপস : আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)' নামকরণের। সে আমাকে পুনরায় অনুরোধ জানায় এ স্মারকের জন্য একটি রাইটআপ (Write up) দেয়ার জন্য। আমি ভাবলাম: আমার এক শ্রদ্ধেয় উস্তাদকে উপলক্ষ করে যে স্মারকটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাতে সম্পৃক্ত হওয়া তো বরং আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় এবং একটি নৈতিক দায়িত্বও বটে। অন্যথায় আমি নিজেকে এক মহৎকর্মে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত মনে করতাম। তাই আমি মনে করি আমাকে এ সুযোগটি করে দেয়ার জন্য ভাই ড. হোছামুদ্দিন বরং ধন্যবাদার্হ।

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক
সাবেক প্রো-ভিসি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

সম্পাদকীয়

আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) (১৮৯৮-১৯৭৯) বহুমাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী বিরল প্রতিভাধর এক জ্ঞানতাপস। তাঁর পিতা আল্লামা নুরুল হুদা (১৮৬২-১৯৩৪) ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তিনি ভারতের হুগলী মাদরাসায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ছিলেন উপমহাদেশখ্যাত বুযর্গ ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহির (রহ.) আধ্যাত্মিক শিষ্য। একজন ইসলামি চিন্তাবিধ ছাড়াও তিনি ছিলেন দার্শনিক, সাহিত্যিক, তর্কশাস্ত্রবিদ, গবেষক, হেকিম, গণিতজ্ঞ ও ক্ষুরধার লেখক। ভূগোল, জ্যামিতি এবং বর্ষপঞ্জিকা নিয়েও কাজ আছে তাঁর। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) পিতামহ সুফি হাসান আলী তালুকদার একজন জমিদার ও আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। তিনি বন-জঙ্গলে গিয়ে ইবাদত ও যিকির-আযকারে নিমগ্ন থাকতেন। সেখানে ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর শরীরের লোমকূপ থেকে 'আল্লাহু আল্লাহু' জিকির শোনা যেতো। একসময় একথা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরতো।

হযরত সুফি হাসান আলী তালুকদারের পিতামহ শাইখ ইয়াসিন মক্কি রহ. ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর মক্কা হতে বাংলাদেশে আসেন এবং বাবুনগরে স্থিত হন। তাঁর বংশধররাই ঐতিহ্যবাহী মক্কার বাড়ীর গর্বিত উত্তরাধিকারী। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এ বংশের অন্যতম আলোকিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ৪ বছর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর স্বীয় পিতা আল্লামা নুরুল হুদার নিকট মাত্র ৩ বছরে নাহু-ছরফসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে চট্টগ্রাম সরকারি মুহসিনিয়া মাদরাসায় (বর্তমানে মহসিন কলেজ) শশুমে (বর্তমান নবম শ্রেণি) ভর্তি হন। পরবর্তী বছর পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান লাভ করে ডাবল প্রমোশন নিয়ে চাহারম (বর্তমান আলিম) শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯১৯ সালে তিনি আসাম বোর্ডের অধীনে ১ম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। সে বছরই সরকারি মুহসিনিয়া মাদরাসায় ওল্ড স্কীম Reformed হয়ে যায়। এরপর ১৯২০-১৯২২ সাল পর্যন্ত তাফসির, হাদিস, ফিক্‌হ, মানতিক, দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরি ও আব্দুল লতিফ আম্বুয়ুটির একান্ত প্রিয়ভাজন ছাত্র ছিলেন।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ১৯২৩ খৃস্টাব্দে কলকাতার দারুল উলুম কুদসিয়া আকড়া সিনিয়র মাদরাসার হেড মাওলানা হিসেবে যোগদান করেন। নিজ কর্মদক্ষতা গুণে ১৯২৫ সালে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে তাঁর পদায়ন হয়। তাঁর যোগদানের পর মাদ্‌রাসার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং একাডেমিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। মাদরাসা আলিয়া (কামিল শ্রেণিতে) উন্নীত হলে তিনি মুহাদ্দিস-অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মাদরাসা পরিদর্শনে আসলে আরবি-উর্দু সম্মাননাপত্র লেখার দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত হতো।

মাওলানা আইয়ুব আযমগড়ি, মাওলানা ইয়াসিন ও মাওলানা আব্দুর রহিম প্রমুখ লক্ষ্ণৌর অধিবাসী হয়েও তাঁদের কেউ আল্লামার উপস্থিতিতে লিখতে সাহস করতেন না। তাঁর সময়ে মাদরাসা এবং তাঁর নাম খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণ ও খৃস্টান পাদ্রীরাও তাঁর কাছে আসতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করতেন।

১৯৪২ সালে শারীরিক অসুস্থতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানকর্তৃক কলকাতায় বোমা হামলার প্রেক্ষিতে তিনি দেশে ফিরে আসলে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া এবং সুবহানিয়া আলিয়া মাদরাসার মত বড়-বড় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁকে নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা করলেও অসুস্থতার কারণে তিনি সম্মতি দেননি। চুনতি মাদরাসা কর্তৃপক্ষের একান্ত অনুরোধে তিনি ১৯৪৫ সালে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ১৯৪৯ সালে পদুয়া হেমায়াতুল ইসলাম মাদরাসায় পরিচালক পদে যোগদান করেন এবং বেশ কয়েক বছর এখানে অধ্যাপনা করার পর সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসায় সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সালে চুনতি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ নাযিমে আলার (রেক্টর) সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক পদ সৃষ্টি করে তাঁকে দ্বিতীয়বার বরণ করে নেন। ১৯৭৯ খৃস্টাব্দে ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি উপমহাদেশের একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিমেদ্বীন, মুহাদ্দিস, মুফাসিসর, মুফতি, সাহিত্যিক, ফরায়েজবিদ, তর্কশাস্ত্রবিদ এবং সহজাত কবি। জ্ঞানের প্রশস্ততার সুবাদে তিনি সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করতেন।

এ ক্ষণজন্মা মনীষীর ইন্তেকালের প্রায় চার দশক পরে তাঁর জীবনী সংকলন করা কষ্টসাধ্য। কারণ, তাঁর প্রথম ২০ বছরের কর্মজীবন দারুল উলুম কুদসিয়া আকড়া আলিয়া মাদরাসায়, এখানে যারা তাঁর ছাত্র ছিলেন, তাদের কেউ বেঁচে নেই। দেশে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যারা বেঁচে আছেন তাঁরাও তাঁর অন্তিম জীবনের ছাত্র। ২০০৩ সালে তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর **"আল্লামা ফজলুল্লাহ (রাহ্) : এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা"** শীর্ষক একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। যাতে তাঁর অনেক কীর্তিমান ছাত্র, শীর্ষ ওলামায়ে কেরাম এবং বিজ্ঞ শিক্ষাবিদগণের প্রবন্ধ সংকলিত হয়। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী সংকলনের উদ্যোগ নেয়া হলেও বিভিন্ন কারণে সে উদ্যোগ পিছিয়ে যায়। কোভিড-১৯ এর সময় আমার শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি'র নির্দেশনায় আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর জীবনী গ্রন্থ সংকলনসহ তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশ ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়।

মহান এই মনীষীর জীবনী সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) কৃতী ছাত্র এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ চট্টগ্রাম'র সাবেক বিভাগীয় পরিচালক মাওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মাদ তারেক। এক্ষেত্রে ২০০৩ সালে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটি বিশেষ সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

এ গ্রন্থ সংকলনে অনেকেই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। তথ্য-উপাত্ত এবং পরামর্শ দিয়েছেন আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) কৃতী ছাত্র প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন ও লেখক মাওলানা আব্দুল মালেক হালিম, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর সাবেক উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মাওলানা আবু বকর রফীক, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও বক্তা অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম খালিদ হোসাইন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক শিক্ষক মাওলানা মমতাজুর রহমান প্রমুখ।

এছাড়াও জামেয়া দারুল মা'আরিফের তরুণ শিক্ষক মাওলানা মাহমুদ মুজিব, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কর্মকর্তা মোঃ ইসহাক, মাসিক আল-হক-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আলাউদ্দিন কবির, প্রাবন্ধিক খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ও অধ্যাপক শাব্বির আহমদ বিভিন্নভাবে সংকলনটির কর্মসম্পাদনে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া!

মহান আল্লাহ সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতাকে কবুল করুক এবং সকলকে উত্তম প্রতিদান দিক।

প্রসঙ্গত, সংকলনটিতে মুদ্রণপ্রমাদ কিংবা কোনো ধরনের ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে অবগত করার জন্যে বোদ্ধা পাঠকমহলের প্রতি বিশেষ অনুরোধ রইলো। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা আমলে নেয়ার চেষ্টা করবো।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে মহান এই মনীষীর সমৃদ্ধ জীবনী অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকেও আলোকিত করার তাওফিক দান করেন। আমিন!

অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

সূচিপত্র

// প্র থ ম অ ধ্যা য় //

পৃষ্ঠা নং

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) : সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ৪৬
(ক) খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইসলামি বিশ্বের অবস্থা
(খ) বৃটিশ শাসনামল
(গ) খিলাফত আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য
(ঘ) অসহযোগ আন্দোলন
(ঙ) ইসলামি দুনিয়ায় পশ্চিমা আগ্রাসন: প্রতিরোধের প্রথম প্রয়াস
(চ) খিলাফত উৎখাতের দুর্ভাগ্যজনক প্রচেষ্টা
(ছ) ভারতীয় শাসনামল
(জ) ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ৫৩
(ক) দরসে নিযামি
(খ) দারুল উলুম দেওবন্দ
(গ) মাযাহির উলুম সাহারানপুর
(ঘ) ওল্ড স্কিম মাদরাসা শিক্ষা
(ঙ) আলিয়া মাদরাসা ধারা
(চ) নদওয়াতুল উলামা প্রবর্তিত ধারা: আধুনিক ও সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা: দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা
(ছ) নদওয়াতুল উলামা ও দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা
(জ) নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
(ঝ) নিউ স্কিম মাদরাসা কোর্সের উৎপত্তি

// দ্বি তী য় অ ধ্যা য় //

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) জীবন চরিত (১৮৯৭/৯৮-১৯৭৯) ৬৪
জন্ম ও বংশ পরিচিতি ৬৪
[শিক্ষাজীবন: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা] ৬৫
উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারত গমন ৬৬
তারিখে মাযাহিরে আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. ৬৭
শিক্ষক ও পীর-মুর্শিদ পরিচিতি ৭১

[কর্মজীবন] পৃষ্ঠা নং

প্রথম কর্মস্থল দারুল উলুম কুদসিয়া কোলকাতা আকড়া সিনিয়র মাদরাসায় যোগদান ৮৯
দারুল উলুম কুদসিয়া কোলকাতা আকড়া সিনিয়র মাদরাসায় কর্মজীবন ৮৯
চুনতি মাদরাসায় আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) যোগদান ৯৫
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) খ্যাতনামা ছাত্রবৃন্দ ৯৭
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সহপাঠী ও বন্ধু-বান্ধব ১৩৬
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সমসাময়িক আলিমসমাজ ১৪১
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) ঘনিষ্ঠ সমসাময়িক বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও পীর মাশায়িখ ১৪৪
আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) : এক অসাধারণ প্রতিভা ১৯১
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) আধ্যাত্মিক চেতনা ও ব্যক্তিসত্তা ১৯৭
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সময়কালীন চুনতি মাদরাসায় স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জি ২০৫
চুনতি সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল : শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) ও আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ২০৯
সমকালীন ওলামা ও শিক্ষাবিদদের মাঝে আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা ২১৩
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) রচনাবলি ২১৫

// তৃতীয় অধ্যায় //

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) অনূদিত 'শামায়িলে তিরমিযী'র আলোচনা ২৩০
আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) রচিত জামে তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ২৪৮
ইতিহাসখ্যাত কসিদা বুরদার সার্থক অনুবাদকর্মের নমুনা ২৫০
আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) রচিত যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম : আংশিক নমুনা ২৭৩
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) কাব্যপ্রতিভা ২৯৮
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) ফাতওয়াসমগ্র ৩১৮
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) ঐতিহাসিক ভাষণ: মাদরাসা শিক্ষার্থীদের মর্যাদা ও কর্তব্য ৩২৩
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) রচনাশৈলী ৩৫১

পৃষ্ঠা নং

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) ভাষাগত উৎকর্ষ ৩৫৯
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) কয়েকটি কারামাত ৩৬৪
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.)-এর মহিয়সী সহধর্মিনী ৩৬৮
আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) স্মরণীয় বাণীসমূহ ৩৭০

// চ তু র্থ অ ধ্যা য় //

হাদিসচর্চায় আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) : বিদগ্ধ আলিম মাওলানা মুযহির আহমদ (রহ.)-এর মূল্যায়ন ৩৮২
চুনতি মাদরাসায় আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) শুভাগমন ৩৮৫
শাহ মাওলানা হাবীব আহমদ
একনজরে আমার শ্রদ্ধাভাজন অভিভাবক ও ওস্তাদ আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ৩৮৭
অধ্যক্ষ ডা. মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (রহ.)
আমার অভিভাবক আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ৪০১
শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (রহ.)
আমার স্মৃতিতে আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) ৪০৩
প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান (রহ.)
আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) সম্পর্কে প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ'র (রহ.) অভিব্যক্তি ৪০৬
চুনতি মাদরাসা ও নাযেমে আ'লা ৪১৮
মাওলানা মুসলিম খাঁন (রহ.)
পরশমণি নাযেমে আ'লা আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ৪২০
ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী
আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. ৪২৬
উপাধ্যক্ষ মাওলানা আ.ন.ম. আতীক আহমদ
আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. অনূদিত 'শামায়িলে তিরমিযী' ৪২৯
অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন
বাবাকে যেমন দেখেছি ৪৩১
অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন
সাক্ষাৎ ও অভিব্যক্তি মিলিয়ে ৪৪০
হাফেজ মাওলানা আবদুল গফুর
শ্রদ্ধেয় শ্বশুরআব্বা আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) সম্পর্কে আমি যেমন শুনেছি ৪৪৪
রিজিয়া রেজা চৌধুরী
আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. এর দশদিক : যেমন দেখেছি ৪৪৮
সাইয়িদ মুসতাফা মুনীরুদ্দীন (আখতার)

পৃষ্ঠা নং

আমার স্মৃতিতে দাদাজান ৪৬৩
জোহরা জেবীন (বেবী)

কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ-সমুদ্র সেঁচার প্রয়াস ৪৬৯
চৌধুরী গোলাম রব্বানী

একটি দুর্লভ সাক্ষাৎকার ৪৭৩
সংকলন: প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ

খেদমত গোযারানে ফার্সি দর্ বাংলাদেশ ৪৭৫

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) শানে নিবেদিত কবিতাসমূহ ৪৮১

// প ঞ্চ ম অ ধ্যা য় //

তৃতীয় প্রজন্মেও মক্কারবাড়ীর ঐতিহ্য অমলিন ৪৯৮

// ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য় //

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন গ্যালারি

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের বহুমুখী তৎপরতা ৬৩০
ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত মসজিদসমূহের কয়েকটি ৬৪৯

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্মিত কয়েকটি একাডেমিক ভবন ৬৬৯

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে নির্মিত পল্লী, দরিদ্র আবাসন, অযুখানা ও টয়লেট এবং হাসপাতাল ৬৭৫

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে হজ কর্মসূচি ৬৮৯

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর অযুখানা ও সেনিটেশন প্রোগ্রামের একাংশ ৬৯১

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ ও ইফতার সামগ্রি বিতরণের একাংশ ৬৯৭

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে ইফতার ও খাদ্যসামগ্রি ও কুরবানির মাংস বিতরণ, বিয়ে-শাদিতে আর্থিক সহায়তা, শিক্ষাবৃত্তি এবং শীতবস্ত্র বিতরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিফর্ম প্রদান ৭০৫

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে সুপেয় পানির সুবিধার্থে স্থাপিত গভীর-অগভীর নলকূপের কয়েকটি স্থির চিত্র ৭১৯

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিভিন্ন মাদরাসা ও এতিমখানায় আর্থিক সহায়তা ও বস্ত্র প্রদান ৭২৯

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ত্রাণ কার্যক্রমের কিছু চিত্র ৭৩৩

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন চেয়ারম্যানের বিভিন্ন দাতাসংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক ৭৩৯

ভূমিকা

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী
সংসদ সদস্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ. (১৮৯৮-১৯৭৯ খৃ.) ছিলেন, বাহ্যিক-আভ্যন্তরীণ সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ, সর্বপ্লাবী, প্রভাববিস্তারী এক মনীষী। যে কেউ তাঁর আকস্মিক সাক্ষাতে যেমন প্রভাবান্বিত হতেন, তেমনি একাধিক সাক্ষাতে হয়ে পড়তেন তাঁর বিশেষ ভক্ত। এমন বহুমাত্রিক যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ উপমহাদেশে খুব কমই জন্মেছেন। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানতুল্য, জ্ঞান-প্রজ্ঞার ভাণ্ডার, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি, স্বভাবজাত সাহিত্যিক, কবি ও ইতিহাসবোদ্ধা।

শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ. এর সাথে আমার প্রথম ইলমি পরিচয় ঘটে ১৯৭৭ সালে। আমি তখন চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থী। আমার আবাসন ছিলো আব্বার সাথেই সাধারণ ছাত্রাবাসে। আমার অনুজ সহোদর ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছাছুদ্দিন এবং অগ্রজ আবুল আতা মুহাম্মদ ইমাদ উদ্দীনও তখন চুনতি মাদরাসার শিক্ষার্থী ছিলেন।

আব্বার জ্ঞানের গভীরতা এবং শাস্ত্রীয় দক্ষতা ও জানাশোনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে আমাকে বহু পর্যায় পাড়ি দিতে হয়েছে।

প্রথম পর্যায়:

১৯৭৭ সাল, আমি তখন জামাতে শশুমের ছাত্র। সেই প্রথম আব্বার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে 'উসুলুস শাশী' পড়ার স্বর্ণালি সৌভাগ্য হয় আমার। ক্লাস নেয়া হতো মসজিদে।

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (البقرة : ٢٢٨)

[১] উক্ত আয়াতে 'করউন' শব্দ দ্বারা 'তুহুর' উদ্দেশ্য না কি 'হায়েজ'; বিষয়টির বিশ্লেষণে তাঁর সম্মোহনী পাঠপদ্ধতি আজও আমার স্মৃতিতে প্রোজ্জ্বল। তাঁর পাঠদানপদ্ধতি এতোই অসাধারণ ছিলো যে, ক্লাসেই সবার পড়া মুখস্থ হয়ে যেতো। পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে তাঁর এমন যোগ্যতা ছিলো যে, তাঁর পুরনো-নতুন, আগের-পরের যতো ছাত্র, সবাই একবাক্যে আব্বার এই বিষয়টি স্বীকার করেন।

তাঁর জ্ঞানের বিশালতা অনুধাবনের ক্ষেত্রে এটি আমার প্রথম পর্যায়। তবে আমার অল্পবয়সহেতু এ পর্যায়টি বলতে গেলে একশ ভাগের দশ ভাগ মাত্র।

দ্বিতীয় পর্যায়:

তখন আমি (১৯৭৮-১৯৮৩ইং এর প্রথম দিক পর্যন্ত) জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার (জমিরিয়া কাসেমুল উলুম মাদরাসা পটিয়া) শিক্ষার্থী। এখানকার শিক্ষাজীবনে আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পরিক্ষায় (বার্ষিক, কেন্দ্রীয়) মুমতাজে আউয়াল তথা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতাম।

উত্তরপত্র লেখতাম প্রমিত আরবি ও উর্দু ভাষায়। আব্বার কাছে আরবিতে পত্র লেখতাম। তিনি তাতে খুবই খুশি হতেন, ক্লাসে শিক্ষার্থীদের দেখাতেন। আমার জন্যে এটি ছিলো আব্বার পক্ষ থেকে 'মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পাওয়া'র মতো দোয়া! যার বদৌলতে আমি আজ মানুষ হয়েছি। তেমনি আমার আম্মা মরহুমা রহিমা খাতুনের শেষরাতের দোয়াও ছিলো আমার প্রতি। এটি আমার ঐতিহাসিক এক পর্যায়, যে পর্যায়ে এসে আমি শ্রদ্ধেয় পিতার জ্ঞানের ব্যাপ্তি সম্পর্কে একশ ভাগের চল্লিশ ভাগ অনুধাবন করি।

তৃতীয় পর্যায়:

এটি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, এটি আমার স্বর্ণালি যুগ। এ পর্যায়ের সময়কাল ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৯ ইং। এই সময়টায় আমি বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠ, ভারতের নদওয়াতুল ওলামা লখনৌর শিক্ষার্থী ছিলাম। বিশ্ববিশ্রুত মনীষী হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানি নদভি রহ. এর সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছিলাম। যাঁর স্নেহচ্ছায়া আমার ওপর সবসময় ছিলো। এখানকার শিক্ষাজীবনে আমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখায় অবগাহন করি। আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, সেমিনার ও কনফারেন্সের সঙ্গে পরিচিত হই। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও সাহিত্যসভার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠি। নদওয়াতুল ওলামার ঐতিহাসিক 'আল্লামা শিবলী নুমানী গ্রন্থাগার' এর মাধ্যমে প্রভূত উপকৃত হই। নদওয়াতুল ওলামার প্রাজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে থেকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। নদওয়াতুল ওলামার শাখা গ্রন্থাগারগুলোর মাধ্যমেও বেশ উপকৃত হই। কেনো হবো না, নদওয়াতুল ওলামা তো বিশ্বব্যাপী শিক্ষা-সাহিত্য, মনন-মিশন, ইতিহাস, সিরাত ও অধ্যাত্মচর্চায় নিজের উদাহরণ নিজেই। নদওয়াতুল ওলামার বর্তমান রেক্টর হযরত আলী মিয়া রহ. এর ভাতিজা, মুসলিম পার্সোনাল ল্য বোর্ড অব ইন্ডিয়ার সভাপতি মহোদয়ের স্নেহচ্ছায়া তখন থেকে অদ্যাবধি আমার ওপর রয়েছে।

নদওয়াতুল ওলামার শিক্ষাজীবনে আমি বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কি আল্লামা শিবলী নুমানীর সাহিত্যকর্ম, কি আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সাহিত্যকর্ম, কি আল্লামা ইকবালের, কি মির্জা গালিবের, কি খাজা আলতাফ হোসাইন হালীর কবিতা, অথবা মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, হযরত মাওলানা আলী মিয়া কি নদওয়াতুল ওলামার অন্যান্য ওস্তাদের সাহিত্যকর্ম- এঁদের প্রতেক্যের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে কমবেশি পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে আমার। এখানে একটি কথা না বললেই নয় যে, যাঁর কারণে নদওয়াতুল ওলামায় গিয়ে জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে আমার মাঝে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ-উদ্দীপনার ঢেউ ছলকে ওঠে, আমার অস্তিত্বজুড়ে যাঁর অসংখ্য অনুগ্রহ, আমার চিত্তজুড়ে যাঁর প্রতি অগাধ আস্থা, তিনি হলেন আমার সম্মানিত শিক্ষক, সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হযরত আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, যাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জামেয়া দারুল মা-আরিফের মতো এক বিশাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

এ পর্যায়ে এসে আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহকে নতুন করে অধ্যয়ন শুরু করি। আমার হৃদয়ে দিনদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা বেড়েই চললো। কেননা, তিনি যদিওবা মাযাহির উলুম সাহারানপুরের ফারেগ (দাওরায়ে হাদিস এবং তাখাসসুস ফিল্ ফুনুন) ছিলেন। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ আম্বোঠভী রহ. এবং হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ সাহারানপুরী রহ. এর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। জমানার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা

আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. এর কাছ থেকে উপকৃত হয়েছেন। হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর মুরিদ ছিলেন। এবং তাঁর সমসাময়িক ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ছিলেন শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী রহ., হযরত কারী মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব কাসেমি রহ., মুফতি মুহাম্মদ শফি ওসমানি রহ., হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব রহ.। এঁদের সবার জন্মসন আমার শ্রদ্ধেয় পিতার মতোই, ১৮৯৭ এবং ১৮৯৮ খৃ. এর কাছাকাছি সময়ে। বাংলাদেশে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ রহ. (পীর সাহেব গারাঙ্গিয়া), হযরত মাওলানা আহমদুর রহমান সাহেব (পীর সাহেব চুড়ামনী, হযরত মিয়া আসগর হোসাইনি দেওবন্দি রহ. এর খলিফা), হযরত মাওলানা বদিউর রহমান সাহেব (শায়খুল হিন্দ, হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দির শিষ্য), হযরত মুফতি আজিজুল হক সাহেব (প্রতিষ্ঠাতা: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া), খতিবে আজম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ সাহেব, হযরত মাওলানা আমিনুল্লাহ সাহেব সাতকানভী প্রমুখ।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে নতুনভাবে অধ্যয়নের এ পর্যায়ে আমি গভীরভাবে অনুভব করি যে, তিনি ছিলেন সকল শাস্ত্রীয় ও তত্ত্বীয় জ্ঞানে সম্যক জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, ইতিহাসবোদ্ধা, বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ (যেমন: আরবি, উর্দু, ফারসি, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা– এসব ভাষায় গত সত্তর বছর আগ থেকেই তার রচনাকর্ম (প্রকাশিত, অপ্রকাশিত) রয়েছে, কাব্য ও সাহিত্যে পূর্ণ দখল, বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক পড়াশোনা ও গভীর জানাশোনা। আজ থেকে ষাট বছর আগেই তিনি ইসলাম ও প্রাচ্যবিদদের ওপর প্রবন্ধ রচনা করে প্রাচ্যবিদদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন। ১৯৬৫ সালে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পাঠ্যসূচির নতুন-পুরাতন ধারার পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার ওপর একটি পুস্তিকা রচনা করেন। হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরীর নির্দেশনায় কলকাতা আকড়া কুদসিয়া আলিয়া মাদরাসায় প্রধান শিক্ষক, মুহাদ্দিস এবং প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করা (১৯২৩-১৯৪২ খৃ. পর্যন্ত), এবং সেখানকার হিন্দু পণ্ডিত ও খৃস্টান পাদ্রিদের সঙ্গে বিতর্ক ও মুনাজারা করে বিজয়ী হওয়া ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এসব উল্লেখ করে আমি বলতে চাই, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আপন সত্তায় দারুল উলুম দেওবন্দ, মাযাহির উলুম সাহারানপুর ও ওলামায়ে দেওবন্দের নীতি-আদর্শ এবং নদওয়াতুল ওলামার চিন্তাচেতনাকে এভাবে ধারণ করে নিয়েছিলেন যে, দেখে মনে হতো, তিনি যেনো দীর্ঘদিন আল্লামা শিবলী নুমানী এবং আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সান্নিধ্যে অবস্থান করেছেন। হযরত মাওলানা আলী মিয়া যেমন মাওলানা মুনাজির আহসান গিলানী রহ. সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তিনি যদিও দারুল উলুম দেওবন্দের সন্তান, তবু তার চিন্তাচেতনা সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি নদভী মানসিকতার।' এসব বৈশিষ্ট্য আমার শ্রদ্ধেয় পিতার মধ্যে ছিলো। এখানে আরেকটা কাকতালীয় ব্যাপার এই যে, বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ফকিহ আলেম আল্লামা আব্দুল হাই চাটগামী। যাঁর জীবনীগ্রন্থ 'নুযহাতুল খাওয়াতির' আটখণ্ডে বেরিয়েছে। তিনি ছিলেন আল্লামা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লির কাছে হযরত আলী মিয়া রহ. এর পিতা মুহতারম আল্লামা আব্দুল হাই হাসানীর সহপাঠী। আব্দুল হাই ফিরিঙ্গি নিজের ফতোয়ায় স্বীয় শিষ্যের রেফারেন্স দেন এভাবে, 'আব্দুল হাই চাটগামীর রায়ও এটাই'। পরে তিনি হযরত রশিদ আহমদ গঙ্গোহি রহ. এর মুরিদ হন। এটা উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো, এই আব্দুল হাই চাটগামীর বিয়ের আকদ পড়িয়েছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় দাদা আল্লামা নুরুল হুদা চাটগামী (ইসলামাবাদী)।

আমার দাদাও ছিলেন হযরত গাঙ্গোহির মুরিদ। এবং আরবি ও ফারসি ভাষায় তাঁর নয়টি পাণ্ডুলিপি রয়েছে (১৪২ বছর আগের)।

উপর্যুক্ত বিষয়াবলি ছাড়াও তাফসির, হাদিস, ফিকহ, ফারায়েজ, গণিত, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ফতোয়া, রচনা-সংকলন, কাব্য ইত্যাদি বিষয়ে আমার শ্রদ্ধেয় আব্বার পূর্ণ দখল ছিলো। উল্লিখিত সব বিষয়ে তাঁর রচনাকর্ম রয়েছে (প্রকাশিত-অপ্রকাশিত)। চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় যখন কামিল বা দাওরায়ে হাদিস খোলা হলো, তখন সিহাহ সিত্তার প্রায়সব কিতাব দীর্ঘদিন ধরে পড়িয়েছেন আমার এই বয়োজেষ্ঠ বুজর্গ পিতা। এ পর্যায়ে এসে আমি আমার পিতার জ্ঞানের গভীরতার সাথে সত্তর ভাগ পরিচিত হই।

চতুর্থ পর্যায়:

এ পর্যায়ের ব্যাপ্তি আমার শিক্ষকতা জীবন থেকে বর্তমান পর্যন্ত। এতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত।

ক.শিক্ষকতা জীবন কাটে দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া এবং আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এ। যেখানে সহিহ মুসলিম শরিফ, তাফসিরে বায়যাভী, হুসামি, ইলমে উসুলে ফিকহ, মুখতারাত মিন আদাবিল আরব, কাতরুন নিদা, আরবি ইনশা, আল-আদব ওয়ান্ নুসুস, আল-কাওয়ায়েদ আল-ফিকহিয়্যা, আল-ইসতিশরাক ওয়াল মুস্তাশরিকুন ইত্যাদি কিতাব ও বিষয় আমার অধ্যাপনায় বণ্টিত ছিলো।

খ. অজস্র বিদেশসফর, আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্সসমূহে অংশগ্রহণকরত প্রবন্ধ উপস্থাপন।

গ. লেখালিখি, অভিসন্দর্ভ ও প্রবন্ধ রচনা এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে তা প্রকাশ করা। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বার অপ্রকাশিত কিতাবাদির পুনর্পাঠ, সম্পাদনার কাজ করা, বিশেষত তিরমিযী শরিফের উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ, শামায়েলে তিরমিযী এবং উর্দু, আরবি, ফারসি ও বাংলায় লিখিত তাঁর কবিতাসমূহ। একটি কথা না বললেই নয়, আমার শ্রদ্ধেয় আব্বার প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কিতাবাদির পুনর্পাঠ করার সময়, তাঁর সাহিত্য ও কবিতাবলির সম্পাদনাকালে আনন্দে ও গর্বে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে! তাঁর শাস্ত্রীয়, চৈন্তিক ও সাহিত্যিক রচনাকর্ম পাঠ করতে গিয়ে আমি অবাক ও হতবাক হয়ে পড়ি। এ পর্যায়ে এসে আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে নব্বই ভাগ চিনেছি। যা ১৯৮৯ খৃ. থেকে অদ্যাবধি চলমান। উল্লেখ্য, আমার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

কিতাব (কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ) নিয়ে কিছুকথা:

আলোচ্য কিতাব অর্থাৎ 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ', যার উদ্দেশ্যে এ ভূমিকা লিখছি। এটি আমার শ্রদ্ধেয় আব্বার কবিতাসংকলন। যেটি জ্ঞান-বিজ্ঞান, মনন, মিশন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুসলিম উম্মাহর উত্থান-পতনের উপাখ্যান ও কারণ, যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাসে সংশোধন ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের এক সাহিত্যসম্ভার।

তিনি কখন কবিতা লেখা শুরু করেন, তার সঠিক তারিখ আমার জানা নেই। তবে উত্তরপ্রদেশের শহর লখনৌ, সাহারানপুর এবং দেওবন্দ যেহেতু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পাদপীঠ, এবং এসব শহরে যেহেতু আমার আব্বার শিক্ষাজীবন কাটে এবং এখান থেকে তিনি বেশ উপকৃত হয়েছিলেন। তাই বলা যায়, তাঁর কবিতাচর্চার সূচনা হয় পড়ালেখা শেষ করার পর, ১৯২২ কি ১৯২৩ সালে। তাঁর বেশ কিছু কবিতায় রচনাকাল উল্লেখ রয়েছে। সেখানে খুব পুরনো একটি কবিতায় দেখা যায়, কবিতাটি লিখেন তিনি ১৯৩৫ সালে।

তাঁর সমস্ত কবিতা পাঠ করে দেখলাম, তাঁর ৯৫ ভাগ কবিতাই উর্দু ভাষায়। তখনকার উপমহাদেশে যেহেতু উর্দু ভাষার চর্চা সবচেয়ে বেশি ছিলো, তাছাড়া কবিতাচর্চার জন্যে উর্দু যথার্থ মাধ্যম। ভাষা হিসেবে উর্দু বেশ গীতল ও সম্মোহনী। এবং তাঁর বাকি কবিতাগুলো ফারসি, বাংলা ও আরবি ভাষায় লেখা।

তাঁর কবিতার বিষয়ের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলে দেখতে পাই, এমন কোনো বিষয় নেই, যে বিষয়ে তিনি কবিতা লিখেননি। যেমন: হামদ, নাত, শোকগাথা, প্রেরণামূলক, বৈপ্লবিক ও জাগরণের কবিতা, শের, গজল, শিক্ষামূলক কবিতা, দার্শনিক কবিতা, প্রশংসাকাব্য, ধর্মীয় মাহফিলের কবিতা, দেশাত্মবোধক কবিতা, জাতীয় কবিতা, ইমানজাগানিয়া কবিতা, চরিত্রসংশোধনী কাব্য, একত্ববাদের কবিতা, আত্মশুদ্ধিমূলক কবিতা, অধ্যাত্ম ও সাধনাকাব্য, ধর্মপ্রীতি ও আত্মমর্যাদাবোধের কবিতা, মুসলিম জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী, বড়ো-বড়ো ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে রচিত অভিনন্দনকাব্য, বিবিধ বিষয় ইত্যাদি। এসব বিষয় তাঁর কবিতায় বর্তমান।

ছন্দের ক্ষেত্রেও বেশ নিরীক্ষাধর্মী ছিলেন তিনি। লিখেছেন, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চারপদী, ষটপদী এবং কাতা ইত্যাদি রীতিতে। তাঁর যোগ্য শিষ্য, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক সাহেব আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ. এর বহুমাত্রিক জীবনের একটি দিক অর্থাৎ কবিতাচর্চা বিষয়ে ২১ পৃষ্ঠা সম্বলিত দীর্ঘ এক গবেষণা প্রবন্ধ লিখেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি গবেষণার শতোভাগ দায় মিটিয়েছেন। কবিতার শৈলীসূক্ষ্মতা, শাস্ত্রীয় আলোকপাত এবং বিশ্বসাহিত্যের (উর্দু, ফারসি) কবিকুল, যেমন আল্লামা ইকবাল, খাজা আলতাফ হোসাইন হালী, আকবর ইলাহাবাদী, শেখ সাদী সিরাজী, জালালউদ্দিন রুমী প্রমুখের কবিতার সঙ্গে তুলনামূলক পাঠ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যথোপযুক্ত এবং অসাধারণ আলোচনা করেছেন। অতপর তিনি তাঁকে (আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ.) উপর্যুক্ত কবিদের সমতুল্য বলে মত ব্যক্ত করেন।

শ্রদ্ধেয় আব্বা হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহর কবিতাবলি আমি যখন পুনর্পাঠ করি, ছাপার উদ্দেশ্যে অক্ষরে-অক্ষরে, চরণে-চরণে পড়ি এবং রিভাইজ দেই, তখন আমার মধ্যে অদ্ভুত এক অবস্থার সৃষ্টি হয়! তাঁর প্রতি আমার আস্থা ও বিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। মনে মনে ভাবি, আমিও তো ভারতের জ্ঞান, মনন ও সাহিত্যের কেন্দ্রসমূহে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি। ওখানকার সাহিত্যের সাথে কিছু না কিছু পরিচিত হয়েছি। তা সত্ত্বেও তাঁর বহু কবিতা ও শব্দ আমি কষ্টসাপেক্ষেই বুঝতে পারি! উর্দু ও ফারসি কবিতায় তাঁর স্বতন্ত্র শৈলী, যথার্থ শব্দচয়ন (গদ্য বা পদ্য), পর্বে পর্বে মিল এবং বাক্যগঠনের রীতি অভূতপূর্ব। অতিসত্বর তাঁর কবিতাসংকলন ছেপে পাঠককুলের হাতে তুলে দেয়া হবে। তখন ভাষা ও সাহিত্যপ্রিয় বন্ধুরা তাঁর কাব্যপ্রতিভার ঝলক প্রত্যক্ষ করবেন।

তারপরো এখানে আমি তাঁর কিছু নির্বাচিত কবিতা এবং কবিতায় ব্যবহৃত বিশেষ ক'টি শব্দ বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরছি।

হজ করে এসে হারামাইন শরিফাইন ও রওজা পাকের জন্যে তার হৃদয়ে ভীষণ ব্যাকুলতা, বিরহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি হলো। গাড়িতে থাকাবস্থায় তাৎক্ষণিক তিনি দীর্ঘ একটি কবিতা লিখে ফেলেন। সে কবিতার কিছু চরণ, ধারাবাহিকতা ছাড়াই এখানে উল্লেখ করছি। চরণক'টি পড়েই আপনারা তাঁর সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থান বুঝতে পারবেন। কবিতাটি ফারসি ভাষায় লিখিত।

ہ مچو سیما بم سکون قلب گم در دہ منم　　سوختہ اندو ھکین وبس کہ آشفتہ سرم

آے امید عاصیان دراحت آشفتگاں　　روز وشب در خواب وبیداری خیالت ہمدمم

واژگوں بختم مرا از درگہ تو دور داشت　　نالہ باؤ آہ ہا از سوز وساز دل کنم

کن کرم بر فضل خستہ غرق دریائے گنہ　　از ندامت شرمگیں خجلت زدہ خود دمبدم

পারদের মতো আমি, হারিয়েছি হায় হৃদয়ের প্রশান্তি
বিরহানলে দগ্ধ আমি, বিরহব্যথায় অস্থিরমতি।
হে পাপীদের ভরসা, হে প্রেমীদের প্রশান্তি
শয়নে-স্বপনে দিনরাত আমি, তোমাকেই ভাবছি!
দুর্ভাগ্য আমাকে তোমার কাছ থেকে রেখেছে দূরে
সে দুখে এ মন আহাজারি আর হা-হুতাশে মরে।
দয়া করো এই ফজলের পরে, পাপের সাগরে ডোবা সে
লজ্জায় আমি লজ্জিত আজ, কুণ্ঠিত আমি শ্বাসে-প্রশ্বাসে!

সর্বত্র বেপর্দা, উলঙ্গপনা, আত্মসম্মান ও ঈমানি সম্ভ্রমশূন্যতা ও বস্তুপূজার সমালোচনা করে তিনি লিখেন:

زلزلہ ایوان میں مادہ پرستوں کے پڑا　　قصر میں الحاد کے ہو گا ستون دین کا گڑا

عورتیں سر پر چڑھیں اپوا کی بے حرمت ہیں ہم　　رقص عریانی ہنر ہے کیسے بے غیرت ہیں ہم

মজলিসে শুরু হলো বস্তুপূজারীর ভূকম্পন
ঘরের খুঁটি নাস্তিক্য, ভাঙলো ধর্মের ভবন
মেয়েরা উঠলো মাথায়, আমরা কেমন লজ্জাহীন
উলঙ্গপনাই মহা এক গুণ, আমরা এমন মর্যাদাহীন!

চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, ঈমানী মর্যাদাবোধ ও চরিত্রগঠন বিষয়ে রচিত দীর্ঘ কবিতার দু লাইন এখানে উল্লেখ করছি:-

ای گلستان حکیمی کے چمیدہ پھولو　　ای چمنزار نذیری کے دمیدہ پھولو

اور ای گلزار چنوتی کے چنیدہ پھولو　　بلبل ستان چنوتی کے شمیدہ پھولو

হে হাকিমি বাগিচার বিচরণশীল পুষ্পদল
হে নজিরি বাগানের আত্মবিশ্বাসী পুষ্পদল
হে চুনতি উদ্যানের নির্বাচিত পুষ্পদল
চুনতি উদ্যানের মধুভরা হে পুষ্পদল!

তাঁর রচিত 'ছলনা ও বিশ্বস্ততা' নামী গজলের এক অন্তরার চার লাইন পড়া যাক:

وہ حسن جفاخو' یہ عشق وفاجو' وہ کبر خفا ہو یہ عجز رضا جو

ہیں ایسی ستمگاریاں مہ جبینوں کی جو میں خموشی میں سہتا رہا ہوں

ادھر عشق وشکوہ' ادھر ناز عشوہ' ادھر آہ ونالہ' ادھر لاابالی

یہ فقدان احساس ونامہربانی زمانے سے دل دل مچلتا رہا ہوں

সে ছলনাপ্রেমী, এ বিশ্বাসপ্রেমী, সে সুপ্ত অহং, এ মনোরঞ্জন
চন্দ্রমুখীদের এমন সব আঘাত আমি, সইছি তো খুব নিরবে।
এদিকে প্রেম-অনুযোগ, ওদিকে দম্ভ-গৌরব, এদিকে তাপ-ক্রন্দন, ওদিকে 'ভয় করি না!'
এই অনুভূতিহীনতা ও নির্দয়তা, বহুদিন ধরে আমি পুষছি মনে!

সর্বত্র মনুষ্যশূন্যতা, জুলুম-প্রহসনের প্রবৃদ্ধি, নষ্ট রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত এবং ইসলামের মধ্যপন্থা নীতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তিন লাইন পেশ করছি, তাঁর এক দীর্ঘ কবিতা থেকে:

رات ودن دور قلابازی وغداری کا — مردمی گم ہے تو غلبہ ہے سیہ کاری کا

جور ہے ظلم ہے چرچا ہے ستمگاری کا — گرم بازار سیاست ہے تو مکاری کا

کہیں افراط عیاں اور کہیں تفریط عیاں — معتدل کوئی بھی مسلک نہیں جاری بجہاں

ধোঁকাবাজি ও গাদ্দারির দিন শেষ
মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত মানেই ভণ্ডামীর উন্মেষ।
চর্চিত আজ জোর, জুলুম ও নিপীড়ন
রাজনীতির বাজারে সরগরম প্রহসন।
কোথাও বেশি, কোথাও কম দৃশ্যমান
পৃথিবীতে নেই আজ মধ্যপন্থা চলমান!

জনৈক কবির দু লাইনের অন্ত্যমিলের বিপরীতে আমার আব্বার চার লাইন (ফারসি ভাষায়) দেখা যাক:

تیغ ابرو ہم او گلگوں غدارے عجبے — صید انداز او مفقود قرارے عجبے

ناوک افگن نگہش ماہ لقائے عجبے — نازک اندام عجب حور نگارے عجبے

عاشق ناز او وارفتہ مزاجے عجبے — طالب وصل او درماندہ حالے عجبے

آتش عشق بجاں شعلہ مزاجے عجبے — قلب آشفتئ من آہ نوازے عجبے

তার তরবারি ও ঘোড়া, চরম ধূর্ত, আফসোস
তার শিকারের দুরভিসন্ধি বাতিল, আফসোস!
তার তীরন্দাজ দৃষ্টি চন্দ্রসখী, আফসোস

কোমল সৌষ্ঠবী হুরপরীর দৃষ্টি, আফসোস!
তার গর্বিত প্রেমিকের ম্রিয়মাণ মেজাজ, আফসোস
তার মিলনপ্রার্থীর অবস্থা শোচনীয়, আফসোস !
প্রেমের আগুন শিখা জ্বাললো হৃদয়ে, আফসোস
পাগল মন আমার, করছে আহাজারি, আফসোস!

দ্বীনি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহ-উদ্দীপনা জাগানিয়া তাঁর দীর্ঘ এক কবিতার কতিপয় চরণ এরকম:

حرص زر، خوف عدو، یا شہوت و جبن و کسل　　گر تجھے چاہے ٹلانے، کوہ بن کہسار
آندھیاں طوفاں حملے دین پر آنے لگے　　پر خطر پیش عدو چوں خالد جرار بن
فضل ناکارہ ہے بس لیکن تمنا ہے کہ تو　　جانِ من باکار بن باکار بن باکار بن

ধনের মোহ, শত্রুর ভয়, প্রবৃত্তি, ভীরুতা কিংবা অলসতা
তোমাকে টলাতে চাইলে, তুমি পাহাড় হও, পাহাড়ের চূড়া হও!
ঝড় বা তুফান, দ্বীনের ওপর আসলে কোনো আঘাত
ভয়ংকর শত্রুর সামনে তুমি সেনাপতি বীর খালেদ হও!
ফজল তো তুচ্ছ, তবু আশা রাখি এই
হে আমার বৎস! কাজের হও তুমি, কাজের হও তুমি, কাজের হও!

১৯৪৫ সালে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উপদেশপ্রদানের নিমিত্তে রচিত দীর্ঘ ষটপদী কবিতার কিছু চরণ দেখা যাক:

روح کردار بنو قابل اقوال بنو　　فارغ از قال بنو، صاحب احوال بنو
والیٔ علم و حکم جامع افضال بنو　　پیکر خلق حسن، صاحب اعمال بنو
درس خوانان دبستان حکیمی تم بنو　　بادہ نوشان خمستان نذیری تم بنو
فرقہ بازی، حسد و نفس پرستی نکرو　　دین فروشی و دغا بازی و سستی نہ کرو
حیلہ و حرص و ریا عادت پستی نہ کرو　　چھوڑ دو ان کو کبھی، ان میں درشتی نہ کرو
مدح خوانانِ روایات حکیمی تم ہو　　قصہ گویانِ حکایات نذیری تم ہو

সপ্রাণ হও, কথার যোগ্য হও
আঁতলামি ত্যাগ করো, কাজের মানুষ হও।
জ্ঞানী ও ধ্যানী হও, সর্বগুণে গুণী হও
সৎচরিত্রবান আর কাজের মানুষ হও।
হাকিমি শিক্ষানিকেতনের শিক্ষার্থী তোমরাই
নজিরি পানশালার সুধা পানকারী তোমরাই।

দলবাজি, হিংসা আর প্রবৃত্তির পূজা করো না
ধর্মব্যবসা, ধোঁকাবাজি আর অলসতা করো না
ধান্ধা, লালসা, লৌকিকতা আর নীচতা করো না
এসব ছেড়ে দাও, এসবের সাথে সম্পর্ক করো না।
হাকিমি বর্ণনার প্রশস্তি গাইবে তো তোমরাই
নজিরি আখ্যানের গল্প শোনাবে তো তোমরাই!

আমি আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদদের বলতে শুনেছি, আল্লামা শিবলী নুমানী রহ. ও আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী রচিত 'সিরাতুননবী' বিশাল এক জ্ঞানভাণ্ডার। যেখানে যাবতীয় শাস্ত্র ও বিষয়ের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তেমনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতার কবিতাসমূহ যদিওবা পদ্য ও শের এর সম্ভার, কিন্তু এখানে সবরকমের তথ্য-উপাথ্য বিদ্যমান এবং প্রতিটি কবিতা যেনো জ্ঞানকোষ। তিনি তাঁর কবিতায় যে অসংখ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা ছিলো যথার্থ ও অবিকল্প চয়ন। দীর্ঘদিন লখনৌ থাকা সত্ত্বেও তাঁর কবিতার বহু শব্দের অর্থ উদ্ঘাটনের জন্যে আমাকে ফিরুজুল লুগাত দেখতে হয়েছে। এমনকিছু শব্দ এখানে দেখা যাক:
আশেকে গুলজি, নেক ফরজাম, জারুব কশ, সুর মাওর, জর্ গিরান, রাগ চুনুতি, শাখে চান্নার, জিশত আসর, দমন দমন, বগাহ, খোশ লেকা, গুর, কশাকশ, দুররে গায়রে সুপতা, গুলফামে হাসিন, ইশওয়া নিগাহি, নিগাহে নাওক আফগান, গুলানে গুলজারান, হুন বরসনা, তন ওয়াহান, বন ঠন, ছনা, কায়স চোঁ, শেতাবান, কুহকন, কাকল, গদগদানা, শেনাওর ইত্যাদি।
উপর্যুক্ত আলোচনা ও কথাবার্তা তাঁর কবিতা ও কবিত্ব বিষয়ে। তাঁর গদ্যের মূল্যায়ন করতে গেলে বলতে হয়, তাঁর গদ্যও তাঁর কবিতার চেয়ে কম অলংকারপূর্ণ নয়। তাঁর গদ্যভাষাও ছিলো বেশ উঁচু দরের এবং উন্নত শৈলীর। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার ছাত্রপরিষদের সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে তিনি যে ভাষণ দেন, তা ১৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত। তার একাংশের কয়েক লাইন আমি এখানে উল্লেখ করছি। যেখানে মুসলিম উম্মাহর উত্থান ও পতনের কথা রয়েছে। এবং যার সমাপ্তি টানা হয়েছে প্রাচ্যের কবি ইকবালের একটি কবিতা উদ্ধৃত করে।

'পৃথিবীর যেখানেই তাঁরা পা রাখতো, বিজয় ও সাহায্য, জয় ও শাসনভার, রাজ্য ও রাজনীতি, নেতৃত্ব ও সরদারি, গৌরব ও প্রিয়তা তাঁদের পায়ে চুমো খেতো। যে দেশে তাঁদের শাসন কায়েম হতো, সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা, জীবন-জীবিকা, রিজিক এবং জীবনোপকরণ এতোই সহজলভ্য হয়ে যেতো যে, পৃথিবীর আর কোথাও তার উদাহরণ পাওয়া ছিলো দুষ্কর। ধর্মের ভিন্নতা, হিংসে-বিদ্বেষ সত্ত্বেও আমজনতা নিজেদের পুরাতন শত্রুতা ভুলে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো। মানুষের কথা না হয় বাদ দিলাম। গ্রহ-নক্ষত্র, ভূচর-খেচর, জড়-উদ্ভিৎ, কীট-পতঙ্গ, গিরি-সমুদ্র এবং পশুপাখির ওপরও তাদের হুকুমত চলতো। পৃথিবীবাসী তাদের বিদ্যুৎগতির উন্নতিতে বিস্মিত, ইহুদি পাদ্রীরা হিংসা ও ঈর্ষায় অস্থির, খৃস্টান পোপেরা গা জ্বলুনির কারণে পানিহারা মাছের মতো, রাজ্যপতিরা নিজেদের স্থিতির চিন্তায় পারদের মতো স্থৈর্যহারা! যাইহোক, কী এমন যাদু ছিলো, যা তাদের এই ভূমণ্ডলে নয় বরং নভোমণ্ডলেও অকল্পনীয় উন্নতি-উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলো।'

پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی　　ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے
فریاد ز افرنگ و دلاویزیٔ افرنگ　　فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ
عالم ہمہ ویراں ز چنگیزی افرنگ　　معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز
از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز　　از خواب گراں خیز

মুসলিম জাহানের আকাশ আজ রক্তিম
নক্ষত্র যার পথের সাথী, সে কাফেলা তুমিই!
অনুরোধ ফিরিঙ্গি আর ফিরিঙ্গি পারিষদের প্রতি
অনুরোধ ফিরিঙ্গি দুগ্ধপোষ্য আর বিজয়ীর প্রতি
পৃথিবী উজাড় করেছে ফিরিঙ্গি নিপীড়ন
হারমের পুনর্নিমাণেই পৃথিবীর পুনর্জীবন!
ঘুমের ঘোর থেকে, ঘুমের ঘোর থেকে, ঘুমের ঘোর থেকে জাগো
ঘুমের ঘোর থেকে জাগো!

তাঁর কবিতাবলির বিষয় বেশ বিস্তৃত। তাতে শোকগাথা, প্রশংসাকাব্য, অভিনন্দনকাব্য এবং স্বীয় প্রিয় শিক্ষার্থীদের প্রেরণা ও উপদেশমূলক কাব্যও রয়েছে। এসব কবিতায় সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও ইসলামি ইতিহাস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানও পাওয়া যায়। বর্ণিত বিষয়গুলোতে তিনি অনুজ, অগ্রজ, সমবয়েসি হওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রতিটি শোকগাথা, অভিনন্দনকাব্য এবং প্রশংসাগীতিকা রচনা করেছেন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. উল্লেখ করেছেন 'সমকালিনতাই বৈরিতার মূল'। কিন্তু আমার আব্বা মরহুম এই বিষয়টা সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন। এটি তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, দূরদৃষ্টি আর উদারচিত্তের প্রমাণ বহন করে।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতার ইন্তেকালের পর দীর্ঘ একটা সময় পার হয়ে গেছে। এই কবিতাসংকলন (ফজলুল্লাহর কাব্যসমগ্র) বহু আগেই প্রকাশ করা জরুরি ছিলো। কিন্তু 'বিলম্বে হলে বিশুদ্ধ হয়' এই নীতির প্রেক্ষিতে অতিসত্বর এটি কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ (ফজলুল্লাহর কাব্যসমগ্র) নামে প্রকাশিত হবে। এভাবে তাঁর অন্যান্য রচনাবলিও আল্লাহ চাইলে ধারাবাহিকভাবে মলাটবদ্ধ করা হবে। ইনশাআল্লাহ, তাঁর এই কুল্লিয়াত (কাব্যসংকলন) পাঠকদের মাঝে সাড়া জাগাবে।

পরিশেষে, আমি তাঁদের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁরা আমার শ্রদ্ধেয় পিতার যাবতীয় রচনাকর্ম (অপ্রকাশিত) মলাটবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন। বিশেষত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, হযরত মাওলানা কারী ইলিয়াস সাহেব (শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা জমির উদ্দীন রহ. (গঙ্গোহি রহ. এর খলিফা) এর নাতি, জনাব মাওলানা ফুরকানুল্লাহ খলীল সাহেব (উপ-পরিচালক: দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া) এবং জনাব মাওলানা হাফেজ জাহেদ হোসাইন সাহেব। এঁরা প্রত্যেকেই 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ' এর জন্যে অভিমত লিখেছেন। আমি জনাব মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলামের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতার পুরনো ডায়েরি থেকে সমস্ত কবিতা কম্পোজ করার মতো কষ্টসাধ্য কাজটি আঞ্জাম দিয়েছেন।

আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ.-এর প্রকাশিত রচনাবলি

১. **ترجمة الشمائل للإمام الترمذي مع التعليقات الهامة** বাংলায় এটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্রেস থেকে বেশ কয়েকবার ছাপা হওয়ার পর ২০১৬ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে কিতাবটি নতুন আঙ্গিকে ছাপা হয়। পাঠক চাহিদার কারণে ই.ফা.বা একের পর এক সংস্করণ ছেপে যাচ্ছে। কিতাবটি খুবই উন্নতমানের ছাপা ও বাঁধাইয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

২. **ترجمة القصيدة البردة للبصيري** বাংলায় এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম ১৯৬৫ সালে ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্রেস থেকে ছাপা হয়। একই প্রেস থেকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণও যথাক্রমে ১৯৭৭ ও ১৯৯৩ সালে ছাপা হয়। অতপর ২০১৮ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সম্পূর্ণ নতুনরূপে এটি প্রকাশ করে এবং খুবই যত্নসহকারে উন্নত ছাপা ও বাঁধাইয়ে তারা কিতাবটি প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

৩. **الدروس الصرفية** একালের মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্যে তিন খণ্ডে রচিত 'সারফের কাওয়ায়েদ' তথা শব্দতত্ত্বের ব্যাকরণ সম্বলিত কিতাবটি খুবই উপযোগী ও সহজবোধ্য। উর্দু ভাষায় রচিত এ কিতাব একসময় সরকারি মাদরাসার সিলেবাসভুক্ত ছিলো। প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্রেস থেকে ১৩৮৭ হিজরিতে। ইতোমধ্যে এর বঙ্গানুবাদ হয়ে গেছে। আরবি অনুবাদও করা হবে ইনশাআল্লাহ, আবার যাতে মাদরাসার সিলেবাসভুক্ত করা যায়।

৪. **كشف الجلالين** এটি উর্দু ভাষায় রচিত **'তাফসিরে জালালাইন'** এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থ। কিতাবটি সর্বপ্রথম ১৯৫৪ সালে লাহোরের কাশ্মিরী বাজারের শায়খ গোলাম আলীর প্রতিষ্ঠান **'সাইয়েদ এন্ড সন্স'** থেকে ছাপা হয়।

৫. **'শরহে ইসাগুচি'** উর্দু ভাষার এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১৯৫৪ সালে লাহোরের **'সাইয়েদ এন্ড সন্স' প্রকাশন** থেকে প্রকাশিত হয়।

৬. **'তরজমাতু কিতাবে গুলজার সুন্নাত'** হযরত মাওলানা মিয়াঁ আসগর হোসাইন দেওবন্দী রহ. এর ছোট কলেবরের এই কিতাব আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এটির আনুমানিক প্রকাশকাল ১৯৫৪ইং।

৭. **'আসান উর্দু তালিম'**পূর্ব পাকিস্তানে এই কিতাবটি সিলেবাসভুক্ত ছিলো।

৮. **'উর্দু পাক গ্রামার'** পূর্ব পাকিস্তানে এটি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

৯. **الإنصاف** এটি বাংলা ভাষায় রচিত, চাঁদ দেখা সংক্রান্ত মাসায়েল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। এই পুস্তিকায় আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের সাবেক খতিব আওলাদে রাসুল হযরত শায়খ আব্দুল করিম আল মাদানী রহ. লিখিত ভূমিকা রয়েছে। তিনি আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হযরত মুফতি আযীযুল হক রহ. এর জানাজা পড়িয়েছেন।

১০. **ইয়াদে মুহসিন**

১১. **তরজমাতু শিকওয়া ওয়া জওয়াবে শিকওয়া।**

এ কিতাব দু'টিও ছাপা হয়। দুঃখজনকভাবে এ দু'টির বিস্তারিত তথ্য আমাদের জানা নেই!

অপ্রকাশিত রচনাবলি

১. **الدرالبهي في شرح الجامع للإمام الترمذي** তিনি যখন উর্দু ভাষায় তিরমিযী শরিফের এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখছেন, তখন আমি চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থী। সম্ভবত এটি ১৯৭৭ সালের কথা, এই বয়োবৃদ্ধ বুজর্গ তখন কোনোরকম ক্লান্তি ছাড়াই খুবই মনোযোগসহকারে ব্যাখ্যাগ্রন্থটি লিখে চলেছেন। আর আমরা তরুণ শিক্ষার্থীরা অবাক দৃষ্টিতে তাঁর এই কর্মযজ্ঞ দেখতাম! তিরমিযীর মুকাদ্দামা যেহেতু খুবই দীর্ঘ, তাই তিনি হয়তো এটির কাজ আরো আগে থেকেই শুরু করেছিলেন। জীবন তাঁকে সঙ্গ না দেয়ায়, ১৯৭৯ সালে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ায়, তিনি মুকাদ্দামাসহ কিতাবুস সালাত পর্যন্ত লেখা শেষ করেন। এটিকে সুবিন্যস্ত ও সুচারু রূপে ছাপানোর লক্ষ্যে প্রস্তুতি চলছে।

২. **الإسلام في ميزان العقل 'যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম'**। আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ এবং ইসলামের সত্যতাকে দালিলিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে বাংলাভাষায় এটি একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ। এটি তিনি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে রচনা করেন। এ গ্রন্থের বহু প্রবন্ধ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র **মাসিক আত-তাওহীদ**-এ প্রফেসর ড. রশীদ সাহেবের সম্পাদনায় ছাপা হয়। এর বহু পৃষ্ঠা হারিয়ে যাওয়ার পরও এখনো ২৫০ পৃষ্ঠামতো অক্ষত রয়েছে। এগুলোকে বই আকারে প্রকাশের জন্যে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।

৩. **الدروس النحوية** এটি দুখণ্ডে রচিত কিতাব। **الدروس الصرفية**-এর মতো এ কিতাবে তিনি সহজ ও সাবলীল ভাষায় মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্যে ইলমে নাহব এর কাওয়াদ তথা আরবি বাক্যতত্ত্বের ব্যাকরণ উর্দুতে রচনা করেছিলেন। এটির বঙ্গানুবাদ হয়ে গেছে। আরবি অনুবাদের জন্যেও আমরা কাজ শুরু করেছি।

৪. **'ইসলাম কা ইকতিসাদি নিজাম'** মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারভি রহ. এর এই কিতাব খতিবে আজম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ রহ. এর আগ্রহে আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা বাংলায় অনুবাদ করেন। দুঃখজনকভাবে অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গেছে!

৫. **'কাদিয়ানিয়াত'** বাংলা ভাষায় তিনি সংক্ষিপ্তাকারে অথচ খুবই পূর্ণাঙ্গরূপে এ কিতাবটি রচনা করেন। এ বইয়ে তিনি কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন।

৬. **'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ'** এটি তাঁর উর্দু, ফারসি, আরবি ও বাংলা ভাষায় রচিত শের ও কবিতার সংকলন। এটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ইনশাআল্লাহ!

৭. এসব ছাড়াও তাঁর রচিত সিলেবাস সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা এবং ফারায়েজ ও ফাতাওয়ার একটি সংকলন রয়েছে।

-আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এম.পি
২৭ শাবান, ১৪৪১ হিজরি।
১২ এপ্রিল ২০২০ খৃস্টাব্দ।

প্রথম অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) : সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা

খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইসলামি বিশ্বের অবস্থা

হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর শুরু এবং খৃস্টীয় উনবিংশ শতকের শেষে বৈশ্বিক পরিসরে সমগ্র মুসলিম জাতির এক বিস্ময়কর ও ট্রাজেডিক ইতিহাস রচিত হয়েছিলো। পুরো মুসলিম দুনিয়া বহুবিধ বিশৃংখলা, ব্যাপক বিপর্যয়, ঘোর দুর্দিন ও বুদ্ধিবৃত্তিক নৈরাজ্যের ভেতর দিয়ে কালাতিপাত করছিলো। সর্বত্র জড়তা ও বন্ধ্যাত্বের আলামত ছিলো স্পষ্ট। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির অবস্থা ছিলো ক্ষত-বিক্ষত ও টুকরো টুকরো। মুসলিম শাসকবর্গ ভোগ-বিলাস, চিত্ত-বিনোদন, শখ-আহ্লাদ, আমোদ-প্রমোদে ছিলো আকণ্ঠ নিমজ্জিত। নিজেদের মধ্যে চলছিলো দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও রক্তপাতের মহোৎসব। ওলামা, শিক্ষিত সমাজ ও জাতির দিক-নির্দেশকগণ হীনমন্যতার শিকার। তাঁরা যুগের উদ্ভূত নিত্য নতুন সমস্যাবলির যথাযথ সমাধান ও ঐতিহ্য পরম্পরায় লব্ধ বর্ণনা-উপাত্ত সংরক্ষণ করে সম্মুখে অগ্রসর হবার শক্তি ক্রমশ হারাতে বসেছিলো।

অন্যদিকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসরমান পাশ্চাত্যের অবস্থান ছিলো অগ্রগতির প্রতিটি ধাপেই সুসংহত। তারা সদা নিয়োজিত সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে আয়ত্ব করার নিরন্তর গবেষণায়। তাদের উচ্চতর গবেষণার ফসল হিসেবে সমাজে এমন সব বস্তু ও বিষয়ের প্রচলন ঘটেছে ও ঘটছে যা মুসলিম তরুণ প্রজন্মের ক্ষেত্রে প্রাণঘাতি বিষতুল্য। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ একদিকে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রাচীন দেয়ালগুলো ধ্বসিয়ে দিচ্ছিলো, অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে উস্কে দিচ্ছিলো নিজেদের লালিত বিশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় ও বৈধ-অবৈধতার সীমাতিক্রমী প্রবণতাকে; বরং সর্বোপরি ইসলামি জীবনধারাই ছিলো প্রতিপক্ষের প্রধান টার্গেট ও পরিকল্পিত নিশানা। চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছিলো ইসলামের স্বাভাবিক নীতিমালাকে। ইসলামের বিধান ও আইনকে অর্থহীন আর অকার্যকর প্রমাণের চেষ্টা হচ্ছিলো। কিন্তু পাশ্চাত্যের বহুমুখী আগ্রাসনের এমন প্রেক্ষিতেও প্রাচ্য ছিলো প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অসচেতন, বেপরোয়া এবং নিজেদের অতীত গৌরবগাঁথায় আত্মনিমগ্ন ও মোহাবিষ্ট।

বৃটিশ শাসনামল

সমগ্র বিশ্বের দৃশ্যপটে ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবস্থা ছিলো বিশেষভাবে শোচনীয় এবং করুণ। এখানে সদর-অন্দর সর্বক্ষেত্রে মুসলমানগণ ছিলো পশ্চাদপদ। অভ্যন্তরীণভাবে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার বড়ো কারণ ছিলো ইংরেজদের আগমনকালে ভারতে মুসলমানদের শাসন চলছিলো। তাঁরা নিজেদের সব কিছুতেই ছিলো সর্বেসর্বা। মুসলিম শাসকদের পরস্পরের মধ্যকার অন্তর্ঘাতমূলক লড়াই, অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাপনা ও অদূরদর্শিতার

কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রদীপ নিভে যায়, পক্ষান্তরে ইংরেজরা ভারতের 'ভাগ্যবিধাতা' ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক বনে যায়। কিন্তু মুসলমানদের অন্তরে মুসলিম শাসনের পতন ও দাসত্বের পীড়াদায়ক অনুভূতিটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিলো। স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাদের হৃদয় ছিলো তখনো ব্যাকুল ও অস্থির। এ কারণে তারা ইংরেজদের প্রতিটি পদক্ষেপের বিপরীতে সম্ভাব্য প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। পদে পদে তাদের মুকাবিলায় বুকটান করে দাঁড়িয়ে যায়। শাহ্ আবদুল আযীয (রাহ.)-এর বৈপ্লবিক ফাত্ওয়া, বালাকোটের শহীদাইন (সাইয়িদ আহমদ শহীদ ও ইসমাইল শহীদ) কর্তৃক শুরু করা আন্দোলন টিপু সুলতানের দুঃসাহসী লড়াকু পদক্ষেপ, ৫২-র স্বাধীনতা সংগ্রাম, খিলাফত আন্দোলন, সিপাহী বিপ্লব ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ইত্যাদি গোলামির শিকল ভেঙে মাতৃভূমির আযাদী পুনরুদ্ধারে একেকটি অক্ষয় স্মারক ও অম্লান দৃষ্টান্ত।

কিন্তু সবক'টি পদক্ষেপ যখন ব্যর্থ হয়ে যায়, ইংরেজরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ শুরু করে দেয়। প্রতিশোধের উন্মত্ততাও তাদের জন্য টেকসই সফলতা বয়ে আনেনি। হত্যা, লুটতরাজ, জ্বালাও-পোড়াও, সর্বপ্রকার মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড এবং বর্বরতার চরম সীমায় পৌঁছেও রক্তপিপাসু ইংরেজদের জিঘাংসা মেটেনি। তারা মুসলমানদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যন্ত খতম করতে মুসলমানদের জীবনকে সামগ্রিকভাবে কোণঠাসা করার যাবতীয় ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে। যেমন, মুসলমানদের আয়-রোজগারের পথ রুদ্ধকরণ, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব থেকে ছাঁটাই, ওয়াকফ সম্পত্তি জব্দ করা– যা দিয়ে তাঁদের মসজিদ-মাদরাসা পরিচালিত হতো। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি ফরমানে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হতো অমুক অমুক পদে কেবল হিন্দুরাই নিয়োগ পাবে।[১] স্যার উইলিয়াম হান্টার বলেন, "মুসলমানগণ এখন এতো নিম্ন অবস্থানে চলে গেছে যে, তারা নিজের যোগ্যতাবলে সরকারি চাকুরি পাবার উপযুক্ত হলেও পৃথক ঘোষণার মাধ্যমে বিশেষ সতর্কতায় তাদের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। বাস্তবে তারা যতোই নিরীহ সাধারণ হোকনা কেনো তা ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয় উর্ধ্বতন শাসকগোষ্ঠির কাছে।[২]

ভারতের খিলাফত আন্দোলনের এরকম উত্তাল দিনগুলোতেই আল্লামা ফজলুল্লাহর রহ. জন্ম ও বেড়ে ওঠা।

খিলাফত আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য

১৯১৯ সালে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। তখন হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে ঐক্যের বেশ চমৎকার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা, উসমানি শাসনের ক্ষেত্রে ঐক্য প্রত্যাশীদের রাজনীতির বিরোধিতা ও স্বাধীন সরকার গঠনের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। সমগ্র হিন্দুস্থানজুড়ে বইতে শুরু করে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রবল হাওয়া। এই আন্দোলনের ফলে হিন্দুস্থানে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। দেশপ্রেম ও ইংরেজদের প্রতি ঘৃণার প্রবল উচ্ছ্বাস

---

১. আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভি রাহ. : জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা, ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন, পৃ. ১৯, মে ২০১৮ ইফাবা

২. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৯-২০

দেখা দেয়। গান্ধীজি পূর্ণ উদ্যম ও দৃঢ় উদ্দীপনা নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে সমগ্র ভারত চষে বেড়াতে লাগলেন। এমন বড়ো বড়ো সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যার চেয়ে বড়ো ও উত্তপ্ত সমাবেশ ভারতবর্ষে এর পূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। মানুষ তাদের নেতৃবৃন্দকে নজিরবিহীন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অবর্ণনীয় আবেগ ভরে অভ্যর্থনা জানাতে লাগলো। জনতার স্লোগানে প্রকম্পিত হতো আকাশ-বাতাস।[১]

অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদ[২] বিদেশী পণ্য বর্জন ও অসহযোগ (Non Co-operation) আন্দোলনের কর্মসূচি দিলেন। এটি স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে একটি শক্তিশালী উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজ প্রশাসন এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করে, এতে পুরো সরকার ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে এমনকি সমগ্র ভারতে গণবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি যেন ইংরেজ সরকারের পতনেরই পূর্বাভাস দিচ্ছিলো। পুরো ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার দূরপ্রাচ্যের এই জনপদে দীর্ঘ সময়ের জন্য এক জটিল অস্থিরতার আবর্তে নিপতিত হয়।[৩]

ইসলামি দুনিয়ায় পশ্চিমা আগ্রাসন : প্রতিরোধের প্রাথমিক প্রয়াস

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইসলামি বিশ্বে পাশ্চাত্যের বহুমুখী আগ্রাসন জোরালো হয়। বেশ কয়েক শতক আগে ক্রুসেড[৪] যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। সুযোগ হাতে আসার পর তারা সর্বশক্তি নিয়ে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে ইসলামি বিশ্ব স্বীয় নৈতিক দুরবস্থা, পারস্পরিক বিভাজন, অন্তর্বিরোধ ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহে ছিলো ক্ষত-বিক্ষত। তুর্কী সাম্রাজ্যও (যা দীর্ঘকাল ইসলামি খিলাফতের কেন্দ্র ছিলো) কালের পরিক্রমায় স্বকীয়তা ও স্বনির্ভরতা হারিয়ে ফেলেছিলো। অপরদিকে পশ্চিমা সভ্যতা ছিলো নতুন সংস্কৃতি আর নতুন শক্তিতে বলিয়ান, নতুন উদ্যম-উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত। তাদের এই উত্থান ছিলো প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় পুষ্ট–যা ক্রমবর্ধমান গতিতে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে তারা ইসলামের হৃদপিণ্ডতুল্য 'হিজাযে মুক্কাদ্দাস' বা পবিত্র আরব ভূমিতেও থাবা বসানোর পাঁয়তারা শুরু করে দেয়। এই পরিস্থিতি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ছিলো অত্যন্ত বিশৃংখল ও হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু এর মোকাবেলায় চিন্তার যে প্রসারতা, দৃষ্টির সূক্ষ্মতা, অমিত শক্তি ও অকুতোভয় সাহসের প্রয়োজন ছিলো; সমকালীন মুসলিম নেতৃত্বের মাঝে তার প্রচুর ঘাটতি ছিলো।[৫]

---

১. প্রাগুক্ত; পৃ. ২০-২১
২. প্রাগুক্ত; পৃ. ২১
৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ২১-২২
৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ২২-২৩

এ ক্ষেত্রে যেসব ওলামা সঙ্কট উত্তরণ ও পরিস্থিতি মুকাবিলার চিন্তা ও চেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানী[১]'র নাম অনন্য বিশিষ্টতায় দীপ্তিমান। কিন্তু তিনি নিজের সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ মেধা ও বলিষ্ঠ বাগ্মিতা সত্ত্বেও লক্ষ্যের শেষ মনযিলে পৌঁছুতে পারেননি। উপরন্তু তাঁর কর্মকৌশলে রাজনীতির রঙ-ছাপ ছিলো সমধিক দৃশ্যমান। তাঁর বেশির ভাগ কর্ম-প্রয়াস ইসলামি বিশ্বের রাজনৈতিক, সাংগঠনিক উন্নতি, মুসলিম জাহান থেকে অমুসলিম ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দখলদারিত্বের অবসানের লক্ষ্যে নিবেদিত ছিলো। পরিশ্রম-সাধনার সিংহ ভাগও এ-পথেই ব্যয় হয়েছে। তাঁর শিষ্য মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু[২] (রহ.) রাজনৈতিক কৌশলের পরিবর্তে আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করেন এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর মতো ইসলামের স্বীকৃত কতিপয় আকায়িদ সম্পর্কে এমন সব 'বিশেষব্যাখ্যা' উপস্থাপন করেছেন যা হকপন্থী আলিম সমাজের পক্ষে গ্রহণ করা কোনো কালেই সম্ভব ছিলো না।

এ প্রসঙ্গে মিসরের 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন আন্দোলন'-এর সাথে বৃহত্তর জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত ছিলো। তারা যদি স্বকীয়তা বজায় রেখে স্বাভাবিক পথে চলতো তাদের মাধ্যমে অন্ত ত মধ্যপ্রাচ্যে পুনর্বার একটি ইসলামি বিপ্লবের প্রত্যাশা সুদূর পরাহত ছিলো না। কিন্তু তাদের নেতৃবর্গ সঠিক সময়ের কিছু আগেই কার্যকর রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে আরব জাতীয়তাবাদ এবং সমাজবাদের পতাকাবাহীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠানও এই আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার ফলে ইসলামি বিশ্ব একটি ব্যাপক ও শক্তিশালী ইসলামি আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত হয়।[৩]

উপমহাদেশে যেসব ব্যক্তি পশ্চিমা সংস্কৃতির সমালোচনায় মুখর ছিলেন তাঁদের মধ্যে আকবার ইলাহাবাদী অন্যতম। তিনি নিজস্ব রম্যভঙ্গিতে, অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও ধারালো ভাষায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সফলভাবে কলম চালিয়েছেন। এ কাজে তাঁর ভূমিকা বেশ গ্রহণযোগ্যতাও পায়। কিন্তু তাঁর পক্ষে ঔপনিবেশিক স্রোতের শাণিত প্রবাহ ঠেকানো সম্ভব হয়নি। এর কারণ ছিলো বিদ্রুপাত্মক, প্রতিবাদমূলক সাহিত্য ও সংস্কারের আবেদন কেবল একটি সীমিত সময় পর্যন্ত প্রভাব ফেলতে পারে। সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় নাম ড. মুহাম্মদ ইকবাল। যাঁকে আধুনিক প্রাচ্যের সর্বাধিক দূরদর্শী চিন্তাবিদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তিনি পশ্চিমা জীবনধারাকে ব্যাপক ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতা ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে এর সমালোচনা করেছেন। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মতৎপরতায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তা সত্ত্বেও তাঁর কর্মসাধনার ব্যাপ্তি উপমহাদেশের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিলো[৪]।

---

১. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩
২. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৫
৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬
৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬

খিলাফত উৎখাতের দুর্ভাগ্যজনক প্রচেষ্টা

ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনের প্রতি গভীর সমর্থন এবং এ প্রশ্নে তাঁদের আত্মমর্যাদাবোধ ইসলামের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান পুরোপুরি সঠিক ছিলো। খিলাফত ইসলামের জীবন ব্যবস্থার একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর এবং এটা প্রতিষ্ঠিত রাখাও মুসলমানদের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। প্রথম শতাব্দীর মুসলমানদের জন্য এটা অকল্পনীয় ছিলো যে, তাঁদের জীবনের একটি ক্ষুদ্র মুহূর্তও 'খলিফাতুল মুসলিমিন' এর অবর্তমানে স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে! কিন্তু পরিশেষে সেই মহান খিলাফতের পদ ও আসন যা মহানবীর (সা.) ইন্তেকালের পর কোনোরূপে এ পর্যন্ত চলে আসছিলো, উসমানী খিলাফতের বাহকেরা (নিজেদের সমুদয় দুর্বলতা, অনেক দণ্ডনীয় গর্হিত কাজ করেও) এর ঐশ্বর্য-মর্যাদা ও ঐতিহ্য ধরে রাখার পাশাপাশি সমগ্র ইউরোপে তার এক সুউচ্চ ভাবমর্যাদা ও প্রতাপ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। যা হারামাইন শরিফাইনের রক্ষক ছিলো, ৩০ মার্চ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৪১ হিজরি সনে কামাল আতার্তুক (ভারতবর্ষের মুসলমানরা অজ্ঞতাবশত যার হাতে বায়'আত গ্রহণ করে বসেছিলো) এর হাতে কলমের এক খোঁচায় ও মুখের একটি দাম্ভিক ঘোষণায় অবলুপ্তি ঘটে। ইসলামি যুগের শেষ শতকগুলোতে মুসলমানদের জন্য দুর্ভাগ্যের ইতিহাস কী? এমন প্রশ্নের জবাবে সচেতন ও বাস্তববাদী যে কোনো ইতিহাসবিদের পক্ষে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের এই করুণ ঘটনা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ইস্তাম্বুলের জাতীয় পরিষদ যখন খিলাফত ব্যবস্থা রহিত করার সিদ্ধান্ত নেয়; কেবল পবিত্র ভূমিগুলোই নয় পুরো ইসলামি উম্মাহর ইজ্জত-আব্রুর দুর্গটাই ভেঙে পড়ে। যা তুর্কীরা নিজেদের সর্বোচ্চ ত্যাগ-তিতীক্ষা, সামরিক শক্তি সর্বোপরি পবিত্র খিলাফতের নামে নির্মাণ করেছিলো।[১]

ভারতীয় শাসনামল

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.)-এর জীবদ্দশায় দু'দুটি মহাযুদ্ধ[২] সংঘটিত হয়েছে; পুরো বিশ্ব জর্জরিত হয়েছে। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে[৩] আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে লাখ লাখ লোক হত্যা করা হয়েছে। লোকক্ষয়, অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট ও সীমাহীন দুঃখভোগের মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে এর খেসারত দিতে হয়েছে। সীমাহীন দানবীয় ঔদ্ধত্য বিশ্ব তছনছ করে দিয়েছিলো। আল্লামা ফজলুল্লাহ দেখেছেন বৃটিশের শাসন ও নিপীড়ন। তাঁর চোখের সামনে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়েছে। হয়েছে হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও তার অংশ পূর্ব পাকিস্তান। অবশেষে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তিন দেশ, তিন পতাকা ও তিন শাসন দেখেছেন। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাইকারি হারে হরিজন নিধন, বাংলাদেশী ও বিহারী নিধন। বাবরি মসজিদসহ বহু সংখ্যক মসজিদ ধ্বংস সাধন দেখেছেন। কিভাবে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়েও এ অঞ্চলের মানুষের প্রকৃত মুক্তি ঘটেনি। উপমহাদেশে মুসলমানদের দুর্দশা ক্রমে বেড়েই চলছিলো, শেষ হওয়ার লক্ষণ নেই। এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে পাক-ভারত যুদ্ধ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ইরাক-

---

১. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৮
২. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৬
৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৬
৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৭

কুয়েত যুদ্ধ, পাক-বাংলাদেশ যুদ্ধ[১], ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলি অত্যাচার, জম্মু কাশ্মিরে মুসলমানদের যূপকাষ্ঠে বলিদান।[২]

ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন

হিজরি প্রথম শতকের শেষের দিকেই ইসলামের সুশীতল ধারার ছিঁটেফোঁটা হিন্দুস্থানের সমস্ত উপকূলীয় এলাকা এবং পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় বর্ষিত হতে শুরু করেছিলো। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় সিন্ধু ও পাঞ্জাব পর্যন্ত মুসলমানরা বিজয়ীর বেশেই প্রবেশ করেছিলো। হিন্দুস্থানের দক্ষিণে মালাবার[৩] ইত্যাদি এলাকা পর্যন্ত আরব বণিকেরা পৌঁছে কেবল বসতিই গড়ে তোলেনি বরং এসব এলাকার বাজার ও বাণিজ্যের স্থানগুলোতে তারা ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত হিন্দুস্থানে ইসলামের পয়গাম ও তার আধ্যাত্মিক বিজয়ের যুগ, দিগ্বিজয়ী মুসলমানদের বিজয়ী বেশে এখানে প্রবেশের বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিলো।

সিংহল[৪], মাল্লীপ[৫], গুজরাট,[৬] মালাবার[৭] ইত্যাদি এলাকায় ব্যাপকহারে আরবদের বসতি গড়ে উঠেছিলো। এসকল এলাকায় মুসলমানদের আন্তরিকভাবে স্বাগতম জানানো হয়।[৮] আরব বণিকেরা সাধারণত ধর্মীয় জ্ঞানে পণ্ডিত হতেন এবং সুফি-দর্শনের অনুসারী হতেন। তাঁরা হাটে-বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং জনসাধারণের সাথে মেলামেশা করতেন। ফলে নিজেদের মার্জিত স্বভাব ও সহজ-সরল জীবনের বাস্তব নমুনা তুলে ধরে মানুষের জীবনধারা ও তাদের চিন্তা-চেতনার গতি পাল্টে দিতেন। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক প্রফেসর ডব্লিউ আর্নল্ড একথার স্বীকৃতি নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। "হিন্দুস্থানের মুসলমানদের মধ্যে নওমুসলিম ও তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বেশি। তবে তাদের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের ব্যাপারে কোনোরূপ বল প্রয়োগ বা জোর-জবরদস্তির সামান্যতম স্থান নেই; বরং সুফিসাধকদের অনুপ্রেরণা ও শিক্ষার প্রভাবই এই প্রচারকার্যে এককভাবে কাজ করেছে।"[৯]

---

১. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৭
২. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৮
৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৮
৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৯
৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪০
৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪১
৭. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪২
৮. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৫

হযরত মুহাম্মাদের (সা.) সময়েই খালিদ ইব্‌নে ওয়ালিদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইসরাইল আফগান ও নিজের গোত্রের লোককে পত্র দিয়ে সমস্ত ধর্মগ্রন্থের প্রতিশ্রুত পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদের (সা.) বাণী ও কুরআনের কথা জানান– 'আমি নিজে এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি; আপনারাও সুনিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন আশা করছি। স্রষ্টা ছাড়া কোনো সৃষ্টির কাছে নতি স্বীকার করাকে ইসলাম নিষেধ করেছে। সংশোধিত, সভ্য, চরিত্রবান ও উন্নত হয়ে স্বর্গের অধিকারী হওয়ার পূর্ণ পদ্ধতি লাভ করে আমরা উপকৃত হয়েছি। তাই আপনাদেরও কল্যাণ কামনায় এই পত্র প্রেরণ।' [তারিখে জাহাঁকুশ ও মাজমাউল আনসার][১]

ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশস্থ মাদ্রাজের মালাবার বন্দরের ওপর দিয়ে আরবরা বাণিজ্যের জন্য চীন যাতায়াত করতেন। অবশ্য সারা পৃথিবীতে ইসলাম পৌঁছে দেবার দায়িত্বও তাঁদের ছিলো। মালাবার স্থানটিকে আরবরা 'মা'বার' বলতেন, আরবিতে এর অর্থ পারঘাট। আরব বণিক, মুবাল্লিগ ও নাবিকেরা এই ঘাটের ওপর দিয়ে মাদ্রাজ, মক্কা, হেজায, মিসর ও চীন যাতায়াত করতেন। বলাবাহুল্য, মা'বার নাম তাঁদেরই রাখা।[২] 'পরাবৃত্ত' পড়ে জানা যায় যে, ভারতের 'চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরামন পেরুমল স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন।[৩] এছাড়াও একজন মুসলিম লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়– 'একজন হিন্দু রাজার মক্কা গমন এবং তাঁর মুহাম্মাদের (সা.) নিকট উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় মুসলমান হওয়া রাজা কিছুকাল হযরতের নিকট অবস্থান করে প্রত্যাবর্তনের সময় 'শহর' নামক স্থানে পরলোক গমন করেন।[৪] 'মালাবার রাজাদের মধ্যে চেরামান পেরুমলই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পেরুমল বংশীয় শেষ রাজা। শুধু নিজে ধর্মান্তরিত হয়েই চেরামান পেরুমল ক্ষান্ত হননি, প্রজাদের মধ্যেও ইসলাম প্রচারে তিনি সচেষ্ট হন। তারও অনেক আগে ভারতে ইসলাম ধর্ম এসেছিলো, তা না হলে কী করে জানলেন তিনি ইসলাম ও মুহাম্মাদের (সা.) কথা ? কেনইবা তাঁর মক্কা যাওয়ার আকর্ষণ হলো?

ভারতে ইসলামের আগমন সম্পর্কিত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের কয়েক বছর পর হতেই ভারতে ইসলামের আগমন ঘটে।

---

১. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৮
২. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৯
৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৫১
৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ৬০
৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ৬১

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. : সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা

ধর্মীয় পরিস্থিতির সাথে শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্কটা নিবিড়ভাবে বিজড়িত। মানুষের চিন্তা, মানস গঠন ও চেতনা নির্মাণে শিক্ষা সমধিক কার্যকর ও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একটি উপাদান। সমাজের ধ্যান-ধারণা, অভিরুচি, অগ্রাধিকার, প্রশাসনের আঙ্গিক ও কাঠামো সবকিছুই এই শিক্ষাব্যবস্থা আর পাঠ্যসূচির অনুগামী ও প্রভাবে চালিত হয়। পাঠ্যক্রম একটি জাতির সামগ্রিক অবস্থার আয়নাস্বরূপ। যে দর্পণে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের পথরেখা বিম্বিত হয়।[১]
উপনিবেশ যুগে ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো, সেটি ছিলো পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে বিজ্ঞানসম্মত জীবনধারা আয়ত্ত করে নিতো। তবে এ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার বীজ বপন করে দিতো। ফলে শিক্ষার্থীরা মাতৃভূমিকে ভালোবাসার পরিবর্তে পশ্চিমাদের ভালোবাসতে শুরু করে। তাদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করে। শুধু তাই নয় ঐ ঔপনিবেশিকদের ভারতীয় প্রজন্ম সভ্যতার ধ্বজাধারী ও পুনর্জাগরণের প্রবাদপুরুষ হিসেবে মনে করতে থাকে। তারা আরো ধারণা করতে থাকে যে, ঔপনিবেশিকরা না এলে বিভিন্ন দেশের উন্নতি ও প্রগতি সাধিত হতো না; আর ইসলামই হলো মুসলিমদের পশ্চাদপদতার মূল কারণ।[২]
মুসলিম বিশ্বের তরুণরা এমন বদলে গেলো, যেনো তারা মুসলিম সন্তান নয়। এমনকি তারা এমন হয়ে গেলো যে, তারা মুসলিম দেশের নাগরিকও নয়। অথচ একসময় তারাই ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো, তাদের বিতাড়নের প্রচেষ্টা করেছিলো এবং তাদেরকে লুটেরা মনে করতো। কিন্তু তারাই আবার ঔপনিবেশিকদের সভ্যতার চালিকাশক্তি মনে করতে শুরু করে। উপনিবেশ যুগে শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মহীন হয়ে পড়ে। ইংরেজি বিদ্যালয়, ইংরেজি কলেজ এবং ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা এমন প্রজন্ম তৈরি করে যারা দেশাত্মবোধ ও ধর্মানুভূতি থেকে অনেক দূরে সরে আসে এবং মাতৃভূমি সংস্কার করার চিন্তাধারা তাদের কাছ থেকে লোপ পায়। লর্ড মেকলের উক্তিতেই এর প্রমাণ মিলে : "বর্তমানে আমাদেরকে এমন একটি শ্রেণি গড়ে তুলতে হবে, যারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা আকৃতি ও বর্ণে ভারতীয় হবে বটে কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ।"[৩]
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৈরী তুফানের টালমাটাল সে প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের দীন, ঈমান, জাতীয় চেতনা ও বিশ্বাসের প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে দৃঢ়মূল ও গতিশীল ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ছিলো স্বীকৃত বাস্তবতা। সমকালীন আলিম সমাজের দূরদৃষ্টি এবং জাতীয় চেতনার দর্পণে এ বিষয়টি যথাসময়ে উদ্ভাসিত না হলে এবং নিযামুদ্দিন সাহালভীর 'দরসে নিযামি' চালু না হলে হয়তো উপমহাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতে পারতো।

---

১. নদভী, মনসূর সুলতান, নদওয়াতুল উলামা কা ফিকহী মেজাজ অওর আবনায়ে নাদওয়া কী ফিকহী খিদমাত; আল-মা'হাদুল আলী আল-ইসলামী, হায়দারাবাদ, প্রথম সংস্করণ- জুলাই ২০০৪ খৃ. পৃ. ৫৮।
২. আস্ সাফাতী, মুহাম্মাদ সাইয়িদ, সৈয়দ আলী আশরাফ ইনস্টিটিউট অব হাইয়ার ইসলামিক লার্নিং, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়; ঢাকা, পৃ. ৬।
৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৬।

দরসে নিযামি

মোল্লা নিযামুদ্দিন সাহালভী দরসে নিযামী[১] (প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতি) এর প্রতিষ্ঠাতা, তিনি ছিলেন একাধারে দীনের সুদক্ষ আলিম, ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ, দার্শনিক, ভাষ্যকার এবং বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ। তিনি ১০৮৮-৮৯ হিজরি, তথা ১৬৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে বর্তমান উত্তর প্রদেশের ভারতস্থ সাহালী শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[২] মোল্লা নিযামুদ্দিন তাঁর পিতা মোল্লা কুতুবুদ্দিন শহীদের কাছে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১১০৩ হিজরি (১৬৯১ খৃষ্টাব্দ) বর্ষে সাহালীর শাইখজাদাগণ মোল্লা কুতুবুদ্দিনকে শহীদ করে তাঁর গ্রন্থাগার সমুদয় সম্পদ ও বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব শিক্ষা বিস্তারে এই অবদানের কথা বিবেচনা করে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে এক সরকারি আদেশ বলে লক্ষ্ণৌর এক প্রসিদ্ধ কুঠি ফিরিঙ্গি মহল তাঁদেরকে দান করেন।[৩]

শেষ যুগের আলিমদের মধ্যে মোল্লা নিযামুদ্দিন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা বড়ো অবদান এই যে, ইলমে দীনের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপক জ্ঞান লাভ করে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বিন্যস্ত করেন যার ফলে আরবি শিক্ষা পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।"[৪]

দারুল উলুম দেওবন্দ

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন ও জিহাদের (যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তথা ওলামায়ে কেরাম) বিপর্যয়ের পর বিশেষত মুসলমানদের মাঝে হীনমন্যতা, পরাজয়ের গ্লানি ও হতাশার এক ব্যাপক মহামারী পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ সরকারের (যারা ধর্মীয়ভাবে খৃস্টান ছিলো) সফলতার প্রেক্ষিতে খৃস্টান মিশনারী ও ধর্মযাজকদের সাহস বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা, জীবন দর্শন ও সংস্কৃতির প্রভাবে ধর্মীয় ও চারিত্রিক বিশৃংখলা দেখা দেয়। স্বীয় ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এবং সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আগামী প্রজন্ম নিশ্চিতভাবে স্বীয় ধর্ম বিশ্বাস সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন এবং শরি'আত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।[৫]

প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট : এহেন পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের ওলামায়ে কিরাম ধর্মীয় ও শিক্ষাগত সম্পদের সুরক্ষা এবং মুসলমানদের ধর্মীয় বন্ধন হিফাযত এবং চেতনাবোধের সংরক্ষণকল্পে এমন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন আবশ্যক মনে করলেন যা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর ধর্মীয় ও চারিত্রিক পতনকে রুখতে সক্ষম হবে এবং এসব শিক্ষাঙ্গন থেকে এমন সব সুদক্ষ ইসলামি পণ্ডিত সৃষ্টি হবেন যাঁরা ইসলামি শরি'আতের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী

---

১. ড. এ.এফ.এম আমীনুল হক, মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, জুন ২০০২, পৃ. ৩০৯।

২. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৭

৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৭

৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৭

৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৮

হবেন। যাঁদের মধ্যে একই সাথে দাওয়াতি হৃদয়, সৈনিকসুলভ খিদমত এবং ইসলামি জ্ঞানের বিকাশ ও মানসিকতা বিদ্যমান থাকবে পূর্ণ মাত্রায়।[১]

মাওলানা কাসেম নানুতভীর (রহ.) জীবনী আলোচনায় মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী লিখেন– '৫৭ সালের সংগ্রাম ব্যর্থতার পর তিনি ছিলেন লড়াইয়ের নতুন ময়দানের খোঁজে চিন্তামগ্ন; দারুল উলুম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি সেই চিন্তাধারার কেন্দ্রভূমি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়। শামেলীর যুদ্ধে[২] পরাজয়ের পর চিন্তাশীলরা চিন্তা-ভাবনার যেমন ইতি টানেননি; তেমনি হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকার পাত্র তাঁরা ছিলেন না। বরং ইসলামের অস্তিত্ব ও ধর্মকে সুরক্ষার পরিকল্পনাকে সামনে এগিয়ে নেবার চিন্তায় কাটতো তাঁদের প্রতিটি প্রহর। পাশাপাশি বিশ্বনিয়ন্তার অদৃশ্য সাহায্য কখন দৃশ্যপটে আসবে সে অপেক্ষায় ছিলেন সর্বক্ষণ।[৩]

এ ধারাবাহিকতায় দারুল উলুম দেওবন্দ সর্বপ্রথম এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। উত্তর ভারতের যুক্ত প্রদেশস্থ সাহারানপুরের দেওবন্দ নামক জনপদের ঐতিহাসিক সাত্তা মসজিদ প্রাঙ্গনে দারুল উলুম দেওবন্দ অবস্থিত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৪]

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য : দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিলো– সিরাতে মুহাম্মদীর (সা.) তা'লিম ও বাস্তব জীবনে তা অনুশীলনে সচেষ্ট একদল কাফেলা তৈরি। যে শিক্ষা ও তা'লিমের সার নির্যাস হবে পরকাল সম্পর্কে সুদৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, কল্যাণের প্রতি গভীর আকর্ষণ, অন্যায়-অনাচারের প্রতি বিরাগ, সততা, আমানতদারিতা, সহমর্মিতা, সেবাপরায়ণতা, মোটকথা বিশ্বনবীর (সা.) আদর্শে সামগ্রিক জীবনকে আলোকিত করা। এ প্রসঙ্গে আল্লামা নদভী বলেন, "এ বিদ্যাপীঠের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, মতবিরোধপূর্ণ নানা মাসআলার পরিবর্তে এ প্রতিষ্ঠান তার দৃষ্টি কেন্দ্রিভূত করেছে তাওহিদ ও সুন্নাতের ওপর এই বিদ্যাপীঠের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সুন্নাহ অনুসরণের আবেগ প্রয়াস। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কায়েমের চিন্তা, ফিকির ও নিবেদন এবং আমল ও ইহতেসাবের প্রেরণা। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার আবেগ, প্রয়াস, চেতনা ও মর্যাদাবোধ।[৫]

পরিবেশ ও প্রভাব : ভারতীয় মুসলমানদের জীবনধারায় দারুল উলুম দেওবন্দের সন্তানদের সংস্কারধর্মী কর্মকাণ্ডের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সুস্পষ্ট। বিদআত কুসংস্কারের মূলোৎপাটন, আকিদা-বিশ্বাসের সংস্কার, তাবলীগে দীন ও ভ্রান্ত সম্প্রদায়সমূহের সাথে জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক ইত্যাদি তাঁদের ঐতিহাসিক অবদানের স্বর্ণালী অধ্যায়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিত্ব রাজনীতির ময়দানে এবং প্রিয় স্বদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান

---

১. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী, হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারিখী জায়িযাহ, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লখনৌ, ভারত (২য় মুদ্রণ), পৃ. ১৩২।

২. ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৯।

৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৯

৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪০

৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪০

রেখেছেন। তাঁরা সত্যোচ্চারণ ও নির্ভিক ভূমিকা পালনে ও পূর্বসূরী ওলামায়ে কিরামের দৃষ্টান্ত কে নবরূপে জাতির সামনে উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

ইসলামের ওপর অবিচল- দৃঢ়পদ, হানাফী মাযহাবের ওপর বলিষ্ঠ ও অনঢ় অবস্থান, পূর্বসূরীদের বর্ণনার সযত্ন সংরক্ষণ এবং সুন্নাহ বিরোধী ক্রিয়াকলাপের প্রতিরোধ দারুল উলুম দেওবন্দের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে।

মাযাহির উলুম সাহারানপুর

অপর বৃহৎ ইসলামি শিক্ষানিকেতন 'মাযাহির উলুম[১]' সাহারানপুরে অবস্থিত। ছাত্র সংখ্যা এবং ইসলামি শিক্ষার নিবিড় পরিবেশ বিচারে দারুল উলুম দেওবন্দের পরই এর অবস্থান। ১২৮৩ হিজরি সালে মাওলানা শাহাদাত আলী সাহেব সাহারানপুরীর হস্তমুবারকে এর ভিত্তি স্থাপিত। মাওলানা মুযহির নানুতুভীর নামে (সামান্য পরিবর্তনসহ) এর নামকরণ করা হয় মাযাহির উলূম। মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী এবং মাওলানা আশরাফ আলী[২] থানভী রহ. এর পবিত্র পৃষ্ঠপোষকতায় ধারাবাহিকভাবে ধন্য এ প্রতিষ্ঠান।[৩]

বৈশিষ্ট্য : মাদরাসা মাযাহির উলুম স্বীয় বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, মূলনীতি, আকিদা-বিশ্বাসের বিবেচনায় দারুল উলুম দেওবন্দের অভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী। এখান থেকেও বিপুল সংখ্যক নিষ্ঠাবান আলিম সৃষ্টি হয়েছেন, যাঁরা হাদিসশাস্ত্রের খিদমতে গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য অবদান রেখেছেন এবং একাধিক হাদিস বিষয়ক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এখানকার বিপুল সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক স্বীয় জীবনধারা, অল্পে তুষ্টি এবং ধর্মের ওপর অবিচলতায় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।[৪]

ভারতবর্ষে দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মাযাহির উলুম ছাড়াও এ পদ্ধতির অনুসারী বিপুলসংখ্যক দীনি মাদরাসা রয়েছে। যেখানে উক্ত মাদরাসাদ্বয়ের সিলেবাস (দরসে নিযামী) অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে দারুল উলুমের শিক্ষা সংক্রান্ত সম্পর্ক রয়েছে। এসব মাদরাসা ধর্মের প্রসার, জ্ঞানের বিকাশ, আকিদার সংস্কার এবং মুসলমানদের ধর্মীয় খিদমত আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখে যাচ্ছে।[৫]

---

১. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৪

২. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৪

৩. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী, ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান (অনুবাদ- আ.ফ.ম খালিদ হোসেন ড.) সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮, কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৪ খৃ. পৃ. ৮০।

৪. ৫. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৪

ওল্ড স্কিম মাদরাসা শিক্ষা

ভারতে মুসলমানদের আগমনের পর অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো এখানকার মসজিদগুলোও শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।[১] দিল্লী কেন্দ্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো ভেঙে পড়লে শুধু রোহিলা খণ্ডের জেলাসমূহে ছোটো-বড়ো মাদরাসার পত্তন করে প্রায় পাঁচ হাজার আলিম শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই উপমহাদেশের সকল জেলা এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের শিক্ষাব্যবস্থার রূপ প্রায় একই ধরনেরই ছিলো।[২]

সারা পাক-ভারতে কতগুলি প্রাইমারি বিদ্যালয় (মক্তব) ছিলো তার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে ম্যাক্স মুলারের এক সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ইংরেজ শাসনের পূর্বে শুধু বাংলাদেশেই আশি হাজার মক্তব ছিলো।[৩] তৎকালীন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিলো। এ সম্পর্কে 'ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া'তে বলা হয়েছে–

সেকালের উচ্চশিক্ষার চাবিকাঠি ছিলো আলিমদের হাতে। তাঁরা ছাত্রদের শিক্ষাদানে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ছিলেন।[৪] এসব শিক্ষায়তনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এসে ভিড় জমাতো। এসময় এসব মাদরাসার শিক্ষা বিষয়ের সূচিতে ইলমে সর্‌ফ, নাহব, বালাগাত, মানতিক (তর্কশাস্ত্র), কালাম (অলঙ্কারশাস্ত্র), তাসাউফ, আদব (সাহিত্য), ফিক্‌হ এবং ফালসাফা (দর্শন) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলো।[৫]

১২০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (চারশত বছর) মুসলিম উম্মাহর উল্লেখযোগ্য শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিলো উপমহাদেশে। এশিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশ থেকেই শিক্ষার্থীগণ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। বৃটিশ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিকে ছিলো।[৬]

৬২২ হিজরি সনের কাছাকাছি সময়ে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন রাজধানী লক্ষণাবতীতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বাংলাদেশে দীনি মাদরাসার ব্যাপক প্রসার ঘটে, এমনকি প্রতি আশিজনের জন্য একটি করে মাদরাসা ছিলো। ৬৬৮ হিজরি সনে শাইখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা[৭] বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও[৮]-এ মাদরাসা স্থাপন করেন। এতে বুখারি, মুসলিম এবং মুসনাদে আবি ইয়ালা'র দার্‌স চালু করেন। এরপর রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, সিলেট

---

১. আব্দুস সাত্তার, আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস (অনুবাদ- মোস্তফা হারুন), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খৃ., পৃ. ২০।

২. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত; পৃ. ২০

৩. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত; পৃ. ২১

৪. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত; পৃ. ২২

৫. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত; পৃ. ২২

৬. নদভী, আবুল হাসানাত, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৭. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (অনুবাদ- আবু সাঈদ ওমর আলি) পৃ. ১৭১ ও অধ্যাপক মুহাম্মদ রেজাউল করিম ও ড. সৈকত আসগর (সাপা) সোনারগাঁয়ের ইতিহাস, উৎস ও উপাদান ১৯৯৩, পৃ. ৩৫০ ও ৪০৩।

৮. ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোসামুদ্দিন, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৬

ও চট্টগ্রামসহ বহু জায়গায় (কওমি) মাদরাসা স্থাপিত হয়। এরপর হযরত শাহজালালের[১] মাধ্যমে সিলেটে ইসলামি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ৭০০ হিজরি সনে বাদশাহ্ তুগলকের যুগে ভারতে বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, কেবল দিল্লী শহরেই ছিলো এক সহস্রাধিক দীনি মাদরাসা। এ সময়ে আল্লামা তকীউদ্দিন আরাবী রাজশাহীর মহীন্তোষে একটি কওমি মাদরাসা স্থাপন করেন। ৮৯৫ হিজরি সনে বাদশাহ্ আদিল শাহ্ শেরশাহ্ ও সিকান্দার লোদী প্রমুখ বাদশাহ্গণের আমলেও মাদরাসা শিক্ষা ব্যাপকতা লাভ করে।

১১০৫ হিজরি সনে বাদশাহ্ আলমগীর লখনৌতে ফিরিঙ্গীমহল নামক বালাখানাটিকে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন। দরসে নিযামির পাঠ্যসূচির প্রবর্তক মোল্লা নিযামুদ্দিন (রহ.) বালাখানাটিতে মাদরাসায়ে নিযামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

হযরত শাহ্ আবদুর রহিম (রহ.) দিল্লিতে মাদরাসায়ে রহিমিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মক্কায় শায়খ আবু তাহের মাদানীর কাছে যাওয়ার আগে এই মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। ১১১৬ হিজরি সনে ঢাকাতে খান মুহাম্মদ মির্জা মসজিদে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১৬০ হিজরি সনে আজিমপুর মাদরাসা স্থাপিত হয়। এগুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক মাদরাসা ছিলো। পরবর্তী সময়ে তা স্থায়ী রূপ ধারণ করে।[২]

আধুনিক ও ওল্ড স্কীম (পুরাতন) শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ যে পার্থক্য বিদ্যমান তা হলো, পুরাকালে শ্রেণি বিন্যাস অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিলো না। কিন্তু বর্তমানে যে শিক্ষাই হোক না কেন শ্রেণি বিন্যাস ব্যতীত সম্ভবপরই নয়। কেননা বেতনভোগী সীমিত শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক শিক্ষা পাওয়া এই পদ্ধতি ছাড়া অসম্ভব।

শিক্ষাব্যবস্থার যে খসড়া ওপরে আলোচিত হয়েছে, তা কয়েকশত বছর এ এদেশে প্রচলিত ছিলো, মোগল শাসনের অধঃপতন ও অবসানের পর থেকে এই পদ্ধতির ওপর প্রতিক্রিয়া আসছিলো। অবশেষে এটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পলাশীর আম্রকাননে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ প্রহসনের পর বাংলাদেশের মুসলিম জাতির মান-সম্মান এবং নামেমাত্র মীর জাফর আলী খানের যে শাসন ছিলো, তাও শেষ হলো এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণই দেশ শাসন করতে লাগলেন।[৩]

আলিয়া মাদরাসা ধারা

কলকাতা আলিয়া মাদরাসা কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষা ধারাটি ওল্ড স্কীম মাদরাসা শিক্ষা নামেও অভিহিত হয়। পলাশী বিপর্যয় উত্তরকালে নব্য ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের মাঝে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ছিলো অন্যতম।[৪] কলকাতার গণ্যমান্য শিক্ষিত মুসলমান প্রতিনিধিগণের একটি দল বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজের তরুণগণকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বাংলার তৎকালীন বড়ো লাট ওয়ারেন হেস্টিংস[৫] এর

---

১. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৭
২. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৮
৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৮
৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৮
৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৮

নিকট আবেদন করেন। তাঁদের এ আবেদনে সাড়া দিয়ে এবং ইংরেজ সরকারের এ বিশেষ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বড়ো লাট এ প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১] এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বৈঠকখানার (শিয়ালদহ স্টেশন) একটি ভাড়াবাড়িতে প্রস্তাবিত মাদরাসার উদ্বোধন করা হয়। 'দরসে নিযামী'-এর রীতি অনুযায়ী মাদরাসার শিক্ষা বিষয় প্রবর্তন করা হয়।[২]

১৭৯০ সাল অবধি মাদরাসার শিক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষা বিষয় দরসে নিযামীর অনুরূপ ছিলো। কেননা এই সিলেবাস অনুযায়ী পাক-ভারতের অন্যান্য মাদরাসায় শিক্ষা দান করা হতো। কালের বিবর্তনে বর্তমানে দরসে নিযামীর মৌলিক রূপ অনেকখানি বিকৃত হয়েছে। বর্তমানে এ-দেশের মাদরাসাগুলোতে যে দরসে নিযামী চালু আছে আসল দরসে নিযামীর সাথে এর সাদৃশ্য খুবই কম।[৩]

---

১. আমিনুল হক ড. এ.এফ.এম; প্রাগুক্ত; পৃ. ৩১০

২. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৬

৩. আবদুস সাত্তার, আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৩-৪৪

নদওয়াতুল উলামার প্রবর্তিত ধারা : আধুনিক ও সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা

দারুল উলুম দেওবন্দ ও মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল আলীগড়ের পর নদওয়াতুল উলামা আন্দোলনের সূচনা হয় এমন এক সময়ে যখন দারুল উলুম দেওবন্দ তার প্রতিষ্ঠার ২৬ বছর অতিবাহিত করেছিলো আর আলীগড় স্কুল তার প্রতিষ্ঠার আঠারো বছরে পা রেখেছিলো। প্রতিষ্ঠার পর পুরো যুগ অতিক্রান্ত হয়েছিলো উভয় শিক্ষা কেন্দ্রেরই। অভিজ্ঞতার সিকি শতক পূর্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো প্রতিষ্ঠান দু'টিই। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শুরুতে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ঢেউ কেবল বস্তুগত, কারিগরি প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাস্ত্র ও যান্ত্রিক সভ্যতার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেনি; বরং তা খুব স্বল্প সময়ে সর্বব্যাপী এক নতুন সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক রূপ পরিগ্রহ করে। সে তার ব্যাপক চিন্তা-দর্শন ও বিস্তৃত ভাবধারায় আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞানশাস্ত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটায়; জাতীয় উন্নতির বিভিন্ন ধাপে পশ্চিমাগণ যার মুখোমুখি হয়েছিলো। পশ্চিমাদের এ বিপ্লব ছিলো সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবনবোধ, দর্শনভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদ। যা নতুন প্রজন্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো; বরং পুরো বিশ্ব বিশেষভাবে মুসলিম দুনিয়ায় এক অপ্রতিরোধ্য তুফান বইয়ে দেয়। বস্তুত এটা ছিলো ইসলামি ও পশ্চিমা দর্শনের এক সর্বাত্মক সংঘাত। এতে পুরো মুসলিম জাহান প্রায় বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হতে যাচ্ছিলো। এই আক্রমণ সবক'টি আবহমান সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার প্রাচীর ধূলিসাৎ করে দেয়। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সভ্যতা অনেক নীরবেই এই বিপ্লবের সামনে নিজেকে সঁপে দিচ্ছিলো। ইসলামের জন্য এটা ছিলো এক নাজুক ও কঠিন যুগ। ইসলামের ধারক-বাহক ও নেতৃত্ব স্থানীয় চিন্তাশীলদের জন্য এক মহাপরীক্ষার সময়।[১]

অন্যদিকে ভারতবর্ষের মাদরাসাসমূহের সমকালীন পাঠ্যক্রম ও শিক্ষানীতির সাধারণভাবে তুলনা চলে সেই ব্যক্তির সঙ্গে যার নিজস্ব তাহযিব-তামাদ্দুনের সাথে চিরস্থায়ী সম্পর্কটা অত্যন্ত শিথিল ও নড়বড়ে অবস্থার শিকার। নতুন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যেনো কোনো ক্রমেই তার সমন্বয় ও বনিবনা হচ্ছে না। ফলে এসব মাদরাসার সমুদয় চিন্তা, গবেষণা ও জ্ঞানগত শক্তি নিজেদের অন্তঃবিরোধ, পারস্পরিক কলহ, দার্শনিক যুক্তি-তর্ক, বাকশাস্ত্রীয় প্রতিযোগিতা আর ফিকহী মতানৈক্যের মধ্যে অবধারিতভাবে ব্যয় ও মানস-লক্ষ্যে নিবেদিত হচ্ছিলো। ঠিক যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা তার রূপ-ঐশ্বর্য ও চোখ ধাঁধানো ভ্রান্তির যাবতীয় উপাদান নিয়ে ভারতের মুসলিম সমাজের ওপর ছায়া বিস্তার করে যাচ্ছিলো এবং এ সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় মেধাবী, প্রতিভাবান, সচেতন প্রজন্মের মানসজগতে এক অস্থিরতা বিরাজ করছিলো; তখনো 'সুল্লাম'–এর মতো তর্কশাস্ত্রের যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থকে মুখস্থ করার প্রথাগত প্রবণতায় সামান্যটুকু ছেদ পড়েনি।[২]

সারসংক্ষেপ হলো, এ শেষ যুগে এসে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার বুদ্ধিবৃত্তিক পতন ও জ্ঞানগত দীনতার শিকার হয়। দরসে নিযামীতে যুগের পর যুগ কোনো কালানুক্রমিক পুনর্বিন্যাস বা

---

১. নদভী, মুনাওয়ার সুলতান, নদওয়াতুল উলামা কা ফিকহী মেজায অওর আবনায়ে নদওয়া কী ফিকহী খিদমাত; আল-মা'হাদুল আলী আল-ইসলামী, হায়দারাবাদ, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ২০০৪ খৃ. পৃ. ৫৪।

২. সাইয়িদ মুহাম্মদ আল হাসানি, সীরাতে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গিরী (রহ.); মাকতাবায়ে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৬৪, পৃ. ৭৯।

ফলপ্রসূ সংস্কার আসেনি। যখনই কিছুটা পরিবর্তন এসেছে তাও কোনো গভীর চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে হয়নি। ফলে মৌলিক গ্রন্থের পরিবর্তে এমন সব পাঠ্যপুস্তক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা টীকা ও ব্যাখ্যাসর্বস্ব। সৃষ্টিশীল রচনা ও গ্রন্থ প্রণয়নের ময়দানে ব্যাখ্যা আর টীকা-টিপ্পনী ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো রচনাকর্ম হচ্ছিলো না।[১]

সিলেবাস ও পাঠ্যক্রমের এই বন্ধ্যাত্বের দ্বিতীয় প্রধান ক্ষতি ছিলো, এই পাঠ্যক্রম চিন্তা-গবেষণা ও কাজের নতুন ময়দান সৃষ্টিতে ছিলো অক্ষম। ফলে নিজের যেটুকু প্রতিভা, যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ ছিলো তা পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, অপ্রয়োজনীয় কূটতর্ক, পরস্পরের প্রতি বিষোদগার এবং দার্শনিক ঝগড়ায় নিয়োজিত করা হয়েছিলো।[২]

নদওয়াতুল উলামা ও দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গিরী (রহ.) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের উপমহাদেশীয় ওলামাসমাজ, দ্বীনি মাদরাসা এবং বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নৈরাশ্যজনক অবস্থা কাছ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের ইসলামবিদ্বেষী আগ্রাসনের ঢেউ ভারতের মুসলমানদের ঈমানী চিন্তা-চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে চলছিলো। এ আগ্রাসনের মোকাবেলায় যে ধরনের ব্যক্তিত্ব তৈরির প্রয়োজন ছিলো তৎকালীন দীনি প্রতিষ্ঠানগুলো সে ধরনের যোগ্য ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজ আঞ্জাম দিতে হিমশিম খাচ্ছিলো। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য তিনি বিখ্যাত উলামায়ে কিরামের সাথে পরামর্শক্রমে উপমহাদেশীয় মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দীনি চিন্তা-চেতনা হেফাযতের উদ্দেশ্যে 'নদওয়াতুল উলামা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ভারতের লক্ষ্ণৌ শহরে মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গিরি ১৮৯৪ সালে নাদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠা করেন। শাহজাহানপুরের জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গও এ প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু জমিদারী ওয়াক্‌ফ করেন। মহামান্য আগা খাঁন ও ভূপালের শাসকগণ বার্ষিক অনুদান মঞ্জুর করেন। প্রথমে বিরোধিতা করলেও পরবর্তী সময়ে ইংরেজ সরকারও এর জন্য জমি বরাদ্দ করেন।[৩]

মাওলানা মুহাম্মদ আলী[৪] মুঙ্গিরি (রহ.) ১৮৯৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর নদওয়াতুল উলামার চিন্তা-চেতনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য যোগ্য লোক তৈরির উদ্দেশ্যে 'নদওয়া'র পক্ষ থেকে 'দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা' নামে একটি দীনি মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম নাযেম নিযুক্ত হন।[৫]

মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গিরী (রহ.) দারুল উলূমের স্বীয় প্রস্তাবিত রূপরেখা তৎকালীন শীর্ষ ওলামা ও বিদগ্ধ শিক্ষাবিদগণের কাছে প্রেরণ করেন। এরপর দারুল উলুম এর জন্য উপযুক্ত জায়গার সন্ধান শুরু হয়। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ উভয় শহরের নাম প্রস্তাবে আসে। অবশেষে দারুল উলুমের জন্য লক্ষ্ণৌকে মনোনীত করা হয়। মুন্সী ইহতেশাম আলী রইসে কাকুরীর সাহায্যে শহরের উপকণ্ঠে একটি বিস্তৃত ভূমি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেখানে প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত

---

১. ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোসামুদ্দিন, প্রাগুক্ত; পৃ. ৬০

২. প্রাগুক্ত; পৃ. ৬০

৩. আমিনুল হক ড. এ.এফ.এম, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৪০

৪. ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোসামুদ্দিন, প্রাগুক্ত; পৃ. ৬১

৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ৬১

সময়ের প্রয়োজন ছিলো। তাই তিনি গোলাগঞ্জ মহল্লায় নব্বই হাজার রূপীর বিনিময়ে খাতুন মঞ্জিল নামে একটি প্রাসাদ ক্রয় করে নদওয়াতুল উলামার জন্য হস্তান্তর করেন। অতঃপর ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৯ জুমাদাল উখরা ১৩১৬ হিজরি দারুল উলুমের প্রাথমিক শ্রেণিসমূহের পাঠদানের শুভসূচনা হয়। যা পুরোদস্তুর উদ্বোধন হয় ৪ অক্টোবর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। এ উপলক্ষে উক্ত তারিখে দেশের আলিম, শিক্ষানুরাগীদের জমায়েত রীতিমত এক বিরাট সম্মেলনে পরিণত হয়।[১]

নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে নিম্নলিখিত মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সক্রিয় ছিলো:

১. প্রচলিত আধুনিক ও প্রাচ্যপন্থী এ দু'ধরনের সিলেবাস সংশোধন করা।
২. ধর্মীয় (ইসলাম) শিক্ষার উন্নয়ন সাধন।
৩. ব্যক্তিচরিত্র সংশোধন করা।
৪. প্রচলিত রীতি-নীতির সংস্কার করা।
৫. আলিম সমাজের পারস্পরিক মতবিরোধ নিরসন তথা মতদ্বৈততার মূলোৎপাটন করা।
৬. মুসলিম সমাজের উন্নতি বিধান ও কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা।
৭. ব্যবহারিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান।
৮. যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা পরিহার করা।
৯. ফাতাওয়া দানের কার্যক্রম নিশ্চিত করা।[২]

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রস্তাবিত দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় এবং ১৯০৮ সালে এতদুদ্দেশ্যে বিশাল অট্টালিকার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ১৮৯৯ সালে একটি সুবিশাল গ্রন্থাগার ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩]

---

১. প্রাগুক্ত; পৃ. ৬১
২. আমিনুল হক ড. এ.এফ.এম, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৪১
৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) জীবন চরিত

(১৮৯৭/৯৮-১৯৭৯)

আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হচ্ছে মানুষ। মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহপাক সুবহানাহু তা'আলা মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধনে পৃথিবীতে এমন কতকগুলো ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যাঁদের জীবনের বিভিন্ন কীর্তি-কর্ম, অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। এমনি একজন কীর্তিমান বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ হচ্ছেন আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)।

তিনি ছিলেন একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাসসির, স্বভাবকবি, আদর্শ শিক্ষক ও আধ্যাত্মিক সাধক, সমাজসংস্কারক। বিরল প্রতিভাধর এক জ্ঞানতাপস। তিনি তাঁর জীবনের সিংহভাগ ব্যয় করেছেন শিক্ষকতা ও লেখালিখির মহান পেশায়।

জন্ম ও বংশ-পরিচিতি

আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) বার আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার বাবুনগর গ্রামে ঐতিহাসিক মক্কার বাড়িতে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১২৬০ বাংলা সনের শ্রাবণ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পিতা হচ্ছেন, আল্লামা নূরুল হুদা (রহ.), যিনি ছিলেন একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, আধ্যাত্মিক সাধক ও বুজর্গ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন ভারতের ঐতিহ্যবাহী দারুল উলুম দেওবন্দ এর অন্যতম স্থপতি হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহির শিষ্য।

আল্লামা নূরুল হুদা (রহ.) যখন শুনতে পেলেন তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে তিনি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন–

"ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ" "এটি আল্লাহর দান, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে দান করেন।"[১]

অতঃপর স্বীয় পুত্রের নাম রাখেন 'ফজলুল্লাহ' (আল্লাহর দান)।

বংশ-পরিচিতি

---

১. সূরা জুমা-৪

পিতা: হযরত আল্লামা নুরুল হুদা রহ. ছিলেন উপমহাদেশ-বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত শাহ আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর শিষ্য। তিনি ছিলেন একাধারে একজন ইসলামি চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, সাহিত্যিক, তর্কশাস্ত্রবিদ, হেকিম, গণিতজ্ঞ ও ক্ষুরধার লেখক এবং কামিল বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব। কাজ করেছেন বর্ষপঞ্জিকা, ভূগোল এবং জ্যামিতি নিয়ে। প্রজ্ঞায়, পাণ্ডিত্যে, আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদিতায়, সততা ও নিষ্ঠায়, উদারতা এবং আমল আখলাকে ছিলেন অনন্য। তাঁর জীবন ও কর্মই এর বাস্তব প্রমাণ। একজন মানুষের মধ্যে এতো প্রতিভার সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না। আল্লামা ইকবালের ভাষায় তিনি ছিলেন ইনসানে কামিল তথা পরিপূর্ণ মানুষ। খত্তে কুফী ও খত্তে নাসতাআলিক বর্ণে আজ থেকে ১৪৩ বছর পূর্বে তাঁর স্বহস্তে লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি রয়েছে যা তারই প্রমাণ বহন করে।

পিতামহ: আল্লামা ফজলুল্লাহ'র রহ. পরদাদা হযরত সুফি হাসান আলি তালুকদার একজন আল্লাহওয়ালা, দুনিয়াবিমুখ, পরহেযগার ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দুনিয়ার জাঁকজমক ও চাকচিক্য থেকে দূরে থাকতেন। অধিকাংশ সময় তিনি বন-জঙ্গলে গিয়ে ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। সার্বক্ষণিক আল্লাহর বন্দেগি ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকতেন। তথায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর লোমকূপ থেকে 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' যিকিরের ধ্বনি শোনা যেতো। ইন্তেকালের পর তাঁর বক্ষ বরাবর হতে একটা নীলাভ আলো বেরিয়ে ওপরের দিকে উঠেছিলো যা তৎকালে সকলে প্রত্যক্ষ করেছিলো। একথা অনেককাল লোকমুখে ফিরছিলো।

প্রপিতামহ: আল্লামা ফজলুল্লাহ'র প্রপিতামহের নাম ছিলো সাদেক আলি; তিনি শায়খ হযরত ইয়াসিন মক্কীর নাতি। সাদেক আলির পিতার নাম জানা যায়নি।

শায়খ হযরত ইয়াসিন মক্কী রহ.

শায়খ ইয়াসিন মক্কী ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে পবিত্র মক্কানগরী হতে সফর শুরু করেন এবং ১৭০০ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি সাতকানিয়ার বাবুনগরে স্থিত হন। তাঁর নামানুসারে সে গ্রামকে 'মক্কার বাড়ি' এবং তাঁর বংশধরগণ 'মক্কারগোষ্ঠী' বলা হয়। তাঁর আরেক ভাই ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়া সফর করেন এবং সুমাত্রা দ্বীপে স্থিত হন।

শিক্ষাজীবন : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

পারিবারিকভাবে কুরআন শিক্ষার পর তিনি ৪ বছর দেওদীঘি নিম্ন প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করেন। এরপর তাঁকে স্কুলে না পাঠিয়ে তাঁর পিতা 'আল্লামা নূরুল হুদা' নিজ বাড়িতে তাঁকে শিক্ষাদান করতে থাকেন। তিন বছরের মধ্যে তিনি ইলমে নাহব, সরফ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে বেশ দক্ষতা অর্জন করেন। তখন তাঁকে চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট মাদরাসা মুহসিনিয়ায় (বর্তমান হাজি মুহাম্মদ মহসিন কলেজ) জামাআ'তে শশুমে (বর্তমান দাখিল নবম শ্রেণি) ভর্তি করানো হয়। উক্ত ক্লাসে চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি ১ম স্থান অর্জন করে ডাবল প্রমোশন নিয়ে চাহারম শ্রেণিতে (বর্তমান আলিম ১ম বর্ষে) ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে আসাম বোর্ডের অধীনে প্রথম বিভাগ পেয়ে বৃত্তিসহ ফাযিল পাস করেন। মুহসিনিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকালে আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) মেধা ও প্রতিভা দেখে তৎকালীন মুহাদ্দিস মুহাম্মদ

হোসাইন, হেড মাওলানা নজির আহমদ সাহেব (রহ.) তাঁকে প্রায়ই উৎসাহিত করে বলতেন যে, "তুমি ফাযিল পাশ করে হাদিস-তাফসিরের উচ্চশিক্ষার জন্যে হিন্দুস্থান যাবে।" তিনি প্রতিবেশী ও স্বজনদের উৎসাহে হিন্দুস্থান না গিয়ে চন্দনপুরাস্থ উমাতারা H. E. স্কুলে ৮ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সকলের অনুরোধ ও চাপে পিতা আল্লামা নূরুল হুদা তাঁকে স্কুলে ভর্তি করালেও তাঁর একান্ত মনোবাসনা ছিলো পুত্র ফজলুল্লাহকে একজন দক্ষ আলিমে দ্বীন হিসেবে গড়ে তোলার।

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারত গমন

স্কুলে ভর্তির পর তিনি ভালোভাবে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে বাড়িতে চলে আসেন। দু'মাস পর তিনি সুস্থ হয়ে শহরে এসে পুনরায় পড়ালেখায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু দু'সপ্তাহ না পেরুতেই তিনি আবার অসুস্থ হয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। অসুস্থাবস্থায় তিনি স্বপ্নে কড়া নির্দেশ পেলেন যে, "হাদিস তাফসিরের উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দুস্থান চলে যাও।" এতে তিনি খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হলেন এবং মনে মনে ভাবলেন যে, ওস্তাদগণ এবং পিতার উপদেশের বিপরীতে স্কুলে ভর্তি হয়ে তিনি ভুল করেছেন। তাই আরোগ্য লাভের পর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি হাদিস তাফসিরের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে চলে যান ভারতের সাহারানপুরে। তথাকার বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাযাহির উলুম সাহারানপুরে ভর্তি হন তিনি। সেখান থেকে হাদিস, তাফসির, ফিকহ, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বিশেষ কৃতিত্বের সাথে তাখাসসুসুস তথা সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ১৩৪০ হিজরিতে।

উল্লেখ্য, শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী, মুফতি শফি উসমানি, কারী মুহাম্মদ তৈয়ব এবং আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) প্রমুখের জন্মসাল প্রায় কাছাকাছি অর্থাৎ ১৮৯৭/৯৮ এর মধ্যেই। তাছাড়া একই সময়ে হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুর ও আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) তাদের শিক্ষক ছিলেন এবং শেষোক্ত তিনজন হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর থানাভবনস্থ খানাকায় অবস্থান করেছিলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপর্যুক্ত মনীষী আলেমদের মধ্যে অবশ্যই সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো।

এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকালীন তিনি বিশ্ববরেণ্য ওলামায়ে কিরামের নিকট তাফসির, হাদিস, ফিকাহসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে। তাঁদের মধ্যে প্রতিথযশা মুহাদ্দিস সুনান আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বজলুল মজহুদ -এর লেখক আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী এবং আল্লামা আবদুল লতিফ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবং তাঁর সার্টিফিকেটে এই দুই জন মনীষীর দস্তখত রয়েছে।

তিনি উপমহাদেশের খ্যাতনামা আধ্যাত্মিক সাধক হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভির আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক বায়আত হন তাঁরই হাতে।

'তারিখে মাযাহির'-এ আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ভারতের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাযাহির উলুম সাহারানপুর হতে দাওরায়ে হাদিস এবং ফুনুনাতে আ'লিয়ার উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন ১৩৪০হিজরি মোতাবেক ১৯২২ খৃস্টাব্দে। মাযাহির উলুমের ইতিহাসকোষ 'তারিখে মাযাহির' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে তাঁর শিক্ষাজীবনের ঈর্ষণীয় ফলাফল এবং কর্মজীবনের সমুজ্জ্বল সূচনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক তথ্য পাওয়া যায়।[১] সমকালীন পাঠকবর্গ ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জ্ঞাতার্থে সেসব তথ্য বঙ্গানুবাদসহ এখানে তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি।

১৩৪০হিজরি বর্ষে মাযাহির উলুম সাহারানপুর হতে দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত কুড়িজন সৌভাগ্যবান শিক্ষার্থী। তারিখে মাযাহিরে তাঁদের নাম সন্নিবেশিত হয়েছে এভাবে:

تاریخ مظاہر ۴۱ جلد دوم

۵۸ سنہ بنائی مطابق سنہ ۱۳۴۰ھ ابتدائی تعلیم میں جو نقائص اور خامیاں پیدا ہو رہی تھیں ان کے سدباب کیلئے ارباب مدرسہ نے اب سے چند سال قبل شعبہ تعلیم ابتدائی عربی کا اجراء کیا تھا جس کے منتظم کار و ممتحن خاص مولانا صدیق احمد صاحب مقرر کئے گئے تھے، اس عرصہ میں اس شعبہ نے کافی ترقی حاصل کی اور ایک بہت بڑی تعداد ذی استعداد طلباء کی تیار ہوئی۔ سال زیر بحث میں اکہتر (۷۱) طلباء نے اس شعبہ میں داخلہ لیا جس کی بناء پر وہ دو مدرس جو خاص اسی شعبہ کے واسطے رکھے گئے تھے کافی نہ ہوئے۔ اسلئے درجہ اعلیٰ عربی کے مدرسین میں سے دو مدرسوں کی اعانت حاصل کی گئی اور ان کو اسباق دیئے گئے۔

طلبا طلبا کی مجموعی تعداد اس سال تین سو ستاسی (۳۸۷) تھی جن میں درجہ اعلیٰ و اوسط اور درجہ ابتدائی عربی کے ایک سو چھپن (۱۵۶) اور باقی قرآن شریف و فارسی، ریاضی و قرأت کے شعبوں سے وابستہ رہے

اس سال کے فارغین دورہ یہ ہیں۔

مولوی ضیاء احمد گنگوہی، مولانا عبدالشکور صاحب کاپلپوری (جو بعد میں مظاہر کے اکابر مدرسین میں سے ہوئے) مولوی فضل اللہ چاٹگامی، مولوی عبدالقیوم پونچھوی، مولوی حافظ احمد چاٹگامی، مولوی نیاز احمد جالندھری، مولوی عبدالقیوم کاپلپوری، مولوی یعقوب چاٹگامی، مولوی غلام نبی کشمیری، مولوی شریف احمد گجرانوالہ، مولوی عبدالحق نبوی، مولوی عبدالوہاب چاٹگامی، مولوی حافظ مجیب الرحمٰن چاٹگامی، مولوی انوار اللہ نواکھالوی، مولوی عبدالرزاق نواکھالوی، مولوی طالب الدین دیناجپوری، مولوی اکرام علی چاٹگامی، مولوی کفیل الدین کمرلوی، مولوی محمد حسین میانوالی، مولوی ممتاز الدین نواکھالوی۔

---

[১] 'তারিখে মাযাহির'-র ২য় খণ্ডে গুরুত্বসহকারে তিন স্থানে আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর নাম উল্লেখ করা হয়।

অনুবাদ: 'এ বছর দাওরায়ে হাদিস সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা হলেন: মৌলভি জিয়া আহমদ গঙ্গুহি, মাওলানা আব্দুশ শাকুর কামিলপুরি (পরবর্তীতে যিনি মাযাহির উলুমের প্রথমসারির শিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন), **মৌলভি ফজলুল্লাহ চাটগামি**, মৌলভি আব্দুল কাইয়ুম পোঁছোভি, মৌলভি হাফেজ আহমদ চাটগামি, মৌলভি নিয়াজ আহমদ জালন্ধরি, মৌলভি আব্দুল কাইয়ুম কামিলপুরি, মৌলভি ইয়াকুব চাটগামি, মৌলভি গোলাম নবি কাশ্মিরি, মৌলভি শরিফ আহমদ গাজরা-নাওয়ালা, মৌলভি আব্দুল হক বনভি, মৌলভি আব্দুলওয়াহহাব চাটগামি, মৌলভি হাফেজ মুজিবুর রহমান চাটগামি, মৌলভি আনোয়ার উল্লাহ নোয়াখালভি, মৌলভি আব্দুর রাজ্জাক নোয়াখালভি, মৌলভি তালেবউদ্দিন দিনাজপুরি, মৌলভি একরাম আলি চাটগামি, মৌলভি কফিলউদ্দিন কমরলভি, মৌলভি মুহাম্মদ হুসাইন মিয়াঁওয়ালি এবং মৌলভি মমতাজউদ্দিন নোয়াখালভি।' **তথ্যসূত্র:(তারিখে মাযাহির,** *মৌলভি মুহাম্মদ শাহেদ সাহারানপুরি, এশাআতুল উলুম কুতুবখানা, মুফতি মহল্লা, সাহারানপুর, ভারত,খ-২, পৃ-৪১)*

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর প্রথম কর্মজীবনের সূচনা সম্পর্কে লেখা হয়:

تاریخ مظاہر ۴۲ جلد دوم

اس فارغین میں ایک بڑی تعداد الحمد للہ ذی استعداد طلباء کی تھی جو اپنی فراغت کے فوراً بعد متفرق مقامات پر خدمت دین و تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گئے، چنانچہ مولوی فضل اللہ چاٹگامی مدرسہ اکبر آباد کلکتہ میں مدرس عربی مقرر ہوئے اور مولوی حافظ ضیاء احمد کو ارباب مدرسہ نے خدمت افتاء کے لئے منتخب کر لیا۔ اسکے علاوہ چند اور دوسرے فارغین کا مناسب مقامات پر تقرر ہو گیا۔

অনুবাদ: 'আলহামদুলিল্লাহ, এবারের দাওরায়ে হাদিস সম্পন্নকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ছিলেন যোগ্যতাসম্পন্ন। যারা ফারেগ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বিভিন্ন স্থানে দ্বীনি খেদমত ও শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। যেমন, **মৌলভি ফজলুল্লাহ চাটগামি** কলকাতার আকড়া কুদসিয়া মাদরাসায় আরবি প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন[১] এবং মৌলভি হাফেজ জিয়া আহমদকে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ইফতা বিভাগের খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেন। এঁরা ছাড়া আরো বেশক'জন ফারেগ শিক্ষার্থী বিভিন্ন উপযুক্ত পদে নিয়োগ লাভ করেন।'

তথ্যসূত্র: (তারিখে মাযাহির, *মৌলভি মুহাম্মদ শাহেদ সাহারানপুরি, এশাআতুল উলুম কুতুবখানা, মুফতি মহল্লা, সাহারানপুর, ভারত,* খ-২, পৃ-৪১ ও ৪২)

---

[১] উল্লেখ্য, আল্লামা ফজলুল্লাহকে (রহ.) উক্ত মাদরাসায় আরবি প্রভাষক হিসেবে প্রেরণ করেন তাঁর প্রিয় শিক্ষক হযরত আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর অসাধারণ মেধা ও ঈর্ষণীয় ফলাফলের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে এভাবে:

تاریخ مظاہر ۴۲ جلد دوم

شائقین وطلبائے حدیث کو مژدہ

مولوی محمد زکریا کاندہلوی مدرس مدرسہ ہذا نے گذشتہ سال سے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جو طالب علم دورہ والا محض حدیث میں اول نمبر ہو اس کو تین روپے اور جو دویم نمبر ہو اس کو دو روپے ، مولوی صاحب خود عطا فرمایا کرینگے۔ جزاہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء۔ چنانچہ امسال مولوی عبدالشکور کاملپوری کو تین روپے اور مولوی فضل اللہ چاٹگامی کو دو روپے مرحمت فرمائے ۔

অনুবাদ: 'মৌলভি মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভি (শিক্ষক, মাযাহির উলুম সাহারানপুর) গত বছর (১৯২১ইং) হতে এই নিয়ম চালু করেন যে, দাওরার যে শিক্ষার্থী কেবল হাদিসশাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবে, তাকে তিন রুপি এবং যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবে, তাকে দুই রুপি করে স্বয়ং তিনি পুরস্কার প্রদান করবেন। (আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন) সে সুবাদে এ বছর (১৯২২ইং) তিনি মৌলভি আব্দুশ শাকুর কামিলপুরিকে তিন রুপি এবং **মৌলভি ফজলুল্লাহ চাটগামিকে** দুই রুপি করে পুরস্কার প্রদান করেন।'

তথ্যসূত্র: (তারিখে মাযাহির, *মৌলভি মুহাম্মদ শাহেদ সাহারানপুরি, এশাআতুল উলুম কুতুবখানা, মুফতি মহল্লা, সাহারানপুর, ভারত, খ-২, পৃ-৪২)*

প্রসঙ্গত, জগতবিখ্যাত ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাযাহির উলুম সাহারানপুর তাঁর দীর্ঘ পথচলায় অসংখ্য কৃতী সন্তান উপহার দিয়েছে। উপমহাদেশের ইতিহাসে যাঁরা বিভিন্নভাবে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। তন্মধ্যে যেসব বাঙালি কৃতী সন্তান সাহারানপুর হতে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষাজীবন শেষ করে বহুবর্ণিল কর্মজীবনের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ. ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

এখানে আমরা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের উদ্দেশ্যে মাযাহির উলুম সাহারানপুরের ওসব বাঙালি কৃতী শিক্ষার্থী ও কীর্তিমান মনীষীদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। যথা:

১. মাওলানা ফজলুল্লাহ চাটগামি রহ.
২. মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব রহ. (হাটহাজারী মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা)
৩. মাওলানা ইয়াকুব চাটগামি রহ.
৪. খতিবে আজম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ রহ.

৫. মুফতি আযীযুল হক রহ[১]. (পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক)
৬. হাফেজ আহমদ চাটগামি রহ.
৭. মাওলানা হাফেজ মুজিবুর রহমান চাটগামি রহ.
৮. মাওলানা একরাম আলি চাটগামি রহ.
৯. মাওলানা আনোয়ারুল্লাহ নোয়াখালভি রহ.
১০. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক রহ.
১১. মাওলানা মুমতাজুদ্দিন নোয়াখালভি রহ.
১২. মাওলানা সিরাজুদ্দিন নোয়াখালভি রহ.
১৩. মাওলানা আব্দুলগণি সিলেটি রহ.
১৪. মাওলানা আজিজুর রহমান ইসলামাবাদি রহ.
১৫. মাওলানা নুর আহমদ চাটগামি রহ.
১৬. মাওলানা আবুল খাইর চাটগামি রহ.
১৭. মাওলানা আব্দুল গফুর চাটগামি রহ.
১৮. মাওলানা ফয়েজ আহমদ চাটগামি রহ.
১৯. মাওলানা ইসমাঈল আরকানি রহ.
২০. মাওলানা আরশাদ আলি ঢাকভি রহ. প্রমুখ।

তথ্যসূত্রঃ (তারিখে মাযাহির, মৌলভি মুহাম্মদ শাহেদ সাহারানপুরি, এশাআতুল উলুম কুতুবখানা, মুফতি মহল্লা, সাহারানপুর, ভারত, খ-২, পৃ-২১১-২৪৬)

উল্লেখ্য, আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. সাহারানপুর অবস্থানকালে শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি জীবিত ছিলেন। যেহেতু শায়খুল হিন্দের ইন্তেকাল হয় ১৩৩৯ হিজরিতে এবং আল্লামা ফজলুল্লাহর শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয় ১৩৪০ হিজরিতে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফারেগ হওয়ার আগে কমপক্ষে দু-তিন বছর ওখানে ছিলেন। যেহেতু আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. সাহারানপুর গমন করেন ১৯১৯ খৃস্টাব্দে।

---

[১]. নির্ভরযোগ্য তথ্যমতে মুফতি আযীযুল হক রহ. সাহারানপুরে পড়াশোনা করলেও ওখান থেকে দাওরায়ে হাদিস শেষ করেননি।

* শিক্ষক ও পীর-মুর্শিদ পরিচিতি

আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)

আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) ১২৬৯ হিজরিতে ভারতের ঐতিহ্যবাহী নানুতা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মজীদ আলি শাহ। বংশধারা দশম পুরুষে গিয়ে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়।

শিক্ষাজীবন

আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)-এর পাঁচ বছর বয়সে তাঁর শ্রদ্ধেয় নানা মাওলানা মামলুক আলি নানুতবী তাঁকে গ্রামের এক মক্তবে ভর্তি করে দেন। গ্রামের মক্তবেই তিনি পবিত্র কুরআন পাঠ সমাপ্ত করেন। স্বীয় গ্রাম নানুতায় বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে তিনি উর্দু, ফারসি এবং গুলিস্তাঁ পাঠ শেষ করেন। অতঃপর স্বীয় চাচা মাওলানা আনসার আলি সাহেবের নিকট তিনি বিভিন্ন আরবি কিতাব পাঠ করেন। কাফিয়া এবং সমসাময়িক অন্যান্য কিতাব তিনি প্রখ্যাত আলেমেদীন মাওলানা সাখাওয়াত আলীর কাছে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি এবং তাঁর চাচাত ভাই মাওলানা সিদ্দিক আহমদ কিছুদিন ইংরেজি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন।

দারুল উলুম দেওবন্দ তখন সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সংবাদ শুনে তাঁরা দু'ভাই দারুল উলুম দেওবন্দে স্বীয় মামা মাওলানা মুহাম্মদ আলি সাহেবের নিকট উপস্থিত হন ১২৮৩ হিজরিতে। এখানেও তিনি কাফিয়া জামাতে ভর্তি হন। ছয় মাস পর তিনি দেওবন্দ থেকে তাঁর অপর এক মামা মাওলানা মাযহার নানুতবী (রহ.)-এর কাছে সাহারানপুর চলে যান। সেখানে তিনি মুখতাসারুল মাআনি জামাতে ভর্তি হন এবং দরসে নিযামির পুরো সিলেবাস সমাপ্ত করেন। ১২৮৮ হিজরিতে ১৯ বছর বয়সে তিনি মাদরাসা শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

অতঃপর তিনি মাযাহির উলুম সাহারানপুরে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। আরবি সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল যথেষ্ট অনুরাগ; তাই তিনি লাহোরের প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ মাওলানা ফয়জুল হাসান (রহ.) সাহারানপুরীর দরবারে চলে যান এবং তাঁর নিকট আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ফয়জুল হাসান (রহ.) তখন লাহোরে অ্যারাবিক কলেজ এর অধ্যাপক ছিলেন।

মাওলানা ফয়জুল হাসান (রহ.) এর নিকট থেকে ফিরে আসার পর মামা ইয়াকুব আলী নানুতবি সাহেব তাঁকে 'কামুস' নামক কিতাবের অনুবাদ করার জন্যে মনসূরী পাঠিয়ে দেন। কয়েক মাসে সেখানে কাজ শেষ করে তিনি মঙ্গলূরের মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিয়ে, বায়আত ও খিলাফত

১২৮৮ হিজরিতে গাঙ্গুহের শাহ আবদুর রহমানের কন্যা আম্বিয়া বেগমকে তিনি বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে মাওলানার এক ছেলে ও দুই মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, শেষ সন্তানটি জন্মের পরে মা ও মেয়ে দু'জনই ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে তিনি ১২৯৭

হিজরিতে হাজি নিজামুদ্দিনের বিধবা কন্যা মুনিরুন্নিসার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। হযরতের ইন্তকালের পরও তাঁর স্ত্রী কিছুদিন জীবিত ছিলেন।

যেহেতু আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) প্রথম বিয়ে গাঙ্গুহতে করেছিলেন তাই শ্বশুরালয়ে আসা-যাওয়ার সুবাদে কুতুবুল আলম মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর সাথে তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ হয়। একপর্যায়ে তিনি তাঁর বড়ো মামা মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহ.)-এর কাছে মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর হাতে বায়আত হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং একটি সুপারিশনামা দরবারে রশিদিয়ায় পেশ করেন ও জবাবের অপেক্ষায় থাকেন। জবাবে গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, মিঞা, নিজেই তো পীরের ছেলে, অন্যের কাছে মুরিদ হওয়ার তোমার কী প্রয়োজন? উত্তরে তিনি অশ্রুসজল নয়নে আল্লামা গাঙ্গুহীকে বলেন- হযরত! আমি তো এ দরবারের একটি কুকুরের সমানও নই। আপনার হাতে বায়আত হতে না পারলে আমার জীবন বৃথা। আপনি আমাকে ধাক্কা মেরে দরবার থেকে বের করে দিলেও আমি অন্য কোথাও যাবো না। আমি আপনার গোলাম হয়ে গেলাম।

একথা শুনে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) তাঁকে বায়আত করান। অতঃপর তিনি তাঁর দরবার থেকে ফিরে এসে শায়খপ্রদত্ত সবক, যিকির-আযকারে মগ্ন হয়ে যান। পরবর্তীতে আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী পবিত্র হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.)-এর নিকট পত্র লেখেন যে, মাওলানা খলীল আহমদ আপনার খিদমতে আসছে। তাঁকে পেয়ে আপনি খুশি হবেন। হাজি সাহেব তাঁর নৈতিক অবস্থা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং নিজের মাথার পাগড়ি খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দেন ও লিখিতভাবে খিলাফত প্রদান করেন। হজব্রত পালন করে ফিরে এসে পাগড়ি ও খিলাফতের সনদ দরবারে রশিদিয়ায় পেশ করেন। এদিকে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)ও স্বীয় মাথার পাগড়ি খুলে আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরীর মাথায় পরিয়ে দেন এবং খিলাফত নামায় দস্তখত করেন। এভাবে আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) এই দু'জন মহান ব্যক্তিত্বও আধ্যাত্মিক সাধকের খিলাফত ও দস্তার লাভ করেন।

ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ

আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরীর (রহ.) ব্যক্তিসত্তা ছিলো স্ব-মহিমায় ভরপুর। তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলতেন, আমি যা মাওলানা খলিল আহমদও তা।

হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.) এক পত্রে লিখেছিলেন- 'তুমি আমার সিলসিলার গৌরব, তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত।'

পঞ্চমবার হজ পালনরত অবস্থায় যখন আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) তাওয়াফে কুদুমের জন্যে হেরেম শরিফ প্রবেশ করেন। তখন হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.)-এর খলিফা মুহিবুদ্দিন (রহ.) বলেন, হারাম শরিফে এমন এক ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে, যার মাধ্যমে হেরেম আলোকিত হয়ে গেছে। তিনি তাওয়াফ শেষ করলে মাওলানা মুহিবুদ্দিন তাঁর

নিকট গিয়ে বলেন, আমার মনে হয় আপনার কারণে হারাম শরিফ আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো।

সাহারানপুর জেলায় একবার মুসলমান ও আর্যদের মাঝে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। আর্যরা তাদের পক্ষে বিতর্কের জন্যে একজন সাধু এনেছিলো, যে মুসলমানদের কোণঠাসা করেছিলো, আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) বিষয়টি বুঝতে পেরে সাধুর প্রতি তাওয়াজ্জুহ দেন এবং স্বীয় ঈমানি বলে তার সকল ক্ষমতা খর্ব করে দেন। ফলে সাধুসহ আর্যরা সব পালিয়ে যায়। মুসলমানদের বিজয় সাধিত হয়। বিশেষ করে ফিকহ ও হাদিসশাস্ত্রে আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ) যথেষ্ট দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। বিতর্কে ছিলো তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। ধর্মীয় বিভিন্ন জ্ঞানে তিনি পুরোপুরি প্রোথিত ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা ও ওয়াজ-নসিহতের ময়দানে তাঁর তত্ত্বাবধানে একটি সুদক্ষ দল গড়ে ওঠেছিলো। ভারতবর্ষের ভেতরে ও বাইরে ধর্মীয় জ্ঞানের প্রসার, আকিদা বিশুদ্ধকরণ, আত্মশুদ্ধি, দাওয়াত ও সংস্কারের ক্ষেত্রে যাঁদের ভূমিকা রয়েছে, তাঁদের মধ্যে মহান সংস্কারক মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ইবন ইসমাঈল কান্ধলভী; যিনি বিশ্বময় প্রসিদ্ধি লাভ করা দাওয়াতে তাবলীগের জনক, খ্যাতিমান মুহাদ্দিস শায়খ আল্লামা যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া কান্ধলভী সাহারানপুরী, যিনি 'আউজাযুল মাসালিক' ও 'লামিউদ দুরারী' সহ অসংখ্য গ্রহণযোগ্য গ্রন্থপ্রণেতা এবং শায়খ আশেক ইলাহী মিরাঠী অন্যতম।

১৩৪৩ হিজরিতে আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) ভারত থেকে হিজরত করে মদিনা শরিফ চলে যান। তাঁর অন্যতম কীর্তি হচ্ছে- তিনি আবু দাউদ শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'বজলুল মজহুদ ফি শরহে সুনানে আবু দাউদ'-এর সফল রচয়িতা।

ইন্তেকাল

মদিনা শরিফের পবিত্র মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন এটাই ছিলো তাঁর অন্তিম বাসনা। আল্লাহ তাঁর এ মনোবাসনা পূরণ করেন। ১৩৪৫ হিজরিতে তিনি মদিনা শরিফে ইন্তেকাল করেন। কোব্বায়ে উসমানির সন্নিকটে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (রহ.)

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (রহ.)-কে চেনে না এমন মুসলমান নেই বললেই চলে। তিনি ভারতের থানাভবন নিবাসী হওয়ার কারণে তাঁর নামের শেষে 'থানভী' যোগ করা হয়। সমকালীন যুগের হাজার হাজার মানুষ তাঁর কাছ থেকে আত্মশুদ্ধি এবং তাসাউফের শিক্ষা গ্রহণ করার কারণে তিনি 'হাকিমুল উম্মত' (উম্মাহর আত্মিক চিকিৎসক) উপাধিতে ব্যাপকভাবে পরিচিত।

আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার জীবন্ত প্রকাশ। তিনি লিখেছেন। প্রচুর লিখেছেন, তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা সহস্রাধিক। তিনি এক জীবনে যা লিখেছেন আমরা কয়েক জীবনে তা পড়েও শেষ করতে পারবো না। তিনি লিখেছেন বিদগ্ধ পণ্ডিত গবেষক আলেমদের জন্য গবেষণার খোরাক। আবার তিনি লিখেছেন সমাজের পিছিয়ে-থাকা অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সহজ-সরল ও সাবলীল গ্রন্থ। পেটের তাগিদে বা লেখক খ্যাতির মোহে তিনি লিখেননি। নিজের লেখার কোনো রয়্যালিটি তিনি গ্রহণ করতেন না। এমনকি তিনি লেখকস্বত্ব বা মেধাস্বত্বও সংরক্ষণ করতেন না। সকল রচনা ও গ্রন্থাবলীর প্রকাশনা সবার জন্য উন্মুক্ত রেখেছিলেন।

জনসাধারণের কোথায় সমস্যা, কী কী কুসংস্কার আর বাড়াবাড়িতে জনসাধারণ নিমজ্জিত এগুলো তিনি দিলের দরদ দিয়ে অনুধাবন করতেন আর মনের মমতা দিয়ে লিখতেন। কুসংস্কারমুক্ত আলোকিত সমাজের স্বপ্ন তিনি দেখতেন। এ স্বপ্নের জন্য তিনি কাজ করতেন। শুধুই কি তিনি লিখেছেন? না তিনি জ্ঞানপিপাসু ছাত্রদের পাঠদান করেছেন। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। আবার দীনবিমুখ সাধারণ মুসলমানদের মাঝে দীনের চেতনা জাগ্রত করার জন্য তিনি গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে ছুটে যেতেন। সর্বশ্রেণির মানুষের মাঝে তিনি ওয়াজ-নসিহত করতেন। সহজভাবে ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের সামনে তুলে ধরতেন। শাণিত যুক্তি দিয়ে ইসলামি বিধানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতেন। তিনি ওয়াজের জন্যও কোনো হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। নিছক দ্বীনি খেমদত ছিলো তাঁর ওয়াজের প্রেরণা। আবার তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ সাধক ও দরবেশ। চিশতিয়া তরিকার একজন কামেল পীর ও মুর্শিদ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ তাঁর মুরিদ ছিলো। কিন্তু পীর-মুরিদি দ্বারা তিনি দুনিয়াবি কোনো ফায়দা ভোগ করতেন না। গরু-ছাগলসহ হাদিয়ার কোনো প্রথা তাঁর দরবারে ছিলো না। কোনো ভুরিভোজের আয়োজন সেখানে হতো না। মানুষ তাঁর কাছে আসতো তাসাউফের সবক শিখতে। তিনি উদার মনে মানুষকে তাসাউফ শিখাতেন। যিকির-আযকারসহ চিশতিয়া তরিকার যাবতীয় সবকের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন ছিলো তাঁর খানকার বৈশিষ্ট্য। যারা তাঁর কাছে মুরিদ হতো তাঁরা পত্রযোগে তাঁর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতো। নিজেদের অবস্থা তাঁকে জানাতো। তিনি কষ্ট করে সবার চিঠি পড়তেন আবার পরামর্শ দিয়ে জবাবও লিখে পাঠাতেন।

জন্ম ও শৈশবকাল : হাকিমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (রহ.) ১২৮০ হিজরির ৫ রবিউসসানি মোতাবেক ১৪ মার্চ ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে সুবহে

সাদিকের সময় ভারতের যুক্ত প্রদেশের মুজাফ্ফর নগর জেলার থানাভবন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনাব আবদুল হক ছিলেন ফার্সি ভাষার সুপণ্ডিত ও লেখক এবং মিরাঠের এক বিরাট জমিদারের নায়েব। হযরত থানভী শিশুকালে ভদ্র ও সুশীল ছিলেন। সুন্দর চেহারা, মধুর ও মনোমুগ্ধকর ব্যবহারের দরুন অনায়াসেই হযরত থানভী সকলের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হন। শৈশবকালে তাঁর সুন্দর ব্যবহারের কারণে হিন্দুরাও তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। শিশুকাল থেকেই তিনি খুবই পরহেজগার ছিলেন।

শৈশবে তিনি ওয়াজ ও বক্তৃতা করতে চেষ্টা করতেন। কোনো কোনো সময় তিনি বাজার করতে গেলে পথে কোন মসজিদে প্রবেশ করে মিম্বরে উঠে খুতবার ন্যায় কিছু পাঠ করতেন। এভাবে তিনি ছোটবেলা থেকে ওয়াজ, নসিহতের ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাইতো তিনি জীবনে জগদ্বিখ্যাত ওয়ায়েযরূপে মুসলিম জাহানে পরিচিত হন। তিনি ছোটবেলা থেকে খুবই লাজুক স্বভাবের ছিলেন।

শিক্ষাজীবন : তিনি বাল্যকালেই পবিত্র কুরআনের হাফিজ হন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন নিজ শহরে। ফারসি ভাষার প্রাথমিক কিতাবগুলো তিনি মিরাঠেই অধ্যয়ন করেন। পরে স্বীয় মাতৃভূমি থানাভবনে এসে ফার্সির অন্য কিতাবগুলো তাঁর শ্রদ্ধাভাজন মামা মাওলানা ওয়াজেদ আলি সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করেন।

হযরত থানভী ১২৯৫ হিজরির যিলকদ মাসে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্যে বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখানে তিনি আরবি, ফারসি ও বিভিন্ন ভাষা অধ্যয়ন করেন। স্বল্প সময়ে তিনি তাঁর প্রখর মেধা ও প্রতিভা বলে শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি মাত্র পাঁচ বছরে ১৩০০ হিজরিতে দেওবন্দ থেকে হাদিসের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে আনুষ্ঠানিক ছাত্রজীবনের ইতি টানেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ কি বিশ বছর। শিক্ষাজীবনে হযরত থানভী (রহ.) ছিলেন আশরাফুত তুল্লাব (সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র) কর্মজীবনে আশরাফুল ওলামা, (সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম) এবং আধ্যাত্মিক জগতে 'আশরাফুল আউলিয়া' (সর্বশ্রেষ্ঠ ওলি)।

কর্মজীবন : দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর ১৩০১ হিজরিতে মাদরাসায়ে ফয়জে আম কানপুরে পঁচিশ টাকা বেতনে অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। কানপুরে তিনি ১৩১৫ হিজরি পর্যন্ত একটানা চৌদ্দ বছর হাদিস এবং তাফসিরের মূল্যবান দরস দেন। সাথে সাথে তিনি ওয়াজ ও নসিহত, ফাতওয়া এবং ইসলামি গ্রন্থ রচনায় ব্যাপ্ত হন। ভারতবাসী তাঁর প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। তিনি ছাত্রদেরকে উদাহরণ ও উপমা দিয়ে জটিল বিষয়কে অতি সহজে সরলভাবে বুঝিয়ে দিতেন। এতে ছাত্ররা তাঁর দরস অতি সহজভাবে বোধগম্য করতে পারতেন। এটি ছিলো হযরত থানভীর (রহ.) দরসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ : হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (রহ.) দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যয়নকালীন হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.) হযরত থানভীর (রহ.) আব্বাকে মক্কা শরিফ থেকে সংবাদ পাঠালেন যে, তিনি যেনো তাঁর বড়ো ছেলে আশরাফ আলি থানভীকে নিয়ে হজে চলে আসেন। হযরত আশরাফ আলি থানভীকে (রহ.) তিনি কেনো মক্কা শরিফে ডেকে পাঠান এর রহস্য হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.) ভালো জানেন। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বলে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা হাজি সাহেব যখন ভারতবর্ষ হতে হিজরত করে মক্কা শরিফ চলে যান তখন হযরত থানভীর জন্মও হয়নি। হযরত থানভীর আব্বাজান হাজি সাহেবের মুরিদ ছিলেন। তিনি স্বীয় পীর-মুর্শিদের নির্দেশ পেয়ে ছেলে থানভীকে নিয়ে হাজি সাহেবের দরবারে মক্কা শরিফে হাজির হন। হাজি সাহেব এতে অত্যন্ত খুশি হন এবং হাজি সাহেব হযরত থানভীকে স্বহস্তে বায়আত করে নেন। পুত্রের সাথে পিতা আবদুল হক সাহেবও হাজি সাহেবের কাছে স্বীয় বায়আত নবায়ন করেন। ১৩০৭ হিজরি সন থেকে হযরত থানভীর আধ্যাত্মিক জগতে নতুন জীবনের সূচনা হয়। একের পর এক তিনি আধ্যাত্মিকতার সিঁড়ি অতিক্রম করতে থাকেন। পরিশেষে স্বীয় মুর্শিদ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.) এর দরবারে মক্কা শরিফে উপস্থিত হওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেন। এভাবে ১৩১০ হিজরিতে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো স্বীয় পীর-মুর্শিদের দরবার মক্কা শরিফে হাজির হন। তাঁর পীর-মুর্শিদ তাঁকে আধ্যাত্মিকতার যাবতীয় তালিম দিতে থাকেন। তিনি স্বীয় পীর-মুর্শিদের কাছে ছয় মাস অবস্থান করেন। যিকির, মুরাকাবা, মুশাহাদা তথা আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ সোপানে পৌঁছে হাজি ইমদাদল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.)-এর পক্ষ থেকে খেলাফত লাভ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে তিনি যথারীতি কানপুর মাদরাসায় অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এবার তাঁর রওনক পূর্বের চেয়ে আরো অধিক বৃদ্ধি পায় এবং কানপুর মাদরাসার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে তাসাউফের নতুনধারা সংযোজিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে মাদরাসা যিকির এর খানকায় রূপান্তরিত হয়। অনেক অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

থানভী (রহ.) যখন স্বীয় পীর-মুর্শিদের দরবার মক্কা শরিফ ত্যাগ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তাঁর মুর্শিদ তাঁকে দু'টি মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন।

(১) ভারতে পৌঁছার পর তোমার অভিনব অবস্থার সৃষ্টি হবে, তখন তুমি অস্থির হবে না, ধৈর্য ধারণ করবে।

(২) কানপুর মাদরাসায় অবস্থান করতে মন না চাইলে স্বীয় গ্রাম থানাভবনে চলে যাবে। অন্য কোথাও যাবে না।

নিজ গ্রাম থানাভবনে হযরত থানভী (রহ.) : কানপুর মাদরাসায় সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর অধ্যাপনা করার পর থানভী (রহ.) স্বীয় গ্রামে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। অতএব ১৩১৫ হিজরিতে তিনি কানপুর হতে থানাভবনে চলে আসেন এবং খানকায়ে ইমদাদিয়া পুরোদমে চালু করার জন্যে আত্মনিয়োগ করেন। হযরত থানভী (রহ.) কানপুর হতে থানাভবনে চলে আসার সংবাদ শুনে

তাঁর পীর-মুর্শিদ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.) অত্যন্ত খুশি হন এবং থানভী (রহ.)-এর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। এতে তিনি লিখেন- তোমার থানাভবনে চলে আসা অনেক ভালো হয়েছে। আশা করি, তোমার মাধ্যমে বহু লোকের জাহেরি ও বাতেনি ফায়েদা হবে এবং তুমি আমাদের মসজিদ ও খানকাহ পুনরায় আবাদ করবে। আমি তোমার জন্যে দুআ' করছি।

হযরত থানভী (রহ.) থানাভবনে এসে গভীর ভক্তি সহকারে বহু পুরাতন পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্র খানকায়ে ইমদাদিয়াতে ইলমে তাসাউফের কাজ শুরু করেন। বহুদিন হতেই ইলমে তাসাউফের শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে আসছিল এ খানকায়ে ইমদাদিয়া। একের পর এক শায়খ মুর্শিদ এসে এখানে আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এখন হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.)-এর সর্বশেষ আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী হিসেবে খানকায়ে ইমদাদিয়ার অবস্থানের কথা চতুর্দিকে প্রচার হলে মৌমাছির মতো মানুষ ঝাঁকে-ঝাঁকে এসে খানকায়ে ইমদাদিয়ায় সমবেত হতে থাকে। লোকজন থানভীর (রহ.) হাতে বায়আত হওয়ার জন্যে পাগল হয়ে যায়। তিনি সবাইকে স্নেহ-মমতা সহকারে ওয়াজ-নসিহত ও আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। এভাবে তিনি খানকায়ে ইমদাদিয়াকে পূর্ণরূপে আবাদ করেন। এমতাবস্থায় হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) থানভীকে দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষকতায় নিয়োগ করতে চাইলে তিনি তাঁকে স্বীয় পীর-মুর্শিদ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.)-এর সেই উপদেশের কথা শুনান। এভাবে তিনি স্বীয় পীর-মুর্শিদের অমূল্য দু'টি উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

হযরত থানভীর (রহ.) হাতে বায়আত হওয়ার শর্তাবলী

হযরত থানভীর (রহ.) হাতে বায়আত হতে হলে নিম্নের শর্তাবলী পালন করে বায়আত হতে হতো, অন্যথায় তিনি কাউকে বায়আত করাতেন না।

* যে পবিত্র কুরআন যতটুকু পড়েছে বা যতটুকু স্মরণ আছে তা কোন অভিজ্ঞ কারি সাহেবের কাছে শুদ্ধ করে নিতে হবে।
* বেহেশতি জেওর-এর সব ক'টি খণ্ড বেহেশতি গাওহার, ইসলাহুর রুসুম ও কৃছদুস সাবিল পড়ে অথবা শুনে এ অনুযায়ী জীবন গঠন করতে হবে।
* আমার যেসব ওয়াজ ও নসিহত ছাপা হয়েছে তা বারবার পড়তে হবে, পড়তে না পারলে যে পড়তে পারে তার কাছ থেকে শুনে এর আনুগত্য করতে হবে।
* প্রাথমিক পর্যায়ে তাসাউফের তালিম আমার কোন খলিফা থেকে গ্রহণ করতে হবে, আমি যাকে নির্ধারণ করে দেবো অথবা সে নিজেই পছন্দ করে আমার অনুমোদন নিয়ে নেবে।
* পঁচিশ বছরের মতো আমার সাথে চিঠিপত্রের যোগাযোগ না হলে কেউ আমার নিকট থেকে তালিম গ্রহণের প্রত্যাশা করবে না। (আশরাফুস সাওয়ানেহ)

হযরত থানভী (রহ.) নিয়মকানুনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁর প্রতিটি কাজই ছিল সুশৃঙ্খল। কেউ যদি কোনো নিয়মকানুন ভঙ্গ করতো তাকে খানকাহ থেকে বের করে দেয়া হতো। যদি তিনি মাফও করে দিতেন কিন্তু শাস্তি দিতেন। কারো কারো শাস্তি এমন ছিলো যে,

লিখিতভাবে খানকাহ হতে সে নিজে ঘোষণা দিতো যে, আমার দ্বারা এ অন্যায় হয়ে গেছে, আবার কারো কারো এমন কঠিন শাস্তি হতো যে, খানকাহ হতে অবস্থানকারী প্রত্যেকের নিকট তাকে পৃথক পৃথকভাবে স্বীয় ত্রুটির কথা প্রকাশ করতে হতো।

কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তার একটি কথা বলারও অধিকার থাকতো না। কেবল চুপচাপ বসে থাকতে হতো।

নবাগতদের জন্যে একথা অত্যন্ত জরুরি ছিলো যে, মুসাফাহা করার সাথে সাথে নিজের পরিচয় এবং বাসস্থানের পরিচয় দিতে হতো। চিঠিপত্র দেয়ার নিয়ম ছিলো- একটি কাগজে মাত্র একটি প্রশ্নই থাকবে। জবাবের জন্যে একটি কাগজ, একটি খাম দিতে হবে। খামের ওপর পূর্ণ ঠিকানা লিখে দিতে হবে।

এককথায় শাহি দরবারের যে নিয়মকানুন এর থেকেও কড়াকড়ি নিয়ম-কানুন ছিলো থানভীর (রহ.) দরবারে। তিনি নিজেই এসব নিয়মকানুন বাস্তবায়নে খুবই কঠোর ছিলেন এবং তিনি নিজেই এসব নিয়মকানুন প্রতিপালনের কঠোর নির্দেশনা দিতেন।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এসব নিয়ম-কানুন মেনেই তাঁর হাতে বায়আত হয়েছিলেন এবং আধ্যাত্মিকতার সুউচ্চ শিখরে আরোহণপূর্বক একটি সুন্দর ও আদর্শ জীবন আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস এর সুউচ্চ স্থান দান করুন। আমিন!

দ্বীন ও তরিকতের প্রচার-প্রসারে সফর : হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (রহ.) নির্জনে বসে আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগি ও আধ্যাত্মিক সাধনা এবং উম্মতের পরিশুদ্ধির জন্যে লেখালিখি করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তদুপরি একজন নায়েবে রাসুল হিসেবে দীন ও তরিকতের প্রচার-প্রসারে অনেক জায়গা সফর করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে ১৩০১ হিজরির সফর মাস থেকে তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র সফর করেন। তিনি করাচি, মুম্বাই, কোলকাতা, রেঙ্গুন, ঢাকা, শিমলা, গুজরাট, লাহোর, ভাওয়ালপুর, আজমগড়, গাজিপুর এবং বানারস প্রভৃতি স্থানে সুদীর্ঘ ৪৩ বছর দ্বীনি কাজে সফর করেন।

দেশ-বিদেশের মুরিদানদের পক্ষ থেকে বহু সংখ্যক দাওয়াতনামা তাঁর নিকট আসতো। যদি প্রতিদিন ১০০টি পত্রের মধ্যে মাত্র ১০টিও মঞ্জুর করতেন, তাহলে ৩৬৫ দিনের মধ্যে একটি দিনও তিনি বাড়িতে অবস্থান করতে পারতেন না। একান্ত প্রয়োজনবোধে কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই সফর করতেন।

একদা ঢাকার প্রভাবশালী নওয়াব সলিমুল্লাহ সাহেব তাঁকে দাওয়াত করলে তিনি নিম্নের শর্ত সাপেক্ষে তা মঞ্জুর করেন:

* কোন টাকা-পয়সা বা হাদিয়া দিতে পারবেন না।
* অবস্থানের জন্যে বিশেষ রুম ছাড়া অন্য এমন জায়গা হতে হবে, যেনো আল্লাহর বান্দারা অবাধে সাক্ষাৎ করতে পারেন।
* নওয়াবের জন্যে সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময় থাকবে, অন্য কেউ তাঁর সাথে আসতে পারবে না। এরূপ ব্যবস্থা হলে উভয়ের মহব্বতের মাধ্যমে ফয়েয লাভ হতে পারে।
* কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ওয়াজ করতে বলতে পারবে না।

উপর্যুক্ত শর্তাবলী নওয়াব অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মেনে নেন।

নওয়াব সাহেব হযরত থানভীকে জাঁকজমকের সাথে অভ্যর্থনা দিতে চাইলেন কিন্তু হযরত থানভী (রহ.) তা শরিআ'ত পরিপন্থী বলে অভিহিত করে নিষেধ করেন। নওয়াব বাহাদুর তাঁর বিরাট জমিদারির নায়েব, ম্যানেজার নওয়াবের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে অভ্যর্থনা জানানোর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলে এতে তিনি রাজি হননি। তিনি বলেন, এরূপ রাজকীয় অভ্যর্থনা আমার স্বভাববিরোধী। আমি এটি পছন্দ করি না। এতদসত্ত্বেও হযরত থানভীর ঢাকা আগমনের খবর শুনে হাজার হাজার থানভীপ্রেমিক জনতা স্টেশনে ভিড় জমায়।

নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর খাস গাড়িতে হযরত থানভীকে (রহ.) বসিয়ে নিজে অন্য গাড়িতে আরোহণ করেন। থানভী (রহ.) নওয়াবকে এ গাড়িতে আরোহণ করতে বললেন কিন্তু বেয়াদবি হবে মনে করে তিনি গাড়িতে উঠেননি। এমনকি একই দস্তরখানায় বসে তাঁর সাথে খানাও খাননি। নওয়াব সাহেব তাঁর বেগমদের দ্বারা বিভিন্ন খাবার তৈরি করে স্বয়ং নিজেই এগুলো হযরতকে পরিবেশন করতেন। নওয়াব হযরতের হাতে বায়আত হতে চাইলে তিনি অস্বীকার করেন। কারণ তিনি ভাবলেন যে, এমন বড়লোককে ইসলামি অনুশাসন মেনে চলার আদেশ বা শাসন করা যাবে না। তবুও নওয়াব সাহেব যখন চিঠিপত্র লিখতেন, তখন তিনি পত্রে আপনার মুরিদ সলিমুল্লাহ লিখতেন।

ওয়াজ-নসিহতে তিনি ছিলেন সমুদ্রতুল্য। সমুদ্র যেরূপ স্ব-স্থানে অবস্থান করে বিভিন্ন জায়গায় পানি সরবরাহ করে ভূমি উর্বর করে অনুরূপ তিনিও বিভিন্ন শহরে ফয়জে ইলাহি পৌঁছে দিয়ে স্বীয় জন্মভূমি খানকায়ে ইমদাদিয়ায় এর কেন্দ্র স্থাপন করেন। হযরত থানভীর (রহ.) প্রতিটি ওয়াজ ছিলো তাসাউফের এক একটি পূর্ণ সবক। তাঁর ওয়াজের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিটি মুরিদকে তাদের চলার পাথেয় সংগ্রহ করে দিতেন।

তিনি সফরের সময় কাউকে মুরিদ করতেন না। কারণ তিনি মনে করতেন, যদি কেউ পীরের সন্ধান পেয়ে তাঁর উসিলায় আল্লাহকে পেতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই কষ্ট স্বীকার করতে হবে। তাই তিনি সকলকে তাঁর মাতৃভূমি থানাভবনে যেতে বলতেন। এতে সত্যিকার প্রেমিকের পরিচয় পাওয়া যেতো। তিনি একথা মনে করতেন যে, শুধু তাঁর ওয়াজ শুনে তাঁর মুরিদ হয়ে যাচ্ছে। যদি পীরের দৈনন্দিন আমল না দেখে তাহলে ভক্তি-শ্রদ্ধা কেমন করে হবে?

পীরের আস্তানায় গেলে পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারবে, একে-অন্যকে পরীক্ষা করারও সুযোগ হবে। পীরের যোগ্যতা না থাকলে কেনো তার হাতে বায়আত হবে? বায়আত তো গাজর-মূলা নয় যে, পয়সা দিয়ে বিক্রি হয়। তিনি তাঁর খানকায়ে ইমদাদিয়ায় উপস্থিত হয়ে দেখেশুনে বায়আত হওয়ার উপদেশ দিতেন। অবশ্য তিনি মহিলা ও রুগ্ন ব্যক্তিকে সফরের সময় বায়আত করে নিতেন।

প্রকাশনা: হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (রহ.) হচ্ছেন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর লিখিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। 'বেহেশতি জেওর' বাড়িতে নেই এমন ঘর খুবই বিরল। 'খুতুবাতে আহকাম' মিম্বরে নেই এমন মসজিদও কম। 'ইমদাদুল ফাতওয়া' বুকসেলফে নেই এমন কোনো ফাতওয়া বিভাগ পাওয়া যাবে না। 'বয়ানুল কুরআন'

নেই এমন কোনো তাফসির বিভাগ কেউ দেখেনি। 'আন নাশরুত তিব' সংরক্ষিত নেই এমন কোনো গবেষণাগারও পাওয়া যাবে না।

উপরিউক্ত পবিত্র গ্রন্থাবলির সংকলক ও লেখক হচ্ছেন হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (রহ.)।

ইসলামের এমন কোন দিক নেই যে সম্পর্কে তিনি কলম ধরেননি। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে শিরক, বিদআত ও অন্যান্য ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোর মূলোৎপাটন করেছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও গুজরাটি ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হয়ে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পঠিত হচ্ছে। তিনি আরবি, উর্দু ও ফারসি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। হযরত থানভী (রহ.)-এর মতো আর কোনো লেখকের লেখা লেখকের জীবদ্দশায় এতো জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। তাঁর জীবদ্দশায় হাজার হাজার কপি ছাপিয়ে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়। এমন কি অমুসলিমদের ঘরেও তাঁর পুস্তক বিদ্যমান থাকার নজির রয়েছে। তিনি নামাজ শেষ করেই একান্ত লেখালেখির কাজে মনোনিবেশ করতেন এবং দুপুরের খাবার গ্রহণ করে অল্প সময় বিশ্রাম নিতেন। যোহরের নামাজ শেষ না করা পর্যন্ত কারো সাথে সাক্ষাৎ দিতেন না। নামাজের পর লোকজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য বসতেন এবং চিঠি-পত্রের উত্তর দিতেন। তিনি সে সকল মহান খোদাভীরু আলেমের একজন যাঁদের ওয়াজ-নসীহত এবং রচনাবলি দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়েছে। তাঁর ওয়াজ-নসীহতের আসরের সংখ্যা চিঠি-পত্রে, লেখা তথ্য মতে চারশ-এ পৌঁছেছিলো।

ইন্তেকাল : দ্বীনের খিদমতে নিবেদিত এ মহান বুজর্গের অতিরিক্ত মেহনতের দরুন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। নানাবিধ রোগ ও বার্ধক্য সত্ত্বেও দীনের প্রচার ও প্রসারে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। পরিশেষে ১৩৬২ হিজরির ১৬ রজব মুতাবেক ১৯ জুলাই ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ সোমবার দিবাগত রাত দশটায় এশার নামাযের পর এই মহান সাধক, কর্মবীর, যুগসংস্কারক, ক্ষণস্থায়ী জীবন ত্যাগ করে মহান রাব্বুল আলামিনের সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি তাঁর আদর্শ ও কর্ম দ্বারা অমর হয়ে আছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস এর উঁচু মাকাম দান করুন। আমিন!

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.)

বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.)-এর পূণ্যময় জীবন একটি অনুসরণীয় আদর্শ জীবন। এ উম্মতের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ওলামায়ে কিরামের জন্ম হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের আলোকোজ্জ্বল বর্ণাঢ্য জীবন মানুষের সামনে রেখে গেছেন, কিন্তু এমন ব্যক্তিত্ব হাতেগোনা কয়েকজন যাঁদের ইলম, বুজর্গি, ফয়েজ, বদান্যতা এবং ভালোবাসা বিশ্বজুড়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। যাঁদের ইলমের সাথে সাথে আমল দ্বারাও উম্মত উপকৃত হয়েছে। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) সেই পুণ্যময় ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

তাঁর ইলম, প্রখর মেধা (قوت حافظ), তাকওয়া-পরহেজগারি, দুনিয়াবিমুখতা ও স্বল্পতুষ্টি ছিলো অসাধারণ ও নজিরবিহীন। ইলমের ক্ষেত্রে তাঁকে চলমান কুতুবখানা বললেও অত্যুক্তি হবে না। আমলের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপাদমস্তক সুন্নাতে নববীর (সা.) অনুসারী। তাঁর ইলমি গভীরতা দরসে হাদিসকে সকল ইলম ও বিষয়ের সমন্বয় হিসেবে গড়ে তুলেছিলো। তিনি কাদিয়ানি মতবাদকে যুক্তির কষ্টিপাথরে খণ্ডন করেছেন এবং এ বিষয়ে তাত্ত্বিক কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বংশীয় ঐতিহ্য : মুহাদ্দিসকুলের গৌরব শায়খুল হাদিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) সাইয়িদ বংশীয় ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ প্রায় আড়াইশত বছর পূর্বে বাগদাদ থেকে হিজরত করে মুলতান হয়ে কাশ্মিরে এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পুরোবংশ ওলিয়াল্লাহ দ্বারা পরিপূর্ণ। বিশেষত শাহ ফতেহুল্লাহ এবং শাহ মাসউদ নরওরির মাজার আজও কাশ্মিরে সর্বসাধারণের জিয়ারতগাহ। হযরত শাহ সাহেবের বংশধারা কয়েকটি সূত্রে হযরত আলি (রা.) পর্যন্ত পৌঁছে। হযরত শাহ সাহেব নিজের কয়েকটি রচনায় স্বীয় বংশধারা এভাবে লিখেছেন-

মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ ইবন মুহাম্মদ মুয়াজ্জম ইবন আবদুল কবির ইবন আবদুল খালেক ইবন পীর আকবর ইবন পীর হায়দার ইবন আরেফ বিল্লাহ ইবন বাবা আলি ইবন শায়খ আবদুল্লাহ ইবন শায়খ মাসউদ কাশ্মিরি। হযরত শাহ সাহেবের পিতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুয়াজ্জম শাহ ছিলেন একজন বিদগ্ধ আলিমেদীন। সোহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার পীর ছিলেন তিনি। হাজার হাজার কাশ্মিরি লোকজন তাঁর হাতে বাইআত হন। তিনি একশত পনেরো বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। হযরত শাহ সাহেবের মাতাও ছিলেন সাইয়িদা। অতএব, পিতা-মাতা উভয় দিক থেকে তিনি ছিলেন সাইয়িদ বংশীয়।

জন্ম ও শৈশবকাল : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) ২৭ শাওয়াল ১২৯২ হিজরি মুতাবেক ২৭ অক্টোবর ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে সোমবার সকালে কাশ্মিরের দুধওয়ান লুবাব নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতার নিকট পবিত্র কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি করিমা, পন্দনামা এবং মুখতাসারুল কুদুরি ইত্যাদি কিতাবের পাঠ সমাপ্ত করেন। বাল্যকাল

থেকে তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। তাঁর অসাধারণ মেধা দেখে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা ও শিক্ষকমণ্ডলী অবাক হয়ে যেতেন। অল্পদিনে মধ্যে তিনি তাঁর সহপাঠীদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব লাভে ধন্য হন। তিনি কিশোর বয়সে যখন মুখতাসারুল কুদুরি পড়তেন, তখন ওস্তাদকে এমন এমন প্রশ্ন করতেন যে, সে প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে তাঁকে হিদায়া ও তাঁর শরাহ অধ্যয়ন করতে হতো। সে সময়কার কোনো বড়ো আলিম তাঁর লেখা পাঠ্য কিতাবের টীকাগুলো দেখে মন্তব্য করেছিলেন- এ ছেলে একদিন এ যুগের গাজালি ও রাযি হবে।

তিনি আরবি ভাষায় ফিকহ, উসুলুল ফিকহ, তাফসির, হাদিস প্রভৃতি ইলম বারো বছর বয়সেই মর্মার্থসহ আত্মস্থ করেন। তৎকালীন কাশ্মীরে ফিকহ ও ফাতওয়া ছিলো প্রতিযোগিতার বিষয়। তাই তিনি বারো বছর বয়সেই ফাতওয়া প্রদান করতেন। তাঁর ফাতওয়া ছিলো বড়ো বড়ো শায়খদের ফাতওয়ার মতো।

উচ্চশিক্ষা অর্জন : গ্রামের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে স্বীয় গ্রাম ত্যাগ করে হাজারা জেলায় (সীমান্ত এলাকা) চলে যান। তিন বছর যাবত সেখানকার বিজ্ঞ আলেমদের নিকট দ্বীনিশিক্ষা অর্জন করেন। হাজারা হতে তিনি সতেরো বছর বয়সে উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে দারুল উলুম দেওবন্দ চলে যান। ১৩০৮ হিজরিতে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। চার বছর তিনি সেখানে অধ্যয়ন করে শিক্ষার পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং দাওরায়ে হাদিস-এর সনদ লাভ করেন।

দেওবন্দে তিনি যেসব উস্তাদের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেন, তৎমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি (রহ.) আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)। দেওবন্দ থেকে সনদ নেয়ার পর তিনি গাঙ্গুহে তাশরিফ নিয়ে যান এবং হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর (রহ.) নিকট থেকে হাদিসের সনদ লাভ করেন। জাহেরি ও বাতেনি ইলমে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর সুলুক ও তরিকতের স্তরগুলো অতিক্রম করেন এবং হযরত গাঙ্গুহীর (রহ.) হাতে বাইআত হয়ে তাঁর থেকে খিলাফত লাভ করেন।

কর্মজীবন : হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর নিকট থেকে তিনি বিদায় নিয়ে মাওলানা মাশিয়াতুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে বিজনূর চলে যান এবং সেখানে অবস্থান করেন। বিজনূর অবস্থানকালে তাঁর দেওবন্দের অপর এক সাথী মাওলানা আমিন উদ্দিন সাহেব দিল্লিতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা নেন। এ কাজের জন্য তিনি আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.)-এর সহযোগিতা নেয়া অত্যন্ত আবশ্যিক বলে মনে করেন। তাই তিনি বিজনূর গিয়ে আল্লামার কাছে স্বীয় ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) তাতে সম্মতি দেন। তখন তাঁর কাছে মাত্র ১৭-১৮ রুপি ছিলো। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি এ টাকাগুলো মাওলানা আমিন উদ্দিনকে দিয়ে দেন। দু'জন দিল্লি এসে কাজ শুরু করে দেন। মাদরাসা পরিচালনায় প্রথমে দু'বন্ধু বেশ কিছুদিন অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেন। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) ছিলেন সে মাদরাসার প্রথম ও প্রধান উস্তাদ। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.)-এর ত্যাগ ও কুরবানির প্রতি

ইঙ্গিত করে একবার মুফতি কেফায়াতুল্লাহ (রহ.) বলেছিলেন- মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি ছিলেন এ মাদরাসার প্রথম ও প্রধান উস্তাদ। তাঁর শুকরিয়া আদায় করা এবং তাঁকে স্মরণ রাখা মাদরাসার বর্তমান দায়িত্বশীলদের অপরিহার্য কর্তব্য।

কয়েক বছর তিনি উক্ত মাদরাসার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে মাতৃভূমি কাশ্মীরে চলে যান। সেখানেও তিনি শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। ১৩২৫ হিজরিতে কাশ্মীরের প্রখ্যাত কয়েকজন বুজর্গের সঙ্গে তিনি পবিত্র হজব্রত পালন করতে যান এবং হারামাইন শরিফ যিয়ারত করেন। এ হজের সফরে তিনি হিযায, মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের প্রখ্যাত ওলামায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বরণ করে নেন এবং হাদিসের সনদ প্রদান করেন। হজ সমাপন করে তিনি কাশ্মীরে চলে আসেন এবং বারামূলায় মাদরাসা ফায়যেআম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় তিন বছর তিনি এ মাদরাসার শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৩৩৮ হিজরিতে দস্তারবন্দি মাহফিল উপলক্ষে তিনি দেওবন্দ আসলে দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ তাঁকে হাতছাড়া করেননি। তাঁকে দেওবন্দের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। যে বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠে তিনি দ্বীনি ইলম অর্জন করেছিলেন, এখন তা অন্যদের মাঝে বিতরণের মহান সুযোগপ্রাপ্ত হন।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে কোন বেতন-ভাতা গ্রহণে সম্মত হননি। তবে তৎকালীন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.)-এর পীড়াপীড়িতে শুধুমাত্র তাঁর সাথে দু'বেলা আহারে শরিক হতে সম্মত হন। এভাবে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের ইলমের সাগরে নিমজ্জিত থেকে অসংখ্য জ্ঞানপিপাসুর তৃষ্ণা নিবারণ করতে থাকেন। কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি সুনান আবু দাউদ ও মুসলিম শরিফের দরস প্রদান করেন। ১৩৪৩ হিজরিতে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি বুখারি শরিফের দরস প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে তিনি এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন। শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর ইন্তেকালের পরে শাহ সাহেব দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এরপর থেকে স্থায়ীভাবে সহিহ বুখারি ও জামে তিরমিযীর দরস দিতে আরম্ভ করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন।

দাম্পত্যজীবন : লোকসমাজে অবস্থান করে শিক্ষকতার গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিলেও পার্থিব ঝামেলা বর্জন করে নির্জনবাসই ছিলো শাহ সাহেবের প্রকৃত অভিপ্রায়। এজন্য তাঁর একান্ত মনোবাসনা ছিলো তিনি হিজরত করে পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারায় চলে যাবেন এবং বাকি জীবন সেখানে কাটাবেন। কিন্তু দারুল উলুম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ তাঁর মতো একজন বিজ্ঞ আলিমকে হাতছাড়া করতে মোটেও সম্মত হননি। তাঁরা চিন্তা করলেন, তাঁকে কিভাবে দেওবন্দ মাদরাসায় অধ্যাপনার দায়িত্বে রাখা যায়। তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যদি তাঁকে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ করা যায় তাহলে এটি ইতিবাচক ফল দেবে। এভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের নায়েবে মুহতামিম মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানি (রহ.) এ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি গাঙ্গুহের এক সম্ভ্রান্ত সাইয়িদ পরিবারের

একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার সাথে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বিয়ের দু'বছর পর তাঁর একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে সামান্য বেতন গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। তিনি কায়মনোবাক্যে এতে সম্মতি প্রদান করেন। এটি কিন্তু ষাট রুপির বেশি ছিলো না।

১৩৪৬ হিজরি পর্যন্ত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দারুল উলুম দেওবন্দে তালিমের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন। কিন্তু সে সময় মাদরাসার মুহতামিমের সঙ্গে কিছুটা মতভেদ দেখা দেয়ায় তিনি গুজরাটের জামেয়া ইসলামিয়া ঢাবেলে চলে যান। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সেখানে তিনি ইলমে দীনের খিদমতে নিয়োজিত থাকেন।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরির (রহ.) ভক্ত ও সহকর্মীদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানি (রহ.), মাওলানা মুফতি আজিজুর রহমান উসমানি (রহ.), মাওলানা সিরাজ আহমদ রশিদি (রহ.), মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারভি (রহ.), মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী প্রমুখ। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) শারীরিক ও চারিত্রিক উভয় দিক থেকে ছিলেন অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত। কাশ্মীরের সন্তান হওয়ায় তাঁর গায়ের রঙ ছিলো লাল-সাদা। পরিধানে সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক থাকতো। তাঁর মধ্যে এমন সম্মোহনী আকর্ষণ ছিলো, তাঁকে কেউ দেখলে আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। তাঁর স্বভাব-চরিত্র ছিল অতি উত্তম। তিনি লোকজনের সাথে এমনভাবে মিশতেন যে, তারা তাঁর ভক্ত না হয়ে পারতো না। আজীবন তিনি অধ্যাপনা চালিয়ে যান, এমনকি রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করেননি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দিয়েছিলেন প্রখর মেধা ও তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি। যা তাঁর একবার চোখে পড়তো, যা তিনি কানে শুনতেন তা জীবনেও ভুলতেন না। পাথরের মত খোদিত হয়ে যেতো তাঁর স্মৃতির মানসপটে। তিনি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর জ্ঞানকে সমুদ্রতুল্য স্বীকৃতি দিতেন। এবং তাঁর حدة ও تفردات-এর বিষয় নিয়ে সমালোচনা করতেন এইভাবে–

"ويصفه بالبحر الزخار الذي لا ساحل له مع انتقاده له في تفرداته و حدته"

এইভাবে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এর হাদিসের জ্ঞানের স্বীকৃতি দিতেন এবং তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ফাতহুল বারি'-এর বড় ভক্ত ছিলেন।[১]

আল্লামা কাশ্মীরি (রহ.) সমকালীন যুগে অনন্য মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। পূর্ববর্তীগণের কিতাবাদি তাঁর ঠোঁটস্থ ছিলো। ফিকহ, উসুলুল ফিকহ, আরবি, কুরআন, হাদিস ইত্যাদি সব বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ছিলো অসাধারণ। তিনি যৌবনের ঊষালগ্নে একবার যা পড়েছেন কিংবা লাইব্রেরিতে একবার দেখেছেন পরবর্তীতে তা হুবহু বর্ণনা করতে পারতেন। ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণের শ্রেণিবিন্যাস এবং তাঁদের স্তর সম্পর্কে তিনি তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আর তাঁদের ব্যাপারে যে কোনো মন্তব্য তিনি ন্যায়পরায়ণতার সাথেই করতেন। তিনি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া (রহ.) এর যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিতেন এবং তাঁকে

---

[১] العلامة عبد الحي الحسني، نزهة الخواطر (الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام ، ص: ٩٢، ج ٨

কূলহীন প্রাচুর্যের সমুদ্রের সাথে তুলনা করতেন। তবে বিচ্ছিন্ন কিছু বিষয়ে তিনি তাঁর গঠনমূলক সমালোচনাও করতেন। অনুরূপ হাফিয ইবন হাজর আসকালানীর (রহ.) অগাধ জ্ঞান ও হাদিসশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যেরও স্বীকৃতি দিতেন। বিশেষত তাঁর রচিত 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থের তিনি বড়ো ভক্ত ছিলেন এবং সবসময় এর প্রশংসায় মুখর থাকতেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম কারি মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব (রহ.) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- আমি একটি গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে একপর্যায়ে আবুল হাসান কায্যাবের জীবনী সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া আমার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হযরত তখন শয্যাশায়ী। আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। কথা প্রসঙ্গে এক পর্যায়ে আমি আমার সমস্যার কথা তাঁকে জানালাম। শুনে প্রথমে তিনি কয়েকটি কিতাবের নাম বললেন এবং আরো বললেন, এতে এ প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে, দেখে নিবেন। আমি বললাম, হযরত! এতগুলো কিতাব ঘাঁটাঘাটি করার সময় আমার হবে না, আপনি একটু কষ্ট করে এ বিষয়ে একটু বলে দেন। তিনি আমার নিকট এ প্রসঙ্গে এতো সূক্ষ্ম আলোচনা করলেন, যেনো মনে হচ্ছিলো তিনি কোনো কিতাবের পাঠদান করছেন। আলোচনা শেষে আমি আরজ করলাম, হযরত! এ বিষয়ে কি আপনি ইতোমধ্যে পড়েছেন? তিনি বললেন না! আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে আমি যখন মিসরে ছিলাম তখন এ বিষয়ে একটি কিতাব পড়েছিলাম, তা থেকে যা স্মরণ ছিলো, তাই বললাম। এতো কেবল একটি ঘটনা, আরো হাজারো ঘটনা রয়েছে যা তাঁর প্রখর মেধার পরিচয় বহন করে। তাঁর সহচর ও আপনজনেরা তাঁকে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি বলে আখ্যায়িত করতো। আল্লামা ইকবালের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো এবং যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন-এ তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে আল্লামা ইকবাল বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

তাঁর মধ্যে ছিলো আধ্যাত্মিকতার চরম উৎকর্ষ। তাকওয়া ও পরহেজগারিতে তিনি ছিলেন বুজুর্গানে দ্বীনের অন্যতম, যেনো আকাশ থেকে ফেরেশতা নেমে এসেছেন। তিনি ছিলেন চিশতিয়া তরিকার অন্যতম মুর্শিদ। একবার একটানা ছয়মাস পর্যন্ত তিনি কাশ্মীরের পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। সে সময় তিনি চিশতিয়া তরিকা মোতাবেক আমল করতেন।

রচনাবলি : তাঁর লিখিত কিতাবগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলির সমাহার। তাঁর উল্লেখযোগ্য কতিপয় কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলো-

(১) فيض البارى بشرح صحيح البخارى (ফাইযুল বারি বি শরহে সহিহুল বুখারি।) এটি হযরত শাহ সাহেবের দরসে বুখারির অনুলিখন। যাঁকে হযরত মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী মুহাজেরে মাদানি কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় বিন্যস্ত করেন।

(২) العرف الشذى لشرح جامع الترمذى (আল আরফুশ্ শাযি লি শরহি জামেউত তিরমিযী।) এটি হযরত শাহ সাহেবের দরসে তিরমিযীর অনুলিপি। যেটি মাওলানা মুহাম্মদ চেরাগ সাহেব (গুজরাটের অধিবাসী) দরসে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত

হয়েছে। এটি হচ্ছে হাদিসসমূহের ওপর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা, প্রত্যেক বিষয়ে পূর্বসূরীদের উদ্ধৃতি এবং শাহ সাহেবের গবেষণালব্ধ একটি জ্ঞানভাণ্ডার।

(৩) انوار المحمود فى شرح سنن ابى داؤد (আনওয়ারুল মাহমুদ ফি শরহি সুনানে আবি দাউদ।) এটি সুনানে আবু দাউদের দরসের শ্রুতিলিখন। যাকে মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিক সাহেব নাসিরাবাদি সংকলন করে প্রকাশ করেছেন। এটি দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(৪) مشكلات القرآن কুরআনে কারিমের যে আয়াতে কারিমাকে জটিল মনে করেছেন, প্রশ্ন বা আপত্তি, ঐতিহাসিক বা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে হোক অথবা বিজ্ঞান বা যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে হোক কিংবা আরবি ভাষা ও অলঙ্কারশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে হোক, সেগুলোর ওপর তিনি নোট লিখেছেন। এ নোট খসড়া আকারে বিদ্যমান ছিলো। পরবর্তীতে 'মজলিসে ইলমি ঢাবেল' সেগুলোকে বিন্যস্ত করে প্রকাশ করেছেন।

(৫) فصل الخطاب فى مسئلة ام الكتاب (ফসলুল কিতাব ফি মাসআলাতি উম্মুল কিতাব) ইমামের পেছনে ফাতেহা পড়ার মাসআলা যা সাহাবায়ে কিরামের থেকে অদ্যাবধি একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়। এটি হচ্ছে তাঁর ১০৬ পৃষ্ঠার একটি বিশ্লেষণধর্মী পুস্তক।

(৬) خاتمة الخطاب فى فاتحة الكتاب (খাতিমাতুল খিতাব ফি ফাতিহাতিল কিতাব) ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়া সংক্রান্ত মাসআলার ওপর এটি ফার্সি ভাষায় তাঁর রচিত একটি পুস্তিকা। হযরত মাওলানা শায়খুল হিন্দ (রহ.) এর মতামতও এতে রয়েছে। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) স্বীয় মতামতে শাহ সাহেবের সুক্ষ্ম দৃষ্টির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

(৭) نيل الفرقدين فى مسئلة رفع اليدين (নাইলুল ফারকাদাইন ফি মাসআলাতি রফইল ইয়াদাইন।) এটি ১৪৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত তাঁর অনবদ্য রচনা। নামাযে রুকুর পূর্বে এবং পরে হাত উঠানোর বিষয়বস্তুর ওপর অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে তিনি আলোচনা করেছেন এ গ্রন্থে।

(৮) بسط اليدين لنيل الفرقدين (বাসতুল ইয়াদাইন লিনাইলিল ফারকাদাইন) এটি নাইলুল ফারকাদাইন এর পরিশিষ্ট একটি ছোট্ট পুস্তিকা।

(৯) كشف الستر عن صلوة الوتر (কাশফুস সতর আন সালাতিল বিত্‌রি) বিতরের মাসআলা সম্পর্কে উম্মতের মধ্যে যে মতানৈক্য চলে আসছে সেগুলোর তিনি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। ৯৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। এতে মূল পুস্তিকার এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

(১০) إكفار الملحدين فى ضروريات الدين (ইকফারুল মুলহিদিন ফি জরুরিয়াতিদ্ দীন) ১২৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ পুস্তিকাটিতে কুফর ও ঈমানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচিত হয়েছে।

(১১) عقيدة الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام (২২০ পৃষ্ঠার কলেবরে রচিত এ কিতাবটি হযরত ঈসা (আ.)-এর হায়াত সম্পর্কিত বিষয়ে রচিত। এ বিষয়ে কুরআনে কারীমের নির্দেশনা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

(১২) تحية الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام (তাহিয়্যাতুল ইসলাম ফি হায়াতি ঈসা আ.) ১৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ কিতাবটি উপরোল্লিখিত কিতাবের টীকার সংযোজন।

(১৩) التصريح بما تواتر فى نزول المسيح (আত তাসরিহ বিমা তাওয়াতুর ফি নুযুলিল মাসিহ) হযরত ঈসা (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণ সম্পর্কিত হাদিস এবং সাহাবায়ে কিরামের উক্তিসমূহ তিনি ব্যাপকভাবে তালাশ করে এ কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। এগুলোর সংখ্যা প্রায়ই একশর কাছাকাছি। এর ওপর মুফতি শফী (রহ.)-এর মূল্যবান ভূমিকাও রয়েছে।

(১৪) خاتم النبيين (খাতিমুন নাবিয়্যিন) এটি ৯৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত ফার্সি ভাষায় তাঁর লিখিত খতমে নবুয়তের আকিদা সংক্রান্ত একটি অনবদ্য রচনা।

(১৫) سهم الغيب فى كبد اهل الريب (সাহমুল গাইব ফি কাবদে আহলির রাইব) এটি ইলমে গাইবের আকিদা সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ।

সন্তান-সন্ততি: আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরির (রহ.) দুই পুত্রসন্তান রয়েছে- যথাক্রমে মাওলানা আযহার শাহ কাশ্মীরি ও মাওলানা আঞ্জার শাহ কাশ্মিরি (তিনি বর্তমানে দারুল উলুম দেওবন্দ 'ওয়াক্ফ'-এর শায়খুল হাদিস) কন্যাসন্তান- দু'জন। তন্মধ্যে একজন তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন।

ইন্তেকাল : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) ঢাবেলে জামেয়া ইসলামিয়ায় পাঁচ বছর অবস্থান করেন। সেখানে তিনি অধ্যাপনা ও লেখালিখিতে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর পরশে এ অঞ্চলটি ইসলামের নূরের জ্যোতিতে ভরে ওঠে। তিনি সেখানকার এক বিশেষ জনগোষ্ঠীকে করেছেন ইসলামের আলোতে আলোকিত। কিন্তু এক পর্যায়ে ঢাবেলের আবহাওয়া তাঁর জন্য প্রতিকূল হয়। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পুনরায় দেওবন্দ চলে আসেন। ধারণা করা হয়েছিলো আবহাওয়া পরিবর্তনে হয়তো তাঁর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হবে, কিন্তু তা হয়নি। ক্রমান্বয়ে অসুস্থতা বাড়তে থাকে। পরিশেষে ৩ সফর ১৩৫২ হিজরি সোমবার দিবাগত রাতে তিনি মাওলার সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ আসনে সমাসীন করুন। আমিন!

বিশিষ্ট কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল (রহ.) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন- ইসলামের শেষের পাঁচশত বছরের ইতিহাস মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরির (রহ.) নজির পেশ করতে অক্ষম। এমন উঁচুমাপের আলিম ও প্রাজ্ঞব্যক্তিত্ব আর সৃষ্টি হবে না। তিনি শুধু সকল ইলমের ধারক-বাহক ছিলেন না, বর্তমান সময়ে দ্বীনি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ছিল তীক্ষ্মদৃষ্টি। আমি জাদিদ ফিকহ সংকলনের জন্যে তাঁকে নির্বাচিত করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপও করেছিলাম। যে পদ্ধতিতে ফিকহের সংকলন আমার সামনে ছিল এর জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তি তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইসলামি বিশ্বে ছিলেন না।

দেওবন্দ থেকে আসার পর লাহোরে থাকার প্রস্তাব আমি তাঁর সামনে পেশ করেছিলাম। আমার এ প্রস্তাব তিনি একপ্রকার গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু গুজরাটবাসীর পীড়াপীড়িতে তিনি ঢাবেল তাশরিফ নিয়ে যান, ফলে সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দুর্ভাগ্যবশত আর পূর্ণতা লাভ

করেনি। এখন আমার অন্তর নিরাশায় ছেয়ে গেছে। কারণ এ মহান কাজের জন্যে কোন আস্থাভাজন ব্যক্তি আমার নজরে আসছে না।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) হযরত খলিল আহমদ সাহারানপুরীর পাশাপাশি আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরির এতো বেশি ভক্ত ছিলেন যে, তাঁর তিরমিযী শরিফের উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থে জায়গায় জায়গায় তাঁর বারবার حوالہ দিয়েছেন এভাবে–

شاہ صاحب نے کہا، شاہ صاحب نے یہ ذکر کیا ইত্যাদি।

প্রথম কর্মস্থল দারুল উলুম কুদসিয়া কোলকাতা আকড়া সিনিয়র মাদরাসায় যোগদান

মাযাহির উলুম সাহারানপুরে অধ্যয়নকালীন তাঁর শিক্ষকদের নিকট সহপাঠীদের থেকে যাঁরা স্বতন্ত্র বিবেচিত হতেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। পরম করুণাময় রাব্বুল আলামিন তাঁকে দান করেছিলেন প্রখর মেধা, প্রজ্ঞা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, হামদর্দি ও তাকওয়া তথা খোদাভীতির সুমহান গুণাবলী। সর্বোপরি তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের মূর্তপ্রতীক। তাই শিক্ষকমণ্ডলীর ছিল তাঁর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। মাযাহির উলুম সাহারানপুরে অধ্যয়নকালীন ১৯২২ সালের শেষের দিকে কলকাতার আলিপুরস্থ দারুল উলুম কুদসিয়া আকড়া সিনিয়র মাদরাসা হতে একজন হেড মাওলানা চেয়ে কর্তৃপক্ষ থেকে একটি চিঠি আসে মাযাহির উলুম সাহারানপুর'র মুহতামিমের কাছে। মুহতামিম সাহেব এবং তাঁর সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী বিশেষ করে হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী তাঁর অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তা বিবেচনায় এনে দারুল উলুম কুদসিয়া আকড়া সিনিয়র মাদরাসার হেড মাওলানার দায়িত্ব প্রদানপূর্বক তাঁকে সেখানে প্রেরণ করেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। এক বছর তিনি হেড মাওলানার দায়িত্ব পালন করেন অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠানে। তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা ও মেধার কথা বিবেচনা করে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে সুপারিনটেনডেন্ট পদে পদোন্নতি দেন। পরবর্তীতে তাঁর প্রচেষ্টা এবং খান সাহেব ওয়াসেল মোল্লার সহযোগিতায় মাদরাসা আলিয়ায় উন্নীত হলে তিনি অধ্যক্ষ-মুহাদ্দিসের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকে মাদরাসার সার্বিক উন্নয়ন এবং ছাত্রদের পড়ালেখার মানবৃদ্ধিকল্পে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন।

দারুল উলুম কুদসিয়া কোলকাতা আকড়া সিনিয়র মাদরাসায় কর্মজীবন

আকড়া একটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম। কোলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত এ গ্রামটি মূল শহর হতে মাত্র ১৩ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। শিল্প এলাকার কাছেই। আকড়া মাদরাসার পার্শ্বেই আকড়া রেলস্টেশন। শিয়ালদাহ হতে আকড়া লোকাল ট্রেন আছে। আর ৫৫৯ বি নং নামে ধর্মতলা হতে আকড়া যাওয়া যায়। এর উত্তরে হুগলি নদী, পূর্বে সন্তোষপুর। বিখ্যাত ব্যবসায়ী খান সাহেব ওয়াসেল মোল্লার বাড়ি এ সন্তোষপুরেই। পশ্চিমে বজবজ রেলস্টেশন। শিয়ালদাহ হতে পশ্চিম দক্ষিণে শেষ স্টেশন বজবজ। এর দু' স্টেশন পূর্বে আকড়া রেলস্টেশন। ডাকঘর ও থানা মহেশতলা, জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। আকড়া, চৌধা এবং মিডিয়াপুর (মিডিয়াপুর নবাব ওয়াজেদ আলির এলাকা) মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা, এখানে যথাক্রমে ৬০%, ৮০% এবং ৯০% মুসলমান এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অত্যন্ত চমৎকার[১]। এ গ্রামের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এটি চুনতির কথা মনে করিয়ে দেয়। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) প্রথম কর্মস্থল আকড়া মাদরাসা এবং শেষ কর্মস্থল চুনতি মাদরাসা। এ দু'টি গ্রামের যোগসূত্র হলো চুনতিতে পাশাপাশি রয়েছে আলিয়া মাদরাসা, মহিলা মাদরাসা, হাইস্কুল ও প্রাইমারি স্কুল,

---

[১]. তথ্যসূত্র: মুহাম্মদ সফিউদ্দিন মোল্লা

বিশাল বাইতুল্লাহ মসজিদ তদ্রূপ আকড়াতে পাশাপাশি অবস্থান করছে সিনিয়র মাদরাসা, হাই মাদরাসা, গার্লস হাই মাদরাসা, প্রাইমারি স্কুল, মা ও শিশু হাসপাতাল এবং ওয়াসেল মোল্লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশাল জামে মসজিদ। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি হাইস্কুলে একজন আরবি ও ইসলামিয়াতের শিক্ষক থাকা আবশ্যক। এখানেও আকড়া সিনিয়র মাদরাসার ছাত্ররা ঐ শিক্ষকের স্থান দখল করে আছে, চুনতি মাদরাসার পাশকরা ছাত্রদের মতো।

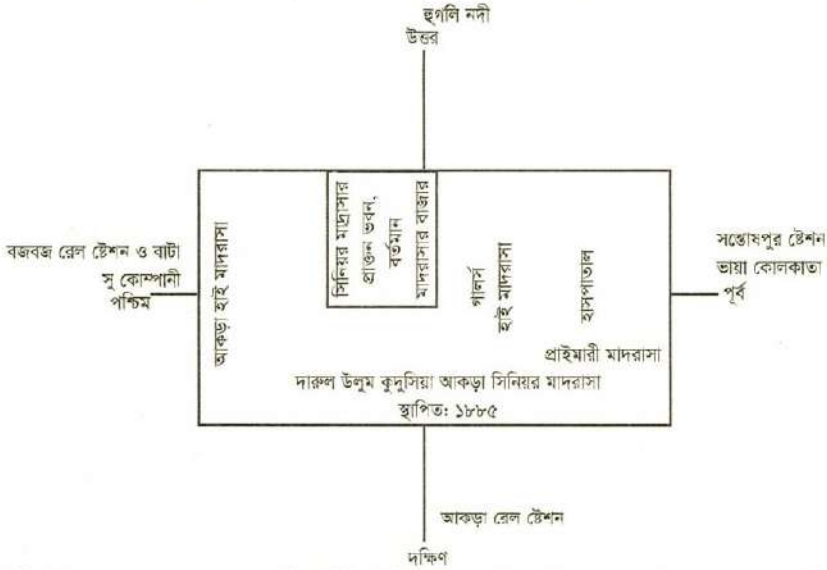

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার স্ক্যানিং স্ট্রিট নিবাসী নবাব আবদুস সাত্তার কোন এক উপলক্ষে আকড়া এসে দেখেন মুসলিম অধ্যুষিত এ এলাকায় ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার কোনো ব্যবস্থা নেই। অথচ কোলকাতা তখন শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছোট লাট হ্যালিডের সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন জেলায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব আবদুস সাত্তার এতে ব্যথিত হন এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে আকড়া স্টেশন সংলগ্ন কিছু জায়গা কিনে জনৈক হাফিজ আবদুল্লাহকে প্রধান করে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের দেখাশোনার সার্বিক দায়িত্ব নবাব আবদুস সাত্তার মাগুরা নিবাসী ড. খোদা বক্সকে প্রদান করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এটি সিনিয়র মাদরাসায় উন্নীত হয়।

এর মধ্যে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে একই ভবনে আরও একটি জুনিয়র মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ এ এটি হাই মাদরাসায় উন্নীত হয়। সিনিয়র মাদরাসাটিতে দেওবন্দ সাহারানপুরের নেসাবে শিক্ষাদান চলে এবং হাই মাদরাসা অবিভক্ত বাংলার ঢাকা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হতে থাকে। বর্তমানে সিনিয়র মাদরাসাটিও কোলকাতাস্থ পশ্চিমবঙ্গ মাদরাসা শিক্ষা পর্ষদের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। মাদরাসা দু'টির উন্নতি ও সমৃদ্ধির পেছনে খান সাহেব ওয়াসেল মোল্লার অকুণ্ঠ দান ছিলো।

আকড়া স্টেশনের ২/৩ কি.মি. দূরত্বে সন্তোষপুর গ্রাম। এ গ্রামে ১৮৭৫ সালে ওয়াসেল মোল্লা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারা বাংলা এবং ভারতবর্ষের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান ও চীনে রপ্তানি ব্যবসা করতেন। কোলকাতায় ধর্মতলা স্ট্রিটে (এসপ্লানেড এ) তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশাল 'ওয়াসেল মোল্লা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স' এখনো কালের সাক্ষী হয়ে

আছে। এখান থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সহ অনেকেই কেনাকাটা করেছেন। The Sunday Statesman পত্রিকা তার সাক্ষী বহন করছে। কোলকাতার লেনিন সরণীতে ১৯ কাঠা জমির ওপর তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশালাকৃতির ৫ তলা ভবন এখনো পুরনো ঐতিহ্যের সাক্ষ্য হয়ে আছে। তারাতালায় অবস্থিত 'মোল্লার গেট'ও তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন বড়মাপের দানশীল ও সমাজসেবক। এজন্য তিনি পেয়েছেন বহু পদবী, উপাধী ও মেডেল। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ইংরেজ গভর্নরের কাছ থেকে তিনি সমাজসেবা ও দানশীলতার স্বীকৃতিস্বরূপ 'খান সাহেব' উপাধীতে ভূষিত হন।

সিনিয়র ও জুনিয়র মাদরাসা একই ভবনে কিছুকাল চলার পর জনাব ওয়াসেল মোল্লা মাদরাসার পাশ্ববর্তী জমিগুলি কিনে মাদরাসার জন্যে দান করে দেন। এ জমিতে দু'টি মাদরাসার জন্য পৃথক দু'টি ভবন তৈরি হয় ও মার্কেট তৈরি হয়। এগুলোর সংরক্ষণ, পরিচালনা এবং মাদরাসার ব্যয় বহনের জন্য গঠিত হয় নবাব আবদুস সাত্তার ও ওয়াসেল মোল্লা ট্রাস্ট। এর সেক্রেটারি নিযুক্ত হন ওয়াসেল মোল্লা, চেয়ারম্যান মনোনয়নের বিধান রাখা হয় বাইরের কোন শিক্ষানুরাগীকে। ট্রাস্টের আয় হতে ৫৫% অর্থ সিনিয়র এবং ৪৫% অর্থ জুনিয়র বর্তমান হাই মাদরাসার জন্য ব্যয় করা হতো।

এই প্রসিদ্ধ দারুল উলুম কুদসিয়া আকড়া সিনিয়র মাদরাসায় ১৯২৩ সালে যোগদান করেন আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)। মাযাহির উলুম সাহারানপুর থেকে তিনি যখন পাশ করেন তখন আকড়া সিনিয়র মাদরাসার জন্য একজন হেড মাওলানা চেয়ে চিঠি দেয়া হয় উক্ত সাহারানপুর মাদরাসায়। অন্যদিকে জাপানের টোকিও জামে মসজিদের জন্য একজন খতিব চেয়ে চিঠি আসে। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরীসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ আল্লামা ফজলুল্লাহকে এ দু'টি থেকে কোনটি গ্রহণ করবেন জানতে চাইলে ব্যাপক আর্থিক সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাতে ইলমচর্চার ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত নয় বিধায় তিনি আকড়ার কর্মক্ষেত্রটা বেছে নেন এবং ১৯২৩ সালে আকড়া মাদরাসায় যোগদান করেন। তখন উক্ত মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করছিলেন মাওলানা আয়ুব আযমগড়ী। এখানে তিনি ১৯২৩-১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১ম বছর হেড মাওলানা পরবর্তী বছর আযমগড়ী সাহেব বিদায় নিলে নিজ যোগ্যতাবলে উক্ত মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট-মুহাদ্দিস এর পদে অধিষ্ঠিত হন। সুপারিনটেনডেন্ট-মুহাদ্দিস পদে থেকে তিনি মাদরাসার ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন, মাদরাসার সুখ্যাতি সারা বাংলা-ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং এটিকে আলিয়া মাদরাসায় উন্নীত করেন। কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না থাকায় আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা' স্মারকগ্রন্থে তাঁর কর্মময় জীবনের এ ব্যাপক অংশটা ইতিহাসচ্যুত হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) কনিষ্ঠ পুত্র ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন বলেন, তাই অক্টোবর'০৪ ভারত সফরকালীন আমি আকড়ার অবস্থান সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আসি। এ লক্ষ্যে আমার অগ্রজ অধ্যাপক ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নিজামুদ্দিন নদভী এমপির পরামর্শে আমি এবং সাংবাদিক শাব্বির সাহেব ২২ মে' ০৫ রবিবার আকড়ার উদ্দেশ্যে কোলকাতা রওয়ানা হই।

২৪.০৫.০৫ সকাল ৯.৩০টায় আমরা আকড়া রওয়ানা হই ট্যাক্সিক্যাব নিয়ে। আকড়া রেলস্টেশন সংলগ্ন বাজারে এক দোকানে পাকা শ্মশ্রুমণ্ডিত একজন বৃদ্ধ থেকে মাদরাসার অবস্থান জানতে চাইলে তিনি আমাদেরকে মাদরাসায় নিয়ে আসেন। মাদরাসার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। নাম আসগর আলি, জন্ম ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ, গ্রাম কৃষ্ণনগর, আকড়ার

পাশেই। পেশা টেইলারিং। সেখানে তাঁর বিশাল টেইলারিং শপ তিনি চট্টগ্রামের স্টেশন রোডে ১৯৪৮-১৯৫২ এবং এরপর ২ বছর ঢাকায় উক্ত পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) সম্পর্কে তিনি বলেন, তাঁর নাম এখন আর মনে নেই। তবে চট্টগ্রামের মাওলানা ফজলুল্লাহ একজন দক্ষ আলিম এবং সুপরিচিত পরিচালক ছিলেন এবং তাঁর সময়ে বাংলাদেশের প্রচুর ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করতো। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা এবং দক্ষ প্রশাসনের কথা এখনো মনে আছে। কারণ ১৯৪২ এর শেষের দিকে যখন তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন তখন আমি ২০ বছরের টগবগে যুবক। তাঁর সময়ে মাদরাসার সব ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন হয়েছিল এবং সুনামের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। তাছাড়া তিনি এখান থেকে চলে যাওয়ার পরও অনেক বছর তিনি এখানে সর্বত্র আলোচিত বিষয় ছিলেন। এছাড়াও এদেশের অনেক বড়ো বড়ো আলেম এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য আসতো এতটুকু মনে আছে।

আসগর আলিকে নিয়ে মাদরাসায় যাই। নীচ তলায় অফিস ও শিক্ষক মিলনায়তন। বর্তমানে সিনিয়র মাদরাসা ভবন দ্বিতল বিশিষ্ট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০ ফুট হবে। পাশে সংযুক্ত মাদরাসা মার্কেট, উত্তর-পশ্চিম কোনে মাদরাসার বাজার, মার্কেটের ২য় তলায় নবাব আবদুস সাত্তার ও ওয়াসেল মোল্লা ট্রাস্ট অফিস।

মাদরাসায় আমরা ভারপ্রাপ্ত সুপারিন্টেন্ডেট মাওলানা গোফরান আলি ও অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম বর্তমান মাদরাসার ভবনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের। বাজারটির স্থানে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মাদরাসার বিশাল বিশাল ভবন ও হোস্টেল ছিলো। ২য় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে এগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে গেলে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলে বর্তমান দালান তৈরি করা হয়। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অধ্যক্ষ থাকাকালীন কোন ফাইলপত্র, নোটিশ বুক বা তাঁর কোনো অফিসিয়াল ডকুমেন্ট বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। অবশিষ্ট যা ছিলো সেগুলো হারিয়ে যায় ১৯৪৭ এর দেশ বিভক্তির সময়। অর্থাৎ ১৯৪৭ এর পূর্বের কোন অফিসিয়াল ডকুমেন্ট আমরা পাইনি। তবে ২০০০ সালে অবসর গ্রহণকারী নিশাপুর[১] নিবাসী মাওলানা ইরফান আলিকে সকলেই চিনেন। তাঁর পূর্ববর্তী অন্য কোন পরিচালকের নাম না জানলেও আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) নামে চট্টগ্রামের একজন প্রসিদ্ধ আলেম আকড়া মাদরাসার পরিচালক ছিলেন তা মধ্যবয়স্ক প্রায় সকল শিক্ষকই শুনেছেন এবং জানেন। তাঁরা এবং হাই মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত হেড মাস্টার শেখ মুহাম্মদ নুরুদ্দিন জানান যে, সে সময় কোলকাতা আলিয়ার মতো বরং আরো বেশি বাংলাদেশী ছাত্র এখানে পড়ালেখা করেছেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি চলে যাওয়ার পর থেকে সেই জোয়ার আর থাকেনি। বর্তমানে মাদরাসার সিলেবাস সরকারি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মত। ১৯৭৫-৭৬ এর দিকে মাদারাসা W.B. মাদরাসা শিক্ষা পর্ষদের অনুদানভুক্ত হলে তাফসির, হাদিস, হেদায়া, শরহে বেকায়াহ, কাফিয়া, হিদায়াতুন্নাহু, মু'খতারাত, আল কিরাআতুর রাশেদা, কসিদা বুরদাহ ছাড়াও বাংলা, ইংরেজি, সমাজ, ভূগোল, ইতিহাস এবং গণিত পড়ানো হয়। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৩শত এর মধ্যে ৯ শতের মতো ছাত্রী।

খান সাহেব ওয়াসেল মোল্লার সহযোগিতা এবং আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) দক্ষ পরিচালনায় সে সময়ে অ্যাকাডেমিক এবং আর্থিক দিক দিয়েও সিনিয়র মাদরাসার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয় এবং মাদরাসা আলিয়া পর্যন্ত উন্নীত হয়ে ব্যাপক সুনাম অর্জন করে। তিনি সেখানে কর্মরত

---

[১]. ডায়মন্ড হারবার থেকে ২ কি.মি. পূর্বে।

থাকাকালীন আরব বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের আগমন হতো এবং তাঁদের জন্য সংবর্ধনাপত্র তাঁকেই রচনা করতে হতো। দারুল উলুম কুদসিয়ার সেসময়কার হেড মাওলানা ইয়াসিন সাহেব[১] ও সহকারী হেড মাওলানা আবদুর রহিম সাহেব উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌর নাগরিক উর্দুভাষী এবং জাঁদরেল আলেম ছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁরা আল্লামা ফজলুল্লাহকে সংবর্ধনাপত্র রচনার জন্য অনুরোধ করে বলতেন আমরা উর্দুভাষী হলেও আপনার উর্দু, আরবি, বাংলা, ফার্সি সব ভাষাতেই অতুলনীয় দক্ষতা এবং চিত্তাকর্ষক লিখনী। তাঁর সংবর্ধনাপত্র অথবা স্বাগতিক কবিতা শোনার পর তাঁরা তাঁর উচ্চসিত প্রশংসা করতেন এবং মাদরাসায় বড়ো বড়ো অনুদান দিতেন। আকড়ায় দায়িত্ব পালনকালীন কলকাতায় একবার সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ ফয়সলের ভাই হেজাযের গভর্নর হাদীর আগমন উপলক্ষে কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) আরবি ভাষায় একটি সুদীর্ঘ সংবর্ধনাপত্র রচনা করেন এবং অনুষ্ঠানে তিনি নিজেই পাঠ করেন। এটা শ্রবণান্তে গভর্নর বিমোহিত ও অভিভূত হন। এরপর তিনি তাঁর বক্তব্যে আল্লামা ফজলুল্লাহকে 'ফজিলতুশ শায়খ' সহ বিভিন্ন সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, অনারবের এমন একটা অঞ্চলে এতো উঁচুমানের আরবি সাহিত্যিক থাকতে পারে এটা ভাবতে অবাক লাগে। আমি রিপোর্ট করার সময় মহামান্য বাদশাহকে এটি দাখিল করবো তিনি অবশ্যই আনন্দিত হবেন। আরো একটি বিষয় সেখান থেকে জানা যায় যে, আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) আকড়া মাদরাসায় কর্মরত থাকাবস্থায় সেখানে বেশ ক'জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে নিজস্ব অর্থায়নে পড়াশোনা করান আবার অনেককে অন্য ধনী লোকদের মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেন। যে কারণে ২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন তিনি ২০ বছর কর্মরত থাকার পর দেশে ফিরে এলেও তাঁকে পুনরায় আকড়ায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য ওয়াসেল মোল্লার নির্দেশে তাঁর ছেলেসহ দু'জন লোক আল্লামা ফজলুল্লাহর বাড়িতে এসে ৭দিন অবস্থান করে তাঁকে কোলকাতায় নিয়ে যান।

তাঁকে আকড়া ফিরিয়ে নিতে কে কে বাংলাদেশে এসেছিলেন এ বিষয়ে জানার জন্য আমরা ওয়াসেল মোল্লা ট্রাস্টে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক জনাব আবদুল গফুরের সাথে কথা বলি। "তিনি জানান তাঁর জন্ম ১৯৩০ সালে। ১৯৪৩ সালে তাঁর বয়স ১৩ বছর প্রায়। তাই তাঁর কিছু মনে পড়ছে না। তবে যেহেতু আমি ট্রাস্টের দায়িত্বে আছি একথা ভালোভাবে জানি এবং বহুদিন শুনেছি যে, বাংলাদেশের একজন দক্ষ আলিম এ মাদরাসার পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর দক্ষতা, জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্যের বিষয়ে আমরা বয়োজ্যেষ্ঠ আলেম ও শিক্ষিত লোকজনদের কাছ থেকে বহু বছর যাবৎ শুনেছি।" এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমরা ধর্মতলায় ওয়াসেল মোল্লা ম্যানসনে গিয়ে তাঁর কনিষ্ঠ ছেলে জনাব শফিউল হক মোল্লার সাথে কথা বলি। এখানে যেতে এবং অন্যান্য বিষয়েও আমাদের সর্বক্ষণ সহযোগিতায় ছিলেন সিনিয়র মাদরাসার দু'শিক্ষক সাইফুদ্দিন মোল্লা বিএসসি এবং সফিউদ্দিন মোল্লা বিএসসি।

জনাব শফিউল হক মোল্লা জানান, ১৯৪৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর পিতা বেঁচে নেই। তারপরও তিনি মাদরাসার সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত বলে তাঁর অনেক তথ্য জানা আছে। তিনি জানান বর্তমানে তাঁরা দু'ভাই জীবিত। যিনি বাংলাদেশে আল্লামা ফজলুল্লাহকে (রহ.)

---

[১] *বাংলাদেশের স্থপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ. -এর এ সহকর্মী প্রসঙ্গে বলেন, "... পরে কান্দুলিয়া ক্যাম্প খোলা হল। এতে প্রায় দশ হাজার লোকের জায়গা হবে। আমি এই ক্যাম্পের নাম দিলাম 'হিজরতগঞ্জ'। মওলানা ইয়াসিন নামটা গ্রহণ করলেন এবং খুশি হলেন।..." তথ্যসূত্র: অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান, পৃ. ৭০।*

আনতে যান তাঁদের সবার বড়োভাই জনাব কবিরুদ্দিন মোল্লার সাথে অন্য একজন স্থানীয় লোক ছিলেন। তিনি মাদরাসার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর পিতার নির্দেশেই তিনি সেখানে যান। তিনি ১৯৯৫ সালে ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে তাঁর কবর। ১৯৪৫ এর পরে তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নেন এবং ব্যাপকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। নারায়ণগঞ্জের প্রসিদ্ধ সিটি হুসিয়ারি ফ্যাক্টরি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সাথে সাক্ষাত পেলে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) সম্পর্কে সকল তথ্য (আকড়া সম্পৃক্ত) দু'কারণে পাওয়া যেতো। প্রথমত: ১৯৪২ সালে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) আকড়া থেকে বিদায়ের সময় কবিরুদ্দিন মোল্লার বয়স ৩৭ বছর। দ্বিতীয়ত: তিনি মাদরাসার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। জনাব শফিউল হক মোল্লা থেকে আরো জানা যায় যে, মাদরাসায় পূর্বকার সে ঐতিহ্য এখন আর নেই। বর্তমানে কোন হোস্টেলও দেখা যায়নি। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) আমলে হোস্টেলে জমজমাট অবস্থা ছিলো বলে আমরা সেখানকার বয়োঃজ্যেষ্ঠ ও শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনেছি।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) পরবর্তী ৩ জন সুপারের নাম বলতে পেরেছেন ২০০০ সালে অবসর গ্রহণকারী নিশাপুর নিবাসী মাওলানা ইরফান আলি। তিনি বলেন, দেশ বিভক্তির পূর্বের তেমন কোনো ফাইলপত্র, খাতা আমি পাইনি। কিছু কিছু কাগজপত্র দেখেছি নষ্টাবস্থায়। সেখান থেকে এবং পূর্বের সুপারিনটেনডেন্টদের কাছেও আল্লামা ফজলুল্লাহ সম্পর্কে জেনেছি। বাংলাদেশের মাওলানা ফজলুল্লাহ নামে বড়মাপের একজন আলেম অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন শুনেছি। তখন সেখানকার ছাত্র এখানেই বেশি পড়াশোনা করতো। এরপর পরবর্তী (সন অজানা) হাওড়ার মাওলানা আবু সালেহ শামসুল আলম, আকড়ার মাওলানা আবদুল মান্নান, ভূপালের মাওলানা ওলিউল্লাহ আকড়া সিনিয়র মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য যে, হাশেমিয়া আলিয়া মাদরাসা কক্সবাজারের সাবেক রেক্টর মাওলানা মুযহির আহমদ এর আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) স্মারকগ্রন্থে লিখিত প্রবন্ধে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) আকড়া মাদরাসায় থাকাকালীন কোলকাতা আলিয়ায় যেতেন উস্তাদ-ছাত্রদের সাথে আলাপ করতে। মাওলানা মুযহির তখন কোলকাতা আলিয়ার ছাত্র ইলিয়ট হোস্টেলের ৪১নং কক্ষে থাকতেন। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) সে কক্ষে বসে তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন অনেকবার। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) আকড়া মাদরাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকালেও বহু শিক্ষা ও সেবামূলক কর্মে তৎপর ছিলেন। তিনি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির মেম্বার ছিলেন এবং কলকাতা আলিয়ার শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের সদস্যও ছিলেন। সে নিয়োগ কমিটিতে খাজা নাজিমুদ্দিনও উপস্থিত থাকতেন।[১]

ওয়াসেল মোল্লার জন্ম: ১৮৭০ খ্রি.-এর দিকে; মৃত্যু: ১৯৪৫ খ্রি.-এর দিকে।

মাওলানা ইরফান আলি আকড়া কুদসিয়া মাদরাসা টিকিয়ে রাখতে সহশিক্ষা (Co-education) চালু করেন। বর্তমানে সেখানে দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্রী।[২]

---

[১] (সূত্র: মরহুম প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ, সাবেক ডিন, কলা অনুষদ, চবি এবং সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চবি।)।

[২] তথ্যসূত্র: সাইফুদ্দিন মোল্লা

চুনতি মাদরাসায় আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) যোগদান

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিবেশে তাঁর কোলকাতায় অবস্থান কোনভাবেই সম্ভব ছিলো না, তাই তিনি ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময় কোলকাতা ছেড়ে চলে আসেন নিজ বাড়িতে।

১৯৪৩ সালে খান সাহেব ওয়াসেল মোল্লার নির্দেশে তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান কবিরউদ্দিন মোল্লা স্থানীয় একজন লোক সহকারে বাংলাদেশে আল্লামা ফজলুল্লাহর বাড়িতে আসেন এবং এক সপ্তাহ অবস্থান করে পুনরায় আল্লামাকে সাথে নিয়ে যান। তিনি আকড়া মাদরাসায় কর্মরত থাকা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তিন মাস পর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে দেশে চলে আসেন। কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দেড় বছর পর তিনি পুরোপুরি সুস্থ হন। তাঁর বাড়িতে অবস্থান এবং সুস্থতার সংবাদ জেনে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কওমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া এবং সুবহানিয়া আলিয়া মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানালে তিনি সম্মতি দেননি। যদিওবা জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া ও এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতি আযীযুল হক (রহ.) এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো এবং উক্ত মাদরাসার লাইব্রেরির জন্যে আল্লামা ফজলুল্লাহ ইমাম রাযি রহ.-এর 'তাফসিরে কবির'সহ বহু কিতাবাদি হাদিয়া প্রদান করেন।

অবসরের এ সময় তিনি রচনা করেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি। অবশ্য মাঝে কয়েক বছর তিনি পদুয়া হেমায়তুল ইসলাম মাদরাসার পরিচালক এবং সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৩ সালে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার পরিচালনা পর্ষদ এবং অত্র মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ (তোলাবায়ে সাবেকীন) পরস্পর পরামর্শ করে চুনতি মাদরাসার শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ 'নাযেমে আলা' (মহাব্যবস্থাপক/শীর্ষ নিয়ন্ত্রক) নামে নতুন পদ সৃষ্টি করে দ্বিতীয় বারের মতো তাঁকে চুনতি মাদরাসার নাযেমে আলার দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জ্ঞাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ফলে ১৯৬৩ সালে মাদরাসায় একটি বিরাট মাহফিলের আয়োজন করে তথায় তাঁকে সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে এ দায়িত্ব অর্পণ করা হলে তিনি এতে সম্মতি প্রদান করেন। এভাবে পুনরায় তিনি চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসার নাযেমে আ'লার পদে অধিষ্ঠিত হন। এ গুরুদায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি মাদরাসার অ্যাকাডেমিক উন্নতি ও আর্থিক স্বচ্ছলতা আনার জন্যে গ্রহণ করেছিলেন এক মহাপরিকল্পনা। পরবর্তীতে এ পরিকল্পনা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের একটি খ্যাতিমান ও শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে।

১৯৭০ সালের শুরুতে শাহ হাফেজ আহমদ (রহ.) এর একান্ত আগ্রহ ও সহায়তা, নাযেমে আলা আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) উর্বর চিন্তা ও নিরলস প্রচেষ্টা এবং পরিচালনা পর্ষদের সহযোগিতায় প্রথমবার অত্র মাদরাসায় কামিল (হাদিস) ক্লাসের শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং শাহ হাফেজ আহমদ (রহ.) নাযেমে আলা সাহেবকে কামিল শ্রেণিতে পাঠদানের অনুরোধ করেন। তবে দেশে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কামিল শ্রেণির কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ১৯৭৬ সালে কামিল শ্রেণির কার্যক্রম শুরু হয়ে ১৯৭৭

সালের জুলাইয়ে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭৭ সাল হতে ইন্তেকাল পর্যন্ত শাহ হাফেজ আহমদ (রহ.) মাদরাসার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

এ সময় চুনতি মাদরাসা শিক্ষা-দীক্ষা ও তাহযিব-তামাদ্দুনের দিক দিয়ে এক শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশব্যাপী বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ইসলামি সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তাঁর সময়; তাঁরই রচিত নাটক সে সময় মঞ্চায়িত হতো মাদরাসায়। মাদরাসার শিক্ষক, ছাত্র ও আপামর জনসাধারণের নিকট এসব নাটক খুবই প্রশংসিত হতো। তখনকার সময় তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম (রহ.), মাওলানা আবদুল বারী (রহ.), মাওলানা মীর গোলাম মোস্তাফা (রহ.), মাওলানা আইয়ূব খান (রহ.), মাওলানা মুজাফ্ফর আহমদ (রহ.) হেড মাওলানা, মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (রহ.) (মুহাদ্দিস), মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ (রহ.) (মুহাদ্দিস), মাওলানা আবদুল হাই নিজামী (মুহাদ্দিস) এবং মাওলানা কামাল উদ্দিন মুসা খতিবী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ মুসা (জিরি), মাওলানা আমিন খান রিজভী, মাওলানা নেসারুল হক (নাজিরহাট), প্রফেসর ড. মাওলানা আবু বকর রফিক (অধ্যক্ষ) প্রমুখ।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ (রহ.) (মুহাদ্দিস), বিশিষ্ট ওয়ায়েজ মাওলানা মুবারক আহমদ (রহ.), মাওলানা আবুল কাসেম (রহ.), মাওলানা আবদুর নূর সিদ্দিকী (রহ.), প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ, প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী (রহ.), মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মিয়া মুহাম্মদ জয়নুল আবেদিন, তিনি তাঁর কাছে 'উসূলুশ শাশি' পড়েছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক ডাইরেক্টর আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারিক, ভারতবর্ষের ইতিহাসবিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রথম মহাপরিচালক ড. মুঈনউদ্দিন আহমদ খান তাঁর কাছে বিশেষভাবে 'নুরুল আনওয়ার' পড়েছেন। মাওলানা সিরাজুল আরেফিন, ড. বদরুদ্দোজা, ড. আবু ওমর ফারুক আহমদ, ড. মাওলানা ঈসা শাহেদী, ড. মাওলানা আ.ফ.ম. খালিদ হোসাইন, অধ্যক্ষ ডা. মাওলানা হাবীবুল্লাহ (রহ.), প্রফেসর ড. আহসান উল্লাহ (আহসান সাইয়েদ) (ভিসি, ইআবি), প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি ও চট্টগ্রাম ওয়াসার সাবেক সচিব মাওলানা ওবাইদুল্লাহ প্রমুখ।

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) খ্যাতনামা ছাত্রবৃন্দ

শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (রহ.)

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানাধীন বাবুনগর গ্রামে ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় গ্রামে কুরআন মজিদ, নামাজ শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং উর্দু ও ফারসি বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর কুরআনের ওস্তাদ মাওলানা মরহুম বদিউর রহমান মিয়াজীর সহায়তায় গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন। যদিও মাওলানা মুহাম্মদ আমিনের পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ছিলো অস্বচ্ছল। কিন্তু আল্লাহর রহমত তাঁকে অভীষ্ঠ লক্ষে পৌঁছার পথ সুগম করে দেন। কবির ভাষায়–

"অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বিকাশের জন্য আমার চিরুণী দ্বারা মাথা আঁচড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা লালা ফুলের সৌন্দর্য স্বয়ং আল্লাহই দান করেছেন।"

তিনি এমন এক শ্রদ্ধাভাজন এবং দয়াপরায়ণ অভিভাবক পেয়ে যান, যাঁর দৃষ্টান্তহীন পিতৃসুলভ স্নেহভাজনতা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। ফলে তিনি সব ধরনের দুঃশ্চিন্তামুক্ত হন। কারণ তাঁর দায়-দায়িত্বের পূর্ণ তত্ত্বাবধায়ক যাঁকে পেয়ে যান তিনি হলেন আলিমকুল শিরোমনি বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারি আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)। তাঁর স্নেহছায়ায় শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ আমিন ১৯৩৮ হতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সাতকানিয়া মাহমুদুল উলুম আলিয়া সিনিয়র মাদরাসা, কোলকাতার খ্যাতনামা দ্বীনি প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম আকড়া কুদসিয়া মাদরাসা এবং চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। ১৯৪৪ সালে এই মাদরাসা হতে আলিম ফাইনাল পরীক্ষায় অবিভক্ত বাংলায় তিনি নবম স্থান অধিকার করেন এবং সরকারি স্কলারশিপপ্রাপ্ত হন। ১৯৪৬ সালে একই মাদরাসা হতে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ১৯৪৭ সালে ইলমে হাদিসের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় দ্বীনি বিদ্যাপীঠ ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদিসে ভর্তি হন। মাওলানা মুহাম্মদ আমিন ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের কৃতী ছাত্রদের অন্যতম। দাওরায়ে হাদিসের ফাইনাল পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান আধিকার করে বাংলাদেশের জন্য বয়ে আনেন খ্যাতি ও গৌরব। তাঁর প্রখর মেধা, স্মরণশক্তি ও তেজোদ্দীপ্ত প্রতিভা ছিলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এক বিশেষ দান। সর্বোপরি অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস অধ্যবসায়ের জন্য তিনি সকলের নজর কেড়েছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দের যে সকল বিশ্ববরেণ্য ওস্তাদবৃন্দের কাছে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উস্তাজুল আরব ওয়াল আজম খ্যাত শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানি (রহ.), শায়খুল আদব ওয়াল ফিকহ হযরত মাওলানা ইযায আলি (রহ.) এবং উস্তাজুল মা'কুলাত হযরত মাওলানা ইবরাহিম বলইয়াভী (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে সনদপ্রাপ্ত হয়ে শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (রহ.) উপমহাদেশের প্রখ্যাত দ্বীনি বিদ্যাপীঠ নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌতে গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাঁর শ্রদ্ধাভাজন পিতৃতুল্য ওস্তাদ হযরতুল আল্লামা ফজলুল্লাহ

(রহ.) তাঁকে দেশে ডেকে পাঠান। দেশে ফিরে এসে ১৯৫০ সালে দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামিল (তৎকালীন সিনিয়র মাদরাসা) পরবর্তীতে কামিল মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। যোগদানের পর হতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১১ বছর এই প্রতিষ্ঠানে একজন সফল শিক্ষকস্বরূপ কর্মরত ছিলেন। ১৯৬১ সালের পর ১৯৬৩ পর্যন্ত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম এ হেড মাওলানা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৮ বছর চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার পর ১৯৯৩ সাল হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসায় শায়খুল হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি চট্টগ্রামস্থ পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া কামিল মাদরাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তাঁর ৭৯ বছর মহিমাময় জীবনের ৫৪ বছর নিয়োজিত ছিলেন শিক্ষকতার মহান পেশায়। তাঁর প্রখর মেধা ও গভীর চিন্তাশক্তির কারণে কঠিন ও দুর্বোধ্য সব বিষয়াদি অতিসহজে আত্মস্থ করতে পারতেন। ফলে হাদিস, তফসির, ফিকহ ও অন্যান্য ফুনুনাতের কঠিন কঠিন বিষয়বস্তু অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাখ্যা করে ছাত্রদের মনে বসিয়ে দিতেন বলে তিনি ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত নন্দিত ছিলেন।

শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (রহ.) একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকিহ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। হাদিসশাস্ত্রে তাঁর ছিলো অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তাঁর রচিত বুখারি শরিফের 'কিতাবুল মাগাযি ওয়াত তাফসির' এর ব্যখ্যা গ্রন্থ 'ইনআমুল বারি ফি শরহিল বুখারি' তাঁর জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তিনি হচ্ছেন সর্বপ্রথম বাংলাদেশী আলিম যাঁর রচিত গ্রন্থ 'ইনআমুল বারি ফি শরহিল বুখারি' (উর্দু) ভারতের দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা আবদুল হক (রহ.) এর অভিমত নেওয়া এবং দেওবন্দ থেকে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা এবং পুরো গ্রন্থটি রিভিউ করা এবং লেখকের জীবনী শুরুতে লেখা, এই সবই কাজ আঞ্জাম; দিয়েছেন প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামউদ্দিন নদভী এমপি; এবং প্রথম প্রকাশনার কিছু কপি তাঁর কাছে সংরক্ষিত আছে। বাংলা ভাষাভাষীদের উপকারার্থে আরো জরুরি তথ্য সংযোজনপূর্বক পরিবর্ধিত আকারে ইনআমুল বারি (বাংলা) ইসলামিয়া কুতুবখানা বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে ২০০২ সালে। ২০১৭ সালে এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত এই মূল্যবান কিতাবের ভূয়সী প্রশংসা করে দেশি-বিদেশি অনেক হাদিসবিশারদ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা আবদুল হক (রহ.) তাঁর অভিমতে উল্লেখ করেছেন- এটি একটি জ্ঞানভাণ্ডার, যেটি অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত আলোচনা থেকে মুক্ত এবং দীর্ঘসূত্রিতা ও অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ততা বর্জিত। মূল উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয় আলোচনাই এতে স্থান পেয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্য একান্ত উপকারী ও কল্যাণকর। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দুআ' করছি তিনি যেনো এ পুস্তকটি কবুল করেন। আমিন!

মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (রহ.) এর দুই ছেলে চার মেয়ে। বড়ছেলে আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক দীর্ঘ একত্রিশ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ১

মার্চ ২০১৯ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালকের পদ থেকে অবসর গ্রহন করেন। ছোটছেলে মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ সাদেক একজন নিকাহ রেজিস্ট্রার (কাজী), চার মেয়ে বিবাহিত। সকলে স্ব-স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত।

মাওলানা মুহাম্মদ আমিন একজন মেধাবী ছাত্র, একজন প্রথিতযশা জ্ঞানী আলিম ও বরেণ্য শিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি একজন আধ্যাত্মিক সাধকও ছিলেন। তিনি পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত সূফিসাধক হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরকানি (রহ.) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তরিকতের সবক গ্রহণ করেন।

তাঁর কাব্যিক প্রতিভা ছিলো অসাধারণ। তিনি স্বভাবকবি। আরবি, উর্দু ও বাংলায় উচ্চমানের কবিতা রচনা করতেন তিনি। বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী, ছন্দ এবং কাব্যিক মান বিবেচনায় তাঁর রচিত কবিতা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হত। তাঁর বাংলা কবিতার প্রশংসা করেছেন প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি বলেছিলেন 'মাওলানা মুহাম্মদ আমিন সাহেবের বাংলা কবিতা পড়ে আমি অভিভূত হয়েছি'। এই প্রতিথযশা পণ্ডিত অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। তিনি ২০০১ সালের ১৩ জানুয়ারি ৭৯ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সান্নিধ্যে চলে যান। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের উঁচু স্থানে আসীন করুন। আমিন!

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশিদ (রহ.)

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশিদও আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) একজন কৃতী ছাত্র। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার অন্তর্গত রশিদের ঘোনা গ্রামে ১৯২০ ঈসায়ি সনে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশিদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ও মাতা মরহুমা রমিজা খাতুন। মাওলানা মুখলেসুর রহমান ছিলেন তার হরফে আওয়াল তথা প্রথম সবকের ওস্তাদ। গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামিল (তৎকালীন সিনিয়র মাদরাসা) মাদরাসায় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হয়। গারাঙ্গীয়া মাদরাসায় এবতেদায়ী হতে আলিম স্তর পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন; এরপর চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ফাযিল পাশ করেন। অতঃপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্যে ভারতের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন এবং বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস ও ইসলামি গবেষকবৃন্দের কাছে হাদিস ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে দেশে ফিরে ১৯৪৮ সনে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন এবং সুদীর্ঘ ৫১ বছরব্যাপী একই মাদরাসায় কর্মরত থাকার বিরল নজির স্থাপন করেন। জ্ঞানপিপাসু মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশিদ আজীবন শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় শিক্ষকতাকালীন তিনি উচ্চতর শ্রেণিতে হাদিস, ফিকহ ও অন্যান্য ইসলামি বিষয়ে পাঠদান করেন। 'ফুনুনাত' আরবি সাহিত্য বিষয়াদিতে একজন বিদগ্ধ ওস্তাদ ও ইলমে ফরায়েয এর বিশেষজ্ঞ আলিম হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত ছিলেন তিনি। চুনতি মাদরাসায়

তিনি দুওম সাহেব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে ১৯৭৮ সনে মাদরাসায় কামিল ক্লাস খোলার পর তাঁকে মুহাদ্দিসে সোম (তৃতীয় মুহদ্দিস) এর পদে পদায়ন করা হয়।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশিদ ১৯৮১-৮৪ সময়ে চুনতি মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্রদের প্রিয় সংগঠন 'আনজুমনে-ই-তোলবায়ে সাবেকিন' এর সম্মানিত সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি দীর্ঘ ২৪ বছর যাবৎ শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে মাদরাসার গভর্নিং বডিতে প্রশাসনিক দায়িত্বও দক্ষতার সাথে পালন করেন।

আজীবন স্বচ্ছ-সুন্দর জীবনযাপনে ব্রতী একজন প্রচারবিমুখ আবেদ ও নিবেদিতপ্রাণ ওস্তাদ হিসেবে সর্বত্র সমাদৃত ও সম্মানিত ছিলেন তিনি।

ইন্তেকাল: হযরত মাওলানা আবদুর রশিদ (রহ.) ২৬ মে ২০১২ সাল জুমাবার দিবাগত রাত ১১টায় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। পরদিন বাদ আসর বিশাল নামাজে জানাযা শেষে তাঁকে মসজিদের পাশে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম (রহ.)

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার অন্তর্গত স্বর্ণপ্রসবিণী গ্রাম চুনতির সন্তান মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মুহাম্মদ সৌদুল্লাহ এবং মাতা মরহুমা চমন খাতুন। তাঁর প্রথম অক্ষর জ্ঞানদাতা উস্তাদ ছিলেন শেখ আজমগড়ি (রহ.) এর প্রবীণ খলিফা মাওলানা ফজলুল হক (রহ.)। অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান হিসেবে লেখাপড়া অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সীমাহীন কষ্ট ভোগ এবং অসাধারণ সাধনার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সনে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা হতে ফাযিল ডিগ্রি লাভ করেন এবং শিক্ষক হিসেবে এই মাদরাসায় যোগদান করেন। ১৯৮৭ সনে অবসর গ্রহণের পরও বিশেষ ব্যবস্থায় প্রায় দশ বছরসহ একটানা ৫০ বছরব্যাপী 'ফুনুনাত' বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকাদিসহ হাদিস-তাফসির বিষয়ে দীর্ঘদিন পাঠদানরত ছিলেন। পাঠদান কার্যক্রমে নিবেদিতপ্রাণ প্রচারবিমুখ এক মহান শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রিয় ছাত্রদের মনে উৎসাহ-অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে স্থান দখল করে আছেন।

বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা মোহাম্মদ কুতুবুদ্দিন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের প্রাক্তন ডিন ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. শব্বির আহমদ, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু বকর রফিক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আনওয়ারুল হক খতিবীসহ তাঁর আরো অসংখ্য সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দ দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে জননন্দিত হয়েছেন।

বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ গ্রামের বাড়িতেই অবস্থান করে ইবাদত বন্দেগি এবং সমাজসেবায় জীবনের বাকি সময়টুকু অতিবাহিত করেন।

মাওলানা কামালুদ্দিন মুসা খতিবী (রহ.)

মাওলানা মুহাম্মদ কামালুদ্দিন মুসা খতিবী চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার পশ্চিম কলাউজানের খতীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্তেকালের সময় তিনি ৫৮ বছর পেরিয়ে ৫৯ বছরে উপনীত হয়েছিলেন বলে তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়। সে হিসেবে তাঁর জন্মসন দাঁড়ায় ১৯৩৪ সালের দিকে। তাঁর পিতা মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব খতিবী (রহ.) (ওফাত ১৯৩৯ খ্রি.) কোলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে ১৯০৭ সালে ফখরুল মুহাদ্দিসিন ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর তিনি আরাকটি জামে মসজিদ রেঙ্গুনের খতিব ও মুফতির পদে তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। উল্লেখ্য যে, তখন আরকাটি জামে মসজিদ ও সুরতি জামে মসজিদের খতিব ও মুফতির পদ ওলামা সমাজের জন্য লোভনীয় ও আকর্ষণীয় ছিলো। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব ফিকহশাস্ত্রে বিশেষত হানাফি ফিকহের খুঁটিনাটি বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।

মাওলানা কামালুদ্দিন যখন পাঁচ বছর তখন তিনি চিরতরে পিতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত হন। এরপর তিনি তাঁর বড়ভাই মাওলানা জামালুদ্দিন ইউসুফ খতিবীর (রহ.) স্নেহ ও তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। আরবি, ফারসি এবং উর্দুর হাতেখড়ি মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবী এবং বড়ো ভাইয়ের নিকটই।

স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েক বছর পড়ালেখা করার পর তিনি চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৫৯ সালে তিনি ঐচ্ছিক ইংরেজি নিয়ে ফাযিল পাস করেন এবং সম্মিলিত মেধা তালিকায় ষোড়শ স্থান অধিকার করেন। তিনি পূর্ববর্তী সকল কেন্দ্রীয় পরীক্ষায়ও আপন মেধার স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৬১ সালে তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা হতে কামিল (হাদিস) পাস করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি অসুস্থাবস্থায় কামিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং মাত্র দু'নম্বরের জন্য ১ম শ্রেণি পাননি। যার জন্য তিনি আজীবন দুঃখ করতেন।

কামিল পাস করার পর তিনি চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার তৎকালীন সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং তাঁর উস্তাদ মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাযেরের (রহ.) অনুরোধে এবং তাঁর বড়োভাই মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবীর পরামর্শে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রায় ৩২ বছর উক্ত মাদরাসায় দক্ষতার সাথে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর ব্যাপারে মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবী (রহ.) প্রায়ই বলতেন, "আমি আমার ভাই কামালুদ্দিনকে চুনতি মাদরাসার জন্য উৎসর্গ করেছি।" বাস্তবে মাওলানা মরহুম চুনতি মাদরাসার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিলেন। তিনি আজীবন অবিবাহিতই রয়ে যান এবং চুনতি মাদরাসার খেদমত করাকেই জীবনের প্রধানতম ব্রত হিসেবে গণ্য করেন।

তিনি নিম্ন শ্রেণি হতে উচ্চতর শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাঠদান করেছেন। তিনি কামিল শ্রেণিতে সহিহ মুসলিমের দরস দিতেন। তাঁর অনন্য পাঠদান পদ্ধতি ছিলো ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তিনি দীর্ঘ বক্তব্যের অবতারণা না করে মূল বিষয়টি ছাত্রদের স্মৃতিপটে বসিয়ে দিতে সমর্থ ছিলেন। চুনতি মাদরাসার কল্যাণে তাঁর এ উৎসর্গসূচক মনোভাব মূলত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাওলানা জামালুদ্দিন ইউসুফ

(রহ.) বিভিন্নভাবে এ মাদরাসার খিদমত করে গেছেন। তিনিও সুদূর রেঙ্গুন হতে এক বছরের ছুটিতে বাড়িতে আসলে উক্ত মাদরাসায় পাঠদান করতেন।

মাওলানা কামালুদ্দিন মুসা খতিবী (রহ.) তাঁর শিক্ষকতা জীবনের সাথে সাথে অধিকাংশ সময় মাদরাসা পরিচালনা কমিটি এবং গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবেও এ মাদরাসার খিদমত করে গেছেন। বিভিন্ন সময়ে মাদরাসার বহু জটিল বিষয়ের সমাধানকল্পে মাওলানার ভূমিকা ছিল সাহসিকতাপূর্ণ, আন্তরিক এবং আপসমূলক।

২য় বার কামিল শ্রেণি (হাদিস) খোলার ক্ষেত্রে তার অগ্রণী ভূমিকা ছিলো। হাদিসের দরস দেয়ার জন্য যোগ্য মুহাদ্দিস নির্বাচন এবং পুস্তক সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

উল্লেখ্য যে, তিনি এ অভিযানের সূচনা করেছিলেন নিজ বাড়ি থেকেই। সর্বপ্রথম তিনি তাঁর পারিবারিক গ্রন্থাগার থেকে 'সহিহ বুখারি' এর শরাহ 'উমদাতুল কারি' এবং 'ফতহুল বারি' সংগ্রহ করেছিলেন।

চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসা গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর চেষ্টা সাধনার কোন তুলনাই হয় না। তিনি লাইব্রেরি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেন। গ্রন্থাগারের প্রতি গ্রন্থকেই তিনি পবিত্র বিবেচনা করতেন ও তার রক্ষণাবেক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থা নিতে সক্রিয় ছিলেন।

সহকর্মীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত মধুর। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং কনিষ্ঠ শিক্ষকদেরকে করতেন স্নেহ মুহাব্বত। ছাত্রদের প্রতি তাঁর ছিলো অগাধ স্নেহ ও ভালোবাসা। কোনো কোনো সময় শাসনের উদ্দেশ্যে ছাত্রদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করলেও পরবর্তীতে অনুশোচনা করে কাঁদতেন এবং স্নেহদ্বারা তা ভুলিয়ে দিতেন। ছাত্ররাও অবস্থাভেদে তাঁর কঠোরতা ও কোমলতার রহস্য বুঝতে পারতেন। তিনি গরীব মেধাবী ছাত্রদেরকে ব্যক্তিগত ফান্ড থেকে আর্থিক সাহায্য ও অনুদান দিতেন।

তিনি ১৯৯৩ সালের ৮ এপ্রিল বুধবার ইন্তেকাল করেন। পরের দিন ৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার লোক তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন যার অধিকাংশই ওলামায়ে কিরাম এবং মাদরাসা ছাত্র। তাঁকে মসজিদ সংলগ্ন তাঁর পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। আমিন!

হযরত মাওলানা শফিক আহমদ (রহ.)

মরহুম মাওলানা শফিক আহমদ চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া (বর্তমানে লোহাগাড়া) উপজেলার চুনতি গ্রামের প্রখ্যাত 'ইউসুফ মঞ্জিলে' ১৯২৩ ঈসায়ি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মাওলানা বশির আহমদ চুনতি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আর পিতামহ কাজী মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছিলেন তৎকালীন বার্মা (মায়ানমার) এর আকিয়াব জেলার ঘুফী মৌজার একজন ভূস্বামী। মাতুতালয়ের দিক থেকে তিনি বাঁশখালী থানার প্রখ্যাত মনুমিয়াজী পরিবারের সুযোগ্য সন্তান ও সুপ্রসিদ্ধ জমিদার আলহাজ খান বাহাদুর মকবুল আলী চৌধুরীর দৌহিত্র। তাঁর শৈশবকাল নিজ গ্রাম চুনতিতে অতিবাহিত হয়। সকালে মক্তব স্বল্পতার জন্য সুযোগ্য গৃহশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে

মরহুম শাহসুফি মাওলানা নজীর আহমদ (প্রকাশ হুজুর) কর্তৃক ১৯৩৭ সনে চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে ভর্তি হয়ে তিনি ১৯৪৩ ঈসায়ি সনে কৃতিতের সাথে 'ফাযিল' পাশ করেন। আবার উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলুম দেওবন্দ' থেকেও তিনি সর্বোচ্চ সনদ 'ফাযিলে দেওবন্দ' লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে মাওলানা শফিক আহমদ পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন। পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে খেদমত আঞ্জাম দেয়ার মাধ্যমে তিনি শিক্ষকতা জীবনের সূচনা করেন। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন উক্ত মাদরাসার 'মুহতামিম' ও 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট' এর দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৭১ এর পর কিছুদিন মাদরাসা প্রধানের দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়ে তিনি সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর ১৯৭৫ ঈসায়ি সনে লোহাগাড়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আজীবন তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে মাদরাসার খেদমত করে যান। ১৯৮২ ঈসায়ি সনে তিনি পুনরায় চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য ফিরে আসেন এবং ১৯৮৬ ঈসায়ি সনের ৯ সেপ্টেম্বর তাঁর ইন্তিকালের দিন পর্যন্ত মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অনৈসলামিক পদ্ধতিতে প্রচলিত সহশিক্ষার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে এবং নারী সমাজের মধ্যে ইসলামি শিক্ষার প্রসারকল্পে স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবীদের সক্রিয় সহযোগিতায় তিনি চুনতি মাদরাসার পূর্বদিকে ঈদগাহ ময়দানের পাহাড়ে 'ফাতেমা বতুল' মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসায় তাঁর বড়ছেলে মাওলানা ফৈয়াজউদ্দিন ১ম অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

সমাজসেবায় তাঁর অবদান ছিলো অপরিসীম। চুনতির ঐতিহ্যবাহী সেবাধর্মী সংগঠন 'আনজুমন-ই-নওজোয়ান' এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৪৭ ঈসায়ি সনে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পূর্বে জাতীয় পর্যায়ে "All India Muslim National Guard" এর ২য় ব্যাচের তিনি ছিলেন অন্যতম 'সরগুরুহ বা ক্যাপ্টেন'।

মরহুম মাওলানা শফিক আহমদ একদিকে যেমন ছিলেন ইসলামি আন্দোলনের একজন যিন্দাদিল দুর্জেয় সিপাহসালার, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন তরিকতের একজন উঁচুদরের খলিফা। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফিসাধক আল্লামা হাফেয হামেদ হাসান আলাভি আজমগড়ি (রহ.)-এর সুযোগ্য খলিফা হযরত শাহসুফি মাওলানা নজীর আহমদ (রহ.)-এর নির্দেশে তিনি মরহুম আজমগড়ি এর অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরকানি (রহ.)-এর হাতে অপরিণত বয়সেই তরিকতের বায়আত গ্রহণ করেন এবং কঠোর সাধনা ও অনুশীলনের দ্বারা ১৯৬২ ঈসায়ি সনে খেলাফত লাভ করেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক লোক তাঁর হাতে তরিকতের সবক লাভ করেন। তিনি ছিলেন নিরহংকার ও আত্মপ্রচার বিমুখ। তাই নিজেকে 'পীর' বলে কখনো পরিচয় দেননি।

মরহুম অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। একদিকে যেমন ছিলেন তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী ও হাস্যময়ী, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার এক

হযরত মাওলানা মুবারক আহমদ (রহ.)

মাওলানা মুবারক আহমদ আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) একজন কৃতী ছাত্র। তি সাতকানিয়া উপজেলার বারদোনা গ্রামে ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পি প্রখ্যাত হাফেজে কুরআন মরহুম আলহাজ কলিম উল্লাহ। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায়। ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৪২ সালে দাখিল এবং ১৯৪ আলিম পাশ করেন। তারপর চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখা ১৯৪৬ সালে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাশ করেন।

মাওলানা মুবারক আহমদ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৪৬ সালে মায়ানমারের (বা ঈয়াঙ্গুনের (রেঙ্গুনের) পাঞ্জাবি জামে মসজিদে খতিব পদে যোগদান করে। ১৯৪৮ সাল প তিনি ঐ সম্মানিত পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামি মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বছর এ পবিত্র পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। তাঁর অগণিত সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দের মধ্যে প্রখ্যাত আলেম, সমাজসেবক, নন্দিত আধ্যাত্মিক সাধক বায়তুশ শরফের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পীর মরহুম মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব এবং প্রখ্যাত ওয়ায়েয মরহুম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ আযাদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৮৪-৯৬ পর্যন্ত সময়ে কক্সবাজার সদর বাজারঘাটা জামে মসজিদের স্বনামধন্য খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন যুক্তিবাদী ও সুদক্ষ বক্তা হিসেবে আজীবন দীন ইসলামের শাশ্বত বাণী প্রচার করে খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী (রহ.)

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার ঐতিহ্যবাহী চুনতি গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ এক মুসলিম পরিবারে ১৯২৬ সালের গোড়ার দিকে মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মাওলানা গোলাম মোস্তফা চুনতি গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ও খ্যাতিসম্পন্ন ত্যাগী একজন সমাজসেবক বলে জননন্দিত। দাদা বিদগ্ধ আলেমেদীন ও আধ্যাত্মিক সাধক মাওলানা আবদুল গণির কাছে তিনি প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। পারিবারিক পরিমণ্ডলে কুরআন শিক্ষাসহ মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন। এ প্রাচীনতম মাদরাসা হতে ১৯৪৮ সালে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাশ করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ দু'বছর এই মাদরাসায় কামিল ক্লাসে অধ্যয়ন করার পর ১৯৫০ সালে মুমতাজুল মুহাদ্দেসিন ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর চট্টগ্রাম শহরের প্রসিদ্ধ 'ইসলামিয়া লাইব্রেরি'র একজন স্বত্বাধিকারী হিসেবে ব্যবসা শুরু করেন তিনি। মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী একজন বিজ্ঞ আলেম ও সফল ব্যবসায়ী। একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যাতি অর্জনের পাশাপাশি তিনি সমাজসেবাকর্মেও নন্দিত এক ব্যক্তিত্ব। ১৯৫০ সাল হতে দীর্ঘ প্রায় ৫৫ বছরকাল একটানা চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার গভর্নিং বডির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাদরাসার নানামুখী উন্নয়নে মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকীর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উদ্দিন (রহ.)

লাহাগাড়া উপজেলাধীন পূর্ব কলাউজান গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আধ্যাত্মিক
ানা মুহাম্মদ কামালউদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মৌলভি
নকট কুরআন পাঠসহ প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করার পর তিনি ঐতিহ্যবাহী
মিল মাদরাসায় ভর্তি হন। এ প্রখ্যাত শিক্ষালয় হতে তিনি ১৯৪৬ সালে
লে আলিম ও ১৯৫০ সালে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাশ করেন। তারপর
ছারছিনা আলিয়া মাদরাসায় কামিল শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৯৫২ সালে
ব কামিল ডিগ্রি লাভ করেন।

মাপনান্তে তিনি গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে
র মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। কিছুদিন চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায়
নে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ১৯৬০ সাল হতে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০
সময় তিনি পূর্ব কলাউজান দারুচ্ছুন্নাহ আলিম মাদরাসায় প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে
য়োজিত ছিলেন। ১৯৮০ সাল হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত আমিরাবাদ সুফিয়া কামিল মাদরাসার
প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে অত্যন্ত সফলভাবে পাঠদান করেন।

মাওলানা এশফাক হোসাইন (রহ.)

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার সুপ্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মাওলানা নূর হোসাইন চুনতি গ্রামেরই একজন আলোকিত আলেম ও বিদগ্ধ ওস্তাদ। পিতার হাতেই মাওলানা এশফাক হোসাইনের শিক্ষায় হাতেখড়ি। পারিবারিক তত্ত্বাবধানে কুরআন পাঠসহ মৌলিক অন্যান্য বিষয়াদিতে শিক্ষাগ্রহণের পর ঐতিহাসিক চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন। এ প্রাচীনতম শিক্ষালয় হতে ১৯৫২ সালে আলিম এবং ১৯৫৪ সালে তিনি ফাযিল পাশ করেন।

১৯৫৮ সালে চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে হাজি মুহাম্মদ মহসিন কলেজ) থেকে আই.এ পাশ করেন। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম কলেজ হতে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি চুনতি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ষাটের দশকের শেষের দিকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে বি.এড ডিগ্রি অর্জন করার পর সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পান। দক্ষতা ও নিষ্ঠার বিষয় বিবেচনায় মাওলানা এশফাক হোসাইনকে একই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত তিনি একজন সফল ও দক্ষ প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক

আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার বাবুনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (রহ.) যিনি ছিলেন একজন প্রতিথযশা মুহাদ্দিস, যাঁর রচিত 'ইনআমুল বারি ফি শারহিল বুখারি' ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত হয়।

মাতা-মরহুম সাজেদা বেগম। তিনি বাবুনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় জমাতে নাহুমে (৬ষ্ঠ শ্রেণি) ভর্তি হন। ১৯৭০ সনে উক্ত মাদরাসা থেকে প্রথম বিভাগে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য যে, সে সময় সাতকানিয়া-লোহাগাড়া, বাঁশখালী এই তিন উপজেলার পরীক্ষা কেন্দ্র ছিলো সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসা। পুরো কেন্দ্র থেকে সে বছর মাত্র দু'জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। একজন আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, অপরজন মরহুম মেজর জেনারেল মিয়া মুহাম্মদ জয়নুল আবেদিন (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক সামরিক সচিব) দু'জনই চুনতি মাদরাসা থেকে।

জনাব আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক ১৯৭২ সালে প্রথম বিভাগে আলিম এবং ১৯৭৪ সালে প্রথম বিভাগে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে ফাযিল পাশ করেন। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল (হাদিস) পাশ করেন। ১৯৮২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম শ্রেণিতে আরবি বিভাগ থেকে বি.এ (অনার্স) এবং ১৯৮৪ সালে (এম.এ) ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। পরবর্তীতে পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করে দীর্ঘ একত্রিশ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশনে চাকুরি করে ২০১৯ সালের ১ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক এর পদ থেকে চাকুরি জীবন সমাপ্ত করে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরি জীবনে তিনি লক্ষ্মীপুর, কক্সবাজার, কুমিল্লা জেলা, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা গবেষণা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (এম.এ) মাদরাসায় অনার্স ক্লাসের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক এর বিভিন্ন বিষয়ে রচিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা হচ্ছে আটত্রিশটি। এর মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে সাতটি। দু'টি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশের পথে রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম সন্নিবেশিত হলো- (১) সিরাতে সাইয়িদুল আম্বিয়া (বিশ্বনবীর (সা.) জীবনী), (২) আখলাকে সাইয়িদুল আম্বিয়া (সা.), (৩) উম্মাহাতুল মু'মিনীন, (৪) নবী (সা.) পরিবার, (৫) ওলীকুল শিরোমনি শায়খ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদির জিলানী (কা.সি.), (৬) হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.), (৭) ইনআমুল বারী ফি শরহিল বুখারি (রহ.) (অনূদিত), (৮) আল কুরআনের সাথে একটি সাক্ষাতকার, (৯) ছোটদের হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), (১০) ছোটদের হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.), (১১) পরিবেশ ও ইসলাম, (১২) ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর অধিকার, (১৩) শিশু পরিচর্যা ও ইসলামি নামের সংকলন, (১৪) নারী ও ইসলাম, (১৫) মিরাজ ও বিজ্ঞান, (১৬) সিরাতে মুস্তফা (সা.) (অনূদিত) ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, (১৭) আশরা মুবাশ্‌শারা, (১৮)

দৈনন্দিন জীবনে দুআ', (১৯) কারবালার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ইমাম হোসাইনের (রা.) শাহাদাত এবং (২০) মৃত্যুর পর কী হবে (অনূদিত) ইত্যাদি।

তিনি এক সরকারি প্রোগ্রামে সিঙ্গাপুর এবং ফিলিপাইন সফর করেন এবং বারোটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, একজন লেখক হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাঁর জীবনী প্রকাশ করছে।

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার অন্তর্গত পশ্চিম কলাউজান খালাচিপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১ ডিসেম্বর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ এলাহী বখশ এবং মাতা মুহতারিমা সিরাজ খাতুন। তিনি খালাচিপাড়া প্রাইমারি স্কুল ও পূর্ব কলাউজান দারুচ্ছুন্নাহ মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১৯৬৮ সালে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় জামাতে হাফতুম শ্রেণিতে (বর্তমান ৮ম) ভর্তি হন। তিনি এ মাদরাসা হতেই মেধাস্থানসহ দাখিল, আলিম ও ১৯৭৫ সালে ফাযিল পাশ করেন। চুনতির ৭ বছরের ছাত্রজীবনেই তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। অতঃপর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৭৭ সালে কামিল (হাদিস) পাশ করে প্রায় এক বছর (জুন ১৯৭৭-মার্চ ১৯৭৮) চট্টগ্রাম লোহাগাড়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় হেড মাওলানা হিসেবে শিক্ষকতা করেন।

১৯৭৮ সালে বিরাট অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় কামিল ফিকাহতে ভর্তি হন। ছাত্রজীবনের শুরু থেকে তিনি মাদরাসা ছাত্রদের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়তে তোলাবায়ে আরাবিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব পালনসহ উক্ত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে সারাদেশ সফর করেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয়তা ও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি। ছাত্রজীবনে দৈনিক পত্র-পত্রিকায় লেখা নিবন্ধসমূহ নিয়ে ১৯৮০ সালে তাঁর প্রথম প্রকাশিত বইয়ের নাম মাদরাসা শিক্ষা কোন পথে?। এ বছরে প্রকাশিত তাঁর অপর দুটি বই ইসলামি আন্দোলনের আগামী দিনের নেতৃত্ব ও খ্রিস্টান ধর্মের গোপন রহস্য।

১৯৮০ সালে কামিল ফিকাহ পাশ করার পর তিনি বায়তুশ শরফের মরহুম পীর হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সান্নিধ্যে চট্টগ্রাম চলে যান। এ সময় (জানুয়ারি ১৯৮১-ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ খ্রি.) তিনি পীর সাহেব কেবলার একান্ত সচিব, মাসিক দ্বীন দুনিয়ার নির্বাহী সম্পাদক, বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদরাসার প্রথম শিক্ষক ও সদ্য প্রতিষ্ঠিত বায়তুশ শরফ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক হিসাবে বহুমুখী দায়িত্ব পালন করেন। ১৯ দিনব্যাপী চুনতি সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলের রূপকার ও মাহফিল পরিচালক নায়েমে আলা আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) পক্ষে ড. শাহেদী অনুষ্ঠানের ঘোষক ও নিয়মিত আলোচক হিসাবে নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িত রাখেন।

১৯৮২ এর শুরুতে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের বিজয় বার্ষিকী উপলক্ষে ইরানের রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে তিনি তেহরান গমন করেন এবং রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠানের অনুবাদক ও সংবাদ পাঠক হিসেবে বিদেশে চাকরিজীবন আরম্ভ করেন। জনাব শাহেদী ২৮ ফেব্রুয়ারি'৮৩ হতে ২৩ অক্টোবর'৮৯ রেডিও তেহরনের বাংলা অনুষ্ঠানের সহকারী পরিচালক (অনুবাদক ও সংবাদ পাঠক) হিসেবে একটানা প্রায় ৭ বছর বিপ্লবোত্তর যুদ্ধরত একটি দেশের অভিজ্ঞতা অর্জনের দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। ইরানে অবস্থানকালে ড. শাহেদী ইসলামি বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনির সঙ্গে দু'বার সাক্ষাতসহ তেহরানে প্রায় সকল আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সাংবাদিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৮৯ সালের শেষদিকে একান্ত নাড়ির টানে দেশে ফিরে আবারো লেখালিখি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন।

তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা তেজগাঁও কলেজ থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ১৯৯৪ সালে বিএ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ৭ম মেধাস্থান লাভ করে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৯৬ সনে এম.এ প্রিলিমারি ১৯৯৭ সনে এমএ ফাইনাল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৯৩ সন হতে তিনি কর্মজীবনে ঢাকাস্থ ইরানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে শিক্ষা-গবেষণা পরিচালক ও ফার্সি ভাষার শিক্ষক ছিলেন এবং জুলাই ২০০৪-জুন ২০০৫ একবছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রে ফার্সি ভাষার শিক্ষক পদে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু কোর্সটি সেখানে স্থায়ী হয়নি।

জীবনের এ অধ্যায়টিতে তিনি বাংলাদেশ সফরকারী ইরানি প্রেসিডেন্ট রাফসানজানিসহ সকল ইরানি ডেলিগেশনের দোভাষীর দায়িত্ব পালন এবং 'ফার্সি-বাংলা-ইংরেজি অভিধান' সম্পাদনা 'ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী' নামে মহাকবি হাফেজ শিরাজী জীবনীগ্রন্থ ও ফার্সি ভাষায় আমাদের 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী' রচনা করে বাংলার সাথে ফার্সি ও ইরানের ঐতিহাসিক বন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ইতিহাসে পিএইচ.ডি পর্যায়ে প্রথম ফার্সি ভাষায় থিসিস লিখে ২০১০ সালের ডিসেম্বরে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এরই মধ্যে তিনি বাংলায় বুখারি শরিফের অনুবাদ করেন। (অপ্রকাশিত) ও মাওলানা রূমির বিশ্ববিখ্যাত মসনবি শরিফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রথম খণ্ড সম্পন্ন ও প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

ড. মাওলানা ঈসা শাহেদী ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত ২০টিরও অধিক গবেষণা পুস্তক ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রবন্ধ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রফেসর ড. আহসান সাইয়েদ

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া পৌরসভাধীন দক্ষিণ রামপুর গ্রামে ১৯৬৩ সালের ১ মার্চ তাঁর জন্ম। তাঁর প্রকৃত নাম আহসান উল্লাহ। সাহিত্যিক নাম 'আহসান সাইয়েদ' নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। পিতা মরহুম মাওলানা শফিক আহমদ পেশায় একজন অভিজ্ঞ হেকিম (চিকিৎসক), মাতা মরহুম মাহফুজা খাতুন আদর্শ গৃহিনী ছিলেন ।

ড. আহসান সাইয়েদ সাতকানিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে সাতকানিয়া সদরে অবস্থিত মাহমুদুল উলুম আলিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসায় জমাতে হাফতুম (বর্তমানে অষ্টম শ্রেণি) পর্যন্ত পড়ার পর ১৯৭২ সালে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া (কামিল) মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৭৭ সালে ফাজিল পাশ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগ হতে ১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে যথাক্রমে বি.এ অনার্স ও এম.এ পাশ করেন। 'বাংলাদেশে হাদিসচর্চা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গবেষণা শিরোনামের ওপর ড. আহসান সাইয়েদ ১৯৯৮ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

আহসান সাইয়েদ ১৯৭৪ সাল হতে একটানা চার বছর চুনতি মাদরাসার কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন আনজুমনে এসলাহুত তোলাবার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় মাদরাসার দেয়াল পত্রিকা 'আল ইবরত' নিয়মিত প্রকাশিত হতো। বর্তমানে তিনি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার উপাচার্য হিসেবে কর্মরত আছেন।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৮৬ সালে পটিয়ার মনসা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে। তিনি ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ খ্রি. এ দু'বছর রাঙ্গুনিয়া আলমশাহ পাড়া আলিয়া মাদরাসার কামিলের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর কুয়াইশ বুড়িশ্চর শেখ মুহাম্মদ কলেজে অল্প কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন।

তাঁর লিখিত ১০টিরও বেশি গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সঙ্গীত ও ইসলামি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে আরবি ও বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁর ২৫টিরও অধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মাওলানা আবু নছর আতীক আহমদ

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন প্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামে ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে মাওলানা আবু নছর আতীক আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাযের একজন হক্কানি আলেম এবং বরেণ্য শিক্ষক ও মাতা মরহুম মুহতরামা জয়নাব বেগম একজন আবেদা ও ছালেহা আদর্শ গৃহিনী ছিলেন। শিশু আতীকের পিতার হাতেই শিক্ষার হাতেখড়ি। পারিবারিক পর্যায়ে কুরআন পাঠসহ প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপনান্তে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি ১৯৬৯ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল, ১৯৭১ সালে প্রথম বিভাগে আলিম এবং ১৯৭৩ সালে প্রথম বিভাগে ফাযিল পাশ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া (কামিল) মাদরাসায়

ভর্তি হন এবং ১৯৭৬ সালে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অবশ্য যথাক্রমে ১৯৮৪ ও ১৯৮৯ সালে তিনি আরো দু'বিষয়ে কামিল ডিগ্রি অর্জন করেন। মহেশখালী পুটিবিলা হামেদিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় হেড মাওলানা পদে নিযুক্তি পেয়ে মাওলানা আবু নছর আতীক আহমদ কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। আগস্ট ১৯৭৬ হতে অক্টোবর ১৯৭৮ পর্যন্ত সময়ে তিনি উক্ত মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। তিনি সহকারী মাওলানা পদে নিয়োগ পেয়ে নভেম্বর ১৯৭৮ সালে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় যোগদান করেন এবং ১৯৮০ সালের শেষ নাগাদ এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। পদোন্নতির মাধ্যমে ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে আরবি প্রভাষক পদে পদায়ন করা হয়। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জানুয়ারি ১৯৮৮ সালে উপাধ্যক্ষ হিসেবে রঙ্গীখালী দারুল উলুম মাদরাসা কক্সবাজারে যোগদান করেন এবং ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ সালে ঐতিহ্যবাহী গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৭ সালের জুন পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানে সফলতার সাথে অধ্যাপনা করেন। জুলাই ১৯৯৭ সালে নিয়োগ পেয়ে পুনরায় চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে ফুনুন.ত, ফিকহ, হাদিস বিষয়ে উচ্চতর শ্রেণিতে অত্যন্ত সফলতার সাথে পাঠদান করেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০০৩ সালে জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। ২০০৬ সাল হতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের অতিরিক্ত দায়িত্বও তিনি সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন।

ড. আবু ওমর ফারুক আহমদ

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন প্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ড. আবু ওমর ফারুক আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মাওলানা আবু তাহের মোহাম্মদ নাযের একজন বিজ্ঞ আলিম ও বরেণ্য ওস্তাদ, মাতা মুহতারিমা জয়নাব বেগম-রত্নগর্ভা বিদুষী রমণী। পারিবারিক পরিমণ্ডলে কুরআন পাঠসহ মৌলিক প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন। এ প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৬৯ সালে দাখিল, ১৯৭১ সালে আলিম ও ১৯৭৩ সালে ফাযিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া (কামিল) মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৭৫ সালে মেধা তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে প্রথম শ্রেণিতে কামিল (হাদিস) ডিগ্রি লাভ করেন।

ড. ফারুক অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলএম (সম্মান) এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। পিএইচ.ডি কোর্স অধ্যয়নকালে তাঁর উন্নতমানের গবেষণা কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি খুব খ্যাতি অর্জন করেন। ইতোপূর্বে সৌদি সরকারের বৃত্তি নিয়ে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামি শরিআ'র ওপর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন তিনি। ১৯৯৭ সালে সিডনি মুসলিম সম্প্রদায়ের উপদেষ্টা হিসেবে অস্ট্রেলিয়া গমনের পূর্বে ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. ফারুক বিশ্বখ্যাত একজন শরিআ'র জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী যিনি ইসলামি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স এর ওপর পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন। তিনি বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজারে ইসলামিক অর্থনৈতিক ধারণার প্রমোটর

হিসেবেও কাজ করেন। তিনি দুবাইভিত্তিক হামদান বিন মুহাম্মদ ই-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ফাইন্যান্স বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৮ সাল হতে তিনি ইসলামিক ফাইন্যান্স কো-অপারেটিভ অস্ট্রেলিয়া লি. এর উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনিস্থ অস্ট্রেলিয়া মুসলিম কল্যাণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ব্রুনাই দারুস সালাম ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে তিনি মে ২০১৮ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি সৌদি আরবের কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি জেদ্দায় সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন।

ড. ফারুক একজন মেধাবী গবেষক হিসেবে সুখ্যাত। তাঁর রচিত গবেষণাধর্মী বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং অসংখ্য প্রবন্ধ দেশি-বিদেশি জার্নালে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনারে ৪০টিরও বেশি তাঁর রচিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামিক ব্যাংকিং এর ওপর আন্তর্জাতিক জার্নাল অব এক্সেলেন্স এর সম্পাদক এর দায়িত্বও তিনি পালন করেন। এতদ্ব্যতীত একাধিক আন্তর্জাতিক ইসলামিক জার্নালের সম্পাদনা পরিষদের উপদেষ্টা সদস্য হিসেবেও তিনি কাজ করছেন এবং আন্তর্জাতিক রিভিউ জার্নালের এডহক রিভিউয়ার হিসেবেও তাঁর কর্মকাণ্ড স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক ময়দানে ড. ফারুকের বিচরণে চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার সুনাম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলহাজ কাজী মাওলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন আধুনগর গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সুফি মিয়াজি পাড়ায় ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন আলহাজ কাজী মাওলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন। পিতা মরহুম হাফেজ মাওলানা হামিদ উদ্দিন মাতা মরহুম নূরজাহান বেগম। তাঁর দাদা মরহুম মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন সাহেবের কাছে প্রথম পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি। পারিবারিক পর্যায়ে কুরআন শিক্ষা ও শিক্ষার প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ করার পর তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে কৃতিত্বের সাথে ১৯৬২ সালে দাখিল ১৯৬৬ সালে আলিম ও ১৯৬৮ সালে ফাযিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৭০ সালে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পড়ালেখা সমাপনান্তে রসুলাবাদ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি সুপার হিসাবে পর্যায়ক্রমে লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর আখতারিয়া মাদরাসা, চরতি মুহাম্মদীয়া দাখিল মাদরাসা, সাতকানিয়া এবং বরমা ইসলামিয়া মাদরাসা চন্দনাইশে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এতদ্ব্যতীত একজন দক্ষ ও নিষ্ঠাবান অধ্যক্ষ হিসেবে পর্যায়ক্রমে বরমা ইসলামিয়া মাদরাসা চন্দনাইশ, পশ্চিম বরঘোনা রহমানিয়া ফাযিল মাদরাসা বাঁশখালী, কেরানীহাট ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা এবং পটিয়া ইয়াছিন আউলিয়া সিনিয়র মাদরাসায় কর্মরত ছিলেন। সর্বোপরি ১৯৭৫-১৯৮৩ সাল সময়কালে তিনি আশেকে রাসূল (সা.) হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতি এর একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

আলহাজ মাওলানা কাজী নাছির উদ্দিন প্রখর মেধা ও স্মরণশক্তির অধিকারী একজন ছাত্র ছিলেন। কোন বিষয় বিশেষ করে কোন কবিতা একবার পড়লে তা আর ভুলেন না! গভীর জ্ঞানসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান একজন সুবক্তা হিসেবে তিনি জননন্দিত একজন আলেমেদীন। তাঁর জ্ঞান সমৃদ্ধ মোহনীয় বক্তৃতা যে কোনো সভা-সমিতিতে শ্রোতাসাধারণকে মুগ্ধ করে রাখে। বক্তৃতাকালে অমূল্য কবিতামালার উদ্ধৃতি তাঁর বক্তৃতার মূল আকর্ষণ।

তিনি লোহাগাড়া থানাধীন আধুনগর ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার এবং কাজী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার গভর্নিং বডির সদস্য, বড়হাতিয়া এশাতুল উলুম ফাযিল মাদরাসার গভর্নিং বডির সহ-সভাপতি, চুনতি শাহ হাফেজিয়া হেফজখানা ও এতিমখানার সদস্য এবং রশিদের ঘোনা শাহ হাফেজিয়া রহমানিয়া এবতেদায়ী মাদরাসার সদস্য হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন তিনি।

ডা. লোকমান মিয়া (রহ.)

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন আধুনগর ইউনিয়নের রশিদেরঘোনা গ্রামের কুলীন মিয়াপাড়ায় মরহুম ডা. লোকমান মিয়ার জন্ম। পিতা মরহুম মুন্সী হাশমত আলী। পারিবারিক তত্ত্বাবধানে কুরআন পাঠসহ অন্যান্য প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পন্নপূর্বক তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসা হতে ১৯৪৪ সালে দাখিল পরীক্ষায় সরকারি বৃত্তি লাভ করেন।

অতঃপর তিনি চট্টগ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৫০ সালে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। তারপর তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলে এলএমএফ ডাক্তারিতে ভর্তি হয়ে ১৯৫৬ সালে এলএমএফ ডিগ্রি লাভ করেন। ডা. লোকমান মিয়া হচ্ছেন চুনতি মাদরাসার প্রথম ছাত্র যিনি একজন সফল চিকিৎসক হিসেবে নন্দিত ছিলেন।

ডা. লোকমান মিয়া সমাজকর্মী হিসেবেও সুখ্যাত ও জননন্দিত ছিলেন। আধুনগর হাইস্কুলের আজীবন সদস্যসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবেও দীর্ঘদিন খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ভদ্র, নম্র, সদাচরণের জন্যও তিনি জনগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম খাঁন

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত লোহাগাড়া উপজেলাধীন চুনতি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ৭ মে মুসলিম খাঁনের জন্ম। পিতা মরহুম মাওলানা আবদুস সোবহান খান মাতা মরহুম কমর নিসা বেগম। পারিবারিক পর্যায়ে পবিত্র কুরআন শিক্ষাসহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম খাঁন ঐতিহ্যমণ্ডিত চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন। এই প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৫০ সনে দাখিল ও ১৯৫২ সালে আলিম পাশ করেন তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে। ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন

করার পর তিনি ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসায় ফাযিল ২য় বর্ষে ভর্তি হন এবং এখান থেকে ১৯৫৪ সনে মেধা তালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করে ফাযিল পাশ করেন। ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছাত্র হিসেবে ছাত্র-শিক্ষক উভয় মহলে অত্যন্ত সমাদৃত ও পরিচিত ছিলেন তিনি। তিনি ফাযিল পরীক্ষা দেওয়ার পর মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ও তাঁর কয়েকজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের অনুরোধে তিনি কিছুদিন চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় স্বেচ্ছাসেবামূলক অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তখন তিনি ফাযিল ক্লাসে আরবি সাহিত্য, ফিকহ-উসুলে ফিকহর মতো কঠিন বিষয়াদিতে পাঠদান করেন। তিনি ছিলেন একজন ইসলামি চিন্তাবিদ ও নীরব গবেষক। তিনি উর্দু ভাষায় অত্যন্ত উঁচুমানের কবিতা রচনা করতেন।

ফাযিল পাশ করার পর মুসলিম খান (রহ.) চট্টগ্রাম নগরস্থ কাজেম আলি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ সালে এ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯৫৮ সালে আইকম পাশ করেন।

লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি খেলাধুলার সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। ফুটবল ও ব্যাটমিন্টন খেলায় তিনি কীর্তিমান খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে একজন দক্ষ ও নিরপেক্ষ রেফারি হিসেবে অনেক টুর্নামেন্ট পরিচালনা করেছেন তিনি অত্যন্ত সুনাম ও সফলতার সাথে।

মাওলানা মুসলিম খাঁন সফল ব্যবসায়ীও ছিলেন। ১৯৫৭ সালে চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লায় 'হাবিব প্রিন্টিং প্রেস' নামে এক অত্যাধুনিক ছাপাখানা স্থাপন করেন। 'হিলসাইড ট্রেডার্স' নামে অন্য একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীও ছিলেন তিনি। তিনি ৭ অক্টোবর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ৭৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ (রহ.)

বৃহত্তর চট্টগ্রামের প্রবীণ আলেমেদীন, সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ, সাতকানিয়া আলিয়া মাহমুদুল উলুম মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ ও দেওদীঘি কাছেমুল উলুম কওমি মাদরাসার সাবেক মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ (রহ.) ১০ মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে চিরবিদায় নিয়ে গেলেন।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন : মাওলানা হাবীবুল্লাহ (রহ.) চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার রূপনগর গ্রামের খন্দকার বাড়ির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মৌলভি আব্দুল ওয়াদুদ মিঁয়াজি এবং মায়ের নাম রহিমা বেগম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা তিনি জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে সম্পন্ন করেন। কিশোর বয়সে তিনি একই দিনে মা-বাবাকে হারালে প্রখ্যাত আলিমেদীন, অনুবাদক ও গ্রন্থকার, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার নাযেমে আলা আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) স্বপ্রণোদিত হয়ে তাঁর সম্পূর্ণ অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। তাই আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) তাঁর অভিভাবক ও উস্তাদ। তিনি মাওলানা হাবীবুল্লাহকে চুনতি মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। ওখান থেকে কৃতিত্বের সাথে তিনি আলিম ও ফাজিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি

বরিশালের শর্ষীণা মাদরাসায় একবছর পড়ালেখা করেন। সেখানে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা নিয়াজ মাখদুম খাতানী তুর্কিস্তানি ও আবদুস সাত্তার বিহারির কাছে হাদিস পড়েন। আবহাওয়া তাঁর প্রতিকূল হওয়ায় তিনি একবছর পর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়ায় ভর্তি হন এবং প্রথম বিভাগে কামিল হাদিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেখানে মাওলানা ওমর আহমদ ওসমানী ও শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ আমিন ছিলেন তাঁর প্রিয় ওস্তাদ।

জামিয়া আহলিয়া মুঈনুল ইসলাম, ডলুকুল নূরিয়াসহ বহু কওমি মাদরাসার তিনি মজলিসে শূরার প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। পঠন-পাঠনে তাঁর আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিলো। কঠিন ও জটিল কথাকে সহজভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা ছিলো তাঁর। মেধাবী ও কম মেধাবী শিক্ষার্থী নির্বিশেষে সবাই তাঁর ক্লাসে উপকৃত হতো।

মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ ছিলেন আদর্শ শিক্ষক এবং যুগসচেতন আলেমেদীন। বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় তাঁর হাজার হাজার ছাত্র নানা খিদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি ছিলেন উদার হৃদয়ের অধিকারী। কওমি ও আলিয়া উভয়ধারার ওলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখতেন তিনি।

কুরআনের শিক্ষাবিস্তার এবং দীনের খেদমতে সারা জীবন ত্যাগ ও কুরবানি দিয়েছেন তিনি। ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবন যাতে শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারমুক্ত হয় এবং সুন্নাতে রাসুল (স.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণে জীবন যাতে শুদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয় সে পথে একনিষ্ঠ প্রয়াস চালিয়েছেন।

স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে তিনি খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.)-এর সাথে নেজামে ইসলাম পার্টির রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন এবং পার্টির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেন। ইসলামি আদর্শের আলোকে কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিলো তাঁর লালিত স্বপ্নসাধ। পরে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিলেও আন্তর্জাতিক ও দেশীয় রাজনীতির নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখতেন। ইসলামপন্থীরা পারস্পরিক দলাদলি ভুলে এক হওয়াই কামনা করতেন সবসময়।

প্রথিতযশা আলেমেদীন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ (রহ.) কওমি ও আলিয়া উভয় ধারার শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যুক্ত থেকে দারস-তাদরিস, সুনাগরিক গঠন, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সফলতার শ্রেষ্ঠ আসন অলংকৃত করেছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল, উদার, পরোপকারী ও অতিথিপরায়ণ। কৃতজ্ঞতাবোধের প্রাবল্য তাঁর জীবনকে মহিমান্বিত করে। বাড়িতে যতো মেহমান আসুক, যত্নআত্তি ও আতিথ্য প্রদর্শনে তিনি কখনো কার্পণ্য করেননি। সংগ্রাম ও বৈরী পরিস্থিতির মোকাবেলা করে তিনি বড়ো হয়েছেন। বিনয়, সৌজন্য, ঋজুতা ও গাম্ভীর্য তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য আলোকিত দিক। শিক্ষকতার পাশাপাশি মানবসেবায় ব্রতী হয়ে হোমিও চিকিৎসায়ও নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সরকারি রেজিস্টার্ড চিকিৎসক। রোগ নির্ণয় ও ওষুধ নির্বাচনে তাঁর পারঙ্গমতা ছিলো বিস্ময়কর। ড. হ্যানিম্যানের 'অর্গানন অব মেডিসিন' ও ড. বোরিকের 'মেটেরিয়া মেডিকো' ছিলো তাঁর প্রিয় চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাবীবিয়া হোমিও ফার্মেসিতে নানা পেশার ক্রনিক রোগী ভিড় জমাতেন প্রতিদিন। ফি আর ওষুধ খরচ নিয়ে তিনি কোনো দিন চাপাচাপি করেননি। অনেকে বিনা পয়সায় ওষুধ নিয়ে যেতেন। তিনি চিকিৎসাকে সেবাব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার এমপি অধ্যাপক ড. আবু রেজা নদভী মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ (রহ.)-এর নামাজে জানাজাপূর্ব বক্তৃতায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'আমার চাচা (হজরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ রহ.) আমাকে আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ায় ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। তৎকালীন প্রধান পরিচালক হযরত হাজি ইউনুছ সাহেবকে তিনি সুপারিশ করেন। তাঁর নেক দুআ' সবসময় পেয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মরহুমের সুকৃতিগুলো কবুল করুন, আমিন'।

তাফসির অধ্যয়নের প্রতি মরহুমের বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করা যায়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভির 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা', আল্লামা আশরাফ আলি থানভির 'বায়ানুল কুরআন', আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানির 'তাফসিরে ওসমানি', আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফীর 'মাআরিফুল কুরআন' ও আল্লামা ইকবালের 'কুল্লিয়াত' সবসময় অধ্যয়ন করতেন। বাংলা, উর্দু ও আরবি ভাষায় দক্ষতা ছিলো তাঁর। ছাত্রজীবনে তার শিক্ষার মাধ্যম উর্দু থাকায় উর্দুচর্চায় তিনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। 'আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) জীবন ও কর্ম' স্মারকে উর্দু ভাষায় লিখিত তাঁর নিবন্ধ সমৃদ্ধ উর্দু সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রয়োজনীয় ইংরেজিও তিনি জানতেন। হস্তলিপিও ছিলো আকর্ষণীয়। খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, প্রিন্সিপাল এ এ রেজাউল করিম চৌধুরী ও মাওলানা তৈয়ব সাহেব তাঁর বেয়াই।

তিনি ১০ মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে ৯৫ বছর বয়সে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। জিরি জামিয়া আরাবিয়ার প্রধান পরিচালক শাহ আল্লামা মুহাম্মদ তৈয়ব, পটিয়া আল জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারি, পদুয়া হেমায়তুল ইসলাম মাদরাসার প্রধান পরিচালক মাওলানা সরওয়ার কামাল আজিজির নেতৃত্বে পৃথক পৃথক প্রতিনিধিদল তাঁর নামাজে জানাজায় শরিক হয়েছেন। চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া, গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া আলিয়া, বাজালিয়া ফাজিল মাদরাসা ও সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসা প্রিন্সিপাল ও শিক্ষকরা নামাজে জানাজায় অংশ নেন।

নামাজে জানাজায় দূর-দূরান্ত থেকে রেকর্ড পরিমাণ মানুষের উপস্থিতি তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চমাকাম নসিব করুন। মহাকবি ইকবালের ভাষায়-

'আকাশ বর্ষণ করুক তোমার কবরে রহমতের বারিধারা,
আলোকময় সবুজ মাটি যেনো এ ঘরকে দেয় পাহারা।'

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.)

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার অন্তর্গত পশ্চিম মাদার্শার ঐতিহ্যবাহী খন্দকার বাড়ির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভি আবদুল ওয়াদুদ মিয়াজি। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মার আকিয়াবে প্রায় সময়ে যাওয়া-আসা করতেন।

শৈশবে তাঁর মাতা-পিতা ইন্তেকাল করলে তিনি তাঁর জেঠা জনাব বদিউর রহমানের কাছে আশ্রিত হন। নিজ এলাকার মৌলভির নিকট থেকে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করার পর আল্লামা

ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৪৫ সালে কৃতিত্বের সাথে তিনি ফাযিল পাশ করেন। সে সময় হাকিমিয়া মাদরাসা কলকাতা, বেঙ্গল বোর্ডের অধীনে ছিলো। ফাযিল সম্পন্ন করার পর নিজের অর্জিত শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে তিনি ইংরেজি ও অংকশাস্ত্রে বিশেষভাবে লেখাপড়া শুরু করেন এবং ১৯৪৬ সালে এ দু'বিষয়ের ওপর বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। পরবর্তীতে উন্নত ক্যারিয়ার গড়ার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম শহরে গমন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চট্টগ্রাম আই আই কলেজ থেকে ১৯৫০ সালে অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডেয়েট পাশ করেন।

তিনি শিক্ষাজীবন শেষ করে শিক্ষকতা পেশাকে অবলম্বন হিসেবে বেছে নেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। চাকুরি জীবনের শুরুতে চট্টগ্রাম সরকারি খাস্তগীর গার্লস হাইস্কুলে প্রশাসনিক ও হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে উত্তম সুযোগ পেয়ে চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পাশাপাশি বিদ্যালয় সংলগ্ন স্বনামধন্য কিন্ডার গার্টেন স্কুলেও হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন।

তিনি বহুমাত্রিক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তাঁর সততা ও নৈতিকতার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের পূর্বে তিনি আকর্ষণীয় ও লোভনীয় বিভিন্ন চাকুরির সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর মেধা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ তাঁকে বনবিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেন এবং বেশ কিছুদিন অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু প্রচুর অর্থ উপার্জন করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নৈতিক স্খলন হওয়া ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয়ে তিনি বনবিভাগের এ আকর্ষণীয় চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন।

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম একজন মানবদরদী, পরোপকারী ও মানবিক বোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের বিপদে আপদে, দুঃসময়ে নীরবে হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন না, সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়াতেন। চট্টগ্রাম শহরে নামকরা স্কুল-কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেয়া, গরীব ছাত্রদেরকে নিজের স্কুলে বিনা বেতনে অধ্যায়নের সুযোগ দানে সহায়তা করা, লজিং এর ব্যবস্থা করে দেয়া, বিভিন্ন জনকে চাকুরি পাইয়ে দেয়া ইত্যাদি সহযোগিতা তিনি করতেন।

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ও তাঁর ছোটো ভাই মাওলানা হাবীবুল্লাহ শৈশবে যখন পিতৃহারা হন তাঁদের জেঠা জনাব বদিউর রহমানের অনুরোধে দু'জনের সম্পূর্ণ অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নেন আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)। তাঁর সান্নিধ্যে ও তত্ত্বাবধানে দু'ভাই বড়ো হয়ে উঠেন এবং নিজেদেরকে যোগ্য করে তোলেন। জীবদ্দশায় তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)কে একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবক হিসেবে সম্মান দেখাতেন। একইভাবে তিনিও সিরাজুল ইসলামকে অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে মহব্বত করতেন। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) বড়োছেলে মো. আবু ছফা খুব ডানপিটে ও চঞ্চল প্রকৃতির ছিলো। ছেলেকে শাসন করা পিতার পক্ষে খুবই কষ্ট হয়ে যেতো। অবশেষে ছেলের সার্বিক দেখভাল করার দায়িত্ব অর্পিত হয় মাওলানা সিরাজুল ইসলামের ওপর।

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ঐতিহ্যবাহী মক্কার বাড়ির জনাব আহমদুর রহমানের দ্বিতীয় কন্যা মোছাম্মৎ খাদিজা বেগমকে বিয়ে করেন। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) একান্ত ইচ্ছা ও আগ্রহে এই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিলো। সম্পর্কের দিক দিয়ে খাদিজা বেগম আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) ভাতিঝি। সিরাজুল ইসলাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোনো একসময় খাদিজা বেগমকে তিনি বলেছিলেন- আমি তোমাকে একজন নেক্কার স্বামী উপহার দিয়েছি। এথেকে ধারণা করা যায় সিরাজুল ইসলাম কতো বড়মাপের ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তিনি ইসলামি জ্ঞানের পাশাপাশি ইংরেজি ও অংকশাস্ত্রে খুবই পারদর্শী ছিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট তাঁর স্বহস্তে লেখা ইংরেজি চিঠি দেখলেই অনুমান করা যেতো ইংরেজি ভাষায় তাঁর জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু ছিলো।

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। বর্তমান সমাজে এ চরিত্রের মানুষ পাওয়া বড়োই দুষ্কর। তিনি মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে ১৯৭৩ সালে দুরারোগ্য ক্যান্সারে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার পুত্র ও তিন কন্যাসন্তান রেখে যান। আল্লাহপাক তাঁকে কবর ও হাশরে নিরাপদে এবং সবশেষে বেহেস্তের সম্মানিত স্থানে দাখিল করুন, আমিন!

মরহুম অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

মরহুম অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল ছিলেন একজন বরেণ্য আলেমেদ্বীন, যিনি ছিলেন ইসলামি ও জাগতিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, আমলের একনিষ্ঠতা ও ব্যবহারের মাধুর্যতায় এক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং যাঁর ঈমানদীপ্ত চেতনা, ইখলাসসমৃদ্ধ ইবাদত ও সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সুন্দর ব্যবহার তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিলো এক বিশাল ও সুউচ্চ মর্যাদার আসনে।

তিনি লোহাগাড়া উপজেলার অন্তর্গত চরম্বা ইউনিয়নের বিবিবিলা গ্রামের এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫২ সালে। পিতা- মরহুম আবদুস সালাম সিকদার ও মাতা- রাবেয়া বেগম; উভয়েই ছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ আমলের এন্ট্রান্স পাশ। পাঁচ বছর বয়সে মাতৃক্রোড়েই তাঁর শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রথম ধাপের মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন কলাউজান দারুচ্ছুন্নাহ মাদরাসা ও ঐতিহ্যবাহী গারাঙ্গীয়া আলিয়া মাদরাসায়। এরপর তিনি চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং এ মাদরাসাতেই তিনি দাখিল থেকে কামিল পর্যন্ত অধ্যয়ন করে ১৯৭২ সালে কৃতিত্বের সাথে মাদরাসা শিক্ষা সম্পন্ন করেন। মাদরাসা শিক্ষা সম্পন্ন করার পর তিনি চট্টগ্রাম এমইএস কলেজ থেকে এইচএসসি, চট্টগ্রাম কলেজ থেকে স্নাতক এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় ১৯৭৭ সাল হতে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আরবি প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। ১৯৮৬ সালের মে মাসে লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় উদীয়মান এ মাদরাসাটি অবকাঠামো, শিক্ষা-দীক্ষা,

ফলাফল তথা সব দিক দিয়ে খ্যাতির শীর্ষে উপনীত হয়। আমল ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি যেমন মুখলেস ছিলেন, সততা ও আমানতদারিতার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক নজিরবিহীন ব্যক্তিত্ব।

তিনি ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে চাকুরির মেয়াদ সমাপনান্তে আধুনগর ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি ৭ ডিসেম্বর ২০১৭, বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী আধুনগর ইসলামিয়া মাদরাসার সম্মুখস্থ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

অধ্যাপক মাওলানা নূরুল আমিন (মরহুম)

অধ্যাপক মাওলানা নূরুল আমিন চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার পূর্ব কলাউজানের প্রসিদ্ধ আছগর আলী সিকদার পাড়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক নূরুল আমিন ১৯৪৭ সালে মেধা তালিকায় ১৫তম স্থান অধিকার করে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা (তখনকার চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসা) হতে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর বরিশাল শর্ষীনা আলিয়া মাদরাসায় কামিল শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৯৪৯ সালে কৃতিতের সাথে কামিল পাশ করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং উর্দুতে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যথাক্রমে ফার্সি ও আরবি এ দু'বিষয়েও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। সম্ভবত চুনতি মাদরাসা হতে ফাজিল পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

লেখাপড়া শেষ করে তিনি পাকিস্তান ফুড ডিপার্টমেন্টে কর্মজীবন শুরু করলেও অল্পদিনের মধ্যে রংপুর কারমাইকেল কলেজে লেকচারার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং সর্বশেষ চট্টগ্রাম সরকারি কলেজসহ দেশের প্রসিদ্ধ সরকারি কলেজসমূহে উর্দু ভাষার অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চট্টগ্রাম বি.এড কলেজের অধ্যক্ষ পদেও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। সমাজসেবাতেও তাঁর অবদান স্বীকৃত। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা ফছিহউল্লাহ (রহ.)

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া (লোহাগাড়া) থানার আধুনগর ইউনিয়নাধীন রশিদেরঘোনা গ্রামের প্রসিদ্ধ মিয়া বাড়িতে তাঁর জন্ম। পিতা মরহুম মুন্সী হাশমত আলি। পারিবারিক পর্যায়ে কুরআন, নামাজ শিক্ষা ও অন্যান্য মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করেন এবং ১৯৪২/৪৩ সালে ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসা হতে ১৯৫২ সালে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। ১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিক এবং ১৯৫৯ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে ভর্তি হন। এখান থেকে ১৯৬৫ সনে আরবিতে বি.এ অনার্স এবং ১৯৬৬ সালে এম.এ পাশ করেন।

মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে প্রভাষক হিসেবে তার প্রথম চাকরি। পরবর্তীতে এম.এড করার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। যোগদানের পর তাঁকে হাতিয়ার সরকারি হাইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে পোস্টিং দেয়া হয়। তাঁর কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ অল্পদিনের মধ্যে তাকে পদোন্নতি দিয়ে সীতাকুণ্ড থানা, শিক্ষা অফিসার (টিইও) হিসেবে পোস্টিং দেয়া হয়। মাওলানা ফছিহউল্লাহ পর্যায়ক্রমে সীতাকুণ্ড থানা, রাঙ্গুনীয়া থানা ও চকরিয়া থানার থানা শিক্ষা অফিসার (টিইও) পদে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি হালিশহর মাদরাসার অধ্যক্ষ এবং চন্দনাইশ মহিলা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কাম প্রকল্প পরিচালক হিসেবেও দক্ষতা এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা ফছিহউল্লাহ (রহ.) অত্যন্ত মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন। কবি ছিলেন। চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকালে অল্প বয়সেই বিভিন্ন ঘটনা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের ওপর প্রতিনিয়ত কবিতা লিখে নন্দিত হয়েছিলেন। ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ, অনাড়ম্বর এবং সাদাসিধে তবে নীতিতে অটল।

প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ

দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া (বর্তমান লোহাগাড়া) থানাধীন চুনতি গ্রামে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ তারিখ ড. আবু বকর রফিক আহমদ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাজের ছিলেন বিশেষ প্রজ্ঞাসম্পন্ন একজন সফল শিক্ষক। মাতা মরহুমা জয়নাব বেগম ছিলেন রত্নগর্ভা এক পূণ্যবতী মহিলা। আবু বকর রফিক আহমদ নিজ পিতার কাছে আরবি, ফার্সি, উর্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৫ সালে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমান কামিল) মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৬৫ সনে এ মাদরাসা হতে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা সরকারি মাদরাসায়ে আলিয়ায় কামিল (হাদিস) ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সনে সে মাদরাসা হতে ১ম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে কামিল (হাদিস) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে ঢাকাস্থ শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজ হতে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের অধীনে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে সম্মান প্রথমবর্ষে ভর্তি হন। ১৯৭৪ সনে প্রথম বিভাগ পেয়ে আরবি ভাষায় সম্মানসহ বি.এ ডিগ্রি এবং ১৯৭৫ সনে একই বিষয়ে প্রথম বিভাগ পেয়ে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও চরিত্রবান ছাত্র হিসেবে সুখ্যাত ছিলেন।

এম.এ পাশ করার পর ১৯৭৬ সালের শুরুতে তিনি চুনতি মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। কিছুদিন পর তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ১৯৮০ সনে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। সহযোগী অধ্যাপক পদে নিযুক্তি পেয়ে ১৯৮৬ সালে গাজীপুর ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৯৯০ সন পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ১৯৯০ সনে আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়াতে সহযোগী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ঐ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এটিই আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রথম প্রবেশ। ১৯৯৬ সালে আন্তর্জাতিক ইসলামি

বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এ কোরআনিক সাইয়েন্স বিষয়ে অধ্যাপকের পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তিনি আবার দেশে ফিরে আসেন এবং ওখানে যোগদান করেন। আইআইইউসিতে যোগদানের পর তাঁকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যের মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্কলারশিপ নিয়ে মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হতে ২০০০ সালে কোরানিক স্টাডি (I'jazul Qur'an) বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। দীর্ঘ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ ও অন্যান্য শরিয়াহ সম্পর্কিত বিষয়সমূহে অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিতে পাঠদানের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ড. আবু বকর রফিক গাজীপুর ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় 'শরিয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ' বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এবং পর্যায়ক্রমে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শরিআহ' অনুষদের ডিন হিসেবে এবং আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় শরিয়াহ অনুষদের ডিন ও প্রো-ভিসির গুরুত্বপূর্ণ পদে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. আবু বকর রফিক একজন ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক। গবেষণামূলক অনেক মূল্যবান পুস্তক ও প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অসংখ্য সেমিনার ও সভায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পদও অলংকৃত করে আছেন।

আরবি, উর্দু, ফার্সি, বাংলা ও ইংরেজিতে অত্যন্ত দক্ষ ড. আবু বকর রফিক চুনতি সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলের তৎকালীন মহাপরিচালক আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সহযোগী হিসেবে তাঁর পক্ষে অনুষ্ঠানের ঘোষণা পাঠ করতেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের ব্যক্তিত্ব।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া (বর্তমানে লোহাগাড়া) থানার পশ্চিম কলাউজান গ্রামের প্রসিদ্ধ খতীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫১ সালে। তার পিতা মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবী (রহ.) হাফিজুল হাদিস হিসেবে খ্যাত একজন দক্ষ আলিম ও সুবক্তা ছিলেন। মাতা নাজমা খাতুন (রহ.) ছিলেন আদর্শ গৃহিনী। মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী শৈশবে ফখরুল মুহাদ্দিসিন মাওলানা আমীনুল্লাহ (রহ.) এর নিকট প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯৫৭ সালে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমানে কামিল) মাদরাসায় জমাতে দহুমে (বর্তমান ৫ম শ্রেণিতে) ভর্তি হন। এ মাদরাসা হতে ১৯৬৫ সালে প্রথম বিভাগে আলিম এবং ১৯৬৭ সালে ১ম বিভাগে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর সরকারি মাদরাসায়ে আলিয়া ঢাকাতে কামিল (হাদিস) শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৯৬৯ সালে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭১ সালে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে ডিপ্লোমা-ইন-উর্দু (আদিবে কামিল) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন। কামিল পাশ করার পর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরবি বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত ১৯৭৩ সালের বি.এ অনার্স (আরবি) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত ১৯৭৪ সালের এম.এ (আরবি) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে

উত্তীর্ণ হন। ছাত্রজীবনে একজন মেধাবী ও ধী-শক্তিসম্পন্ন ছাত্র হিসেবে তিনি শিক্ষকদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী ১৯৭৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে আরবি ভাষা শিক্ষক পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ফার্সি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। ক্রমাগতভাবে পদোন্নতি পেয়ে তিনি উক্ত বিভাগের প্রফেসর ও সভাপতির দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেন। পরবর্তীতে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন শেষে উক্ত বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি উর্দু ভাষায় কবিতাও রচনা করেন।
ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী "Imam Ibn Taimiyah's Concept of Ijtihad" শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।
তিনি ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ সালে ইন্তেকাল করেন। খতিব বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মাওলানা অহিদ আহমদ

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন দক্ষিণ শুকছড়ি গ্রামে মাওলানা অহিদ আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ মাওলানা আবদুল আজিম একজন জ্ঞানী আলেম, মাতা আসিয়া খাতুন খোদাভীরু রত্নগর্ভা গৃহিণী ছিলেন। শ্রদ্ধেয় পিতার কাছে প্রথম সবক গ্রহণ করেন তিনি। পারিবারিক পর্যায়ে কোরআন শরিফ পাঠ ও শিক্ষার প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ করে তিনি ১৯৫৫ সালে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদরাসায় ভর্তি হন। এ ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ হতে ১৯৫৯ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল, ১৯৬৩ সালে প্রথম বিভাগে আলিম এবং ১৯৬৫ সালে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। অতঃপর তিনি দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় কামিল (হাদিস) শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সালে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি।

১৯৬৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন কালারপুল অহিদিয়া সিনিয়র মাদরাসায় হেড মাওলানা পদে যোগদানের মাধ্যমে মাওলানা অহিদ আহমদ কর্মজীবন তথা শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকার পর ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত পটিয়া শাহচাঁন্দ আউলিয়া সিনিয়র মাদরাসায় হেড মাওলানা হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন। এরপর ১৯৭৬ হতে ১৯৭৮ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আমিরাবাদ সূফিয়া আলিয়া মাদরাসা এবং পটিয়া ইয়াসিন আউলিয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সালে দক্ষিণ শুকছড়ি আব্দুল খালেক শাহ আমিরিয়া হোছাইনিয়া হাফেজুল উলুম ফাজিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ০১.০৭.১৯৭৮ হতে এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। মাওলানা অহিদ আহমদ একজন সফল শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক ও নিষ্ঠাবান সংগঠক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

মাওলানা এরশাদ উল্লাহ খান

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত লোহাগাড়া উপজেলাধীন প্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও কুলীন মুসলিম পরিবারে মাওলানা এরশাদ উল্লাহ খান জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাওলানা শাহাব উল্লাহ খান বৃটিশ আমলের একজন বিদগ্ধ বরেণ্য শিক্ষক। পিতার হাতেই শিক্ষার হাতেখড়ি।

নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯৫৫ সালে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন। এই প্রাচীনতম শিক্ষালয় হতে ১৯৫৯ সালে দাখিল, ১৯৬৩ সালে আলিম ও ১৯৬৫ সালে ফাজিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ১৯৬৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে অর্থনীতি বিভাগে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অর্থনীতিতে বি.এ অনার্স পাশ করেন এবং ১৯৭১ সালের (১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত) এম.এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। তারপর তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করন। পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি পেয়ে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক এর মহাব্যবস্থাপক পদে অধিষ্ঠিত হন। সফলতা ও সুনামের সাথে কর্মজীবন শেষ করে তিনি বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। তিনি একজন গবেষক এবং কবি হিসেবেও সুখ্যাত।

মাওলানা শফিক আহমদ

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন আধুনগর ইউনিয়নের হরিণা গ্রামে মাওলানা শফিক আহমদ জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৪ সালে। পিতা মরহুম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ একজন সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ও সমাজসেবক। তিনি প্রথম সবক পাঠ করেন মরহুম মাওলানা মতিউর রহমান (রহ.) এর কাছে।

পারিবারিক স্তরে কুরআন শিক্ষাসহ অক্ষরজ্ঞান লাভ করার পর স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। অতঃপর ১৯৫৫ সালে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে ১৯৫৯ সালে দাখিল, ১৯৬৩ সালে আলিম ও ১৯৬৫ সালে ফাজিল (সকল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে) পাশ করেন। তারপর ঢাকা সরকারি মাদরাসায়ে আলিয়াতে কামিল প্রথম বর্ষে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সালে ১ম বিভাগে মেধা তালিকায় ১০ম স্থান অধিকার সহকারে কামিল (হাদিস) পাশ করেন। পড়ালেখা সমাপনান্তে মাওলানা শফিক আহমদ ১৯৬৭ হতে ১৯৭১ সাল পযন্ত চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় আরবি প্রভাষক হিসেবে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। তিনি চুনতির শাহ সাহেব কর্তৃক স্থাপিত বাইতুল্লাহ জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব হিসেবেও ১৯৮২-১৯৯৫ পর্যন্ত দীর্ঘদিন দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

তিনি আধুনগর ইউনিয়নের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮০-১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। মাওলানা শফিক আহমদ একজন আলোকিত জ্ঞানের অধিকারী আলেম। সুবক্তা হিসেবে তিনি দেশবরেণ্য একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। সভা-সমিতিতে জ্ঞানসমৃদ্ধ বক্তৃতা শ্রোতাসাধারণকে মোহিত করে। তিনি অত্যন্ত উঁচুমানের কবিতাও রচনা করেছেন।

তিনি ১২ জানুয়ারি ২০১৭ সালে ইন্তেকাল করেন।

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ১৯৫৯ সালের ঈদুল ফিতরের দিন আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা কেটেছে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার বাবুনগর গ্রামে। বাবুনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর পড়ালেখার হাতেখড়ি। ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত সেখানে অধ্যয়ন করে সাতকানিয়া আলিয়া মাহমুদুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। এই মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহাদ্দিস আল্লামা সাইয়িদ আসগর হোসাইন মিয়া সাহেব (রহ.)। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদ হাসান (রহ.)-এর নামে এ মাদরাসার নামকরণ। আলিয়া ও কওমি ধারার বহু প্রাজ্ঞ ওস্তাদের সামনে বসে ইলমেদ্বীন হাসিল করার সৌভাগ্য অর্জন করেন তিনি।

১৯৬৯-৭১ সালে পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ায় পড়ালেখা করেন। ১৯৭৫ সালে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে হাদিসশাস্ত্রে কামিল ডিগ্রি অর্জন করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ হতে কৃতিত্বের সাথে ১৯৮২ সালে বি.এ (অনার্স) ও ১৯৮৩ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ২০০৬ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার নাযেমে আ'লা, বাংলাদেশের বরেণ্য আলিমেদ্বীন, গবেষক ও 'শামায়িলে তিরমিযী'র অনুবাদক হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ও পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ার সাবেক মহাপরিচালক হযরত আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারি (রহ.) তাঁর কিশোর বয়সের ওস্তাদ। ড. খালিদ বলেন, "তাঁদের তীক্ষ্ণমেধা ও বহুমাত্রিক প্রতিভার প্রভাব আছে আমার ওপর। আমি তাঁদের দ্বারা লেখালিখি ও উচ্চশিক্ষায় প্রাণীত হয়েছি। হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ১৯৭৬ সালে অনার্সে ভর্তি হওয়ার আগে আমাকে সাথে করে নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ ক্যাম্পাসে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খানের সাথে পরিচয় করে দিয়েছিলেন।"

১৯৮৭ সালে সাতকানিয়া আলিয়া মাহমুদুল উলুম ফাজিল মাদরাসায় আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। ১৯৯২ সাল হতে ২০১৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চট্টগ্রাম ওমর গণি এমইএস কলেজে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ২০০৭ সাল থেকে পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ার ধর্মীয় ও সাহিত্য বিষয়ক মুখপত্র মাসিক 'আত-তাওহীদ' এর সম্পাদক ও হালিশহর এ-ব্লক হযরত উসমান (রা.) জামে মসজিদে খতিব হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ায় ৪ বছর ও চট্টগ্রাম দারুল মাআরিফ আল ইসলামিয়ায় ১ বছর ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম ক্যাম্পাসে দেড় বছর অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে চট্টগ্রামের জিরি আল জামিয়া আল আরাবিয়া আল ইসলামিয়ায় অতিথি শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

ছাত্রজীবনে (১৯৭৩-১৯৮৪) দৈনিক সংবাদ, দৈনিক বাংলার বাণী ও The Bangladesh Times এর পটিয়া মহকুমা সংবাদদাতা ও The New Nation এর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইতোমধ্যে তাঁর ২০০ নিবন্ধ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামি বিশ্বকোষ, সিরাত বিশ্বকোষ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক কালের কণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক আলোকিত পথ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক আমার দেশ, দৈনিক সময়ের আলো, দৈনিক পূর্বকোণ ও মক্কাস্থ রাবেতা আলমে ইসলামির মুখপত্র The Muslim World League Journal এ প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামি বিশ্বকোষ দ্বিতীয় সংস্করণের ৩ থেকে ৯ খণ্ড পর্যন্ত সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, আরব আমিরাত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেন।

ইতোমধ্যে তাঁর লিখিত ও অনূদিত ছোট-বড় ২০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানেও তিনি লেখালেখিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন।

তিনি বলেন, "আল্লামা আশরাফ আলি থানভী, ড. মুহাম্মদ ইকবাল (রহ.), আল্লামা ইউসুফ বান্নুরী (রহ.), আল্লামা কারি তৈয়ব (রহ.), আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী (রহ.), আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.), আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভী, আল্লামা ড. খালিদ মাহমুদ (রহ.), বিচারপতি আল্লামা তাকি উসমানী ও মাওলানা সাজ্জাদ নদভী সাহেবের অগ্রসরচিন্তা ও বর্ণাঢ্য জীবনধারা আমাদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।"

আল্লামা শায়খ আবদুল মালেক হালিম

জন্ম : আল্লামা আব্দুল মালেক হালিম (হাফিজাহুল্লাহ)। তিনি চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার অন্তর্গত পুকুরিয়া ইউনিয়নে ১৯৪১ সালের মার্চ মাসের ২১ তারিখ, জুমাবার এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক বংশধারা মিলিত হয়েছে পবিত্র মদিনা নগরীর প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী (রা.)-এর বংশের সাথে।

পিতা : তাঁর পিতার নাম আল্লামা আব্দুল হক্ব (রহ.)। দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন আলিম ছিলেন। তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের একজন দক্ষ, প্রতিভাধর আলিম ও প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন ছিলেন।

শিক্ষাজীবন : তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা ঘটে নিজ পিতা আল্লামা আব্দুল হক্ব (রহ.)র হাতে, এটাই তাঁর পারিবারিক শিক্ষার প্রথম ধাপ। শৈশবেই দ্বীনি ইলমের প্রতি আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পিতা তাঁকে আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ায় ভর্তি করিয়ে দেন। তিনি শিক্ষাজীবনের সুদীর্ঘ ১২ বছর এখানে অধ্যয়ন করেন। জামেয়া পটিয়ার ইতিহাসের আলোকিত সর্বকালের সেরা তালিবে ইলমদের মধ্যে একজন আল্লামা আব্দুল মালেক হালিম।

তাঁর সম্মানিত ওস্তাদগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন:

১. খতিবে আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ.
২. হযরত মুফতি আযীযুল হক রহ.
৩. আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ.

৪. হযরত ইমাম সাহেব হুজুর রহ.
৫. হযরত মীর সাহেব হুজুর রহ.
৬. হযরত হাজী ইউনুস রহ.
৭. আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ.
৮. হযরত আলি আহমদ বোয়ালবী রহ.
৯. হযরত মুফতি ইবরাহীম সাহেব রহ.
১০. আল্লামা নুরুল ইসলাম ক্বাদীম রহ.
১১. আল্লামা আনোয়ারুল আজিম রহ.
১২. আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদীদ রহ.

কর্মজীবন : তিনি শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। মুফতি আযীযুল হক রহ.র দিকনির্দেশনায় চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ কওমি মাদরাসা দোহাজারি মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। সেখানে অত্যন্ত সুনামের সাথে শিক্ষকতার কাজ আঞ্জাম দেন। এ মাদরাসায় তাঁর নিকট হতে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন এমন বহু আলিম পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত হন। দোহাজারি মাদরাসায় শিক্ষকতার পাঠ চুকিয়ে তাঁর মহান শিক্ষকদের পরামর্শে মনের বাসনা অনুযায়ী তিনি ইসলামি শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হন। প্রায় অর্ধশতাব্দী বছর পূর্বে তখনকার প্রত্যন্ত জনবসতি চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশের আনোয়ারাস্থ, হাইলধর গ্রামে ধর্মীয় চেতনা, ইসলামি শিক্ষার বিস্তার, বিশেষ করে প্রকৃত ও ইসলাম সম্মত নারী শিক্ষার গোড়াপত্তন করার নিমিত্তে তিনি কঠিন পরিশ্রমের বিনিময় ও অক্লান্ত সাধনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন জামেয়া আরাবিয়া বালক-বালিকা হাইলধর, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

মহিলা মাদরাসা প্রবর্তনের সংগ্রাম: মাওলানা আবদুল মালেক হালিম (হাফিজাহুল্লাহ) ৭০র দশকের প্রান্তিক সময়ে মুসলিম নারীকুলের দোরগোড়ায় ইসলামের বাণী পৌঁছাবেন এই আশায় অক্লান্ত মেহনত করেছেন এবং শত প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে বাংলাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দের দরসে নেযামির আলোকে প্রথম কওমি মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা তৎকালীন সময়ে দেশ বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাঁর এ সময়োপযোগী উদ্যোগ ইলমে দ্বীন পিপাসু মুসলিম নারীদের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টির পাশাপাশি আশার আলো সঞ্চার করে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে উঠেছে বহু ছোট বড় মহিলা মাদরাসা।

দেশ-বিদেশ সফর : তিনি প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর কাছে ইলমে দ্বীন প্রসারের বিশুদ্ধ নিয়তে যৌবনের প্রাক্কাল থেকে শুরু করে জীবনের পড়ন্ত বেলা পর্যন্ত বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় বহুবার সফর করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর হাতে স্থাপিত হয়েছে অগণিত মহিলা মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর।

তিনি বিভিন্ন কনফারেন্স ও সেমিনারে অংশ গ্রহণ করতে বহির্বিশ্বের উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র পাকিস্তান, ভারত, আরব বিশ্বের সৌদি আরব, সিরিয়া, আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, ইয়ামান, ওমান সহ আরো অনেক দেশ সফর করেছেন। উল্লিখিত দেশেগুলোতে সফরের

কারণে বাংলাদেশে তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা আন্দোলন সৃষ্টির নেপথ্যের মৌলিক অভিজ্ঞতাও অর্জিত হয়েছিলো। তাঁর আবিষ্কৃত ৭ দফা শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও দাওয়াতি কাজে ফিকর ও নজর বিনিময় করতে গিয়ে সাক্ষাত করেছেন অনেক প্রথিতযশা আলেম-ওলামার সাথে।

রাজনৈতিক জীবন: শায়খ আব্দুল মালেক হালিম বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতির একজন অগ্রনায়ক। ইসলামি রাজনীতির দেওবন্দি ধারার তিনি একজন আলোচিত ও কর্মমুখর ব্যক্তি। এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক সময়ের একজন বিপ্লবী আলিম তিনি। ৭০'এর দশকে ইসলামি রাজনীতির অস্থিতিশীল ও প্রতিকূল সময়ে যে সকল তরুণ নকিব ইসলামি রাজনীতির হাল ধরে দোদুল্যমান বহু কাফেলার পালকে তীরে নিয়ে এসে নিরাপদ করেছিলেন তাদের মধ্যে আল্লামা আবদুল মালেক হালিমের নাম শীর্ষে থাকবে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা উত্তরকালে আলিমগণের মধ্যে সর্বপ্রথম যারা সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য দল থেকে মনোনীত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনি একজন। ১৯৮৬ সালে নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে তিনি চট্টগ্রামের বাঁশখালী আসনে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৮১ সালে খতিবে আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদের (রহ.) সভাপতিত্বে গঠিত নেজামে ইসলামের বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন আল্লামা আব্দুল মালেক হালিম। ১৯৮৪ সালে তিনি নেজামে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিতায় ২০০৭ সালে তিনি নেজামে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

লেখালেখির জীবন: এতো বহুমুখী ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি লেখালেখি ও দ্বীনি বইপুস্তক রচনার জগত থেকে নিজেকে নিবৃত রাখেননি। তাঁর লেখালেখি ছিলো মূলত সময়ের ও পরিস্থিতির প্রয়োজনকে সামনে রেখে। ফলে প্রতিটি রচনার পেছনে আছে কোনো না কোনো প্রেক্ষাপট। বাংলা ভাষায় তাঁর লেখার হাত ক্ষুরধার ও ভাষার মানে তাঁর কলম গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সমকালীন আলিমগণের নিকট। তিনি পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হযরত মুফতি আযীযুল হক, হযরত মাওলানা হাজী মুহাম্মাদ ইউনুস এবং হযরত মাওলানা আবুল বারাকাত ফজলুল্লাহ (রহিমাহুমুল্লাহ) এর নিকট থেকে বাংলা ভাষায় লেখালেখির অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন নিজের ছাত্রজীবন থেকেই। বিশেষ করে খতিবে আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদের নির্দেশে মাওলানা আবদুল মালেক হালিম চুনতি মাদরাসায় আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) রুমে ৩ মাস অবস্থান করে বাংলা, ইসলামি সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেন।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বইয়ের নাম নিম্নে সংযুক্ত করা হলো:

১. ঈমানদার নারী গঠনে মহিলা মাদরাসা অপরিহার্য
২. ইসলাম ও কমিউনিজম (Islam & Communism)
৩. ইসলাম ও ক্যাপিটালিজম (Islam & Capitalism)
৪. মাদরাসা সংবিধান
৫. শিক্ষা সংস্কারের ৭ দফা

৬. নারী জাগরণে মহিলা মাদরাসার ভূমিকা
৭. আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র
৮. বিংশ শতাব্দীর ইসলামি শিক্ষানীতি
৯. কাদিয়ানীরা মুসলমান নয় (উর্দু ও বাংলা)
১০. ভ্রান্ত মতবাদ (উর্দু ও বাংলা)
১১. কাসিদায়ে হালিম (নিজের জীবনেতিহাস নিয়ে আরবিতে রচিত কবিতা সংকলন)
১২. নাসিহাহ (দ্বীনি উপদেশ সংকলন)

তাসাউফ ও তাযকিয়াহ: ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অনেক পরিশ্রমী ও কঠোর সাধনাপ্রিয় মানুষ। বিশেষ করে শরিআতের অনুসরণ অনুকরণে তিনি কুরআন ও হাদিসের নির্দেশিত পথের পথিক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। দেশের প্রখ্যাত অলি হযরত আল্লামা আলি আহমদ (বোয়ালবী) রহ. এর কাছ থেকে তিনি খেলাফাত লাভে ধন্য হন।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বিখ্যাত আলিম দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা সুলতান যওক নদভী (হাফিজাহুল্লাহ) হযরত আলি আহমদ বোয়ালবীর জীবনীগ্রন্থে বোয়ালবী হযরতের দশজন খলিফার নামের মধ্যে আল্লামা আব্দুল মালেক হালিমের নাম উল্লেখ করেছেন।

মুফতি মাওলানা গোলাম কাদের

মুফতি মাওলানা গোলাম কাদের আনুমানিক ১৯৩১/১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত মাদার্শার রূপনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ

শিক্ষাজীবন : তাঁর পিতা মৌলভী আব্দুল জব্বার। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতার হাতে শিক্ষার সূত্রপাত। ৬ বছর বয়সে তিনি চুড়ামনির শাহ সাহেব মাওলানা আহমদুর রহমানের নিকট সুরা ফাতেহার মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা আরম্ভ করেন জনাব আবু ছফা সহ। পাশাপাশি প্রাইমারি স্কুল হতে ৫ম শ্রেণি পাশ করেন। এরপর তাঁর পিতা, অধ্যক্ষ মাওলানা হাবীবুল্লাহ ও মাওলানা সিরাজুল ইসলামসহ আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সাথে পরামর্শ করে তাঁকে চুনতি মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। তখন আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) চুনতি মাদরাসায় সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে কর্মরত। সেখানে তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে আল্লামা ফজলুল্লাহ ছাড়াও তখনকার হেড মাওলানা মুফতি মাওলানা আবুল হাশেম (রহ.) অন্যতম। মাওলানা গোলাম কাদের চুনতি মাদরাসায় ৩ বছর অধ্যয়নের পর আল্লামা ফজলুলাহ (রহ.) পদুয়া হেমায়েতুল ইসলাম মাদরাসায় পরিচালক হিসেবে যোগদান করলে তিনিও সেখানে ভর্তি হয়ে দু'বছর অধ্যয়নের পর সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে শরহেজামী পর্যন্ত পড়ালেখা চালিয়ে যান।

এরপর তিনি মুফতিয়ে আযম আল্লামা ফয়জুল্লাহর (রহ.) মেখল মাদরাসায় তিন বছর এবং দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে ১৯৫৯ সালে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসা থেকে পদুয়া মাদরাসা পর্যন্ত তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) তত্ত্বাবধানেই তাঁর পড়াশোনা চালিয়ে যান।

কর্মজীবন : হাটহাজারী মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করার পর মুফতিয়ে আযম আল্লামা ফয়জুল্লাহর (রহ.) পরামর্শে তিনি মেখল হামিউস সুন্নাহ মাদরাসায় শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব আনজাম দেন প্রায় ২৭ বছর। পরবর্তীতে তিনি মাদরাসা বায়তুস সালাম চট্টগ্রামের প্রধান পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বাইআত ও খিলাফত লাভ: তিনি প্রথমে মুফতিয়ে আযম'র (রহ.) কাছে বাইআত গ্রহণ করেন। যুবক অবস্থায় তিনি সুফী মুহাম্মদ মিয়াঁর কাছ থেকে খিলাফতপ্রাপ্ত হন। এরপর তাঁকে মাওলানা আজিজুল্লাহ সাহেব (রহ.) ও মাওলানা যুবাইর চাটগামী (রহ.)ও খিলাফত প্রদান করেন।

ইন্তেকাল : মুফতি মাওলানা গোলাম কাদের ১৯ অক্টোবর ২০২০ সালে রাতে প্রায় ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। পরদিন অনেক আলেম-উলামার উপস্থিতিতে আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীর ইমামতিতে নামাজে জানাযার পর তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

শাহ মাওলানা মখসুসুর রহমান ওরফে তোয়াহা মিয়া

শাহ মাওলানা মখসুসুর রহমান প্রকাশ ৩য় শাহ জাঁহাগীর ২৭ জমাদিউস সানি ১৩৩৪ হিজরি, ১ মে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে সোমবার মির্জাখিলের জাঁহাগিরিয়ার পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। দরবারের শিক্ষা কেন্দ্রেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি। প্রবল মেধাশক্তির কারণে পিতার তত্ত্বাবধানেই তিনি কুরআন হাদিসসহ বিভিন্ন বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর তিনি দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় কয়েকবছর অধ্যয়নের পর মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে কোলকাতা গমন করেন। সেখানে তিনি দারুল উলুম কুদসিয়া আকড়া আলিয়াতে ভর্তি হন। তখন আল্লামা ফজলুল্লাহ আকড়া মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কোলকাতায় প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার পাঠ চুকিয়ে তিনি ২৪ বছর বয়সে দেশে ফিরে আসেন। তিনি ছিলেন দরবারের ৩য় সাজ্জাদানশীন। তিনি ২৪ জমাদিউস সানী ১৩৯১ হিজরি, ১৬ আগষ্ট ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে সোমবার ইন্তেকাল করেন। দরবারেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

প্রফেসর সুলতানুল আলম চৌধুরী

প্রফেসর সুলতানুল আলম চৌধুরী ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরের ঐতিহ্যবাহী বহর্দ্দার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চ করাচি, পাকিস্তানের রিসার্চ প্রফেসর অব ইসলামিক ল' পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আন্দোলন কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। বলা হয় যে, তিনিই চট্টগ্রামের প্রথম পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। বহর্দ্দার বাড়ি জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) দীর্ঘকালীন অপ্রাতিষ্ঠানিক ছাত্র।

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি

দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার মাদার্শা ইউনিয়নের বিখ্যাত মক্কারবাড়ির এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৬৮ সালে প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রি.), মাতা মহিয়সী এবং রত্নগর্ভা রহিমা খাতুন।

মেধার বিচ্ছুরণে উজ্জ্বল ছাত্রজীবন : আল্লামা ফজলুল্লাহর মতো একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম যাঁর পিতা তাঁর শৈশব-কৈশোর কিভাবে কাটবে তা সহজেই অনুমেয়। একটি ভাবগম্ভীর ধর্মীয় আবহে শ্রদ্ধেয় পিতার হাতেই লেখাপড়ার হাতেখড়ি ড. আবু রেজা নদভীর। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী রত্নগর্ভা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় শুরু হয় তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন। এখানে প্রিয় পিতার সান্নিধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর ভর্তি হন বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ কওমি মাদরাসা আল জামেয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ায়। আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি হাদিস, তাফসির, ইসলামি আইনশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ সময় তিনি একজন তুখোড় মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষকদের প্রিয়ভাজনে পরিণত হন। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি উচ্চশিক্ষার্থে ভারতের উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি শিক্ষা নিকেতন দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামায় গমন করেন। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামি ব্যক্তিত্ব সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভীর সংস্পর্শে শুরু হয় ড. আবু রেজা নদভীর এক নতুন শিক্ষাজীবন। বিশ্ববিখ্যাত এ প্রতিষ্ঠানটির ব্যতিক্রমধর্মী পাঠ্যক্রম, উদারনৈতিক দর্শন, সৃজনশীল পরিবেশ ও উন্নত চিন্তাধারা তাঁর মন, মনন ও ব্যক্তিত্ব গঠনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮৯ সালে তিনি এখানে কৃতিত্বের সাথে আরবি ভাষা, সাহিত্য ও ইসলামিক স্টাডিজে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর দেশে ফিরে এসে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ থেকে পুনরায় এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০১২ সালে তিনি ভারতের প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি অর্জন করেন।

কীর্তিতে ভাস্বর কর্মজীবন: একজন কীর্তিমান মানুষের জীবন্ত প্রতিভূ ড. আবু রেজা নদভী। পরশপাথরতুল্য এ মানুষটি কর্মজীবনে যেখানেই পা রেখেছেন সেখানেই সফল হয়েছেন। যেখানে হাত দিয়েছেন সেখানেই উন্মোচিত হয়েছে নতুন কোনো দিগন্ত। তাঁর কর্মময় জীবনের সূচনা হয়েছে শিক্ষকতার মাধ্যমে।

বাংলাদেশের কওমি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন ও সংস্কারের প্রত্যয় নিয়ে বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়ার আরবি সাহিত্য ও হাদিসের শিক্ষক হিসেবে শুরু হয় ড. আবু রেজা নদভীর কর্মজীবন। শিক্ষকতার পাশাপাশি এখানে তিনি আন-নাদী আস-সাকাফী আল-ইসলামী (ইসলামি সাংস্কৃতিক ফোরাম) নামে একটি প্লাটফর্ম গড়ে তুলেন। যা ছিলো সে সময়ের জন্য কওমি মাদরাসা শিক্ষা জগতে একটি সম্পূর্ণ নতুন ও ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। পাশাপাশি তিনি প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষকতার পাশাপাশি তাঁর ওপর

অর্পিত হয় বিদেশ বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব। নবপ্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতকরণ ও আরব বিশ্বের বৃহত্তম দাতা সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও আস্থা অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা, অবকাঠামোগত উন্নয়নের এক কঠিন সংগ্রামে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের ফলে অতি অল্প সময়ে তিনি এ সংগ্রামে সফল হন। মুসলিম বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি ও সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত করা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে সীতাকুণ্ড উপজেলার কুমিরায় আধুনিক স্থাপত্যশৈলিতে নির্মিত স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানামুখী উন্নয়নে তিনি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. সংসদ সদস্য: চট্টগ্রাম-১৫, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোয়নে ১০ম ও একাদশ (২ বার) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত)

২. সদস্য: শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

৩. চেয়ারম্যান (ট্রাস্টি বোর্ড): আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

৪. সদস্য: সাউদি-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারিয়ান ফ্রেন্ডশিপ কমিটি

৫. সদস্য: শেখ যায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৬. প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন (এনজিও ব্যুরো নিবন্ধিত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান)

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ড. আবু রেজা নদভী: আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষত আরব বিশ্বে ড. আবু রেজা নদভী ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পরিচিত এবং বিশ্বস্ত একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি মুসলিম বিশ্বের বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে সরাসরি জড়িত। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

১. সদস্য: আন্তর্জাতিক ইসলামি সাহিত্য সংস্থা, জেদ্দা।

২. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর মুসলিম স্কলার, কাতার।

৩. ভাইস চেয়ারম্যান: ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর রিলিফ, ওয়েলফেয়ার এন্ড ডেভলপমেন্ট, বাংলাদেশ অফিস।

৪. সদস্য: সৌদি সরকার কর্তৃক গৃহিত 'হজ বিশ্বকোষ' রচনা কমিটি এছাড়াও যেসব আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সেগুলো হলো:

অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি), ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ড-জেদ্দা, রাবেতা আল আলম আল ইসলামি (মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ) মক্কা মোকাররমা, ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি), ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক চেরিটেবল অর্গানাইজেশন-কুয়েত, ফেডারেশন অব ইসলামিক অর্গানাইজেশন ইন ইউরোপ, ইউরোপ গবেষণা ও ইফতা পরিষদ-লন্ডন, যাকাত হাউজ-কুয়েত, শেখ যায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ফাউন্ডেশন-আবুধাবি, কুয়েত ন্যাশনাল কমিটি ফর ডোনেশন কালেকশন, কুয়েত পাবলিক ফাউন্ডেশন, শেখ আবদুল্লাহ নূরী চ্যারিটি সোসাইটি-কুয়েত, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি-আবুধাবি, কাতার চ্যারিটি-কাতার, কাতার অথরিটি ফর চ্যারিটি-কাতার, সুন্নাহ ও সিরাত গবেষণা সেন্টার-কাতার, শারজাহ চ্যারিটি হাউজ-সংযুক্ত আরব আমিরাত ইত্যাদি।

তিনি প্রায় শতাধিক আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান আলোচক ও গবেষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। পরিদর্শন করেছেন বিশ্ববিখ্যাত শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়। ভ্রমণ করেছেন বিশ্বের ৪৫টির অধিক দেশ। আন্তর্জাতিক কোনো সম্মেলনে অংশগ্রহণ, কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা দাতা সংস্থার সাথে সমঝোতা বা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বের যেসব দেশ ভ্রমণ করেছেন তা হচ্ছে: কুয়েত সরকারের রাজকীয় আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে কুয়েত সফর (ফেব্রুয়ারি-২০১০)। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর (২০১১)। এছাড়াও সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, বেলজিয়াম, সুইডেন, লুক্সেমবার্গ, ফিনল্যান্ড, হল্যান্ড, কানাডা, মিসর, ভারত, সিরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওমান, কাতার, লিবিয়া, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, শ্রীলংকা, ব্রুনাই, বাহরাইন, মালদ্বীপ, সেনেগাল, তুরস্ক, মরক্কো, মায়ানমার ইত্যাদি।

সমাজসেবার পথিকৃৎ ড. আবু রেজা নদভী: ড. আবু রেজা নদভী তাঁর স্বনামধন্য পিতা মরহুম আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহর নামে ধর্মীয় উন্নয়ন ও বহুমুখী সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বেসরকারি সেবা ও সাহায্য সংস্থা 'আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন'। এটি এন.জি.ও ব্যুরো (রেজিঃ নং-১৭৭০) ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধনকৃত। তিনি এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে প্রায় ৫৫০০টি জনকল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। নিম্নে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো:

* বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৬৮০টি মসজিদ নির্মাণ।
* ১৫০০টির অধিক অজুখানা নির্মাণ।
* ১০,০০০ এর অধিক গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন।
* ৭০টির অধিক বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা, হিফজখানা ও এতিমখানা ভবন নির্মাণ।
* ২০০ জনের অধিক গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।
* ২০০৮ সাল থেকে ৭০০ জন এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত মাসিক বৃত্তি প্রদান।
* দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সাহায্য প্রদান।
* বন্যাদুর্গত এলাকার এবং শীতার্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ।
* প্রতিবছর লক্ষাধিক মুসলমানের মাঝে ইফতারি ও কুরবানির গোশত বিতরণ।
* প্রতিবছর ২ থেকে ৬ জন গরীব মানুষকে হজ করার সুযোগ প্রদান।
* দরিদ্র লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা (বিশেষ করে সেলাই মেশিন ও রিকশা বিতরণ এবং দোকান ঘর তৈরি) ইত্যাদি।
* গ্রামীণ গরীব মহিলাদেরকে কারিগরী শিক্ষা যথা এম্ব্রয়ডারি, বুটিক, বাটিক ইত্যাদি প্রশিক্ষণপূর্বক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।
* ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ও এতিম-দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
* চিকিৎসা, গরীব ও এতিমদের বিয়ে উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

* বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' আক্রান্ত দুর্গত এলাকায় (বাগেরহাট, আমতলী, মোড়েলগঞ্জ) গৃহহীনদের জন্য 'আমীরাত পল্লী' নামে ৭২টি ঘর, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি স্কুল ও একটি মাদরাসা সম্বলিত একটি আদর্শ পল্লী নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ওআইসির অর্থায়নে মাদারীপুর জেলায় আরো ৪২টি ঘর ও একটি সুরম্য মসজিদ সম্বলিত 'ওআইসি পল্লী' নামে আরেকটি আদর্শ পল্লী নির্মাণ হয়েছে। নিজ উপজেলা সাতকানিয়ায় কুয়েতের এক দাতব্য সংস্থার অর্থায়নে নির্মাণ করেছেন আরও ৩টি এবং লোহাগাড়ায় ১টি সহ মোট ৬টি দরিদ্র পল্লী।

গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় ড. আবু রেজা নদভী : বহুমুখী প্রতিভার আধার ড. আবু রেজা নদভীর আরেকটি অন্যতম পরিচয়-তিনি একজন ভাষাবিদ, গবেষক, লেখক ও ইসলামি চিন্তাবিদ। আরবি, উর্দুতে পূর্ণ পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও ফার্সিতে রয়েছে তাঁর উল্লেখযোগ্য দক্ষতা। তিনি সর্বপ্রথম সৌভাগ্যবান বাংলাদেশি যার লিখিত আরবি গ্রন্থ কুয়েতের ওয়াকফ এন্ড ইসলামিক এফেয়ার্স মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আর কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশের পথে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে তাঁর প্রায় ২২টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হলো:

গ্রন্থাবলি : ১. হাদিসে নববির আলোকে ফিকহ ও ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি, ১২৮ পৃষ্ঠা, কুয়েত ওয়াকফ ও ইসলামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে প্রকাশিত, আগস্ট ২০০৭ (আরবি)। বর্ধিত কলেবরে ৩০৮ পৃষ্ঠার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, ২০২১ সালে আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন ও আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের গবেষণা বিভাগের যৌথ প্রকাশনায়।

২. আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক বাংলায় অনুদিত 'শামায়িলে তিরমিযী'র সম্পাদনা ও পরিমার্জন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত, ২০১৯।

৩. 'কুল্লিয়াতে আল্লামা ফজলুল্লাহ' (আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) রচিত বাংলা, আরবি, উর্দু ও ফার্সি কবিতাসমগ্র) সংকলন ও সম্পাদনা, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত, ডিসেম্বর ২০২০।

৪. বাংলাদেশে ইসলামি দাওয়াতের ক্রমবিকাশ (আরবি), আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত, ২০২১।

৫. বিরল প্রতিভাধর এক জ্ঞানতাপস আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ২০২২ সালে আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন ও আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের গবেষণা বিভাগের যৌথ প্রকাশনা।

৬. মুআল্লিমুল ইন্‌শা, বাংলা অনুবাদ (আরবি রচনা ও অনুবাদ শিক্ষার অনন্য গ্রন্থ) লেখক : আবদুল মাজেদ নদভী, যা অসংখ্য সরকারি ও কওমি মাদরাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত, ১৯৯৬ ও ২০০৩।

৭. ভ্রাতৃত্বের পয়গাম, (আরবি থেকে অনূদিত) শেখ নাদের আবদুল আযিয আল নূরী, কুয়েত, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত, ১৯৯৭।

৮. আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক রচিত 'যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম' গ্রন্থের পরিমার্জন ও সম্পাদনা (যন্ত্রস্থ)

৯. আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক রচিত 'আদ দুররুল বহীয়্যু ফি শরহী জামি আত তিরমিযী' (উর্দু), পরিমার্জন ও সম্পাদনা।

১০. আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক রচিত 'কাদিয়ানিদের ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা' গ্রন্থের পরিমার্জন ও সম্পাদনা।

১১. আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক রচিত 'আদ দুরুসুস সারফিয়্যাহ' (আরবি ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য সহজ ও আধুনিক পদ্ধতিতে লিখিত একটি অনন্যগ্রন্থ, ১৯৮৭ সালে ইসলামিয়া লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। এটি অনেক সরকারি মাদরাসায় সিলেবাসভুক্ত ছিলো।) মূল উর্দু থেকে বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা।

১২. আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক রচিত 'আদ দুরুসুন্ নাহবিয়্যাহ'। মূল উর্দু থেকে বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা।

প্রবন্ধ-নিবন্ধঃ

১. রাসুল (সা.) এর যুগে শিক্ষাব্যবস্থা (আরবি), আইআইইউসি স্টাডিজ, সংখ্যাঃ ডিসেম্বর ২০০৪, ভলিয়মঃ ২।

২. বস্তুর প্রকৃতি পরিবর্তন ও ফিকহের বিধানে তার প্রভাব (আরবি), আইআইইউসি স্টাডিজ, সংখ্যাঃ ডিসেম্বর ২০০৬, ভলিয়মঃ ৩।

৩. কবি মুহাম্মদ ইকবাল ও তাঁর কবিতার দর্শন (আরবি), ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল 'ছাক্বাফাতুল হিন্দ', সংখ্যা : ৪/২০১০, ভলিয়ম : ৬১।

৪. অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা বিষয়ে কিছু সংশয় ও শরিআতের নীতিমালার আলোকে তার পর্যালোচনা (আরবি), আলজেরিয়ার আম্মার ছলিজী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যানিটেরিয়ান ও সোস্যাল সাইন্স অনুষদ থেকে প্রকাশিত ইসলামিক স্টাডিজ জার্নালে প্রকাশিত, ডিসেম্বর ২০১৪, সংখ্যা : ৫।

৫. ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহ ও এক্ষেত্রে মুসলিম আলেম ও প্রাচ্যবিদদের ভূমিকা (আরবি) [১ম পর্ব] ভারতের নাদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল 'আল বা'ছ আল ইসলামি', অক্টোবর ২০১১, সংখ্যা : ৩, ভলিয়ম : ৫৭।

৬. ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহ ও এক্ষেত্রে মুসলিম আলেম ও প্রাচ্যবিদদের ভূমিকা (আরবি) [২য় ও শেষ পর্ব] ভারতের নাদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল 'আল বা'স আল ইসলামি', নভেম্বর ২০১১, সংখ্যা : ৪, ভলিয়ম : ৫৭।

৭. ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্যান্য শিক্ষাব্যবস্থা : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা (আরবি), ভারতের নাদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল 'আল বা'স আল ইসলামি', জুন ২০১১, সংখ্যা : ১০, ভলিয়ম : ৫৬।

৮. ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের উৎসসমূহ (আরবি) [১ম পর্ব], ভারতের নাদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল 'আল বা'ছ আল ইসলামি', জুন ২০১০, সংখ্যা : ৯, ভলিয়ম : ৫৫।

৯. ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের উৎসসমূহ (আরবি) [২য় ও শেষ পর্ব], ভারতের নাদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল 'আল বা'ছ আল ইসলামি', জুলাই ২০১০, সংখ্যা : ১০, ভলিয়ম : ৫৫।

১০. আরবি কবিতায় মানবিকতা (আরবি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল 'আল মাজাল্লাহ আল আরবিয়্যাহ', জুন ২০১০, সংখ্যা : ১৩, ভলিয়ম : ১২।

১১. সালাফিয়্যাত : মর্ম ও প্রভাব (আরবি), ২০১১ সালে রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সংকলনে প্রকাশিত।

১২. সমকালীন সামাজিক সমস্যা ও ইসলামে তার সমাধান (আরবি), ভারতের নাদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল 'আল বা'ছ আল ইসলামি', জুন ২০১২, সংখ্যা : ১০, ভলিয়ম : ৫৭।

১৩. ইসলামি অর্থনীতিতে ক্রেডিট (আরবি), ভারতের নাদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল 'আল বা'স আল ইসলামি', অক্টোবর-নভেম্বর ২০১২, সংখ্যা : ৪, ভলিয়ম : ৫৮।

১৪. ইসলামে বায়তুল মাকদিস (আরবি), ভারতের নাদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল 'আল বা'ছ আল ইসলামি', এপ্রিল ২০১২, সংখ্যা : ৮, ভলিয়ম : ৫৭।

১৫. প্রবাসী কবিদের কবিতায় রম্যগল্পের চিত্রায়ন (আরবি), ভারতের কেরালাস্থ কালিকুট বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল, জানুয়ারি ২০১৩, সংখ্যা: ২, ভলিয়ম : ৩।

১৬. আরবি সাহিত্যের মৌলিকত্ব বনাম আধুনিকতা (আরবি), ভারতের আলীগড় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল, ২০১০-২০১১, সংখ্যা : ২, ভলিয়ম : ৩০।

১৭. জ্ঞান, শিক্ষা ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (আরবি), ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার জার্নালে প্রকাশিত।

১৮. আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থা কী রূপ হওয়া উচিত (আরবি), জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া থেকে প্রকাশিত 'মানারুশ শারক' এ প্রকাশিত।

১৯. মধ্যপন্থার ভিত্তি সুদৃঢ়করণে সিরাতে নববীর ভূমিকা (আরবি), মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে প্রকাশিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত, অক্টোবর ২০২০।

২০. মধ্যপন্থা প্রচারে আলেমদের অবদান (আরবি), ২০১৬ সালের ৩০ জুলাই ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত 'সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার মোকাবেলায় ইসলামের মধ্যপন্থা নীতি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপিত। পরবর্তীতে মক্কাস্থ মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ থেকে প্রকাশিত জার্নালে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত।

২১. বাংলাদেশে ইসলামের প্রবেশ ও প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (আরবি), ২০১৮ সালে রিয়াদস্থ কিং আব্দুল আযিয ফাউন্ডেশন থেকে বড় বড় কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হজ ও হারামাইন বিশ্বকোষে প্রকাশিত।

২২. ইসলাম তালাক দেয়ার অধিকার পুরুষের উপর কেনো অর্পণ করলো (আরবি), ভারতের নাদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল 'আল বা'ছ আল ইসলামি' এ প্রকাশিত।

২৩. ইবনে খালদুন এবং তাঁর মুকাদ্দিমার ওপর একটি পর্যালোচনা (উর্দু)।

২৪. দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস (আরবি)

২৫. আখেরাত (উর্দু)

২৬. বিশ্বায়নের যুগে সৌদি আরব (আরবি)

২৭. খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযিয এর বহুমুখি অবদান (আরবি)

২৮. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম

একজন সফল মানুষের জীবন্ত প্রতিভূ ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী। জীবনের ষাটতম বসন্ত ছুঁই-ছুঁই করলেও এখনো তিনি অদম্য কর্মশক্তি ও তারুণ্যে ভরপুর একজন সংগ্রামী মানুষ। দেশ ও জাতির সেবায় নিবেদিতপ্রাণ এ মানুষটির অনাগত জীবনের প্রতিটি দিন হোক আরো কর্মময়, আরো ভাস্বর- মহান আল্লাহর কাছে এটাই প্রার্থনা।

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সহপাঠী ও বন্ধু

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ (রহ.) (বড়ো হুজুর)

কুতুবুল আলম সুলতানুল আউলিয়া হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ (রহ.) প্রকাশ হযরত বড়ো হুজুর (রহ.) গারাঙ্গীয়া ১৮৯৪ ইংরেজি ১৩১৪ হিজরিতে বর্তমান পৈত্রিক ভিটা গারাঙ্গীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত সুফী মুহাম্মদ আলাউদ্দিন মিয়াজী। মায়ের নাম মোছাম্মৎ রাহাত জান বেগম মতান্তরে রাহাতুন্নেছা বেগম। তাঁর পূর্বপুরুষগণ আরব দেশ থেকে চট্টগ্রামে আগমন করেন। তিনি পিতার দিক দিয়ে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং মাতার দিক দিয়ে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর বংশধর বলে জানা যায়।

মাওলানা শাহ আবদুল মজিদ (রহ.) তাঁর পিতার কাছে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি গারাঙ্গীয়া মাদরাসার পশ্চিম দিকে মির্জাখীল গ্রামে হযরত মাওলানা আবদুল লতিফ (রহ.)-এর নিকট উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে মির্জাখীল দরবারের প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন ও শায়খ হযরত মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) থেকে ফার্সি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। সে সাথে আরবি ও উর্দুতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। হযরত মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) ও অন্যান্য মুরব্বীগণের পরামর্শে তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জনের নিমিত্ত ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদরাসায় জামাতে ছাহারুম (তখনকার নবম শ্রেণি) এ ভর্তি হন। অতঃপর বুজর্গ উস্তাদগণের এজাজত নিয়ে তিনি দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা থেকে মুহসেনিয়া সরকারি হাই মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে মুহসেনিয়া মাদরাসা থেকে হায়ার মাদরাসা পরীক্ষায় (ফাযিল সমমান) অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, এখানেই বড় হুজুর শাহ মাওলানা আবদুল মজিদ (রহ.) ও আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) সহপাঠী। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এখান থেকে আসাম বোর্ডের অধীনে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে ফাজিল উত্তীর্ণ হন।

হযরত বড়ো হুজুর (রহ.) চট্টগ্রাম শহরস্থ মুহসিনিয়া সরকারি হাই মাদরাসা থেকে ধর্মীয় শিক্ষা সমাপ্ত করে কিছুদিন চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় অবৈতনিক শিক্ষকতা করেন। অতঃপর পিতা-মাতার বড়ো সন্তান হিসেবে পারিবারিক তাগিদে গ্রামে ফিরে আসেন এবং বাড়ির নিকটস্থ রূপকানিয়া গ্রামের দরোগা বাড়ির জুনিয়র মাদরাসায় শিক্ষকতায় যোগদান করেন। রূপকানিয়া জুনিয়র মাদরাসায় শিক্ষকতাকালীন ১৯২০ সালে তিনি গারাঙ্গীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালে গারাঙ্গীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে তরিকতে দাখিল হওয়ার জন্যে হযরত বড়ো হুজুরের (রহ.) মনে আগ্রহ জন্মে। ১৯২১ সালে হযরত বড়ো হুজুর চুনতির কাজি মাওলানা ইউসুফ এর কাচারি ঘরে হযরত মাওলানা হাফেজ হামেদ হাসান আলভী আজমগড়ী (রহ.)-এর হাতে তরিকতে দাখিল হওয়ার পর থেকে গারাঙ্গীয়া মাদরাসার খিদমতের পাশাপাশি তরিকতের কাজ চালিয়ে যান।

হযরত বড় হুজুর (রহ.) এবং হযরত আরকানী (রহ.) একত্রে সাতকানিয়া থেকে ভারতের উত্তর প্রদেশের আজমগড়ে হযরত আজমগড়ী (রহ.)-এর সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে সফর

করেন। আজমগড়ে অবস্থানকালীন হযরত বড়ো হুজুরকে হযরত আজমগড়ী (রহ.) খিলাফত দানে ধন্য করেন। এই সালটি ছিল ১৯৪৫ ও ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি, ১৩৬৬ হিজরি। তথায় অবস্থানের পর তাঁরই নির্দেশে পাঞ্জাবের সারহিন্দে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করেন। যিয়ারত শেষে চট্টগ্রাম ফিরে আসেন।

হযরত বড়ো হুজুর (রহ.) ছিলেন একাধারে মুফাস্‌সিরে কুরআন, মুহাদ্দিস, ইসলামি চিন্তাবিদ, ফিক্‌হবিদ, যুক্তিবাদী এবং তাসাউফের অতি উচ্চমানের মহান আল্লাহর ওলী ও পীরে কামেল। তেমনি অতি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আশেকে রাসুল (সা.) হিসেবে সারাটা জীবন সুন্নাতে নববী (সা.)-এর ছিলেন একনিষ্ঠ অনুসারী। ১৯২০ সালে গারাঙ্গীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায়ই ৫৭ বছর বাস্তব জীবনে শরিআত ও তরিকতের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন একান্ত আন্তরিকতার সাথে।

আল্লাহর এ মহান ওলি ৭ জিলক্বদ ১৩৯৭ হিজরি, ২১ অক্টোবর ১৯৭৭ ইংরেজি জুমাবার ফজরের নামায জামাতে আদায় করে সকাল ৮টার পরপরই মহান রাব্বুল আলামিনের সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব সাহেব (রহ.)

জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা: খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব আল্লামা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রহ.) চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাটহাজারী থানাধীন রুহুল্লাহপুর গ্রামে ১৩১৭ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে তিনি বাল্য জীবন অতিবাহিত করার পর হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদরাসায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের সুবিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র যথাক্রমে মাযাহির উলুম সাহারানপুর গমন করেন এবং সেখানে তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহর সহপাঠী ছিলেন।[১] এরপর দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন। সেখানে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি ও আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) প্রমুখ মহাদ্দিসগণের নিকট হতে ইলমে হাদিস লাভ করেন। হযরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (রহ.) হতে তিনি আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন, পরে তাঁর নিকট হতেই খিলাফতপ্রাপ্ত হন।

কর্মজীবন: হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রহ.) স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে সর্বপ্রথম দারুল উলুম হাটহাজারীতেই শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এখানেই তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে হাদিস শাস্ত্রসহ অন্যান্য বিষয়ের বিভিন্ন কিতাবাদীর পাঠদান করেন। দ্বীনের অগণিত অতন্দ্র প্রহরী আলিম তাঁর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে সর্বত্র দ্বীনের সার্বিক খিদমতে রত হন। খোদাপ্রদত্ত স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে দারুল উলুম হাটহাজারী মাদরাসার উপদেষ্টা কুতবল আলম হযরত মাওলানা জমীরুদ্দীন (রহ.) তাঁকে দারুল উলূম হাটহাজারীর 'নায়েবে মুহতামিম' পদে নিযুক্ত করেন। শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ সাহেব (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ সাহেব সন্দীপী

---

[১] তারিখে মাযাহির উলুম সাহারানপুর।

দারুল উলুম হাটহাজারী হতে অবসর গ্রহণ করলে হিজরি ১৩৬৩ সালে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে দারুল উলুম হাটহাজারীর মুহতামিমম (মহাপরিচালক) পদে সমাসীন করা হয়।

তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় দারুল উলুমের সার্বিক ক্ষেত্রে যে অসাধারণ উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার বিবরণ মূলতঃ ইতিহাসের এক বিস্তৃত অধ্যায়। তিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ অসাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে মাদরাসা পরিচালনার সাথে সাথে একজন আদর্শবান বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ও হক্কানি পীর হিসেবে তাসাওউফ ও সুলুক তথা আধ্যাত্মিক ও মানবিক সংশোধনের মতো পুণ্যময় কাজটিও যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়ে যান। ফলে তাঁর দ্বারা পেয়েছে অসংখ্য পথহারা, দিশেহারা মানুষ মহাসত্যের সন্ধান, আল্লাহ ও রাসুলের পথের দিশা। আল্লাহর অগণিত বান্দা তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেছেন। তন্মধ্যে আবার অনেকেই খিলাফত লাভে ধন্য হয়েছেন।

ইন্তেকাল: এ মহামনীষী তাঁর অসংখ্য ভক্ত, অনুরক্তদের ছেড়ে ১৪০২ হিজরি সালে ইহজগত ত্যাগ করে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মাকবারায়ে হাবীবী ও মাকবারায়ে জমীরীতে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

হযরত মাওলানা বদিউর রহমান রামপুরী (রহ.)

হযরত মাওলানা বদিউর রহমান রামপুরী (রহ.) ১৮৯৩ সালে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন উত্তর রামপুর নিজ পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল জব্বার মুন্সি। মাওলানা বদিউর রহমান পারিবারিকভাবে প্রাথমিক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) পিতা শাহ মাওলানা নুরুল হুদার কাছে নাহু, সরফ, আরবি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এখানে তিনি বড়ো মাওলানা আমিনুল্লাহ (রহ.) এবং চুড়ামণির শাহ মাওলানা আহমদুর রহমান একসাথে শাহ মাওলানা নুরুল হুদার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তখন থেকেই তাঁদের সাথে আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তা আমৃত্যু বজায় ছিলো। মাওলানা বদিউর রহমান দেশে ফাযিল ডিগ্রি গ্রহণ করার পর দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে সফলভাবে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরি (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি (রহ.)-এর কাছে পড়েছেন বলে কেবল শোনা যায়।

তিনি অধ্যয়নপর্ব শেষ করে টাঙ্গাইল করটিয়া সাদাত কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য, এ কলেজের তখন অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ। এ সুবাদে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর সাথে আল্লামা ফজলুল্লাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং আল্লামার বাড়িতেও তাঁর যাতায়াত ছিলো। মাওলানা বদিউর রহমান (রহ.) হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভীর (রহ.) খিলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় সেগুলো হলো- উলামায়ে হক, বিদআত কী?, পবিত্র আল কুরআনের ১০ পারা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি।

তাঁর সাথে শাহ মাওলানা আহমদুর রহমান (চুড়ামণির শাহ সাহেব), আল্লামা ফজলুল্লাহ এবং বড়ো মাওলানা আমিনুল্লাহ সাহেব ছাড়াও শাহ মাওলানা আবদুল মজিদ (রহ.) (বড়ো হুজুর), মাওলানা শাহ আবদুল মালেক কুতুবী (কুতুবদিয়া), শাহ মাওলানা শফিকুর রহমান ও শাহ মাওলানা ইলাহী বখশ (রহ.) (বাঁশখালী) প্রমুখের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। তিনি সাতকানিয়ার প্রাজ্ঞ আলেমেদ্বীন হাফেজ কারী মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফার শ্বশুর এবং আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) কনিষ্ঠ কন্যা মরহুম হুমায়রা বেগমের দাদা শ্বশুর। আল্লামা বদিউর রহমান (রহ.) ১৯৪৮ সালে হজ শেষে দেশে ফিরে বাঁশখালীর খানখানাবাদে শ্বশুর বাড়িতে অবস্থানরত পরিবারের কাছে যান এবং সেখানে কলেরাক্রান্ত হয়ে হজ পালনের ৩৯ তম দিনে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধীস্থ করা হয়।

হযরত মাওলানা শাহ আহমদুর রহমান (রহ.)

হযরত মাওলানা শাহ আহমদুর রহমান প্রকাশ চুড়ামনির শাহ সাহেব (রহ.) ১৮৯৪ সালে সাতকানিয়া উপজেলার চুড়ামনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় কুরআন শিক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর উত্তর কাঞ্চনায় মামার বাড়িতে রেখে তাঁকে নিকটস্থ নন্দীবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমাপনী শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করার পর তিনি মাদরাসা শিক্ষার প্রতি আগ্রাহান্বিত হন এবং বাড়িতে পড়াশোনা শুরু করেন। একপর্যায়ে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাবুনগর (মক্কার বাড়ির) যাতায়াত করে আল্লামা শাহ নুরুল হুদার (রহ.)-এর কাছে বেশ কয়েক বছর পড়াশোনা করেছেন। মাওলানা নুরুল হুদা ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত বুযর্গ হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এর শিষ্য। উস্তাদ নুরুল হুদার কাছে একসাথে পড়াকালীন নুরুল হুদা সাহেবের সুযোগ্য সন্তান হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর সাথে শাহ সাহেবের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং কিশোর বয়স থেকে দুজনের মধ্যে গড়ে উঠা আন্তরিক সুসম্পর্ক আজীবন বজায় থাকে। পরবর্তীতে শাহ সাহেব চট্টগ্রাম শহরের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান মুহসিনিয়া মাদরাসায় (বর্তমানে মহসীন কলেজ) ভর্তি হন। কয়েক বছর পর হাটহাজারী মাদরাসায় চলে যান। ওখানে কৃতিত্বের সাথে পড়াশোনা সম্পন্ন করে উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন। তাঁর মেধা আর আখলাক প্রশংসনীয় ছিলো বলে সুযোগ্য উস্তাদবৃন্দ তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। ওখানে পড়াশুনা শেষ করে তিনি প্রখ্যাত বুযর্গ ও তাঁর উস্তাদ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আসগর হোসাইন প্রকাশ মিয়া ছাহেব (রহ.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে পীর সাহেবের খেদমতে থেকে যান। কিছুদিন পর পীর সাহেব তাঁকে খেলাফত দান করেন। দেশে ফিরে তিনি পটিয়ার হেমায়াতুল ইসলাম কৈগ্রাম এবং জিরি মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন এবং দ্বীনি খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। পবিত্র মক্কা শরীফে দ্বিতীয় বারের মতো হজ্জ করতে গেলে তিনি ৩০ জুন ১৯৬৪ সালে ইন্তেকাল করেন এবং মক্কা শরীফে জান্নাতুল মোয়াল্লায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। এদিকে মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেবও ভারতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষকতা এবং ইসলামি গবেষণায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। দু'জন যতোদিন জীবিত ছিলেন ততোদিন তাঁদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলো। যেকোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরামর্শ, সভা কিংবা যেকোনো মাহফিলে সম্মানিত মেহমানবৃন্দের মধ্যে দু'জনকে পাশাপাশি দেখা যেতো। তাছাড়া তিনি প্রায়ই আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) বাড়িতে আসতেন।

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ

(১৮৯৪-১৯৭৮) শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক। টাঙ্গাইল জেলার শাবাজ নগর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৯১২ সালে পিংনা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স, ১৯১৪ সালে আনন্দ মোহন কলেজ থেকে এফএ এবং কলকাতার সেন্ট পলস সিএম কলেজ থেকে ১৯১৬ সালে ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ পাস করেন। পরে তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আইন বিষয়েও ১৯১৮ সালে ডিগ্রি লাভ করেন।

ইবরাহীম খাঁ ১৯১৯ সালে করটিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খাঁ পন্নীর অর্থসাহায্যে করটিয়া সাদত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ইবরাহীম খাঁ এর প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। মাঝে কিছুকাল তিনি ময়মনসিংহেও ওকালতি করেন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইবরাহীম খাঁ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি একাধিকবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য এবং ১৯৫৩ সালে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত তিনি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং ১৯৪৮-১৯৫২ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

একজন কৃতবিদ্য লেখক হিসেবেও ইবরাহীম খাঁর খ্যাতি ছিলো। তিনি বিভিন্ন লেখায় মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের কথা বলেছেন। নাটক, গল্প, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণকাহিনি ও স্মৃতিকথা মিলে তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ২১টি। সেগুলির মধ্যে কামাল পাশা (১৯২৭), আনোয়ার পাশা (১৯৩৯), ঋণ পরিশোধ (১৯৫৫), আলু বোখারা (১৯৬০), ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র (১৯৫৪), বাতায়ন (১৯৬৭), ব্যাঘ্র মামা (১৯৫১) এবং বেদুঈনদের দেশে (১৯৫৬) প্রধান। তাঁর স্মৃতিকথা বাতায়ন সমকালের মুসলিম সমাজের একটি বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে বিবেচিত। তিনি ব্রিটিশ আমলে 'খান সাহেব' ও 'খান বাহাদুর' এবং পাকিস্তান আমলে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' উপাধী লাভ করেন। নাটকে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৩) এবং সাহিত্যের জন্য একুশে পদক (১৯৭৬) লাভ করেন। ১৯৭৮ সালের ২৯ মার্চ ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর সাথে আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিলো। তিনি ২ বার আল্লামা ফজলুল্লাহর বাড়িতেও এসেছিলেন বলে জানা যায়। আল্লামা ফজলুল্লাহ বেশ কয়েকবার করটিয়ায় তাঁর কর্মস্থলে গিয়েছিলেন এবং কিছুদিন পরপর খাঁ সাহেবও আল্লামা ফজলুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করতে কোলকাতায় যেতেন। এছাড়াও আল্লামা তাঁর মাধ্যমে লোহাগাড়ার কলাউজানস্থ খতিব বাড়ির মাওলানা আবদুল মালেককে করটিয়া কলেজের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সমসাময়িক আলিমসমাজ

মুসলিম জাতির দাপট-এর হাজার বছরে সবকিছু হারিয়েও দুটি জিনিস অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে তারা আপোষ রফা করেনি; করলেও মূলনীতি বিসর্জন দেয়নি (ক) ধর্ম (খ) শিক্ষা। বলাবাহুল্য, জগতের তাবৎ প্রগতিশীল শিক্ষাকর্ম তারাই জাত-কূল-নির্বিশেষে লুফে নিয়েছে। উপনিবেশবাদ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার পর উপমহাদেশের মুসলমানগণ খুব ধীরগতিতে আধুনিক শিক্ষার অনুবর্তী হয়। এ সময়কে অবস্থান্তর যুগ বলে। আল্লামা ফজলুল্লাহর ঐ রকম অবস্থান্তর ঘটাবার ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখেন বলে আধুনিকতা-উত্তর যুগেও তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বৃটিশরাজের দৃষ্টিতে বঙ্গভূমির গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। তাই সর্বপ্রথম বাংলায় মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারি উদ্যোগে সংগঠিত করার লক্ষ্যে তারা ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার উৎপত্তি।

বড়লাট স্যার ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক ১৭৮০ সালে কলকাতায় আলিয়া মাদরাসার গোড়া পত্তনের পর থেকে মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতিচর্চার একটি উন্নততর প্লাটফরম তৈরি হয়। অতঃপর ১৮৬৬ সালে ভারতের সাহারানপুর জিলার দেওবন্দে দারুল উলুম দেওবন্দ নামক একটি কওমি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মুসলমানগণ নব উদ্যমে ইসলামি জ্ঞানার্জনে এগিয়ে আসেন। এভাবে মুসলিম সমাজে ক্রমশ ইসলামি শিক্ষার বিকাশ পর্ব নিত্য নতুন অভিধায় আবর্তিত হতে থাকে। এমনি এক পরিবেশে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় প্রতিভাধর অনন্য এক আলিমে দ্বীনস্বরূপ আবির্ভূত হন আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রি./১৩১৭-১৩৯৯ হি.)।

আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে হাদিসবিশারদ, তাফসিরবিদ, আরবি ভাষা ও ব্যাকরণশাস্ত্রবিদ এবং কবি ও লেখক। এখানে তার প্রতিভা ও সমসাময়িক উলামাসমাজ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং পারস্পরিক প্রভাব পরম্পরার সম্যক পর্যালোচনা করা হলো-

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতায় তিনি ছিলেন চিটাগাং মাদরাসার (প্রকাশ মুহসিনিয়া মাদরাসার বর্তমান মহসিন কলেজ) উলা (ফাজিল, ১৯১৯ খ্রি.) এবং মাযাহির উলুম সাহারানপুর এর ফুনুনাত সহ দাওরায়ে হাদিস পাশ (১৯২৩ খ্রি.)। উক্ত দু'টি মাদরাসাই ছিলো সে সময়ের প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। তাঁর স্মৃতিশক্তি, জ্ঞানার্জনে গভীর আগ্রহ এবং বিচক্ষণতার দরুণ তিনি ছাত্র-শিক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণকরতঃ সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। সুতরাং ছাত্রজীবন শেষ হতে না হতেই তিনি তৎকালীন প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে কর্মযোগে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত ছিলো কুরআন-হাদিসচর্চার মাধ্যমে এ দেশের মুসলমানদেরকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। এতদুদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতাকে নিজের পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং ১৯২৩ সালে কলকাতা দারুল উলুম কুদসিয়া আকড়া সিনিয়র (তাঁর যোগদান পরবর্তীতে আলিয়া) মাদরাসায় যোগদানের মাধ্যমে স্বীয় কর্মজীবন শুরু করেন।

আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ যে সময় কুরআন-হাদিস শিক্ষার বিকাশে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন তারও আগে এদেশে যাঁরা কুরআন-হাদিসচর্চায় অনন্য অবদান রাখেন তাঁরা হলেন: মাওলানা

কারামত আলী জৌনপুরী (মৃ. ১৮৭৩ খ্রি.), মাওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (রহ.) (মৃ. ১৯২১ খ্রি.) ও মাওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (মৃ. ১৯২১ খ্রি.)। জৌনপুরী পরিবার ছাড়া আরও যাঁরা অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে মির্জাখীলের মাওলানা আবদুল হাই (মৃ. ১৯২১ খ্রি.), হাটহাজারীর মাওলানা জমীরুদ্দীন (মৃ. ১৯৪০ খ্রি.), চুনতির শাহ মাওলানা নযীর আহমদ (মৃ. ১৯৪৪ খ্রি.) ও মাওলানা সাঈদ আহমদ সন্দ্বীপী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল্লামা ফজলুল্লাহর পূর্বেও বিশাল সংখ্যক আলিম-উলামা এ অঞ্চলে জ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। তাঁর সমকালে আরও অধিক সংখ্যক আলেম-ওলামা এ পথে নিজেদের উৎসর্গ করেন। এ সময়ের খ্যাতনামা আলিমদের মধ্যে বাঁশখালীর মাওলানা ফজলুর রহমান (মৃ. ১৯৬৪ খ্রি.), ছদাহার মাওলানা ওবাইদুল হক (মৃ. ১৯৬৪ খ্রি.), চরতীর মাওলানা মুহাম্মদ আমীন চৌধুরী (মৃ. ১৯৭৭ খ্রি.), মহেশখালীর মাওলানা আবুল ফছীহ মুহাম্মদ ফুরকান (মৃ. ১৯৭৭ খ্রি.), শাহ মাওলানা আবদুল মজীদ (মৃ. ১৯৭৭ খ্রি.), তাঁর ভ্রাতা মাওলানা শাহ আবদুর রশিদ (বড়ো হুজুর-ছোটো হুজুর), হেড মাওলানা মুজাফফর আহমদ (মৃ. ১৯৭১ খ্রি.), মাওলানা মীর গোলাম মোস্তাফা (মৃ. ১৯৯৩ খ্রি.), চট্টলার মাওলানা আবদুল মান্নান (মৃ. ১৯৭৯ খ্রি.), মিরসরাইয়ের মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী (মৃ. ১৯৮৬ খ্রি.), খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (মৃ. ১৯৮৭ খ্রি.), মুফতিয়ে আযম মাওলানা ফয়জুল্লাহ, মুফতিয়ে আযম, হাটহাজারী (মৃ. ১৯৭৬ খ্রি.), পটিয়ার মুফতি আযীযুল হক (মৃ. ১৯৬০ খ্রি.) প্রমুখের নাম অগ্রগণ্য।

এ সময় চট্টগ্রামের বাইরে যারা অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে ঢাকার মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (মৃ. ১৯৬৯ খ্রি.), মাওলানা আবদুল ওহাব পীরজী হুজুর (মৃ. ১৯৭৬ খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (মৃ. ১৯৮৬ খ্রি.), মাওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ী নদভী (মৃ. ১৯৭৪ খ্রি.), মুফতি আমীমুল ইহসান (মৃ. ১৯৭৪ খ্রি.), বরিশালের নিয়াজ মাখদুম আল খাতানী আত-তুরকিস্তানি (রহ.) (মৃ. ১৯৮৬ খ্রি.), সিলেটের মাওলানা আতহার আলী (মৃ. ১৯৭৬ খ্রি.), মাওলানা শাহরুল্লাহ (মৃ. ১৯৮৭ খ্রি.), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাওলানা তাজুল ইসলাম (মৃ. ১৯৬৭ খ্রি.), ময়মনসিংহের মাওলানা আবদুস সামাদ (মৃ. ১৯৭৪ খ্রি.) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আরও প্রখ্যাত আলিম ছিলেন না তা নয়; বরং বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানে সীমিতভাবে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কওমি ও আলিয়া-উভয় ধারার মাদরাসার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান ছিলো। এসময় আলিমদের প্রভাব ছিলো প্রবল; যা পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধিষ্ণু আধুনিক শিক্ষাধারার মোকাবেলায় শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এমনি এক সময় আল্লামা ফজলুল্লাহ ঐতিহ্যগত বিদ্যাভ্যাস ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনচর্চা দ্বারা সমাজে শীর্ষস্থানীয় আলিম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর পাঠদান দ্বারা প্রভাবিত হতো শিক্ষার্থী, চিন্তা-চেতনা দ্বারা সমাজ এবং হামদ-নাত দ্বারা সুরপ্রেমী মানুষেরা।

আমরা পূর্বে কলকাতার আকড়া মাদরাসার কথা উল্লেখ করেছি। এখানে তিনি ১৯৪২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছরের অধিককাল শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৪৫ সালে চট্টগ্রামের চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন। তিনি মাত্র এক দশক বাদে আমৃত্যু

এখানে কর্মরত থেকে হাদিস, তাফসিরসহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। পাঠদানের ক্ষেত্রে তার একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। কিতাবের কথাগুলি তিনি প্রথমে গল্পচ্ছলে ছাত্রদেরকে বলে দিতেন। পরে মূল কিতাব পাঠ শুরু করতেন। পাঠদানের ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা ও উপমা প্রয়োগ এবং পদ্ধতি উপস্থাপনা ছিলো খুবই মনমোহিনী।

লেখক হিসেবেও আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তাঁর সময়ে অন্যান্য যে সকল আলিম লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে হাটহাজারী নিবাসী মাওলানা নযীর আহমদ আনওয়ারী, মেখল নিবাসী মুফতি ফয়জুল্লাহর নাম উল্লেখযোগ্য। ঢাকায় যাঁরা গ্রন্থ প্রণয়নে অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে মুফতি আমীমুল ইহসান, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও মাওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ী নদভীর নাম অগ্রগণ্য।

তৎকালে যাঁরা লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে পূর্বোল্লিখিত মুফতি আমীমুল ইহসান ছিলেন ঢাকা আলিয়া মাদরাসার (শুদ্ধনাম মাদরাসা-ই আলিয়া ঢাকা) স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, মাওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ী নদভী (রহ.) ভারতস্থ নদওয়াতুল উলামা লাখনৌতে ৯ বছর শিক্ষকতা শেষে কলকাতা আলিয়া এবং পরে ঢাকা আলিয়া মাদরাসার উচ্চপর্যায়ের শিক্ষক এবং মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ছিলেন ঢাকার জামিয়াতুল হোছাইনিয়া আশরাফুল উলুম ও জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসার মুহতামিম। দেখা যায়, তুলনামূলকভাবে আল্লামা ফজলুল্লাহ ছিলেন শহর থেকে অনেক দূরে গ্রামে। উল্লেখিত তিন জনই ঢাকায় অবস্থান করে প্রকাশনার সুবিধাসমূহের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হন যা তাঁর জন্য দুর্লভ ছিলো; ফলে তাঁরা স্বীয় মেধার প্রকাশ ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ সুযোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিলেন ঢাকা থেকে প্রায় ৩৩০ কি.মি. এবং চট্টগ্রাম শহর থেকে ৬৫ কি.মি. দূরে চুনতি গ্রামে অবস্থানরত আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)। তা সত্ত্বেও তিনি কলম ধরেছেন; তাঁর লিখিত প্রত্যেকটি বই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁর রচনাশৈলির বিশেষত্ব হলো গতানুগতিকতা পরিহার। আদ-দুরুসুস সরফিয়্যাতে তিনি ব্যাকরণ লেখার এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন যা সরফ-এর ঐতিহ্যগত প্রচলিত ধারায় অনুপস্থিত এবং এটি ভিন্নভাষী ছাত্রকুলের কাছে অনায়াসলব্ধ বলে স্বীকৃতিযোগ্য।

আল্লামা ফজলুল্লাহর এক অনাবিষ্কৃত সত্তা হলো তাঁর কবিত্ব। অনাবিষ্কৃত বলতে এখানে তাঁর কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে বিদ্বৎ সমাজের অজ্ঞতাকে বুঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ যে মানের কাব্য তিনি রচনা করেছেন তার সাধারণ পাঠক দুর্ভাগ্যবশত মানোত্তীর্ণ হতে পারেনি; এর কারণ নির্মম ইতিহাস, সে সময় অনেকেই হামদ-নাত লিখে তা গেয়ে শুনিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। যাঁদের রচনায় মাত্রাগত শুদ্ধতার অভাব ছিলো; ছিলো ভাষা প্রয়োগে আনাড়িপনা। কিন্তু আল্লামা ফজলুল্লাহর কবিতা ও গান ছিলো শাস্ত্রসম্মত, ভাবাত্মক ও রোমাঞ্চ রসোত্তীর্ণ। আল্লামা ফজলুল্লাহর যুগ ছিলো আলিম সমাজের চরম উৎকর্ষের যুগ। তখন চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালী ও ঢাকাসহ দেশের নগর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলব্যাপী আলিমদের পদচারণা ছিলো ব্যাপক। এমনি একসময় আল্লামা ফজলুল্লাহ তাঁর নিষ্ঠা ও বহুমুখী প্রতিভা দ্বারা ইসলামি সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। আল্লাহ তাঁর কর্মসমূহ কবুল করুন। আমিন!

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়িখ

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর সমসাময়িক কিছু বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে সন্নিবেশিত হলো-

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী (রহ.)

জন্ম ও বংশ পরিচয় : শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ.) ১৩১৫ হিজরিতে ১২ রমযানুল মোবারক মোতাবেক ১৮৯৮ খ্রি.[১] (তাঁর এবং আল্লামা ফজলুল্লাহর জন্মগ্রহণ একই সন ১৮৯৮ খ্রি. এবং মাযাহির উলূম সাহারানপুরে অবস্থানও একই সময় ছিল) রাত এগারটায় ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগর জেলার কান্ধালাহ নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী ইলমী খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন স্বনামধন্য আলেম, খ্যাতনামা বুযর্গ হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া (রহ.)। তাঁর আম্মাও নেক্কার মহিলা ছিলেন। তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) তাঁর আপন চাচা ছিলেন। তিনি খ্যাতনামা বুযর্গ, আলিম, মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)-এর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন।

বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন : শায়খুল হাদিস (রহ.) এর খান্দানের পূর্বপুরুষেরা যেমন উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন, অনুরূপভাবে তাঁদের খান্দানের মহিলারাও ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। তাঁদের খান্দানের মহিলাদের জন্য তরজমা, তাফসীরসহ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, মাজাহিরে হক, মাশারিকুল আনোয়ার, হিসনে হাসীন প্রভৃতি কিতাবগুলো পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

৭ বছরের কিশোর যাকারিয়া অবশেষে হযরত গাঙ্গুহীর একান্ত ভক্ত অত্যন্ত নেকবখত ডা. আবদুর রহমান সাহেবের নিকট বিসমিল্লাহখানি করেন। তার নিকটেই কায়েদায়ে বোগদাদী শেষ করেন। কোনো নির্দিষ্ট মক্তবে বা নির্দিষ্ট হাফেয সাহেবের কাছে তাঁর পড়াশুনার সুযোগ মেলেনি। কেননা তার আব্বা লেখাপড়ার তুলনায় অসৎ সঙ্গের ব্যাপারে বেশি দৃষ্টি রাখতেন। কুরআন শরীফ হিফজ করা এই খান্দানের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। তাই তাঁকেও হিফজ কুরআনের সবক দেয়া হয় এবং তিনি স্বল্প সময়েই হিফজ শেষ করে তার সুযোগ্য চাচাজান, মুবাল্লিগে দীন, তাবলীগী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াছ সাহেবের নিকট উর্দু, ফার্সীর কিতাবাদি পড়েন। বার তেরো বছর পর্যন্ত তিনি গঙ্গোহ্তে অবস্থান করেন। তখন তিনি এগুলো পড়ে শেষ করেন। পরবর্তীতে তেরো বছর বয়সে শায়খের আব্বার সাথে তিনি সাহারানপুর চলে আসেন। এখানে তাঁর আব্বার কাছে আরবি ব্যাকরণের কিতাবাদী (নাহু-সরফ) পড়েন। পরবর্তীতে মানতেক শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য মানতেকের ইমাম মাওলানা

---

[১] তারিখে মাযাহির উলুম সাহারানপুর।

মাজেদ আলী সাহেবের নিকট হামদুল্লাহর মতো উঁচু পর্যায়ের কিতাব মাত্র ১৮-১৯ দিনে শেষ করেন। যাঁরা উক্ত হামদুল্লাহ কিতাব কয়েকবার পড়েছিলেন, তাঁদের সাথে শায়খ পরীক্ষা দিলে দেখা গেল শায়খই নম্বর বেশি পেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি এবং তাঁর সুযোগ্য পিতা ও হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট হতে ইলমে হাদিস শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৩২ হিজরির ৭ মুহাররম শায়খের মেশকাত শরীফের সবক শুরু করেন তার আব্বাজান। জোহরের নামাযের পর গোসল করে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে শায়খের দিকে ফিরে বিসমিল্লাহ ও মুকাদ্দামা (ভূমিকা) তার দ্বারা পড়ান। তারপর বেশ কান্নাকাটি করে ১৫-২০ মিনিট দু'আ করেন। দরসে হাদীসে তিনি দুটি জিনিসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। একটি হলো বিনা অজুতে কোন হাদিস না পড়া অপরটি কোন হাদিস যেনো এরূপ না হয় যে, উস্তাদের সামনে পড়া হয়নি। দাওরায়ে হাদিস তিনি দু'বছর পড়েন। ১৩৩৩ হিজরিতে তাঁর আব্বার নিকট ও পরের বছর হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরীর নিকট। দ্বিতীয় বছর তিনি সাথে সাথে শিক্ষক হয়ে যান। তখন তিনি প্রচুর মেহনত করতেন দিবারাত্রি মাত্র ২/৩ ঘণ্টা ঘুমাতেন। শিক্ষকতা অবস্থায় হযরত সাহারানপুরীর কাছে দাওরা পড়ে হাদিস শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন।

শায়খের পিতার ইন্তেকাল ও কঠিন পরীক্ষা : হযরত শায়খের ১৯ বছর বয়সে ১৩৩৪ হিজরির ৮ জিলক্বদ তাঁর পিতা পরলোকগমন করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন) শায়খ তাঁর আব্বার মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েন। আকস্মিকভাবে তাঁর পিতার মৃত্যুতে সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র মেয়ে, তাঁর বিবি সাহেবা ও শায়খকে রেখে যান। সে সময় আট হাজার টাকা ঋণও তাঁর ছিলো।

অধ্যাপনা : ভারতের বিশিষ্ট ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র মাযাহিরে উলুমে ১৩৩৪ হিজরি সনে দ্বিতীয়বার হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরীর নিকট বুখারি, তিরমিযী তথা দাওরায়ে হাদিসে অধ্যয়নকালে উক্ত মাদরাসায় হযরত শায়খের অধ্যাপনা জীবন শুরু হয়। অধ্যাপনার প্রথম বছর তাকে উসুলুশ শাশী ও ইলমুস্ সীগা এই দুইটি কিতাব পড়াতে দেয়া হয়। প্রথম বছরেই তিনি কিতাব দু'খানা পড়িয়ে বেশ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হন। অধ্যাপনার তৃতীয় বছরেই তিনি আরবি সাহিত্যের সর্বোচ্চ কিতাব মাকামাত ও সাব'আ মুআল্লাকাতের মতো কঠিন কিতাব পড়ানোর সুযোগ পান। এটা তাঁর অধ্যাপনার জীবনের উন্নতির প্রথম ধাপ। এসব কিতাব পড়িয়েও তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁর অধ্যাপনার অষ্টম বছরে বুখারি শরিফের মতো দুর্লভ কিতাবের ১৩, ১৪ ও ১৫ পারা পড়ানোর সুযোগ পেয়ে তিনি ধন্য হন। পরবর্তীতে তিনি শায়খুল হাদিসের পদ অলংকৃত করে গোটা মুসলিম বিশ্বে স্বীয় ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

পর্যায়ক্রমে তিনি সদরে মুদাররেস, নাজেম, প্রধান পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন করে মাযাহির উলুমের সুনাম বৃদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তিনি বলতেন, "আমি মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতাকে যতো ভয় করি আর কিছুকে ততো ভয় করি না।" শায়খের

একটানা ৬০টি বছর অধ্যাপনায় কেটে যায় "মাযাহির উলুম সাহারানপুরে।" তিনি তাবলীগ জামাতের রুহানী মুরব্বী ছিলেন বিধায় বিশ্বের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ শায়খের কাছে হাজির হয়ে মাদরাসার বিভিন্ন খাতে প্রচুর অর্থ দান করতেন। যাঁদেরকে মাদরাসায় দাওয়াত করে আনাও ছিলো অতি কষ্টকর। তিনি শুধু এ মাদরাসার সাথেই নয় বরং অন্যান্য মাদরাসার সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত গভীর।

বায়'আত গ্রহণ ও খেলাফত লাভ : হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.), ফকীহুল উম্মত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) ও হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (রহ.)'র মতো জগদ্বিখ্যাত আলেমও যেহেতু ইলমে জাহেরী হাসিলের পর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কীর দরবারে আধ্যাত্মিক সাধনা করে নিজের জীবন গঠন করেছেন। হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.)-এর মতো বড়ো আলেম হওয়া সত্ত্বেও প্রতি সপ্তাহে কুতুবে আলম হযরত গাঙ্গুহীর দরবারে হাজেরী দিতেন। ঠিক এমনিভাবে শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) ও ইলমে জাহেরীতে এতো যোগ্যতা নিয়েও ইলমে বাতেনী হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁরই বুখারির ওস্তাদ ঐ সময়ের খ্যাতনামা মুর্শিদ, মুহাদ্দিস হযরত গাঙ্গুহীর শ্রেষ্ঠ খলিফা হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরীর হাতে ১৩৩৩ হিজরিতে তাঁর বাবার জীবদ্দশায় বায়আত গ্রহণ করেন। ছেলের এতো বড়ো উদ্যোগ দেখে তাঁর বাবা সীমাহীন খুশী হয়ে ছেলের জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করেন। মুর্শিদের নিকট তিনি এতো প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন যে, মুর্শিদ তাঁকে ছাড়া পথ দেখতেন না। হযরত গাঙ্গুহীর নিকট মাওলানা ইয়াহইয়া যেনো অন্ধের লাঠি ছিলেন। একটু এদিক সেদিক হলেই গাঙ্গুহীর দরবারে মাওলানা ইয়াহইয়ার তলব শুরু হয়ে যেতো। ঠিক তদ্রূপ মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) মাওলানা সাহারানপুরীর দরবারে এর চেয়ে বেশি আদর পেতেন।

দীর্ঘ বারটি বছর হযরত মাওলানা সাহারানপুরীর সোহবত লাভ করে আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বোচ্চ সোপানে পৌঁছলে ১৯৪৫ হিজরিতে হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী ও শায়খুল ইসলাম মাদানির বড়োভাই মাওলানা সাইয়িদ আহমদ মাদানির সম্মুখে হযরত সাহারানপুরী নিজের পাগড়ি খুলে হযরত সাইয়িদ আহমাদ মাদানিকে তা শায়খুল হাদিস সাহেবের মাথায় বেঁধে দেয়ার হুকুম করেন। পাগড়ি বেঁধে দিয়ে এ সিলসিলার বায়'আত করানোর অনুমতি দান করেন।

তাঁর খলিফাদের মধ্যে দু'চার জন ছাড়া সকলেই ছিলেন যেমন মারিফাতের সূর্য তেমনি যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন। হযরতের একশত নয় জন খলিফার তালিকা পাওয়া গেছে। যাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মক্কা-মদিনা, ইংল্যান্ড, আফ্রিকা, জাম্বিয়া, কানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্রে তাঁর জাহেরী বাতেনী ইলমের ঝাণ্ডা উত্তোলন করে দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে তাবলীগ জামাআতের আমির হযরত মাওলানা আবদুল আযীয খুলনাভী দামাত বারকাতুহুম তাঁরই হাতে গড়া।

শায়খের রচিত গ্রন্থাবলি : হযরত শায়খুল হাদিসের অধ্যাপনা জীবনের প্রথম ১০টি বছর (১৩৩৫-১৩৪৪ হিজরি) কেটে যায় হযরত সাহারানপুরীর তত্ত্বাবধানে 'বজলুল মজহুদ' রচনা কাজে। এরপর বিশ্বের ঘরে ঘরে পঠিত জনপ্রিয় দ্বীনিগ্রন্থ 'ফাজায়েলে আমাল' নামক কিতাবখানা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর পরামর্শে এবং কাওকাবুদ্‌দুররী, শামায়িলে তিরমিযীর তরজমা খাসায়েলে নববী' সহ ছোটো বড়ো প্রায় ৮৪টি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তার রচিত আরবি, উর্দু গ্রন্থাবলি গোটা মুসলিম বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা হচ্ছে 'মুআত্তা ইমাম মালেক'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আউজাযুল মাসালিক'। এটি শতাব্দীর অন্যতম ইলমি কীর্তি।

তাবলীগ জামাত ও হযরত শায়খ : তাবলীগ জামাতের সাথে শায়খের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিনি তাবলীগ জামাতের একনিষ্ঠ রুহানী মুরব্বী ছিলেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বিভিন্ন জটিল ব্যাপারে শায়খের সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি দেশে-বিদেশে ছোট বড় এজতেমায় অংশগ্রহণ করে উলামায়ে কিরাম ও মাদরাসা ছাত্রদেরকে তাবলীগের প্রতি উৎসাহিত করেন। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর ইন্তেকালের পর তিনি নিজামুদ্দিনের প্রতি একান্তভাবে ঝুঁকে পড়েন এবং বেশি বেশি খোঁজখবর রাখতে থাকেন। পরবর্তীতে মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবী ও মাওলানা এনামুল হাসান কান্ধলবী উভয়েই শায়খুল হাদিসের (রহ.) সাথে পরামর্শ করেই সব কাজ আঞ্জাম দিতেন। তাই বলা চলে বর্তমান তাবলীগ জামাতের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে শায়খুল হাদিসের অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি ৫০/৬০ বছর হাদিসের দরস দিয়ে মূল্যবান পুস্তকাদি রচনা করে স্বীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে গোটা মুসলিম বিশ্বের জনপ্রিয় ও অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। অনুরূপভাবে তাঁর সমসাময়িক বুযর্গানে দ্বীনের নিকটও স্বীয় মর্যাদার আসন অর্জনে সক্ষম হন। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.), শাহ আবদুর রহিম রায়পুরী (রহ.), হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (রহ.), শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি (রহ.), মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ ও শায়েখের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আরববিশ্বের বড়ো বড়ো আলেম বিচারপতিরাও তাঁর গ্রন্থাবলি দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। নিয়মিত হাদিস অধ্যয়ন না করতে পারলে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। শায়খের সাথে হাদিসের সম্পর্ক এতই গভীর হয়ে ওঠে যে, তিনি অন্যান্য গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শায়খুল হাদিস হিসেবে এতো প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, উপমহাদেশে শায়খুল হাদিস বললে একমাত্র তাঁকেই বোঝায়।

ইন্তেকাল : শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ.) অর্ধ শতাব্দীর বেশি কাল ধরে দিশেহারা মানবসমাজের প্রশংসনীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়ে ১৪০২ হিজরির ১ শাবান মোতাবেক ১৯৮২ সালের ২৪ মে সোমবার বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে বিশ্ববাসীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে সোনার মদিনায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৭ বছর।

হযরতুল আল্লাম মুফতি আযীযুল হক (রহ.)

জন্ম ও শৈশব : ১৩২২ হিজরি সন মোতাবেক ১৯০৪/৫ খ্রি. এক রজনীতে ইলম ও মারেফাতের এই ধ্রুব নক্ষত্র শিরক-বিদআত, কুসংস্কারের দুর্গন্ধময় বিষাক্ত ব্যাধিতে কুঁকড়ে যাওয়া পটিয়ার চরকানাই গ্রামে মরহুম মাওলানা নুর আহমদের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশধারা ছিলো পবিত্র, উন্নত ও গৌরবোজ্জ্বল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে রয়েছে তাঁর বংশের বন্ধন। এ জন্যেই তিনি সিদ্দিকি।

শিক্ষাজীবন : মুফতি আযীযুল হকের প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানে পড়াশোনার সময় কুরআনুল কারিম এবং ইসলামিয়াত শিক্ষাও সমানভাবে চলে। দাদার তীব্র আগ্রহে যোগ্য আলেম বানানোর নিয়তে মুফতি সাহেবকে কৈগ্রাম হেমায়াতুল ইসলাম মাদরাসায় ভর্তি করা হয়। সেখানে বছরখানেক অধ্যয়নের পর ১০ বৎসর বয়সে তাঁর বাবার মামাতো ভাই মাওলানা আহমদ হাছান (রহ.) আপন ভাতিজাকে নিজ প্রতিষ্ঠিত জিরি মাদরাসায় নিয়ে আসেন। সেখানে পারিবারিক আদর-স্নেহ ও তদারকি পেয়ে তিনি ধাপে ধাপে দাওরাহ্ হাদিস পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যান। ১ম ব্যাচের ছাত্র হিসেবে মুফতি সাহেব প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে অনন্য মেধার স্বাক্ষর রাখেন। এখানে তিনি শায়খুল হাদিস মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ সাহেব (রহ.)-এর অপরিসীম ভালোবাসা ও দুআ' পেয়ে ধন্য হন। উচ্চশিক্ষার প্রবল বাসনা নিয়ে তিনি শিক্ষকদের দুআ' ও নির্দেশনায় ভারতের দেওবন্দ গমন করেন। হিন্দুস্থানের দারুল উলুম দেওবন্দে তিনি ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেলেও সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো না যাওয়ায় তিনি স্থায়ী হতে পারেননি। অবশেষে তিনি চলে যান মাযাহির উলুম সাহারানপুর মাদরাসায়। সেখানে বিজ্ঞ উস্তাদদের কাছ থেকে তাফসীর, হাদিস, ফিক্হ, মানতিক ও সাহিত্য অধ্যয়ন করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হিন্দুস্থানের উস্তাদদের মধ্যে তিনি সবসময় খাতিমুল মুহাদ্দেসিন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, আবদুর রহমান কামেলপুরী ও মাওলানা আসাদুল্লাহ'র অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করতেন। দেশে ও বিদেশে তিনি অনুপম মেধা ও চরিত্রের জন্য উস্তাদদের গৌরব ও নয়নমণি ছিলেন।

শিক্ষকতা: উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ১৩৪৫ হিজরি সনে ২২ বছর বয়সে তাঁর দায়িত্বে অর্পিত হলো জিরি মাদরাসার শিক্ষকতার গুরুভার। এখানে তিনি ফতোয়ার বিষয়টিও দেখতেন এবং শরহে তাহজীব, মোল্লা হাছান, তাফসীরে জালালাইন এবং মুসলিম শরীফের দরস দিতেন। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ছিলো বিশ্লেষণধর্মী ও খুবই আকর্ষণীয়।' তিনি ছাত্রাবাসের নেযামতও আঞ্জাম দিতেন। এখানে প্রায় পনেরো বছর শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন সুনিপুণ দক্ষতার সাথে। গড়ে তোলেন অসংখ্য আলেম, মুফতি, জ্ঞানী, গুণী। তার নিরলস প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জিরি মাদরাসা 'বীর প্রসবিণী' হিসেবে মাত্র অল্পদিনে সুখ্যাতি লাভ করে।

পটিয়া জমিরিয়া কামেসুল উলুম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা: মুফতি সাহেব ১৩৫৭ হিজরি সালে নিজ শায়খের পক্ষ হতে পটিয়ায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট হন। কিন্তু জিরি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মুফতি সাহেবকে বিদায় দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় ইতোমধ্যে দু'বছর চলে যায়। ১৩৫৭ হিজরি সালে জিরিতে শিক্ষকতায় বহাল থেকে মুফতি সাহেব পটিয়ায় তোফাইল আলী মুন্সী মসজিদে "কাসেমুল উলুম" নামে একটি মাদরাসার সূচনা করে দেখাশুনা করতে থাকেন আর মাওলানা আহমদ (ইমাম সাহেব), মাওলানা ঈসা, মাওলানা আমজাদ ও কারী মুসলিম প্রমুখ প্রত্যক্ষভাবে মাদরাসা পরিচালনা করে যাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে শায়খের সাথে মুফতি সাহেবের হজ্জের সফর এবং শায়খের ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে মাদরাসার কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। মুফতি সাহেব দীর্ঘ ২৩ রাত ইস্তেখারার পর জিরি থেকে চুড়ান্তভাবে চলে এসে পটিয়া মাদরাসার হাল ধরেন। আড়াই গণ্ডা জমি কিনে মুফতি সাহেব সেখানে সাতাইশ হাত লম্বা একটি মাটির ঘর তৈরি করেন। পরবর্তীতে এভাবেই উক্ত জায়গায় ক্রমান্বয়ে জামেয়া বর্তমান অবস্থানে এসে পৌছে। মুফতি সাহেব মাদরাসার দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি নিজ মুর্শিদের নাম যুক্ত করে মাদরাসার নাম রাখেন "জমিরিয়া কাসেমুল উলুম পটিয়া মাদরাসা।"

স্বভাব-চরিত্র: তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও সাধাসিধে। তাঁর হৃদয়স্পর্শী কথা আকৃষ্ট করতো যে কাউকে। আপ্যায়ন-আতিথেয়তাও ছিলো তাঁর চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিন্তা রেখা থাকতো তাঁর উজ্জ্বল অবয়বে। তবে তা ঢেকে রাখতেন হাসিচ্ছটা দিয়ে। তাঁর রুচি ছিলো সুতীক্ষ্ম, সূঁচালো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ছিলো তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। জামা-কাপড় থাকতো ঝকঝকে। সুন্দরতম চেহারা, স্বচ্ছ ও মানানসই বস্ত্র, সেই সাথে মারেফাতের আলোকরশ্মি, সব মিলিয়ে ছিলো অপূর্ব দৃশ্য।

চুম্বক আকর্ষণীয় ওয়াজ: মরহুমের জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হলো নিষ্ঠা ও দরদী মনের অমূল্য ওয়াজ। ওয়াজের পারিশ্রমিক নিয়ে যারা দর কষাকষি করে, তাঁদের প্রতি ছিলো তাঁর তীব্র ক্রোধ, প্রচণ্ড রোষ। একবার বাবুনগর মাদরাসায় একটানা দীর্ঘ বয়ানে তিনি তাদের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর বয়ান শুনে পাষাণ অন্তরও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো, যার প্রকাশ ঘটত অশ্রু ফোঁটার অবিরাম বর্ষণ দিয়ে। দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে কান্নার কানফাটানো রোল শুরু হয়ে যেতো।

রচনাবলি: তাঁর ওয়াজ যেমন ছিলো প্রাণস্পর্শী, তেমনি তাঁর রচনা ছিলো সংবেদনশীল। আরবি, ফার্সি, উর্দু, তিন ভাষায় ছিলো তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা। তৎক্ষণাৎ কবিতা রচনা করে তিনি শ্রোতাদের বিস্মিত করতেন। কেউ কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তৎক্ষণাৎ জবাব দিতেন। বিভিন্ন ভাষায় রচিত তাঁর অনেক গদ্য ও কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, (১) নে'মাল উরুজ ফি নজমীল ফরুজ- আরবী কাব্য গ্রন্থ। (২) তানজিয়াতুল খালেক- আরবি গদ্যগ্রন্থ। (৩) আল কাসিদাতুল ফরদিয়া ফি মদ্‌হে খাইরিল বরিয়্যা- তিনশ আরবি কবিতার চমৎকার সংকলন।

ইন্তেকাল: ১৩৮০ হিজরি সালের ১৫ রমজান মোতাবেক ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে জুমার নামাজের প্রাক্কালে পাক-পবিত্র হওয়ার পর মুফতি আযীযুল হক (রহ.) আপন প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের তৎকালীন খতিব আওলাদে রসুল (সা.) সাইয়িদ আবদুল করীম মাদানি (রহ.) তাঁর নামাজে জানাযা পড়ান। হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষক ও ভক্ত মুরিদের উপস্থিতিতে জানাযা শেষে নিজ প্রতিষ্ঠিত জামিয়া পটিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পশ্চিমে "মকবরায়ে আযীযীতে" তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত আল্লামা মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.)

জন্ম : মুফতিয়ে আযম (বাংলাদেশ) হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ (রহ.) এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে হিজরি ১৩১০ মোতাবেক ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা-দীক্ষা: মাত্র আড়াই বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হয়ে আপন শৈশবকাল অতিবাহিত করেন অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ১৩২০ হিজরি সালে দারুল উলুম হাটহাজারীতে ভর্তি হন। এখানে তিনি দীর্ঘ দশ বছর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পর কুরআন হাদিসে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে ভারত সফর করেন। একাগ্রচিত্তে ২ বছর ভারতের বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দে হাদিস, তাফসীর ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন: হযরতুল আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রহ.), হযরতুল আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) ও আল্লামা সাঈদ আহমদ সন্দ্বীপী (রহ.) প্রমুখ।

দেশে ফিরে তিনি দারুল উলুম হাটহাজারীতে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি এখানেই কর্মরত থাকেন। তাছাড়া তিনি ফাতওয়া প্রদানের কাজও করতেন। ফাতওয়াদানের ক্ষেত্রে তাঁর গভীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিকত্বের কারণে সারাদেশে একমাত্র তিনিই "মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ" খেতাবে ভূষিত হন। শেষ জীবনে দারুল উলুম হাটহাজারী হতে অবসর গ্রহণ করে নিজ গ্রামে হামিউস সুন্নাহ মেখল মাদরাসা নামে ব্যতিক্রমধর্মী একটি দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এতে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করেন। এ সুদীর্ঘ শিক্ষকতার যামানায় তাঁর নিকট হতে অগণিত অসংখ্য আলেম উলামা দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন। তন্মধ্যে হযরতুল আল্লাম ইয়াকুব (রহ.) শায়খুল হাদিস দারুল উলুম হাটহাজারী, খতিবে আযম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) ও হযরত মাওলানা ব্যারিস্টার সানাউল্লাহ্ (রহ.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ মাওলানা ফয়জুল্লাহ (রহ.) একজন সংগ্রামী আলেম ছিলেন, যিনি ইসলামকে বিভিন্ন কুসংস্কার, বিদ'আত, শিরক ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার হাত থেকে রক্ষায় দ্বীনি শিক্ষাবিস্তারে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি নিজের জীবনকে ইসলামের সেবায় করেছিলেন উৎসর্গ। শরিআত ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোনো কাজের বিষয়ে তিনি কোনো অবস্থাতেই নিরব

থাকতে পারতেন না। পরিবেশ পরিস্থিতি যতোই প্রতিকূল থাকুক না কেনো তিনি ন্যায় এবং সত্য কথা সমাজের সামনে তুলে ধরাকেই তাঁর প্রধান দ্বীনি কর্তব্য মনে করতেন। সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের প্রবণতা এবং অন্যায়ের সাথে আপোষ মনোভাব তাঁর কোনোদিনই ছিলো না। শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁর নীতিবিচ্যুতি ঘটতো না।

রচনাবলি: *ফয়জুল কালাম লি সায়্যিদিল আনাম *আল কাওলুস্ সাদীদ ফী হুকমিল আহওয়াল ওয়াল মাওয়াজীদ *আল ফায়সালাতুল জালীলাহ্ লি আহকামিস্ সাজদাতুত্তাহিয়্যাহ *রাফিউল ইশকালাত আলা হুরমাতিল ইস্তিজার আলাততা'আত *ইযহারুল ইখতিলাল ফী রিসাতিল ই'তিদাল ফী মাসআলাতিল হিলাল *ইরশাদুল উম্মাহ ইলাতফরিকে বাইনাল বিদআতে ওয়াস সুন্নাহ ও আল কালামুল ফাছিল বাইনা আহলিল হাক্কে ওয়াল বাতিল * আর রিসালাতুল মানযুমাহ আলাল ফিরকাতিন্নাছারিয়া * উমদাতুল আকওয়াল ফী রাদ্দে মা ফী আহসানিল মাকাল * আল ফালাহ ফী মা ইয়াতাআল্লাকু বিন্নিকাহ * তা'লীমুল মুবতাদী লিল লিসানিল আরবি * আল মাসলাকুস্ সারীহ * মসনভীয়ে দেলাবীয * কখোকী (ফার্সি) * পন্দেনামায়ে খাকী * ইসলাহুন্নাফস * ফরযে বেপাঁয়া *সিরাজুত্তাবলীগ * ফরযে কেকারাঁ * ফরযে বেবাহা * ফরযে সত্তার * হক কী রাহনুমায়ী * মসনভীয়ে খাকী * রাহে হক।

ইন্তেকাল: দ্বীনের এই একনিষ্ঠ খাদিম, সুন্নাতে নববীর অনুসরণে ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্ব, হযরত আল্লামা মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) ১২ শাওয়াল ১৩৯৬ হিজরি মোতাবেক ৭ অক্টোবর ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ৮৬ বছর বয়সে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনের শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাটহাজারী থানার মেখল গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হামিউস সুন্নাহ মেখল মাদরাসাসংলগ্ন মসজিদের কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরী

প্রিন্সিপাল এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরী চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সফরভাটায় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আলী আহমদ চৌধুরী, মাতার নাম বেগম মরিয়ম খাতুন। সফরভাটা বোর্ড স্কুলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। তিনি ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দক্ষিণ রাউজান সফরভাটা উচ্চ বিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সাথে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি ১৯৪৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

প্রিন্সিপাল এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরী অত্যাশ্চর্য ধী-শক্তি, বহুমাত্রিক পাণ্ডিত্য ও সৃজনশীল মননের অধিকারী এক প্রবাদপুরুষ। প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ, তুখোড় বাগ্মী, যশস্বী লেখক ও নিষ্ঠাবান ধর্মাশ্রয়ী হিসেবে সমকালীন প্রেক্ষাপটে তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেন। বরাবরই বর্ণাঢ্য শিক্ষাজীবনের অধিকারী এ মনীষী ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ হতে বিএ. (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫০ সালে একই বিষয়ে একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম. এ ডিগ্রিপ্রাপ্ত হন। একই সময় তিনি সাবসিডিয়ারি বিষয় আরবি ও ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

তাঁকে নিত্যানন্দ স্বর্ণ পদক প্রদান করেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জি.এস) নির্বাচিত হন। প্রিন্সিপ্যাল এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরী ১৯৫৬ সালে 'ফুলব্রাইট স্কলার' (Fulbright Scholar) হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণা করেন।

চট্টগ্রাম সিটি কলেজ ও চট্টগ্রাম ওমর গণি এম. ই. এস কলেজের প্রাণপুরুষ হিসেবে তিনি সুদীর্ঘ ৩৫ বছর অধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

ইংরেজি সাহিত্যের সফল অধ্যাপনার সঙ্গে তিনি অনায়াসে সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন প্রগাঢ় ধর্মীয় চেতনা। ষাটের দশকেই তিনি নিজেকে একজন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ রূপে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। ১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। সেদিন যাঁরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরা অধ্যক্ষ এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরীকেই পবিত্র কুরআন হতে তেলাওয়াত করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তিনি সাগ্রহে তা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সতেজ কণ্ঠের সে আবৃত্তি ও তরজমা আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

রচনা ও অনুবাদ সাহিত্য: তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত হয়েছে; কবিতা ও সনেটসহ প্রচুর পাণ্ডুলিপি রয়েছে অগ্রন্থিত। তাঁর প্রকাশিত মৌলিক ও অনূদিত নিবন্ধ ও গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে:

১. The Problem of State Language (1948)
২. Towards Jinnahism (১৯৫৩),
৩. নির্বাচিত ইংরাজি গীতি কবিতা (১৯৯৪),
৪. A reply to Satanic Verses (১৯৯৬),
৫. কুন্তলবেণী ধর্ষণ-১৯৯৭ (The Rape of the lock by Alexander pope),
৬. গীতি গাঁথার ভূমিকায় ওয়ার্ডস ওয়ার্থ-১৯৯৯ (Preface to the Lyrical ballads),
৭. হারানো জান্নাত-২০০০ (Paradise Lost by John Milton),
৮. অবোধের গীতিমালা ও অভিজ্ঞতার গাঁথামালা-২০০১ (Songs of Innocence and the Songs of Experience)
৯. An Apology for Poerty,
১০. The Spnish Tragedy,
১১. খাজা আবদুল্লাহ্ আনসারীর মুনাজাত ও নসীহত,
১২. রূমী'র মসনবী (কাব্যানুবাদ),
১৩. Prophet's Miraj (মহাকাব্য)

পঁচাত্তর বছরের বর্ণাঢ্য জীবনে এসব সাহিত্যকর্ম ও রচনা আকারে-আয়তনে বেশী না হলেও প্রতিভার বৈচিত্র্য, অপরূপ সাহিত্যমান, কাব্যিক ব্যঞ্জনা ও উৎকর্ষের পূর্ণতায় অভিষিক্ত। অনুবাদ মূলত কঠিন ও আয়াসসাধ্য; মূল ভাষা ও অনুদিত ভাষার গঠনশৈলী, শব্দের ঐশ্বর্য সম্ভার, প্রবাদ প্রবচন ও বাকরীতির ওপর পাণ্ডিত্য না থাকলে অনুবাদ দুর্বোধ্য, একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে ওঠে- কিন্তু এ জ্ঞান তাপস সতর্ক পরিচর্যায় অনুবাদ সাহিত্যে যোগ করেছেন নতুন মাত্রা, নতুন আঙ্গিক ও নতুন সৌষ্ঠব।

অনুবাদের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিবাচক দিক যেমন তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি তার নেতিবাচক দিক-অশ্লীলতা, যৌনতা ও নাস্তিক্যবাদকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন জোরালো ভাষায়। তিনি বোদলেয়র, বায়রণ, এলিয়ট, ভিক্টর হুগো ও সালমান রুশদীর মত ভোগবাদী কবিদের কবিতা ও সাহিত্যে যৌনক্রিয়ার ইংগিত, নগ্নতা, উর্বশীর টানা কামুক চোখ, দোলায়িত নিতম্ব, মসৃণ গ্রীবা, পীনোন্নত স্তন, প্রস্ফুটিত অধরের ঘৃণ্য ও সুড়সুড়ে বর্ণনাকে পর্ণো ম্যাগাজিনের চাইতেও প্রকাশ্য অশ্লীলতা বলে অভিহিত করেন।
কুখ্যাত লেখক সালমান রুশদীর 'স্যাটানিক ভার্সেস' গ্রন্থের জবাবে প্রিন্সিপ্যাল রেজাউল করিম চৌধুরী লিখেছেন A Reply to Satanic Verses. এলিজাবেথান যুগের নাটকের কাঠামো বিন্যাসের আদলে রচিত এ কাব্য নাটকটি প্রিন্সিপ্যাল রেজাউল করিম চৌধুরীর এক অমর সৃষ্টি। এ গ্রন্থের মূখবন্ধে তিনি মত প্রকাশের অধিকারের নামে যথেচ্ছাচারকে নিন্দা করেন এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে 'মানুষের মৌলিক অধিকার' রূপে চিহ্নিত করার প্রয়াস পান।

কাব্য প্রতিভা: প্রিন্সিপাল রেজাউল করিম চৌধুরীর কাব্য প্রতিভাও বিস্ময়কর। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি কবিতা লিখতে সক্ষম ও পারঙ্গম। প্রিন্সিপাল রেজাউল করিম চৌধুরী বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অতীত সন্ধান করেছেন। মুসলমানদের ঐতিহ্য ও গৌরব গাঁথার সম্প্রসারণে তিনি নিজের প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পান। আল্লামা ফজলুল্লাহর সাথে তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং আল্লামা ফজলুল্লাহর যুগোপযোগী লিখনী ও গভীর জ্ঞান এবং উদার নীতির কারণে প্রিন্সিপাল রেজাউল করিম চৌধুরী তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করতেন।
তিনি ২০০১ সালে ইন্তেকাল করেন।

হযরত মাওলানা আতহার আলী (রহ.)

জন্ম: মুসলিম মিল্লাতের ধ্রুবতারা মাওলানা আতহার আলী (রহ.) ১৩০৯ হিজরি মোতাবেক ১৮৯১ ইংরেজি সনে সিলেট জেলার অন্তর্গত বিয়ানীবাজার থানার ঘুঙ্গাদিয়া নামক গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৌলভী আবদুল আযীম ও পিতামহ উভয়ে ধর্মীয় শেখ ছিলেন। তাঁদের আদিবাস ছিলো ইরান।

শিক্ষা : বাল্যকাল থেকেই তাঁকে দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করতে হয়। দ্বীনি শিক্ষা লাভের প্রবল স্পৃহা তাঁর মধ্যে বাল্যকাল হতেই পরিলক্ষিত হয়। নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর আরবি মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য উত্তর ভারতের মুরাদাবাদ কাসেমিয়া মাদরাসায় ও পরে রামপুর মাদরাসায় লেখাপড়া করেন। অতঃপর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। এখান থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে হাদিস ও তাফসীরশাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রখ্যাত হাদিসবিশারদ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) ও নির্ভিক বাগ্মী শায়খুল ইসলাম আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) প্রমুখ ক্ষণজন্মা মহামনীষীগণ ছিলেন তাঁর উস্তাদ। হাদিস, তাফসীরের সনদ লাভের পর ৯০ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ হিফজ করে প্রখর মেধার এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

আধ্যাত্মিকতা: তিনি হাদিস তাফসীরের প্রভূত জ্ঞান অর্জনের পর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের প্রবল বাসনায় হিজরি ১৪০০ শতাব্দীতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক বুযর্গ হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (রহ.) এর খিদমতে উপস্থিত হন। দীর্ঘ তিনটি বৎসর কঠোর সাধনার মাধ্যমে অর্জন করেন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা এবং আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিত্ব বা খিলাফত লাভে ধন্য হন।

কর্মজীবন : স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সিলেট ও কুমিল্লার বিভিন্ন মাদরাসায় সর্বোচ্চ পদে সমাসীন থেকে অধ্যাপনা ও আত্মশুদ্ধির সুমহান দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশে প্রথমত: কিশোরগঞ্জের বৌলাই নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আগমন করে দাওয়াত, তাবলীগ ও আত্মশুদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীতে তাঁর কতিপয় প্রভাবশালী ভক্তবৃন্দের একান্ত অনুরোধে তিনি কিশোরগঞ্জ শহরে পুরান থানার মসজিদে আপাততঃ অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপন মুর্শিদের নিকট পত্র লিখেন। মুর্শিদের পক্ষ থেকে এখানেই অবস্থান করে দাওয়াত, তাবলীগ, সমাজসেবা ও সংস্কারের কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আসলে এখানে থেকেই তার কর্মবহুল জীবনের সূত্রপাত ঘটে।

অমর কীর্তিসমূহ

আল জামিয়াতুল ইমদাদিয়া: মাওলানা আতহার আলীর (রহ.) দৃষ্টিতে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতিরেকে যেহেতু জাতিগঠন সম্ভব নয়, তাই তিনি ইসলামি আন্দোলনের অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি কিশোরগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালে "জামিয়া ইমদাদুল উলুম" নামে একটি ছোট্ট মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উন্নত চিন্তাধারা পূতপবিত্র মানসিকতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এই ছোট্ট মাদরাসাটি "আল জামিয়াতুল ইমদাদিয়া" নামে একটি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়। এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে অসংখ্য ওলামায়ে কিরাম, অগণিত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ইসলামি চিন্তাবিদ গড়ে ওঠেন।

শহীদী মসজিদ: কিশোরগঞ্জ শহরের পুরান থানা এলাকায় একটি সুবৃহৎ মসজিদের মর্যাদা নষ্ট করার চেষ্টাকালে হিন্দুদের সাথে মুসল্লিদের সংঘর্ষ হলে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন মুসলমান শাহাদাৎ বরণ করেন। যার ফলে এ মসজিদটি "শহীদী মসজিদ" নামে খ্যাতি লাভ করে। এ মসজিদ থেকেই তাঁর জীবনের বিরাট কীর্তিসমূহের সূচনা হয়। এ মসজিদে বসেই তিনি তখনকার রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি প্রভাবশালী দলের নেতৃত্ব দেন। নিজে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করে অনেককেই মন্ত্রীত্বের আসনে বসিয়েছেন।

বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়্যা : (কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড) : বাংলাদেশের প্রায় তিন সহস্র কওমি মাদরাসাকে একই কেন্দ্রের আওতাভুক্ত করে এগুলোর পাঠ্যক্রম, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির মানোন্নয়নের প্রাথমিক প্রচেষ্টা তিনিই চালিয়ে যান। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে তাঁর ইন্তেকালের দুই বছর পর ১৯৭৮ সনে 'বেফাকুল মাদারিসিল কাওমিয়্যা আল আরবিয়্যা' নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আকর্ষণীয় গ্রন্থাগার: প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বহু দুষ্প্রাপ্য কিতাব সংগ্রহ করে জামিয়া ইমদাদিয়ার গ্রন্থাগারকে তিনি আকর্ষণীয় গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করেন।

গবেষণা ও প্রচার দপ্তর : তখনকার দিনে বাংলা ভাষায় ইসলামি সাহিত্যের পরিধি ছিলো খুবই সংকীর্ণ। এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে তিনি "গবেষণা ও প্রচার দপ্তর" নামে আলাদা একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে এ বিভাগ হতে "আল মুনাদী" নামে একটি ইসলামি মাসিক পত্রিকা বাংলাতে প্রকাশিত হয় এবং কয়েকখানা গবেষণামূলক পুস্তক রচিত হয়। মাওলানা সাহেবের বহুদিনের লালিত বাসনা ছিলো মাতৃভাষায় ধর্মীয় চিন্তাধারা প্রকাশ করার। দুটি বাংলা পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। একটি দৈনিক "নাজাত" অন্যটি সাপ্তাহিক "নেযামে ইসলাম"। তাঁর উৎসাহে আরও বহু ইসলামি শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

ইন্তেকাল: ৬ অক্টোবর ১৯৭৬ সালে বুধবার রাত ৮টা ৫৫ মিনিটে ৮৩ বছর বয়সে দেশ ও জাতির পথ প্রদর্শক মুজাহিদে মিল্লাত, সুন্নাতে নববীর মূর্তপ্রতীক এ নশ্বর জগতের বন্ধন ছিন্ন করে মহান রাব্বুল আলামিনের সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

জামিয়া ইসলামিয়া মোমেনশাহীর সম্মুখস্থ মাঠের দক্ষিণ পূর্বপার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হযরত মাওলানা আতহার আলীর (রহ.) সাথে আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সাতকানিয়ায় মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মাহমুদুর রহমানের সমর্থনে সর্বশেষ ঐতিহাসিক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)। সেখানে তদানীন্তন নেজামে ইসলাম সভাপতি চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, করাচি নেজামে ইসলামের সভাপতি রানা জাফরুল্লাহ খাঁন, পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামের সভাপতি শাহ মাওলানা আতহার আলী, মুফতি আল্লামা আযীযুল হক (রহ.), শাহ মাওলানা আবদুল মজিদ (রহ.) বড়ো হুজুর, খতিবে আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ (রহ.), মাওলানা আমীনউল্লাহ (রহ.), শাহ মাওলানা আবদুর রশীদ (রহ.) ছোটো হুজুর এবং মাওলানা মুবারক (রহ.) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এখানে লক্ষ জনতার ঢল নেমেছিলো। যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীদের বিশেষ করে তৎকালীন সাতকানিয়া নির্বাচনী এলাকা এবং চকরিয়া নির্বাচনী এলাকা হতে যথাক্রমে মাওলানা মাহমুদুর রহমান এবং খতিবে আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদকে জিতিয়ে আনার ক্ষেত্রে আল্লামা মুফতি আযীযুল হক, আল্লামা শাহ আবদুল মজিদ, আল্লামা ফজলুল্লাহ এবং শাহ মাওলানা আবদুর রশীদ (রহ.) মূখ্য ভূমিকা পালন করেন।

হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.)

জন্ম : ১৩২৭ হিজরি মোতাবেক ১৯০৬ খৃস্টাব্দে।

জন্মস্থান : মেখল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

ইন্তেকাল : ১৪১৩ হিজরি মোতাবেক ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ খৃস্টাব্দে।

বয়স : ৮৬ বছর

শিক্ষা : স্থানীয় স্কুল, হাটহাজারী মাদরাসা ও দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত।

শিক্ষকতা : স্থানীয় আজিজিয়া বিদ্যালয় ও পটিয়া মাদরাসা।

প্রতিষ্ঠাতা : অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা ও হাসপাতাল।
বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে।

জন্ম ও শিক্ষা: ক্ষণজন্মা এই মহান ব্যক্তি চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার উত্তর মেখল গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে ১৯০৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা রিয়াজুন্নেসা ও পিতা মাষ্টার আব্দুল জাব্বারের আদর-স্নেহে লালিত পালিত হয়ে চার বছর বয়সে ভর্তি হন স্থানীয় আজিজিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, কিন্তু মাত্র ৩/৪ বছর বয়সেই পিতৃহারা হন। মাতা রিয়াজুন্নেসা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। মাতার আন্তরিক দুআ'য় তিনি স্থানীয় বিদ্যালয় থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ শেষ করে বাংলাদেশের প্রাচীন ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদরাসায় ভর্তি হন। দেশের খ্যাতনামা উলামা-মাশায়েখের সান্নিধ্যে এসে তিনি উক্ত মাদরাসা থেকে জামাআতে উলা পাশ করেন।

উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতগমন: ১৩৫১ হিজরিতে উচ্চশিক্ষা লাভ এবং উপমহাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখের নৈকট্য লাভের মহৎ বাসনা নিয়ে তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা নিকেতন দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখানে তিনি দাওরায়ে হাদিস পাঠ শেষান্তে দর্শনশাস্ত্রে উচ্চতর গবেষণা করেন। ইত্যবসরে তিনি কুরআন মজিদও হিফয করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

শিক্ষকতা: মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস দারুল উলুম দেওবন্দ হতে পড়াশোনা শেষ করে দেশে এসে ১৯৪৩ সালে স্থানীয় আজিজিয়া বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা জীবনের সূচনা করেন। এখানে দুই বছর অতিবাহিত করার পর তিনি একটি মাদরাসায় যোগদান করেন। ইত্যবসরে তার শায়খ মাওলানা জমীরুদ্দিন (রহ.) এর নির্দেশ এবং মুফতি আযীযুল হক (রহ.) এর পরামর্শে জামিয়া পটিয়া জমিরিয়া মাদরাসায় ১৯৪৫ সালে মুদাররিস হিসেবে নিয়োজিত হন। মাদরাসায় তিনি একাডেমিক সিলেবাসের মেশকাত পর্যন্ত পড়াতেন এবং পাশাপাশি ছাত্রাবাসের দায়িত্ব আনজাম দেন। পরবর্তীতে নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন।

পরিচালক পদে দায়িত্ব গ্রহণ: ৬ সফর ১৩৭৭ হিজরি বুধবার (১৯৫৯ ইংরেজি) জামেয়ার মসজিদে সকল শিক্ষক-ছাত্রের সামনে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুহতামিম ঘোষণা করা হয়। মুহতামিম হিসেবে মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস নিষ্ঠা, সততা ও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। উল্লেখ্য যে, ১৫ রমজান ১৩৮০ হিজরি মোতাবেক ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে শুক্রবার মুফতি সাহেবের ইন্তেকালের পর হাজী ইউনুস (রহ.) সার্বিকভাবে জামেয়ার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি জামেয়ার মুরুব্বিগণের যৌথ সহযোগিতা ও একান্ত পরিশ্রমে পটিয়া মাদরাসার রূপ পালটে দিতে সক্ষম হন। জামেয়ার উন্নয়নে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। তাঁরই আমলে জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতাদের রুহানী বরকত ও তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে জাতীয় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে জামেয়ার ভূমিকা সমাজে বিদ্যমান কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি, পশ্চিমা এইডস আক্রান্ত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে একটি দুর্বার আন্দোলন বললে অত্যুক্তি হবে না।

তরিকতের জীবন: মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস ছাত্রাবস্থা হতে ছিলেন তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত। তিনি যাবতীয় আজেবাজে কাজ পরিহার করে চলতেন। "গুলিস্তা ও বোস্তা" অধ্যয়নকালেই তিনি এতদকালের আধ্যাত্মিক গুরু শায়খুল মাশায়েখ মাওলানা শাহ জমীরুদ্দীন (রহ.)-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। তাঁর ইবাদত, রিয়াযত ও ইত্তেবায়ে সুন্নাতের কারণে পীর সাহেব তাকে মেশকাতের বছরই খিলাফত দানে ভূষিত করেন। তাঁর খলিফাগণের মধ্যে মাওলানা দানেশ (রহ.) (লোহাগাড়া) মাওলানা আবদুল মান্নান (নোয়াখালী), মাওলানা আকতার কামাল (রামু), মাওলানা সুলতান (হাটহাজারী), পটিয়া মাদরাসার মুহতামিম মুফতি আবদুল হালিম বুখারি সাহেবের পিতা মাওলানা আবদুল গণী সাহেব, সাবেক মুহতামিম পদুয়া মাদরাসা, শেখ মোহাম্মদ বশীর হোসাইন আল শুকফা, ডাইরেক্টর- আল আওকাফ আল আইন (ইউএই) ও মাওলানা আবদুল বাকী (ফরিদপুর) অন্যতম।

কওমি মাদরাসার কল্যাণে অবদান: মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) সারা বাংলাদেশে হাজার হাজার কওমি মাদরাসা ও এর লক্ষ লক্ষ ছাত্রের কল্যাণে ব্যাপক অবদান রাখেন। তিনি 'বেফাকুল মাদারিসিল আরবিয়্যা' নামে একটি কেন্দ্রীয় কওমি মাদরাসা বোর্ড গঠন করেন। আমৃত্যু সর্বসম্মতিক্রমে কওমি মাদরাসা বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অপরিসীম প্রচেষ্টার ফলেই আজ কওমি মাদরাসা থেকে দাওরা পাশ ছাত্ররা মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় এবং লিবিয়ার দাওয়াহ কলেজে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

সমাজসেবা: হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) আর্তমানবতার সেবায় ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তিনি চট্টগ্রামসহ সারা দেশে অসংখ্য মসজিদ, মকতব, ফোরকানিয়া, নূরানী মাদরাসা ও কওমি মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

বৈদেশিক সম্পর্ক: ১৯৭৫ সালে হাজী সাহেবকে রাবেতা আলম আল ইসলামির মসজিদ বিষয়ক উচ্চ পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়। একই বছর মক্কায় এবং ১৯৭৮ সালে করাচিতে এবং পরবর্তীতে কাতারে অনুষ্ঠিত সিরাত সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

জামেয়া পটিয়ার এক তথ্য বিবরণীতে প্রকাশ- জনাব হাজী ইউনুস (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে প্রায় ৬৫০টি মাদরাসা এবং মসজিদ পরিচালিত হচ্ছিলো। তিনি ইত্তেহাদুল মাদারিস আঞ্চলিক সংগঠন এবং বেফাকুল মাদারিস কেন্দ্রীয় সংগঠন নামক দুটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্যবাহী কওমি শিক্ষাবোর্ডের প্রধান ছিলেন। কিছু খ্রিষ্টান মিশনারি, যারা এন.জি.ও বেশে দেশের গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে যখন সমাজে কলুষিত বস্তুতান্ত্রিক ভ্রান্ত শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে সমাজকে কলুষযুক্ত ও মুসলিম শিশু-কিশোর এমনকি যুবকদেরকেও ধর্মান্তরিত করণের প্রয়াস চালাচ্ছিলো, ঠিক তেমনি সময়ে হযরত হাজী ইউনুস (রহ.) গ্রাম-গঞ্জে ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মিশনারি সেন্টার গড়ে তোলার এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছোট ছোট মাদরাসা মক্তবের দ্রুত উন্নতি সাধনের জন্য সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেন।

ইন্তেকাল: মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) ১৯৯২ ইংরেজির ১৪ ফেব্রুয়ারি মহান প্রভুর একান্ত সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। পরদিন পীরে কামেল হযরত মাওলানা আলী আহমদ বোয়ালভী হুজুর (রহ.)-এর ইমামতিতে লক্ষাধিক ছাত্র, অনুরক্ত ও সাধারণ মুসলমানের উপস্থিতিতে সালাতুল জানাযা শেষে তাঁকে পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি আযীযুল হক (রহ.)-এর পাশে "মাকবারায়ে আজিজিতে" সমাহিত করা হয়।

হযরতুল আল্লাম শাহ্ আবুল মোজাফফর (রহ.)

জন্ম: মাওলানা আবুল মোজাফফর (রহ.) জ্ঞানী-গুণী প্রসবিণী ইসলামি ভাবধারা অধ্যুষিত জনপদ লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের এক অভিজাত আলেম ও ব্যবসায়ী পরিবারে ১৯০৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা ময়েজ উদ্দীন ছিলেন উম্মুল মাদারেস খ্যাত চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার সিনিয়র শিক্ষক। মাতা ওমদা খাতুন একজন স্বামীভক্ত পরহেজগার নারী ছিলেন। তাঁদের পরিবারের অনেকেই তৎকালীন সময়ে ইয়াংগুনে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। এজন্য তাদের বাড়িকে আকামুদ্দিন সওদাগরের বাড়ি বলা হতো।

শিক্ষা-দীক্ষা : মাওলানা আবুল মোজাফ্ফর (রহ.) তার মুহতারাম পিতামাতার কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি ১৯১৭ সালে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে একনাগাড়ে ৮ বছর অধ্যয়ন করে ১৯২৫ সালে উলা (ফাযিল) পাশ করেন প্রথম বিভাগে। এরপর তিনি ইয়াংগুন গমন করেন। সেখানে তিনি কিছুদিন পারিবারিক ব্যবসা-বাণিজ্যে সময় কাটান। দারুল উলুমে তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন আল্লামা ফজলুর রহমান (রহ.), মাওলানা নজির আহমদ, মাওলানা তমিজুর রহমান প্রমুখ।

তাঁর বেশ কয়েকটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

* তাসহিলুল কাফিয়া।

* আযহারুল আযহার শরহে নুরুল আনওয়ার।

* খোলাসায়ে শরহিল আকায়েদ।

* কুরআনে হাকীম আওর হামারী যিন্দেগী ইত্যাদি।

বায়'আত: মাওলানা ওবায়দুল হক (রহ.) সাইয়িদ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এর হাতে বায়আত হন এবং খেলাফত লাভ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.) এর হাতে বায়'আত হয়ে খেলাফত লাভ করেন। তিনি খতমে নবুওয়াত নামক সংগঠনের সভাপতি ও বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন।

ইন্তেকাল: এই মহান সাধক ২০০৭ খৃস্টাব্দে ৬ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। হযরতকে আজিমপুর বড়ো কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শাহসুফি হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.)

হযরত শাহসুফি মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মাওলানা মীর মাসউদ আলী (রা.) তাঁর পিতা।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা নানার বাড়ি রাঙ্গুনিয়ার ব্রহ্মোত্তরে শুরু হয়। তাঁর পিতা চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। এ সময় তিনি সপরিবারে পিতৃভিটা পূর্ব মাদারবাড়িতে বসবাস শুরু করেন এবং মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে যথাসময় আলিম ও ফাযিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাশ করার পর তিনি হাদিস অধ্যয়নের জন্যে ভারতের প্রখ্যাত ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে সনদপ্রাপ্ত হন। তাঁর পীর মুর্শিদ হচ্ছেন- যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও আল্লাহর ওলি হযরত সাইয়িদ মোনছরম শাহ (রহ.)।

হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) হচ্ছেন- বায়তুশ শরফ দরবারের প্রতিষ্ঠাতা। যাঁর কঠোর পরিশ্রম ও আধ্যাত্মিক সাধনা রয়েছে এর প্রতিষ্ঠায়।

ক্ষুধাতুর, দরিদ্র ও সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত বাংলার মুসলমানদের সঠিক পথের সন্ধান দিতেও আল্লাহর বান্দাদের ঈমানী-রূহানী উৎকর্ষ সাধন এবং জাগতিক প্রয়োজনে সাহায্য-সহায়তামূলক কাজ পরিচালনায় তিনি একটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন কায়েমের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেন, তাই বায়তুশ শরফ দরবারে প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা শাহসূফি আলহাজ হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন "আনজুমনে ইত্তেহাদ"। এটি একটি মসজিদভিত্তিক মানবকল্যাণমূলক সংগঠন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সংগঠনটি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে গরিব-অসহায় মানুষের দ্বারে

উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতগমন: মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দে ১৯৪২ খৃস্টাব্দে কাফিয়া জামাতে ভর্তি হন। এর দশ-বারো দিন পর তাঁর পিতার ইন্তেকাল হয়। ইন্তেকালের পর তাৎক্ষণিক দেশে ফিরে এলেও এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি পুনরায় দেওবন্দ গমন করেন। মাওলানা ওবায়দুল হক (রহ.) দেওবন্দে ১৩৬৬ হিজরিতে দাওরায়ে হাদিস, ১৩৬৭-৬৮ হিজরিতে তাখাসসুস ফিত-তাফসীর এবং ১৩৬৮-৬৯ হিজরিতে ফুনুনাত সমাপ্ত করেন। দাওরায়ে হাদিসের বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

দেওবন্দে তাঁর বিশিষ্ট ওস্তাদগণ হচ্ছেন: শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি (রহ.), মাওলানা ইব্রাহিম বলিয়াভী (রহ.), মাওলানা ইযায আলী আমরুহী (রহ.), মাওলানা ইদরিস কান্দলভী (রহ.), মাওলানা ফখরুল হাসান (রহ.), মাওলানা আবদুশ শাকুর (রহ.), মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব (রহ.) ও হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ জলীল (রহ.) প্রমুখ।

শিক্ষকতা: মাওলানা ওবায়দুল হক (রহ.) দারুল উলুম দেওবন্দে পড়াশোনা শেষ করার পর ঢাকার বড় কাটারা হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আবদুর ওহাব পীরজী হুজরের আগ্রহে এবং দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবির ও উস্তাদগণের পরামর্শে বড় কাটারা মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এ মাদরাসায় তিনি ১৩৬৯ হিজরি থেকে ১৩৭২ হিজরি পর্যন্ত বুখারি শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ও বায়যাবী শরীফ প্রভৃতি কিতাব শিক্ষা দেন। পীরজী হুজুর এক পত্রে মাওলানা ওবায়দুল হকের তৎকালীন শিক্ষকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

শিক্ষকতার ৪র্থ বছর শায়খুল আদব মাওলানা ইজায আলী (রহ.) তাঁকে উত্তর প্রদেশের শাহাজাহানপুরের এক মাদরাসায় শিক্ষকতার জন্য পাঠিয়ে দেন। সেখানে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর হযরত শায়খুল আদব তাঁকে ডেকে পাঠান। অতঃপর তাঁকে হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম করাচী পাঠানো হয়। সেখানে তিনি ১৩৭৩ হিজরি শিক্ষাবর্ষে আবু দাউদ শরীফ ও হেদায়া আখেরাইন ইত্যাদি কিতাবের পাঠদান করেন। অতঃপর মাওলানা আতহার আলী (রহ.) মুফতি শফী সাহেবের অনুমতিক্রমে মাওলানা ওবায়দুল হককে ঢাকায় নিয়ে আসেন। এ সময় মাদরাসা-এ-আলিয়া ঢাকার সিনিয়র শিক্ষকের একটি পদ খালি হয়। তাঁকে এ পদে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি শাইখুল আরব ওয়াল আযম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর অনুমতি নিয়ে মাদরাসা-এ-আলিয়া ঢাকায় যোগদান করেন। হেড মাওলানা পদে অধিষ্ঠিত থেকে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি কয়েক বছর এমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ মাদরাসায় এবং ১৯৮৬-১৯৮৭ খৃস্টাব্দ এই দুই বছর পটিয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদিস এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮৭ খৃস্টাব্দ থেকে সিলেট কাসেমুল উলুম দরগাহ মাদরাসায় শায়খুল হাদীসের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থেকে দরসী খেদমত আঞ্জাম দেন।

কল্যাণের বার্তা পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে। আজকের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শত শত মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, চক্ষু, পঙ্গু ও শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ নানামুখী ঈমানী-রূহানী মাহফিলের আয়োজন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডসমূহের বাস্তবায়ন সেই মহান আধ্যাত্মিক সাধকের গভীর উপলব্ধির বাস্তব ফসল।

এই অলিকুল শিরোমণি শাহ সূফী হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) ১৯৭১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি জীবনের ২৯ তম হজব্রত পালনকালে উকুফে আরাফা শেষে পবিত্র মিনার হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল মুআল্লায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

১৯৭১ সালে তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁরই সুযোগ্য খলিফা ও এ দরবারের প্রধান রূপকার হাদীয়ে যামান শাহ সুফী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, ত্যাগ, অধ্যবসায়, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও সাহসিকতার মাধ্যমে বায়তুশ শরফ আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ নামে এই আদর্শ সংগঠনকে বাংলাদেশের শহরে, গ্রামেগঞ্জে ও প্রত্যন্ত এলাকা ছাড়াও বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সম্প্রসারিত করেছেন। আল্লামা ফজলুল্লাহর সাথে মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো এবং তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহকে খুবই সমীহ করতেন।

হযরত শাহ্ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) শাহ সাহেব, চুনতি

হযরত মাওলানা শাহ্ হাফেজ আহমদ (রহ.) ১৯০৭ সালে দক্ষিণ চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বুযর্গানে দ্বীনের আবাসভূমি চুনতি গ্রামে এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়িদ আহমদ (রহ.)। মাতা হাজেরা খাতুন। তাঁর মা ৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা এবং উপমহাদেশের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষাগ্রহণ করেন। কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৩৪ সালের মে মাসে স্বীয় চাচা হযরত মাওলানা বশির আহমদ এর কন্যা মুছাম্মৎ মাহমুদা খাতুনের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এরপর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে হযরত শাহ সাহেবের ঔরসে ২ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী মোছাম্মৎ জয়নব বেগম ও হযরত শাহ্ সাহেবের ঔরসে কোন সন্তান-সন্ততি ছিলো না।

তিনি প্রায়ই বলতেন- আল্লাহপাকের নিকট তাঁর দু'টি 'আরয ছিলো। এর মধ্যে একটি ছিল জ্ঞান, অপরটি প্রকাশ করতেন না। তিনি ইলম, আমল, ঈমান ও ইবাদতের জন্যে সব সময় আল্লাহ তাআলার নিকট শুকরিয়া আদায় করতেন।

শিক্ষা জীবনের পর একবার আকিয়াবে তাঁদের জমিদারি দেখার জন্য গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বার্মার বর্তমান মায়ানমারের বাম্মু শহরে বেড়াতে যান। ওখানকার জনগণ তাঁর ইলম ও আমলে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

কর্মজীবনে শরীআতের ইলম, নামায, রোজা ইত্যাদির সঙ্গে বাতেনী ইবাদতও আবশ্যক মনে করে একসময় সত্যের সন্ধানে লোকালয় ত্যাগ করে ৩৭ বছর আল্লাহর যিকির, রাসুল (সা.)

এর প্রশংসা করে। ঘুরে বেড়াতেন পাহাড়ে-অরণ্যে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তখন তিনি সর্বক্ষণ এ কবিতা ছত্রটি আবৃত্তি করতেন-

হাম মাজারে মুহাম্মদ পে মর জায়েঙ্গে
জিন্দেগি মে য়াহি কাম কর জায়েঙ্গে
'হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উদ্দেশ্যে আমার জীবন উৎসর্গিত,
সারা জীবন তাঁর ধ্যানেই আমি থাকব নিয়োজিত'।

আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবাণীতে অবশেষে তিনি হেদায়তের মশাল হাতে ফিরে আসেন লোকালয়ে। তিনি অসাধারণ স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। ছাত্রজীবনে পঞ্চাশ/ষাট বছর পূর্বে পঠিত আরবি, ফার্সি, উর্দু কবিতা এমন কি তাফসীর, হাদিস ও ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয় মুখস্থ বলতে পারতেন। দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত আলিমগণ যখনই তাঁর দরবারে আসতেন, তাঁরা তাঁর কুরআন-হাদিসের আলোচনা শুনে মুগ্ধ হয়ে একাগ্রচিত্তে তাঁর পানে চেয়ে থাকতেন। তিনি ছিলেন দুনিয়ার সকল ভয় ভীতির উর্ধ্বে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই মানুষের সাথে শত্রুতা, আবার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই মানুষকে মুহাব্বত করতেন। যা হাদিস শরীফের হুবহু অনুকরণ। প্রখ্যাত আলিমগণ বলতেন- "উনি ছিলেন সমসাময়িক কালের এক বিশিষ্ট মর্যাদাপ্রাপ্ত অলি" তাঁর কারামতের কথা এত স্বল্প পরিসরে লেখা সম্ভব নয়। তবে তাঁর ওফাতের পরও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ১৯ দিন ব্যাপী সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল অদ্যাবধি যথারীতি উদযাপিত হয়ে আসছে।

অর্থ-সম্পদের প্রতি তাঁর ছিলো না বিন্দুমাত্র মোহ। ভক্তদের দেয়া অর্থও তিনি গরীব-দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করতেন অকাতরে। ইন্তেকালের সময় তাঁর নিকট সঞ্চয় বলতে এক কপদর্কও ছিলো না। তিনি ছিলেন জ্যোতির্ময় চেহারার অধিকারী এক মহান অলি। উনার পরশে পরম শান্তি লাভ করত সত্যানুসন্ধানীদের হাহাকার অন্তর। তাঁর পবিত্র চেহারার দর্শনান্তে দর্শনার্থীরা পেতো পরম পরিতৃপ্তি।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আজীবন লালিত মুহাব্বতে হযরত শাহ সাহেবের অন্তর ছিলো ভরপুর। রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ উঠার পর হতে তিনি বেহাল হয়ে পড়তেন।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম হযরত শাহ সাহেবই আলেম-উলামা, পীর মাশায়েখ, ইসলামি চিন্তাবিদ ও দ্বীনদরদি মানুষদের একই প্লাটফর্মে জড়ো করে রবিউল আউয়াল মাসে একদিন সারারাত ব্যাপী সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলের প্রবর্তন করেন। একদিনের এই মাহফিল শাহ মনজিলের সামনের চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে তিনদিন ব্যাপী মাহফিলের ঘোষণার পরামর্শমূলক বৈঠকে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার নাযেমে আলা আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) প্রস্তাব করেন ওয়াজ মাহফিলকে বিষয় ভিত্তিক করার জন্য। হযরত নাযেম সাহেবের এ প্রস্তাব হযরত শাহ সাহেব অত্যন্ত খুশি মনে সমর্থন করেন এবং নাযেমে আলা সাহেবকে বিষয় ঠিক করার জন্যে অনুরোধ করেন। উল্লেখ্য যে, হযরত শাহ সাহেব নাযেমে আলা আল্লামা ফজলুল্লাহকে খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শায়েরীর প্রতি সম্মান দিতেন। অতএব এ মাহফিলের রূপকার আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ঢালাও ওয়াজ মাহফিলের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ধারায় সিরাত মাহফিলের

অনুষ্ঠানসূচি প্রণয়ন করেন। উলামাগণের মাঝে ওয়াজের 'বিষয়' নির্ধারণ করে আগে থেকে তাঁদের কাছে প্রেরণ করেন যাতে তাঁরা প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারেন। এতে শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁকে সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করেন। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) প্রবর্তিত ধারায় তা অদ্যাবধি প্রচলিত রয়েছে। পরবর্তীতে এই সিরাত মাহফিল ১৯৭৪ সালে ৫ দিন, ১৯৭৬ সালে ১০ দিন, ১৯৭৭ সালে ১২ দিন, ১৯৭৯ সালে ১৫ দিন, কিন্তু শাহ সাহেব কর্তৃক সে বছর আরো ২ দিন বাড়িয়ে ১৭, আবার আরো ২ দিন বাড়িয়ে ১৯ দিনে গিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। ১৯৮০ সাল হতে অদ্যাবধি সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল ১৯ দিন ব্যাপী চলে আসছে।

আশেকে রাসুল (সা.) মুজাদ্দিদে মিল্লাত, বানীয়ে সিরাত আলহাজ হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) তাঁর প্রবর্তিত সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে গড়ে গেছেন ১৩ একর আয়তন বিশিষ্ট একটি বিশাল সীরাত ময়দান। যার পশ্চিম প্রান্তে তাঁরই অভিপ্রায় অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে একটি সুরম্য জামে মসজিদ 'মসজিদে বায়তুল্লাহ'।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সিরাতুন্নবী (সা.)-এর মাহফিলের ১৯ দিন পূর্বে ২৩ সফর ১৪০৪ হিজরি, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৩ খৃস্টাব্দ, ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৯০ বাংলা সোমবার দিবাগত রাত ১২টা ১৫ মিনিটে মহান রাব্বুল আলামিনের সান্নিধ্যে চলে যান। মসজিদে বায়তুল্লাহর দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মরহুম মাওলানা মোজাফফর আহমদ (রহ.) (হেড মাওলানা)

মাওলানা মোজাফফর আহমদ এর বাবার নাম মাওলানা হামিদুর রহমান এবং মাতার নাম জমীলা খাতুন, দাদার নাম মাওলানা বশিরউল্লাহ (তাঁদের বাড়ি বশিরউল্লাহ মাওলানার বাড়ি বলে লোকমুখে পরিচিত) নানার নাম মাওলানা তোরাবউদ্দীন, যাঁর ফার্সি পাণ্ডুলিপি 'আওরাদ ও ওযায়েফে মকবুল' সংরক্ষিত আছে। এ শিশু মা-বাবার প্রথম সন্তান, জন্ম ১৯০৪ সন। অতিবরেণ্য ও আদুরে দুলাল, মেজাজি বাবার অগোচরে পরম ধর্মশীলা মার চোখে-চোখে বড় হন। প্রথম অক্ষরের উস্তাদ ছিলেন ছদাহার মাওলানা আবুল খাইর সাহেব। আপন ফুফা মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের কাছে জুমলাহ সরফ ও ফার্সি পাঠ শেষ করে ১৯১৩ সনে দারুল উলুম চট্টগ্রামে ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন আলিম ও ফাযিল পাশ করেন ডিস্টিংশনসহ ১ম শ্রেণিতে। চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসা আরাকান-বাঙ্গালার শিক্ষাকেন্দ্রস্বরূপ খেলাফত আন্দোলনের উত্তুঙ্গ প্রবাহে বিস্ফোরণন্মুখ ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করে। (কলকাতা মাদরাসা সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় আন্দোলন বিমুখ হতে বাধ্য ছিল)। ১৯২১ সনে ছাত্র মোজাফফর দারুল উলুমের প্রায় ৫০০ ছাত্রের নির্বাচিত প্রতিনিধি স্বরূপ সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠান লাভ করে ছাত্র জনতার দুঃসাহসী মুখপাত্রস্বরূপ একনিষ্ঠ কর্মতৎপরতায় অভিষিক্ত হন। সিলেট আলিয়া ও বাকেরগঞ্জে তাঁর যাতায়াত তখন সমধিক তাৎপর্য নির্দেশ করে।

১৯২৪ সনে মাওলানা ফখরে বাংলার নির্দেশক্রমে হিন্দুস্তানের রামপুরে 'ফুনুনাত' এ বিশদ পাঠ সম্পন্ন করেন প্রখ্যাত পণ্ডিত ফযলে কখাইবাবাদীর তত্ত্বাবধানে। ১৯২৮ সনে দেশে ফিরলেও

৩০ সনে রেঙ্গুন যাত্রা করেন এবং ১৩ বছর ব্যাপী দু'টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় তিনি থানবী সাহেব এবং আযমগড়ী সাহেবের মত মারফতের দিকপাল ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯৩১ সনে মিঞা বাড়ীর মুসলিহা খাতুনের সাথে তাঁর নিকাহ হয়। তিনি দুই পুত্র এক কন্যার জনক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের সাবেক ডিন প্রফেসর শব্বির আহমদ (রহ.)।

১৯৪৫ সনে দেশে ফিরে বাড়িতে হাফেজ পাড়া মসজিদে এবং পদুয়া হেমায়াতুল ইসলাম মাদরাসায় উচ্চস্তরে পাঠ্য কিতাবসমূহের দরস প্রদান করেন। এ সময় তিনি একাধিক স্কুল মাদরাসা নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠা করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪৭ সনে তিনি মহারাজ বাবুর মোকাবেলায় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং জুরী কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন।

চুনতি, রসুলাবাদ, শাহচাঁদ আউলিয়া, আহমদিয়া সুন্নিয়া ইত্যাদি মাদরাসা ও বিভিন্ন স্কুলে তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল দরস দান করেন। চুনতি মাদরাসায় হেড মাওলানা হিসেবে তাঁর কার্যকাল, একজন বরেণ্য 'ওস্তাদ' এবং ধী-শক্তিসম্পন্ন সংগঠকস্বরূপ সমধিক অনুভূতিপ্রবণ ও স্পর্শকাতর অথচ তুলনামূলকভাবে সুশিক্ষিত স্থানীয় সদস্য মণ্ডলীর কাছে অনুপম ও অনবদ্য বলে স্বীকৃত ও নন্দিত।

১৯৫০ সনে যোগদান করে '৭০ এর ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সামান্য কিছু সময় ছাড়া তিনি ইন্তে কালের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত একজন সক্রিয় শিক্ষক ছিলেন।

হযরত মাওলানা হাফেয ক্বারী মীর গোলাম মোস্তফা (রহ.)

উপমহাদেশে ওলামা সম্প্রদায়ের বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৮২০-১৯৪৭) পরবর্তী মাদরাসা ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষিত সমাজ নজিরবিহীন উদ্যমে ইসলাম শিক্ষা ও সংহতির প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। অনুরূপ তৎপরতার প্রেক্ষাপটে হযরত মাওলানা হাফেয ক্বারী মীর গোলাম মোস্তফা একজন অমিতবিক্রম শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিত্ব।

পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে সমকালীন শ্রেষ্ঠ উস্তাদবৃন্দের কাছে শিক্ষা লাভ করে তিনি নিজেকে একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ও বিশেষজ্ঞরূপে প্রতিপন্ন করেন। জীবন ও জগতের চরম উদ্দিষ্ট আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে নিজেকে দ্বীনি ইলম প্রসারে নিবেদিত করে এতদঞ্চলে অনন্য অবদান রেখেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি ১৯২৭ সালে বিখ্যাত হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে বড়ো মুহাদ্দিস মাওলানা সাঈ'দ আহমদ, মুফতি ফয়জুল্লাহ, খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ প্রমুখ বিখ্যাত আলিমদের কাছে ফুনুনাতে বিশেষজ্ঞ হন।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা: মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফা হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর নির্দেশক্রমে হযরত মাওলানা জমিরুদ্দিন (রহ.)'র কাছে বায়আত গ্রহণ করেন।

১৯৩৪ সালে উচ্চতর শিক্ষার্থে লক্ষ্মৌ গমন করেন। লক্ষ্মৌর বিখ্যাত হাফেয আবদুশ শাকুর আজমগড়ীর কাছে ১১ মাসে কুরআন মজিদ হিফয এবং সপ্ত পদ্ধতির কিরআত শিক্ষা করেন।

১৯৩৫ সালে লক্ষ্ণৌর মেহদীবাগে প্রথম হিফয কুরআন শোনান। এরপর হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবীসহ বিখ্যাত উলামায়ে কিরামের সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিয়ে: ১৯৩৮ সালে বিয়ে করেন।

শিক্ষকতা: ১৯৩৮ সালে আকিয়াব রাজারকুল মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু, ১৯৪০ পটিয়ার বড় উঠান দেওদীঘি মাদরাসায় যোগদান, অধুনা বিখ্যাত ক্বিরআত শিক্ষা কেন্দ্র শাহমীরপুর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা। ১৯৪১ সালে ঐতিহাসিক চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন।

১৯৪৩ সালে সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসায় যোগদান ও পুনরায় চুনতি মাদরাসায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৬০ সালে গারাঙ্গিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন।

১৯৭০ সালে চট্টগ্রামের ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন।

১৯৭৪ সালে ফটিকছড়ি আনোয়ারুল উলুম মাদরাসায় যোগদান; অতঃপর সাতকানিয়া আলিয়া, চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া, লোহাগাড়া মাদরাসা ও বাজালিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা হয়ে কুমিরাঘোনা বায়তুশ শরফ মাদরাসা হতে ১৯৯৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবি (রহ.)

মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবি (রহ.) চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার অন্তর্গত পশ্চিম কলাউজান গ্রামের খতিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ জানা না গেলেও ১৯৮৬ সালে তাঁর ইন্তেকালের সময় তিনি উনাশি বছর বয়সে উপনীত হয়েছিলেন বলে কথিত। এর সাথে হিসেব করে দেখলে তিনি ১৯০৭ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি তাঁর পিতা মাওলানা ওবাইদুল মান্নান খতিবির কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তার খালু শাহ মাওলানা আবদুল খালেক, দক্ষিণ সুখছড়ি, এর নিকট শেখ সাদীর 'গুলিস্তাঁ' ও 'বোস্তাঁ' অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি তাঁর চাচা মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ ইয়া'কুব খতিবির (ও: ১৯৩৯ খৃ.) নিকট আরবি, ফার্সি এবং উর্দু ভাষার প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে তাঁকে চট্টগ্রামের দারুল-উলুম মাদরাসায় ভর্তি করানো হয়। তখন শাহ্ মাওলানা নজির আহমদ (রহ.), চুনতি, হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান (রহ.), হযরত মাওলানা মীর মসউদ আলী (রহ.), ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (রহ.) প্রমুখ প্রখ্যাত উলামা এ প্রতিষ্ঠানকে অলঙ্কৃত করে রেখেছিলেন। তিনি দারুল উলুম মাদরাসা হতে ১৯২৯ খৃস্টাব্দে হায়ার স্ট্যান্ডার্ড (বর্তমান ফাযিল) পরীক্ষা পাশ করেন এবং হাদিসশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষার জন্যে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় গমন করেন। তখন মাওলানা মুশতাক আহমদ কানপুরী (রহ.), শামসুল উলামা মাওলানা ইয়াহইয়া সাহারামী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিক চাটগামী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন সিলেটী (রহ.) প্রমুখ প্রখ্যাত উলামা কলকাতা আলিয়া মাদরাসার শোভা বর্ধন করছিলেন। মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবি কলকাতায় হাদিস অধ্যয়নকালে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। তিনি ১৯৩২ খৃস্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা হতে মুমতাযুল মুহাদ্দিসিন ডিগ্রি লাভ করেন। ইতোমধ্যে তাঁর অন্যতম

মুরুব্বি ও চাচা মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ ইয়া'কূব (রহ.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর তিনি বার্মার রেঙ্গুনে অবস্থিত আরকাটি জামে মসজিদের খতিব ও মুফতি হিসেবে তাঁর চাচার স্থলাভিষিক্ত হন। উল্লেখ্য যে, তখন রেঙ্গুনে অবস্থিত 'আরকাটি জামে মসজিদ' এবং 'সূরাতি মসজিদের খতিব ও মুফতির পদ 'ওলামা সমাজের জন্যে অত্যন্ত সম্মানজনক ও লোভনীয় ছিলো। মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবি রেঙ্গুন থাকাকালীন সময়ে সাইয়িদ আবদুল হামীদ বাগদাদির (রহ.) সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে কাদেরিয়া তরিকায় খিলাফত লাভ করেন। রেঙ্গুনে অবস্থানকালে তিনি হয়রত শাহ মাওলানা আবদুল মজিদ, গারাঙ্গীয়া-এর পক্ষ হতে "তাওয়াজ্জুহ বিল-গায়ব" লাভ করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে কয়েকটি তরীকায় খিলাফত লাভ করেন। তিনি হযরত শাহ মাওলানা আবদুস সালাম আরাকানী (রহ.) থেকেও তা'লীম হাসিল করেন এবং একটি তরিকায় খিলাফত লাভ করেন।

১৯৩৯-৪৩ সনে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রেঙ্গুনে বোমা বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবি দেশে চলে আসেন এবং মাওলানা আজিজুল হক আল কাদেরী শেরে বাংলা (রহ.) কর্তৃক চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার মেখলে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি অত্যন্ত চমৎকার ছিলো। পরবর্তী সময়ে তিনি চট্টগ্রামের আলকরণ জামে মসজিদের খতিব হিসেবে জীবনের শেষ অবধি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন এবং অধিকসংখ্যক হাদিস হিফয করার দরুন 'হাফিযুল হাদিস' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক ছিল। তিনি তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে হাদিসের বাণী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

জীবনের শেষ ভাগে তিনি তাঁর এলাকায় "পশ্চিম কলাউজান খতিবিয়া দাখিল মাদরাসা" প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর সহপাঠীদের মাঝে হযরত শাহ মাওলানা আবদুল মালেক কুতুবদিয়া, হযরত মাওলানা মুয্হির আহমদ, প্রতিষ্ঠাতা ও রেক্টর, কক্সবাজার হাশেমিয়া আলিয়া মাদরাসা, অন্যতম। ইয়াঙ্গুনে অবস্থানকালে মুফতি মাওলানা দীন মুহাম্মদ খান (রহ.) এবং সাইয়িদ আবদুল করীম আল মাদানীর (রহ.) সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি সাইয়িদ আবদুল করিম আল মাদানির আরবি বক্তৃতামালা বাংলা ও উর্দু ভাষায় অনুবাদ করতেন। হযরত শাহ মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.), তাঁর খলিফা হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার, হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) চুনতি, হযরত মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) প্রমুখ বিশিষ্ট আলিমদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো। মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবি ১৯৮৬ সালের ১৮ এপ্রিল, জুমাবার সুবহে সাদিকের সময় ইন্তেকাল করেন এবং পশ্চিম কলাউজানের মসজিদসংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

মাওলানা মুহাম্মদ দানেশ (রহ.)

মাওলানা মুহাম্মদ দানেশ ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার অন্তর্গত চুনতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আসগর আলী একজন সমাজ সেবক ও জনহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর মুহাম্মদ দানেশ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুহসিনিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯১৭ সালে হায়ার স্ট্যান্ডার্ড (বর্তমান ফাযিল) পরীক্ষা পাশ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম মুসলিম হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর তিনি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাব রেজিস্ট্রারের পদের জন্য নির্বাচিত হন। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন। ভাতৃদ্বয়ের পরামর্শে পারিবারিক কারণে তিনি উক্ত পদে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে তিনি চুনতি পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন এবং শিক্ষক হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে যোগদান করেন। তিনি মাসোহারা ছাড়াই আজীবন চুনতি ডেপুটি বাজার সংলগ্ন জামে মসজিদের পেশ ইমামের দায়িত্ব পালন করেন।

মাদরাসার ছাত্র হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই আরবি, ফার্সি এবং উর্দু ভাষায় তাঁর দখল ছিলো। তবে ফার্সিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি একজন ধী-সম্পন্ন সমাজসচেতন আলিম ছিলেন। তখন উলামা সমাজের অতি অল্পসংখ্যক সদস্যই বাংলা ও ইংরেজি জানতেন। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ দানেশ ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী আলিম যার বাংলা এবং ইংরেজিতেও দখল ছিলো। তিনি ব্যক্তিগত কিংবা দাপ্তরিক যে কোন পত্র যোগাযোগ (Correspondence) সুন্দর ও সাবলীল ইংরেজিতে করতে পারতেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সৎ, দয়ালু, অমায়িক এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। তবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি কখনো কখনো রাগান্বিতও হতেন। তিনি নিজ এলাকার সর্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর সহপাঠীদের মাঝে হযরত শাহ মাওলানা আবদুল মজীদ (১৮৯৪-১৯৭৭ খ্রি.) গারাঙ্গীয়া, অন্যতম। পীর ভাই হিসেবে তাঁদের দু'জনের সম্পর্ক ছিলো সুগভীর। তিনি আজীবন হক্কানি আলিমগণের খিদমত করে গেছেন। ফখরুল মুহাদ্দিসীন হযরত মাওলানা আমীনুল্লাহ (রহ.)-এর প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিলো এবং দু'জনের সম্পর্ক ছিলো নিবিড়। তিনি কুতবুল আলম হযরত হাফেয হামেদ হাসান আলাভী আযমগড়ীর (রহ.) হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং হযরত আযমগড়ীর স্বনামধন্য খলীফা হযরত শাহ মাওলানা ফজলে হক, (ও: ১৯৪৪ খৃ.) হযরত শাহ মাওলানা নজির আহমদ (ও: ১৯৪৪ খৃ.) এবং হযরত শাহ মাওলানা আবদুস সালাম আরাকানি (ও: ১৯৬৯ খৃ.) এর হাতে তরিকতের সবক হাসিল করেন।

চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার সাথে তাঁর দেহ ও আত্মার সম্পর্ক ছিলো। ১৯৩৭ সালে হযরত শাহ মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) হযরত শাহ মাওলানা আবদুল হাকিমের (রহ.) নামে চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কামিল মাদরাসায় উন্নীত। উল্লেখ্য যে, এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠালগ্নে খান বাহাদুর মাওলানা হাসান (রহ.) শাহ মাওলানা নজির আহমদকে (রহ.) আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন। অন্যান্য শিক্ষানুরাগীর ন্যায়

মাওলানা দানেশও শুরু থেকে চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তিনি ধান্য চাঁদা সংগ্রহের প্রাক্কালে এবং বার্ষিক সভার আগে নিজ এলাকার জনগণকে এ মাদরাসার সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে অনুপ্রেরণা যোগাতেন। প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগত কোন ছাত্রের লজিং (lodging) এর বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিতেন। তিনি মাদরাসার প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ শিক্ষকদেরকে অগাধ শ্রদ্ধা এবং কনিষ্ঠ শিক্ষকদেরকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। ১৯৪৯ সালে মাদরাসা পরিচালনা কমিটি এবং শিক্ষকমণ্ডলীর মাঝে মতবিরোধের কারণে বিশিষ্ট কয়েকজন দক্ষ শিক্ষক ইস্তফা দিয়ে অন্যত্র চলে গেলে মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হয়। মাওলানা দানেশ এ সঙ্কটপূর্ণ মূহূর্তে মরহুম তাহের আহমদ খান, মরহুম আবদুস সুবহান খান, আলহাজ শামসুল হুদা খান সিদ্দিকি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দু'পক্ষের মাঝে সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এতে করে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের কয়েকজনকে পুনরায় মাদরাসায় ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ দানেশ ১৯৬১ সালের ১ জুলাই রোববার বিকাল ৩টার সময় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন এবং নিজ গ্রামের কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চাসনে সমাসীন করুন। আমিন!

খতিবে আযম হযরত আল্লামা মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.)

১৯০৫ সালে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন বরইতলীর মধ্যবিত্ত এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা নাদেরুজ্জামানের নিকট পবিত্র কুরআন ও প্রাথমিক বাংলা শিক্ষার প্রথম পাঠ নেন। বরইতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত তথায় অধ্যয়ন করেন। গৃহশিক্ষকের কাছে তিনি পঞ্চম ও চকরিয়া হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়া সমাপ্ত করেন। অতঃপর সাতকানিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ইতোমধ্যে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ করে আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকদের খাতায় নাম লেখান। খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলে মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) চকরিয়া শাহারবিল সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন এবং এক বছরে আরবি ব্যাকরণের প্রাথমিক বইগুলো পড়া শেষ করেন। অতঃপর চট্টগ্রামের হাটহাজারী দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদরাসায় জমাতে হাপ্তুমে ভর্তি হন। মিশকাত পর্যন্ত তিনি এ মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন।

উচ্চশিক্ষার্থে ভারত গমন: ১৯২৬ সালে তিনি ভারতের সাহারানপুর মাযাহির উলুম মাদরাসায় হাদিস, তাফসীর ও ইসলামি আইনে উচ্চতর বিভাগে অধ্যয়ন করেন এবং "দাওরায়ে হাদিস" ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি ভারতের প্রখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দে ফুনুনাত, অঙ্ক, জ্যামিতি, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, আইন ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক উচ্চতর শিক্ষালাভ করেন। আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা ও ধী-শক্তির অধিকারী মাওলানা সিদ্দিক আহমদ শিক্ষাজীবনে কোথাও প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হননি শুধু সাহারানপুর মাদরাসায় জ্বর থাকার কারণে দু'নম্বর ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ (রহ.) ও হযরত মাওলানা আবদুল জলিল (রহ.), হযরত মুফতি মাওলানা ফয়জুল্লাহ (রহ.) ও হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহাব (রহ.) প্রমুখ ওস্তাদের নিকট লাভ করেন।

ফনুনাতের উচ্চশিক্ষা তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে হযরত মাওলানা এজাজ আলী (রহ.), হযরত মাওলানা ইব্রাহিম বলিয়াভী, হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) ও ক্বারী মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) প্রমুখ মনীষীগণের নিকট হাসিল করেন। হাদিস তিনি সাহারানপুর মাযাহের উলুম সাহারণপুর মাদরাসায় হযরত মাওলানা আবদুল লতিফ সাহারানপুরী (রহ.), হযরত মাওলানা আবদুর রহমান কামিলপুরী ও শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট অধ্যয়ন করেন।

এছাড়া খতিবে আযমের অন্যান্য শিক্ষকের মধ্যে রয়েছেন হযরত মাওলানা জাকের (রহ.), হযরত মাওলানা আসাদুল্লাহ (রহ.), হযরত মুফতি জমিল আহমদ থানভী, হযরত মাওলানা আবদুশ শাকুর (রহ.), হযরত মাওলানা মনযুর আহমদ (রহ.) ও হযরত মাওলানা রাসুল খাঁ (রহ.)।

শিক্ষকতা জীবন: খতিবে আযম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর প্রায় একনাগাড়ে ৪৪ বছর শিক্ষকতার মত মহৎ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়।

ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৩১-৩২ এক বছরের জন্যে কক্সবাজার জেলাধীন চকরিয়া সাহারবিল আনোয়ারুল উলুম মাদরাসায় যোগ দেন।

হাটহাজারী মাদরাসার উস্তাদদের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি ১৯৩২ সালে হাটহাজারী দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৪ বছর একনাগাড়ে শিক্ষকতা করে হাদিসের বিশেষজ্ঞরূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি নিজ গ্রামে 'বরইতলী ফয়জুল উলুম' নামে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। ১৯৬৬ সালে পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান পরিচালক হযরত মাওলানা মুফতি আযীযুল হক সাহেবের আহ্বানে হযরত খতিবে আজম পটিয়া মাদরাসায় অনুবাদ ও রচনা বিভাগে প্রথম পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে এ মাদরাসায় তিনি বুখারী, আবু দাউদ এবং প্রাচীন দর্শন ও কালামশাস্ত্রের উচ্চতর গ্রন্থের অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন কৃতিত্বের সাথে। জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি তিনি শায়খুল হাদিস (প্রধান মুহাদ্দিস)-এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পটিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনার পশাপাশি তিনি প্রায়ই চার বছর পর্যন্ত আনঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারেস (মাদরাসা ঐক্য পরিষদ) এর সাধারণ সম্পাদক এবং ১৩৯৫ হিজরি হতে ১৪০১ হিজরি পর্যন্ত পটিয়া আল জামেয়ার প্রধান শিক্ষা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন অত্যন্ত সুচারুরূপে। তিনি সুদীর্ঘ ২২ বছর ব্যাপী পটিয়া আল জামেয়ায় শিক্ষকতা করেন।

তিনি একাধারে একজন মুহাদ্দিস, দার্শনিক, তার্কিক (متكلم) রাজনীতিবিদ এবং অদ্বিতীয় ওয়ায়েজ ও বক্তা। তাঁর ওয়াজ ও বক্তৃতা নেহায়েত যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী।

আধ্যাত্মিক জীবন : খতিবে আযম মুফতিয়ে আযম মাওলানা মুফতি ফয়জুল্লাহ সাহেবের (রহ.) সাহচর্যে এসে সর্বপ্রথম রূহানিয়তের সবক লাভ করেন। শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবনে তিনি দীর্ঘদিন মুফতিয়ে আযমের একনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন এবং আধ্যাত্মিকভাবে বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে খিলাফত লাভ করেন। মুফতিয়ে আযম সাহেবের তিনি হচ্ছেন শীর্ষস্থানীয় খলিফা, ভারতের সাহারানপুর মাযাহির উলুম মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি উপমহাদেশের খ্যাতনামা সাধক পুরুষ হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভীর সান্নিধ্যে আসেন এবং ফারেগ হওয়ার পর একাধারে ৪০ দিন তাঁর দরবারে অবস্থান করে তরিকতের সবক হাসিল করেন, পরবর্তীতে তিনি থানভীর (রহ.) বায়আত গ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পত্র বিনিময়ও ছিলো।

রাজনৈতিক জীবন: খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) ছিলেন একজন সংগ্রামী ও আপোষহীন রাজনীতিক। ১৯৪০ সালের দিকে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর নেতৃত্বাধীন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কর্মী ছিলেন তিনি। বলতে গেলে এ সংগঠনের মাধ্যমেই খতিবে আযমের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। ১৯৫২ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী প্রতিষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে ইসলামে যোগ দেন। ১৯৫২ সালের ১১, ১২ ও ১৩ মার্চ কিশোরগঞ্জের হযরত নগরে অনুষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের তিনদিন ব্যাপী সম্মেলনে তিনি কাউন্সিলর হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে কক্সবাজার, মহেশখালী, কুতুবদিয়া নির্বাচনী এলাকা থেকে বিপুল ভোটে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫৫ সালে নেজামে ইসলামের নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। হযরত মাওলানা আতাহার আলী (রহ.) ও হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) যথাক্রমে পার্টির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৫ সালে ঢাকার জেলা বোর্ড হলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ নেজামে ইসলামের প্রাদেশিক সভাপতি নির্বাচিত হন। খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ ছিলেন এ দেশের একমাত্র রাজনীতিবিদ যিনি নেজামে ইসলামি পার্টির কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ও প্রাদেশিক সভাপতির দায়িত্ব একযোগে পালন করেন।

খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ তাঁর ৪৭ বছরের রাজনৈতিক জীবনে কোন ধরনের আপোষকামিতার আশ্রয় নেননি। রাজনীতির বিনিময়ে কোন পার্থিব সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে জীবনকে তিনি কলুষিত করেননি। স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো চিরপ্রতিবাদী।

খতিবে আযম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) ১৯৮৩ সালের নভেম্বরে আকস্মিকভাবে ডায়াবেটিসজনিত কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ১৯৮৭ সালের ১৬ মে শুক্রবার তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে অবশেষে ১৯ মে ২০ রমযানুল মুবারক সোমবার পৌনে বারটার সময় হযরত খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ দীর্ঘ ৮২ বছর বয়সে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান।

সাইয়িদ আবদুল করিম আল মাদানী (রহ.)

সাইয়িদ আবদুল করিম আল মাদানী ১৮৮০ খৃস্টাব্দে মদিনা শরিফের আল সাইয়িদ মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। এই আওলাদে রাসুল (সা.) ১৯৫০ খৃস্টাব্দে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে খতিব হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৮ বছর খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে এই সুদীর্ঘ ১৮ বছর দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের বেশ কিছু মৌলিক সংস্কারকার্য সম্পন্ন করেন।

সাইয়িদ আবদুল কারিম আল মাদানী (রহ.)-এর সময়কালে তাঁরই সহযোগিতায় মসজিদ কমিটি মসজিদের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণকার্য সম্পাদন করেন। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বের মৌলিক সংস্কারের কাজও সে সময় সম্পাদিত হয়। শুধু তাই নয়, সামগ্রিকভাবে চারিদিক থেকে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা সেটি এ আমলেই গড়ে উঠেছিল। সত্যিকার অর্থে তারপরে মসজিদের কোন মৌলিক সম্প্রসারণ হয়নি, যা হয়েছে ওপরের সৌন্দর্যবর্ধন মাত্র।

শুক্রবারের জুমার নামাযের 'খুতবা' ছাপিয়ে মুসল্লিদের মাঝে বিলি করার প্রথা তাঁর আমল থেকেই চালু হয়। তিনি 'দারুল ইশাআত' ও 'দারুল ইফতা' প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল ও ফাতওয়া ইত্যাদি প্রচার করা হতো।

মহান বিদ্যোৎসাহী সাইয়িদ আবদুল কারিম আল মাদানী (রা.) মসজিদের প্রাচীন কুতুবখানার সংস্কার সাধনেও মনোনিবেশ করেন। তিনি সাইয়িদ আবদুল হামিদ বোগদাদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুতুবখানার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে একে যুগোপযোগী নতুন আদল প্রদান করেন।

মাদানী সাহেব মদিনা শরিফের আনসারদের পবিত্র আদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরে নিজে আনসারের খাকী ইউনিফর্ম পরে চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসিদ্ধ লালদিঘী ময়দানে প্যারেডের জন্য হাযির হতেন। খোলা গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ নগরবাসী এবং দশ হাজার আনসার সদস্যের প্লাটুনকে সজ্জিত করে সমস্ত শহরে মিছিল করে ইসলামি ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার এবং একই সাথে দীনের খিদমতে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে মিছিলের সাথে একাত্ম হয়ে নিজেকে কওমের খাদিম রূপে শামিল করতেন।

তাঁরই জ্ঞাতি ভাই মাওলানা সাইয়িদ আবদুল কাদের সাদেক আল মাদানী (রহ.) ১৯৩৫ সালে পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারা থেকে এই পুণ্যভূমি চট্টগ্রাম তথা ইসলামাবাদে এসে এতদঞ্চলে উন্মুক্ত ময়দানে ঈদের নামায পড়ার লুপ্তপ্রায়ই সুন্নতি ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন। সাইয়িদ আবদুল করিম আল মাদানী (রহ.) ছিলেন সাদেক আল মাদানীর নিকটতম আত্মীয় এবং এই লুপ্তপ্রায় সুন্নতি ঐতিহ্য পুনপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ সহযোগী। ফলে ১৯৩৬ সালে ঐতিহাসিক লালদিঘীর ময়দানে সফল ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের নীরব নিরহংকারী সেবক কোহিনুর লাইব্রেরী ও কোহিনুর প্রেসের মালিক মর্দে মুমিন আলহাজ আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার হযরতুল আল্লাম সাইয়িদ আবদুল করিম আল মাদানীর নিত্য সহচর এবং সেবকরূপে নিঃস্বার্থ সেবা দান করেছেন।

সাইয়িদ আবদুল করিম আল মাদানী (রহ.) তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্তি থেকে আজীবন চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় *ঈদ জামাত কমিটির যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন এবং আন্দরকিল্লা শাহী* জামে মসজিদের খতিব ও পেশ ইমাম হিসেবে রীতি মাফিক চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় ঈদ জামাত কমিটির প্রধান ঈদের নামাযের বৃহত্তর জামাতে ইমামতি করেছেন যথাযোগ্যভাবে।

তিনি তাঁর ওফাতের পূর্বে তাঁর ইমামতির স্থলে শাহী জামে মসজিদের নবনিযুক্ত খতিব ও ইমাম হযরত সাইয়িদ মাওলানা হাফেজ আবদুল আহাদ আল মাদানী সাহেবকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় ঈদ জামাত কমিটির প্রধান ইমামরূপে মনোনয়ন দিয়ে যান।

পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায ঈদগাহ ময়দানে আদায়ের যে মর্তবা ও মর্যাদা এবং এর কী সওয়াব মরহুম সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানী সাহেব (রহ.) তা শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

সাইয়িদ আবুদল করিম আল মাদানী (রহ.) ৮৮ বছর বয়সে ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৮ খৃস্টাব্দে ১৫ শাওয়াল মঙ্গলবার তাঁর স্মৃতিময় কর্মস্থল আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে তদীয় হুজরায় ইন্তে কাল করেন। ঐতিহাসিক লালদিঘী ময়দানে লক্ষ মুসলমানের উপস্থিতিতে জোহরের নামাজের পর তার নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ পীরে কামেল হযরত মাওলানা আতিকুল্লাহ খান সাহেবের ইমামতিতে প্রথম জানাজা শেষে মরহুমের অসিয়ত অনুসারে তাঁরই জ্ঞাতি ভাই সাইয়িদ আবদুল আহাদ আল-মাদানীর ইমামতিতে চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে তাঁর দ্বিতীয় নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে লাশ মুবারক মরহুমের জন্মস্থান মদিনা শরীফে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। তদানীন্তন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ও চট্টগ্রাম কেন্দীয় ঈদ জামাত কমিটির সভাপতি একিউএম সালাহ উদ্দিন টিকিউএ, লাশ মুবারক মদিনা শরীফ পৌঁছানোর যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আলহাজ্জ নওশের আলী খান এবং মাওলানা আমিনুল ইসলাম চট্টগ্রামবাসীর পক্ষ থেকে পিআইএ, প্লেনে লাশ বহন করে পবিত্র মদিনায় পৌছে দেন। পবিত্র জুমার নামাযের পর মসজিদে নববী (সা.)-এর ইমাম সাহেবের ইমামতিতে মসজিদে নববীতে নামাযে জানাজা শেষে জান্নাতুল বাকীতে পবিত্র আওলাদে রাসুলগণের (সা.) নির্দিষ্ট ব্লকে তাঁকে দাফন করা হয়। সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানী (রহ.) এবং আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) মধ্যে অত্যন্ত সম্মানজনক সম্পর্ক ছিলো। তিনি বিভিন্ন সময় আল্লামা ফজলুল্লাহকে যে চিঠি লিখেছেন শুরুতে খুবই সম্মানের সাথে সম্বোধন করেছেন আল্লামা ফজলুল্লাহকে (রহ.)।

ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (রহ.)

হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রাণপুরুষ ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (রহ.) ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর আলিমে বরহক। তাঁর হাতে গড়ে উঠেছে হাজার-হাজার প্রথিতযশা মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও আলিমেদ্বীন। চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস হিসেবে তিনি পাঁচ দশক ধরে নিয়োজিত ছিলেন।

জন্ম ও পড়াশোনা: তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলাধীন দূরদুরী গ্রামে ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসের কোন এক দিন পিতা মৌলভী মুহাম্মাদ আবদুল ফাত্তাহ চৌধুরী এবং মাতা লতিফা খাতুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা আদর করে এ নবজাতকের নাম রাখেন দোজাহানের সরদার হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর লক্বব অনুসারে "মুহাম্মদ আমীন"। আরবি-ফার্সিতে দক্ষ ধর্মভীরু মা বাবার তত্ত্বাবধানে নিজ গ্রামেই মাওলানা আমীনের পড়াশোনার হাতেখড়ি। পার্শ্ববর্তী এলাকার পুকুরিয়া মাদরাসা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ১৯২১ সালে চট্টগ্রাম শহরের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ উম্মুল মাদারিস নামে খ্যাত দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসা হতে ১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে যথাক্রমে আলিম ও ফাযিল জামাতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের পক্ষ হতে তাঁকে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় পাঠানোর সুপারিশ করা হয়। ফলে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় তিন বছর নিবিষ্ট অধ্যয়ন শেষ করে কামিল পরীক্ষায় উভয় বাংলা আসামে ১৯২৯ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করলে গোল্ড মেডেলসহ ফখরুল মোহাদ্দিসীন উপাধী লাভ করেন।

শিক্ষকতা: শিক্ষাজীবন শেষে উপমহাদেশের এ শ্রেষ্ঠ মাদরাসা কলকাতা আলিয়ায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের সুযোগ পেয়েও তিনি তার মুর্শিদ ফখরে বাংলা মাওলানা আবদুল হামিদ (রহ.) এর অনুরোধে দেশে ফিরে এসে দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। এখানে তাঁর আদর্শিক গুরু ছিলেন পীরে কামিল শাহসুফি মাওলানা নজীর আহমদ (রহ.)। তাঁর এ হক্কানি রাহবারের ইন্তেকালের পর মাওলানা আমীন (রহ.) মাদরাসার হেড মাওলানা পদে উন্নীত হন। ১৯৪০ সালে দারুল উলুম মাদরাসায় কামিল হাদিস খোলা হলে তিনি মুহাদ্দিস ও পরবর্তীতে প্রধান মুহাদ্দিস (শায়খুল হাদিস) হিসেবে সিহাহ সিত্তার সবক প্রদান করতেন। হাদিসশাস্ত্রে যেমনি তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পেতো তেমনি ফিক্হ, তাফসীর, উসূলুল ফিক্হ, ইসলামের ইতিহাস, ফাতওয়া, ফরায়েজ প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য প্রতিভাত হতো। তিনি "দারুল ইফতা চট্টগ্রাম"র মুফতি হিসেবে ফাতওয়া দেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। রাষ্ট্রীয় আদালতে ইসলামি বিশেষজ্ঞ হিসেবে অসংখ্যবার তাঁর মতামত উপস্থাপন ও গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সময় মাদরাসায় অধ্যক্ষের পদ খালি হলে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সাময়িকভাবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব আনজাম দিতেন। তবে কখনো এ পদে স্থায়ীভাবে সমাসীন হওয়ার জন্য তিনি আবেদন করেননি। তাঁর প্রিয়তম ওস্তাদের পদাংক অনুসরণে হেড মাওলানা পদটিই ছিলো তাঁর পছন্দের।

সাহিত্য সাধনা: উর্দু, ফার্সি ও আরবি ভাষায় ঈর্ষণীয় দখল ছিলো তাঁর। 'শাহেদ' ও 'শয়দা' নামে। তিনি বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনায় কবিতা লিখতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম শহরের দামপাড়ার বাসায় অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত হলে তাঁর কবিতার মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলো ভস্মিভূত হয়ে যায়। "খেতাবে মুজাহিদে কওম সহ তাঁর বেশ কতিপয় সাড়াজাগানো কবিতা ও অভিনন্দনপত্র সম্প্রতি মাওলান মুহাম্মদ আমীন স্মারকগ্রন্থে

প্রকাশিত হয়েছে। হস্তলিপি ও শব্দ চয়নে তাঁর হাত বেশ পাকা ছিলো। তিনি খুতবা ও ওয়াজে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামের আধুনিক জীবনধারা প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটিয়ে তুলতেন।

সামাজিক ও সাংগঠনিক জীবন: তাঁর ছিলো বলিষ্ঠ মানবিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে অনন্য অবদান। তিনি চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ, মাওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রতিষ্ঠিত কদম মোবারক মুসলিম এতিমখানা, দারুল উলুম মাদরাসা হোস্টেল ও পুরনো ভবণ সংস্কার এবং জমিয়াতুল ফালাহ প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তাছাড়া তিনি নিজ গ্রামে একটি মসজিদ পুনঃনির্মাণ, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ফোরকানিয়া ও দূরদুরী মুহাম্মদিয়া সিনিয়র মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। চট্টগ্রামের সর্বস্তরে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ সমানে সমাদৃত হতো। বিশেষ করে জহুর আহমদ চৌধুরী, জনাব এমএ মান্নান তাঁর প্রচণ্ড ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর পরামর্শ নিতেন এবং তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করতেন।

পারিবারিক জীবন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন জাত পড়ুয়া। ইলমে দীনের সাধনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁকে হানাফী মাযহাবের পণ্ডিত বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে হাদিস সহিহ প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি সেটাই আমল করতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো উদার। মনেপ্রাণে ইসলামের আধুনিক উপস্থাপনকে পছন্দ করতেন। ১৯৫২ সালে তিনি পবিত্র হজ পালন করেন। তার স্বপ্ন ছিলো অসংখ্য নবীর স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি জেরুজালেম সফর করার। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বাধা থাকায় সেটা সম্ভব হয়নি। অনুপম ধর্মানুরাগী এ মহান মুহাদ্দিস ইসলামি অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। সহজ-সরলতা, বিনয়-নম্রতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, আমানতদারিতা, সহানুভূতিশীলতা, আন্তরিকতা ও একাগ্রতা তাঁর চারিত্রিক ভূষণ। "মাওলানা মুহাম্মদ আমীন স্বীয় উস্তাদ ও পীর শাহসুফি মাওলানা মুহাম্মদ নজির আহমদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকার অন্তর্ভুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি স্বীয় পীরের কাছে খিলাফতপ্রাপ্ত হন"।

ইন্তেকাল: গ্রামের বাড়িতে নিয়মিত ছুটি কাটাতে এসে অল্পসময় অসুস্থ থাকার পর ১৯৭৭ সালের ১২ জুন তিনি পরপারে পাড়ি জমান। তৎকালীন সময়ে প্রায় দশ সহস্রাধিক লোক তাঁর নামাজে জানাজায় শরিক হয়। একটানা ৪৮ বছর শিক্ষকতা জীবনে তার বহুমুখী পাণ্ডিত্যের ইলমি সুধা পেয়ে যারা ধন্য হয়েছেন তাঁদের এক বিশাল অংশ বর্তমানে দেশে-বিদেশে মুসলিম সমাজে ইসলামি দাওয়াত, তা'লিম-তরবিয়ত ও তামদ্দুন-তাহযিবের লালন ও বিকাশে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন-বস্তুতপক্ষে সেখানেই মাওলানা আমীনের সার্থকতা।

বাঁশখালীর বড়ো হুজুর শাহসুফি শফিকুর রহমান (রহ.)

জন্ম ও জন্মস্থান: সর্বজনশ্রদ্ধেয় এ মুরশিদে বরহক ১৯০১ সালে পশ্চিম চাম্বল মুন্সিখীল এলাকার মৌলভী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতাও একজন বুযর্গ ছিলেন। পুরো বাঁশখালীতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। তিনি হচ্ছেন- হযরত মাওলানা আবদুল লতিফ। বড়ো হুজুরের আম্মাজান আখতার জাহানও একজন আবেদা জাহেদা, ছালেহা মহিলা ছিলেন।

দাদা মৌলভী মুহাম্মদ আলাউদ্দীন। হুজুরের নানা বাড়ি একই উপজেলার সাধনপুর মীর বাড়িতে। নানা শাহসুফি মাওলানা মীর আনোয়ারুল্লাহ ছিলেন বিশিষ্ট আলিম ও পীর সাহেব। মীর বাড়ি এখনও দ্বীনি শিক্ষার গৌরবময় ঐতিহ্যদীপ্ত। তিনি আপন চাচাতো বোন শফিকা খাতুনের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

শিক্ষা-দীক্ষা: মাওলানা শফিকুর রহমান (রহ.) ছোটকালে পারিবারিক পরিবেশেই দ্বীনি তালিম অর্জন করেন। বাংলাবাজার মাদরাসার তৎকালীন প্রসিদ্ধ মাওলানা হাসমত উল্লাহ ও তাঁর ফুফা হাফেজ তফজ্জলুল ওয়াদুদ (বড় হাফেজ)-এর নিকট পবিত্র কুরআন শরীফ শিক্ষা গ্রহণ করেন। কুরআন শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রাচীনতম মাদরাসা পুঁইছড়ি ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি সেখান থেকে পানজুম পাশ করে চট্টগ্রাম শহরের দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সম্ভবত ৩০ এর দশকের দিকে তিনি এই মাদরাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি ফাযিল পাশ করেন কৃতিত্বের সাথে। উল্লেখ্য যে, তখনও দারুল উলুম মাদরাসায় টাইটেল ক্লাস খোলা হয়নি। ১৯৪৮ সালে তাঁরই নিকটাত্মীয় দেশবরেণ্য উসতাদ হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান এ মাদরাসায় টাইটেল জামাতের মঞ্জুরী নিয়ে আসেন।

ইতোপূর্বে দেশে শর্ষিনা আলিয়া ছাড়া আর কোথাও টাইটেল মাদরাসা ছিলো না বলে তিনি হিন্দুস্থানের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত মাযাহির উলুম সাহারানপুর মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস (টাইটেল সমমান) অধ্যয়ন করেন। এছাড়া তিনি হুজুরদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে কঠোর পরিশ্রম করে তাফসীর, ফিকহ ও আদবের ওপর দখল নেন।

শিক্ষকতা জীবন ও তরিকত: প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করেই তিনি সর্বপ্রথম শিক্ষকতা করেন ভারতে অবস্থিত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়। সেখানে কিছুকাল শিক্ষকতার পর তিনি নিজ মাতৃভূমির অকৃত্রিম টানে দেশে ফিরে আসেন। তখন পুঁইছড়ি মাদরাসার জয়জয়কার চলছিলো। ছাত্র-শিক্ষকের জমজমাট পরিবেশ মুখরিত করত চারিদিকের আলো-বাতাস। বড় হুজুরের পিতামাতা ও অন্যান্য মুরব্বির অনুমতিক্রমে পুইছড়ি ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় সসম্মানে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে একটানা ৪০ বৎসর বিভিন্ন সমস্যার পাহাড় চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তিনি মানুষ গড়ার কারিগরের দায়িত্ব পালন শেষে নিজ ঘরে কিছুদিন অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৬-১৯৪৮ সালে প্রথমবার এবং ১৯৬১-৬৪ সালে ২য় বার এই মাদরাসায় সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অবসরে তাঁর মন টেকে না। তালিবে ইলমের মাঝে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। তাই দ্বীনের খেদমতের জন্য চলে আসেন জলদী মখজনুল উলুম ইসলামিয়া মাদরাসায়। এরপর শিক্ষকদের অতীব আগ্রহের কারণে পুঁইছড়ী মাদরাসায় পুনরায় ফিরে আসেন। তবে এখানে তিনি বেশি দিন স্থায়ী হননি। পরে তিনি বিভিন্ন সময় রঙ্গিয়াঘোনা মাদরাসা, বৈলছড়ি আজিজিয়া কাসেমুল উলুম মাদরাসা, চাম্বল আইনুল ইসলাম কওমি মাদরাসা এবং খাতেমা বিল খাইর হিসেবে পুনরায় জলদি মখজানুল উলুম মাদরাসায় শায়খুল হাদিস হিসেবে কুরআন-হাদিসের তালিম দিতেন। হিন্দুস্থানের প্রখ্যাত আলিম দেওবন্দ মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা সাইয়িদ আজগর হোসাইন (রহ.) ছিলেন তাঁর পছন্দের অগ্রজ পীর।

তাঁর ছাত্ররা আজ দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী, মাওলানা ক্বারী মোখতার আহমদ, অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রহমান, অধ্যক্ষ মাওলানা এলাহাদাদ আব্বী প্রমুখ তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের অন্যতম। পুইছড়ি মাদরাসায় মুদাররিস থাকাকালীন তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে শাহসুফি হযরত মাওলানা এলাহী বখশ (ছোটো হুজুর), মাওলানা আবদুল লতিফ, মাওলানা মোজাফফর আহমদ, মাওলানা আবদুস ছমদ, মাওলান মোজাফ্ফর আহমদ সিকদার প্রমুখ উল্লেখ্যযোগ্য।

চরিত্র ও উপদেশ: মাওলানা শফিকুর রহমানের (রহ.) জীবন ছিল একদম সাদাসিধে। তিনি কোমল প্রাণ ও দিল-দরিয়া ছিলেন। অন্যায়, অশ্লীল বেহায়াপনার প্রতি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি থাকত কেউ তাঁকে ফাঁকি দিতে পারতো না। তিনি সব সময় তাঁর ছাত্র ও ভক্তদের আল্লাহর যিকির করার কথা বলতেন। তিনি বলতেন, একিন রাখিও আল্লাহ তা'আলার ওপর, রিজিক তোমার কিসমত অনুসারে হবে। তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলতেন, তোমরা যা পারো দান করো। কারণ, কিপটে ও হিংসুক দোযখে যাবে।

তাঁর স্বভাব চরিত্র কোমল ও মধুর ছিল। তিনি কথা, কাজ ও আচরণে সহজেই যে কাউকে আপন করে নিতে পারতেন। তিনি তাহাজ্জুদ কাযা করতেন না। সব সময় ইবাদত ও জিকির-আযকারে মশগুল থাকতেন।

ঐক্যের প্রতীক: বড় হুজুর কওমি-অকওমি সরকারি-বেসরকারি সর্বস্তরের আলেম-ওলামার শ্রদ্ধাভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ওহাবি-সুন্নি এখতিলাফ তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি সবাইকে আল্লাহর বান্দা ও রাসুলের উম্মত হিসেবেই জানতেন।

"আলিমগণের মাঝে ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মহলের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখতেন। তিনি অনায়াসে গমন করতেন কওমি মাদরাসার সভা ও সরকারি নেছাবের মাদরাসার সভায় এবং মিলাদ ও সীরাত মাহফিলে। তিনি কখনো শিরক-বিদআতকে চুল পরিমাণও বরদাশত করতেন না।"

ইন্তেকাল: শেষবয়সে হুজুর চলাফেরায় অক্ষম হয়ে পড়লে গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। একদিন হুজুর কোনো একজন থেকে জানতে চাইলেন, পার্শ্ববর্তী বিলের আমন ধান কাটা হয়েছে কিনা। তিনি ইতিবাচক জবাব দেন। পরদিন ২ মার্চ ১৯৯৮ সাল রাত ১১.৪৫ টার সময় সোমবার হুজুর কালিমায়ে তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ উচ্চারণ করতে-করতে মহান প্রভুর দরবারে পাড়ি জমান। হুজুরের ইন্তেকালের দিন ভিটে-বাড়ি সুগন্ধিময় হয়ে যায়।

ছোটো হুজুর শাহ্সুফি মাওলানা ইলাহী বখশ (রহ.)

জন্ম: মাওলানা ইলাহী বখশ ১৯০১ সালের ৩ শ্রাবণ ১৩০৮ বাংলা, শনিবার ১৩২২ হিজরি বাঁশখালী থানার শেখেরখীল গ্রামে সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাজী মৌলভী আলিমউদ্দিন ছিলেন সমাজের সর্দার। সমাজহিতৈষী কর্মকাণ্ড ও বিচার-আচারের জন্য তার সুখ্যাতি সুবিদিত ছিলো। তিনি তৎকালীন সময়ে মুহসিনিয়া মাদরাসা হতে প্রবেশিকা পাশ করেছিলেন। তার বাবা হাজী বাকর আলী মাতব্বরও সেসময়কার গুণী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মাওলানা ইলাহী বখশের মাতা বেগম শামসুন্নাহার ছিলেন একজন পর্দানশীন বিদুষী মহিলা। অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, চিন্তাশীল ও স্বাতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন হয়ে বেড়ে উঠার পেছনে বালক ইলাহী বখশের মায়ের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। জানা যায়, মাওলানা ইলাহী বখশের পূর্বপুরুষ আব্বাসীয় বংশধারার সাথে মিলিত হয় এবং তাঁরা সুদূর আরব হতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেন।

শিক্ষালাভ: শিক্ষিত মা বাবার কাছেই ইলাহী বখশের পড়ালেখার হাতেখড়ি। ৬-৭ বছর বয়সে তাঁকে স্থানীয় নব মাতব্বরের গুরুগৃহে পড়ালেখার জন্য পাঠানো হয়। সেখানে কয়েকবছর পড়ার পর অদূরে নানা বাড়ির পাশে অবস্থিত উত্তর চাম্বল বোর্ড স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। সেখানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন নবপণ্ডিত।

এ স্কুলে তৃতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের নিউ স্কীম হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ছনুয়া কাতেবি বাড়িতে লজিং থাকতেন। সেখানে তিনি সর্বজন সম্মানীয় বুযর্গ ব্যক্তিত্ব মাওলানা খলিলুর রহমানের সোহবত পেয়ে নিজেকে আরো খালিছ ঈমানদার বানিয়ে নেন। ফলে ইলমে দ্বীনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং নব প্রতিষ্ঠিত পুঁইছড়ি ইসলামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে কয়েক বছর পড়ার পর ১৯১৫ সালে তিনি চট্টগ্রাম শহরের ঐতিহ্যবাহী দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসা হতে ১৯৩০ সালে সর্বোচ্চ ডিগ্রি জামাতে উলা পাশ করতঃ আরবি, ফার্সি, উর্দু, ইংরেজি, বাংলা ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় আরো উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হলেও অজানা কারণে সেখানে বেশিদিন না থেকে দেশে ফিরে আসেন।

কর্মজীবন: পারিবারিক প্রয়োজনে ১৯৩০ সালেই তিনি মিরসরাই লতিফিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে দু'বছর শিক্ষকতার পর বাঁশখালীর জমিদার ইজ্জত আলী চৌধুরীর আহ্বানে ১৯৩৩ সালে পুঁইছড়ি ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় যোগদান করেন। এখানে একনাগাড়ে ২১ বছর ধরে শিক্ষকতার পর ১৯৫৫ সাল হতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিন বছর তিনি বড়ঘোপ রহমানিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে আবার ১৯৫৮ সালে পুঁইছড়ি মাদরাসার হাল ধরেন। তিনি প্রথম বার ১৯৬০-১৯৬২ সালে তিন বছর এবং ২য় বার ১৯৬৪-১৯৬৮ সালে ৫ বছর সুপারিনটেনডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন। এ মাদরাসার সুপারের দায়িত্ব শেষে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কুরআন, হাদিস, ফিকহ, মানতিক, ফারায়েজ, অংক প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষকতা করে অবসর নেন। জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজেই বুঝিয়ে দিতে পারতেন বলে তিনি ছাত্রদের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

পারিবারিক জীবন: মাওলানা ইলাহী বখশ (রহ.) পিতামাতার অনুরোধে মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিয়ে করেন।

আধ্যাত্মিক জীবন: মাওলানা ইলাহী বখশ আজন্ম ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। পুঁইছড়ি মাদরাসার রূপকার অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল কাদেরের (রহ.) হাতে তাঁর ইলমি জীবন শুরু হয়। আর তিনি প্রথম আধ্যাত্মিক তালিম নেন চুনতির মাওলানা শাহ নজির আহমদ (রহ.) এর কাছ থেকে। পরবর্তীতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আবদুস সালাম আরকানি (রহ.) সংস্পর্শে এসে শরিআত ও মারিফাতের বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি পীরের সাথে দাওয়াতী কাজে বাংলাদেশ, ভারত ও বার্মার প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর করেন। ১৯৫০ সালে তিনি তাঁর পীরের কাছ থেকে পরিপূর্ণ খিলাফতপ্রাপ্ত হন। আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর অসংখ্য কারামত পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মুখ এতই পবিত্র ছিল যে, তিনি কুরআন-হাদিস থেকে কোনো কিছু পড়ে ফুঁক দিলে তা নেক নিয়তে পান করে হাজার হাজার মানুষ উপকার লাভ করত। ফলে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবধরনের লোকজন একটু দুআ' ও পানি পড়ার জন্য তাঁর বাড়িতে এসে ভীড় জমাতো।

তাকওয়া ও পরহেজগারি: হাদিসের ভাষ্য মতে, যাকে দেখলে আল্লাহপাকের কথা স্মরণে আসে তিনি ঈমানদার। শাহ ইলাহী বখশ এমনই তাকওয়াবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তাঁকে দেখলেই হৃদয়ে আল্লাহর কথা স্মরণে আসে। অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাদাসিদে জীবনের অধিকারি এ বুযর্গ কখনো দুষ্টুমির ছলেও কাউকে কষ্ট দেননি, মিথ্যা বলেননি। যৌবন বয়সেও তিনি দৃষ্টি অবনত রাখতেন, সদা-সর্বদা যিকরুল্লাহে মগ্ন থাকতেন। তিনি মাদরাসা পরিচালনায় ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ ও পরিচ্ছন্ন। হিসেব-নিকেশে থাকতেন আয়নার মতো পরিষ্কার। ১৯৮২ সালে তিনি পবিত্র হজ পালন করেন। তিনি ছিলেন আজীবন প্রচারবিমুখ। ইন্তেকালের পরও সাধারণ কবরস্থানে দাফনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর কবরকে কেন্দ্র করে যেনো কোনো ধরনের আয়বর্ধক শিরক-বিদআতের আয়োজন করা না হয় সে জন্য সবাইকে কঠোরভাবে সতর্ক করেন।

সমাজসেবা: সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে দ্বীনি দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মাওলানার প্রয়াস ছিল নিরন্তর। তিনি অশীতিপর বুড়ো বয়সেও পালকিতে চড়ে দূর-দূরান্তে গ্রামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সভা-সমাবেশ ও দ্বীনি মজলিসে হাজির হয়ে সভাপতিত্ব করতেন এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সারগর্ভ বয়ান পেশ করতেন। তিনি নিজ গ্রামে এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে দ্বীন ও দুনিয়াবী শিক্ষার প্রসাবের জন্য দারুস সালাম আদর্শ সিনিয়র মাদরাসা ও বায়তুর রব্বান মসজিদ ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন।

ইন্তেকাল: পীরে কামিল শাহ্‌সুফি মাওলানা ইলাহী বখ্‌শ নিজ বাড়িতে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৪ সালে ৯৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর নামাজে জানাযায় সারা চট্টগ্রাম হতে ভক্ত, মুরিদ, ছাত্র ও সহকর্মী মিলে লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলমান শরিক হয়।

বিদগ্ধ আলিম হযরত মাওলানা মুযহির আহমদ

হযরত মাওলানা মুযহির আহমদ (রহ.) ছিলেন একজন অসাধারণ মেধাবী ব্যক্তিত্ব, বাল্যকাল হতে তাঁর মেধা ও প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল অত্যন্ত প্রখরভাবে। বাল্যকালে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ বোন রশিদা খাতুনের নিকট পবিত্র কুরআন শরিফ এর নাজেরা সমাপ্ত করেন অতি অল্প সময়ে। অতঃপর ১৯২১ সালে তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান তাঁকে চকরিয়া সাহারবিল বোর্ড স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেন। ১৯২৫ সালে বোর্ড বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তিনি চকরিয়া উপজেলায় ১ম স্থান অধিকার করে মাসিক ৩ টাকা হারে বৃত্তি লাভ করেন। জামাতে দাহুম হতে চাহারুম পর্যন্ত তিনি সাহারবিল আনোয়ারুল উলুম মাদরাসায় পড়ালেখা চালিয়ে যান। এ মাদরাসায় তিনি যেসব শিক্ষকবৃন্দের নিকট অধ্যয়ন করেছেন তারা হচ্ছেন- মরহুম মাওলানা মকবুল আহমদ, মরহুম মাওলানা হিদায়ত উল্লাহ, মরহুম মাওলানা আজমত উল্লাহ, মরহুম মাওলানা আবদুস সুবহান, মরহুম মাওলানা ফজলুল করীম, মরহুম মাওলানা আবু নসর, মরহুম মাওলানা আবু সাঈদ, মরহুম মাওলানা সাইয়িদ আহমদ এবং খতিবে আযম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) প্রমুখ।

১৯৩১ সনে তিনি সাহারবিল মাদরাসা হতে জামাতে চাহারুমের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করে ১৯৩২ সনে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন আলিম ২য় বর্ষে।

১৯৩৩ সালে তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা হতে কলকাতাস্থ বেঙ্গল সেন্ট্রাল মাদরাসা একজামিনেশন বোর্ড এর তত্ত্বাবধানে অবিভক্ত বাংলায় আলিম পরীক্ষায় ৩য় এবং ১৯৩৫ সনে ফাজিল পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করেন। তখনকার দিনে কলকাতা ছাড়া আর কোথাও কামিল (টাইটেল) পড়ার ব্যবস্থা ছিলো না। ফাজিল পরীক্ষায় যারা ১ম হতে ৪র্থ স্থানে উত্তীর্ণ হতো তাদের জন্য সে সময় মাসিক ৫০ টাকা হারে এবং ৫ম থেকে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারীর জন্য মাসিক ২৫ টাকা হারে বৃত্তির ব্যবস্থা ছিলো। সুতরাং তিনি মাসিক ৫০ টাকা হারে বৃত্তি লাভ করেন। অবশ্য এ বৃত্তি ভোগ করতে হলে ১ম থেকে ৪র্থ স্থান অধিকারকারীকে কামিল হাদিস বিভাগে এবং ৫ম হতে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারকারীকে কামিল ফিকাহ বিভাগে ভর্তির শর্তারোপিত ছিলো।

উচ্চশিক্ষার্থে কলকাতা গমন: চট্টগ্রাম মেইল ট্রেনযোগে কলকাতার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন এবং ১৪.০৭.৩৫ ইং রাত দশটায় কলকাতাস্থ শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছেন। সেখান থেকে তাঁকে বন্ধু মাওলানা আবু দরদা মুহাম্মদ মায়াজ চট্টগ্রামের বাঁশখালী নিবাসী হলেও সে এখন কলকাতা খিদিরপুরের স্থায়ী অধিবাসী। ট্রেন স্টেশন থেকে তাঁরা তাঁকে নিয়ে রাত সাড়ে দশটায় মাদরাসায়ে আলিয়ার ইলিয়ট হোস্টেলে পৌঁছে। এই ইলিয়ট হোস্টেলে তিনি অবস্থান করেন। আবু দরদা কলকাতা জীবনে, তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁকে মাদরাসায়ে আলিয়া কলকাতায় কামিল ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দেন এবং লাইব্রেরি হতে কিতাব নিয়ে দেন। স্কলার ছাত্র হিসেবে ফ্রি সিটের ব্যবস্থা করে দেন। এই মাদরাসায় অধ্যয়ন শেষ অবধি তিনি এই ইলিয়ট হোস্টেলে অবস্থান করেন।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে কামিল (টাইটেল) প্রথম বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে

তিনি কামিল (টাইটেল) ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহপাকের অশেষ রহমতে তিনি অবিভক্ত বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। মাদরাসা বোর্ডের বিগত ১২ বছরের মধ্যে সর্বাধিক নম্বর পাওয়ায় তিনি ভাইসরয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁর এ কৃতিত্বের কথা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি একই বছরে মিসরের আল আযহার ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু পারিবারিক অসম্মতির কারণে আল আযহারে তাঁর পড়া সম্ভব হয়নি। ১৯৩৮ সালে তিনি কলকাতা মাদরাসা একজামিনেশন বোর্ড হতে রিসার্স স্কলারশিপ লাভ করেন। ১৯৩৮ সনের জুলাই হতে ১৯৪১ এর জুন পর্যন্ত দুই বছরকাল তিনি ইমাম মালেক (রহ.) এর জীবনী ও ফিকহ্ সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং "সীরাতে মালেক ও ত্বরিকে ইসতিনবাতে ফিকহ" এর ওপর একটি গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন। যা সে সময় কলকাতা মাদরাসা আলিয়া কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

কর্মজীবন: ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে কামিল পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বে তিনি চকরিয়া সাহারবিল আনোয়ারুল উলুম সিনিয়র মাদরাসায় সুপারিনটেনডেন্ট পদে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৩ হতে ১৯৫২ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১০ বছর তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে চকরিয়াস্থ সাহারবিল আনোয়ারুল উলুম মাদরাসাকে গড়ে তোলেন। ১৯৪৩ সালে কক্সবাজার জেলার বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ সাহেব উক্ত মাদরাসায় যোগদান করলে তিনি তাঁর সহযোগিতায় মাদরাসার অবকাঠামো মজবুত করেন।

১৯৫২ সনে তিনি সাহারবিল আনোয়ারুল উলুম মাদরাসা হতে চলে আসেন। ইতোমধ্যে উক্ত মাদরাসা থেকে তাঁর চলে আসার সংবাদ জেনে কক্সবাজার হাশেমিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা জনাব কলিমুল্লাহ সাহেব তাঁর একজন কর্মকর্তাকে ইতোমধ্যে একদিন মাওলানা মুযহির আহমদ (রহ.)-এর নিকট পাঠালেন। উক্ত কর্মকর্তা তাঁকে একান্ত আগ্রহভরে অনুরোধ জানালেন যে, কক্সবাজারের কেন্দ্রস্থলে একটি নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাদরাসাটির হাল ধরার জন্য কর্তৃপক্ষ আপনাকে মনোনীত করেছেন।

পরিশেষে তিনি সবার অনুরোধে ১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারি একশত টাকা বেতনে কক্সবাজার হাশেমিয়া আলিয়া মাদরাসায় সুপার পদে যোগদান করেন। অতঃপর প্রতিষ্ঠানটি তাঁর বিশেষ প্রচেষ্টায় ১৯৮১ সালে কামিল স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি এ মাদরাসার সুপার, অধ্যক্ষ ও রেক্টর হিসেবে ২০০০ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক কর্মজীবন সমাপ্ত করেন।

বিদেশ সফর: হযরত মাওলানা মুযহির আহমদ হাশেমিয়া আলিয়া মাদরাসার রেক্টর থাকাকালীন সময়ে ১৯৮৭ সালে ইসলামিয়া জমহুরিয়া ইরানের ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইরান গমনের জন্য আমন্ত্রণ পান। ইরান সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ১৯৮৭ সালে ২৬ জানুয়ারি ইরান সফরে যান।

১৯৯০ সালে তিনি ইরাক সরকারের আমন্ত্রণে ইরাক সফর করেন। এ সফরে তিনি ইরাকের ইতিহাসসমৃদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি রাষ্ট্রীয় সভা-সমাবেশেও যোগদান করেন। তিনি ইরাক, ইরান ছাড়াও সৌদি আরব, কুয়েত, দুবাই ও জর্ডান সফর করেন।

হযরত আল্লামা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে এদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য অনেক আরব বণিক ও সুফি-সাধক আসেন। তার মধ্যে মিয়াজি পরিবার অন্যতম। সে মিয়াজি পরিবারের একজন হলেন মাওলানা ওয়াছি উদ্দিন মিয়াজি। চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া ইউনিয়নের মিয়াজি পাড়ার তাঁর স্থায়ী নিবাস। মাওলানা ওয়াছি উদ্দিন মিয়াজির মেজো সন্তান হলেন আল্লামা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.), পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ। ১৯৩৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বর্তমান মিয়ানমারের থাংগু জেলায় কালাবস্তি বাঙালি কলোনিতে হযরত আল্লামা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আল্লামা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর আড়াই বছর বয়সে তাঁর পিতার ইন্তেকালে কিশোর আব্দুল জব্বার (রহ.)-এর মাতা ফিরোজা খাতুন তাঁর একমাত্র অভিভাবকে পরিণত হন।

হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। আরবি, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন তিনি। তাঁর মুর্শিদ ছিলেন কুতবুল আখতর শাহ্সুফি হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.)। ১৯৪৮ সালে আলিম প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত অবস্থায় পবিত্র শবে-বরাতের রজনীতে তাঁর মুর্শিদ মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) তাঁকে বায়আত করান। চট্টগ্রাম স্টেশন মসজিদে মুর্শিদের হুজরাখানায় মুর্শিদের কাছে থেকে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সকলে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বারকে (রহ.) সম্মান করবে। সে আমার রুহানি সন্তান। মুর্শিদের নির্দেশে পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিসের চাকুরি ছেড়ে চট্টগ্রামের কদমতলীতে মুর্শিদের সান্নিধ্যে চলে আসেন। তিনি কঠোর সাধনায় মারেফতের প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী হন। হযরত মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণের জন্য হযরত আল্লামা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল জব্বারকে (রহ.) গড়ে তোলেন। মুর্শিদ উপস্থিত সকলকে তাঁর পেছনে মুনাজাত করতে বলতেন। ভবিষ্যতে সবাইকে তাঁর পেছনে থাকতে হবে বলতেন। মুর্শিদ চট্টগ্রামের মাদারবাড়িতে তাঁরই কাছের মসজিদে পবিত্র জুমার নামাজ আদায় করতেন। প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাজের পর তাঁর মুর্শিদ কর্তৃক জিকির ও দোয়া মাহফিল হতো। তিনি স্বীয় মুর্শিদ ভক্তদের অভিপ্রায়ে একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রামের ধনিয়ালাপাড়ায় একটি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে উক্ত মসজিদে বায়তুশ শরফে প্রথম তারাবিহ শুরু হয়। ২২ নভেম্বর তাঁর মুর্শিদের ইমামতিতে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। সেদিনই তাঁর মুর্শিদ এ মসজিদের নাম ঘোষণা করেন মসজিদে বায়তুশ শরফ। শাহ সুফি হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) ১৯৭১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সৌদি আরবে পবিত্র হজ পালনকালে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের আগে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব হযরত আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ওপর অর্পণ করেন। দায়িত্ব পেয়ে তিনি ইসলামের মশাল নিয়ে ধর্মসংস্কারক হিসেবে এগিয়ে যান। তিনি সমাজ থেকে মদ-জুয়া, ব্যাভিচার-শিরক, বিদআত দূর করতে তৎপর ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, লোহাগাড়া উপজেলার দরবেশ হাট এলাকায় বার আউলিয়ার এক অলি হযরত শাহপীর (রহ.) এর মাজারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন যাবৎ ওরশের নামে অশালীন নাচ-গানের আসর হতো। শরিয়াত বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকতো। তিনি স্বীয় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে এসব কর্মকাণ্ড

উচ্ছেদ করে সেখানে ওয়াজ-নসিহত ও মিলাদ মাহফিলের ব্যবস্থা করলেন। বড়হাতিয়ায় প্রতিবছর ১২-১৩ বৈশাখ বলিখেলা ও গরুর লড়াই অনুষ্ঠিত হতো। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এ বলিখেলা ও গরুর লড়াই হয়ে আসছিলো। স্থানীয় প্রভাবশালী মরহুম সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী এটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মাওলানা ১৯৭৭ সালে বলি খেলা বন্ধ করে ঐ স্থানে ১১-১২ বৈশাখ (১৯৭৭ সাল থেকে) সিরাত মাহফিলের আয়োজন করেন। জবলে সিরাত বা সিরাতের পাহাড় হিসেবে এ পাহাড় বেশ পরিচিতি লাভ করে।

হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) তথাকথিত কোনো পীর ছিলেন না। তিনি একজন সংস্কারক ও মহৎপ্রাণ আলেম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি জীবদ্দশায় অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, মসজিদ, এতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, সেবা ও কর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। তিনি ইসলামি ব্যাংক, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহকে (রহ.) অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহকে (রহ.) এক রমজানে দাওয়াত করে কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফে খুবই সম্মানের সাথে মেহমানদারির ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়েছিলেন। তিনি ১৯৯৮ সালের ২৫ মার্চ সকালে ইন্তেকাল করেন। পরদিন ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ড মাঠে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের উপস্থিতিতে তাঁর স্মরণকালের বিশাল নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ মসজিদ ও বায়তুশ শরফ আদর্শ আলিয়া মাদরাসার মধ্যবর্তী ফুলবাগানের সামনে মাওলানাকে শেষশয্যায় শায়িত করা হয়।

হযরত শাহ্ মাওলানা আবদুর রশিদ রহ. (গারাঙ্গীয়ার ছোটো হুজুর)

হযরত শাহ্সুফি মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশিদ হামেদী সিদ্দিকী (রহ.) প্রকাশ ছোটো হুজুর। বিশাল ব্যক্তিত্বের, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহর ওলি ছিলেন। তিনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বলে ধারণা করা হয়।

তিনি বয়সে হযরত বড়ো হুজুর (রহ.)-এর প্রায় ৬ বছর ছোটো ছিলেন। হযরত বড়ো হুজুর (রহ.) হযরত ছোটো হুজুরকে (রহ.) অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে কোলে-কাঁধে নিতেন। হযরত ছোটো হুজুর (রহ.) নিজ পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর বারদোনা মাদরাসায় কিছুদিন লেখাপড়া করেন। এরই মধ্যে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে গারাঙ্গীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলে হযরত ছোটো হুজুর গারাঙ্গীয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। অতঃপর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন।

হযরত বড়ো হুজুর (রহ.) তাঁর স্নেহের ছোটো ভাই হযরত ছোটো হুজুরকে (রহ.) তাঁর দক্ষিণহস্ত হিসেবে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে গারাঙ্গীয়া মাদরাসায় নিয়ে আসেন এবং শিক্ষকতায় যোগদান করান।

গারাঙ্গীয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা অবস্থায় তিনি আউয়াল সাহেব হুজুর (হেড মাওলানা) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে হযরত বড়ো হুজুর (রহ.)-এর পাশাপাশি রাতদিন মাদরাসার খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তখন থেকে আউয়াল সাহেব হুজুর লকবে সর্বমহলে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব হুজুর 'হযরত বড়ো হুজুর

(রহ.)' এবং হযরত আউয়াল সাহেব হুজুর 'হযরত ছোটো হুজুর (রহ.)' হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছেন।

হযরত ছোটো হুজুর (রহ.) জন্মলাভ করা থেকে যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত অতি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মহান আল্লাহপাক নবী-রাসুলের যথার্থ নায়েবে রাসুল হিসেবে হযরত ছোটো হুজুরকে (রহ.) বিশেষ হেফাজতে রেখেছিলেন।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি গ্রামে হযরত মাওলানা কাজী ইউসুফ সাহেবের বাড়িতে হযরত বড়ো হুজুর (রহ.) তাঁর অতি আদরের ছোটো ভাই হযরত ছোটো হুজুরকে (রহ.) সাথে নিয়ে আজমগড়ী হযরতের হাতে তরিকতে দাখিল করিয়ে দেন। সে অবধি হযরত ছোটো হুজুর (রহ.) গারাঙ্গীয়া মাদরাসার খেদমতের পাশাপাশি তরিকতের কাজও চালিয়ে যান।

হযরত বড়ো হুজুর (রহ.) কর্তৃক আজমগড়ী হযরতের কাছে প্রেরিত চিঠির প্রত্যুত্তরে আজমগড়ী হযরত প্রায় চিঠিপত্রে এবং অন্য সকল যোগাযোগে হযরত ছোটো হুজুর (রহ.)-এর কথা উল্লেখ করতেন।

আজমগড়ী হযরত ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে তাশরিফ আনলে হযরত ছোটো হুজুরকে (রহ.) লিখিতভাবে খেলাফত দানে ভূষিত করেন। হযরত ছোটো হুজুর (রহ.) আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় খুবই পারদর্শী ছিলেন। তেমনি এ তিন ভাষায় প্রচুর লেখালেখিও করেছিলেন। তিনি 'আল ইসলাম' নামে একটি ইসলামি ম্যাগাজিন প্রকাশ এবং কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। হযরত বড়ো হুজুর (রহ.) জীবনের শেষের দিকে হযরত ছোটো হুজুর (রহ.)-এর বিশালত্বকে সর্বমহলে প্রকাশ করে দিতে থাকেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে গারাঙ্গীয়া মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব হযরত ছোটো হুজুর (রহ.) এর কাঁধে অর্পণ করে দেন এবং ১৯৭৩/৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে হযরত বড়ো হুজুর (রহ.) তরিকতের যাবতীয় কিছু হযরত ছোটো হুজুর (রহ.)-এর কাছে সঁপে দেন। হযরত বড়োর হুজুর (রহ.)-এর জীবদ্দশায় ১৯৭৪/৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পর্যায়ক্রমে উভয় ভ্রাতার সারা জীবনের প্রচেষ্টার ফসল গারাঙ্গীয়া মাদরাসা কমপ্লেক্সসহ হযরত বড়ো হুজুর (রহ.) প্রতিষ্ঠিত বিশাল শরিআত ও তরিকতের বাগানাদিকে হযরত ছোটো হুজুর (রহ.) পর্যায়ক্রমে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন।

তিনি হযরত বড়ো হুজুর (রহ.)-এর খলিফাগণের মধ্যে যারা জীবিত ছিলেন তাঁদেরকে পৃথকভাবে খেলাফতদানে ভূষিত করেন এবং বড়ো হুজুর (রহ.)-এর মুরিদ থেকেও পরবর্তীতে যোগ্য বিবেচনা করে আরো কতেক ব্যক্তিকে খেলাফত দানে ভূষিত করেন। হযরত ছোটো হুজুর (রহ.) তাঁর বিশালত্বকে কাজে লাগিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশেষ করে হযরত বড়ো হুজুর (রহ.)-এর মুরিদগণের শারীরিক ও আর্থিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা নিয়ে গারাঙ্গীয়া মাদরাসায় দালানাদি সম্প্রসারণসহ পৃথকভাবে হোস্টেল ভবন নির্মাণ করেন। জামে মসজিদকে বিশাল দালানে রূপান্তরিত করেন। পৃথকভাবে এতিমখানা ও মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। গারাঙ্গীয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তাঁর শ্রদ্ধাভাজন বড়ো ভাই হযরত বড়ো হুজুর (রহ.)-এর নামকরণে 'শাহ মজিদিয়া সড়ক' ও শাহ 'শাহ মজিদিয়া ডলু ব্রিজ' নির্মাণ করেন। হযরত ছোটো হুজুর (রহ.) ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইন্তেকাল অবধি ইসলামি ঐক্যের জন্য খেদমত করে গেছেন, তেমনিভাবে শরিআত ও তরিকতের পাশাপামি

মানুষকে কর্মময় জীবনের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতেন। তিনি সুন্নতের কঠোর পাবন্দ ছিলেন। তাঁর সম্মুখে কেউ তাঁর প্রশংসা করতে সাহস পেতো না।

জীবনের শেষের দিকে এসেও তিনি গারাঙ্গীয়ায় বসে যেমন ব্যস্ত জীবন কাটাতেন, তেমনি দেশের বিভিন্ন স্থানে শরিআত ও তরিকতের সফরে ব্যস্ত সময় কাটাতেন। বয়স ও বার্ধক্যের কারণে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে গারাঙ্গীয়া মাদরাসার অধ্যক্ষের পদ ছেড়ে দিয়ে তিনি গভর্নিং বডির সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এ মহান আল্লাহর ওলি ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর শুক্রবার সকালে বার্ধক্যজনিত রোগে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। একই দিন বিকেলে লক্ষ-লক্ষ লোকের সমাগমে জানাযা শেষে তাঁর পরম শ্রদ্ধাভাজন বড়ো ভাই হযরত বড়ো হুজুর (রহ.) এর পাশেই তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ছোটো হুজুরের সাহেবজাদা মরহুম শাহ মাওলানা ফরিদুল ইসলাম সূত্রে জানা যায়, আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর সহপাঠী বড়ো হুজুর শাহ মাওলানা আবদুল মজিদ (রহ.)-এর সহপাঠী ছিলেন বিধায় মাঝে মধ্যে তাঁদের বাড়িতে যেতেন। তখন ছোটো ভাই তাঁকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতেন। কারণ তিনি বড়ো ভাইয়ের বন্ধু এবং তাঁর মতো বড়ো মাপের আলিম তৎকালীন সময়ে ছিলো হাতেগোনা। তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহকে (রহ.) বড়ো ভাইয়ের মতো সম্মান দিতেন।

ফখরুল মুহাদ্দিসীন বড়ো মাওলানা মুহাম্মদ আমীনউল্লাহ (রহ.)

বড়ো মাওলানা মুহাম্মদ আমীনউল্লাহ (রহ.) চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলাধীন বারদোনা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে ১৮৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আলী হোসাইন এবং মায়ের নাম খাতুনে জান্নাত। তিনি আরবি, ফার্সি, উর্দু, ইলমে নাহু ও সরফের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য খ্যাতিমান উলামাদের নিকট ছুটে যান। এ সকল বিষয়ে তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) পিতা আল্লামা শাহ নুরুল হুদার নিকট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর বিরল প্রতিভার অধিকারী মাওলানা আমীনউল্লাহ চট্টগ্রামের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুহসিনিয়া মাদরাসায় (বর্তমান সরকারি হাজি মুহাম্মদ মহসিন কলেজ) ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি তৎকালীন 'হায়ার স্টান্ডার্ড) তথা ফাযিল ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। প্রখর মেধা ও তেজস্বীতার কারণে তিনি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শিক্ষকগণের নজর কাড়তে সক্ষম হন এবং সকল সরকারি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তির টাকায় পড়ালেখার খরচ মিটিয়ে উদ্বৃত্ত টাকা মায়ের জন্য পাঠিয়ে দিতেন যা দিয়ে বাড়ির খরচ অনায়াসে চালিয়ে নেয়া যেতো। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান লাভ করেন এবং ডাবল স্বর্ণপদকসহ কামিল লাভ করেন। ১৯১৭ সালে দেশে ফিরে তিনি দু'ভাবে তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেন। প্রথমত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দ্বিতীয়ত ওয়াজ-নসিহত। তাই তিনি স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় বারদোনা ডেপুটি হাটের পূর্ব পাশে 'বারদোনা ইসলামি আদর্শ মাদরাসা' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন এবং তিনি নিজেই এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। শাহ্ মাওলানা আবদুর রশিদ (ছোটো হুজুর) এবং শাহ্ মাওলানা আবদুল বারির মতো ব্যক্তিত্বগণও এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি রুটিন করে পাড়ায়-মহল্লায় গিয়ে স্থানীয় জনগণের মাঝে ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে

ইসলামের আলো জ্বালাতেন। তৎকালীন সময়ে তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রামের জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক পরিচিত ওয়ায়েজ ছিলেন। ফাতওয়া ও ফরায়েজেও খুবই দক্ষ ছিলেন তিনি। রাজনৈতিক জীবনে তিনি প্রথমে অবিভক্ত বাংলার উলামায়ে হিন্দের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি জমিয়তে উলামাতে যোগদান করেন। মৃত্যু অবধি তিনি ফাতওয়া-ফারায়েজ এবং ওয়াজ-নসিহতে জীবন পার করেন। চট্টগ্রামে তিনি বড়ো মাওলানা হিসেবে অধিক পরিচিত। তাঁর সাথে আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) গভীর সম্পর্ক ছিলো এবং একে-অপরকে খুবই সমীহ করতেন। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) ইন্তেকালের আগের দিন ৩ মার্চ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ শনিবার সকালে তিনি এবং মাওলানা আমীনউল্লাহ (রহ.) একসাথে একই টেক্সিতে করে সাতকানিয়া রাস্তার মাথা হতে মাওলানা শামসুল ইসলাম হেলালীর পূর্ব নির্ধারিত দাওয়াতে জাফরাবাদ মাদরাসার সভায় যান। উভয়ের মধ্যে আগেই প্রোগ্রাম করা ছিলো যে, রাস্তার মাথা হতে তাঁরা একত্রে যাবেন। পরদিন ৪ মার্চ তিনিই আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) জানাযায় ইমামতি করেন। বড়ো মাওলানা অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল। সদাচারী ছিলেন। অধিক কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং মুখে যিকির লেগে থাকতো সর্বদা।

১৯৮৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাতে ৯৪ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিক রোগে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরদিন সোমবার বিকেল ৪টায় নামাজে জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.)

মুফতিয়ে আযম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফি (রহ.) সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ এলাকা দেওবন্দে ২০ শাবান ১৩১৪ হিজরি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা ইয়াসিন সাহেব (রহ.) সন্তান জন্মের সংবাদ জানিয়ে আপন শায়খ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর নিকট চিঠি লিখলে তিনি খুবই খুশি হন এবং তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মদ শফি'। পরবর্তীতে এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ শফি (রহ.) পাঁচ বছর বয়সে দারুল উলুম দেওবন্দে হাফেজ মুহাম্মদ আজিম সাহেবের নিকট পবিত্র কুরআন শরিফের নাযেরা পড়েন। তাঁর পিতা মুজাফফর নগর জেলায় কাজী ছিলেন। পবিত্র কুরআন শিক্ষা লাভ করার পর দারুল উলুম দেওবন্দে পিতার নিকটেই তিনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে উর্দু, ফার্সির যাবতীয় কিতাবের তালিম লাভ করেন। তাছাড়া তিনি অঙ্ক, জ্যামিতি প্রভৃতি স্বীয় চাচা জনাব জনাব মুন্সি মনজুর আহমদ সাহেবের নিকট এবং তাজবিদ কারী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। নাহু, সরফ, ফিকাহর প্রাথমিক কিতাবসমূহ, ফুসুলে আকবরি, হেদায়াতুন্নাহু, মুনইয়াতুল মুসল্লি প্রভৃতি গ্রন্থ এবং আরবির প্রাথমিক কিতাবসমূহ পাঁচ বছরে সমাপ্ত করেন।

ইলম অর্জন করা ছিলো হযরত মুফতি সাহেবের জীবনের প্রধান ব্রত। ছাত্রজীবনে ইলম অর্জন ও ইলমচর্চায় তিনি এতো বেশি নিমগ্ন থাকতেন, যার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত তৎকালীন যুগে ছিলো না। ক্লাস শেষে তিনি স্বীয় সবক প্রতিদিন নিয়মিত তাকরার করতেন। যখনই একটু সুযোগ মিলতো তখনই তিনি শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর খেদমতে চলে যেতেন। ইলম অন্বেষণের প্রতি তাঁর অতি উৎসাহ ও পরহেযগারির কারণে উস্তাদগণের স্নেহের দৃষ্টি সর্বদাই তাঁর ওপর পড়তো।

শায়খুল হিন্দের (রহ.) হাতে বায়আত: দীর্ঘ পাঁচ বছর মাল্টার জেলে বন্দি থাকার পর ১৩৩৮ হিজরিতে মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.) মুক্তি লাভ করে দেওবন্দে তাশরিফ আনেন। তখন তাঁকে দেখার জন্য চতুর্দিক থেকে দলে দলে লোকজন আসতে লাগলো। হযরত তখন স্বীয় দুর্বল ও অসুস্থ শরীর নিয়েই তাদের সাক্ষাৎ দিচ্ছিলেন। এদিকে মুফতি শফি (রহ.) তাঁর হাতে বায়আত হওয়ার জন্য সুযোগ মিলে গেলো সেদিন শায়খুল হিন্দ (রহ.) এর হাতে মুফতি শফি (রহ.) হযরত মাওলানা কারি মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব এবং আরো কয়েকজন ব্যক্তিত্ব বায়আত গ্রহণ করেন।

হযরত থানভী (রহ.) এর খেলাফত লাভ: হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) মাল্টা থেকে প্রত্যাবর্তনের ছয় মাস পর ১৮ রবিউল আউয়াল ১৩৩৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। এর ২/৩ বছর পর মাওলানা আবদুর রহিম রায়পুরী (রহ.) এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তাই হযরত মুফতি সাহেব (রহ.) পুনরায় হযরত থানভী (রহ.) এর নিকট গমন করেন এবং ১৩৪৯ হিজরিতে হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভী (রহ.) তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন।

আল্লামা মুফতি শফির (রহ.) শিক্ষকবৃন্দ: আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি, আল্লামা শব্বির আহমদ উসমানী, মুফতি আজিজুর রহমান উসমানী, মাওলানা মুহাম্মদ রসুল খাঁন, আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহিম বলয়াভী, মাওলানা গোলাম রসুল হাজারভী ও মাওলানা মিয়া আসগর হুসাইন দেওবন্দি (রহ.) প্রমুখ।

শিক্ষকতা জীবন: হযরত মুফতি শফি (রহ.) সর্বপ্রথম ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে দারুল উলুম দেওবন্দে প্রাথমিক জামাতের কিতাবসমূহ পড়ানোর মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। অতঃপর বছরের পর বছর তিনি ওপরের জামাতের সকল বিষয়ের কিতাবসমূহ ক্রমান্বয়ে পড়াতে থাকেন। হযরত বলেন, "দারুল উলুমের পক্ষে ছয় ঘণ্টা পড়ানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। কিন্তু আমি দৈনিক ১৮ ঘণ্টা পড়াতাম। দারুল উলুম দেওবন্দে তাঁর আবু দাউদ শরিফ ও মাকামাতে হারিরির দরস এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। দরস দুটিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শুধু ছাত্ররাই নয়, ওস্তাদগণও তাতে শরিক হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বলে বিবেচনা করতো। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতি নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর দারুল উলুম দেওবন্দে দারস দানের পর তিনি জামিয়া ইসলামিয়া ডাভিলেও কিছুদিন বুখারি শরিফের দারস প্রদান করেন। অতঃপর ১৩৭০ হিজরিতে হযরত মুফতি সাহেব (রহ.) করাচিতে যান এবং সেখানে দারুল উলুম করাচির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতো, কয়েক বছর বুখারি শরিফের দারস দান করেন।

হযরত মুফতি শফি (রহ.) এর দরসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই ছিলো যে, তাঁর সবকে কোনো ছাত্রেই অন্যমনস্ক হতো না। কিতাবের কঠিন থেকে কঠিন স্থানগুলি তিনি এতো সহজে বুঝিয়ে দিতেন যে, ছাত্রদের নিকট উক্ত স্থানটি কোনোরূপ কঠিন বলেই অনুভব হতো না। কোনো কোনো সময় তো এমন হতো যে, ক্লাসের মাধ্যমেই ছাত্রদের সবক পূর্ণরূপে রপ্ত হয়ে যেতো।

হাকিমুল উম্মতের দৃষ্টিতে মুফতি সাহেবের ফাতওয়া: হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (রহ.) হযরত মুফতি সাহেব (রহ.)-এর ফাতওয়ার ওপর কতটুকু আস্থা রাখতেন, তা নিম্নের চিঠি ও তার জবাবের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে–

একদা হযরত থানভী (রহ.) এর নিকট প্রার্থিত একটি ফাতওয়ার জবাব হযরত শফি সাহেব (রহ.) প্রেরণ করেন এবং চিঠি লিখেন যে, "আপনি আমার নিকট যে প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন, তা পত্র পাওয়ার সাথে সাথেই দেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এর মধ্যে জরুরি সফর উপস্থিত হওয়ায় পুরো করতে পারিনি। আজকে যা কিছু আসলো তা পাঠিয়ে দিলাম। আশা করি এর শুদ্ধতা কিংবা ভুল সম্পর্কে অবহিত করবেন। যদি কোনো অংশে প্রয়োজনীয় কথা বাদ গিয়ে থাকে, তাহলে সে সম্পর্কেও জানিয়ে বাধিত করবেন।"

হযরত থানভী (রহ.) জবাবে লিখেন, আপনার চিঠি পেয়ে দুইটি কারনে আনন্দিত হয়েছি- (১) সন্দেহের নিরসন, (২) আমি দেখছি যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা দ্বীনের মহান খেদমত আঞ্জাম দিবেন।

জাস্টিস আল্লামা তকী উসমানী তাঁর সাহেবজাদা। পুরো ইসলামি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী (রহ.) এর ইন্তেকালের পর আরবি ও ইসলামি বিশ্ব থেকে তাঁকে 'মুফাক্কিরে ইসলাম' উপাধির সাথে সাথে 'শায়খুল ইসলাম' আখ্যায়িত করা হয়।

রচনাবলি: আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) ছোটো বড়ো মিলিয়ে প্রায় দেড় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ৮ খণ্ডবিশিষ্ট তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন বিশ্বখ্যাত। এছাড়াও খাতামুল আম্বিয়া, কিয়ামত, আওযানে শরঈয়াহ, ইসলাম কে চার খলিফা, নিযামে আরাদি অন্যতম।

ইন্তেকাল: হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) ১০ শাওয়াল ১৩৯৩ হিজরিতে মোতাবেক ৬ অক্টোবর ১৯৭৬ ইংরেজি রাতে ইন্তেকাল করেন। দারুল উলুম করাচি মাদরাসা মসজিদের সাথে মরহুম মুফতি শফি সাহেব (রহ.)-এর কবর বিদ্যমান আছে।

হাকিমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.)

খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ এবং দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হাকিমুল ইসলাম মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) ১৮৯৭ সালের জুন মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশের দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ (রহ.) দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর পুত্র এবং দারুল উলুম দেওবন্দের পঞ্চম মুহতামিম ছিলেন।

হযরত মাওলানা কারী তৈয়ব সাহেব (রহ.) ইলমে কিরাত হিফজ এবং আরবির সকল শিক্ষা দারুল উলুম দেওবন্দেই লাভ করেন। ছেলের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে তাঁর পিতার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নজর ছিলো। মাওলানা আহমদ সাহেব (রহ.) হযরত হাকিমুল উম্মত থানভীর পরামর্শ অনুযায়ী মাওলানা আবদুল ওহিদ খান নামক একজন কারী সাহেবকে শুধুমাত্র নিজের ছেলের কিরাত শিক্ষার জন্য নির্বাচন করেন এবং নিজের বাড়িতেই তাঁকে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম সহকারে যুগশ্রেষ্ঠ উস্তাদগণের নিকট লেখাপড়া করেন। এদের মধ্যে ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.),

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.), আল্লামা শব্বির আহমদ উসমানী (রহ.), আল্লামা ইবরাহিম বলয়াভী (রহ.) প্রমুখ মহাপুরুষ।

অধ্যয়ন শেষে ১৯১৯ সালে মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) দারুল উলুমের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। একটানা দীর্ঘ সাত বছর তিনি যোগ্যতার সাথে দরসে তাদরিসে লিপ্ত থাকেন। এরপর ১৯২৫ সালে তাঁকে দারুল উলুমের সহকারী অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩০ সালে হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানী (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত দক্ষতার সাথে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর আমলে দারুল উলুমের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং বহির্বিশ্বে এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর আমলেই দারুল উলুম দেওবন্দের শত বার্ষিকী অনুষ্ঠান পালিত হয়।

ইলমি পাণ্ডিত্যের সাথে সাথে হযরত মুহতামিম সাহেব আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। প্রথমে তিনি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.)-এর নিকট বায়আত হন। শায়খুল হিন্দের ইন্তেকালের পর এই সম্পর্কে মাওলানা গাঙ্গুহী (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ খ্যাতনামা মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) এর সাথে জড়িত হন। হযরত শাহ সাহেব দেওবন্দ হতে ডাবেল চলে গেলে মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব এবং মাওলানার পিতার চেষ্টায় কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) থানভী সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হন এবং কঠোর মুজাহাদা সহকারে থানভবনে হযরত থানভীর কাছে হাজিরা দিতে থাকেন। অবশেষে তিনি হাকিমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর খেলাফতলাভে ধন্য হন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হিসেবে পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেন। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষ বিশেষ কনফারেন্স উপলক্ষে তাঁর ডাক পড়তো। জীবনের শেষবেলায় বৃদ্ধ অবস্থাতেও তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন। বার্মা, আফগানিস্তান, সৌদি আরব, মিসর, লেবানন, উত্তর আফ্রিকা, আমেরিকা, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে ইসলামি শিক্ষা প্রচার করেছেন। সাথে সাথে দারুল উলুমের ব্যাপক খেদমতের কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন।

রচনাবলি: হযরত মুহতামিম সাহেব একজন প্রথম শ্রেণির লেখক ছিলেন। তাঁর লিখিত বইপত্রের সংখ্যা শতাধিক। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তা অনূদিত হয়ে জ্ঞানপিপাসুদের পিপাসা নিবারণ করছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে- বিজ্ঞান ও ইসলাম, আফতাবে নবুওয়াত, তাশাব্বুহ ফিল ইসলাম, ইলমে গায়েব, শানে রেসালাত ফিতরি হুকুমাত, ফালসাফায়ে নামায, ইসলাম কা নেজামে আখলাক, হাশিয়ায়ে আকিতাদুত্তাহাবী ইত্যাদি।

ইন্তেকাল: উপমহাদেশের কৃতী সন্তান, হাকিমুল ইসলাম মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) ১৬ জুলাই ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন এবং 'মাকবারায়ে কাসেমি'তে আল্লামা নানুতবী (রহ.)-এর পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) : এক অসাধারণ প্রতিভা

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী একজন প্রথিতযশা আলেমে দীন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছিলেন অসাধারণ মেধা ও ব্যুৎপত্তি। নিম্নে তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার বিষয়ভিত্তিক কিছু আলোচনা করা হলো-

ভাষাতত্ত্ব জ্ঞান:

এতদঞ্চলের ইসলামি শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলার সাথে চারটি বিদেশি ভাষার অনুশীলন, চর্চা সন্নিবেশিত আছে। আরবি, ফার্সি, উর্দু ও ইংরেজি। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, কুরআন, সুন্নাহ ও অন্যান্য প্রামাণ্য আরবি গ্রন্থাবলিতে সংরক্ষিত থাকায় আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন ছাড়া ইসলামের সঠিক জ্ঞান অন্বেষণ অসম্ভব। তাই আবহমানকাল থেকে আরবি ভাষা শিক্ষা মাদরাসা সিলেবাসে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। অনুরূপ ফার্সি ভাষা শত শত বছর ধরে ভারতবর্ষের সরকারি ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন ও শিক্ষা-দীক্ষার সার্বজনীন মাধ্যম হিসেবে চালু থাকায় কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বলিত অজস্র কিতাব ফার্সি ভাষায় রচিত হয়েছিলো, যেগুলোর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষক মহলসহ সর্বস্তরের মানুষের গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং আরবির পাশাপাশি ফার্সিও মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে। ফার্সির মতো উর্দুও ভারতীয় মুসলমানদের ব্যবহারিক ভাষায় পরিণত হওয়ায় মুসলিম মনীষার বিরাট তথ্যসম্ভার উর্দু ভাষায় গচ্ছিত রয়েছে। সুতরাং উর্দুকেও সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায়। যাতে ইসলামি জ্ঞানের সেই রত্নরাজি আহরণ সহজসাধ্য হয়; যেগুলো উর্দু গ্রন্থাবলিতে সুরক্ষিতাবস্থায় রয়েছে। অপরদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক হিসেবে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং ইংরেজিও মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে সিলেবাসভুক্ত হয়েছে। আহরিত জ্ঞানের প্রচার-প্রসার তথা দাওয়াত ও তাবলিগ ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিতদের অন্যতম গুরুদায়িত্ব। তাই বাংলাভাষা শিক্ষাকে মাদরাসা সিলেবাসে অন্যতম আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি তাকালে উপর্যুক্ত ভাষাসমূহের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এতগুলো ভাষার তত্ত্বজ্ঞান অর্জন চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। সুতরাং দেখা যায়, মাদরাসা শিক্ষিতদের সিংহভাগই ভাষা জ্ঞানে অপরিপক্ব থেকে যায়। সমাজ ও জাতির প্রয়োজনে আল্লাহপাক গুটিকয়েক ভাগ্যবান মহাপুরুষকে যেনো বেছে নেন যাঁরা ভাষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানের মাধ্যমে জাতিকে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এতদঞ্চলীয় কালোত্তীর্ণ বহুভাষাবিদদের একজন। আরবি, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় যে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিলো তাঁর এ চার ভাষায় রচিত বিভিন্ন রচনা থেকে তা প্রমাণিত হয়। সাধারণত মাদরাসা শিক্ষিতরা আরবি, ফার্সি ও উর্দুতে দক্ষ হলেও বাংলা, ইংরেজিতে বরাবরই কাঁচা থাকেন। কিন্তু আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এ দু'ভাষায়ও যথেষ্ট পারঙ্গমতা প্রদর্শনে সক্ষম হন। বাংলা ভাষায় 'শামায়িলে তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ, "যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম ও আল্লামা ইকবালের শেকওয়াহ ও জওয়াবে শেকওয়াহ'র কাব্যানুবাদ

বাংলা ভাষায় তাঁর অমর কীর্তি হিসেবে স্বীকৃত। 'যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম' গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি রেফারেন্স টেনেছেন। ইংরেজি উদ্ধৃতির বাংলা তরজমা করেছেন। তা থেকে প্রতীয়মান হয় ইংরেজি ভাষায়ও তাঁর পর্যাপ্ত দখল ছিলো। তবে ইংরেজি ভাষায় তাঁর কোনো লিখনী নেই।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) শুধু বহু ভাষাবিদ ছিলেন না। ভাষার গ্রামাটিক্যাল সিস্টেমকে উন্নত ও যুগোপযোগী করার প্রয়াস চালিয়েছেন আজীবন। মাদরাসা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম বিষয় উর্দুকে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে সরল ও সাবলীল উর্দু ভাষায় "পাক উর্দু গ্রামার ও আসান উর্দু তালীম" শিরোনামে দুটি উর্দু ব্যাকরণ বই লিখেন তিনি।

অপরদিকে আরবি গ্রামারকে অবোধ্য প্রাচীন দার্শনিক পদ্ধতি ও ফার্সি ভাষার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে আধুনিক পদ্ধতিতে উপস্থাপনের মানসে উর্দু ভাষায় "আদদুরুসুস্ সারফিয়াহ" ও আদদুরুসুন নাহভীয়াহ" নামে (প্রতিটি তিন খণ্ড) দুটি চমৎকার আরবি ব্যাকরণ বই রচনা করে শিক্ষিত মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। যা তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভারই পরিচায়ক।

সাহিত্য ও কাব্যজ্ঞান:

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর প্রত্যেক লেখায় সাহিত্যরস উপভোগ্য ও শৈল্পিক উৎকর্ষ প্রণিধানযোগ্য। বিশেষত উর্দু ও ফার্সি ভাষায় লিখিত রচনাবলি সাহিত্যের বিচারে অনেক উঁচুমানের এবং কবিতাবলীর নান্দনিক রূপ পাঠকমনে তাক লাগায়। নাতে রাসুল (সা.) ও গজলের প্রতিটি লাইনে যেনো স্বর্গীয় সুধার অমিয় ধারা প্রবহমাণ। তাঁর গজলকে হাকীম সুনাঈ, খসরু, হাফেজ শিরাযীর ফার্সি গজল এবং গালিব ও হাসরত মোহানীর উর্দু গজলের সাথে এবং চিন্তা চেতনা ও দার্শনিকতত্ত্ব বিবেচনায় তাঁর কাব্যকে আকবর এলাহাবাদী, আলতাফ হুসাইন হালী ও ইকবালীয়াতের সাথে তুলনা করা যায়।

"ইলমুল আরূদ্" অলংকারশাস্ত্র এর সুবিশাল ও দুর্গম প্রান্তরে ছিলো তাঁর অবাধ পদচারণা। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় ছিলো তাঁর অনুশীলন ক্ষেত্র। তাঁর রচিত 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ'র কবিতাগুলোতে নজর বুলালে দেখা যায় তিনি "ইলমুল আরূদ" এ বর্ণিত কঠিন থেকে কঠিন মাত্রায়ও কবিতা রচনা করেছেন অনায়াসে। প্রকারভেদ ও রূপান্তর ক্রমের সব রীতিই প্রয়োগ করেছেন কাব্য রচনায়। সাথে সাথে শব্দের গাঁথুনী ও বৈয়াকরণিক নিয়মাবলী বাস্তবায়নে যথার্থতার স্বাক্ষর রেখেছেন নিপুণভাবে। ভিনদেশী ভাষায় সাহিত্যচর্চা ও কাব্য রচনায় এসবের ব্যত্যয় ঘটা স্বাভাবিক হলেও তাঁর বেলায় তা প্রায় ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। সত্যিই তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ সাহিত্যিক ও কবি। এ বিরল প্রতিভা আল্লাহপাক খুব কম মানুষকেই দান করেন।

বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞান

কুরআন-সুন্নাহর অনুপম ব্যাখ্যা জ্ঞান:

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন কুরআন- হাদিসের সঠিক জ্ঞানাহরণের পূর্বশর্ত। অনুরূপ কুরআন-হাদিসের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্যে লোকসাহিত্য ও কথাশিল্পে যথেষ্ট দখল থাকা অত্যাবশ্যক। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যেহেতু বহুবিধ ভাষা সাহিত্যে কালজয়ী পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃত, সেহেতু তাঁর মাঝে কুরআন-হাদিসের মর্মোৎঘাটন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অগাধ জ্ঞান থাকা নিতান্তই সঙ্গত ও স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লিখিত বই-পুস্তক ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াত ও হাদিসে রাসুলের (সা.) অনুপম ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। এর উৎকৃষ্ট নমুনা হলো- তাঁর রচিত "জালালাইন শরীফ, তিরমিযী ও শামায়িলে তিরমিযী"র মতো কঠিন কিতাবাবলির অনুবাদ ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ। হাদিসশাস্ত্র সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম ধারণা রয়েছে- তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল বিষয়াবলীর অন্যতম হচ্ছে এ হাদিসশাস্ত্র। আল্লাহপাক যাঁকে বিশেষ মেহেরবাণী করেন তিনিই এ বিষয়ে পাঠদান ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার যোগ্যতা অর্জন করে থাকেন। পাঠদান যদিও যেনতেন, ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) উভয় ক্ষেত্রেই পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের কওমি ও আলিয়া উভয় ধারার মাদরাসা সিলেবাসে হাদিসের যেসব কিতাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তন্মধ্যে তিরমিযী শরীফ জটিল কিতাবসমূহের অন্যতম। একেতো ইমাম তিরমিযী (রহ.) উক্ত গ্রন্থে হাদিসশাস্ত্রীয় এমন বহু সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার অবতারণা করেছেন, যা সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের বোধগম্য নয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হওয়াতে প্রত্যেকটি হাদিসের ব্যাখ্যা এমনভাবে প্রদান করেছেন যে, সব হাদিসই যেন শাফেয়ী মাযহাবের পক্ষে; অথচ অন্যান্য মাযহাব বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ সংশ্লিষ্ট হাদিসের ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে প্রদান করেছেন, যা অনেক ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযীর ব্যাখ্যার চেয়ে যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত। তাই বলা হয়ে থাকে, ভারতবর্ষের মাদরাসাসমূহে হাদিসের কিতাব বিশেষতঃ তিরমিযী শরীফ পড়ানো মানে শাফেয়ীদের জমিতে চাষ করে হানাফী ফসল উৎপাদন করা।

এক্ষেত্রে মুহাদ্দিস যদি হাদিস ও ফিকহ উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী না হন তাহলে আমাদের দেশে প্রচলিত হানাফী মতের ধারণাটা উলট-পালট হতে বাধ্য; অথচ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ও বাস্তবতার নিরিখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব নির্ভুল বলে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। সুতরাং ভারতবর্ষে হাদিসশাস্ত্রে যাঁরা শিক্ষকতা করেন তাঁরা ইসলামের সর্ববিষয়ে অবশ্যই পারদর্শী হন। যার জ্ঞানের পরিধি যতই প্রশস্ত ততই তার অভিভাষণ জ্ঞানগর্ভ হয়। পাঠদান হয় যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য। আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে হাদিসশাস্ত্রের এ শিক্ষাদান পদ্ধতি।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) আজীবন বুখারি ও তিরমিযী শরিফের দরস দিয়েছেন এবং অভিজ্ঞতার আলোকে রচনা করেছেন সাবলীল উর্দু ভাষায় তিরমিযীর এক অনবদ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠে প্রতীয়মান হয় তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ও ব্যাখ্যারীতি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও যুগোপযোগী। তিনি শাস্ত্রীয় আলোচনা ও বিভিন্ন বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ পর্যালোচনার পর যুক্তি-প্রমাণাদির মাধ্যমে হানাফী মাযহাবের তারজীহ্ বা পাল্লা ভারি করার গতানুগতিক রীতিতে সীমাবদ্ধ রাখেননি তাঁর ব্যাখ্যার ধারা। সমসাময়িক বিষয়াবলীর চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক যুক্তিসঙ্গত সমাধান বের করারও প্রয়াস চালিয়েছেন। সাথে-সাথে ইসলাম ও ইসলামের মূলনীতির বিরুদ্ধে খোদাদ্রোহী নাস্তিক পাশ্চাত্য লেখক, গবেষক ও ওরিয়েন্টালিস্টদের দুরভিসন্ধিমূলক মন্তব্য ও বক্তব্যাবলী জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন।

বাংলা ভাষায় রচিত ও মুদ্রিত শামায়িলে তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থটিকে আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অমর কীর্তি বলা যেতে পারে দুটি কারণে। প্রথমতঃ শামায়িলে তিরমিযী ভাষা ও বিষয়ের দিক দিয়ে দাঁতভাঙ্গা কঠিন কিতাব। সিরাতে রাসুল (সা.) আরবি ভাষাজ্ঞান ও উচ্চ পর্যায়ের আরবি সাহিত্যে পারদর্শিতা ব্যতীত এ কিতাবের শিক্ষাদান ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ সরস ও সাবলীল বাংলায় এ জটিলতম কিতাবের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনাও বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দখল থাকা ছাড়া অসম্ভব। প্রান্তিকভাবে দুরূহ এ দুই কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তিনি এ অমর কীর্তির মাঝে বাংলার জ্ঞানপিপাসু মানুষের কাছে অমর হয়ে থাকবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান:

আরবি ভাষা ও সাহিত্যসহ কুরআন-সুন্নাহর অগাধ জ্ঞানের পাশাপাশি মাদরাসা সিলেবাসভুক্ত প্রাচীন গ্রিক দর্শন, মানতিক (তর্কশাস্ত্র), জ্যোতির্বিদ্যা, অংক ও জ্যামিতির মতো উলুমে আকলিয়া (বুদ্ধিভিত্তিক) জ্ঞানেও আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) পারদর্শী ছিলেন। এসব বিষয়ে সফল পাঠদান করেছেন ও ফুটনোট লিখেছেন তিনি। মানতিকের অন্যতম কিতাব "ঈছাগুজী"র ব্যাখ্যা গ্রন্থও লিখেছেন যা ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

ফাতওয়া ও ফরায়েজের জ্ঞান:

ফাতওয়া (সমসাময়িক সমস্যাবলীর ইসলামি শরীআ'তসম্মত সমাধান) ও ফরায়েজ (ইসলামের সম্পদ বণ্টননীতি) বিষয়েও তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান ছিলো। তাঁর ফাতওয়া, ফরায়েজ শিক্ষিত মহল ও সর্বসাধারণের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত ছিলো বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁর লিখিত বিভিন্ন ফাতওয়া ও ফরায়েজে দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরামের অনুমোদনপূর্বক স্বাক্ষর দেখা যায়। তাঁর এসব ফাতওয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে ফাতওয়ার একটি নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স গ্রন্থে পরিণত হতে পারে। তৎকালীন আদালতে তাঁর ফরায়েজ (সম্পদ বণ্টন নীতি) খুবই গ্রহণযোগ্য ছিলো।

সমাজ চিন্তা ও রাজনীতি জ্ঞান:

ইসলামি চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর সমাজ চিন্তা ছিলো অত্যন্ত উঁচু মানের ও বাস্তবসম্মত। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন ইসলামি সমাজব্যবস্থা ব্যতিরেকে প্রকৃত মানবসমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। ইসলামি নীতি ও নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজব্যবস্থা পশুত্বের নামান্তর। তাঁর রচিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই "যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম" তাঁর চিন্তাপ্রসূত জ্ঞানগর্ভ ও গবেষণালব্ধ এক প্রামাণ্য গ্রন্থ। বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত এ বৃহদাকার গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রত্যেকটি বিষয়ে কুরআন-হাদিসের আলোকে ও বাস্তবতার নিরিখে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। আলোচনায় যেমন তাঁর উন্নত চিন্তা ও তেজস্বিতা ফুটে উঠেছে, তেমনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, চিরন্তনতা ও বিশ্বজনীনতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উক্ত গ্রন্থের "ইসলাম ও পর্দা প্রথা" পর্বের আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। পর্দার আবশ্যিকতার স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে তিনি পর্দাহীনতার করুণ পরিণতি সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন সেই পরিণতিই আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে চলেছি বেলেল্লাপনার অশুভ তাণ্ডবযজ্ঞে। নারী স্বাধীনতার নামে নগ্নতার যে মহড়া চলছে তাকে আর যাই বলা যাক না কেনো, যথোচিত আচরণ বলা যেতে পারে না। এ সবের মূল কারণ হচ্ছে পর্দাহীনতা ও বেপরোয়া চলাফেরা।

পূত-পবিত্র, সুশিক্ষিত ও সুসভ্য সমাজ বিনির্মাণে পরিবারের সীমিত পরিসর থেকে রাষ্ট্রের বিশাল প্রান্তরে সামাজিক অধিকর্তাস্বরূপ তাঁর কার্যকরী ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত বক্তৃতা-বিবৃতি ও গবেষণামূলক বই-পুস্তক রচনার মাধ্যমে আজীবন কাজ করে গেছেন তিনি। ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)। স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিলো বিস্তর। প্রাগৈসলামিক যুগ থেকে সমকাল পর্যন্ত মানবেতিহাসের অনেক চড়াই-উৎরাই, রাজনৈতিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের তোড়ে বিশ্বময় 'সবল ও শক্তিধরের আধিপত্য বিস্তার ও ভৌগোলিক সীমারেখা পরিবর্তনসহ অসংখ্য ঘটনা যেনো তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছে- এভাবেই তিনি ঘটনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। আফ্রো-এশিয়া ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকা তথা বিশ্বে সফল নেতৃত্বদানকারী মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়, প্রলয়ংকরী ঝড়ের ন্যায় প্রচণ্ড আঘাত হানে তাঁর মনোজগতে। চেঙ্গিস খান কর্তৃক মুসলিম গণহত্যা ও বাগদাদের পতন, ফার্ডিন্যান্ড কর্তৃক গ্রানাডার পতন, গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর মৃত্যুর পর ক্রুসেড শক্তি কর্তৃক বাইতুল মাক্বদেস পুনঃদখল থেকে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশসহ আফ্রো-এশিয়ার অধিকাংশ মুসলিম দেশের স্বাধীনতা হরণ, মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ নিয়ে আনওয়ার পাশার 'প্যান ইসলামিক স্টেট' গঠনের স্বপ্ন ইঙ্গ-রাশিয়ার ষড়যন্ত্রে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাওয়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তথাকথিত মিত্রবাহিনীর উসমানিয়া খেলাফতে ভাগ বসানো, অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার নেতৃত্বে তাবৎ বিশ্বের তাগুতি শক্তি মিলে আরব বিশ্বের বুকে "যায়োনিস্ট স্টেট অব ইসরাইল" প্রতিষ্ঠার ন্যায় হৃদয়বিদারক ঘটনাপ্রবাহ হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) চিন্তা-চেতনাকে নিদারুণভাবে পর্যুদস্ত করে। তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও দাওয়াতি বক্তৃতামালায় এসবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বিশ্ব নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকারী একমাত্র মুসলিম জাতি। আজ কেনো তাদের এ করুণ অবস্থা? মুসলমানেরা কি তাদের হৃতগৌরব আবার ফিরে পেতে পারে? এ দুটি বিষয়ে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা কেন্দ্রীভূত ছিলো। একপর্যায়ে তিনি মুসলিম বিপর্যয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়েও হৃতগৌরব উদ্ধারের উপায় উপকরণ নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তা হলো আল্লাহর দীন থেকে দূরে সরে গিয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়া এবং যেখানে জিহাদ প্রয়োজন সেখানে 'জিহাদ' ছেড়ে দিয়ে পরস্পর সংঘাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়াই মুসলিম বিপর্যয়ের মূল কারণ। এ বিপর্যয় ঠেকানোর একমাত্র উপায় হলো, তাকওয়ার ভিত্তিতে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব জাগ্রত করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। নেজামে ইসলাম পার্টির এক সমাবেশে ও চুনতি আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্রদের এক সাংগঠনিক অধিবেশনে তিনি যে লিখিত বক্তব্য রেখেছেন তাতে তাঁর এ বলিষ্ঠ চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছে। তাঁর রাজনৈতিক চিন্ত াধারাকে ইকবাল চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি বলা যেতে পারে। আল্লামা ইকবাল আজীবন স্বীয় অমর কাব্যে ইসলামের জয়গান গেয়ে ঘুমন্ত মুসলিম উম্মাহকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। আল্লামা ফজলুল্লাহও অনুরূপ তাঁর বক্তৃতা, কবিতামালা, বিবৃতি ও বিভিন্ন রচনাবলীতে মুসলিম যুবমানসে জাগৃতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন আজীবন।

শিক্ষা সংস্কারের চিন্তা:

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) অত্যন্ত সচেতন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইসলামি শিক্ষাবিদ ছিলেন বিধায় ইসলামি শিক্ষার মানদণ্ড নির্ণয় ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, ইসলামি শিক্ষা ইসলামের মতই চিরন্তন। কিয়ামত পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। তবে স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে শিক্ষা-পদ্ধতিতে পরিবর্তন ও পরিমার্জন আবশ্যক। ইসলামকে যুগের চাহিদানুসারে পেশ করতে হলে যুগোপযোগী ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামের মূল বিষয়াবলীর ওপর কাঁচি চালাতে হবে। বরং ইসলামের মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যেই শুধু শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে তিনি ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের উপযোগী একটি সিলেবাস প্রণয়নে সচেষ্ট ছিলেন। ঐ সিলেবাসের প্রশ্নোত্তরভিত্তিক দীর্ঘ মুখবন্ধে তিনি ইসলামি শিক্ষার সিলেবাস সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাসুলভ আলোচনা করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। ইসলামের মূল 'তাকওয়া'ই হতে হবে ইসলামি শিক্ষার প্রধান উপাদান। সাবলীল ও অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে তিনি এ বাস্তব সত্যকে প্রমাণ করেছেন উক্ত মুখবন্ধে। এছাড়া এ বিষয়ে একটি পুস্তিকাও রচনা করেছেন।

মোদ্দাকথা, আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন বহুমাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী, প্রাজ্ঞ লেখক, সফল অনুবাদক, স্বভাব কবি এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দীন। তাঁর সমকালীন বুদ্ধিজীবীমহল তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করতেন এবং তাঁরা ছিলেন তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভা সর্বমহলে স্বীকৃত।

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) আধ্যাত্মিক চেতনা ও ব্যক্তিসত্তা

আধ্যাত্মিক চেতনা:

সৃষ্টির সেরা জীব মানবজাতি। মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে এমন কতগুলো ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যাঁদের জীবনের বিভিন্ন কীর্তিকর্ম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমনি একজন কীর্তিমান বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী মনীষী হচ্ছেন মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)। যিনি ছিলেন একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাসসির, স্বভাবকবি ও আধ্যাত্মিক সাধক। যিনি তাঁর জীবনের সিংহভাগ ব্যয় করেছেন শিক্ষকতার মহান পেশায়। দ্বীনি ইলমের প্রচার ও প্রসারের সাথে সাথে আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধনে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন একাগ্রতার সাথে। তিনি উপমহাদেশের খ্যাতিমান মনীষী হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর হাতে তরিকতের বায়আত গ্রহণ করেন ১৯২১ সালে। সুদীর্ঘ ছয় মাস তাঁর সান্নিধ্যে ইলমে মারফতের উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তাঁরই খানেকায় অবস্থান করে। পরবর্তীতে তিনি তা অক্ষরে অক্ষরে অনুশীলন করেন তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে।

আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা ইলমে তাসাউফ তথা আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম প্রদান করে সঠিক নির্দেশনা। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি মানুষের যতো বিচরণ ক্ষেত্র রয়েছে, যেমন চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া, লেনদেন, স্বভাব-চরিত্র, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, নিকাহ-তালাক, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং ইবাদাত, রীয়াযত্ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের ব্যাপক অনুশীলনের বাস্তব পথ-নির্দেশনা। আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে শরিআতে ইসলামির বিভিন্ন বিধি-বিধান। ইসলামি জীবন বিধান ব্যতিরেকে অন্য কোনো বিধান আল্লাহ তাআলার নিকট আদৌ গ্রহণীয় নয়। ইসলামি শরিআতের বিভিন্ন বিষয়াদির ওপর গবেষণা করলে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মৌলিকভাবে ইসলামি শরিআত পাঁচ ভাগে বিভক্ত। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন- দীনের অংশ পাঁচটি।

(১) আকায়েদ (২) ইবাদাত (৩) মুআ'মালাত (৪) মুআ'শারাত (৫) তাসাওউফ।

(১) আকায়েদ: আকায়েদ হচ্ছে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সা.) প্রবর্তিত বিধান অনুযায়ী মুখে ও অন্তরে এর সত্যতার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এর প্রেক্ষিতে আমল করা।

(২) ইবাদত: নামায, রোযা, যাকাত ও হজ ইত্যাদি।

(৩) মুআ'মালাত: নিকাহ, তালাক, ইসলামি বিধান অনুযায়ী শাস্তি ও কাফফারা এবং ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির আহকাম। এসব আহকামের উদ্দেশ্য হচ্ছে- এসব কাজ-কারবারে কেউ কারো ওপর জুলুম না করা। পরস্পর এমনভাবে কাজ করা যাতে কোনো ঝগড়া-ফাসাদের আশঙ্কা না থাকে।

(৪) মুআ'শারাত: মানুষের পারস্পরিক ওঠাবসা, চলাফেরা, বসবাস, মেহমানদারী, স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি, প্রিয়জন এবং অপরিচিত ও চাকর-বাকরদের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত এ সম্পর্কে সম্যক অবগতি হাসিল করা।

(৫) তাসাউফ: শরিআতের মধ্যে তাসাউফকে বলা হয়- নফসের পরিশুদ্ধি। সেমিটিক ঐতিহ্যে 'সংসার ত্যাগ' তাসাউফ-এর মূলমন্ত্র ছিলো তা বৌদ্ধ-জৈন খৃষ্টধর্মের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ ছিলো। ইসলামি সংস্কৃতির আঙ্গিকে তা সততই পরিত্যক্ত হয়।

পার্থিব ও সামাজিক কর্মকাণ্ড বর্জন করা কিছু সংখ্যক মূর্খ সুফিদের নিছক ভ্রান্ত ধারণাস্বরূপ প্রচলিত দেখা যায়। যাদের তাসাউফের হাকিকত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই বলা যায়।

প্রকৃতপক্ষে তাসাউফ হচ্ছে এমন পথপ্রদর্শন যা একজন শরিআতপন্থী ব্যক্তিকে সর্বক্ষণ এ মর্মে সতর্ক করে যে, তিনি যেনো এক মুহূর্তের জন্য স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে পদস্খলিত না হন। তাসাওউফ আমাদেরকে এ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে যে, যখন আমরা নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দণ্ডায়মান হই তখন আমরা কিবলামুখী হয়েছি কিনা ইত্যাদি দেখি, সাথে সাথে আমাদের এদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আমাদের ধ্যান-ধারণা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে নিমগ্ন আছে কিনা। প্রকৃতপক্ষে তাসাউফ তরিকত অনুসারীকে প্রতি মুহূর্তে এ মর্মে সতর্ক করে দেয় যে, সে যেনো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ধ্যান-ধারণা থেকে গাফিল না থাকে। আরেফে হিন্দ মরহুম জজ আকবর ইলাহাবাদী কতোইনা সুন্দর কথা বলেছেন-

قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت

'পবিত্র কুরআন সম্মুখে রেখে অগ্রসর হওয়া হচ্ছে শরিআত আর আল্লাহ তা'আলাকে সম্মুখে রেখে অগ্রসর হওয়া হচ্ছে তরিকত।

মোদ্দাকথা, উল্লিখিত এ পাঁচটি বিষয়ের নামই হচ্ছে ইসলাম। যদি কারো মধ্যে কোনো একটি বিষয়ের অভাব থাকে তবে তার দীন অপূর্ণাঙ্গ। (বসায়েরে হাকীমুল উম্মত, পৃ. ৮৪)

মানুষের শরীরে যদি একটি অংশ না থাকে অথবা অপূর্ণাঙ্গ থাকে এমন ব্যক্তি সৌন্দর্যের মানদণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয় না। অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যক্তির দীন সংক্রান্ত ঐ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে কোনো একটির অভাব পরিলক্ষিত হয় তবে তার দীন অপূর্ণাঙ্গ।

হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) যিনি হিন্দুস্থানি ওলামা ও মাশায়িখের মুকুটমণি এবং বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকিহ, সর্বোপরি উচ্চাঙ্গের একজন সুফি ও তরিকতের বিশিষ্ট শাইখ। যাঁর মহতি প্রচেষ্টায় যুগ যুগ ধরে বিদআতের মূলোৎপাটিত হয়েছে। তিনি তাঁর রচিত 'তাযকিরাতুর রশিদ' নামক গ্রন্থে তাসাউফের চারটি স্তর বর্ণনা করেছেন। যথা-

১। **ইলমে সুফিয়া:** সুফিয়ায়ে কিরামের ইলম যা হচ্ছে ইলমে দীনের নাম। এটা ইলমে জাহেরি হোক বা ইলমে বাতেনি। যদ্বারা একিন বা দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপিত হয়। এ ইলমই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ।

২। **হালে সুফিয়া:** আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের পথে সুফিদের মধ্যে যেসব অবস্থাদির সৃষ্টি হয় এর নামই হচ্ছে হালে সুফিয়া। চরিত্র সংশোধন এবং সার্বক্ষণিক আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে নিমগ্ন থাকার দ্বারা সুফিদের মধ্যে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৩। **হাকিকতে তাসাউফ:** আল্লাহ তা'আলার চরিত্রে সুশোভিত হওয়া হচ্ছে হাকিকতে তাসাউফ। স্বীয় ইচ্ছে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমেই তাসাউফের বাস্তবতা অর্জিত হয়।

৪। **আখলাকে সুফিয়া:** নবী করীম (সা.)-এর আখলাকই প্রকৃতপক্ষে সুফিয়ায়ে কিরামের আখলাক। হুজুর আকরম (সা.)-এর আখলাকের প্রশংসা করে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন-

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

"হে নবী (সা.) নিশ্চয়ই আপনি সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী"। আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহান মনীষী আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) একজন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেনো একজন শাইখে তরিকতের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, শাইখে তরিকতের হাতে বায়আত এমন কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় নয় যে, যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই গ্রহণ করতেই হবে।

অনেক উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এমন রয়েছেন, যাঁরা নিজেরাই সৎপথে পরিচালিত হতে সক্ষম। বিভিন্ন কারণ, উপকরণ এবং কার্যাবলীর মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে তাকওয়া এবং দীনদারীর গুণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ ধরনের লোক যদি কোনো শাইখে তরিকতের হাতে বায়আত গ্রহণ না করেন তবে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু সাধারণ মানবীয় স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে শাইখে তরিকতের হাতে বায়আত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হয় অতি সহজভাবে।

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, মানবীয় প্রবৃত্তির মধ্যে এমন মারাত্মক ব্যাধি রয়েছে যা কোনো অভিজ্ঞ শাইখ ব্যতীত অপর কোনো লোক উপলব্ধি করতে পারে না যথাযথভাবে। এ ব্যাধি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেও এর চিকিৎসা কিন্তু বুঝে আসে না সত্যিকারভাবে। মানুষের দোষ-ত্রুটি মানুষ ধরতে পারে; কিন্তু প্রবৃত্তির টানা-হেঁচড়ার কারণে এর সংশোধনের সুযোগ হয় না। এমতাবস্থায় আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত শাইখে তরিকতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাতে এসব মনীষী মানুষের নফসের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়ে এর প্রতিকারের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল নন। শাইখে তরিকতের অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। তাই তাঁরা মানুষের এসব ত্রুটি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

এটা চিরাচরিত বিষয় যে, কারো কোনো উচ্চমর্যাদা উস্তাদ ব্যতিরেকে হাসিল হয় না। অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য অবশ্যই তরিকতের ওস্তাদ তথা শাইখে তরিকতের প্রয়োজন। যাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সার্থকতার বরকতে বান্দার আসল উদ্দেশ্য তথা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিল হয়। কবি বলেন-

گر ہوائے ایں سفر زاری زلا دامن رہبر بگیر و پس بیا

بے رفیقے ہر کہ شد در راہ عشق عمر بگزشت و نشد آگاہ عشق

'হে আত্মা! যদি তুমি তরিকতের পথে চলার ইচ্ছে করো তবে পথ প্রদর্শকের আঁচল ধরে পেছনে পেছনে চলো। এজন্য যে, যে কেউ আল্লাহর প্রেমের পথে পথ প্রদর্শক ব্যতিরেকে চলছে তার জীবন নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু সে আল্লাহর প্রেমের পথে সফলকাম হয়নি।' (শরিআত ও তরিকত, পৃ. ৬২, তালীমুদ্দীন সূত্রে)

বায়আত ও সাহচর্যের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হওয়ার পর আমাদের এমন একজন শাইখে কামিলের আলোচনার প্রয়োজন যাঁর হাতে হাত রেখে বান্দা সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন দীনদারী, মুত্তাকি, সৎ ও সংস্কারবাদী একজন শাইখে কামিলের অন্বেষণ। পবিত্র হাদিসে নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন-

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأ على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন, মানুষ তার বন্ধুর অনুসৃত নীতির ওপর পরিচালিত হয়। অতএব, তোমাদের প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত, কার সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করছো। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

যখন সাধারণ বন্ধুত্বের মধ্যে এর প্রভাব বিদ্যমান, তবে শাইখে তরিকত এবং শিক্ষকের সাথে তো আরো প্রগাঢ় ভালোবাসা রয়েছে। এ ভালোবাসার প্রভাব কতটুকু হবে, সকলের একথা চিন্তা করা উচিত। এটা বাস্তব সত্য যে, যার সাথে যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও যে ধরনের আকিদা-বিশ্বাস রয়েছে সে হিসেবে ঐ ব্যক্তির আমল-এর আখলাকের প্রভাব অতি তাড়াতাড়ি সে ব্যক্তির মধ্যে সম্প্রসারিত হয়।

উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) জাহেরি ইলমের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জনের সাথে সাথে বাতেনি ইলম তথা ইলমে মারেফাতের জ্ঞান হাসিলের নিমিত্ত উপমহাদেশের খ্যাতনামা মনীষী বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ ও মহান আধ্যাত্মিক সাধক হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে সুদীর্ঘ ছয় মাস তাঁরই খানকায় অবস্থানপূর্বক তাঁর সোহবতে ধন্য হয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর গোটা জীবনে তাঁর পীর-মুর্শিদ প্রদত্ত তরিকতের সবক চালিয়ে গেছেন। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, তিনি ছিলেন যাহেরি এবং বাতেনি ইলমের সমন্বিত একজন পরিপক্ব আলিমে দীন। যিনি তাঁর পুরো জীবন ওয়াকফ করেছিলেন ইলম দীনের প্রচার-প্রসারে।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর আমলি জিন্দেগি পর্যালোচনা করলে আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন খুবই তাকওয়াবান তাঁর থেকে কোনোদিন তাহাজ্জুদ বাদ পড়েনি তিনি ইশরাক, আউয়াবিন, সালাতুত দোহা এবং পীর-মুর্শিদ প্রদত্ত ওজিফা আদায় করতেন যথাযথ নিয়মে।

বাস্তবিকই তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সাধক। ১৯৬০ সালে তিনি পবিত্র হজ পালন করেন। ফজরের নামাযে তিনি প্রথম সারিতে নামায আদায় করতেন। বৃদ্ধ অবস্থায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি তাঁর জীবনে। নিশিরাতে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য তিনি মসজিদে গমন করতেন খালি পায়ে, যেনো কেউ তাঁর তাহাজ্জুদের কথা জানতে না পারে। তিনি ইবাদত-বন্দেগি করতেন অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে। তাঁর ছিলো কালো রঙের একটি ছোট তাসবিহর ছড়া। সেটি সর্বদা থাকতো তাঁর মুঠোর মধ্যে। কেউ যেনো তাঁর ইবাদতের কথা বুঝতে না পারে। তিনি ভণ্ড পীর থেকে সাবধান থাকার নির্দেশ দিতেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন– কলকাতা আলিয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্যে খাজা নাজিমুদ্দিন দু'জন বিজ্ঞ আলিমের ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে একজন মাওলানাকে জিজ্ঞেস করেন– তরিকতের কারণে ইসলামের ফায়দা বেশি হয়েছে, না ক্ষতি? উত্তরে মাওলানা সাহেব তরিকতের অবদান সবিস্তারে আলোচনা করেন। অপর মাওলানাকেও একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন– প্রাথমিক যুগে ফায়দাটা বেশি হয়েছে তবে বর্তমানে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। এর জবাব শুনে খাজা সাহেব তাঁকে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দেন।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল- ভণ্ড পীরের হাতে বাইয়াত হওয়ার চেয়ে পীর না ধরাই উত্তম।

তিনি ছিলেন একজন আমলদার খোদাভীরু দুনিয়াবিমুখ আলিমে দীন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর ছিলো ভীষণ আকর্ষণ। সর্বদা দরূদ শরিফ পড়তেন। তিনি নামায, রোযা, হজ, যাকাতকেই শুধু ইবাদত মনে করতেন না বরং পার্থিব কাজসমূহ সুন্নাত মুতাবিক সম্পাদন করাকেও ইবাদত হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি প্রায় সময় বলতেন- "ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই। দীনের কাজ সুন্নাত মুতাবিক না হলে সেটা হবে দুনিয়াবী কাজ আর দুনিয়াবী কাজ যদি সুন্নাত মুতাবিক হয় তাহলে সেটা হবে দ্বীনি কাজ।"

তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবু ছফা মুহাম্মদ নাজমুদ্দিনকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

* গলদ দরবেশি পরিহার করো। তোমার কথাবার্তায় যে ভাবোন্মত্ততা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা খুবই ক্ষতিকর।
* স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতিপালনও শরিআত। শরিআত ছাড়া মারেফাতের কোনো মূল্য নেই। মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।
* সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো এবং যথাসাধ্য তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করো।
* মুরুব্বি ও বুযর্গদের উপদেশ মুতাবেক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করো।
* আমার খিদমতের ফিকির করার দরকার নেই। আল্লাহ যতোদিন তাওফিক দেন, ততোদিন পরিবার-পরিজনের খিদমত করে যাবো। সবসময় আল্লাহ তা'আলারও ভরসা করে যাবো।

আরেকটি কথা মনে রেখো– মানুষের পক্ষে যেহেতু জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে আল্লাহর রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়, তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য রিসালাত ও নবুয়তের

ধারা চালু রেখেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী নবী-রাসুলের আগমন ঘটেছে। তাঁরা মানুষের জীবন ধারনের জন্যে আদর্শ রেখে গেছেন, যাতে মানুষ তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে। এখন একথা বুঝে নাও যে, আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে আদর্শ রেখে গেছেন এবং জ্ঞানী-গুণীরা যে আদর্শের স্বীকৃতি দিয়েছেন তা অনুসরণ করা জরুরি। এছাড়া আল্লাহকে পাওয়া অসম্ভব। শরিআতের খেলাফ করে কেউ গন্তব্যে পৌছাতে পারেনি। নবীজির আদর্শে কোন বৈরাগ্যবাদ ছিল না। নবী (সা.) বলেছেন- 'ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদ নেই, পরিবার-পরিজন ছেড়ে নির্দয় ও দায়িত্বহীন হয়ে নিঃস্ব থাকার মানসিকতা আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে চরম প্রতিবন্ধক। অবধারিত দায়িত্ব থেকে নির্লিপ্ত থাকার নাম ইবাদত ও মারেফাত নয়; বরং তা আল্লাহর অসন্তোষের কারণ। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে কেবল রাসুলের (সা.) আনুগত্যের মাধ্যমে। রাসুলের (সা.) আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। সত্যিকার ব্যক্তি তিনিই যে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয়াবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। আর এটাই হলো মুহাম্মদী (সা.) আদর্শ।

ব্যক্তিসত্তা:

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন একটু মেজাজি। তবে সে মেজাজ তাঁর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হতো না, মুহূর্তের মধ্যে তিনি তা নিয়ন্ত্রণ করে ফেলতেন। তিনি খাদিম ও শিক্ষার্থীদের সাথে আত্মীয়ের মতো আচরণ করতেন। তাই সব খাদিম ও শিক্ষার্থী তাঁর সম্মুখে খুবই সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতেন। সোজা কথা, সকলের প্রতি ছিলো তাঁর দরদিমন।

ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে। নিজেই পুকুরে জাল ফেলে মাছ শিকার করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিতব্যয়ী। কোনো প্রকার অপচয় করতেন না। সবসময় স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করতেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। আতিথেয়তায় কোনো প্রকার ত্রুটি করতেন না। মেহমানদের সাথে উত্তম ও সম্মানজনক আচরণ করতেন। মেহমানের খাবার পরিবেশন ও বিশ্রামের প্রতি সবিশেষ নজর রাখতেন।

স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তার কোনো সন্তান দরিদ্রতার করালগ্রাসে পতিত হোক তা তিনি পছন্দ করতেন না। তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে জহুর হকার মার্কেটে একটি দোকান ক্রয় করে ছেলে আবুজিয়ার হাতে ন্যস্ত করেন। স্থাবর সম্পত্তিও তিনি ক্রয় করেছেন অনেক। যাতে তারা অর্থ-সংকট ও দরিদ্র্যতায় পতিত না হয়, কারণ দরিদ্রতা কখনো কখনো কুফরিতে লিপ্ত করে। সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তাঁরই সুযোগ্যপুত্র ড. অধ্যাপক আবু রেজা মুহাম্মদ নিজামুদ্দিন নদভী চট্টগ্রাম ১৫ আসন (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) থেকে পরপর দু'বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। যিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের নামে মানবসেবার অনন্য প্রতিষ্ঠান 'আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন, প্রতিষ্ঠা করে আর্ত-মানবতার সেবায় এক অনন্য নজির স্থাপন করেন। অপর পুত্র অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক, ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান। অন্যান্য আরো অনেক সেবামূলক সংস্থার সাথে জড়িত। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন একজন সুদর্শন ব্যক্তি। যখন শেরোয়ানি পরতেন তখন তাঁকে একজন মোম্বাইয়ের অভিজাত বাসিন্দা বলে মনে হতো। চলাফেরায় তিনি ছিলেন স্থীরগতি সম্পন্ন।

চলাফেরায় গাম্ভীর্য এবং কথাবার্তায় ছিলো বিশেষ আকর্ষণ। সর্বোপরি তিনি ছিলেন নাজুক স্বভাববিশিষ্ট। স্বভাবের নাজুকতায় তিনি সাইয়িদুস সা'দাত মির্জা মাযহার জানে জাঁনা আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি প্রকাশ শামসুদ্দিন হাবিবুল্লাহর (১৬৯৯-১৭৮১ খৃ.) রহ. অনুরূপ ছিলেন।

তিনি মাঝেমধ্যে গল্প বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। একবার তিনি গল্প বলতে গিয়ে বলেন- এক রাজকুমার বন্দী হয়ে দাসে পরিণত হয়। একদিন কোনো এক রাজকুমার সফরে বের হয়েছিলেন তখন তিনি রাস্তার পাশে এ দাসকে কান্না করতে দেখে জিজ্ঞেস করেন তুমি কাঁদছ কেনো? উত্তরে সে বললো– আমিও একদিন আপনার মতো শৌর্য-বীর্য সম্পন্ন রাজকুমার ছিলাম। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আজ আমি দাসে পরিণত হয়েছি। তাঁর একথা শুনে রাজকুমার তাকে জিজ্ঞেস করেন, মুরগীর স্বাদ কিসের মধ্যে? সে বললো, চামড়ার মধ্যে। তখন রাজকুমার তাকে আজাদ করে দিয়ে বললো, তুমি বাস্তবেই রাজকুমার। এ ঘটনা দেখে অন্য একজন দাস পথে বসে কান্না শুরু করে দেয়। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তুমি কাঁদছ কেনো? সে বললো, আমিও একদিন আপনার মত প্রভাবশালী রাজকুমার ছিলাম। ভাগ্যচক্রে আমি আজ দাসে পরিণত হয়েছি। তখন রাজকুমার তাকে জিজ্ঞেস করেন- বকরীর স্বাদ কিসে? সে বললো, চামড়ায়। রাজকুমার বললেন– তুমি রাজকুমার নও বরং একজন প্রতারক। তুমি দাস-ই থেকো।

নবী করিম (সা.) নিজেই বাজারে গিয়ে বাজার করতেন। অনুরূপ নবীর (সা.) সুন্নাত অনুযায়ী আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)ও বাজারে গিয়ে বাজার করে নিজে বহন করে নিয়ে আসতেন, কারো সাহায্য নিতেন না। তাঁর প্রতি জনসাধারণের এ ধরনের ভক্তি-মুহাব্বত ছিলো যে, তাঁর হাতে বাজারের থলে দেখলে তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিতো। তিনি গোশত, মাছ ও তরকারি পছন্দ করতেন। বিশেষ করে কচুর ডিগি দিয়ে মুরগির ডিমের তরকারি খুবই পছন্দ করতেন। স্বল্প তরকারিতে তুষ্ট থাকতেন। খাওয়া, দাওয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। সকালের নাস্তায় ফ্রাই করা ডিম ও চা পছন্দ করতেন।

মানবসেবা:

রাসুলে পাক (সা.) পবিত্র হাদিসে ইরশাদ করেন- "خير الناس من ينفع الناس" "ঐ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ যে মানুষের কল্যাণ সাধন করে।" (বুখারি)[১]। সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে একে অন্যের সাহায্যে যুগে যুগে বিভিন্ন মনীষী এগিয়ে এসেছেন বিভিন্নভাবে, আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন এদের অন্যতম। তিনি ছিলেন পরোপকারী, জনহিতৈষী এবং অন্যতম সমাজসেবক। কোনো ছাত্র বই-পুস্তক কিনতে না পারলে বা যে কোনো ধরনের আর্থিক সমস্যায় পড়লে তিনি ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে সমাধান করতেন। দেশে ও বাইরে যাঁরা তাঁর পূর্ণ আর্থিক সহায়তা ও অভিভাবকত্বে তাদের পড়ালেখা সম্পন্ন করেছেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক-প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরা সবাই তা অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁর নিজ গ্রামের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব গ্রিন্ডলেজ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা বুজুরুস

১. আল-ফতহুল কবির, খণ্ড-২, পৃ. ৯৮।

মেহের যিনি আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) একজন ভক্ত ও অনুরক্ত এবং প্রতিবেশী। তাঁর সূত্রে জানা যায়, "১৯৩৯/৪০ এর দিকে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) নিজ এলাকার কিছু সংখ্যক লোকজন ও ছাত্রকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কর্মসংস্থান এবং পড়ালেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষায় অধ্যয়নরত যে কোনো গরিব শিক্ষার্থীকে তিনি সহায়তা করতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।" চুনতি মাদরাসার শিক্ষকদের মাসের শেষে বেতন দেবার মত তহবিল মাদরাসায় না থাকলে তিনি কাল বিলম্ব না করে বাড়িতে গিয়ে নিজ গোলার ধান বিক্রি করে শিক্ষকদের বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করতেন। যাতে শিক্ষকরা আর্থিকভাবে কোনো কষ্ট না পায়। এটা তাঁর মানবসেবার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বৈ কী? চুনতি মাদরাসার শিক্ষকরা একথা স্বীকার করতেন অকপটে। চুনতি মাদরাসার মুফতি ইব্রাহীম সাহেবের অর্থ-সংকট দেখে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) নিজের ধান বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়ে মুফতি সাহেবের জন্যে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দেন। মুফতি সাহেব সারা জীবন এই ইহসানের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন।[১]

তাঁরই নিজ গ্রামের তিনজন বিশিষ্ট আলিমে দীন শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (রহ.), অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ ও মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (রহ.) তাঁরই বদান্যতায় ইলমে দীনের সুউচ্চ ডিগ্রি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। যিনি তাঁদেরকে পিতৃস্নেহ দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আন্তরিকভাবে। এই মহতি খিদমতের বিনিময়ে আল্লাহপাক তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ স্থান দান করুন। আমিন!

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) মানবসেবার ধারাবাহিকতাকে অম্লান ও অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে তাঁর সুযোগ্য পুত্র (ولد صالح) অধ্যাপক ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন "আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন" চট্টগ্রাম। ধর্মীয়, সমাজকল্যাণ, আর্তমানবতার সেবায়, শিক্ষায়, গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে নিরলসভাবে।

বিশিষ্ট আশেকে রাসুল (সা.) হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত সিরাতুন্নবী (সা.)-এর প্রধান রূপকার ছিলেন তিনি। আজীবন পরিচালনা করেছেন এ সিরাত মাহফিল। বক্তাদের মাঝে নবী করিমের (সা.) পুরো জীবনচরিত বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি যেভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন অদ্যাবধি সিরাত মাহফিল পরিচালিত হয়ে আসছে সে ধারাবাহিকতায়। এটি তাঁর সদকায়ে জারিয়ার আরো একটি বিশেষ কীর্তি।

---

২. অধ্যক্ষ ডা. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ (রহ.), প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ (রহ.) এবং মুফতি মাওলানা ইবরাহিম (রহ.)-এর নিজ স্বীকৃতি।

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সময়কালীন চুনতি মাদরাসায় স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে ভয়াল দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠে মানুষ সবেমাত্র সংসার গুছাতে আরম্ভ করেছে। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ তখন প্রায় অসম্ভব। দক্ষিণ চট্টগ্রামের শতাব্দীকাল প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসা সুদূর বার্মা (মায়ানমার) পর্যন্ত শিক্ষার একমাত্র উৎস কেন্দ্রস্বরূপ চালু ছিলো। উল্লিখিত কারণের পরিপ্রেক্ষিতে তখন স্বীয় মানী-গুণী তো বটেই, সাধারণ লোকের অস্তিত্ব বজায় রাখাও অনেকটা কঠিন হয়ে পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয়, তখন মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন একদল অতি উঁচুমানের গুণীজ্ঞানী ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ। নিম্নে তাঁদের নামের ফিরিস্তি উল্লেখ করা হলো-

চুনতির মরহুম কাজী মাওলানা ঈসমাইল, মরহুম ডেপুটি মোস্তাফিজুর রহমান, বিশিষ্ট কবি কাজী ফইয়াজুর রহমান, মাওলানা ফয়েজ আহমদ, বিশিষ্ট কবি অধ্যাপক খান বাহাদুর হাসান, হাজি সাইয়িদ আহমদ (শাহ সাহেবের বাবা), শাহ মাওলানা নজীর আহমদ, মাওলানা মাহবুবুর রহমান ডেপুটি রেজিস্ট্রার, মাওলানা ইউনুস খান ডেপুটি রেজিস্ট্রার, মাওলানা দানেশ, মরহুম মাওলানা জিয়াউল হক, মরহুম মাওলানা কবির উদ্দিন খান ডিসি, বিখ্যাত ব্যবসায়ী আলহাজ মাওলানা শামসুল হুদা খান সিদ্দিকী, হরিনার ব্যবসায়ী মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, মাওলানা আবদুল ওয়াছেহ আহমদ (সাতগড়), বারদোনার মাওলানা আমিন উল্লাহ (বড়ো মাওলানা), কলাউজানের মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবী, হারবাং-এর অ্যাডভোকেট জলীলুদ্দিন মিয়া (প্রাক্তন মন্ত্রী), আরাকানবাসী শাহ মাওলানা আবদুস সালাম আরকানী।

এদিকে গোল্ড মেডেলিস্ট মরহুম মাওলানা নূরুল হোসাইন সাহেব এবং আরো অনেকের পারিবারিক অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে অন্যত্র গমন এবং মরহুম মাওলানা আবদুস সোবহান (আমিরাবাদ)-এর অকাল মৃত্যুর কারণে মাদরাসায় বিরাজমান শূন্যতা। অন্যদিকে কলকাতা আকড়া আলিয়া মাদরাসা হতে আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। 'কিসমত' এর কী অপূর্ব সংযোজন! এই মাদরাসা আল্লামা ফজলুল্লাহকে কাণ্ডারী হিসেবে ঐ অজুহাতে পেয়ে গেলেন আরবিতে যাকে বলে نعم البدل। মরহুম আল্লামা তখন একদল সহযোগী যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষকমণ্ডলী পেয়ে গেলেন, যাঁদের দিয়ে তিনি তাঁর পরিকল্পনা মাফিক শিক্ষাদানে উৎসাহিতবোধ করলেন। সেই সময়কার শিক্ষকমণ্ডলীর নামের তালিকা তুলে ধরা হলো-

মরহুম মাওলানা মুফতি ইব্রাহীম, মরহুম মাওলানা আবদুল বারী (মহেশখালী), মরহুম মাওলানা গোলাম কাদের (রসুলাবাদ), মরহুম মাওলানা আবুল হাশেম (শের-এ খোদা) (করইয়া নগর), মরহুম মাওলানা মীর গোলাম মোস্তাফা (সাতকানিয়া), মরহুম মাওলানা আবদুল হাফিজ আনওয়ার, প্রসিদ্ধ হেড মাস্টার মাওলানা আইয়ূব খান, চুনতি (কাযেম আলি হাইস্কুল, চট্টগ্রাম), মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন (কুতুবউদ্দিন সাহেবের বাবা), একরামুল হক অভিনেতা (পরিদর্শক), মাস্টার সোলতান আহমদ প্রমুখ। তাঁদের গুণগত শিক্ষার প্রভাবে এই প্রতিষ্ঠান হতে যে শত শত ছাত্র বের হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নাম

হচ্ছে- মরহুম মাওলানা আবদুর রশীদ সাহেব (মুহাদ্দিস অত্র মাদরাসা), মরহুম শায়খুল হাদিস মাওলানা আমিন (সাতকানিয়া), মাওলানা আহমদুল্লাহ, মাওলানা আহমদ বশির, মাওলানা প্রফেসর নূরুল আমিন (কলাউজান), অধ্যক্ষ মাওলানা হাবিবউল্লাহ (সাতকানিয়া), মরহুম মাওলানা সাইয়িদ মাসুম (সাবেক মুহাদ্দিস, ঢাকা আলিয়া মাদরাসা), মাওলানা মুবারক আহমদ (বারদোনা), মাওলানা কাসেম সাহেব (চুনতি), মাওলানা মাহফুজুর রহমান খান সিদ্দিকী (চুনতি), মাওলানা ওসমান গণি (চুনতি), মাওলানা সিরাজুল আরেফীন, মাওলানা আবদুন নূর সিদ্দিকী (চুনতি)।

বলাবাহুল্য, তদানীন্তন সময়ে শিক্ষা-দীক্ষা তাহযিব-তামাদ্দুনের পীঠভূমি চুনতি মাদরাসা একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে শীর্ষত্বের দাবী রাখে। তখন মাদরাসা কেন্দ্রিক বাৎসরিক ড্রামা বা নাটক মঞ্চায়িত হতো। আল্লামার আগমনের পর তাঁর রচিত নাটক ড্রামা সংলাপ চতুর্দিকে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয় বিপুলভাবে।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার বর্ণনা না দিলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়:

পাক-ভারত বিভক্তিপূর্ব ১৯৪৬ সাল, চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ফজল আহমদ করিম (F.A. Karim) নামক একজন আই.সি.এস তিনি উঁচুমানের কবিও ছিলেন। যাঁর কবিতা তখন ডিগ্রি পর্যায়ে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সে সমস্ত কবিতার মধ্যে একটি কবিতা 'মজলুম' সম্বন্ধে "إتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب"[১] হাদিস শরিফের ব্যাখ্যায় লিখেছিলেন। তাঁর প্রথম ও শেষের দিকের দুটি পঙ্‌ক্তি তুলে ধরা হলো:

مظلوم کے آہوں کا اثر ہو کے رہیگا　　یہ نظم جہاں زیر و زبر ہو کے رہیگا

فضلی نہ پیمبر ہے نہ ولی ہے نہ برہمن　　جو اسنے کہا ہے وہ مگر ہو کے رہیگا

উক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সম্ভবতঃ কক্‌সবাজার হতে ফেরার পথে চুনতি মাদরাসায় কয়েক ঘণ্টার যাত্রা বিরতির জন্য এসেছিলেন। সঙ্গে এক অবিবাহিতা বোন ছিলেন যাকে পূর্বে চুনতি ডাক বাংলোতে রেখে এক কিশোর ছেলেকে দিয়ে আসেন। উক্ত অতিথিকে মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহর রচিত বিভিন্ন গান দিয়ে ছাত্ররা অভ্যর্থনা জানায়, তাঁর একটি গানের প্রথম দিকের ৪টি পঙ্‌ক্তি এখানে তুলে ধরা হলো-

مہمان محترم پہ ہمارا اسلام ہو　　تعظیم اف اے کریم بصد احترام ہو

بچے ہیں ہم نہیں ہے سمجھ کچھ ابھی ہمیں　　کیا ہم سے انتظام ہو کیا اہتمام ہو

পাশাপাশি অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি দেখে বিশেষ করে মরহুম আল্লামার শায়েরির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পুরো দু'দিনের জন্য তিনি যাত্রা বিরতি করেন এবং এ সময়ের মধ্যে মুশায়েরায় শরিক হন ও অনির্ধারিত অনেক জলসা মাহফিলে তিনি শামিল হন।

---

১. সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

عسى الفرج الذي أصبحت فيه - يكـــون ورآه هم قـريب

সম্ভবতঃ ১৯৪৯ সাল অনিচ্ছাকৃত দৈবিক কিছু কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহ তাঁর অসংখ্য ছাত্র ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের ডেকে চুনতি মাদরাসা থেকে বিদায় নেন। হযরত আলির (রা.) সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হয়-

ع – ولا يبقى لمسرور سرور

মরহুম আল্লামার চুনতি মাদরাসায় আগমনের ২য় পর্ব ঘটে ১৯৬৩ সালের দিকে। বিগত ১০ বছরে দেশে অনেক পরিবর্তন এসেছে। মানুষের প্রত্যাশা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমস্যার জঞ্জালও উপস্থিত। মাদরাসার ১ম সারির হিতাকাঙ্ক্ষী ও উঁচুমানের শিক্ষকের হয় মৃত্যু, অথবা অন্যত্র প্রস্থানের কারণে প্রত্যাশিত মানের শিক্ষা দানে অপারগ কিছু কিছু পরিস্থিতিরও উদ্ভব ঘটে। প্রশাসনিক দিক দিয়েও বহুবিধ সমস্যায় তখন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বেসামাল হয়ে মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহর শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁর নিজ হাতেগড়া মাদরাসার পুনর্বার হাল ধরার জন্য সম্মত হন এবং সাথে সাথে নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করে আবার সেই পুরাতন প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, এ ক্ষেত্রে তাঁর সার্থকতা অবিস্মরণীয়। ইতোমধ্যে মাদরাসা ১ম সারির ৩ জন আধ্যাত্মিক সাধকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। একজন মরহুম মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.), প্রতিষ্ঠাতা বায়তুশ শরফ; তাঁর ইন্তেকালে তাঁরই উত্তরসূরী মরহুম শাহ মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) এবং অপরজন মুজাদ্দিদে মাহফিলে সিরাতুন্নবী (সা.) মরহুম মাওলানা শাহ হাফেজ আহমদ (চুনতির শাহ সাহেব), শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যেও মাদরাসা পেয়ে যায় প্রখর মেধাসম্পন্ন কয়েকজন অসাধারণ ওস্তাদবৃন্দ। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

মরহুম মাওলানা মোজাফফর আহমদ (হেড মাওলানা), মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (মুহাদ্দিস), মাওলানা আবদুর রশিদ (মুহাদ্দিস), মাওলানা আবদুল হাই নিজামী (মুহাদ্দিস), মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম, মুহাদ্দিস মাওলানা আমিন খান রেজভি, মুহাদ্দিস মাওলানা নেসারুল হক, উপাধ্যক্ষ-মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, মরহুম মাওলানা কামাল উদ্দিন মুসা খতিবী, গুণগত মানের শিক্ষার প্রমাণে নিচের কয়েকজন তাঁদের ছাত্রই যথেষ্ট যাঁরা আজ বাংলাদেশে স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল- শাহ মাওলানা কুতুবুদ্দিন (পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ), প্রফেসর ড. মাওলানা শব্বির আহমদ (প্রফেসর ও প্রাক্তন ডিন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), প্রফেসর ড. মাওলানা আবু বকর রফীক (সাবেক প্রোভিসি, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম), প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী (প্রফেসর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), মাওলানা ওবাইদুল্লাহ (প্রাক্তন প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ওয়াসা), অধ্যাপক মাওলানা নুরুল আমীন, ড. মাওলানা বদরুদ্দোজা (প্রফেসর, চবি), কাজী মাওলানা নাসিরুদ্দীন, প্রফেসর ড. মাওলানা আহসান সাইয়েদ (ভিসি, ইআবি), মাওলানা আবু উমর ফারুক আহমদ (অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইসলামিক ইকোনমিক ইনস্টিটিউট, কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা, সৌদি আরব) প্রমুখ।

বাংলাদেশ আমলে মরহুম জনাব শাহ হাফেজ আহমদ (রহ.)-এর উদ্যোগে চুনতিতে সর্বপ্রথম বিষয়ভিত্তিক সিরাতুন্নবী (সা.)-এর বাস্তবায়নে আল্লামা ফজলুল্লাহ মূখ্য ভূমিকা পালন করে পুরো জাতিকে একটি দিকনির্দেশনা দান করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে সৌদি আরবের ১ম রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামিদ বিন খতিব সিরাতুন্নবী (সা.) ও চুনতি মাদরাসা পরিদর্শনে আসলে তাঁর সম্মানে দীর্ঘ আরবি কবিতার মাধ্যমে এতদঞ্চলে ইসলামের সম্প্রসারণের পটভূমিকা ও চুনতির মতো স্থানকে বেছে নেয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরে আল্লামা ফজলুল্লাহ যে মানপত্র রচনা করেন তা ভাষাগত দিক দিয়ে মরহুমের জ্ঞানের গভীরতার স্বাক্ষর বহন করে। ঐ বছরেই চুনতি মাদরাসা শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ'র আগ্রহ ও সহযোগিতা, কমিটির আন্তরিক সমর্থন এবং আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সাহসী পদক্ষেপ ও নিরলস প্রচেষ্টায় কামিল শ্রেণিতে উন্নীত হয়। ১৯৭৯ সালে তিনি তাঁর প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চুনতি মাদরাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ'র ইচ্ছায় তাঁর ছাত্র, ভক্ত ও অনুসারীরা মাদরাসার পূর্বদিকস্থ পাহাড়ে মাওলানা ফজলুল হক ও মাওলানা নজীর আহমদ এর মাজারের উত্তর পার্শ্বে তাঁকে ও তাঁর সাথে একপৃথিবী জ্ঞান ও প্রেরণা সমাধিস্থ করেন।

مات فضل الله لكن لم يمت فيضانه

إنما مـات المسمى اسمه ما لا يمـوت

চুনতি সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) ও আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

হিজরি ১৩০০ শতাব্দীতে সারাবিশ্বে ইসলামের চরম অবনতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ে তুরস্ক সাম্রাজ্যের খিলাফত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সাথে সাথে খিলাফতের অবসানে ইসলামের ঐক্যবদ্ধ শক্তির উৎস নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। অপরদিকে অশুভ পাশ্চাত্য জড়বাদ, নাস্তিক সমাজতন্ত্রবাদ ক্রমবিকাশমান বিশ্বে মুসলমানদের তৌহিদি প্রেরণাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এই সুযোগে ইহুদিরা বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে ইসলামকে ধ্বংস করতে পাঁয়তারা করতে থাকে। বাংলাদেশের মুসলমানরাও এ ষড়যন্ত্রে পতিত হয়ে আল্লাহপ্রদত্ত ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদর্শিত মূল সত্য থেকে অনেক দূরে সরে পড়তে থাকে। বাংলার জমিনেও নবীজির সিরাতের আলো নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছিলো। ইসলামের এই দুঃসময়ে ঘুণেধরা সমাজের সংস্কার সাধনের জন্যে আবির্ভূত হলেন অলিকুল শিরোমনি বানিয়ে মাহফিলে সিরাতুন্নবী (সা.) হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.)।

তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক ধী-শক্তি বলে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসুল (সা.) প্রদর্শিত সত্য থেকে বিচ্যুতিই মুসলিম সমাজের দুরাবস্থা ও অধঃপতনের একমাত্র কারণ। তাই তিনি সিরাতুন্নবী (সা.) তথা আল কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ মুতাবেক ১৩৯২ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল সিরাতুন্নবী (সা.) নামে ১ দিনব্যাপী এক ঐতিহাসিক মাহফিলের গোড়াপত্তন করেন। যা পরবর্তীতে ধাপে ধাপে ১৯ দিনে রূপান্তরিত হয়। রবিউল আউয়াল মাস সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম মহামানব হযরত মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহর (সা.) দুনিয়ার বুকে আবির্ভাবের পবিত্র মাস। আল্লাহপাক তাঁকে বিশ্বজগতের রহমতরূপে বিশ্বমানবতার আদর্শরূপে ইহকালীন জীবনের শান্তি ও পরকালিন জীবনের মুক্তি ও নাজাতের পয়গাম নিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি স্রষ্টার সঠিক পরিচয় মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। আমাদের প্রিয় রাসুল (সা.) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রেখে গেছেন সুস্পষ্ট নিদর্শন, সর্বোত্তম আদর্শ। আধুনিক সভ্যতা সর্বাপেক্ষা তাঁর কাছে ঋণী। দুনিয়া যতো সামনে এগিয়ে যাবে তাঁর প্রভাব, তাঁর অবদান ততো বেশি অনুভূত হবে। তিনি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের শান্তি, কল্যাণ ও অস্তিত্বের জন্যে কুরআনের বাণী- "وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ" অপরিহার্য প্রমাণিত হবেন।

হযরত শাহ সাহেবের ভাষ্যানুযায়ী তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এযাজতপ্রাপ্তির পর আপামর জনসাধারণের জন্য মাহফিলে সিরাতুন্নবী (সা.) ও চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসাকে কামিল পর্যায়ে (টাইটেল স্তরে) উন্নীত করে হাদিসের উচ্চশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন।

চুনতি মাহফিলে সিরাতুন্নবী (সা.)-এর শুরু থেকে হযরত শাহ সাহেবকে (রহ.) তাঁর অনুরোধে যিনি সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ বিশেষ করে অনুষ্ঠানসূচি সাজানো বিষয় নির্ধারণ,

মাহফিলের নামকরণসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন উপমহাদেশের স্বনামধন্য প্রথিতযশা আলিমেদ্বীন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফতি, লেখক, গবেষক ও স্বভাবকবি আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)। তিনি আমৃত্যু এ মাহফিলের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানেও তাঁর উদ্ভাবিত বিষয়ের ওপর মাহফিল চলছে। চুনতি সিরাত মাহফিলের পূর্বে শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বের কোথাও এ ধরনের বিষয়ভিত্তিক সুশৃঙ্খল ওয়াজ মাহফিলের নজির নেই। এই ব্যতিক্রম ধারনার উদ্ভাবক আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)। তাই শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদকে (রহ.) সিরাতুন্নবীর (সা.) প্রবর্তক এবং আল্লামা ফজলুল্লাহকে (রহ.) রূপকার বলা হয়। ২০১৪ সালের পর থেকে অদ্যাবধি তাঁর সন্তান প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী সিরাতুন্নবী মাহফিলের বিষয়বস্তুর সম্পাদনা, বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা, ওয়ায়েজিনদের বাছাইকরণ, কার সাথে কোন বিষয় মিল খাবে, আইন শৃঙ্খলা, সরকার কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ, সিংহভাগ অর্থযোগানসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড তিনিই আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।

পবিত্র মাহফিলে সিরাতুন্নবী (সা.) চুনতি এর পটভূমি ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) বলেন-

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[১] অর্থাৎ- মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনকথা, তাঁর প্রতিটি আদেশ, নিষেধ, ওঠাবসা, চলাফেরা, ব্যক্তিগত অভ্যাস, অভিব্যক্তি তথা পছন্দ-অপছন্দ, আচার-আচরণের প্রতিটি পর্যায়ই বাস্তব ও জীবন্তরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিলো মহানবী (সা.)-এর দৈনন্দিন জীবনে। কুরআনের অনুশাসনকে যদি কেউ জীবনে বাস্তবায়িত করতে চায় তবে তার পক্ষে মহানবির (সা.) জীবনালেখ্য সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। মহানবী (সা.) এর পূতঃপবিত্র জীবনের কোনো দিক বা আলেখ্যই এখন মানব চক্ষুর অন্তরালে নেই। প্রত্যেকটি মুহূর্তই সকলের সামনে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। দীর্ঘ চৌদ্দশ বছরাধিককাল ধরে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ জীবনের ওপর চলছে বিস্তর গবেষণা এবং ব্যাপক আলোচনা।

যুগে যুগে মানবসমাজে কোনো নৈতিক অধঃপতন ও ধর্মীয় বিপর্যয় দেখা দিলে তখন তা দূরীকরণের নিমিত্ত নবী জীবনের ঐ দিকটা বিশেষভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশেষ করে যখন কোন সময় দেশময় ধর্মীয় বিপর্যয় দেখা দেয়, অত্যাচার, অনাচার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, জনসাধারণ ধর্মীয় অনুশাসনকে ভুলে গিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহে লিপ্ত হয়, একে অন্যের ইজ্জত আব্রু লুণ্ঠনের জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে। মানুষ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে নেমে আসে পশুত্বের স্তরে; তখন মহানবী (সা.)-এর আদর্শ শিক্ষার বিশদ আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেয় যেনো জনসাধারণ এর সঠিক পথের দিকনির্দেশ করতে সক্ষম হয়।

---

১. সুরা আহযাব-২১।

এমনিতর একটি অবস্থা বিরাজ করছিলো আমাদের এই বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্বাপর সময়ে। মুসলমান মুসলমানের প্রতি ছিলো খড়্গহস্ত-ইসলাম হয়েছিল দেশের অধিকাংশ জনতার কাছে একটি অত্যন্ত অপ্রিয় বস্তু। এ জাতি যে আবার কখনো ধর্মীয় অনুভূতি ফিরে পাবে তা ছিলো অকল্পনীয় বস্তু। এহেন জাতীয় বিপর্যয়ের মুহূর্তে এ অধঃপতিত জাতিকে ধর্মীয় ও নৈতিক অবনতির অতল গহ্বর থেকে মানুষের স্তরে উন্নীত করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যিনি, তিনি হলেন হযরত আলহাজ শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (চুনতির শাহ সাহেব) তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন ও সুতীক্ষ্ণ আধ্যাত্মিক চক্ষু দিয়ে দেখতে পেলেন এ জাতির পরিত্রাণের ব্যবস্থা একমাত্র সিরাত আন্দোলনের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। বিশ্বমানবতার ত্রাণকর্তা রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ জীবনের সঠিক চিত্রটুকু জনতার সম্মুখে তুলে ধরাই এর একমাত্র পন্থা।

তাই হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিশেষ বিশেষ দিকসমূহের ওপর আলোচনার উদ্দেশ্যে ২৪ ঘণ্টার একটি দীর্ঘ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী বছর নবী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ সুচিন্তিতভাবে বিন্যস্ত করতঃ তিন দিন ব্যাপী এক সিরাত মাহফিলের ব্যবস্থা করলেন। যা পরবর্তী বছরসমূহে পাঁচ দিন, সাত দিন, দশ দিন এমনকি বারো দিনের (বর্তমানে ১৯ দিন) এক দীর্ঘ কোটায় উন্নীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সিরাত মাহফিল কোনো নিছক অনুষ্ঠান নয়, এটি একটি বাস্তব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

এ সিরাত মাহফিলের আয়োজনের পেছনে হযরত শাহ সাহেবের প্রধান উদ্দেশ্যও এই- জনসাধারণ যেন কয়েকদিন একনাগাড়ে পার্থিব কাজকারবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ মাহফিলে দেহমন নিয়ে উপস্থিত হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলামের পবিত্র আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে একটা বাস্তব ধারণা নিয়ে যেতে পারে। যার ওপর ভিত্তি করে তার পরবর্তী জীবনটুকু যেন সেই আদর্শে পরিচালনে সচেষ্ট হয়। এ সিরাত মাহফিলে নবি জীবনের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সুবিন্যস্ত সারগর্ভ আলোচনা করা হয়।

এ মাহফিলের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই, অন্যান্য মাহফিলের মতো এটি শুধু আলোচনা সভায় সীমাবদ্ধ নয় বরং এখানে অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের জন্যে বিশেষ এন্তেজামের সাথে ব্যবস্থা হয় দু'বেলা খাবারেরও। কারো নিকট থেকে নেয়া হয় না কোনো বাধ্যতামূলক চাঁদা বা কখনও জিজ্ঞাসা করা হয় না কোন চাঁদা ইত্যাদি আদায় করেছেন কিনা? এমনকি মাহফিল কর্মীদের কেউ নামাজ খেলাফ করেছে বা শরিআতবিরোধী কোন কর্ম করেছে বলে জানা গেলে তাকে বহিষ্কার করা হয় সাধারণ কর্মীর তালিকা থেকে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রতি বছর যে পাঁচ-ছয় লাখ টাকা (বর্তমানে আরো অনেক বেশি প্রায় ১.৫ কোটি টাকা) এ মাহফিল উপলক্ষে ব্যয় হয় তার ব্যবস্থা হবে কিনা এ বিষয়ে হযরত শাহ সাহেবকে (রহ.) কোনোদিনই এতটুকু ভ্রুকুঞ্চিত করতেও দেখা যায়নি। তাঁর মুখে একটিমাত্র কথা- এটি মহানবীর (সা.) পবিত্র মাহফিল, আমার তোমার ভাবনা কিসের? বরং কেউ কোনরূপ ব্যয় সংকোচনের প্রস্তাব দিলে তিনি তা সজোরে এ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, এটি মহানবীর (সা.) কাজ। এতে আবার

কার্পণ্য কেনো? সত্যিই এ মাহফিলের এতো সুবৃহৎ কাজের আঞ্জাম ও ফান্ডের ব্যবস্থা কিভাবে যে হয়ে যায় তা কল্পনাতীত। এ ফান্ডে উসুলকৃত টাকা-পয়সা থেকে একটা পয়সাও অন্য খাতে খরচ করতে তিনি এতো কঠোর ও বিরোধী যে, একে তিনি কবিরা গুনাহ মনে করতেন।

এ ধরনের একটা মাহফিলের আয়োজন ঐ মহান ব্যক্তিত্বের পক্ষে সম্ভব যাঁর রয়েছে মহানবী (সা.) এর প্রতি অগাধ মুহাব্বত, সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও অসামান্য আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, এসব গুণাবলির মূর্ত-প্রতীক হলেন হযরত আলহাজ শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.)। তাঁর এ মহান সিরাত আন্দোলনের ফলে আজ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে দিবারাত্রি সিরাত মাহফিলের একটা আলোড়ন পড়ে গেছে। দেশবাসী সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে তাদের ভুলভ্রান্তি ও মহানবীর মহান শিক্ষার মূলকথা, আর তাতে করে এ বাঙালি জাতি তার অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে আবার আলোর পথে পা বাড়াচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

আল্লাহ তাঁর এ সিরাত আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ, ধর্ম ও জাতির সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করুন। আমিন!

(১৯৭৭ সালে প্রকাশিত সিরাত স্মরণিকা থেকে সংগৃহিত)

সমকালীন ওলামা ও শিক্ষাবিদদের মাঝে আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা

এদেশের খোদ্দামে দীন ও নায়েবে রাসুলগণ দ্বীনি দায়িত্ব পালনে যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম, দীনের ঝাণ্ডাবাহী বিজয়ী বেশে ইসলামের জয়পতাকাকে উড্ডীন করেছিলেন; তন্মধ্যে হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) একজন নির্ভীক ও লড়াকু সৈনিক। তিনি ছিলেন দীনের একনিষ্ঠ খাদেম ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐক্যের প্রতীক। বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের সময়ে মাওলানা মাহমুদুর রহমান সাহেব (রহ.)-এর নির্বাচনী এলাকা সাতকানিয়ায় এবং খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.)-এর চকরিয়া নির্বাচনী এলাকায় তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা অক্লেশে স্বীকার করতে হয়। সেসময় মাওলানা মাহমুদুর রহমান সাহেবের নির্বাচনী প্রচারণার শেষ মিটিং মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই নির্বাচনী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন তদানীন্তন নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, জনাব অ্যাডভোকেট ফরিদ আহমদ, করাচি নেজামে ইসলাম পার্টির মহানগর সভাপতি রানা জাফরুল্লাহ খান এবং পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মাওলানা শাহ আতহার আলী (রহ.), ইসলামের প্রাণকেন্দ্র চট্টগ্রামের খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.), জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি আযীযুল হক (রহ.), মাওলানা আবদুর রশিদ (রহ.) (ছোটহুজুর), মাওলানা মোবারক সাহেব (রহ.), মাওলানা আমিন উল্লাহ সাহেব প্রমুখ। যুক্তফ্রন্টের মনোনীত (সংসদ সদস্য) অ্যাডভোকেট আবদুল কুদ্দুস মিয়ার স্থলে নেজামে ইসলাম পার্টির মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মাহমুদুর রহমানের স্বপক্ষে সাতকানিয়া তেওয়ারি হাট ময়দানের সমাবেশে শতাধিক মিছিল সহকারে লক্ষ জনতার ঢল নামে। মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) সভাপতির ভাষণে দীপ্তকণ্ঠে চূড়ান্ত ফায়সালা দিয়েছিলেন যে, যুক্তফ্রন্টের অনুমোদনপুষ্ট মনোনীতদের ভোট না দিয়ে অন্য প্রার্থীকে ভোট দিলে চরম ভুল ও ক্ষতি হয়ে যাবে। তিনি এবং সাতকানিয়ার প্রখ্যাত ওলামা-মাশায়েখ সহকারে যথাক্রমে- শাহ মাওলানা আবদুল মজিদ, শাহ মাওলানা আবদুর রশিদ ও পটিয়ার মুফতি আযীযুল হক সাহেবের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাতকানিয়া হতে মাওলানা মাহমুদুর রহমান, চকরিয়া হতে মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, বাঁশখালী হতে প্রফেসর আসহাব উদ্দীন আহমদ এবং আনোয়ারা হতে আখতার কামাল সাহেব যুক্তফ্রন্টের টিকেটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তখনকার পাকিস্তান আমলে হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব, শাহ মাওলানা আবদুল মজিদ সাহেব ও শাহ মাওলানা আবদুর রশিদ সাহেব- এ বুজুর্গত্রয় পাকিস্তান জমিয়তে উলামা ও নেজামে ইসলাম পার্টির এবং চার দলীয় যুক্তফ্রন্টের তত্ত্বাবধানে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠায় যে কষ্ট-ক্লেশের মাধ্যমে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, তাতেই বুযর্গত্রয়কে তদানীন্তন কালের ইসলামি আন্দোলনের অগ্রসৈনিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

১৯৬৫ সালে সামরিক জান্তা প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আইয়ুব খান-এর মৌলিক গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে উভয় পাকিস্তানে (পূর্ব ও পশ্চিম) গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে বৈষম্য ও শোষণ-নির্যাতন চালায়। তারা পবিত্র ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামকে কাট-ছাট করার জন্য তথাকথিত 'ইসলামিক রিচার্স কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠা করে। এই কাউন্সিলের জেনারেল

ডিরেক্টর নিযুক্ত করেন ড. ফজলুর রহমানকে। এই মুরতাদ তার তথাকথিত ইসলাম নামক বইয়ে নামাজকে তিন ওয়াক্ত, যাকাতকে ট্যাক্স ও জিবরাইলকে (আ.) কাল্পনিক বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। তৎকালীন ছাত্রনেতা মাওলানা আবদুল মালেক হালিমের প্রতিবাদে 'ড. ফজলুর রহমানের ভ্রান্ত মতবাদ' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। নামাজ ও যাকাত সম্পর্কে লিখিত সেই বইয়ে যাকাত শিরোনামে প্রবন্ধটি লিখেন মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.)। তাঁর লিখিত প্রবন্ধ সমগ্র পাকিস্তানে জ্ঞানী-গুণীদের নিকট সমাদৃত হয়। সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ এ এ রেজাউল করিম চৌধুরী বইটি হাতে নিয়ে মাওলানা আবদুল মালেক হালিম সাহেবকে বলেছিলেন- ভাতিজা, তোমার বইটিতে যাকাত নামক প্রবন্ধটি কে লিখেছেন? তিনি বললেন- চাচা, আপনি বলেন তো! তিনি সাথে সাথে বললেন- আমার মনে হচ্ছে প্রবন্ধটি মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেবের। তখন হালিম সাহেব অট্টহাসি দিয়ে বলেছিলেন, আসলে লিখনীতেই লেখকের পরিচয়! এমন ঘটনা আরো আছে। চুনতি হাকিমিয়া আলিয়ার প্রধান মুহাদ্দিস থাকাকালীন তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান কক্সবাজার যাত্রাপথে হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেবের একটি লিখিত মানপত্র পেয়ে বলেন, এমন মানপত্রের লেখককে দেখতে যাওয়া প্রয়োজন! এই মানপত্র পেয়ে গভর্নর চুনতি মাদরাসা পরিদর্শনে আসেন।

১৯৬৮ সালে খতিবে আযম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) তৎকালীন ইসলামবিরোধী শক্তির মোকাবেলায় ব্যাপক কর্মসূচি নিয়ে ময়দানে নামেন। পাকিস্তানের কথিত 'ইসলামিক রিচার্স কাউন্সিল'-এর ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড রুখে দেয়ার জন্য এবং তাদের অপতৎপরতার দাঁতভাঙা জবাব দানের জন্য অন্য অনেকের মতো মাওলানা আবদুল মালেক হালিম সাহেবকেও নিযুক্ত করেন খতিবে আযম সাহেব। এ কাজের উপযুক্ত মনে করে খতিবে আযম হালিম সাহেবকে হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ইসলামি সাহিত্যের শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দেন। জনাব হালিম সাহেব মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর নিকট তিন মাস হাতে-কলমে ইসলামি সাহিত্যের পাঠ নেন। সেই সাথে মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) তাঁকে এ কাজের যোগ্য করে গড়ে তুলেন।

আসলে মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর জ্ঞান-গরিমা-বুদ্ধিমত্তা আর সাহস তাঁকে নিয়ে গেছে এক অনতিক্রম্য উচ্চতায়। তাঁর গুণ ও যোগ্যতাকে সবাই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। উত্তুঙ্গ মেধাবী হওয়ার কারণে তাঁকে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক মুফতি আযীযুল হক (রহ.) এ মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। একবার মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব (রহ.) ও সাতকানিয়ার প্রধান ওয়ায়েজ মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবি সাহেবসহ পটিয়া মাদরাসায় তাশরিফ আনেন। ছাত্ররা তাঁকে একপলক দেখতে গেলে মুফতি সাহেব বলেছিলেন, 'আমি তাঁকে (মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) বহু অনুরোধ করেছি আমার মাদরাসার খেদমত করতে, কিন্তু আনতে পারছি না; তোমরা ছাত্ররা পায়ে ধরে তাঁকে রাজি করাতে পারো কিনা দেখো।' তিনি শিক্ষক হিসেবে ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, শিক্ষাবিদ হিসেবে ছিলেন খ্যাতিমান, রাজনীতির ময়দানে ছিলেন দক্ষ রাজনীতিবিদ, ইবাদাতে ছিলেন একনিষ্ঠ, ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠায় ছিলেন ঐক্যের প্রতীক, ছাত্রদের জন্য ছিলেন এক অনুপম আদর্শ।

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) রচনাবলি

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। জীবনের সিংহভাগ তিনি ব্যয় করেছেন শিক্ষকতার মহান পেশায়। হাজার হাজার ছাত্র তাঁরই নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করে আদর্শ জাতি গঠনের মহান পেশায় নিয়োজিত। জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান দান করাই ছিল আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর একমাত্র পেশা ও নেশা। তিনি ১৯টি গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সংকলন করে জ্ঞানজগতে করেছেন অনন্য সংযোজন। তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে:

প্রকাশিত:

১. শামায়িলে তিরমিযী (বঙ্গানুবাদ): এ গ্রন্থটি ইসলামিয়া লাইব্রেরি চট্টগ্রাম, হতে ১৯৬০ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর আরো একাধিক প্রকাশনার পর পরবর্তীতে জানুয়ারি ২০১৬ সালে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে। মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (রহ.) রচিত শামায়িলে তিরমিযীর অনুবাদ আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহর (রহ.) অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ব্যক্তি জীবনের ৫৮টি বিষয়কে অনুচ্ছেদ আকারে সাজিয়েছেন তিনি এ গ্রন্থে। মূল আরবির পাশাপাশি অনুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় মাদরাসার ছাত্রদের জন্যে প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছে। অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) বলেন- "হযরতের যাহেরী ছুরত, আকার-আকৃতি, চাল-চলন, আহার-বিহার, স্বভাব-চরিত্র, জীবনযাপন প্রণালী ইত্যাদি ভালোরূপে জেনে নিয়ে ভক্তি ও মুহাব্বতের সাথে মানসপটে এর ছবি অঙ্কিত রাখা, তাঁর চরিত্রের অনুসরণ করা যে কোন মুসলমানের জন্যে ইহ-পরকালের শান্তির কারণ। তাতে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। আমাদের বাঙালি মুসলমানের মধ্যে অনেক ধর্মপ্রাণ লোক আছেন, তাদের মন-প্রাণ হযরতের (সা.) মুহাব্বতের প্রেরণায় তরঙ্গায়িত।"

এই গ্রন্থটির শোভা-সৌষ্ঠব আরো বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি ও ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন'র সম্পাদনার মাধ্যমে। যেটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত হাদিসবেত্তা ইমাম তিরমিযী তাঁর সমগ্র মেধা, শক্তি ও সাধনা প্রয়োগ করে 'জামেউত তিরমিযী' গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁর এ গ্রন্থখানি 'সিহাহ সিত্তাহ' গ্রন্থ ষষ্ঠকের অন্তর্ভুক্ত। ফলে এটি মুসলিম সমাজে খুবই গুরুত্বের সাথে গৃহিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযীর এ মূল্যবান গ্রন্থখানির মধ্যে শামায়িল অংশ সংযোজিত। যাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন দিক, তাঁর অবয়ব কাঠামো, শারীরিক গঠন, চুল, দাঁড়ি, আচার-আচরণ, স্বভাব-প্রকৃতি, রীতি-নীতি এবং ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। যা একজন মুসলমানের জানা এবং তদনুযায়ী আমল করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু মূল গ্রন্থটি আরবি ভাষায় হওয়ায় এবং বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ না থাকায় বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিম সমাজ এ ধরনের অত্যাবশ্যক ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি থেকে অনেকটা বঞ্চিত ছিল।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) শামায়িলে তিরমিযী'র সফল অনুবাদক। তাঁর এ অনুবাদ কর্মের দ্বারা মহানবী (সা.)-এর বাস্তব জীবনচিত্র বাংলাভাষী মুসলমানদের সামনে তুলে ধরতে তিনি সক্ষম হয়েছেন অত্যন্ত সফলভাবে। তাই তিনি তাঁর এ অনুবাদ গ্রন্থের জন্যে চির স্মরণীয় হয়ে

থাকবেন। কেননা, বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানগণ তাঁর এই অনুবাদের মাধ্যমে তাদের দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের ব্যাকুল আত্মা ও মনতুষ্টি লাভ করেছে। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যে কত উঁচু স্তরের আলিমে দ্বীন, বহু ভাষাবিদ, পণ্ডিত, কবি ও সাহিত্যিক এবং সমাজ সংস্কারক ছিলেন তা তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদক। আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষা থেকে তিনি বাংলা এবং উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাছাড়া মাদরাসার ছাত্রদের জন্যে তিনি উর্দু ও আরবি গ্রামার বই রচনা করেছেন। আল বুসীরী রচিত 'কাসীদাতুল বুরদা' কিতাবেরও তিনি সফল অনুবাদক।

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা খুবই কঠিন কাজ। এজন্য প্রয়োজন সকল ভাষায় সমান দক্ষতা। ক্ষণজন্মা এ মহাপুরুষ ছিলেন বহু ভাষাবিদ এবং সাহিত্যকর্মী। আরবি, ফার্সি, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর ছিলো সমান দক্ষতা। সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁর বেশ দখল ছিলো। তাছাড়া বাংলা, আরবি, উর্দু ভাষায় তাঁর অনেক কবিতা রয়েছে। আরবি ভাষায় রচিত তাঁর কাসীদাসমূহ বাংলাদেশে সৌদি আরবের প্রথম রাষ্ট্রদূত ও সৌদি আরবের সাবেক তৈলমন্ত্রী শাইখ যাকী ইয়ামানীসহ দেশ-বিদেশের কবি সাহিত্যিক, পাঠক ও বিজ্ঞজনের ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত তাঁর একাধিক 'দিওয়ান' এরই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইতোমধ্যে 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ' নামে তাঁর কবিতার প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের এ সকল দুর্লভ পাণ্ডুলিপিসমূহের পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক অনূদিত "শামায়িলে তিরমিযী" তাঁর অনুবাদকর্মসমূহের মধ্যে অবশ্যই এক অনন্যধর্মী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এদেশের প্রখ্যাত ওলামা-মাশায়েখ, সাধারণ শিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিত সকল স্তরের মুসলমানের কাছে তা সমাদৃত হয়েছে বলে জানা যায়। বাংলা ভাষায় 'শামায়িলে তিরমিযী'র অভাব ছিলো বহুদিনের। এ অভাব পূরণে সফলভাবে কেউ এগিয়ে আসেননি। তাই বাংলার মুসলিম সমাজ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন দিক, চরিত্র মাধুর্য ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল বলা যায়। যার ফলে তারা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে ছিলো আঁধারে। তাঁর আদর্শ এ দেশের সাধারণ পাঠকের কাছে ছিলো অজ্ঞাত।

মুসলিম সমাজ যখন ক্রমান্বয়ে বিদআতের দিকে ধাবিত হতে লাগলো এবং সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখন তিনি মুসলমানদেরকে বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করার জন্যে এ কাজে হাত দেন। কিভাবে মুসলমানদের মধ্যে মহানবী (সা.)-এর সুন্নতি জীবন-ধারা চির উজ্জীবিত করা যায়, কিভাবে রাসুল (সা.)-এর মুহাব্বতের নামে প্রচলিত কুসংস্কারসমূহ দূর করা যায় তারই সফল প্রয়াস হিসেবে ইলমে দ্বীনের শিক্ষাদানরত অবস্থায় ১৯৬০ সালে তিনি গ্রন্থখানি অনুবাদে ব্রতী হন। গ্রন্থটি অনুবাদের মাধ্যমে তিনি এ দেশের মুসলিম সমাজ ও জাতির মধ্যে মহানবী (সা.)-এর মহান ও কালজয়ী বিশ্ব আদর্শ বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন। মুসলিম জাতিকে বিজাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির অনুসরণ-অনুকরণ থেকে ফিরিয়ে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি। তাঁর এ অনুবাদের ফলে বিংশ শতাব্দীর আত্মবিস্মৃত মুসলিম জাতি আবার মহানবী (সা.)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত

হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। অনূদিত এ গ্রন্থখানির মাধ্যমে জাতি সাধকসিদ্ধ পথের সন্ধান লাভ করছে দেখলে তাঁর মহান আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করবে। জাতি আজ আমল-আখলাক, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র সবকিছু নতুন করে ঢেলে সাজানোর সুযোগ পেয়েছে।

বাংলা ভাষায় তখন সিরাত গ্রন্থও ছিলো বিরল। আর যা ছিলো তার মাধ্যমে সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া কঠিন ব্যাপার ছিলো। এমন এক পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.)-এর আদর্শকে এদেশে চির জাগরুক রাখার জন্য এ গ্রন্থের অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন "শামায়িলে তিরমিযী' গ্রন্থের অনুবাদ একজন মুসলমানের কাছে থাকলে "উসওয়ায়ে হাসানার" অনুসারী হওয়া খুবই সহজ কাজ হবে। কেননা, "শামায়িলে তিরমিযী" গ্রন্থে আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের অকল্পনীয় ব্যাপকতা, খুঁটিনাটি বিষয়ের সুক্ষ্ম ও সুবিস্তৃত বর্ণনা দেখতে পাই, যা তাঁর উসওয়ায়ে হাসানার উত্তম রূপায়নস্বরূপ স্বীকৃত। উক্ত গ্রন্থে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা মহানবীর (সা.) মানবীয় সকল গুণাবলির চূড়ান্ত বিকাশ। তাঁর অপূর্ব দৈহিক প্রকৃতি, তাঁর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শোভা-সৌন্দর্য, তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা, মানুষের প্রতি আন্তরিকতা ও মানবসেবা প্রভৃতির সু-সমাবেশ ঘটেছে এ শামায়িল বা চাল-চরিত্ররূপী গ্রন্থে। যা প্রতিটি মুসলমানের জন্যে জানা এবং অনুসরণ করা অপরিহার্য। আর সে কাজটিই সম্পন্ন করেন আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)। তাই অনুবাদ গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। আল্লামা ফজলুল্লাহর অন্য সকল কীর্তি বাদ দিলেও এই একটি কাজের জন্যে জাতি তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে চিরদিন।

মহানবী (সা.)-এর রেখে যাওয়া কালজয়ী ও বিশ্বনন্দিত আদর্শসমূহ যাতে প্রতিটি বাংলাভাষী মুসলমানের আয়ত্বে আসতে পারে এবং প্রত্যেকটি আদর্শ যাতে হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর বাস্তব নমুনা হতে পারে এ গ্রন্থের অনুবাদ তারই প্রয়াস মাত্র। মহানবী হযরত মুহাম্মদকে (সা.) একজন ব্যক্তি তাঁর স্বভাব চরিত্রে, আচার-আচরণে প্রতিবিম্বিত করার এক বিশেষ মাধ্যম হল শামায়িলে তিরমিযী গ্রন্থের অনুবাদ।

প্রতিটি রাসুলপ্রেমিক মানুষ যাতে তাঁর বাহ্যিক প্রতিকৃতি, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, চাল-চলন সর্বোপরি তাঁর জীবনযাপন প্রণালী ভালোভাবে জেনে-বুঝে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে নিজ মানসপটে অঙ্কিত করে সত্যিকার আদর্শ মানবে রূপান্তরিত হতে পারে এ অনুবাদগ্রন্থে অনুরূপ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার মৌলিক বিষয়সমূহ বর্তমান।

শামায়িলে তিরমিযী আরবি ভাষায় রচিত। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এ গ্রন্থের সফল বাংলা অনুবাদক। গ্রন্থটি ৫৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। যার মধ্যে মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন দিক সম্বলিত ৪০০টি হাদিস স্থান পেয়েছে। ৫৬টি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ প্রতিটি হাদিসের সরল অনুবাদ করেছেন তিনি। কঠিন কঠিন শব্দ ও বিষয়সমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন তিনি এ গ্রন্থটিতে।

যা না জানলে কোন মুসলমানের পক্ষে রাসুল (সা.)-এর অনুসারী হওয়া মোটেও সহজ নয়। তাছাড়া হাদিসের আলোকে প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করেছেন গ্রন্থখানিতে। তাই পাঠক একই সময়ে হাদিসের অনুবাদ, কঠিন কঠিন শব্দ ও বিষয়ের ব্যাখ্যা এবং হাদিসের

প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে সহজে তা ব্যক্তিজীবনে বাস্তবায়নে সক্ষম হবেন। বাংলা ভাষা-ভাষী সমাজে রাসুল (সা.) সম্পর্কে অজ্ঞতা, দীনতা ও কুসংস্কার দূর করাই মূলতঃ গ্রন্থটি অনুবাদের উদ্দেশ্য। তিনি এ গ্রন্থখানি সফলভাবে অনুবাদ করে আমাদেরকে তাঁর কাছে চির ঋণী করে রেখেছেন। শামায়িলে তিরমিযী গ্রন্থের অনুবাদে আল্লামা ফজলুল্লাহর আরবি ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় তাঁর এ অনুবাদ অত্যন্ত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হয়েছে। ভাষার অলংকার, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের কারণে এ অনুবাদগ্রন্থটিও প্রাক-সাহিত্যিক মূল্য লাভ করেছে। তাঁর অনুবাদের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা বা জড়তা নেই। প্রবচন ও শব্দসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনূদিত বিষয়ের তাৎপর্য এবং অর্থ বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। অনুবাদের কোন কোন শব্দে মূল আরবিই রয়ে গেছে। এতে এক ভাষার শব্দ আরেক ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে উভয় ভাষার গূঢ়ার্থ প্রকাশ পেয়েছে এবং অনুবাদের ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে বলা যায়। ফলে অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠকের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছে বলে মনে হয়। সাধারণ শিক্ষিত মুসলমান এ গ্রন্থ পাঠ করে খুব সহজে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। এটা অনুবাদকের এক বিশেষ সফলতা বলা যায়। অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি এমন অনুবাদ অর্থ ব্যবহার করেছেন যা পাঠ করলে মনে হয় একজন পাঠক যেনো মূল গ্রন্থটি পাঠ করছেন। এমন আমানতদারির সাথে অনুবাদকর্ম বাংলা ভাষায় প্রায় বিরল।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) তাঁর অনুবাদে কখনো সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটাননি। তবে বাক্যে আরবি, উর্দু ও ফার্সি শব্দের সমারোহ ঘটেছে। এতে বাংলা ভাষার সহজবোধ্যতা ও সাবলীলতা ক্ষুণ্ন হয়নি।

অনুবাদের মধ্যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার কিছু উচ্চারণ ভাব লক্ষ্যণীয়। তবে এটা দোষের কিছু নয়। বরং অনুবাদের ভাষা আরো সহজবোধ্য হয়েছে।

নিম্নে তাঁর অনুবাদ সাহিত্যের কিছু অংশ নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করা হলো-

(ক) "রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়ে মহানবী (সা.)-এর ১২নং হাদিসে বর্ণিত "আমি হযরত রাসুলুল্লাহকে (সা.) তাঁর পবিত্র দেহের উপর দু'খানা পুরাতন লুঙ্গি থাকা অবস্থায় দেখেছি।" এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি আরবি শব্দ "তাওয়াদু" ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন হযরত (সা.) এরূপ অতি পুরাতন বস্ত্র تواضع (বিনয়ভাব)-এর কারণেই ব্যবহার করতেন। প্রায়ই তিনি মামুলি পোশাকে থাকতেন। কোন কোন সময় অবশ্য বেশ মূল্যবান পোশাকও ব্যবহার করেছেন। একবার তিনি একজোড়া কাপড় ২৭ উষ্ট্রের পরিবর্তে খরিদ করে ব্যবহার করেন। খোদার দেয়া নেয়ামতের সদ্ব্যবহার ও শোকরগুজারি করাও মানবের কর্তব্য। সঙ্গতিপন্ন লোকের জন্য কার্পণ্যবশতঃ সর্বদা মামুলি পোশাকে থাকাও শরিআতে নিষেধ। তবে উত্তম পোশাক পরিধান করে গর্বিত হওয়া দূষণীয়। তাঁর এ ব্যাখ্যা থেকে বিভিন্ন মাসআলা তিনি উদ্ভাবন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন- ধনী লোকের জন্য কার্পণ্যবশতঃ সর্বদা সাধারণ পোশাক পরিধান করা নিষেধ এবং উত্তম পোশাক পরিধান করে অহংকারী হওয়া দূষণীয়।"

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক অনুবাদকৃত 'শামায়িলে তিরমিযী'র ৩৭তম অধ্যায়ে باب ما جاء فى صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشعر এ তিনি হযরত রাসুল (সা.) যে সমস্ত কবিতা নিজে উল্লেখ করেছেন বা শুনেছেন তার বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে বলেছেন যে, "এ স্থলে দু'একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। আর তা হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.) কবি ছিলেন কি-না? এবং আরবগণের কবিত্ব- এ প্রসঙ্গে তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন যার মাধ্যমে আরবি কবিতা সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য বহন করে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) কবি ছিলেন না। পদ্য রচনার প্রতি তাঁর মনোযোগই ছিলো না। সেদিকে মনোযোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে শ্রেয়ও ছিলো না। তিনি ও তাঁর ভাবধারা এসবের বহু উর্ধ্বে।" আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "আমি তাঁকে পদ্য রচনা শিক্ষা দিই নাই এবং তা তাঁর পক্ষে শ্রেয়ও নহে।" অবশ্য কোনো কোনো সময় তাঁর কোনো কোনো বাক্য পদ্যের মতো হয়ে পড়েছে, তাতে তাকেও কবি বলা যায় না। কাব্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, অনেক সময় অনেক অ-কবির মুখ থেকেও দু'একটা পদ্য হয়তো বেরিয়ে যায়। তাতে তাকে শাস্ত্র মতে কবি বলা যাবে না। কাব্যশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী কোনো বিষয় নিয়ে স্বেচ্ছায় যে ব্যক্তি কাব্য রচনা করে বা করার ক্ষমতা রাখে তাঁকে কবি বা شاعر বলা হয়।"

আরবগণের شاعرى বা কবিত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, "ভাষা বিন্যাস, ভাষার মাধুর্যরস, ছন্দ ও যতি হিসেবে পদ্য ও গদ্য উভয় প্রকার রচনায় আরবি ভাষা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ছিলো। আরবগণ অনারব সকল জাতিকে আজম অর্থাৎ বোবা বলতো। তবে ইসলামের পূর্বে আরব দেশের কাব্যচর্চা এতই জঘন্যরূপ ধারণ করেছিলো যে, এর অধিকাংশ ভাবভাষ্য ইসলামি নীতি অনুসারে বর্জনীয় ছিল। শায়েরির মারফতে বংশ মর্যাদার গর্ব করা, অনুষ্ঠান ও অতিথি সৎকারাদি সম্বন্ধে বাহুল্যমণ্ডিত গল্প সাজানো, সুন্দরীগণের রূপ যৌবনের প্রতি অসঙ্গত আবেদনমূলক ভালোবাসা ও প্রেমের কাহিনী অতি নির্লজ্জভাবে সগর্বে বর্ণনা করা, সুন্দরীদের অন্যান্য প্রেমিকগণকে পরাজিত করতঃ তাদের যৌনবিহার লাভে সমর্থন লাভের বাহাদুরি ব্যাখ্যা করা, কারো সাথে সামান্য মনোমালিন্য ঘটলে তার নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করা-তাও আবার এমনভাবে সত্য, মিথ্যা মিশ্রিত যে, সে সমাজে মুখ দেখাতে না পারে। আবার কারো প্রশংসা করতে লাগলে একেবারে আকাশ-পাতাল সমান করে দেয়া, কাব্যের মারফত দু'গোত্রের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বাধিয়ে দেয়া; মোটের ওপর এসব ছাড়া আর কিছুই ছিলো না বললেই চলে। বাক্য সংযোজন ও ভাষা বিন্যাস হিসেবে যত উঁচু দরের হোক না কেন, মর্ম ও ভাষা হিসেবে একেবারে সভ্যতা বহির্ভূত বলতে হয়। হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের পর তিনি যতো অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার ইত্যাদি পদদলিত করেছিলেন, ইসলামে দীক্ষিত হয়ে আরবগণ সত্যিকার মানবে পরিণত হয়ে তাহযিব-তামাদ্দুন, সভ্যতা ও মানবতা সহযোগে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ভিতর পূর্বোল্লেখিত উলঙ্গ কবিগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ ইসলামোত্তর কবিত্বের ভিতর তাওহিদ, খোদাপ্রেম, তাসাউফ, শরিআত, তরিকত, হাকিকত, মারফত ইত্যাদি বর্ণনা, আল্লাহর প্রশংসা, রসূল (সা.)-এর না'ত, বুযর্গানে দ্বীনের ফযিলত আরও বহু প্রকার পবিত্র বিষয়াদি প্রবিষ্ট হয়ে আরবি ভাষা ও কাব্যকে বিশ্বজোড়া যশ ও মর্যাদা দান করেছে।"

২. কাশ্‌ফুল জালালাইন (উর্দু):

ষাট দশকের শুরুতে মাদরাসার ফাযিল শ্রেণির উপযোগী জালালাইন শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ উর্দু ভাষায় কাশ্‌ফুল জালালাইন (তাফসিরে জালালাইনের ব্যখ্যাগ্রন্থ) নামে যে গ্রন্থটি তিনি রচনা করেন তা মাদরাসা শিক্ষার্থীদের নিকট ছিল অত্যন্ত প্রিয় ও আকর্ষণীয়। সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা হাবীবুল্লাহ সাহেবের অনুরোধে তিনি এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত হাবীবিয়া লাইব্রেরি সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত হয় এর প্রথম সংস্করণ। শেখ গোলাম আলী এন্ড সন্স, কাশ্মীরি বাজার, লাহোর পাকিস্তান এবং হাবিবিয়া লাইব্রেরি সাতকানিয়া চট্টগ্রাম এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় সংস্করণ।

ইসাগুজি (মানতিক, উর্দু): ষাটের দশকের শুরুতে আলিম-ফাযিল শ্রেণির উপযোগী ইসাগুজি গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ করেন অধ্যক্ষ মাওলানা হাবীবুল্লাহর অনুরোধে। কাশফুল জালালাইনের সাথে এটিও হাবীবিয়া লাইব্রেরি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম হতে ১ম প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ খৃস্টাব্দে উক্ত দুটি গ্রন্থ হাবীবিয়া লাইব্রেরি এবং শেখ গোলাম আলী এন্ড সন্স, কাশ্মীরি বাজার লাহোর, পাকিস্তান এর যৌথ উদ্যোগে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৩. ইতিহাসখ্যাত কসিদা বুরদার স্বার্থক অনুবাদ

ইমাম সালেহ মুশাররফ উদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন হাস্‌সান বুসীরী (রহ.) কর্তৃক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শানে রচিত প্রশংসাগীতি 'আল কাসিদাতুল বুরদাহ' এর স্বার্থক বঙ্গানুবাদ করেছেন আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)। কসিদা গাউছিয়া, দু'আয়ে সুরয়ানী ও হিযবুল বাহারের বাংলা তরজমাও রয়েছে এর সাথে সংযুক্ত। অনুবাদ গ্রন্থটি এতো পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে যে, ১৯৬৫, ১৯৭৭ এবং ১৯৯৩ সালে এর তিনটি সংস্করণ বের হয় ইসলামিয়া লাইব্রেরি আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম হতে। অনুবাদক গ্রন্থটিকে ১০টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেন। গ্রন্থের শুরুতেই অনুবাদক কসিদা বুরদার পরিচয়, ইতিহাস, মর্যাদা তাছীর ও তা পাঠের নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন। আরবি কবিতার অনুবাদ ইচ্ছে করলে তিনি বাংলা কবিতা দিয়ে করতে পারতেন। কারণ তাঁর কাব্যপ্রতিভাও ছিলো প্রখর কিন্তু আরবি কবিতার গদ্য অনুবাদ করেছেন তিনি, প্রয়োজনে বন্ধনীর ভেতরে বিষয়কে ব্যাখ্যা করেছেন। আসলে কবিতার অনুবাদ কবিতা দিয়ে করলে অনেক সময় মূল কবিতার সুর, স্বাদ, বিষয়বস্তু স্পষ্ট আঙ্গিকে ফুটে ওঠে না। এজন্য আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ইকবালের নির্বাচিত কাব্যের অনুবাদ করতে গিয়ে 'নুকুশে ইকবাল' এ মূল উর্দু ও ফার্সি কবিতার অনুবাদ ব্যাখ্যা করে গদ্যে বিশ্লেষণ করেছেন। দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক কবি মাওলানা রুহুল আমিন কসিদা বুরদাহ এর কাব্যিক অনুবাদ পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) গদ্যানুবাদের ২৫ বছর পর এটা কবি রুহুল আমীনের কাব্যানুবাদ। 'বঙ্গানুবাদ কসিদা বুরদাহ' (৪র্থ সংস্করণ) জানুয়ারি ২০১৮ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়।

কসিদা বুরদা, কসিদা গাউছিয়া, দু'আয়ে সুরয়ানি ও হিযবুল বাহারের প্রেক্ষাপট

* কসিদা বুরদা

এই বরকতময় কসিদার আসল নাম 'আল কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ ফি মনাকিবি খাইরিল-বারিয়্যাহ'। তবে এর প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে আল কসিদাতুল বুরদা বা কসিদা বুরদা। এই কসিদার রচয়িতা হলেন. হযরত ইমাম সালেহ মুশাররফ উদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন হাসান বুসীরী (রহ.)। এতে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসা বর্ণনা করেছেন। তিনি হুজুর (সা.)-এর নাত বিষয়ক আরো একাধিক কবিতা লিখেছেন। তবে এ কসিদা রচনার ছিলো একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট। এক সময় তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর শরীরের নিম্নঅর্ধাংশ অসাড় হয়ে যায় এবং তিনি অচল ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। বহু চিকিৎসার পর নিরাশ হয়ে তিনি ইচ্ছে করলেন নবী করিম হযরত মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশংসায় একখানা কসিদা লিখে তাঁর ওসিলায় আল্লাহ জাল্লাশানুহুর দরবারে এ যন্ত্রণা হতে মুক্তিলাভের দরখাস্ত করবেন। তিনি এ কসিদা লিখে শুক্রবার রাতে এক খালি ঘরে পূর্ণ ভক্তি, মুহাব্বত ও মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করতে আরম্ভ করেন। পড়তে-পড়তে কোন মুহূর্তে নিদ্রা এসে তাঁকে আচ্ছন্ন করল তা তিনি টেরও পেলেন না। সে সময় স্বপ্নে রাসুলে মাকবুল (সা.) এর দীদার (দর্শন) হাসিল হয়। তিনি সবিনয়ে শিফা লাভের দু'আর জন্যে নিবেদন করলে হুজুর রাহমাতুল লিল আলামিন (সা.) তাঁর দেহের রোগাক্রান্ত অংশে তাঁর পবিত্র হাত মুবারক বুলিয়ে দেন। ভোরে নিদ্রা ভঙ্গের পর বিছানা হতে উঠে দাঁড়ালেন সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে। এটি হচ্ছে এ কসিদার প্রথম জ্বলন্ত কারামত।

সকালে তিনি বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে হঠাৎ এক দরবেশ এসে সালাম দিয়ে বললেন- আমি আপনার সেই কসিদা শুনতে চাই যা আপনি হুজুর (সা.) এর প্রশংসায় লিখেছেন। তিনি বললেন আমি এ বিষয়ে একাধিক কসিদা লিখেছি আপনি কোনটির কথা বলছেন? দরবেশ বললেন, যেটির প্রারম্ভে (امن تذكر جيران) আছে সেটির কথা বলছি। ইমাম বুসীরী (রহ.) আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন– আল্লাহর কসম আমি এ কসিদা এ যাবত কাউকে দেইনি। আপনি কিভাবে অবগত হলেন? দরবেশ বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি গত রাতে যখন হুজুর (সা.)-কে শুনাচ্ছিলেন সে সময় আমি শ্রবণ করেছি। জানা গেল যে, আল্লাহপাক এ কসিদা কবুল করে স্বীয় খাস বান্দাদের মধ্যে প্রচারিত করেন। এটি হচ্ছে এ কসিদার দ্বিতীয় কারামত। এ ঘটনা জানাজানি হলে এই কসিদা সারা ইসলামি জগতে পরিচিত হয় এবং তার হাজার হাজার কারামত ও বরকত প্রকাশ পায়।

মালিক তাহিরের উযির বাহাউদ্দিন এ কসিদা খোলা মস্তক, খোলা পায়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় শুনতেন। তাঁর নায়েব সা'দুদ্দিনের চোখ নষ্ট হয়েছিলো। এ কসিদা চোখে লাগিয়ে রাখা মাত্রই তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

* কসিদা গাউসিয়া:

এ মুবারক কসিদা হযরত কুতুবে রব্বানি মাহবুবে সুবহানি শেখ সাইয়িদ আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদির জিলানি কুদ্দিসা সিররাহুর যবান হতে এমন অবস্থায় উচ্চারিত হয়েছিলো যখন এ নশ্বর জগতের সাথে তাঁর অন্তরের সংশ্রব ছিলো না। তিনি তখন অনাদি, অনন্ত মাহবুবের নৈকট্যে কলবের মধ্যে জ্যোতি ও আহওয়ালের অবর্ণনীয় অবস্থায় ডুবে ছিলেন। স্বীয় অস্তিত্বকে অনন্ত অসীম সৌন্দর্য জ্যোতি বা নুরের সন্নিধানে বারবার ফানা (নিশ্চিহ্ন) করে বকা (স্থিতি)-এর উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সারা বিশ্বকে রাই-এর দানা সম দেখতে পাচ্ছিলেন।

এই কসিদার মধ্যে তিনি তাঁর ভক্ত ও মুরীদানকে সাহসিকতা ও প্রেরণার সাথে মারেফাতের পথিক হওয়ার জন্যে এবং শয়তানের ভয়ে ভীত না হওয়ার কথা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন।

* দু'আয়ে সুরয়ানি

বর্ণিত আছে- আসমানি কিতাব যাবূরে আযমের মধ্যে একটি সুরা আছে আমাদের কুরআনে পাকের সুরা আর রহমান শরিফের মতো। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে সময় সে সুরা সম্পর্কে আলোচনা করতেন তখন সাজদা করতেন। হযরত (সা.) সুরয়ানি ভাষার সুরাটি আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। সকলে যাতে বরকত হাসিল করতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তা আরবি পদ্যে রচনা করেন। এরূপ বর্ণিত আছে যে, একটা পাথরের গম্বুজ প্রকাশ পেয়েছিলো, তার ওপর এই দু'আ খোদিত ছিলো।

* হিযবুল বাহার

এ দু'আ আল্লাহপাকের পক্ষ হতে কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ আবুল হাসান শাযলী (রহ.) এর প্রতি ইলহাম হয়। পরবর্তীকালে তরিকতের মুরশিদ পীর-মশায়েখ তাঁদের মুরিদান ও ভক্তগণকে বহুবিধ বরকত হাসিলের উদ্দেশ্য এ দু'আ নির্ধারিত বিশেষ নিয়ম প্রণালি মতে প্রত্যহ অযীফাস্বরূপ পাঠ করার ইজাযত (অনুমতি) দিয়ে এসেছেন। বাংলাভাষী ভাইদের সুবিধার্থে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এ দু'আ বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন। আমিন!

৪. বঙ্গানুবাদ গুলজারে সুন্নাত

এটি ইসলামিয়া লাইব্রেরি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। দারুল উলুম দেওবন্দের মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মিয়া আসগর হোসাইন (রহ.) কর্তৃক উর্দু ভাষায় লিখিত "গুলজারে সুন্নাত"-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)। ২৪ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকায় আটটি অধ্যায় রয়েছে, যা একজন মুসলমান দৈনন্দিন জীবনে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে মহানবীর (সা.) সুন্নাত বা আদর্শ অনুযায়ী পারেন এ পুস্তিকাটি তার জন্যে

পথ নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে। নিদ্রা যাওয়া, নিদ্রা থেকে জাগরণ, পানাহার, পানপাত্র, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, চুল, দাঁড়ি, গোঁফ, বিয়ে-শাদি, মুসাফিরী, রোগ-বালাই, শোক, ঔষধ, চিকিৎসা, মৃত্যু চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে রাসুলুল্লাহর (সা.) হুকুম ও আদর্শের বিবরণী রয়েছে এ ছোট্ট পুস্তিকায়।

(৫) বঙ্গানুবাদ 'শিকওয়াহ ওয়া জওয়াবে শিকওয়াহ'

ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ "শিকওয়াহ ওয়া জওয়াবে শিকওয়াহ"-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন অনেকে কাব্যাকারে। বিশেষত চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মাওলানা তমিজুর রহমানের কাব্যানুবাদে ইকবালের কবিতার ঝংকার, ছন্দ, অন্ত্যমিল, দ্যোতনা স্পষ্ট লক্ষ্যণীয়। মরহুম আল্লামা ইকবালের অনুমতিক্রমে তিনি এর অনুবাদ করেন। ড. আল্লামা ইকবালের "শিকওয়াহ ওয়া জওয়াবে শিকওয়াহ" এর প্রতিটি ছন্দের সাথে ইতিহাসের ঘটনা জড়িত। ব্যাখ্যা ছাড়া কেবল কাব্যানুবাদে শিকওয়াহর নির্গলিতার্থ এর পাঠোদ্ধার করা সাধারণ পাঠকদের জন্য অনেকটা কঠিন। এক্ষেত্রে আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) এর গদ্যানুবাদ ব্যাখ্যা সম্বলিত হওয়ায় 'শিকওয়াহ ওয়া জওয়াবে শিকওয়াহ'র মর্মার্থ পাঠকদের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছে অনায়াসে।

(৬) বঙ্গানুবাদ 'ইসলাম কা ইকতিসাদী নিযাম'

অর্থনীতি বিষয়ক এ গ্রন্থটি কওমি মাদরাসায় সিলেবাসভুক্ত হওয়ায় এর অনুবাদ কর্মটি সমাদৃত হয় ব্যাপকভাবে। হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারভী (রহ.) কর্তৃক ১৯৩৮ সালে লিখিত অর্থনীতি বিষয়ক উর্দু গ্রন্থের বাংলায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষান্তর করেন আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)। গ্রন্থটি ছাত্র-শিক্ষক সকলের নিকট সমানভাবে সমাদৃত। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) পূর্বে এ গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় আর কেউ অনুবাদ করেননি। প্রায় ২০ বছর পর ১৯৮২ সালে এ গ্রন্থটি মাওলানা আবদুল আউয়াল কর্তৃক অনূদিত হয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, এই বইটির অনুবাদের জন্যে খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক সাহেব (রহ.) জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম জদিদকে উর্দু কপিসহ চুনতি মাদরাসায় আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) কাছে পাঠিয়েছিলেন। হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম জদিদ সাহেব আল্লামা ফজলুল্লাহর পুত্র এবং তাঁর ছাত্র ড. আবু রেজা নদভী এমপিকে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

(৭) আদ্-দুরুসুস সারফিয়াহ (উর্দু) [মৌলিক গ্রন্থ]

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এ গ্রন্থটি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় সহজবোধ্য করে রচনা করেন। বইটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে রচিত। কিশোর ছাত্রদের জন্যে রচিত এ বইটি প্রচলিত বইগুলো থেকে একেবারেই ভিন্ন। লেখক তাঁর বইটিকে তিনটি খণ্ডে ভাগ করেছেন। প্রথম খণ্ডে

তিনি ২৯টি পাঠ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ খণ্ডে মূলত ক্রিয়া (فعل) এর প্রকারভেদ, রূপান্তর ও মূল উৎস থেকে নির্গত শব্দ (مشتقات) এর রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডকে ৩১টি ভাগে ভাগ করেছেন। সেখানে ক্রিয়া পদের বিভিন্ন ধাঁচ (باب) সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ক্রিয়ার অতীত কালের প্রকার বর্তমান কালকে 'হ্যাঁ' বোধক তাকীদ অথবা 'না' বোধক তাকীদ বুঝানোর বিভিন্ন রূপান্তরক্রম ইত্যাদি। তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়ার উৎসস্থল (مصدر) রূপান্তরহীন বিশেষ্য (اسم جامد) এর মাপকাঠি ও স্ত্রীবাচক (مؤنث) শব্দের চিহ্ন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডের মূল আলোচনা স্বরবর্ণ (حروف العلة) ও হামজা অক্ষর (الإعلال) দিয়ে গঠিত বর্ণের পারস্পরিক পরিবর্তন ও স্থলাভিষিক্ত হওয়া (الإعلال) ও বিভিন্নভাবে এ ক্রিয়াগুলোর রূপান্তর, বিভিন্ন ধাঁচের ক্রিয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য, মূল উৎস থেকে নির্গত কয়েক প্রকার শব্দ (مشتقات) এর দ্বি-বচন ও বহুবচনের নিয়ম পদ্ধতি প্রভৃতি। বইটির তিন খণ্ডই ইসলামিয়া লাইব্রেরি চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত হয়।

* আলোচ্য গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

সহজবোধ : সমসাময়িককালে যেসব পাঠ্য বই সরফের জন্যে নির্ধারিত ছিলো তা হয়ত ফার্সিতে অথবা মূল ফার্সি গ্রন্থ থেকে অনুবাদ। যা ছিলো ছাত্র, এমনকি শিক্ষকদের জন্যেও কিছুটা দুর্বোধ্য। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) একই বিষয়কে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় প্রত্যক্ষ উপায়ে নিজের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করায় তা সকলের নিকট সহজবোধ্য হয়েছে।

আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার : একেবারে আধুনিক নিয়মে উদাহরণকে ব্যাখ্যা করে সম্মানিত লেখক তা থেকে 'মূল নিয়ম পদ্ধতি' (قاعدة) চয়ন করেছেন। সনাতন হরফের বইগুলোতে প্রথমে নিয়ম-পদ্ধতি উল্লেখ করে পরে উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। কায়দার ব্যাখ্যা সেখানে গৌণ বলে বিবেচিত হয়। 'ইলমুস সিগাহ' বইয়ের 'পদবিন্যাস ও 'ফুছুলি আকবরী' বইয়ের 'আরবি পদসমূহ' অধ্যায় দু'টিকে আলোচ্য আদ-দুরুসুস সরফিয়ার প্রথম পাঠকে তুলনা করলে এ বাস্তবতা ধরা পড়ে। পক্ষান্তরে প্রথমেই যদি উদাহরণকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে ব্যাখ্যার মাধ্যমে যেগুলোর আলোকে 'নিয়ম পদ্ধতি' চয়ন করা হয় তা হলে তা একজন ছাত্রের নিকট বুঝতে যেমনতর সহজ হয় তেমনি তা স্মৃতিতে ধারণ করা তার পক্ষে কঠিন হয় না। পাশ্চাত্যে ভাষাগুলোর ব্যাকরণ পড়ার এ আধুনিক পদ্ধতি অনেক পূর্ব থেকে অনুসৃত হলেও আরবি ভাষার ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষ করে আমাদের দেশে আল্লামা ফজলুল্লাহই (রহ.) সর্বপ্রথম সূত্রপাত করেছেন।

এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে পটিয়া জামেয়া ইসলামিয়ার প্রাক্তন শায়খুল হাদিস খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) বলেন,

کتاب مستطاب الدروس الصرفیہ ماشاَ اللہ نونہال بچوں کو اپنی مادری زبان سے تطبیق دے کر مسائل صرفیہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس لئے یہ کتاب بنگالی بچوں کے حق میں انتہائی مفید ہونے کی توقع ہے۔حق تعالی بچوں کے لئے مفید اور مصنف علام کے لئے ذخیرۂ آخرت بنائے۔

"আদ্ দুরুস্ সারফীয়াহ" শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থটিতে মাশাআল্লাহ মাতৃভাষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কচি-কাঁচাদের আরবি ভাষার বাক্য গঠন ও শব্দ প্রকরণ সম্পর্কিত সূত্রগুলো সহজভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ কারণে বাঙালি শিশু শিক্ষার্থীদের জন্যে এ গ্রন্থটি অশেষ কল্যাণ বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়। মহান আল্লাহ এ গ্রন্থটিকে শিশু-কিশোরদের জন্যে কল্যাণকর এবং বিজ্ঞ আল্লামা গ্রন্থকারের জন্যে পরকালীন নাজাতের পুঁজি হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

(৯) আল ইনসাফ (বাংলা) (মৌলিক গ্রন্থ)

(১০) আসান উর্দু তালীম (উর্দু) (মৌলিক গ্রন্থ)

(১১) উর্দু পাক গ্রামার (উর্দু) (মৌলিক গ্রন্থ)

(১২) ইয়াদে মুহসিন (উর্দু) (মৌলিক গ্রন্থ)

(১৩) কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ (মৌলিক কাব্যগ্রন্থ) (উর্দু, আরবি, ফার্সি ও বাংলা কাব্যগ্রন্থ)। এটি ২০২০ খৃস্টাব্দে আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন প্রকাশ করে।

অপ্রকাশিত:

(১) যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম (বাংলা) (মৌলিক গ্রন্থ)

যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থটি তিনি জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি আল্লামা আযীযুল হকের (রহ.) অনুরোধে রচনা করেছিলেন। প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি তিনি দু'খণ্ডে রচনা করেন। গোটা পাণ্ডুলিপিটি পূর্বে জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী প্রকাশনার উদ্দেশ্যে নিয়ে যান এবং ১ম খণ্ড হারিয়ে ফেলেন। বিষয়টি আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) কাছ থেকে ইন্তেকালের আগে জেনে তাঁরই ছাত্র রেডিও তেহরানের সাবেক সংবাদ পাঠক ড. মাওলানা ঈসা শাহেদী ২য় খণ্ডটি নিয়ে সযত্নে রেখে দেন। পরে ইরান থেকে দেশে ফিরে আসলে তিনি আল্লামার কনিষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক ড. হোছামুদ্দিনের হাতে তুলে দেন। প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠার এ পাণ্ডুলিপিকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ে বিভক্ত করে ইসলামকে যুক্তি ও বুদ্ধির নিরিখে বিশ্লেষণ করেছেন। আধুনিক শিক্ষিতদের মনে বিভিন্ন সময়ে পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার প্রভাবে ইসলাম সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উদ্রেক হয় যা অনেক সময় মানুষকে বিভ্রান্ত ও ধর্ম বিমুখ করে তোলে।

যুগে-যুগে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম উদ্ভূত এসব প্রশ্নের যৌক্তিক জবাব দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) যেমন "আহকামুল ইসলাম আকল কি নযর মেঁ" লিখে হিন্দুস্তানের তথাকথিত প্রগতিবাদের জবাব দিয়েছেন

তেমনি বাংলাদেশে এ খিদমত আনজাম দেন তাঁরই হাতে বায়আত গ্রহণকারী আধ্যাত্মিক শিষ্য আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি দ্বীন-দুনিয়া, আদর্শ জীবনরক্ষার ব্যবস্থা, আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর একত্ব, পৃথিবীতে নবী ও রাসুলের আবির্ভাবের কারণ, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, চোরের হাত কাটা, যবেহ ও বলিদান প্রথা, পর্দা, তালাক, বিয়ে, সুগন্ধির ব্যবহার, খতনা, যিনা-ব্যভিচারের শাস্তি, দেনমোহর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সৃষ্ট সব জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন যুক্তির কষ্টিপাথরে।

(২) জামে তিরমিযীর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (الدُّرُّ البهي فى شرح الجامع للإمام الترمذى) (উর্দু)

এটি প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার পাণ্ডলিপি। সিহাহ সিত্তার অন্যতম হাদিস গ্রন্থ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযীর "আল-জামে" এর উর্দু ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) রীতিমতো দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাহারাত থেকে ফাওয়ায়েদে মিসওয়াক পর্যন্ত ৮০০ পৃষ্ঠার এ পাণ্ডুলিপি পড়লে অনুবাদকের ইলমের গভীরতা, অনন্য পাণ্ডিত্য ও হাদিসশাস্ত্রে তাঁর আগাধ প্রজ্ঞা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। গ্রন্থটির মুকাদ্দিমা ইলমে হাদিস শীর্ষক ভূমিকায় বিজ্ঞ অনুবাদক হাদিসের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, পরিধি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, হাদিস অমান্যকারীদের যুক্তির জবাব, খলিফা উমর ইব্‌ন আবদুল আজিজের সময়ে হাদিস সংকলনের ধারা বিবরণী, হাদিসের ইতিহাস, সাহাবায়ে কিরামের সাতটি স্তর (তাবকাত) হাদিসের গ্রন্থাবলির স্তর (তাবকাত) জাল হাদিস প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের যেভাবে আলোচনা করেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর ও তথ্যবহুল।

(৩) মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা

মাদরাসার মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে তিনি 'মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা' শীর্ষক ৩৪ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন, এতে তিনি বলেন- ছাত্রদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে একজন মানুষ খাঁটি মুসলমান হিসেবে তৈরি হতে পারে, মুসলমানি জিন্দেগি যাপন করতে পারে; রাসুলুল্লাহর (সা.) অবর্তমানে অন্যদের খাঁটি মুসলমান বানাতে পারে, মুসলমানরূপে জিন্দেগি কাটাতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে; রাসুলুল্লাহর (সা.) আদর্শকে উজ্জীবিত করতে পারে এবং ইসলামের ওপর মুসলমানদের অটল ও স্থির রাখতে পারে। ইসলামি শিক্ষা তথা রাসুলুল্লাহর (সা.) আদর্শ ও শিক্ষার বিস্ময়কর ফলাফলের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেন তাতে উর্দু গদ্য সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে:

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم (اسلامی تعلیم) نے روئے زمین پر ایک متلاطم انقلاب پیدا کیا ہے اور ایسی ایک قوم اس نے تیار کی جس نے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اخلاق اور اسوۂ رسول کو لائحہ عمل بنا کر اسلامی زندگی کا نمونہ اہل علم کے سامنے پیش کیا ہے - اسلامی زندگی کی سربراہی کیلئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدائی حکومت قائم کی اور اسکے آئین و قوانین کو قرآن وسنت کی صورت میں پیش فرمایا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وتربیت نے جس قوم کو پیدا کیا تھا وہ کن صفات سے آراستہ تھی - اخلاص وعبادت ' سیاست ونظام مملکت ' قوت وجذبات ' اعلائے کلمتہ اللہ بلسان وقلم وسیف علم اس قوم کی فطرت و طینت بنگئی تھی ' طاعت وطاقت دونوں انہوں نے حاصل کیں ' نافرمان قوتیں ان سے ٹکرائیں اور پاش پاش ہو کر ناپید ہو گئیں -

'রাসুলুল্লাহর (সা.) শিক্ষা (ইসলামি শিক্ষা) দুনিয়ায় এক তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে; শিক্ষা এমন এক জাতি তৈরি করেছে যাঁরা রাসুলের চরিত্রকে নিজেদের চরিত্ররূপে এবং রাসুলের আদর্শকে নিজেদের কর্মপদ্ধতিরূপে গ্রহণ করে ইসলামি জীবনব্যবস্থার নমুনা আহলে ইলমদের সামনে পেশ করেছেন। ইসলামি জীবনের নেতৃত্বের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর যে হুকুমত কায়েম করেন তাঁর আইন ও বিধিমালা ছিলো কুরআন ও সুন্নাহর অবয়বে; রাসুলুল্লাহর (সা.) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দ্বারা যে জাতি তৈরি করেন তাঁদের গুণাবলি কি ছিলো? নিষ্ঠা, ইবাদত, রাজনীতি, সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থা, শক্তি ও উদ্দীপনা ছিলো তাঁদের প্রাণশক্তি। কলম ও যবানে, তরবারি ও জ্ঞানে আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিলো এ জাতির স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। শক্তিমত্তা ও আনুগত্য দুটোই তাঁরা অর্জন করেন। বাতিল ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি তাদের সাথে লড়েছে এবং টুকরো টুকরো হয়ে হারিয়ে গেছে তাঁদের অস্তিত্ব।'

(৪) আদ-দুরুসুন নাহভিয়্যাহ الدروس النحوية (মৌলিক গ্রন্থ)

এটি এখনো ছাপা হয়নি। পাণ্ডুলিপিটি উর্দু ভাষাতেই লেখা। এই পাণ্ডুলিপি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড টিতে ৫৭টি পৃষ্ঠা রয়েছে। এটি ৩৫ পাঠে বিভক্ত। প্রথমপাঠে একক ও যৌগিক (مفرد ومركب)-এর প্রেক্ষাপটে আরবি শব্দের প্রকারভেদ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠে বাক্যের প্রকার; চতুর্থ পাঠে অসম্পূর্ণ যৌগিক শব্দ; (مركب غير مفيد) পঞ্চম পাঠে বিভিন্ন পদের চিহ্ন; ষষ্ঠ হতে দ্বাদশ ও ষষ্ঠদশ হতে অষ্টাদশ পাঠসমূহে শেষচিহ্ন পরিবর্তনশীল শব্দ (معرب) ও শেষচিহ্ন অপরিবর্তনশীল শব্দ (مبنى) গুলোর বিস্তারিত প্রকারভেদ; ত্রয়োদশ পাঠে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট বিশেষ্য (معرفه ونكره) চতুর্দশ পাঠে লিঙ্গ (مذكر ومؤنث) পঞ্চদশ পাঠে বচন; ঊনবিংশতি হতে ত্রয়োবিংশ পাঠসমূহে শেষ অক্ষর পেশযুক্ত বিশেষ্যসমূহ (مرفوعات) চতুর্বিংশ হতে ত্রিংশ পাঠসমূহে শেষ অক্ষর যবরযুক্ত বিশেষ্যসমূহ (منصوبات) একত্রিংশ পাঠে শেষ অক্ষর যেরযুক্ত বিশেষ্যসমূহ (مجرورات) দ্বাত্রিংশ হতে পঞ্চত্রিংশ পাঠ পর্যন্ত ব্যাখ্যা বিশেষ্য বা অনুগামী (توابع) বিষয়টি স্থান পেয়েছে।

পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় খণ্ডটি ৭৫ পৃষ্ঠার। প্রথম হতে সপ্তম পাঠসমূহে ক্রিয়ার বিস্তারিত প্রকারসমূহ; অষ্টম পাঠে সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া, (فعل متعدى ও فعل لازم) নবম পাঠে 'অন্তরাত্মা সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া; (افعال قلوب) দশম পাঠে অসমাপিকা ক্রিয়া; (أفعال ناقصة) একাদশ পাঠে নৈকট্য জ্ঞাপক ক্রিয়া (أفعال مقاربة); দ্বাদশ পাঠে বিস্ময়সূচক ক্রিয়া, (أفعال تعجب) ত্রয়োদশ পাঠে প্রশংসা ও নিন্দা জ্ঞাপক ক্রিয়া; (أفعال مدح وذم) চতুর্দশ পাঠ হতে অষ্টাদশ পাঠ পর্যন্ত কার্যকর অব্যয়সমূহ (حروف عامله) ঊনবিংশতি হতে ষড়বিংশতি পাঠসমূহ অকার্যকর অব্যয়সমূহ (حروف غير عامله) সপ্তবিংশতি পাঠে সংখ্যাবাচক বিশেষ্যসমূহ (أسماء العدد) অষ্টবিংশতি পাঠে ক্রিয়া বিশেষ্য (مصدر) ঊনত্রিংশৎ পাঠে উপমেয় বিশেষণ; (صفة مشبهة) ত্রিংশৎ পাঠে তুলনামূলক বিশেষ্য اسم تفضيل স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য এ বিষয়গুলিই হচ্ছে আরবি ভাষার বাক্য বিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(৫) কাদিয়ানীবাদ (বাংলা)

এতে কাদিয়ানীবাদ ও কাদিয়ানীদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে।

(৬) ইসলামি ফাতওয়া সমগ্র (আরবি, উর্দু ও বাংলা)

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) অনূদিত 'শামায়িলে তিরমিযী'র আলোচনা

আবু ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী:

(২০৯-২৭৯ হি.-৮২৪-৮৯২ খ্রি.)

যে সকল স্মরণীয় হাদিসবিদ তাঁদের প্রতিভাদীপ্ত জীবন এবং অবদানের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর দিকনির্দেশক ও অনুকরণীয়, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন হাদিসের হাফিজ, বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী, খ্যাতনামা আলোচক, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন, হাদিস সম্পর্কে অভিজ্ঞ, ফিকহশাস্ত্রবিদ এবং বিভিন্ন মতামত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তিনি হাদিস আহরণে তৎকালীন যুগের সমৃদ্ধ স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করে হাদিসের বিরাট সম্ভার গড়ে তোলেন। যুগশ্রেষ্ঠ হাদিসবিদগণ ছিলেন তাঁর শায়খ। ইমাম বুখারি (রহ.) থেকে তিনি যেমন উপকৃত হন, ইমাম বুখারি (রহ.)-ও তাঁর থেকে উপকৃত হন। হাদিসশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ক্ষুরধার লিখনী এবং তাঁর এসব সংকলনে হাদিসশাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অতি উচ্চমানের ইবাদতগুজার ও সংযমী পুরুষ। তাঁর জীবন ও কর্ম এক অনুপম আদর্শ। তাঁর রচিত 'আল-জামি' সকল স্তরের পাঠকের জন্য অতি কল্যাণকর ও সহজবোধ্য গ্রন্থ। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থও প্রসিদ্ধ ও হিতসাধনকারী।

নাম ও বংশ পরিচয়:

ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবু 'ঈসা। তাঁর পিতার নাম 'ঈসা। তাঁর বংশপরিক্রমা হলো: মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরা[১] ইবন মুসা ইবন আয-যাহহাক আস-সুলামি আয-যরির আল-বুগি আত-তিরমিযি।[২]

কেউ কেউ আয-যাহ্হাক নামের স্থলে শাদ্দাদ নাম উল্লেখ করেছেন।[৩]

---

১. سَوْرَةُ শব্দের س বর্ণে যবর, و বর্ণে সুকূন এবং শেষে ة বর্ণ।

২. (ক) ইবন খল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়াআম্বাউ আবনায়িয যামান, খ. ৪, পৃ. ১৯৫, জীবনী: ৬১৩ (১); (খ) শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ. ১৩, পৃ. ২৭০, জীবনী: ১৩২; (গ) জামালুদ্দিন আল-মিযযি। তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল, খ. ২৬, পৃ. ২৫০, জীবনী: ৫৫৩১।

৩. ইবন কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ১১, পৃ. ৭৭

কারো কারো মতে, তাঁর বংশপরিক্রমা হলো: মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ইবন ইয়াযিদ ইবন সাওরা ইবন আস-সাকানি[১] আস-সুলামি[২] আত-তিরমিযী আল-বুগি।[৩]

জন্ম ও জন্মস্থান:

ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২০১ হিজরি মুতাবিক ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে 'তিরমিয' শহরের 'বুগ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৪]

কারো কারো মতে, তিনি ২০০ হিজরি সালে জন্মগ্রহণ করেন।[৫]

শামসুদ্দিন আয-যাহাবি (রহ.) বলেন,

وُلِدَ فِيْ حُدُوْدِ سَنَةِ عَشْرٍ وَّمِائَتَيْنِ.

'তিনি দু'শত দশ হিজরি সালের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।'[৬]

ড. ফুআদ সিযগিনের মতে,

وُلِدَ سَنَةَ ٢١٠هـ = ٨٢٥ م . فِيْ بُوْغٍ مِنْ أَعْمَالِ تِرْمِذِ عَلَى نَهْرِ جَيْحُوْنَ.

'তিনি ২১০ হি./৮২৫ খ্রি. 'জায়হুন' নদীর তীরে তিরমিযের অন্তর্গত 'বুগ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৭]

ড. মুহাম্মদ যুবায়র সিদ্দিকী বলেন,

Abu Isa Muhammad b. Isa was born at Makkah in the year 206/821.[৮]

'বুগ' হচ্ছে 'তিরমিয' শহরের একটি গ্রাম। বুগ' 'তিরমিয' থেকে ছয় ফারসাখ দূরে অবস্থিত।[৯] এটি খুরাসানের অন্তর্গত। এর দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁকে বুগি বলা হয়।

---

১. (ক) জামালুদ্দিন আল-মিযযি, তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল, খ. ২৬, পৃ. ২৫০, জীবনী: ৫৫৩১; (খ)। শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ. ১৩, পৃ. ২৭০, জীবনী: ১৩২।

২. بَنُوْ سُلَمٍ (বনূ সুলাম)-এর প্রতি সম্পৃক্ত করে তাঁকে আস-সুলামি বলা হয়।

৩. (ক) ইবন খল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়াআবনাউ আবনায়িয যামান, খ. ৪, পৃ. ২৭৮, জীবনী: ৬১৩ (১); (খ) শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ. ১৩, পৃ. ২৭০, জীবনী: ১৩২; (গ) জামালুদ্দিন আল-মিযি, তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল, খ. ২৬, পৃ. ২৫০, জীবনী: ৫৫৩১; (ঘ) শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, তাযকিরাতুল হুফফায, খ. ২, পৃ. ১৫৪, জীবনী: ৬৫৮ (৪-১০); (ঙ) ইবন হাজার আল-আসকলানি, তাহযিবুত তাহযিব, খ ৯, পৃ. ৩৮৭, জীবনী: ৬৩৮; (চ) ইবন কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ১১, পৃ. ৭৭; (ছ) ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলি, শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব, খ. ৩, পৃ. ৩২৭; (জ) Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, *Hadith Literature*, P. 1703; (ঝ) The Encyclopaedia of Islam, V. 6, P. 796; (ট) T. P. Hughes, Dictionary of Islam, P. 634; (ঠ) The New Encyclopaedia Britannica. V. 22, P. 795.

৪. খায়রুদ্দিন আ-যিরিকাল, আল-আ'লাম, খ. ৬, পৃ. ৩২২।

৫. মুহাম্মদ আবদুল আযিয আল-খাওলি, মিফতাহুস সুন্নাহ, পৃ. ৯৪।

৬. শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, সিয়ার আলামিন নুবালা, খ. ১৩, পৃ. ২৭১, জীবনী: ১৩২

৭. ড. ফুআদ সিযগিন, তারিখুত তুরাস আল-আরাবি, খ. ১, পৃ. ২৯৯

৮. Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, Hadith Literature, P. 107

৯. (ক) ইয়াকূত আল-হামাওয়ি, মু'জামুল বুলদান, খ. ১, পৃ. ৫১০; (ক) ইবন খল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান, খ. ৪, পৃ. ২৭৮, জীবনী: ৬১৩ (১); (গ) আবদুল করিম আস-সাম'আনি, আল-আনসাব, খ. ১, পৃ. ৪১৫, নসব: ৬১৮; তিনি বলেন,

'আল্লামা সামআনি (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

بُوْغٌ: إِمَّا إِنَّهُ كَانَ مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ أَوْ سَكَنَ هٰذِهِ الْقَرْيَةَ إِلٰى حِيْنَ وَفَاتِهِ.

'তিনি হয়ত বুগ শহরের আদি অধিবাসী ছিলেন অথবা তিনি এ শহরে এসে নিবাস স্থাপন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।'[১]

ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর দাদা মারুযের অধিবাসী ছিলেন। লায়স ইবন ইয়াসারের শাসনামলে তিনি তিরমিয শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু আল্লামা রিকা'ঈ (রহ.)-এর মতে তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন মার্ভের অধিবাসী। তিরমিয শহর জায়ন নদীর তীরে অবস্থিত। এটি উত্তর ইরানের খুরাসানে অবস্থিত। তিরমিয স্থানের সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁকে তিরমিযি বলা হয়ে থাকে। আল্লামা সামআনি (রহ.) তিরমিয সম্পর্কে বলেন,

اَلتِّرْمِذِيُّ: هٰذِهِ النِّسْبَةُ إِلٰى مَدِيْنَةٍ قَدِيْمَةٍ عَلٰى طَرْفِ نَهْرِ بَلْخٍ الَّذِىْ يُقَالُ لَهُ جَيْحُوْنَ، وَبَعْضُهُمْ يَقُوْلُوْنَ بِكَسْرِهَا، وَالْمُتَدَاوَلُ عَلٰى لِسَانِ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدَةِ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْمِيْمِ، وَالَّذِىْ كُنَّا نَعْرِفُهُ قَدِيْمًا فِيْهِ كَسْرُ التَّاءِ وَالْمِيْمِ جَمِيْعًا.

'বালখ নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহরের প্রতি সম্পৃক্ত করে তাঁকে তিরমিযী বলা হয়। এ নদীকে জায়হূন নামেও অভিহিত করা হয়। কারও কারও মতে, তিরমিযী শব্দের تاء-এ যের রয়েছে। ওই শহরের অধিবাসীদের মুখে تاء অক্ষরে যবর এবং ميم অক্ষরে যের ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে আমরা দীর্ঘকাল থেকে تاء এবং ميم উভয়টিতেই যের বলে জানি।[২]

বাল্যকাল ও শিক্ষাসফর:

ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর সময়কালে মুসলিমবিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে হাদিসচর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিলো। বিশেষত খুরাসান, মাওয়ারাউন নাহার প্রভৃতি এলাকা হাদিস শিক্ষা ও চর্চাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ইমাম বুখারি (রহ.)-এর ন্যায় স্বনামধন্য মুহাদ্দিস এ অঞ্চলে হাদিসচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) জ্ঞান লাভ করার পর থেকেই হাদিসের এ পরিবেশ প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।[৩] ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর বাল্যকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। বিশেষত শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করেন নিজ গ্রামে। প্রাথমিক শিক্ষাও নিজ গৃহেই সমাপ্ত করেন।[৪] বয়স বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে তিনি হাদিস ও ফিকহ-এর প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত হয়ে পড়েন। আর এ সময়টি ছিলো হাদিস

اَلْبُوْغِيْ: بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوْحدة وَسَكُوْنِ الْوَاوِ وَفِيْ آخِرِهَا الْغَيْنُ الْمُعْجَمَةُ، هٰذِهِ النِّسْبَةُ إِلٰى بُوْغٍ وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى التِّرْمِذِ عَلٰى سِتَّةِ فَرَاسِخَ، مِنْهَا اَبُوْ عِيْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى بْنِ سَوْرَةَ بْنِ شَدَّادِ الْبُوْغِيْ التِّرْمِذِيّ الضَّرِيْرِ.

[১]. আবদুল করিম আস-সাম'আনি, আল-আনসাব, খ. ১, পৃ. ৪১৫, নসব: ৬১৮।

[২]. ইয়াকূত আল-হামাওয়ি, মুজামুল বুলদান, খ. ২, পৃ. ২৬।

[৩]. (ক) মুহাদ্দিসিনে ইযাম, পৃ. ১৭৬; (খ) তারাজিমুল মুহাদ্দিসিন, পৃ. ১২০।

[৪]. তারাজিমুল মুহাদ্দিসিন, পৃ. ১২০।

বিশারদগণের হাদিসচর্চার যুগ। অন্যান্য মুহাদ্দিসের ন্যায় ইমাম তিরমিযী (রহ.)-ও হাদিসচর্চার প্রতি আত্মনিয়োগ করেন।

ইতোমধ্যে ইমাম বুখারি (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর ন্যায় যুগান্তকারী মুহাদ্দিসের আবির্ভাব ঘটে। বিশেষত ইমাম বুখারি (রহ.)-এর হাদিস শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ইমাম তিরমিযী (রহ.)কে অনুপ্রাণিত করে। ইলমে হাদিসে গভীর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশ সফর করে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদিস অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করেন। এ সম্পর্কে ইবন খল্লিকান (রহ.) বলেন,

وَارْتَحَلَ، وَطَافَ الْبِلَادَ، وَسَمِعَ خَلْقًا كَثِيْرًا مِنَ الْخُرَاسَانِيِّيْنَ وَالْحَرَمِيِّيْنَ وَالْعِرَاقِيِّيْنَ وَالْحِجَازِيِّيْنَ، وَلَمْ يَرْتَحِلْ إِلَى مِصْرَ وَالشَّامِ -

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং খুরাসান, হারামাইন, ইরাক, হিজাযের বহুসংখ্যক হাদিসবিদের নিকট থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। তিনি মিসর ও সিরিয়া ভ্রমণ করেননি।[১]

রিজাল শাস্ত্রবিদগণ বলেন,

وَارْتَحَلَ، فَسَمِعَ بِخُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ وَالْحَرَمَيْنِ، وَلَمْ يَرْحَلْ إِلَى مِصْرَ وَالشَّامِ.

'তিনি হাদিস অন্বেষণে অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। অনন্তর তিনি খুরাসান, 'ইরাক এবং মক্কা-মদিনা সফর করেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায় গমন করেননি।[২]

وَهُوَ تِلْمِيْذُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيِّ، وَشَارَكَهُ فِيْ بَعْضِ شُيُوْخِهِ، وَكَانَ ضَرِيْرًا، قِيْلَ: وُلِدَ أَكْمَهَ.

'তিনি ছিলেন মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈলের ছাত্র। তিনি ইমাম বুখারি (রহ.)-এর কোন কোন শায়খ থেকে হাদিস শ্রবণে তাঁর সাথী ছিলেন। তিনি ছিলেন চক্ষু জ্যোতিহীন। কারও কারও মতে, তিনি ছিলেন জন্মান্ধ।'[৩]

ড. মুহাম্মদ যুবায়র সিদ্দীকী বলেন,

"He travelled a good deal in order to learn traditions, visited the various centres of Islamic learning in Arabia Mesopotamia, persia and Kurashan. and associated with the eminent traditionists of his time e .g. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud and others."[৪]

---

১. (ক) ইবন খল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়াআবনাউ আবনায়িয যামান, খ. ২, পৃ. ৩৬৩; (ক) ইবন কাসির, জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, ভূমিকা, খ. ১, পৃ. ১০৯

২. (ক) জামালুদ্দিন আল-মিযি, তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল, খ. ২৬, পৃ. ২৫০-২৫১, জীবনী: ৫৫৩১; (খ) ইবন হাজার আল-আসকলানি, তাহযিবুত তাহযিব, খ. ১, পৃ. ৩৬৪; (গ) শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ. ১, পৃ. ২৮২; (ঘ) শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, তাযকিরাতুল হুফফায, খ. ২, পৃ. ১৫৪, জীবনী: ৬৫৮ (৪-১০); (ঙ) The Encylopaedia of Islam, V. 6, P. 796-797; এতে বলা হয়েছে: 'of his life very x little is known. It is said that he was born but also, that he lost his eyesight in his later years.'

৩. আল-ইয়াফি, মিরআতুল জিনান ওয়া 'ইবরাতুল মাকযান ফি মা'রিফাতি মা মু'তাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান, খ. ২, পৃ. ১৪৪।

৪. Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, Hadith Literature, P. 107

শিক্ষকবৃন্দ:

ইমাম তিরমিযী (রহ.) ছিলেন হাদিসের একজন ইমাম, বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এবং হুজ্জাত (প্রামাণ্য দলিল)। তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে অসংখ্য শিক্ষকের নিকট শিক্ষা অর্জন করেন। শামসুদ্দিন আয-যাহাবি (রহ.) তাঁর শিক্ষকগণের একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন। তা এই- কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, মুহাম্মদ ইবন আমর আসসাওয়াক আল-বালখি, মাহমূদ ইবন গায়লান, ইসমাঈল ইবন মূসা আল-ফাযারি, আহমদ ইবন মানি', আবু মুসআ আয-যুহরি, বিশর ইবন মুআয আল-'আকাদি, হাসান ইবন আহমদ ইবন আবূ শুআইব, আবু 'আম্মার আল-হুসাইন ইবন হুরাইস, 'আবদুল্লাহ ইবন মু'আবিয়া আল-জুমাহি, 'আবদুল জাব্বার ইবন 'আলা, আবু কুরায়ব, আলি ইবন হুজুর, 'আলি ইবন সাঈদ ইবন মাসরূক, 'আমর ইবন আলি আল-ফাল্লাস, ইমরান ইবন মূসা আল-কাযয, মুহাম্মদ ইবন আবান আল-মুসতামলি, মুহাম্মদ ইবন হুমাইদ আর-রাযি, মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা, মুহাম্মদ ইবন রাফি, মুহাম্মদ ইবন আবদুল আযিয ইবন আবু রিমা, মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু আশ-শাওয়ারিব, মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আল-আদানি, নাসার ইবন আলি, হারুন আল-হাম্মাল, হান্নাদ ইবনুস-সারি, আবূ হাম্মাদ ওয়ালিদ ইবন শুজা, ইয়াহইয়া ইবন আকসার, ইয়াহইয়া ইবন হাবিব ইবন, 'আরাবি, ইয়াহইয়া ইবন দুরুসত আল-বাসারি, ইয়াহইয়া ইবন তালহা আল-য়ারবুঈ, ইউসূফ ইবন হাম্মাদ আল-মানি, ইসহাক ইবন মূসা আল-হামি, ইবরাহিম ইবন আবদুল্লাহ আল-হারাওয়ি, সুওয়াইদ ইবন নাসার আল-মারওয়াযি।[১]

এছাড়া ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), মুহাম্মদ ইবন বাশশার (রহ.), আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবন সাঈদ (রহ.), সাঈদ ইবন আবদুর রহমান (রহ.), সালিহ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন যাকওয়ান (রহ.) ও আবু সুফয়ান ইবন ওয়াকি (রহ.) প্রমুখ থেকেও তিনি হাদিস গ্রহণ করেন।

তিনি ইমাম বুখারি (রহ.) থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেন। ফলে ইমাম বুখারি (রহ.) থেকে প্রচুর হাদিস শিক্ষা করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।[২] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারি (রহ.) ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর শায়খ হলেও ইমাম বুখারি (রহ.) যে ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন তা তিনি নিজের বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারি (রহ.) নিজেই বলেন, مَا انتفعت بِكَ أَكْثَرُ مِمَّا انتفعت بِي 'আপনি (তিরমিযী) আমার দ্বারা যতটুকু উপকৃত হয়েছেন আমি আপনার দ্বারা তার চেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি।[৩] ইমাম বুখারি (রহ.) কিছু হাদিস ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।[৪]

---

[১]. কামসুদ্দিন আয-যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, (খ. ১৩, পৃ. ২৭১, জীবনী: ১৩২)

[২]. (ক) শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি, বুস্তানুল মুহাদ্দিসিন ফি বয়ানি কুতুবিল হাদিস ওয়া আসহাবিহাল গারামিন, পৃ. ২৮৯; (খ) মুহাদ্দিসিনে ইযাম, পৃ. ১৬৭

[৩]. ইবন হাজার আল-আসকালানি, তাহযিবুত তাহযিব, খ. ৯, পৃ. ৩৮৯

[৪]. ইবন হাজার আল-আসকালানি, তাহযিবুত তাহযিব, খ. ৯, প. ৩৮৯

ছাত্রবৃন্দ:

ইমাম তিরমিযী (রহ.) ছিলেন তাঁর যুগের একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে বহু হাদিস অনুরাগী ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর নিকট থেকে হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আগমন করেন। ইমাম বুখারি (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর খুরাসানে তাঁর সমকক্ষ আর কোন হাদিসবিশারদ ছিলেন না। এজন্য খুরাসান, তুর্কিস্তান এবং ইসলামি দুনিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে অসংখ্য ছাত্র তাঁর দরবারে হাদিস শিক্ষালাভের জন্য দলে দলে হাজির হতে থাকেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্র হলেন:

আবু বকর আহমদ ইবন ইসমাঈল ইবন আমর আস-সমরকন্দি, আবু হামিদ আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন দাউদ আল-মারওয়াযি আত-তাজির, আহমদ ইবন আলি আলমুকরি, আহমদ ইবন ইউসূফ আন-নাসাফি, আবুল হারিস আসাদ ইবন হামদাওয়াহ আননাসাফি, হুসাইন ইবন ইউসূফ আল-ফিরবি, হাম্মাদ ইবন শাকির আল-ওয়ারাক, দাউদ ইবন নাসার ইবন সুহাইল আল-বদওয়ি, রাবি' ইবন হাইয়ান আল-বাহিলি, 'আবদুল্লাহ ইবন নাসার ইবন সুহাইল আল-বযদওয়ি, আবুল 'আব্বাস মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন মাহবূব আল-মাহবূবি আল-মারওয়াযি, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন আহমদ আন-নাসাফি, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন সুফয়ান ইবনুন নাযার আন-নাসাফি আল-আমিন, আবু 'আলি মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আল-কাররাব আল-হারওয়ি, আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবন মাহমূদ ইবন আনবার আন-নাসাফি, মুহাম্মদ ইবন মক্কি ইবন নূহ আন-নাসাফি, মুহাম্মদ ইবনুল মুনযির ইবন সাঈদ আল-হারওয়ি শাকর, মাহমূদ ইবন আনবর আন-নাসাফি, আবুল ফযল আল-মুসাব্বাহ ইবন আবূ মূসা আল-কাজিরি, আবু মুতি' মাকহুল ইবনুল ফযল আন-নাসাফি, মক্কি ইবন নূহ আন-নাসাফি আল-মুকরি, নাসর ইবন মুহাম্মদ ইবন সাবরা আশ-শায়রাখসি, আল-হায়সম ইবন কুলাইব আশ-শাশিসহ আরও অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[১]

প্রখর স্মৃতিশক্তি:

ইমাম তিরমিযী (রহ.) প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। আল্লামা শামসুদ্দিন আয-যাহাবি (রহ.) এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। ঘটনাটি হলো: ইমাম তিরমিযী (রহ.) জনৈক শায়খের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাঁর কাছ থেকে সরাসরি উক্ত হাদিসগুলো শোনার মনস্থ করেন। তিনি তাঁর শায়খকে হাদিসগুলো শোনানোর জন্য নিবেদন করলে শায়খ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজি হন কিন্তু ইমাম তিরমিযী (রহ.) সেগুলো অনেক খোঁজাখুঁজি করে পেলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভুলবশত সেগুলো বাড়িতে রয়ে গেছে। ইমাম তিরমিযী (রহ.) অগত্যা সাদা কাগজ হাতে নিয়ে এমন ভান করলেন যেন শায়খ যে হাদিসগুলো পড়ছেন তিনি সেগুলো তার লিখিত কপির সাথে মিলিয়ে নিচ্ছেন। হঠাৎ সাদা কাগজের ওপর শায়খের দৃষ্টি পড়তেই তিনি রেগে বললেন, তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছো? শায়খের ধমক শুনে ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর নিকট ঘটনা খুলে বললেন এবং তিনি আরও বললেন, আপনি এখন যেসব হাদিস পড়েছেন তার সবগুলোই আমার মুখস্থ হয়ে

---

[১]. জামালুদ্দিন আল-মিযযি, তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল, খ. ২৬, পৃ. ২৫২, জীবনী: ৫৫৩১

গেছে। শায়খের সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি নতুন আরও কিছু হাদিস শোনানোর নিবেদন করলেন। শায়খ তখন আরও দুষ্প্রাপ্য চল্লিশটি হাদিস ইমাম তিরমিযী (রহ.)-কে শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, এগুলো মুখস্থ বলো। ইমাম তিরমিযী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেগুলো বলে দিলেন। এতে শায়খের বিশ্বাস হলো এবং তিনি চমৎকৃত হয়ে মন্তব্য করলেন 'আমি আপনার মতো স্মৃতিশক্তির অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।"[১]

ড. মুহাম্মদ যুবায়র সিদ্দিকী বলেন,

Abu Isa possessed an extremely sharp and retentive memory which was severely tested many times. In ordder to test this, he recited forty other traditions and asked al-Tirmidhi to reproduced them. Al-Tirmidhi at once repeated what he had heard from his teacher, who was now convinced of the truth of his statement, and was impressed by his unfailing memory.[২]

মাযহাব:

ইমাম তিরমিযী (রহ.) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য ইমামগণের মাযহাব সম্পর্কে যেমন মতভেদ রয়েছে, ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর মাযহাবের ব্যাপারেও তেমনি মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী 'আলিমগণ প্রখ্যাত হাদিসবিশারদগণকে এক এক মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেন। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) বলেন,

وَأَمَّا التِّرْمِذِيُّ فَهُوَ شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ لَمْ يُخَالِفُهُ طَرَحَةً إِلَّا فِيْ مَسْئَلَةِ الْأَبْرَدِ-

'ইমাম তিরমিযী (রহ.) ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। কেননা তিনি যোহরের নামায বিলম্বে পড়ার মাসআলা ব্যতীত ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর বিপরীত মত পোষণ করেননি।'[৩]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.)-এর মতে,

وَأَمَّا أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ فَهُمَا مُجْتَهِدَانِ مُنْتَسِبَانِ إِلَى أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

'ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এবং ইমাম তিরমিযী (রহ.) ছিলেন মুজতাহিদ। তাঁদেরকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ও ইমাম ইসহাক (রহ.)-এর প্রতি সম্পর্কযুক্ত করা হয়।'[১]

---

[১]. (ক) শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, তাযকিরাতুল হুফফায, খ. ২, পৃ. ৬৩৪-৬৩৫: (ক) ইবন হাজার আল-আসকলানি, তাহযিবুত তাহযিব, খ. ৯, পৃ. ৩৮৯, তিনি আল-ইদরিসি (র.)-এর বরাত দিয়ে লিখেছেন,

قال الإدريسي: فسمعت أبا بكر بن أحمد بن محمد بن الحارث المروزي الفقيه، يقول: سمعت أحمد بن عبد الله بن داود يقول: سمعت أبا عيسى الترمذي، يقول: كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ، فمر بنا ذلك الشيخ فسالت عنه، فقالوا: فلان فرحت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي وإنما حملت معي في محملي جزئين غيرهما شبههما، فلما ظفرت سألته السماع فأجاب وأخذ يقرأ من حفظه ثم لمح فرأى البياض في يدي، فقال: ماتستحي مني؟ فقصصت عليه القصة وقلت له: إني أحفظه كله، فقال: اقرأ، فقرأته عليه على الولاء، فقال: هل استظهرت قبل أن تجيء إلي قلت لا ثم قلت له: حدثني بغيره فقرأ علي أربعين حديثا من غرائب حديثه، ثم قال: هات فقرأت عليه من أوله إلى آخره، فقال: ما رأيت مثلك.

[২]. Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, Hadith Literature, P. 107-108.

[৩]. আল-কাশ্মিরি, ফয়যুল বারি শরহু সহিহ আল-বুখারি, খ. ১, পৃ. ৫৮

প্রকৃতপক্ষে সিহাহ সিত্তার ইমামগণ কোন মুজতাহিদের মুকাল্লিদ ছিলেন না। তাঁরা হাদিস থেকে ফিকহি মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। তাদের উদ্ভাবিত মাসআলা কোন মাযহাবের ইমামের মতামতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা তাদেরকে কোন একটি বিশেষ মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত করা সমীচীন নয়। ইমাম তিরমিযী (রহ.) যে একজন মুজতাহিদ ছিলেন তা তাঁর গ্রন্থ পাঠ করলেই অতি সহজে বোঝা যায়। তিনি তাঁর গ্রন্থে হাদিস থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে বিধি-বিধান উদ্ভাবন করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব কতিপয় পরিভাষাও প্রয়োগ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত

১. 'আল্লামা শামসুদ্দিন আয-যাহাবি (রহ.) মিযানুল ইতিদাল ফি নকদির রিজাল গ্রন্থে বলেন,

مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى بْنِ سَوْرَةَ: الْحَافِظُ الْعَالِمُ أَبُوْ عِيْسٰى التِّرْمِذِيُّ، صَاحِبُ الْجَامِعِ، ثِقَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

'মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরা: আবু ঈসা আত-তিরমিযী ছিলেন হাফিয, 'আলিম, জামি' গ্রন্থের সংকলক, নির্ভরযোগ্য এবং তাঁর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলেই একমত।'[২]

২. আবু ইয়ালা আল-খলিলি (রহ.) বলেন,

ثِقَةٌ، مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ، مَشْهُوْرٌ بِالْأَمَانَةِ، وَالْعِلْمِ

'তিনি ছিলেন সকলের মতে নির্ভরযোগ্য। আমানতদারি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন প্রসিদ্ধ।'[৩]

৩. হাফিয ইবন হিব্বান (রহ.) বলেন,

كَانَ أَبُوْ عِيْسٰى مِمَّنْ جَمَعَ، وَصَنَّفَ وَحَفِظَ، وَذَاكَرَ -

'আবু ঈসা ছিলেন হাদিস মুখস্থকারী, সংগ্রহকারী ও সংকলনকারীগণের মধ্যে অন্যতম।'[৪]

৪. 'আল্লামা সামআনি (রহ.) বলেন,

إِمَامُ عَصْرِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ-

'তিনি স্বীয় যুগের অবিসংবাদিত ইমাম এবং গ্রন্থাবলির সংকলক ছিলেন।'[৫]

৫. হাফিজ ইবন কাসির (রহ.) বলেন,

أَحَدُ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ فِيْ زَمَانِهِ -

---

[১]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি, আল-ইনসাফ ফি বয়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ, পৃ. ৮৬

[২]. শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, মিযানুল ইতিদাল ফি নকদির রিজাল, খ. ৩, পৃ. ৬৭৮, জীবনী : ৮০৩৫।

[৩]. আবূল ইয়ালা আল-খলিল, আল-ইরশাদ ফি মারিফাতি উলামায়িল হাদিস, খ. ৩, পৃ. ৯০৪, জীবনী: ৮২৯

[৪]. (ক) ইবন হিব্বান, আস-সিকাত, খ. ৯, পৃ. ১৫৩, জীবনী : ১৫৭৩০; (খ) জামালুদ্দিন আল-মিযি, তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল, খ. ২৬, পৃ. ২৫২, জীবনী : ৫৫৩১; (গ) ইবন হাজার আল-আসকলানি, তাহযিবুত তাহযিব, খ. ৯, পৃ. ৩৮৮; (ঘ) শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ. ১৩, পৃ. ২৭৩, জীবনী: ১৩২।

[৪]. আবদুল করিম আস-সাম'আনি, আল-আনসাব, বাবুল খ. ১, পৃ. ৪১৫, নসব: ৬১৮

'তিনি স্বীয় যুগের ইমামগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।'[১]

৬. আল্লামা শামসুদ্দিন আয-যাহাবি (রহ.) সিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থে বলেন,

الحَافِظُ، المُحَدِّث، المُؤَرِّخُ، الْفَقِيْهُ، الْإِمَامُ الْبَارِعُ

'তিনি ইমাম, হাফিয, মুহাদ্দিস, ইতিহাসবিদ, ফকিহ ও অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন।'[২]

৭. ইতিহাসবিদ ইয়াকূত আল-হামাওয়ি (রহ.) বলেন,

إِمَامُ عَصْرِهِ، صَاحِبُ كِتَابِ الصَّحِيْحِ -

'তিনি স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন। তিনি কিতাবুস সহিহ গ্রন্থের সংকলক।'[৩]

৮. ইতিহাসবিদ ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলি (রহ.) বলেন,

كَانَ مُبَرَّزًا عَلَى الْأَقْرَانِ، آيَةً فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ.

"তিনি ছিলেন তাঁর সমকালীন হাদিসবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং হিফয ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে এক বিরল নিদর্শন।'[৪]

৯. হাকিম আন-নিশাপুরি (রহ.) বলেন,

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَلَّكَ، يَقُوْلُ: مَاتَ الْبُخَارِيُّ فَلَمْ يُخَلِّفْ بِخُرَاسَانَ مِثْلَ أَبِيْ عِيْسٰى فِي الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ، وَالْوَرَعِ وَالزُّهْدِ، بَكٰى حَتّٰى عَمِيْ، وَبَقِيَ ضَرِيْرًا سِنِيْنَ.

'উমর ইবন 'আল্লক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর ইন্তেকালের পর খুরাসানে জ্ঞান, পরহেযগারি এবং দুনিয়া বিমুখতার ক্ষেত্রে আবু ঈসা (রহ.)-এর অনুরূপ আর কাউকে রেখে যাননি। তিনি অধিক কান্নার জন্য অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং কয়েক বছর পর্যন্ত অন্ধাবস্থায় জীবনযাপন করেন।'[৫]

১০. ইতিহাসবিদ তাশ-কুবরাযাদাহ বলেন,

وَهُوَ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْحُفَّاظِ الْأَعْلَامِ، وَلَهُ فِي الْفِقْهِ يَدٌ صَالِحَةٌ أَخَذَ الْحَدِيْثَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ، وَلَقِيَ الصَّدْرَ الْأَوَّلَ مِنَ الْمَشَايِخ -

'তিনি উল্লেখযোগ্য আলিম ও হাফিযগণের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি হাদিসের একদল ইমাম থেকে হাদিস গ্রহণ করেন এবং প্রথম স্তরের হাদিসবিশারদদের সাক্ষাৎ লাভ করেন।'[৬]

১১. হাফিয আল-মিযযি (রহ.) বলেন,

---

[১]. ইবন কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ১১, পৃ. ৭৭

[২]. শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ. ১৩, পৃ. ২৭৩, জীবনী: ১৩২

[৩]. ইয়াকুত আল-হামাওয়ি, মুজামুল বুলদান, খ. ১, পৃ. ৫১০

[৪]. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলি, শারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব, খ. ৩, পৃ. ৩২৭

[৫]. (ক) শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, তাযকিরাতুল হুফফায, খ. ২, পৃ. ১৫৪, জীবনী: ৬৫৮ (৪-১০); (খ) শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ. ১৩, পৃ. ২৭৩, জীবনী: ১৩২।

[৬]. তাশ কুবরাযাদাহ, মিফতাহুস সাআদা ওয়া মিসবাহু সিয়াদা, খ. ২, পৃ. ১২২।

أَحَدُ الْأَئِمَّةَ الْحُفَّاظِ الْمُبْرَزِيْنَ وَمَنْ نَفَعَ اللهُ بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ

'তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম এবং এমন এক ব্যক্তি যার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানগণকে উপকৃত করেছেন।'[১]

রচনাবলি:

ইমাম তিরমিযী (রহ.) কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। যে সকল গ্রন্থের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: আল-জামিউল কবির আস-সুনান, কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা, আশ-শামায়িলুল মুহাম্মদিয়া ওয়াল খাসায়িলুল মুস্তাফাভীয়্যা, (শামায়িলুত তিরমিযী), তাসমিয়াতু আসহাবি রাসুলিল্লাহ। কিতাবুন নাওয়াদিরি আসহাবি রাসূলিল্লাহ (সা.) আত-তারিখ ও কিতাবুয যুহদ।[২]

আল্লামা আবু সা'দ আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল-ইদরিসি আস-সমরকন্দি (রহ.) (ওফাত: ৪০৫ হি./১০১৫ খ্রি.) বলেন,

مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ سَوْرَةِ التِّرْمِذِيِّ الْحَافِظُ الضَّرِيْرُ، أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الَّذِيْنَ يُقْتَدٰى بِهِمْ فِيْ عِلْمِ الْحَدِيْثِ، صَنَّفَ كِتَابَ"الْجَامِعِ"وَالتَّوَارِيْخِ وَ"الْعِلَلِ"؛ تَصْنِيْفَ رَجُلٍ عَالِمٍ مُنْتَقٍ، كَانَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي الْحِفْظِ.

"হাদিসশাস্ত্রে যে সকল ইমামের অনুসরণ করা হয়ে থাকে, তিরমিযী (রহ.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একজন সুপ্রতিষ্ঠিত 'আলিম ব্যক্তির ন্যায় আল-জামি, আত-তারিখ এবং আল-ইলাল গ্রন্থ রচনা করেন। হিফযের ক্ষেত্রে তাঁর উপমা দেয়া হতো।"[৩]

১. আল-জামিউল কবির আস-সুনানুত তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাদিসশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করার পর একটি নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থ সংকলন করেন। এটি জামি'উ আত-তিরমিযী নামে পরিচিত। এ গ্রন্থের মধ্যে সিয়ার, আদাব, তাফসির, আকাইদ, ফিতান, আশরাত, আহকাম ও মানাকিব সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে বলে এটি জামি। অপরদিকে এটি সুনানও। কারণ এ গ্রন্থে ফিকহের বিন্যাস অনুযায়ী তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ প্রভৃতি বিষয়গুলোকে তিনি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে এ জামি গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

---

১. জামালুদ্দিন আল-মিযযি, তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল, খ. ২৬, পৃ. ২৫০, জীবনী: ৫৫৩১

২. (ক) ইবনুন নদিম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ২৮৫; (খ) আবদুল করিম আস-সাম'আনি, আল-আনসাব, খ. ১, পৃ. ৪৫৯, নসব: ৬১৮; (গ) ইবন খল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়াআবনাউ আবনায়িয যামান, খ. ৪, পৃ. ২৭৮, জীবনী: ৬১৩ (১); এতে তিনি বলেন,

أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الَّذِيْنَ يَقْتَدِىْ بِهِمْ فِيْ عِلْمِ الْحَدِيْثِ، صَنَّفَ كِتَابَ "الْجَامِعَ"، وَ"الْعِلَلِ"؛ تَصْنِيْفَ رَجُلٍ مُتْقِنٍ -

৩. জামালুদ্দিন আল-মিযযি, তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল, খ. ১, পৃ. ১৭২

২. আশ-শামায়িলুল মুহাম্মদিয়া ওয়াল খাসায়িলুল মুস্তাফাভিয়্যা শামায়িলুত তিরমিযী

তিনি এ গ্রন্থটি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى দিয়ে শুরু করেছেন। এরপর স্থান লাভ করেছে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অবয়ব, মোহরে নবুওয়াত, মাথা মুবারকের চুল, খেযাব ব্যবহার, সুরমা ব্যবহার, মোজা পরিধান, পাদুকা, আংটি, লুঙ্গি, পাগড়ি, আহার পদ্ধতি, আহারের পূর্বে বা পরে দু'আ, খুশবু ব্যবহার, হাস্য, কবিতা, ইবাদত, নামায, রোযা, কিরআত, শয্যা, বিনয়, চরিত্র-মাধুর্য, লজ্জাশীলতা, জীবিকা, বয়স, তিরোধান, উত্তরাধিকার, ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা। ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর পূর্বে এ ধরনের গ্রন্থ কেউ সংকলন করেননি। গ্রন্থখানি মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধি উপলব্ধি করে অনেক মনীষী এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অনুবাদ করেছেন। হাফিয আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলি ইবন হাজার আল-মক্কি আলহায়ছামি (রহ.) (৯০৯-৯৭৪ হি./১৫০৪-১৫৬৭ খ্রি..), মুসলিহ উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন সালাহ জালাল আল-মিল্লাতাওয়ি আল-আনসারি আস-সাদি আল-ইবাদি (রহ.) (ওফাত: ৯৭৯ হি./১৫৭১ খ্রি.), হাফিয জালাল উদ্দিন আবুল ফযল 'আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর। আস-সুয়ুতি (রহ.) (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), মোল্লা আলি ইবন সুলতান মুহাম্মদ নূরুদ্দিন আল-হারাওয়ি আল-কারি (রহ.) (ওফাত: ১০১৪ হি./১৬০৬ খ্রি.), শায়খ মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন হামযা (রহ.) (ওফাত: ৯৩৮ হি./১৫৩১ খ্রি.), উসমান উদ্দিন মুহাম্মদ ইবরাহিম ইবন মুহাম্মদ (রহ.) (৮৪৩ হি./১৪৩৯ খ্রি.), মুহাম্মদ হানাফি (রহ.) (ওফাত: ৯২৬ হি./১৫১৯ খ্রি.), হাফিয মঈনুদ্দিন মুহাম্মদ (ওফাত: ১০১ হি./১৬০৪ খ্রি.), শায়খ সুলাইমান আল-জামাল ইবন উমর ইবন মনসূর আল-ওজায়লি আল-আযহারি (ওফাত: ১২০৪ হি./১৭৯০ খ্রি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩. কিতাবুল ইলাল

এ গ্রন্থটি হাদিস বর্ণনাকারীদের পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ। তিনি ইলাল বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথমটি اَلْعِلَلُ الْكُبْرٰى (আল-ইলালুল কুবরা), দ্বিতীয়টি اَلْعِلَلُ الصُّغْرٰى (আল-ইলালুস সুগরা) নামে অভিহিত। হাদিসশাস্ত্রের দোষ-ত্রুটির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাচাই বাছাইয়ের জন্য اَلْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ তথা ইতিবাচক ও নেতিবাচক পর্যালোচনা নীতিমালা সম্পর্কিত এটি একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এটি ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর হাদিসের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি ও বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচায়ক। হাদিস বিশারদগণের নিকট কিতাবুল-ইলাল গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। এ গ্রন্থটি জামি' আত-তিরমিযীর শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে।[১]

এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে:

৪. كِتَابُ الْمُفْرَدِ (কিতাবুল মুফরাদ),

---

[১]. ইবনুল আসির, জামিউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল, খ. ১, পৃ. ১৬৩।

৫. كِتَابُ الزُّهْدِ (কিতাবুয যুহদ),

৬. كِتَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنٰى (কিতাবুল আসমা ওয়াল-কুনা) ও

৭. كِتَابُ التَّارِيْخِ (কিতাবুত তারিখ)।

ইন্তেকাল:

ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২৭১ হিজরি সালের রজব মাসের শেষদিকে ইন্তেকাল করেন।[১] আল্লামা সাম'আনি (রহ.) বলেন,

وَتُوَفِّيْ بِقَرْيَةِ بُوْغٍ سَنَةَ نِصف وَسَبْعِيْنَ وَمِائَتَيْنِ، إِحْدٰى قُرَى تِرْمِذٍ

'তিনি তিরমিযের অন্তর্গত 'বুগ' নামক গ্রামে ২৭৫ হিজরি সালে ইন্তেকাল করেন।'[২]

শামসুদ্দিন আয-যাহাবি (রহ.) বলেন,

مَاتَ أَبُو عِيْسَى فِي ثَالِثِ عَشَرِ رَجَبٍ، سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِيْنَ وَمائَتَيْن بِتِرْمِذَ.

'তিনি ২৭৯ হিজরি সালের রজব মাসের ১৩ তারিখ তিরমিযে ইন্তেকাল করেন।'[৩]

ইবন খল্লিকান (রহ.) বলেন,

وَتُوَفِّيَ لِإِحْدٰى عَشَرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ خَمْسٍ وَّتِسْعِيْنَ وَمِائَتَيْنِ، وَلَمْ يُغَيِّرْ سَيْبَهُ، وَكَانَ قَدِ اخْتَلَطَ فِيْ آخِرِ عُمْرِهِ اخْتِلَاطًا عَظِيْمًا، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى -

'ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২৯৫ হিজরি সালের ১১ মুহাররম ইন্তেকাল করেন। আর তখনও তাঁর দৈহিক দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি। তবে পরিণত বয়সে তাঁর স্মরণ শক্তির ক্ষেত্রে বড় ধরনের হ্রাস ঘটে।'[৪]

আল্লামার লিখিত বঙ্গানুবাদ শামায়িলে তিরমিযীর পটভূমি

আদিমানব, পরম পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান মানবজাতি, সৃষ্টিজগতে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয়তম সৃষ্টি। عَالَمٌ رُّوْحَانِيٌّ (আত্মিক জগতে) আদম-সন্তানগণের প্রতি اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের প্রতিপালক প্রভু নই?)[৫] এই প্রশ্ন করে বিশ্বপালক আল্লাহ তাদের দ্বারা স্বীয় প্রভুত্বের স্বীকৃতি নিয়েছেন এবং প্রভু ও বান্দার মধ্যকার অটুট

---

[১]. (ক) শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ. ১৩, পৃ. ২৭৭, জীবনী: ১৩২; (খ) জামালুদ্দিন আল-মিযযি, তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল, খ. ২৬, পৃ. ২৫২, জীবনী: ৫৫৩১; তিনি বলেন,

مَاتَ أَبُوْ عِيْسَى التِّرْمِذِيّ الْحَافِظ بِالتِّرْمِذِ لَيلَةَ الْإِثْنَيْنِ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَّسَبْعِيْنَ وَمِئَتَيْنِ-

[২]. আবদুল করিম আস-সামআনি, আল-আনসাব, খ. ১, পৃ. ৪৬০, নসব: ৭১

[৩]. শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ. ১৩, পৃ. ২৭৭, জীবনী: ১৩২

[৪]. ইবন খল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়াআমবাউ আবনায়িয যামান, খ. ৪, পৃ. ১৯৬, জীবনী: ৬১৩ (১)

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আরাফ, ৭:১৭২

সম্পর্কের মাহাত্ম্য ও গূঢ়তত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। মাটির দেহের সাথে; رُوْحٌ (আল্লাহ-প্রদত্ত আত্মা)-এর সংযোগ করে আল্লাহ মানব গঠন করেন। সুতরাং মানবের পার্থিব জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক উন্নতির যাবতীয় কর্তব্যও পালন করতে হবে। মানব আল্লাহপ্রেমের প্রতিজ্ঞা করে এসেছে। আল্লাহপ্রেমের প্রেরণা এবং যোগ্যতা দান করে আল্লাহ মানবকে বানিয়েছেন। জনৈক কামিল প্রেমিক বলেন,

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعۂ فال بنام من دیوانہ زدند

অর্থ: আল্লাহপ্রেমের আমানত আসমানের মতো বিরাট مَخْلُوْقٌ (সৃষ্টি) গ্রহণ করতে সাহস করেনি। লটারিতে সেখানে আমি আত্মহারা ক্ষুদ্র মানবের নামই উঠল।' মানবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে আরয করেন,

يَا رَبُّ! خَلَقْتَهُمْ يَأْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُوْنَ، وَيَتَلَذَّذُوْنَ بِالنِّسَاءِ فَاجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا، وَلَنَا الْآخِرَةِ -

'হে প্রভু! আপনি মানব সৃষ্টি করে তাদের খাওয়া-দাওয়া, বিয়ে-শাদি ইত্যাদি ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন (অথচ আমরা এসবে নেই); অতএব দুনিয়ার জীবনটা তাদেরকে দিন এবং আখিরাতটা আমাদের ভাগে দান করুন।'

এর জবাবে আল্লাহপাক বলেছেন,

لَا أَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتُهُ بِيَدِيَّ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ كُنْ فَكَانَ-

'যাকে আমি বিশেষভাবে স্বয়ং কুদরতের হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি এবং তার ভেতর আমার (নূরের আভা) রূহ সঞ্চারিত করে দিয়েছি! তাকে আমি আমার كُنْ (হও) শব্দদ্বারা সৃষ্ট সাধারণ মাখলুক (সৃষ্টি)-এর সমান (মর্যাদাদান) করবো না। এ সাধারণ সৃষ্টিগণকে আমি كُنْ (হও) শব্দটি মাত্র বলেছি এবং তারা হয়ে গেছে।'[১]

করুণাময় আল্লাহপাক সৃষ্টির সর্বোত্তম মানবকে আল্লাহপ্রেমের উচ্চাসন লাভ করার যোগ্যতা ও প্রেরণা দান করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ষড়রিপুর আক্রমণে, প্রলোভনের মায়া-মরীচিকার পেছনে পড়ে দুর্বলচিত্ত মানব আল্লাহকে ভুলে যায়। ভোগ-লালসায় মেতে থাকা প্রিয় মানবকে এ ধরনের শোচনীয় অধোগতি থেকে ফিরিয়ে আনা ও রক্ষা করার জন্য করুণাময় আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসুল প্রেরণ করেন। আম্বিয়ায়ে কিরাম (সম্মানিত নবীগণ) শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মানব। একেকজন এক-একটি উজ্জ্বল প্রদীপ ও ধ্রুবতারাস্বরূপ। তাঁরা বান্দাগণকে পথভ্রষ্টতা ও পথভ্রান্তির অভিশাপ থেকে রক্ষাকরতঃ আল্লাহপ্রেমের পথ দেখিয়ে প্রভু ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.)-এর মধ্যে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) সর্বপ্রধান। তিনি রহমাতুল্লিল আলামিন বা উভয় জগতের জন্য আল্লাহর অনুকম্পা। তিনি

---

[১]. (ক) আহমদ ইবন হাম্বল, আস-সুন্নাহ, খ. ২, পৃ. ৪৬৯, হাদিস: ১০৬৫; (খ) আত-তাবারানি, মুসনাদুশ শামিইয়িন, খ. ১, পৃ. ২৯৮, হাদিস: ৫২১; (গ) আল-বায়হাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, খ. ২, পৃ. ১২১, হাদিস: ৬৮৮; (ঘ) আল-বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, খ. ১, পৃ. ৩০৭, হাদিস: ১৪৭; হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ আল-আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত।

বিশ্বনবী, নবীকুল শিরোমণি। আমরা তাঁর উম্মত ও অনুসারী। এটা যে আমাদের পক্ষে কতো বড় গৌরবের বিষয়, তা বর্ণনাতীত। পৃথিবীতে এমন যুগে তাঁর আবির্ভাব হয় যখন সারা বিশ্ব তাওহিদ ও একেশ্বরবাদের বিপরীত شِرْكٌ (অনেকেশ্বরবাদ)-এর তিমিরাচ্ছন্নে আচ্ছন্ন ছিলো। অধর্ম, নাস্তিকতা, পৌত্তলিকতা, অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, অরাজকতা ও কুসংস্কারে ছিলো পরিপূর্ণ। এ ধরনের অভিশপ্ত যুগে তিনি এসে জগতকে খাঁটি তাওহিদ, সত্যধর্ম, মানবতা, প্রেম-প্রীতি, ন্যায় ও সদাচার, উদারতা, সাম্য এবং মৈত্রীর মহামন্ত্রে দীক্ষিতকরতঃ বিশ্ববাসীকে ইহকালের শান্তি এবং পরকালের মুক্তির পথ ধরিয়ে দেন। অতএব তারা দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য মুমিনগণের নিকট অতি আদরের পরম প্রিয় নিদর্শন।

রাসুল (সা.)-এর যাহিরি সুরত, অবয়ব-আকৃতি এবং চাল-চলন, আহার-বিহার, স্বভাব-চরিত্র তাঁর مَعَاشَرَاتٌ (জীবনযাপন-প্রণালী) ইত্যাদি ভালোরূপে জেনে নিয়ে ভক্তি ও মুহাব্বতের সাথে মানসপটে এর ছবি অঙ্কিত রাখা, যথাসাধ্য তাঁর চরিত্রের অনুসরণ করা যে মুমিন মুসলমানের জন্য ইহ-পরকালের শান্তির কারণ, তাতে সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হুলিয়া মুবারক ও দৈহিক গঠনের বর্ণনা

হযরত (সা.)-এর বরকতময় রূপ ও সৌন্দর্যের যথোচিত বর্ণনা করা এবং শ্রোতার মানসপটে এর পূর্ণ ছবি এঁকে দেয়া সম্ভব নয়। রাসুল (সা.)-এর সাহাবিগণ যথাসম্ভব চেষ্টা করে এই বিষয়ে সঠিক বর্ণনা দিয়ে সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। হযরত (সা.)-এর সুরত ও আখলাক বা আকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (রহ.) ৪০০ হাদিস রিওয়ায়তপূর্বক এ কিতাব প্রণয়ন করেছেন। উক্ত ৪০০ হাদিস ৫৪ ভাগে (অধ্যায়ে) বিভক্ত। তিনি এ অধ্যায়ে ১৪টি হাদিসের বর্ণনা সনদসহ লিপিবদ্ধ করেছেন।

١/١- حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَا بِالْآدَمِ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ»

হাদিস-১/১: [আবু রাজা কুতায়বা ইবন সাঈদ আস-সাকাফি (১৫০-২৪০ হি. = ৭৬৭-৮৫৫ খ্রি.)<ইমাম মালিক ইবন আনাস আল-আসবাহী<রবি আতুর রায় ইবন আবু 'আবদুর রহমান (ওফাত ১৩৬ হি. = ৭৫৩ খ্রি.) সূত্রে বর্ণিত]

হযরত আনাস (রা.)[১] বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) অতি দীর্ঘকায়ও ছিলেন না, খর্বকায়ও ছিলেন না (বরং তিনি মানানসই মধ্যম আকৃতির লোক ছিলেন)[ক] এবং তিনি চুনের

---

[১]. আবূ সুমামা, আবু হামযা, আবুন নাযর, যুল আদনাইন, আনাস ইবন মালিক ইবনিন নাযর ইবন যামযাম ইবন যায়দ ইবন হারাম আন-নাজ্জারি আল-খাযরাজি আল-আনসারি; বিশিষ্ট সাহাবি।

মতো সাদা রঙেরও ছিলেন না অথবা একেবারে গম রঙবিশিষ্টও ছিলেন না (বরং তিনি লাবণ্যময়, রক্তিমাভাযুক্ত উজ্জ্বল গম রঙবিশিষ্ট লোক ছিলেন)। হযরত (সা.)-এর মুবারক মস্তকের চুলসমূহ অতিশয় কুঞ্চিতও ছিলো না, একেবারে সোজাও ছিলো না (বরং সামান্য সামান্য কুঞ্চিত অতিসুন্দর ছিলো)। ৪০ বছর বয়সে আল্লাহপাক তাঁকে نُبُوَّةٌ (পয়গম্বরি) দান করেন। অতঃপর তিনি মক্কা নগরীতে ১০ বছরকাল অবস্থান করেন এবং তারপর (হিজরত করে) মদিনা শরিফে ১০ বছরকাল অতিবাহিত করেন। তারপর আল্লাহর আদেশে ৬০ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয় অথচ তাঁর পবিত্র মস্তক এবং দাড়ি মুবারকের মোট ২০ খানা চুলও (পেকে) সাদা হয়নি।[(খ)১]

টীকা: (ক) হযরত (সা.) মধ্যম আকৃতিগণের মধ্যে একটু দীর্ঘকায় ছিলেন। মধ্যম আকৃতির সবলোক তো একই মাপের হয় না! তিনি বেশ মানানসই মধ্যম আকৃতির ছিলেন। হিন্দ ইবন আবু হালা পরিষ্কার ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন। হাদিস শরিফে হযরত (সা.) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বহু দণ্ডায়মান লোকজনের মাঝে দাঁড়ালে তাঁর পবিত্র মস্তক সকলের উর্ধ্বে দেখা যেতো। মধ্যম আকৃতির হওয়া সত্ত্বেও সবসময় এভাবে দৃষ্ট হওয়া তাঁর একটি মুজিযা বা অলৌকিক ব্যাপার ছিলো।

(খ) এ হাদিসে হযরত আনাস (রা.) হযরত (সা.)-এর ৬০ বছর বয়সে ওফাত হয় বলে বর্ণনা করেছেন। অপর এক হাদিসে অন্য বর্ণনাকারী ৬৫ বছর বলেছেন। এসব ব্যতীত অপর একাধিক হাদিসে হযরত (সা.)-এর বয়স ৬৩ বছর বর্ণনা করা হয়েছে। এটিই হযরত (সা.)-এর সঠিক বয়স বলে মুহাদ্দিসগণ ধরে নিয়েছেন। নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর হযরত (সা.) ১৩ বছর মক্কা শরিফে থাকেন। তারপর হিজরত করে মদিনা শরিফে ১০ বছর অতিবাহিত হলে তাঁর ওফাত হয় (৪০+১৩+১০=) ৬৩ বছর বয়সে। আরবগণের একটি নিয়ম আছে যে, অনেক সময় তারা কোনো বিষয়ে সংখ্যা উল্লেখ করার সময় দশক (দশ দশ) সংখ্যাসমূহ বলে খুচরা সংখ্যাগুলো ছেড়ে দেয়। হযরত আনাস (রা.) এ হাদিসে উক্ত নিয়মে ১৩-এর স্থলে ১০ এবং ৬৩ বছরের স্থলে ৬০ বলেছেন। যে হাদিসে ৬৫ বছর বর্ণনা করা হয়েছে, এতে বর্ণনাকারী জন্ম ও ওফাতের সনসমূহকে পৃথক পৃথক এক এক বছর ধরে নিয়ে ৬৫ বছর বলেছেন।

٢/٢- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، حَسَنَ الْجِسْمِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ أَسْمَرَ اللَّوْنِ، إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ»-

হাদিস-২/২: *[হুমায়দ ইবন মাসআদা আল-বাসরি (ওফাত ২৪৪ হি. = ৮৫৮ খ্রি.)<আবদুল ওয়াহ্হাব আস-সাকাফি (১১০-১৯৪ হি. = ৭২৮-৮০৯ খ্রি.)<হুমায়দ ইবন তায়রাওয়াহ = ইবন আবু হুমায়দ আত-তাওয়িল সূত্রে বর্ণিত]*

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) অতিসুন্দর শরীরের মধ্যম আকৃতির লোক ছিলেন। অতিদীর্ঘকায় বা খর্বকায় ছিলেন না। তাঁর পবিত্র মস্ত

---

১. (ক) মালিক ইবন আনাস, আল-মুওয়াত্তা, খ. ২, পৃ. ৯১, হাদিস: ১৯২৫; (খ) আল-বুখারি, আস-সহিহ, খ. ৪ ও ৭, পৃ. ১৮৭ ও ১৬১, হাদিস: ৩৫৪৭, ৩৫৪৮ ও ৫৯০০; (গ) মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৪, পৃ. ১৮২৪, হাদিস: ১১৩/২৩৪৭; (ঘ) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবির, খ. ৫, পৃ. ৫৯২, হাদিস: ৩৬২৩; (ঙ) আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, খ. ২১, পৃ. ১৬০, হাদিস: ১৩৫১৯

কের চুল অতি কুঞ্চিত বা একেবারে সোজা ছিলো না। তিনি (রক্তিমাভাযুক্ত, লাবণ্যময় উজ্জ্বল) গমের রঙবিশিষ্ট লোক ছিলেন। যখন হাঁটতেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতেন।[(ক)১]

টীকা: (ক) এ হাদিসে হযরত (সা.)-এর চলা সম্পর্কে يَتَكَفَّأُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দটি আরবি ভাষায় তিন অর্থে ব্যবহার করা হয়। কোন কোন সময় সামান্য দ্রুতপদে চলার অর্থে, কোন সময় সম্মুখদিকে একটু ঝুঁকে চলার অর্থে আর কোন সময় কদম উঠিয়ে উঠিয়ে চলার অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত অর্থই হযরত (সা.)-এর হাঁটার মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি সামান্য দ্রুতপদে চলতেন। তিনি পুরুষোচিত নিয়মে শক্তির সাথে পা উঠিয়ে উঠিয়ে হাঁটতেন। তিনি সম্মুখদিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতেন। গর্বিতভাবে হাঁটতেন না।

٣/٣/- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ الْيُسْرَى، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ»

হাদিস-৩/৩: *[মুহাম্মদ ইবন বাশার আল-আবদি (১৬৭-২৫২ হি. = ৭৮৩-৮৬৬ খ্রি.)<মুহাম্মদ ইবন জাফার আল-হুলি (ওফাত ১৯৩ হি. = ৮০৮ খ্রি.)<শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ আল-'আতাকি (৮২-১৬০ হি. = ৭০১-৭৭৬ খ্রি.)<আবু ইসহাক 'আমর ইবন আবদুল্লাহ আস-সুবায়ঈ (৩৩-১২৭ হি. = ৬৫৩-৭৪৫ খ্রি.) সূত্রে বর্ণিত]*

হযরত বারা ইবন 'আযিব (রা.)[২] বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) একজন সামান্য দৈর্ঘযুক্ত মধ্যম আকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলের দূরত্ব (সচরাচর লোকের চেয়ে) কিছু বেশি ছিলো (এতে বোঝা যায় যে, সিনা বা বক্ষস্থল মুবারক চওড়া ছিলো)। তাঁর মস্তকের কেশসমূহ কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত ঝুলছিলো। তাঁর পবিত্র দেহে লাল জামা জোড়া (চাদর ও লুঙ্গি) ছিলো। আমি কখনও তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর কোনো কিছু দেখিনি (বরং তিনিই সবচেয়ে সুন্দর)।[৩]

٤/٤/- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ»

---

১. (ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবির, খ. ৪, পৃ. ২৩৩, হাদিস: ১৭৫৪; (খ) আবূ ইয়ালা আল-মূসিলি, আল মুসনাদ, খ. ৬, পৃ. ৪৪৫, হাদিস: ৩৮৩২; (গ) আল-বাগওয়ি, শরহুস সুন্নাহ, খ. ১৩, পৃ. ২২১, হাদিস: ৩৬৪১; (ঘ) নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, মুখতাসারুশ শামায়িল, পৃ. ১৩, হাদিস: ২;---হাদিসটি সহিহ।

২. আবু 'উমারা, আবু আমর, আবুত তুফাইল, বারা ইবন আযিব ইবনুল হারিস ইবন 'আদি ইবন মাজদাআ ইবন হারিসা ইবনুল হারিস ইবনুল খাযরাজ ইবন আমর ইবন মালিক ইবন আওস আল-আনসারি (ওফাত ৭১ হি. = ৬৯০ খ্রি.); সাহাবি

৩. আল-বুখারি, আস-সহিহ, খ. ৪, পৃ. ১৮৮, হাদিস: ৩৫৫১; (খ) মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৪, পৃ. ১৮১৮, হাদিস: ৯১/২৩৩৭; (গ) আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, খ. ৩০, পৃ. ৪২২, হাদিস: ১৮৪৭৩; (ঘ) আন-নাসাঈ, আসসুনানুল কুবরা, খ. ৮, পৃ. ৩২০, হাদিস: ৯২৭৭; (ঙ) আবু ইয়ালা আল-মুসিলি, আল-মুসনাদ, খ. ৩, পৃ. ২৬২, হাদিস: ১৭১৪

হাদিস-৪/৪: *[মাহমূদ ইবন গায়লান আল-আদওয়ি (ওফাত ২৩৯ হি. = ৮৫৩ খ্রি.)<ওয়াকি ইবনুল জাররাহ আর-রুআসি (১২৯-১৯৮ হি. = ৭৪৬-৮১২ খ্রি.)<সুফয়ান ইবন সাঈদ আস-সাওরি (৯৮-১৬১ হি. = ৮১৬-৭৭৮ খ্রি.)<আবু ইসহাক 'আমর ইবন আবদুল্লাহ আস-সুবায়'ঈ সূত্রে বর্ণিত]*

হযরত বারা ইবন 'আযিব (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি বাবরি চুলবিশিষ্ট লাল জোড়া পরিহিত কোনো লোক হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর দেখিনি। রাসুল (সা.)-এর পবিত্র মস্তকের কেশসমূহ উভয় বাহু-মূল বা কাঁধের উপর পৌঁছেছিল।[ক] দুই কাঁধের মধ্যস্থল (সচরাচর লোকের চেয়ে) একটু প্রশস্ত। তিনি খর্বকায় বা দীর্ঘকায় ছিলেন না।[১]

টীকা: (ক) বারা ইবন 'আযিব (রা.) হযরত (সা.)-এর বাবরি চুল পূর্বের হাদিসে কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং এ হাদিসে কাঁধ পর্যন্ত। রাসূল (সা.) কোনো কোনো সময় কান পর্যন্ত বড়ো বড়ো চুল রাখতেন; তাকে جُمَّةٌ (জুম্মা) বলা হয়েছে আর কোনো কোনো সময় আরও বাড়িয়ে কাঁধ পর্যন্ত রেখেছেন, একে لِمَّةٌ (লিম্মা) বলা হয়েছে। আর কোনো সময় কান ও কাধের মধ্যস্থল পর্যন্ত তাঁর পবিত্র চুলসমূহ লম্বা হতো।

٥/٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، ضَخْمُ الرَّأْسِ، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ، طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

হাদিস-৫/৫: *[ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারি<আবু নুআইম ফযল ইবন দুকাইন আল মুল্লায়ি (১৩০-২১৯ হি. = ৭৪৮-৮৩৪ খ্রি.)<আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ আল-মাসউদি ওফাত: ১৬০ হি. = ৭৭৬ খ্রি.)<উসমান ইবন মুসলিম ইবন হুরমুয আল-মাক্কি>নাফি ইবন জুবাইর ইবন মুতইম আন-নাওফলি (ওফাত ৯৯ হি. = ৭১৭) সূত্রে বর্ণিত]*

হযরত আলি ইবন আবি তালিব (রহ.)[২] বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) দীর্ঘকায় বা খর্বকায় ছিলেন না (কিঞ্চিৎ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট মধ্যমাকৃতির ছিলেন)। উভয় হাতের তালু এবং পায়ের পাতা পুরু মাংসল ছিলো। পবিত্র মস্তক সামান্য বড়ো এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোগ অস্থিগুলি মোটা ছিলো। সিনা মুবারক হতে সরু লোমের রেখাটি নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ ছিলো। তিনি যখন হাঁটতেন সম্মুখদিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতেন যেনো কোনো উচ্চস্থান হতে নামছেন। আমি

---

১. আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৫১, হাদিস: ৪১৮৩; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবির, খ.৪ ও ৫. পৃ. ২১৯ ও ৫৯৮, হাদিস: ১৭২৪ ও ৩৬৩৫; (গ) আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, খ. ৩০, পৃ. ৫২৯ ও ৬১১, হাদিস: ১৮৫৫৮ ও ১৮৬৬৬; (ঘ) নাসিরুদ্দিন আল-বানি, মুখতাসারুশ শামায়িল, পৃ. ১৪, হাদিস: ৩; হাদিসটি সহিহ

২. আমিরুল মুমিনিন, আবুল হাসান, আলি ইবন আবু তালিব ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদি মুনাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব আল-কুরাইশি (২৩ হি. পূ ...৪০ হি. = ৬০০-৬৬১ খ্রি.); চতুর্থ খলিফা।

তাঁর মতো সুন্দর[ক] কাউকেও দেখিনি (অতএব তিনি যেমন স্বীয় গুণাবলি হিসেবে অদ্বিতীয় ছিলেন, তদ্রূপ দৈহিক সৌন্দর্যেও তাঁর তুলনা ছিলো না)।[১]

টীকা: (ক) এ ধরনের বাক্য কাউকে অতুলনীয় বোঝানোর জন্য বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে হযরত (সা.) যাহিরি বা দৈহিক সৌন্দর্য এবং বাতিনি গুণাবলিতে অতুলনীয় ছিলেন। হযরত আলি (রা.) এ বিষয়টিই বুঝিয়েছেন। এটি কবিগণের مُبَالَغَةٌ বা অতিরঞ্জন নয়। তাঁরা শায়িরি মুবালিগা (অতিরঞ্জিতকরণ) পছন্দ করেন না। হাদিস রিওয়ায়াতে তাঁরা একবিন্দুও যাতে কম-বেশি বা এদিক-ওদিক না হয় সেরূপ দৃঢ় সতর্কতা অবলম্বন করতেন। শরি'আহ মতে অতিরঞ্জিত প্রশংসা হারাম।

---

[১]. (ক) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবির, খ. ৫, পৃ. ৫৯৮, হাদিস: ৩৬৩৭; (খ) আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, খ. ২, পৃ. ৩১২, হাদিস: ১০৫৩; (গ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহিহাইন, খ. ২, পৃ. ৬৬২, হাদিস: ১৯৪; (ঘ) আবু দাউদ আত-তায়ালিসি, আল-মুসনাদ, খ. ১, পৃ. ১৪২, হাদিস: ১৬৬; (ঙ) নাসিরুদ্দিন আল-বানি, মুখতাসারুশ শামায়িল, পৃ. ১৫, হাদিস: ৪; হাদিসটি সহিহ

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) রচিত জামে তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) রচিত 'الدر البهي في شرح الجامع للإمام الترمذي' এর উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এখানে প্রথমে তিনি 'মুকাদ্দিমায়ে ইলমে হাদিস' তথা হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাস সংক্রান্ত একটি ভূমিকা লিখেছেন। এতে তিনি ইলমে হাদিস এর সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হাদিস রিওয়ায়েত এর সংখ্যানুসারে সাহাবায়ে কিরামকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন।

(১) مكثرين **(মুকাস্‌সেরীন):** সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা এক হাজারেরও অধিক হাদিস রিওয়ায়াত (বর্ণনা) করেছেন তাঁরা এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এ স্তরের সাহাবাদের সংখ্যা ৭ (সাত) জন।

(২) متوسطين **(মুতাওয়াসসিতীন):** সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা এক হাজার থেকে কম এবং পাঁচশ'র অধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ স্তরের সাহাবাদের সংখ্যা ৪ (চার) জন।

(৩) সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁদের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা পাঁচশ'র কম এবং চল্লিশ কিংবা ততোধিক। এ স্তরের ৫৮ জন সাহাবায়ে কিরাম রয়েছেন।

(৪) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চল্লিশ জন সাহাবায়ে কিরাম এ স্তরে রয়েছেন। অবশ্য গবেষণামূলক পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান করলে এ পর্যায়ে আরো অনেক সাহাবায়ে কিরামের নাম পাওয়া যাবে।

অতঃপর 'জামে তিরমিযী' এর বিভিন্ন অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ হাদিসসমূহের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) অতি সূক্ষ্মভাবে।

উল্লেখ্য, ইমাম তিরমিযী সংকলিত হাদিস গ্রন্থ 'জামে তিরমিযী' নামে খ্যাত। তাকে সুনানও বলা হয়। ইমাম বুখারি রচিত জামে গ্রন্থখানা সহিহ হাদিস পরিচয় লাভের প্রধান মৌলিক গ্রন্থ। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ইমাম তিরমিযী (রহ.) রচিত 'জামে' গ্রন্থখানা 'হাসান' পরিচয় লাভের অন্যতম উৎস গ্রন্থ। 'জামে তিরমিযী' হাদিসের বিশুদ্ধতা ও ব্যাপকতা বিচারে সহিহ বুখারির স্থান অধিকার করেছে। হাদিসের বিন্যাস ও উত্তম রচনাশৈলির দিক দিয়ে 'জামে তিরমিযী' সহিহ মুসলিমের রীতিতে সজ্জিত। আর আহকাম বিষয়ক হাদিসসমূহ ও ফকীহগণের উপস্থাপিত প্রামান্য হাদিসসমূহ বর্ণনায় 'জামে তিরমিযী' সুনানে আবু দাউদের রীতি অনুসরণে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী স্বীয় জামে গ্রন্থ সংকলন করে হিজায, ইরাক ও খোরাসান তথা মুসলিম বিশ্বের প্রথিতযশা ও অভিজ্ঞ ওলামা-মশায়েখের নিকট পেশ করেন। সকলে এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ গ্রন্থের উপযোগিতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সকলেই অকপটে স্বীকার করেছেন। এ গ্রন্থখানা আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বীয় মহিমায় ভাস্বর। এ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (রহ.) নিজেই বলেন-

صَنَّفْتُ هٰذَا الْمَسْنَدُ الصَّحِيْحِ وَعَرَضْتُهُ عَلَى عُلَمَاءِ الْحِجَازِ فَرَضُوا بِهِ، وَعَرَضْتُهُ عَلَى عُلَمَاءِ الْعِرَاقِ فَرَضُوا بِهِ، وَعَرَضْتُهُ عَلَى عُلَمَاءِ خُرَاسَانَ فَرَضُوا بِهِ- (البداية والنهاية لحافظ ابن كثير)

'আমি এ বিশুদ্ধ মুসনাদ গ্রন্থটি সংকলন করে এটিকে হিজাবের হাদিসবিদদের সমীপে পেশ করি তাঁরা এটাকে খুবই পছন্দ করেন এরপর ইরাকের হাদিস বিশারদগণের নিকট পেশ করি তাঁরা এটাকে খুবই পছন্দ করেন। অতপর আমি এটিকে খোরাসানের হাদিসবিদদের নিকট পেশ করি, তাঁরাও এটাকে খুবই পছন্দ করেন।

ইমাম তিরমিযী প্রণীত 'জামে' গ্রন্থটি 'হাসান হাদিস' চিহ্নিত করণের জন্য একটি মৌলিক উৎস। পূর্ববর্তী যুগের হাদিসবেত্তাগণ সহিহ ও হাসান হাদিসের মধ্যে কোনো প্রকারের পার্থক্য নির্ণয় করেননি। ইমাম বুখারি ও আলি বিন আল মাদানি প্রমুখ সর্বপ্রথম এ বিষয়টি আলোচনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এই আলোচনাকে আরো ব্যাপক উৎকর্ষ সাধন করেন। জামে তিরমিযীতে ১৪৬টি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ এ ২১১৪টি অনুচ্ছেদ ও ৩৮১২টি হাদিস রয়েছে। এ গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে একটি ثلاثي 'সুলাসি হাদিস' রয়েছে। তিনটি সূত্রের মাধ্যমে গ্রন্থকার হতে রাসুলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত যে হাদিস পৌঁছেছে তাকে 'সুলাসি' বলা হয়। তিনি এ গ্রন্থে এমন হাদিস লিপিবদ্ধ করেন যে, হাদিস কোনো একজন মুজতাহিদের নিকট আমলের যোগ্যতা লাভ করে, যদিও এ হাদিসের সনদ সম্পর্কে আলোচনা করা হোক না কেনো। কাজেই জামে তিরমিযীতে বর্ণিত প্রায় সকল হাদিস আমলের উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য। জামে তিরমিযী সুনানের মর্যাদা পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) সিহাহ সিত্তার এই অমূল্য গ্রন্থটির গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের ব্যাখ্যা লিখে মুসলিম উম্মাহ তথা উলামায়ে দীনের বিরাট উপকার সাধন করেছেন। তিনি كتاب الصلاة এর শেষ পর্যন্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্পন্ন করেই ইন্তেকাল করেছেন বিধায় আর অগ্রসর হতে পারেননি। এটি এখনো পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে। অতি শীঘ্র এটি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে। إن شاء الله

ইতিহাসখ্যাত কসিদা বুরদার সার্থক অনুবাদকর্মের নমুনা

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মুহাব্বত ও ইশকের বয়ান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَمِنْ تَـذَكُّرِ جِـيْرَانٍ بِـذِىْ سَـلَمٍ مَزَجْتَ دَمْعًا جَـرٰى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمٍ

হে আমার মন! তোমার মাহবুব (প্রিয়তম)-এর দেশ যি-সলমের প্রতিবেশীদের কথা কি স্মরণ হয়েছে? তোমার নয়নযুগল হতে যে রক্ত মিশ্রিত অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। (এই কসিদার বরকত ও উপকার অসীম। মুসিবত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তা প্রসিদ্ধ। এর প্রথম অক্ষরও ২য় শব্দ (من) এবং ৩য় শব্দের প্রথম অক্ষর (ت) একত্রিত করলে কসিদার প্রথম শব্দ বাহির হয় (أمنتَ) এর অর্থ হলো, তুমি নিরাপদ হয়েছো, তুমি আমান পেয়েছো। অর্থাৎ এর দ্বারা এক মূল্যবান শুভফল হাসিল হয়।

(২) اَمْ هَبَّتِ الرِّيْحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ أَوْ أَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظُّلْمَاءِ مِنْ اِضَمٍ

অথবা কাযেমার দিক হতে কি বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে এবং অন্ধকারের ভেতর এযম্ পর্বতে বিজলি চমকেছে?

(৩) فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَا وَمَا لِقَلْبِـكَ إِنْ قُـلْتَ اسْـتَفِقْ يَهِمٍ

তোমার উভয় চক্ষুর কী অবস্থা? যদি তুমি তাদেরকে ক্ষান্ত হতে বলো তারা যে আরও অধিক অশ্রু বর্ষণ করে? আর তোমার হৃদয়ের কী অবস্থা, তুমি তাকে স্বজ্ঞানে আসার জন্য বললে সে যে আরো আত্মহারা হয়? (অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তা প্রেমের প্রতিক্রিয়া ও বিরহ-যাতনা ছাড়া অন্য কোনো বিপদাপদের কারণে নয়)।

(৪) أَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ مَا بَيْـنَ مُنْسَـجِمٍ مِّـنْهُ وَمُضْـطَرِمٍ

প্রেমিক কি ধারণা করছে যে, তার প্রেম গোপন থাকবে এমন অবস্থায় যে, তার নয়নযুগল হতে রক্তাশ্রু ঝরছে এবং হৃদয়ের বিরহানল শিখা বহির্গত হচ্ছে?

(৫) لَوْلَا الْهَوٰى لَمْ تُرِقْ دَمْعًا عَلٰى طَلَلٍ وَلَا أَرَقْـتَ لِذِكْرِ الْبَـانِ وَالْعَـلَمٍ

যদি তুমি প্রেমরোগে আক্রান্ত না হতে, তাহলে টিলার ওপর বসে কাঁদতে না ও বানবৃক্ষ ও সেখানকার নিশানার কথা উঠলে অধীর হতে না।

(৬) فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ بِه عَلَيْـكَ عَـدُوْلُ الدَّمْـعِ وَالسَّـقَمٍ

তোমার রক্তাশ্রু ও রোগ-কাতরতা উভয় সত্যবাদী সাক্ষী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তুমি কীরূপে প্রেমের কথা অস্বীকার করবে? (অতএব অস্বীকার করে গোপন রাখার চেষ্টা ফলদায়ক হবে না)।

(৭) وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وَّضَنًى مِثْلَ الْبَهَارِ عَلٰى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ

এবং প্রেম ও বিরহের অনল তোমার চেহারার ওপর রক্তাশ্রু ও রোগ দুর্বলতার দুটি রেখা হলদে রঙ এর ফুলের মতো ও রক্তবর্ণ ডালের মতো স্থাপন করেছে (এমতাবস্থায়ও কি প্রেম গোপন রাখা সম্ভব?)।

(৮) نَعَمْ سَرٰى طَيْفُ مَنْ أَهْوٰى فَأَرَّقَنِيْ وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَّاتِ بِالْأَلَمِ

(যখন প্রেমের বিষয় গোপন করার সকল পথ বন্ধ হয়ে গেলো তখন কবি প্রেমকাহিনী বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন)। হ্যাঁ, আমার অন্তরে মাহবুবের প্রেমানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। তাতে হৃদয় বিগলিত হয়ে রক্তাশ্রু ঝরছে। অবশ্য প্রেম ও বিরহানল সকল প্রকার সুখ-শান্তিকে যাতনায় পরিবর্তিত করে।

(৯) يَا لَائِمِيْ فِي الْهَوٰى الْعُذْرِيِّ مَعْذِرَةً مِنِّيْ اِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ

হে আমার তিরস্কারকারী (প্রেম সম্বন্ধে)! আমাকে প্রেমের বিষয়ে অপারগ সাব্যস্ত করো। বনী আয্‌রার প্রেমের মতো আমার প্রেম স্থায়ী। তা ত্যাগ করার ক্ষমতা আমার মধ্যে নেই। যদি তুমি সুবিচারক হতে তাহলে আমাকে তিরস্কার করতে না।

(১০) عَدَتْكَ حَالِيْ لَا سِرِّيْ بِمُسْتَتِرٍ عَنِ الْوُشَاةِ وَلَاأَدَائِيْ بِمُنْحَسِمِ

তোমার কাছে আমার অভ্যন্তরীণ প্রেমের অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে। এখন আমার অবস্থাদি আমার নিন্দুক চুগলখোরদের কাছে গোপন থাকবে না এবং আমার এই প্রেমরোগও আরোগ্য হবে না।

(১১) مَحَضْتَنِيْ النُّصْحَ لٰكِنْ لَسْتُ اَسْمَعُهُ اِنَّ الْمُحِبَّ عَنِ الْعُذَّالِ فِيْ صَمَمِ

অবশ্য তুমি খাঁটি মঙ্গলকামী হয়ে আমাকে (প্রেম ত্যাগের) উপদেশ দিয়েছো। কিন্তু তা আমি শ্রবণ করি না। কারণ, প্রেমিক তিরস্কারকারীদের বেলায় বধির হয়ে থাকে (আমিও তদ্রূপ খাঁটি প্রেমিক)।

(১২) اِنِّيْ اَتَّهَمْتُ نَصِيْحَ الشَّيْبِ فِيْ عَذَلِيْ وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ فِيْ نُصْحٍ عَنِ التُّهَمِ

(আরব কবিগণের সাধারণ নিয়মানুসারে গ্রন্থকার প্রেম ও প্রেমের অবস্থাদি বর্ণনা করেন। তাতে মূল উদ্দেশ্য তার হৃদয়ে যে রাসুলের প্রেম-তরঙ্গ বিদ্যমান তার কিছু কিছু ইঙ্গিত দেয়া। এখন ধীরে ধীরে তিনি মূল উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হবেন। কতেক অনুতাপ ও উপদেশের পর পরিষ্কার ভাষায় হযরত নবী করিম (সা)-এর না'ত ও প্রশংসা আরম্ভ করবেন।)

আমি আমার সত্যিকার মঙ্গলকামী উপদেশদাতা বার্ধক্যকে অবিশ্বাস করেছি। (সে আমাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দুনিয়ার বিলাস-প্রিয়তা ছেড়ে পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু আমি তা মানিনি) অথচ বার্ধক্য অবিশ্বাস্য হওয়ার মতো ব্যাপার নয়।

নফসের ভোগ ও বিলাসপ্রিয়তায় বাধাপ্রদান

(১৩) فَإِنَّ اَمَّارَتِيْ بِالسُّوْءِ مَا اتَّعَظَتْ مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيْرِ الشَّيْبِ وَالْهَرَمِ

আমার নফসে আম্মারা (যে কুপ্রবৃত্তি সর্বদা অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস ও মন্দকাজের দিকে মনকে টেনে নিয়ে যায়) স্বীয় মূর্খতা ও অদূরদর্শিতার কারণে পূর্ণবয়স ও বার্ধক্য-উভয় ভয় প্রদর্শনকারী উপদেশদাতাকে গ্রাহ্য করেনি।

(১৪) وَلَا اَعَدَّتْ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيْلِ قِرٰى ضَيْفٍ أَلَمَّ بِرَأْسِيْ غَيْرَ مُحْتَشَمِ

যে অতিথি মেহমান (বার্ধক্য এবং সাদা চুল, দাড়ি) আগমনপূর্বক আমার মস্তকে ও চেহারাতে আসন গ্রহণ করেছে, তার জন্য আমার নফস (কুপ্রবৃত্তি) কোনরূপ আতিথ্যের ব্যবস্থা করেনি। (অর্থাৎ পুণ্য কাজের ও পাপ হতে বিরত থাকার কোনো চেষ্টা করেনি।)

(১৫) لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اِنِّيْ مَا أُوَقِّرُهُ كَتَمْتُ سِرًّا بَدَالِيْ مِنْهُ بِالْكَتَمِ

যদি আমি জানতাম যে, এই মেহমানের মর্যাদা দানে সক্ষম হবো না; তা হলে এই গুপ্তরহস্য (বার্ধক্য) যা আমার শরীরে প্রকাশ পেয়েছে তাকে খেযাব দ্বারা লুকিয়ে রাখতাম। (একথা বলার উদ্দেশ্য হলো বার্ধক্যকে লুকিয়ে রাখা যেমন অসম্ভব, সৎকর্ম দ্বারা তার জন্য প্রস্তুত না থাকাও তেমনই ভীষণ ক্ষতিকর)।

(১৬) مَنْ لِّيْ بِرَدِّ جِمَاحٍ مِّنْ غَوَايَتِهَا كَمَا يُرَدُّ جِمَاحُ الْخَيْلِ بِاللُّجُمِ

কে আছেন আমার এমন হিতকামী, যিনি এই অবাধ্য নফ্সকে তার গুমরাহি ও অবাধ্যতা হতে বাধা দিয়ে রাখবে। যেমনভাবে অবাধ্য ঘোড়াকে লাগাম দ্বারা বিরত রাখা হয়।

(১৭) فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاصِيْ كَسْرَ شَهْوَتِهَا اِنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّيْ شَهْوَةَ النَّهَمِ

পাপের কাজ করে নফসের ভোগ-লিপ্সা ও শাহওয়াত-কামনাকে ভাঙ্গার ইচ্ছা ও আশা করো না। কারণ প্রচুর আহার করা আহারের দুর্লোভ বৃদ্ধি করে। (তদ্রূপ নফ্স যতই পাপ করবে ততই তার পাপ আসক্তি বাড়বে)।

(১৮) وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلٰى حُبِّ الرِّضَاعِ وَاِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ

নফস দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো; যদি স্তন্যপানে ছেড়ে দিয়ে রাখ তাহলে সে দুধের লোভের মধ্যেই যৌবন লাভ করবে। আর যদি তাকে দুধ ছাড়িয়ে দাও তাহলে সে ছেড়ে দেবে।

(১৯) فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ اِنْ تَوَلِّيَهُ اِنَّ الْهَوٰى مَا تَوَلّٰى يُصِمِ أَوْ يَصِمِ

নফসের দুর্লোভ ও মন্দ কামনা-বাসনাকে তাড়িয়ে দাও এবং সাবধান! তার ওপর তার কাম, ক্রোধ ও লোভকে প্রবল করে দিও না। কারণ দুর্লোভ যখন জয়ী হয় তখন জীবন শেষ করে দেয়। অথবা দোষী-দাগি বানিয়ে অপমানিত করে।

(২০) وَرَاعِهَا وَهْيَ فِي الْأَعْمَالِ سَائِمَةٌ وَاِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعٰى فَلَا تُسِمِ

নফসের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখো। সে কার্যকলাপের ক্ষেত্রে খোলা মাঠে বিচরণকারী পশুর মতো। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিচরণ তার নিকট খুবই মিষ্টি বোধ হলেও তাকে অবাধে বিচরণ করতে ছেড়ে দিও না।

(২১) كَمْ حَسَّنَتْ لَذَّةً لِّلْمَرْءِ قَاتِلَةً مِّنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السَّمَّ فِي الدَّسَمِ

সর্বদা সে মানুষের সামনে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক করে দেখিয়েছে। অথচ তা মানবের পরকালীন জীবন ধ্বংসকারী। যেভাবে সে চর্বিদার সুস্বাদু খাবারের ভেতর যে বিষ আছে তা মোটেই টের পায় না।

(২২) وَاخْشَ الدَّسَائِسَ مِنْ جُوْعٍ وَّمِنْ شَبَعٍ فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِّنَ التُّخَمِ

নফসের কুহক ও গোপন ষড়যন্ত্র যা ক্ষুধা ও তৃপ্তির অবস্থাদির ভেতর দিয়ে সে করে থাকে, সে বিষয়ে ভীত ও সতর্ক থেকো। কারণ অনেক সময় এমন হয় যে, ক্ষুধার অবস্থা পূর্ণ উদরাবস্থার চেয়েও ক্ষতিকর হয়। (অধিক রোযা রাখা যদি লোক দেখানো হয় বা উপবাস অবস্থায় আল্লাহর প্রতি নারাজি প্রকাশ করে তা খুবই মারাত্মক।)

(২৩) وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدِ امْتَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ

তোমার সে নয়নযুগল হারাম ও পাপে পরিপূর্ণ (অর্থাৎ পাপদৃষ্টি ও মন্দ অভিপ্রায়ের নযর ইত্যাদি)। সে চক্ষু হতে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করো এবং অনুতাপের প্রহরীকে চিরসঙ্গী করে নাও। (কারণ অনুতপ্ত হৃদয়ে পাপলিপ্সা থাকে না)।

(২৪) وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا وَإِنْ هُمَا مَحَضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ

নফস এবং ইবলিস উভয়ের বিরুদ্ধাচরণ করো। যদি তারা কোনো সময় খাঁটি উপদেশও দেয় তাও অবিশ্বাস করো। (কারণ ভেতরে দুরভিসন্ধি থাকবেই, যা প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে না)।

(২৫) وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ

কোনো অবস্থাতেই নফস ও শয়তানের আদেশ পালন করো না। তোমার বিবাদী হলেও না বা তোমার ও তোমার বিবাদীর মাঝখানে শালিসকার সাজলেও না। কারণ, বিবাদী এবং শালিসকার দ্বারা কতো রকমের ধোঁকাবাজি হতে পারে, তা তুমি জানো।

(২৬) أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ قَوْلٍ بِلَا عَمَلٍ لَقَدْ نَسَبْتُ بِهِ نَسْلًا لِّذِيْ عُقُمِ

এমন সুবাক্য ও নসিহত উচ্চারণ করা, যা নিজে আমল করিনি-সেরূপ পাপ হতে আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। কারণ, আমি এরূপ করে থাকলে তা নিঃসন্তান লোকের পরবর্তী বংশ প্রমাণ করার মতো হয় (তা যেমন মিথ্যা তেমনি সেটিও মিথ্যার মধ্যে গণ্য)

(২৭) اَمَرْتُكَ الْخَيْرَ لٰكِنْ مَّا أَتَمَرْتُ بِهِ وَمَا اَسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِيْ لَكَ اسْتَقِمِ

আমি তোমাকে সৎকাজের আদেশ দিলাম, অথচ আমি নিজে তা করলাম না। আমি স্বয়ং সৎপথে স্থির থাকলাম না আর তোমাকে অটল থাকার উপদেশ দিলাম, ব্যাপারটি কী রকম দেখায়? (হাস্যকরই বটে)।

(২৮) وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً وَلَمْ أُصَلِّ سِوٰى فَرْضٍ وَلَمْ أَصُمِ

হায়! আমি মরণের পূর্বে পরকালের মঙ্গলের জন্য কোনো নফল ইবাদতের পাথেয় যোগাড় করিনি। ফরয ব্যতীত কোনো নফল নামাযও পড়িনি এবং নফল রোযাও রাখিনি।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশংসা

(২৯) ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيَى الظَّلَامَ اِلٰى اَنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرَّ مِنْ وَّرَم

যিনি আল্লাহর ইবাদতে এতো দীর্ঘ সময় রাত্রি জাগরণ করতেন, যাতে তাঁর উভয় পা ফুলে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যেতো, আমি তাঁর আদর্শের প্রতি অন্যায় ও চরম অবহেলা করেছি। (তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল ইবাদত সম্বন্ধে আমার অবহেলা নিশ্চয়ই অনুতাপের বিষয়। অথচ তিনি আল্লাহর হাবিব হওয়া সত্ত্বেও এতো কষ্ট করতেন। তাহাজ্জুদে এক এক রাকাতে আড়াই পারা, তিন পারা কুরআন পাঠ করতেন এবং তাতে তাঁর পা ফুলে যেতো)।

(৩০) وَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ اَحْشَاءَهُ وَطَوٰى تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتْرَفَ الْاَدَم

এবং তিনি (উপবাসের কারণে) তাঁর নরম, নাজুক চর্মের ওপর পাথর রেখে কষে পেট বেঁধে রাখতেন। (আমরা সেরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি।)

(৩১) وراوَدَتْـهُ الْجِبَالُ الشُّـمُّ مِن ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِـهٖ فَـأَرَاهَا أَيَّمَـا شَمَم

সুউচ্চ, বিরাট পর্বতমালা স্বর্ণে পরিণত হয়ে তাঁর মন আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তিনি সেদিকে একটুও আগ্রহ না দেখিয়ে স্বীয় মহানুভবতা প্রমাণ করেন (আমরা এই আদর্শের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছি)।

(৩২) وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيْهَا ضَرُوْرَتُهُ إِنَّ الضَّرُوْرَةَ لَا تَعْدُوْ عَلَى الْعِصَم

তাঁর অভাব-অনটন ও উপবাস ইত্যাদি উক্ত ধন-দৌলত সম্বন্ধে তাঁর পরহেযগারি ও সংযমী জীবনকে আরও অটুট করেছিলো। কারণ, অভাব-অনটন সংযমের রক্ষণসীমা অতিক্রম করতে পারে না। [হযরত (সা.)-এর হৃদয়কে আল্লাহ এমনই গড়েছিলেন যে, পার্থিব জীবনের কোনো পরিস্থিতি তাঁর ধৈর্য ও ত্যাগের ওপর জয়লাভ করতে পারেনি।]

(৩৩) وَكَيْفَ تَدْعُوْا إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَـمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَم

যিনি না হলে অস্তিত্ব জগত হতো না তাঁর মতো মহান মানবকে অভাব-অনটন কীরূপে দুনিয়ার দিকে আকর্ষণ করবে?

(৩৪) مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَم

হযরত মুহাম্মদ (সা.) দুনিয়া, আখিরাত ও মানব-দানব এবং আরব-অনারব সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের সর্দার, শিরোমণি।

(৩৫) نَبِيُّنَا الْآمِرُ النَّاهِيْ فَلَا اَحَدٌ أَبَرَّ فِيْ قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَم

আমাদের নবী (সা.) (সৎ ও ন্যায়ের) আদেশদাতা (মন্দ ও অন্যায়ের) নিষেধকারী। অতএব হ্যাঁ এবং না বলার (অর্থাৎ আদেশ দান ও নিষেধ করার) ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ ন্যায়বান কেউ হতে পারে না।

(৩৬) هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِيْ تُرْجَىٰ شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِمِ

তিনি (আল্লাহর) এমনই প্রিয় যে, (কিয়ামতের দিন) সকল প্রকার ভয়ঙ্কর বিপদ-আপদের সময় তাঁর সুপারিশের আশা করা হয়।

(৩৭) دَعَا إِلَى اللهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمِ

তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। আর যাঁরা তাঁর আদর্শকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে তাঁরা এক অটুট রজ্জু ধারণ করেছে।

(৩৮) فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِيْ خَلْقٍ وَفِيْ خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوْهُ فِيْ عِلْمٍ وَّلَا كَرَمِ

আকৃতি ও চরিত্র সর্বদিক দিয়ে সকল আম্বিয়া (আ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি। আর ইলম ও বুযর্গিতে কেউ তাঁর সমতুল্য হওয়া সম্ভবই নয়। কেউ তাঁর কাছাকাছিও নন।

(৩৯) وَكُلُّهُمْ مِّنْ رَّسُوْلِ اللهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ

আম্বিয়া (আ.) সকলেই হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমীপে (ইলমের) সমুদ্র হতে যৎকিঞ্চিৎ এবং বুযুর্গি ও দানশীলতার বৃষ্টি হতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ যাঞ্ছা করেন।

(৪০) وَوَاقِفُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمِ مِنْ نُّقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ

এবং সকলেই স্বীয় মর্যাদানুসারে হুযুর (সা.)-এর নিকট তাঁর ইলমের এক বিন্দু বা তাঁর হিকমতের যৎকিঞ্চিৎ পাওয়ার জন্য অপেক্ষমান।

(৪১) فَهُوَ الَّذِيْ تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ

হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) এমনই যে, তাঁর বাতেনি গুণাবলী এবং যাহেরি সুরত উভয়ই সম্পূর্ণ। অতএব সৃষ্টিলোকের স্রষ্টা আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁকে হাবিবরূপে বাছাই করেন।

(৪২) مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِيْ مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

তিনি (সৃষ্টি জগতে) স্বীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীতে সমকক্ষহীন, সৌন্দর্য ও গুণাবলীর মূল উপাদান অবিভক্তরূপে তাঁরই ভেতর বিদ্যমান।

(৪৩) دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَىٰ فِيْ نَبِيِّهِمِ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِمِ

খ্রিস্টানরা তাদের নবী (আ.) সম্বন্ধে যেরূপ দাবী করে (তাঁকে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করে তাওহিদের ঈমান নষ্ট করেছে) তা বর্জন করো এবং (তা ব্যতীত) হুযুর (সা.)-এর প্রশংসায় যতো ইচ্ছে হয় আরোপ করো এবং তাঁর ওপর দৃঢ় থাকো। (কারণ, খোদার আসনের পর সৃষ্টিজগতে তাঁর আসন সকলের ঊর্ধ্বে)!

(৪৪) وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ

তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে যতো ইচ্ছে হয় বুযর্গি ও মাহাত্ম্য যুক্ত করো এবং তাঁর কদর ও মর্যাদার প্রতি যতো ইচ্ছে হয় উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের সংযোগ সাধন করো। কারণ:

(৪৫) فَإِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

হযরত (সা.)-এর ফযিলত ও বুযর্গির কোনো সীমা নেই, যার বর্ণনা কোনো বক্তার মুখে যথাযথভাবে দেয়া সম্ভব হতে পারে।

(৪৬) لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظَمًا أَحْيَى اسْمُهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرِّمَمِ

হযরত (সা.)-এর মু'জিযাদি (অলৌকিকত্ব) যদি তাঁর কদর ও মর্যাদার অনুপাতে প্রকাশ পেতো তাহলে তা মৃত প্রাণির পচা-গলিত হাড়সমূহকে জীবিত করে দিতো।

(৪৭) لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَ الْعُقُوْلُ بِهِ حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمِ

এমন কোনো জটিল বিষয় নিয়ে তিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করেননি, যা বুঝে উঠতে আমাদের বুদ্ধি অসমর্থ হয়ে পড়ে। কারণ আমাদের হেদায়াতের প্রতি তাঁর লোভ ও অনুগ্রহ অতিরিক্ত ছিলো। (কাজেই তিনি অতি সরল-সহজ আদর্শ রেখে গেলেন) সে কারণে আমরা কোনো সন্দেহ বা হয়রানিতে পড়িনি।

(৪৮) أَعْيَ الْوَرَىٰ فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَىٰ لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مِنْهُ غَيْرُ مُنْفَحِمِ

হযরত (সা.)-এর হাকিকত ও মর্যাদার মাহাত্ম্য নির্ণয়ে সুধীবৃন্দ অক্ষম, তাঁরা আম্বিয়া হোন, সাহাবা হোন অথবা আউলিয়া হোন কিংবা মর্যাদা বা জমানা হিসেবে তার কাছাকাছি হোন বা দূরত্বের কেউ হোন তাঁর মাহাত্ম্যের সঠিক ধারণা করতে সক্ষম নন।

(৪৯) كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعُدٍ صَغِيْرَةً وَتُكِلُّ الطَّرْفَ مِنْ أَمَمِ

যেমন সূর্য দূর হতে ছোট গোলকের ন্যায় দেখা যায়, অথচ তার দিকে তাকালে চোখকে ঝাপসা এবং অক্ষম করে দেয়।

(৫০) وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ

(যখন আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ হযরতের (সা.) হাকিকত ও মাহাত্ম্য অনুধাবনে অক্ষম তখন) এই সমস্ত ঘুমন্ত গাফেল লোক যারা স্বপ্ন দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে তারা কীরূপে হুযুর (সা.)-এর মহান মর্যাদা নির্ণয় করতে সক্ষম হবে?

(৫১) فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ كُلِّهِمِ

অতএব তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি জ্ঞান এই যে, তিনি মানব এবং আল্লাহর সকল সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ।

(৫২) وَكُلُّ أَيٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُوْرِهِ بِهِمِ

সকল প্রকার মুজিযার নিদর্শন, যা আম্বিয়ায়ে কিরাম দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে, সে সমস্ত তাঁরা হুযুর (সা.)-এর নূর হতে প্রাপ্ত হয়েছেন।

(৫৩) فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

নিশ্চয়ই তিনি ফযিলত ও মর্যাদার সূর্য, তাঁরা এই সূর্যের তারকারাজি। হুযুর (সা.)-এর আগমনের পূর্বে যাঁরা বিশ্বমানবকে অন্ধকারযুগে উক্ত সূর্যের হেদায়াতের আলো প্রদর্শন করছিলেন। (যখন তিনি ইহজগতে জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁদের পয়গম্বরি খতম বা চূড়ান্ত এবং সাবেক ধর্মসমূহ বিলোপ হয়ে যায়। কারণ সূর্যোদয়ের পর তারকার অস্তিত্ব অদৃশ্য হয়ে যায়।)

(৫৪) حَتَّىٰ إِذَا طَلَعَتْ فِي الْكَوْنِ عَمَّ هُدَاهَا الْعَالَـمِيْنَ وَأَحْيَتْ سَائِرَ الْأُمَمِ

অবশেষে তাঁর সূর্য উদিত হয়ে [হুযুর (সা.)-এর শুভাগমনের পর] সারা জাহানে হেদায়াতের আলো সার্বজনীন হয়ে গেলো; সমস্ত উম্মতকে পুনর্জীবন দান করলো।

(৫৫) أَكْـرِمْ بِخَـلْقٍ نَبِيٍّ زَانَهُ خُـلُقٌ بِالْـحُسْنِ مُشْتَمِلٌ بِالْبِشْرِ مُتَّسِمِ

হযরত (সা.)-এর প্রকৃতি, আকৃতি অতুলনীয় এবং অনুপম, যার সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব আরও বৃদ্ধি করেছে তাঁর মহান চরিত্র। তিনি যেনো আপাদমস্তক স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের জামা পরিহিত এবং সুন্দর চেহারাখানা তাঁর হাসি মিশ্রিত।

(৫৬) كَالزَّهْرِ فِيْ تَرَفٍ وَّالْبَدْرِ فِيْ شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِيْ كَرَمٍ وَّالدَّهْرِ فِيْ هِمَمِ

কোমলতা ও স্নিগ্ধতায় তিনি পুষ্পকলির মতো। উচ্চতা উজ্জ্বলতায় পূর্ণিমার চাঁদের মতো। প্রশস্ততা ও প্রচুর দানশীলতায় সমুদ্রের মতো। দুর্বার তৎপরতায় কালের গতির মতো।

(৫৭) كَأَنَّهُ وَهْوَ فَرْدٌ مِنْ جَلاَلَتِهِ فِيْ عَسْكَرٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ وَفِيْ حَشَمِ

এতো কোমল স্বভাব, নম্র মেজাজ সত্ত্বেও যখন হুযুর (সা.) একাকী বসেন তখন তুমি তাঁর সাথে দেখা করলে তাঁর প্রতাপ ও পরাক্রমের কারণে তোমার বোধ হবে যেনো তিনি বহু সৈন্য-সামন্তে পরিবেষ্টিত আছেন।

(৫৮) كَأَنَّمَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُوْنُ فِيْ صَدَفٍ مِنْ مَّعْدَنَيْ مَنْطِقٍ مِّنْهُ وَمُبْتَسَمِ

হযরত (সা.)-এর বাণী ও দন্তরাজি যেনো মণিমাণিক্য, যা এ যাবত খনি হতে বের হয়ে আসেনি। কথা বলার সময় বা মুচকি হাসার সময় এরূপই দেখায়। (ছিপি হতে বের হয়ে মানবহস্তের মলন-দলন স্পর্শে পতিত হওয়ার পূর্বে মণিরত্ন অত্যন্ত উজ্জ্বল চমৎকার থাকে, হুযুর (সা.)-এর বাণী এবং দন্ত মোবারকও সেরূপ চমৎকার)।

(৫৯) لَا طِيْبَ يَعْدِلُ تُرْبًا ضَمَّ أَعْظَمَهُ طُوبَىٰ لِـمُنْتَشِقٍ مِّنْهُ وَمُلْتَثِمِ

যেই মাটি হুযুর (সা.)-এর দেহ সংলগ্ন হয়ে আছে, পৃথিবীর কোনো সুগন্ধি তার সমতুল্য নয়। সুসংবাদ তাঁর সাফল্যের প্রতি, যিনি এর ঘ্রাণ লাভ এবং তাকে চুম্বন দিতে সক্ষম হয়েছেন।

হযরত (সা.)-এর জন্মগ্রহণ

(৬০) أَبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيْبِ عُنْصُرِهِ يَا طِيْبَ مُبْتَدَئٍ مِّنْهُ وَمُخْتَتَمِ

হযরত (সা.)-এর জন্মগ্রহণ তাঁর শরীর গঠনের উপাদানের পবিত্রতাকে প্রকাশ করেছে। (কারণ তখন আরব ও অন্যান্য বহু স্থানে অনেক রকম আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিলো) সুবহানাল্লাহ! হুযুর (সা.)-এর আদি ও অন্ত উভয়ই পবিত্র।

(৬১) يَوْمٌ تَفَرَّسَ فِيْهِ الْفُرْسُ أَنَّهُمُ قَدْ أُنْذِرُوْا بِحُلُوْلِ الْبُؤْسِ وَالنِّقَمِ

হযরত (সা.)-এর জন্মদিবস এমন বিপ্লবাত্মক দিন ছিলো যে, পারস্যবাসীগণ (তাদের পূজ্য-দেবতা সহস্র বছরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হঠাৎ নির্বাপিত হওয়ায়) স্বীয় জ্ঞান ও জ্যোতিষী গণকদের গণনা দ্বারা বুঝেছিলো, অদূর ভবিষ্যতে তাদের ওপর সঙ্কটজনক অবস্থা ও ভয়ানক শাস্তি নাযিল হবে এবং তাদের সহস্রাধিক বছরের পুরাতন শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে।

(৬২) وَبَاتَ إِيْوَانُ كِسْرَىٰ وَهْوَ مُنْصَدِعٌ كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَىٰ غَيْرَ مُلْتَئِمِ

হযরত (সা.)-এর জন্মমুহূর্তে পারস্য সম্রাটের প্রাসাদে ফাটল পড়ে। তদ্রূপ তার সৈন্যদের মধ্যেও এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যে, তাদের ভেতর আর সংঘবদ্ধতা রইলো না। প্রাসাদের আকাশস্পর্শী কঙ্গুরাগুলোর মধ্যে ১৪টি ফেটে যায়। জ্যোতিষীরা জানালো, বর্তমান সম্রাটের পর তার বংশধর পরপর ১৪ জন সিংহাসনে বসবে। তাতে সম্রাট শান্ত হলেন, মনে করলেন যে, আমার বংশধরের মধ্যে আরও বহুদিন রাজত্ব বহাল থাকবে। কিন্তু ঘটনা এরূপ দাঁড়ালো যে, ৪ বছরের ভেতর ১০ জন সম্রাট গত হয়ে গেলো। অবশিষ্ট ৪ জন হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফত পর্যন্ত শেষ হয়। তারপর সম্পূর্ণ পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের হস্তগত হয়।

(৬৩) وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْأَنْفَاسِ مِنْ أَسَفٍ عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاجِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ

এবং সেদিন তাদের উপাস্য দেবতা সহস্র বছরের ক্রমাগত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড পারস্য সাম্রাজ্যের অদূর ভবিষ্যতে পতনের বিষয় জ্ঞাত হয়ে বিষাদগ্রস্ত অন্তর ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ত্যাগপূর্বক নিভে যায় এবং ফোরাত নদী দুঃখিত মনে সাওয়ার ঘাটে গিয়ে পতিত হয়।

(৬৪) وَسَاءَ سَاوَةَ أَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا وَرَدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِيْنَ ظَمِيْ

এবং এই ঘটনা সাওয়াবাসীদের বিষাদগ্রস্ত করলো যে, তাদের ছোট দরিয়াটির পানি শুকিয়ে গেলো এবং তার ঘাট হতে পিপাসার্তদের বিফল মনোরথে ফিরিয়ে দিলো।

(৬৫) كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْـمَاءِ مِنْ بَلَلٍ حُزْنًا وَّبِالْـمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمِ

এমন হলো যেনো বিষাদের কারণে আগুনের দহন স্বভাবে শীতলতা আসলো এবং পানির ভেতর আগুনের উষ্ণতা এসে শুকিয়ে গেলো।

(৬৬) وَالْـجِنُّ تَهْتِفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ وَالْـحَقُّ يُظْهَرُ مِنْ مَعْنًىً وَمِنْ كَلِمِ

আর সে সময় জিনরা (হুযুর সা.-এর আগমন) সম্পর্কে আওয়াজ দিচ্ছিলো, বিভিন্ন স্থানে বহু নূর (জ্যোতি) প্রকাশিত হচ্ছিলো এবং সত্য (পয়গাম্বরি) নুরের আভা ও গায়েবি আওয়াজ দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছিলো।

(৬৭) عَمُّوْا وَصَمُّوْا فَإِعِلَانُ الْبَشَائِرِ لَـمْ تُسْمَعْ وَبَارِقَةُ الْإِنْذَارِ لَـمْ تُشَمِ

(এসব আলামত দর্শন সত্ত্বেও) তারা (অবিশ্বাসীগণ) অন্ধ ও বধির বনে রইলো। পয়গাম্বরির সুসংবাদাদি তাদের কানে পৌঁছলো না। আর ভয়প্রদর্শনের বিদ্যুৎ ইত্যাদি তাদের দৃষ্টিগোচর হলো না। (শুনেও শুনলো না, দেখেও দেখলো না)।

(৬৮) مِنْ بَعْدِمَا اَخْبَرَ الْأَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ بِأَنَّ دِينَهُمُ الْـمُعْرَجُ لَـمْ يَقُمِ

এতদসত্ত্বেও সে জাতিসমূহকে তাদের জ্যোতিষীরা সংবাদ জানান যে, তাদের বর্তমান প্রচলিত অশুদ্ধ বক্রধর্ম বহাল থাকবে না (কিন্তু তারা অন্ধত্ব ও বধিরতা অবলম্বন করলো)

(৬৯) وَبَعْدَمَا عَايَنُوْا فِي الْأُفْقِ مِنْ شُهُبٍ مُنْقَضَّةٍ وَفْقَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ صَنَمِ

এতদসত্ত্বেও যে তারা আসমানের দিগন্তসমূহে (নিম্নমুখী ধাবমান) উল্কাসমূহ দর্শন করলো (সেগুলো জিনদেরকে তাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়) এবং জমিনে সকল ঠাকুরঘরের পুত্তলিকাসমূহ উপুড় হয়ে পড়েছিলো। (এরপরও তারা সত্য ধর্মে আসলো না, অন্ধ ও বধির হয়ে রইলো।)

(৭০) حَتَّىٰ غَدَا عَنْ طَرِيْقِ الْوَحْيِ مُنْهَزِمٌ مِّنَ الشَّيَاطِيْنِ يَقْفُوْا إِثْرَ مُنْهَزِمِ

শয়তান জিনদের প্রতি এতো প্রচুর পরিমাণে অগ্নিশিখা বর্ষিত হলো যে, তারা ওহি (ঐশীবাণী) অবতরণের পথ ছেড়ে পেছনে পলায়ন করলো।

(৭১) كَأَنَّهُمْ هَرَبًا أَبْطَالُ أَبْرَهَةٍ أَوْ عَسْكَرٌ بِالْـحَصٰى مِنْ رَّاحَتَيْهِ رُمِى

উক্ত জিনদের পলায়নের ধারা এমন ছিলো, যেমন মক্কানগরী হতে আবরাহার সেনাবাহিনী অথবা সেই পলাতক সেনার মতো, যখন হযরত (সা.) কুরাইশদের প্রতি কঙ্করমুষ্ঠি নিক্ষেপ করেছিলেন।

(৭২) نَبْذًا بِهِ بَعْدَ تَسْبِيْحٍ بِبَطْنِهِمَا نَبْذَ الْـمُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِمِ

এসব কংকর হযরত (সা.)-এর মুষ্ঠির মধ্যে তাসবিহ পাঠ করছিলো। এমতাবস্থায় তিনি সেগুলো বিধর্মী দলের দিকে নিক্ষেপ করেন; যেমনভাবে তাসবিহ পাঠরত ইউনুস (আ.)-কে তাঁর গ্রাসকারী মৎস্য বের করে দিয়েছিলো। (মৎস্যগর্ভে তিনি দুআ ইউনুস পড়েছিলেন)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মু'জিযাসমূহ

(৭৩) جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً تَمْشِيْ إِلَيْهِ عَلَىٰ سَاقٍ بِلَا قَدَمِ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আহ্বানে বৃক্ষাদি সিজদারত অবস্থায় তাঁর প্রতি অগ্রসর হলো। গাছেরা পায়ের পাতা ছাড়া কাণ্ডমূলের ওপর ভর করে চলে আসলো (এ ধরনের বহু ঘটনা ঘটেছে।)

(৭৪) كَأَنَّمَا سَطَرَتْ سَطْرًا لِّـمَا كَتَبَتْ فُرُوْعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْـخَطِّ فِي اللَّقَمِ

হুযুর (সা.)-এর আহ্বানে বৃক্ষাদি ডালপালাসহ জমির ওপর রেখা টেনে আসলো, যেনো রাস্তায় একটি লাইন লিখে চললো।

(৭৫) مِثْلُ الْغَمَامَةِ أَنَّىٰ سَارَ سَائِرَةً تَقِيْهِ حَرَّ وَطِيْسٍ لِّلْهَجِيْرِ حَمِيْ

বৃক্ষের আদেশ পালন ও মেঘখণ্ডের আনুগত্যের মতো হযরত (সা.)-কে দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত গরম হতে রক্ষা করার মানসে তিনি যেদিকে ভ্রমণ করতেন, মেঘখণ্ডও মাথার ওপর ছায়া করে সঙ্গে-সঙ্গে ভ্রমণ করতো।

(৭৬) أَقْسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْـمُنْشَقِّ إِنَّ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَّبْرُورَةَ الْقَسَمِ

আমি দ্বিখণ্ডিত চাঁদের কসম করে বলেছি যে, তাঁর অন্তরের সাথে চাঁদের সম্বন্ধ (অভ্যন্তরীণ সংস্রব) রয়েছে। আর এই কসম খাওয়ায় কোনো খাদ নেই।

(চাঁদ, সূর্য ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব ও গুণাবলী সমস্তই তার উসিলাতে হাসিল হয়েছে)।

(৭৭) وَمَا حَوَي الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَّمِنْ كَرَمٍ وَكُلُّ طَرْفٍ مِّنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِيْ

সমস্ত কল্যাণ ও মহত্ত্বের কসম করছি, যা সওর পর্বতের গুহা স্বীয় অভ্যন্তরে সঞ্চয় করেছিলো। (হিজরতের সময় হযরত (সা.) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তথায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং আমি সে সময়েরও হলফ করছি, যে সময় বিধর্মীদের চক্ষু দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও (হযরত (সা.)-এর মুজিযাস্বরূপ) অন্ধ ছিলো।

(৭৮) فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيْقُ لَـمْ يَرَمَا وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا بِالْغَارِ مِنْ اِرَمِ

অথচ সত্য অর্থাৎ সত্য নবী হযরত (সা.) এবং আবু বকর সিদ্দিক (রা.) উভয়ই গুহার মধ্যে ছিলেন। কোনো দিকে যাননি। এমতাবস্থায় তারা বলছিলো, গুহার ভেতর কোনো মানুষ নেই।

(৭৯) ظَنُّوا الْـحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوْتَ عَلَىٰ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَـمْ تَنْسُجْ وَلَـمْ تَحُمِ

তারা ধারণা করেছিলো, কবুতর ও মাকড়সা হযরত (সা.)-এর নিরাপত্তার জন্য ডিম পাড়েনি, জাল বুনেনি। (বরং পূর্ব হতেই এ রকম রয়েছে)

(৮০) وِقَايَةُ اللهِ أَغْنَتْ عَنْ مُّضَاعَفَةٍ مِنَ الدُّرُوعِ وَعَنْ عَالٍ مِّنَ الْأُطُمِ

আল্লাহপাকের প্রহরা হযরত (সা.)-কে পুরু লৌহবর্ম ও উচ্চ সুদৃঢ় দুর্গ হতে মুখাপেক্ষীহীন করেছিলো। (মাকড়সা ও কবুতর দ্বারা শত কিল্লার কাজ নেয়া হয়েছিলো।)

(৮১) مَا سَامَنِي الدَّهْرُ ضَيْمًا وَاسْتَجَرْتُ بِهِ إِلَّا وَنِلْتُ جِوَارًا مِّنْهُ لَـمْ يُضَمِ

যখনই আমাকে কালের দুর্বিপাক কোনো বিপদে আটকিয়েছে এবং আমি হুযুর (সা.)-এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছি তখনই আমি তার হেফাজত লাভ করেছি এবং এই সুরক্ষা ছিলো নিশ্চিত। (ইমাম বুসিরী (রহ.) ফালেজ বা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলে এই কাসিদা লিখে দুআ করেন। রাতে স্বপ্নে হুযুর (সা.) এসে হাত বুলালে সকালে তিনি ভালো হয়ে যান অর্থাৎ শরীরের নিম্নাংশ যে অসাড় হয়েছিলো তা ভালো হয়ে গিয়েছিলো।)

(৮২) وَلَا الْتَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَّدِهِ إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَىٰ مِنْ خَيْرِ مُسْتَلَمِ

যখনই আমি হযরত (সা.)-এর পবিত্র হাত হতে (তাঁর উসিলাতে) উভয় জীবনের ধন-সম্পদ (কৃতকার্যতা) চেয়েছি, তখনই আমি সে দান তাঁর পবিত্র হাত হতে পেয়েছি, সে হাত সকলের চুম্বনীয়, পবিত্র। (হুযুর (সা.)-এর উসিলাতে সকল মকসুদ'র পূর্ণতা পেয়েছি)।

(৮৩) لَا تُنْكِرِ الْوَحْيَ مِنْ رُؤْيَاهُ إِنَّ لَهُ قَلْبًا إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَـمْ يَنَمِ

হযরত (সা.)-এর স্বপ্নাবস্থায় ওহি (ঐশীবাণী) লাভের বিষয় সম্পর্কে অস্বীকার করো না। কারণ, তাঁর নয়নযুগল ঘুমালেও তাঁর অন্তর ঘুমাতো না (সেহেতু নিদ্রার কারণে তাঁর ওযু নষ্ট হতো না। তাঁর হৃদয় সদা জাগ্রত থাকতো।

(৮৪) وَذَاكَ حِينَ بُلُوْغٍ مِّنْ نُبُوَّتِهِ فَلَيْسَ يُنْكَرُ فِيْهِ حَالُ مُحْتَلَمِ

স্বপ্নাবস্থায় ওহির (ঐশী বাণীর) ঘটনা হযরত (সা.)-এর পয়গম্বরির মহান মর্যাদালাভের সমসাময়িক অবস্থায় ঘটেছিলো (৪০ বছর বয়সে যখন তিনি পয়গম্বরির যোগ্যতায় পৌঁছেন। কাজেই তাঁর স্বপ্নযোগে লব্ধ ওহি বিশ্বাস করতেই হবে।)

(৮৫) تَبَارَكَ اللهُ مَا وَحْيٌ بِمُكْتَسَبٍ وَلَا نَبِيٌّ عَلَىٰ غَيْبٍ بِمُتَّهَمِ

আল্লাহপাক বরকতওয়ালা। ওহি ও পয়গম্বরি উপার্জনীয় বস্তু নয় (যা চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা হাসিল হতে পারে; বরং তা আল্লাহর দান মাত্র) এবং কোনো নবী গায়েবের সংবাদদাতা হিসেবে অবিশ্বাস্য নন। (কারণ তাঁরা নিজের ইচ্ছায় কোনো কথা বলেন না।)

(৮৬) آيَاتُهُ الْغُرُّ لَا يَخْفَى عَلَىٰ اَحَدٍ بِدُوْنِهَا الْعَدْلُ بَيْنَ النَّاسِ لَـمْ يَقُمِ

তাঁর [হুযুর (সা.)-এর] অলৌকিক ঘটনাবলী উজ্জ্বল প্রমাণ, যা কারো নিকট গোপনীয় নয়। যেগুলো ব্যতিরেকে মানবসমাজে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হতো না।

(৮৭) كَمْ أَبْرَأَتْ وَصِبًا بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ وَأَطْلَقَتْ أَرَبًا مِّنْ رِّبْقَةِ اللَّمَمِ

হযরত নবী (সা.) স্বীয় পবিত্র হস্তের স্পর্শ দ্বারা বহু ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে আরোগ্য দান করেন এবং কতো পাগল তাঁর স্পর্শ দ্বারা পাগলামীর বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করেছে। (এ ধরনের বহু ঘটনার রিওয়ায়াত মজুদ আছে)।

(৮৮) وَأَحْيَتِ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ حَتَّىٰ حَكَتْ غُرَّةً فِي الْأَعْصُرِ الدُّهُمِ

অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের বছরকে হযরত (সা.)-এর দুআ জীবিত করে দিয়েছে। আর তা অন্ধকারের ভেতর আলোর মতো হয়েছিলো।

(৮৯) بِعَارِضٍ جَادَا وَخِلْتَ الْبِطَاحَ بِهَا صَيْبًا مِّنَ الْيَمِّ أَوْ سَيْلًا مِّنَ الْعَرِمِ

দু'আ দ্বারা অনাবৃষ্টিজনিত মৃত জমিকে জীবিত করা মেঘের মাধ্যমে হয়েছিলো। মেঘের প্রচুর বর্ষণে এতো পানি হচ্ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো সমুদ্র ভেঙ্গে এসেছে অথবা আরেম উপত্যকা হতে ঢল নেমেছে।

কুরআনপাকের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য

(৯০) دَعْنِيْ وَوَصْفِيَ آيَاتٍ لَّهُ ظَهَرَتْ ظُهُوْرَ نَارِ الْقِرٰى لَيْلًا عَلٰى عَلَمِ

হে প্রিয় শ্রোতা! রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে যে সমস্ত আয়াত (কুরআনের আয়াতসমূহ) প্রকাশ পেয়েছে আমাকে সেসবের বর্ণনা করতে দাও। তা জ্বলন্ত প্রমাণ, পর্বত চূড়ার ওপর আতিথেয়তার জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুনের মতো। (দূর হতে দেখে মুসাফিররা এসে আশ্রয় নেয়া ও খাওয়া-দাওয়া গ্রহণ করার জন্য আরবের দানশীল ব্যক্তিরা রাতে আগুন জ্বালাতেন)।

(৯১) فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَّهُوَ مُنْتَظِمٌ وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرًا غَيْرَ مُنْتَظِمِ

অবশ্য মণির হার গাঁথা হলে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় বটে; কিন্তু না গাঁথা হলেও মণির মূল্য ও কদর কম হয় না। (তদ্রূপ কুরআনের আয়াতের গুণাবলী বর্ণনা করা হলে তা লোকসমাজে রওশন হবে বটে; কিন্তু বর্ণনা করা না হলেও তার কদর ও মর্যাদার ক্ষতি হবে না।)

(৯২) فَمَا تَطَاوَلَ آمَالُ الْـمَدِيْحِ إِلَى مَا فِيْهِ مِنْ كَرَمِ الْأَخْلَاقِ وَالشِّيَمِ

প্রশংসাকারীর মনোবাসনা ও আশা সেসব গুণাবলী ও মহান চরিত্রের দিকে ধাবিত হয়নি, যা হুযুর (সা.)-এর ব্যক্তিত্বের ভেতর নিহিত ছিলো। (কারণ তা এতই উচ্চ এবং মহান যে প্রশংসাকারীর জ্ঞান ও বুদ্ধি ততো উর্ধ্বে পৌছতে পারে না। কাজেই হযরত (সা.)-এর কতক আয়াত ও মুজিযা বর্ণনা করে ক্ষান্ত হলাম।)

(৯৩) آيَاتُ حَقٍّ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثَةٌ قَدِيْمَةٌ صِفَةُ الْـمَوْصُوْفِ بِالْقِدَمِ

উক্ত আয়াতে কুরআনি (কুরআনের আয়াতসমূহ আল্লাহর বাণী হিসেবে তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে নশ্বর।) অপরদিকে অবিনশ্বর সত্তার বিশেষণ হিসেবে কাদিম বা অবিনশ্বর (অনাদি)।

(৯৪) لَـمْ تَقْتَرِنْ بِزَمَانٍ وَّهِيَ تُخْبِرُنَا عَنِ الْـمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَّعَنْ إِرَمِ

কুরআন অনাদি হওয়া কালের গতিবেগে আবদ্ধ নয় (কারণ, কুরআন ঐশীবাণীরূপে কালের অস্তিত্বের পূর্বে ও অনাদিকাল হতে বিদ্যমান ছিলো)। আবার অবতরণ ও উচ্চারণ মতে হাদেস (অনাদি নয়)। সে হিসেবে পরকাল সম্পর্কে, কওমে আদ সম্বন্ধে এবং এর বাগানে (শাদ্দাদের বেহেশত)-এর বর্ণনা ও সংবাদ দিচ্ছে।

(৯৫) دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجِزَةٍ مِنَ النَّبِيِّيْنَ إِذْ جَاءَتْ وَلَـمْ تَدُمِ

কুরআনি মুজিযা আমাদের কাছে চিরস্থায়ীরূপে বিদ্যমান। কাজেই অন্যান্য আম্বিয়া (আ.)-এর মুজিযা হতে বহুগুণে উত্তম। কারণ তাঁদের মুজিযাসমূহ প্রকাশ পেয়ে স্থায়ী হয়নি (বরং নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।)

(৯৬) مُحْكَمَاتٌ فَمَا يُبْقِيْنَ مِنْ شُبَهٍ لِذِيْ شِقَاقٍ وَّلَا يَبْغِيْنَ مِنْ حَكَمٍ

কুরআনের আয়াতসমূহ সকল বিষয়ে এমনই সঠিক ও দৃঢ় ফয়সালাদানকারী যে, তা অপর কোনো ফয়সালাদানকারীর প্রত্যাশী নয়।

(৯৭) مَا حُوْرِبَتْ قَطُّ إِلَّا عَادَ مِنْ حَرَبٍ أَعْدَى الْأَعَادِيْ إِلَيْهَا مُلْقِى السَّلَمِ

কুরআনের ঘোর বিরোধীও যখনই তার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছে শেষ পর্যন্ত হাতিয়ার ত্যাগ করে (পরাজয় বরণপূর্বক) ফিরে গেছে।

(৯৮) رَدَّتْ بَلَاغَتُهَا دَعْوَىٰ مُعَارِضِهَا رَدَّ الْغَيُوْرِ يَدَ الْجَانِيْ عَنِ الْحَرَمِ

কুরআনের বালাগত (মানবশক্তি বহির্ভূত ভাষা বিন্যাস, ভবিষ্যদ্বাণী, মানবরচিত সুদূরপ্রসারী নীতিশিক্ষা) বিরুদ্ধবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীদের দাবীকে এমনভাবেই দূরীভূত করেছে, যেমনভাবে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বীর পুরুষ স্বীয় পরিজন হতে দুষ্ট লোককে বিতাড়িত করে।

(৯৯) لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِيْ مَدَدٍ وَفَوْقَ جَوْهَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيَمِ

আয়াতে কুরআনির ভেতরে অফুরন্ত মর্মাদি নিহিত আছে। আয়াতসমূহ একে অপরের সহায়তা করে, যেভাবে সমুদ্রের তরঙ্গসমূহ একে অপরের সহায়তা করে। কুরআনের অন্তর্নিহিত মণিসমূহ সমুদ্রের মণির চেয়ে সৌন্দর্যে ও মূল্যমানে বহুগুণে উত্তম।

(১০০) فَلَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَىٰ عَجَائِبُهَا وَلَا تُسَامُ عَلَى الْإِكْثَارِ بِالسَّأَمِ

কুরআনের অভ্যন্তরীণ আশ্চর্যজনক মর্মসমূহ গণনার অতীত এবং সদাসর্বদা তা পাঠ করলেও তার প্রতি বিরক্তি বা বিষণ্নতা আসে না। (বরং যতোই বেশি তিলাওয়াত করা হয় ততোই আগ্রহ বৃদ্ধি পায়)।

(১০১) قَرَّتْ بِهَا عَيْنُ قَارِيْهَا فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ ظَفَرْتَ بِحَبْلِ اللهِ فَاعْتَصِمِ

তার দ্বারা তার পাঠকের চক্ষু শীতল হয় (প্রাণ এক অবর্ণনীয় প্রশান্তি লাভ করে) আমি তাকে বলি, তুমি বড়ো ভাগ্যবান, আল্লাহর (রহমত ও হেদায়াত) রজ্জু তুমি হস্তগত করেছো, এখন মজবুত করে ধরো ও আমল করো।

(১০২) إِنْ تَتْلُهَا خِيْفَةً مِّنْ حَرِّ نَارٍ لَظَى أَطْفَأَتَ حَرَّ لَظَىٰ مِنْ وِرْدِهَا الشَّبِمِ

যদি তুমি দোযখের অনলশিখার ভয়ে কুরআন তিলাওয়াত করো, তাহলে তুমি এই পবিত্র গ্রন্থের শীতল পাঠের শান্তিধারা দ্বারা নরকাগ্নিশিখা নির্বাপিত করবে। (কুরআনের বরকত ও সুপারিশ দ্বারা তুমি অবশ্যই মুক্তি লাভ করবে)।

(১০৩) كَأَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ بِهِ مِنَ الْعُصَاةِ وَقَدْ جَاؤُوْهُ كَالْحُمَمِ

কুরআনপাক যেনো হাওজে কাওসার বা নাহরে হায়াত। তার তিলাওয়াত পাপীদের পাপ-কালিমাময় অন্তরকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়।

যেমন দোযখের শাস্তিভোগী মু'মিনগণ তাতে জ্বলেপুড়ে কয়লার মতো হওয়ার পর মুক্তিলাভপূর্বক হাওজের পানি দ্বারা স্নানের পর চমৎকার হয়ে যাবে এবং বেহেশতে দাখিল হবে।

(১০৪) وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْـمِيْزَانِ مَعْدِلَةً فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَـمْ يَقُمِ

আয়াতে কুরআনি ন্যায়প্রতিষ্ঠায় ও সুবিচারে পুলসিরাত ও পাল্লার মতো। কুরআন ব্যতীত মানবসমাজে সঠিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা হয়নি। (পুলসিরাত পাপীদেরকে পৃথক করে ফেলবে।) পাল্লা ওজনের বেশ-কমকে সমান করে। (কুরআনও তদ্রূপ)।

(১০৫) لَا تَعْجَبَنْ لِـحَسُوْدٍ رَّاحَ يُنْكِرُهَا تَجَاهُلًا وَّهُوَ عَيْنُ الْـحَاذِقِ الْفَهِمِ

হিংসুক অজ্ঞ ও অবুঝ সেজে কুরআনকে অস্বীকার করছে। অথচ সে বেশ ভালোরূপে জানে যে, কুরআনের শিক্ষাসমূহ অকাট্য সত্য ও ন্যায়সঙ্গত। হে শ্রোতা! এতে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। কারণ:

(১০৬) قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضُوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَّمَدٍ وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْـمَاءِ مِنْ سَقَمِ

অনেক সময় চক্ষুশূল হলে চোখ সূর্য-কিরণকে অস্বীকার করে (তা সহ্য করতে পারে না) এবং ব্যাধিগ্রস্ত জিহ্বা পানির স্বাদ আছে, তা মানে না (অর্থাৎ, পানিসহ কোন কিছুরই স্বাদাস্বাদন করতে পারে না)। তদ্রূপ হিংসার কারণে বা অন্য কোনো স্বার্থে কুরআনকে সত্য জেনেও গ্রহণ করে না।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইসরা ও মিরাজ শরিফের বর্ণনা

(১০৭) يَـا خَيْرَ مَن يَمَّمَ الْعَافُوْنَ سَـاحَتَهُ سَعْيًا وفَوْقَ مُتُوْنِ الْأَيْنُقِ الرُّسُمِ

হে দানবীরকুলমণি! যার সমীপে প্রত্যাশী ভিখারীরা (বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে) পদব্রজে বা দ্রুতগামী উষ্ট্রীর ওপর সওয়ার হয়ে দলে দলে হাজির হয়।

(১০৮) وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ لِـمُعْتَبِرٍ وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَىٰ لِـمُغْتَنَمِ

'হে মহান! ভাবুক ও চিন্তাশীল মানবের চোখে আপনি (হেদায়াতের) উজ্জ্বল নিশান এবং মর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য আপনি মহান নেয়ামত।

(১০৯) سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَّيْلًا إِلَى حَرَمٍ كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِيْ دَاجٍ مِّنَ الظُّلَمِ

আপনি রাত্রিকালে পবিত্র মক্কার হারাম হতে বায়তুল মুকাদ্দাসের হারাম পর্যন্ত ভ্রমণ করলেন, যেভাবে ১৪ তারিখের পূর্ণিমা চাঁদ অন্ধকার রজনীকে আলোকোজ্জ্বল করে পরিভ্রমণ করে।

(১১০) وَبِتَّ تَرْقَىٰ إِلَىٰ أَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَـمْ تُدْرَكْ وَلَـمْ تَرُمِ

এবং সে ভ্রমণে উর্ধ্বগামী হয়ে আল্লাহর নৈকট্যের কাবা কাউসাইন-এর উচ্চ মর্যাদায় পৌছলেন, যা কারো ধারণায় আসেনি এবং সেখানে পৌছুবার সংকল্পও কেউ করেনি।

(১১১) وَقَدَّمَتْكَ جَمِيْعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسْلِ تَقْدِيْمَ مَخْدُوْمٍ عَلَىٰ خَدَمِ

এবং (ইমামতের জন্য) সকল আম্বিয়া ও রাসুলগণ (আ.) আপনাকে সম্মুখে দিলেন, যেমন খাদেমরা (সেবকরা) মখদুমকে (শ্রদ্ধেয়জন) সামনে এগিয়ে দেয়।

(১১২) وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ فِيْ مَوْكَبٍ كُنْتَ فِيْهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ

এবং আপনি ফেরেশতা সঙ্গীগণসহ সাত স্তর আসমান ভ্রমণ করলেন এমন শান-শওকতে গেলেন, যেনো সেনাবাহিনীর মধ্যে আপনি পতাকাধারী ছিলেন।

(১১৩) حَتَّىٰ إِذَا لَمْ تَدَعْ شَأْوًا لِمُسْتَبِقٍ مِنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرْقًى لِّمُسْتَنِمِ

আল্লাহর নৈকট্যের উর্ধ্বগমনে আপনি এতো উর্ধ্বে পৌছুলেন যে, কোন উর্ধ্বগামীর জন্য নৈকট্যের সম্ভাব্য সীমা ও কোনো করুণাকামীর জন্য কোনো ধাপ বাকি রাখলেন না। (আপনি নৈকট্যের সম্ভাব্য উর্ধ্বতম ধাপে পৌছুলেন।)

(১১৪) خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالْإِضَافَةِ إِذْ نُوْدِيْتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ

তখন আপনি স্বীয় মাকামের (মর্যাদার) তুলনায় সকল আম্বিয়া আউলিয়াগণের মাকামকে নিচু করে দিলেন। কারণ আপনি সৃষ্টিকুলের অদ্বিতীয় মহান ব্যক্তি হিসেবে উর্ধ্বভ্রমণে (মিরাজে) আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

(১১৫) كَيْمَا تَفُوْزَ بِوَصْلٍ أَيِّ مُسْتَتِرٍ عَنِ الْعُيُوْنِ وَسِرَّايِّ مُكْتَتَمِ

(يَا مُحَمَّدُ اُدْنُ) -"হে মুহাম্মদ (সা.) নিকটবর্তী হও" (এ আমন্ত্রণ এজন্য ছিলো) যাতে আপনি এক অবর্ণনীয় মিলনে কৃতকার্য হোন, যা সকল চক্ষুর আওতার বাইরে এবং এমন পবিত্র গোপন হাকিকত অর্জন করেন, যা আপনি ব্যতীত অপর কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম।

(১১৬) فَحُزْتَ كُلَّ فِخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمِ

তখন আপনি অংশীবিহীনভাবে সকল প্রকার গৌরব আয়ত্ব করলেন এবং সঙ্গীবিহীনভাবে বুযর্গির স্তরসমূহ শেষ করে উর্ধ্বতম স্থানে পৌছুলেন।

(১১৭) وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وُلِّيْتَ مِنْ رُتَبٍ وَغَزَّ إِدْرَاكُ مَا أُوْلِيْتَ مِنْ نِعَمِ

যে সমস্ত পদ ও মর্যাদা আপনাকে দেয়া হয়েছে তা অতি মহান ও উচ্চ। আর যে সমস্ত নেয়ামত ও গুপ্তরহস্য আপনাকে প্রদত্ত হয়েছে তা লাভ করা অতুলনীয় সম্মানের বিষয়।

(১১৮) بُشْرٰى لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمِ

হে মুসলমান কওম! আমাদের জন্য সুসংবাদ যে, আল্লাহর মেহেরবানির অটুট স্তম্ভ আমরা পেয়েছি।

(১১৯) لَمَّا دَعَى اللهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ بِأَكْرَمِ الرُّسْلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ

যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্দেগির প্রতি আহ্বানকারী আমাদের নবী (সা.)-কে আকরামুর রুসুল (নবীকুল শিরোমণি) খ্যাতি দিয়ে ডেকেছেন, তাতে আমরা সকল উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত সাব্যস্ত হয়েছি।

হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জিহাদ সম্পর্কিত বর্ণনা

(১২০) رَاعَتْ قُلُوْبَ الْعِدٰى أَنْبَاءُ بِعْثَتِهِ كَنَبْأَةٍ أَجْفَلَتْ غُفْلًا مِّنَ الْغَنَمِ

হযরত নবী করিম (সা.)-এর পয়গম্বরির সংবাদ ধর্মদ্রোহী অত্যাচারীদের প্রাণ এমনভাবে কাঁপিয়ে দিয়েছে, যেমন হঠাৎ ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে অসতর্ক ছাগলের দল পলায়ন করে।

(১২১) مَا زَالَ يَلْقَاهُمُ فِيْ كُلِّ مُمْتَرَكٍ حَتّٰى حَكَوْا بِالْقَنَا لَحْمًا عَلٰى وَضَمِ

হযরত নবী (সা.) যে অভিযানেই তাদের মুখোমুখি হয়েছেন, শেষ পর্যন্ত (মুজাহিদদের তীর ও বর্শার আঘাতে) তারা কসাইখানার তক্তার ওপর রাখা নিঃসাড় মাংসখণ্ডের মতো হয়ে গেছে।

(১২২) وَدُّوا الْفِرَارَ فَكَادُوْا يَغْبِطُوْنَ بِهِ أَشْلَاءَ شَالَتْ مَعَ الْعِقْبَانِ وَالرَّخَمِ

পরাজিত ও পরিবেষ্টিত ধর্মদ্রোহীরা পলায়নে অক্ষম হয়ে আহত কাফিরদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর হিংসা করতে লাগলো, যেগুলোকে শকুনের দল উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। (বলছিলো, হায়! যদি আমাদেরকেও শকুনের দল উড়িয়ে নিয়ে যেতো।)

(১২৩) تَمْضِي اللَّيَالِيْ وَلَا يَدْرُوْنَ عِدَّتَهَا مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ لَّيَالِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

রাত আর দিনগুলো অতিবাহিত হতো, কিন্তু তারা সে সবের গণনার খবর রাখতো না (ভয় ও ত্রাসের কারণে), যে পর্যন্ত যুদ্ধ-হারাম মাসগুলো না আসতো।

(১২৪) كَأَنَّمَا الدِّيْنُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ بِكُلِّ قَرْمٍ إِلٰى لَحْمِ الْعِدٰى قَرِمِ

দীন ইসলাম যেনো এক সম্ভ্রান্ত মেহমান, যে শত্রুর মাংসলোভী সর্দারগণসহ তাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছে (আর তারা বিনা আপত্তিতে মাংস দিচ্ছে)।

(১২৫) يَجُرُّ بَحْرَ خَمِيْسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ تَرْمِيْ بِمَوْجٍ مِّنَ الْأَبْطَالِ مُلْتَطِمِ

এই মেহমান (ইসলাম) মুজাহিদ সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করছিলো (সে ঘোড়-সওয়ার সেনাদল দেখে মনে হতো) যেনো তরঙ্গায়িত সেনা-সমুদ্রে অশ্বারোহী বাহিনীর তরঙ্গ একে অপরকে থাপ্পড় মারছে।

(১২৬) مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبٍ لِلّٰهِ مُحْتَسِبٍ يَسْطُوْ بِمُسْتَأْصِلٍ لِّلْكُفْرِ مُصْطَلِمِ

সে বীর পুরুষগণ! প্রত্যেকেই আল্লাহর ধর্মের আমন্ত্রণ গ্রহণকারী ও (প্রত্যেক কাজে) সওয়াবের প্রত্যাশী। কুফরি ধর্মের মূলোৎপাটনকারী নবী (সা.)-এর সাথে তারা অধর্ম-নাশক অস্ত্রাদিসহ কাফিরদের ওপর আক্রমণ চালায়।

(১২৭) حَتّٰى غَدَتْ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَهْيَ بِهِمْ مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُوْلَةَ الرَّحِمِ

শেষপর্যন্ত এই দুর্বল গরীব মিল্লাতে ইসলাম (প্রসার লাভ করলো) সকলের সহায়তা লাভ করে শক্তি অর্জন করলো।

(১২৮) مَكْفُوْلَةً أَبَدًا مِّنْهُمْ بِخَيْرِ أَبٍ وَخَيْرِ بَعْلٍ فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَئِمِ

তাঁদের ক্রমাগত জিহাদ ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার কারণে মিল্লাতে ইসলাম শেষ পর্যন্ত উত্তম অভিভাবক দ্বারা চিরকালের জন্য সুরক্ষিত হলো। অতঃপর সে আর এতিম বা বিধবা (অভিভাবকহীন) হবে না। (কারণ আল্লাহপাক ইসলাম রক্ষার ওয়াদা করেছেন।)

(১২৯) هُمُ الْـجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مُّصَادِمَهُمْ مَاذَا رَأَوْ مِنْهُمْ فِيْ كُلِّ مُصْطَدَمِ

মুজাহিদবাহিনী অটল পর্বতমালার ন্যায়, তাঁদের সম্বন্ধে (হে শ্রোতা!) রণাঙ্গনসমূহের কাছে জিজ্ঞাসা করো যে, প্রত্যেক যুদ্ধে তাঁদের বীরত্ব, দৃঢ়তা ও শত্রুবিনাশকার্য কিরূপ ছিলো?

(১৩০) فَسَلْ حُنَيْنًا وَسَلْ بَدْرًا وَسَلْ أُحُدًا فُصُوْلُ حَتْفٍ لَـهُمْ أَدْهَىٰ مِنَ الْوَخَمِ

অতঃপর হুনাইন রণাঙ্গনকে জিজ্ঞাসা করো, বদর ও উহুদ রণাঙ্গনকে জিজ্ঞাসা করো। (তবে জানবে যে) বহুপ্রকার মৃত্যু বিধর্মীদের ধ্বংস করেছিল, যা কলেরা ও প্লেগের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

(১৩১) اَلْـمُصْدِرِي الْبِيْضِ حُمْرًا بَعْدَمَا وَرَدَتْ مِنَ الْعِدَىٰ كُلَّ مُسْوَدٍّ مِّنَ اللِّمَمِ

মুজাহিদ বীরপুরুষগণ তাঁদের শুভ্র চমৎকার তরবারিসমূহকে বিধর্মীদের কালো চুলসহ কেটে ভেতরে ঢুকিয়ে তা রক্তে রঞ্জিত করে বের করেন।

(১৩২) وَالْكَاتِبِيْنَ بِسُمْرِ الْـخَطِّ مَا تَرَكَتْ أَقْلَامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْرَ مُنْعَجِمِ

তাঁদের পীতবর্ণের তীরসমূহ শত্রু-দেহকে অক্ষত ছাড়েনি।

(১৩৩) شَاكِي السِّلَاحِ لَـهُمْ سِيْمَا تُمَيِّزُهُمْ وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِالسِّيْمَا مِنَ السَّلَمِ

সাহাবা মুজাহিদগণ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন যেমন ধর্মদ্রোহীরা সজ্জিত ছিলো। তবে মুজাহিদদের চেহারার ঈমানি জ্যোতি ও মর্যাদার চিহ্ন তাঁদেরকে কাফিরদের থেকে পৃথকরূপে পরিচিত করছিলো, যেমন গোলাপ ফুল তার বৃক্ষকে বালবু কাঁটার গাছ হতে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত করে। (উভয় বৃক্ষই কাঁটাবিশিষ্ট কিন্তু গোলাপ গাছের সম্মান স্বতন্ত্র)।

(১৩৪) يُهْدِيْ إِلَيْكَ رِيَاحُ النَّصْرِ نَشْرَهُمُ فَتَحْسَبُ الْوَرْدُ فِي الْأَكْمَامِ كُلَّ كَمِيْ

আল্লাহর সাহায্যের বায়ু (হে মুমিন)! তোমার প্রতি স্বীয় ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। কাজেই যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত মুজাহিদদের এমন সুন্দর দেখাচ্ছিলো যেমন খোসার মধ্যে পুষ্পকলি।

(১৩৫) كَأَنَّهُمْ فِيْ ظُهُوْرِ الْـخَيْلِ نَبْتُ رُبًا مِنْ شِدَّةِ الْـحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ حُزُمِ

বীর মুজাহিদগণ ঘোড়ার আসন জমিয়ে এমন অটলভাবে উপবিষ্ট ছিলেন, যেনো তাঁরা টিলার ওপরে ঘাস (যা দৃঢ় শিকড়ে স্থিত থাকে) তাঁদের দৃঢ়তা তাঁদের নিপুণতার কারণে ছিলো, ঘোড়ার জিনের দৃঢ় বন্ধনের কারণে নয়।

(১৩৬) طَارَتْ قُلُوْبُ الْعِدَىٰ مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقًا فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَهْمِ وَالْبُهَمِ

মুজাহিদদের পরাক্রম ও দাপটে শত্রুদের প্রাণ উড়ে গেলো। তারা ভীতিবিহ্বলতায় এমন আত্মহারা হয়েছিলো যে, ছাগলছানা আর বীরযোদ্ধার মধ্যে পার্থক্য করতে পারতো না। ছাগলছানারা দেখে ভয়ে পলায়ন করতো।

(১৩৭) وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُوْلِ اللهِ نُصْرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْأَسَدُ فِيْ آجَامِهَا تَجِمِ

হযরত নবী (সা.)-এর উসিলায় আল্লাহর সাহায্য যাদের সঙ্গী ছিলো, যদি বন-জঙ্গলে সিংহ তাঁদের সম্মুখীন হতো সেও হতবাক হয়ে যেতো। (যেমন হযরত সকিনা ও বাঘের ঘটনা এবং এরূপ আরও বহু ঘটনা ঘটেছে। এসব হিংস্র জন্তু আক্রমণ তো দূরের কথা, বরং লালিত পালিত বিড়ালের মতো সাহায্য করেছে)।

(১৩৮) وَلَنْ تَرَىٰ مِنْ وَّلِيٍّ غَيْرِ مُنْتَصِرٍ بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرِ مُنْقَصِمِ

তুমি হযরত (সা.)-এর কোনো বন্ধুকে এমন পাবে না, যিনি তাঁর সাহায্য লাভ করেননি এবং নবীর বন্ধুর এমন কোনো শত্রু পাবে না, যে পরাজয় বরণ করেনি।

(১৩৯) أَحَلَّ أُمَّتَهُ فِيْ حِرْزِ مِلَّتِهِ كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِيْ أَجَمِ

হযরত (সা.) স্বীয় মুমিন উম্মতদেরকে ইসলাম দুর্গের ভেতর সুরক্ষিতভাবে রেখেছেন, যেমন সিংহ তার শাবকদের নিয়ে বনের ভেতর নিজ সুরক্ষিত বাসস্থানে অবস্থান করে।

(১৪০) كَمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ اللهِ مِنْ جَدَلٍ فِيْهِ وَكَمْ خَصَّمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصِمِ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিরোধীদের সাথে আল্লাহর বাণী বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদেরকে পরাজয় বরণ করিয়েছে এবং আল্লাহ প্রেরিত বহু মুজিযা ও যুক্তি দাবী প্রমাণে বিবাদীদের পরাভূত করেছে।

(১৪১) كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِّ مُعْجِزَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّأْدِيْبِ فِي الْيُتُمِ

(হে শ্রোতা!) তোমার পক্ষে হযরত (সা.)-এর পয়গম্বরির প্রমাণ সম্বন্ধে (অপরাপর যুক্তিসমূহ বাদ দিয়েও) এতটুকু মুজিযাই যথেষ্ট যে, তিনি নিরক্ষর হয়েও সে অন্ধকার যুগে অসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং পিতৃহীন বালক হয়েও ভাষা ও সাহিত্যকলায় অসাধারণ ছিলেন।

পাপমুক্তির প্রার্থনা ও হযরত (সা.)-এর শাফাআত লাভের বাসনা

(১৪২) خَدَمْتُه بِمَدِيْحٍ أَسْتَقِيْلُ بِهِ ذُنُوْبِ عُمْرٍ مَّضَىٰ فِي الشِّعْرِ وَالْخَدَمِ

আমি এই কামনা নিয়ে না'ত ও প্রশংসাগান হযরত (সা.)-এর খেদমতে পেশ করেছি যে, বিগত জীবনে ধনী লোকদের খেদমত করে ও কাব্য রচনা করে যেসব পাপ করেছি, তার শাস্তি হতে যেনো মুক্তিলাভ করি।

(১৪৩) إِذْ قَلَّدَانِيْ مَا تُخْشَىٰ عَوَاقِبُهُ كَأَنَّنِيْ بِهِمَا هَدْيٌ مِّنَ النَّعَمِ

অতএব সে পাপ আমার গলদেশে এমন হার পরিয়েছে, যার পরিণাম ভয়ানক হওয়ার আশঙ্কা করছি। আমার অবস্থা হচ্ছে- আমি সে পাপের কারণে গলায় মালা পরিহিত কুরবানির উটের মত।

(১৪৪) أَطَعْتُ غَيَّ الصِّبَا فِي الْحَالَتَيْنِ وَمَا حَصَّلْتُ إِلَّا عَلَى الْآثَامِ وَالنَّدَمِ

আমি ধনীদের খেদমত ও কাব্যচর্চা উভয় কাজেই বাল্য বয়সের গোমরাহীর তাঁবেদারি করেছি। এর দ্বারা পাপ ও অনুতাপ ব্যতীত আমার আর কিছুই হাসিল হয়নি।

(১৪৫) فَيَا خَسَارَةَ نَفْسٍ فِيْ تِجَارَتِهَا لَمْ تَشْتَرِ الدِّيْنَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسُمِ

অতএব হায় আমার নফস! তোমার ব্যবসায়ে ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। তুমি দুনিয়ার পরিবর্তে দীন খরিদ করোনি এবং খরিদ করার ইচ্ছাও করোনি।

(১৪৬) وَمَنْ يَبِعْ آجِلًا مِّنْهُ بِعَاجِلِهِ يَبِنْ لَهُ الْغَبْنُ فِيْ بَيْعٍ وَّفِيْ سَلَمِ

যে ব্যক্তি পরকালকে ইহকালের পরিবর্তে বিক্রয় করে, নগদ কেনাবেচা ও বাকিতে কেনাবেচা উভয় ক্ষেত্রেই তার ঘাটতি প্রকাশ পাবে।

(১৪৭) إِنْ آتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِيْ بِمُنْتَقِضٍ مِنَ النَّبِيِّ وَلَا حَبْلِيْ بِمُنْصَرِمِ

যদিও আমি হঠাৎ পাপ করে বসি, তাতে হযরত (সা.)-এর সুপারিশের জিম্মায় থাকা হতে কর্তিত হবো না এবং আমার আশার রজ্জুও কাটা যাবে না।

(১৪৮) فَإِنَّ لِيْ ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِيْ مُحَمَّدًا وَّهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ

অবশ্য আমার পিতা-মাতা আমার নাম মুহাম্মদ রাখাতে আমার পক্ষে তাঁর শাফাআতের জিম্মা হাসিল হয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি অঙ্গীকার পালনে সর্বশ্রেষ্ঠ।

(১৪৯) إِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْ مَعَادِيْ آخِذًا بِيَدِيْ فَضْلًا وَّإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ

যদি তিনি পরকালে অনুগ্রহপূর্বক আমার শাফাআত ও সহায়তা না করেন তা হলে বলো, হায়, পদস্খলন! (অর্থাৎ আমার দুর্গতির সীমা থাকবে না)।

(১৫০) حَاشَاهُ أَنْ يُّحْرِمَ الرَّاجِيْ مَكَارِمَهُ أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمِ

কস্মিনকালেও এমন হবে না যে, হযরত (সা.)-এর অনুকম্পাপ্রার্থী তাঁর দান হতে বঞ্চিত হবে। অথবা তাঁর কাছে আশ্রয়প্রার্থী অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হবে।

(১৫১) وَمُنْذُ أَلْزَمْتُ أَفْكَارِيْ مَدَائِحَهُ وَجَدْتُهُ لِـخَلاَصِيْ خَيْرَ مُلْتَزِمِ

যখন থেকে আমার চিন্তাধারাকে হুযুর (সা.)-এর প্রশংসায় বিজড়িত করেছি, তখন থেকে তাঁকে আমার পরকালের মুক্তির জন্য পূর্ণ দায়িত্বশীল পেয়েছি।

(১৫২) وَلَنْ يَّفُوْتَ الْغِنٰى مِنْهُ يَدًا تَرِبَتْ إِنَّ الْـحَيَا يُنْبِتُ الْأَزْهَارَ فِي الْأَكَمِ

হযরত (সা.)-এর অপার দানসমুদ্র কাউকেও বঞ্চিত ও মুখাপেক্ষী রাখবে না। কারণ বৃষ্টি যেমন উর্বর জমিকে ফলবান করে তদ্রূপ পর্বতাদির ওপরেও ফুলকলি জন্মায়।

(১৫৩) وَلَـمْ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِيْ اقْتَطَفَتْ يَدَا زُهَيْرٍ بِمَا أَثْنٰى عَلٰى هَرِمِ

আমি হযরত (সা.)-এর প্রশংসা করে দুনিয়ার কামিয়াবি ও সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে করিনি, যেমন যুহাইর হারমের প্রশংসা করে লাভ করেছে।

মুনাজাত এবং হাজত নিবেদন

(১৫৪) يَا أَكْرَمَ الْـخَلْقِ مَا لِيْ مَنْ أُلُوْذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْـحَادِثِ الْعَمِمِ

হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, মহান! আপনি ব্যতীত আমার জন্য সর্বগ্রাসী বিপদের সময় আর কে আছে? যার কাছে সে বিপদে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি।

(১৫৫) وَلَنْ يَضِيْقَ رَسُوْلَ اللهِ جَاهُكَ بِيْ إِذِ الْكَرِيْمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ

ইয়া রাসুলাল্লাহ! যে সময় আল্লাহ তাআলা প্রতিফল দানকারীরূপে বিরাজমান হবেন, সে সময় আমার মতো পাপীর পক্ষে সুপারিশের কারণে আপনার মহান মর্যাদার হানি হবে না।

(১৫৬) فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

কারণ দুনিয়া ও আখিরাত আপনারই কল্যাণে। আপনার ইলম হতেই লাওহ ও কলমের ইলম। (لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ) -আপনি না হলে আমি আসমান ইত্যাদি সৃষ্টি করতাম না। অতএব সমস্ত সৃষ্টিই হুযুর (সা.)-এর উসিলাতে হয়েছে; কাজেই অন্য অর্থে সবকিছু তাঁরই কল্যাণে।)

(১৫৭) يَا نَفْسُ لَا تَقْنُطِيْ مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ

হে চিত্ত! তোমার পদস্খলন, পাপ যদিও বড়ো তবুও তুমি নিরাশ হয়ো না। কারণ, এসব পাপ আল্লাহর অসীম ক্ষমার সামনে অতিশয় ক্ষুদ্র।

(১৫৮) لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّيْ حِيْنَ يَقْسِمُهَا تَأْتِيْ عَلَى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِي الْقِسَمِ

আমার পূর্ণ আশা, যখন আল্লাহর রহমত বণ্টন করা হবে তখন ভাগের মধ্যে পাপের পরিমাণেই রহমত আসবে।

(১৫৯) يَا رَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائِيَ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِيْ غَيْرَ مُنْخَرِمِ

হে করুণাময় প্রভু! যে আশা নিয়ে আপনার দরবারে প্রার্থনা করেছি, তার বিপরীত করবেন না এবং আপনার নিকট যে রহমতের ধারণা করেছি, তা অসাড় প্রমাণ করবেন না।

(১৬০) وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ صَبْرًا مَتَى تَدْعُهُ الْأَهْوَالُ يَنْهَزِمِ

হে পরম দাতা! উভয় জগতে আপনার বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। কারণ এই বান্দার ধৈর্য অতীব দুর্বল। যখন বিপদাপদ আসে সে পরাভূত ও পলাতক হয়ে পড়ে।

(১৬১) وَأْذَنْ لِسُحْبِ صَلَاةٍ مِّنْكَ دَائِمَةٍ عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلٍ وَّمُنْسَجِمِ

দরূদ ও সালামের মেঘকে নবী (সা.)-এর ওপর অবিরাম রহমতের বারি বর্ষণের আদেশ করুন।

(১৬২) وَالْآلِ وَالْصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَـهُمْ أَهْلِ التُّقَى وَالتُّقَى وَالْـحِلْمِ وَالْـكَرَمِ

এবং তাঁর বংশধর, সাহাবিগণ ও তাবেয়িগণের প্রতি (রহমত) বর্ষিত হোক, যাঁরা ছিলেন পরহেযগার, পবিত্র, গম্ভীর, সহনশীল ও দানশীল।

(১৬৩) ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ وَّعَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَلِيٍّ وَّعَنْ عُثْمَانَ ذِي الْكَرَمِ

অতঃপর (আয় আল্লাহ!) মর্যাদাবান হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত আলি (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) সকলের প্রতি আপনার সন্তোষ বর্ষিত হোক।

(১৬৪) مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ الْبَانِ رِيْحُ صَبًا وَأَطْرَبَ الْعِيْسَ حَادِي الْعِيْسِ بِالنَّغَمِ

যতোদিন সমীরণ বান-বৃক্ষের ডালপালাগুলোকে হেলান, দোলান দিতে থাকবে এবং হুদিখান গায়কের সুর উষ্ট্রদলকে আনন্দে মাতোয়ারা করবে ততোদিন হযরতের প্রতি দরূদ ও চার সাহাবার প্রতি সন্তোষ বর্ষিত হোক।

(১৬৫) فَاغْفِرْ لِنَا شِدِهَا وَاغْفِرْ لِقَارِئِهَا سَأَلْتُكَ الْخَيْرَ يَا ذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ

অতএব (হে প্রভু!) এই কাসিদার গ্রন্থকার, কারি (পাঠক এবং শ্রোতা) সকলকে মাফ করুন। হে দাতা! হে মহান অসীম! আপনার কাছে এই মঙ্গল কামনা করছি (আপনি তা কবুল করুন)।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) রচিত যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম : আংশিক নমুনা

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর বাংলা ভাষায় রচিত 'যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম' গ্রন্থখানি এক অনবদ্য গ্রন্থ। এটি একটি মানবজীবন সংশ্লিষ্ট এমন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যার বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগতি প্রত্যেক মানুষের জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

বিষয়াবলী: নিকাহ (বিবাহ) এর বর্ণনা, তালাকের বর্ণনা, মৃত ব্যক্তিকে মাটিতে (কবরে) দাফন করার বর্ণনা, সুরা লাহাব, সূরা ইখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাস এর বর্ণনা, ইসলাম ও পর্দা, যবেহ ও বলিদান প্রথা, সুদ এর বর্ণনা, চোরের শাস্তি হাতকাটা, একতা বা ঐক্য, খতনা, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক, বিধবা বিবাহ, ব্যভিচারের শাস্তি, আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর অস্তিত্ব, দীন (ধর্ম) ও দুনিয়া, ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেনি, নামাযের নিয়মাবলি ও কুরবানির বর্ণনা ইত্যাদি।

এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হলো:

নিকাহ ও বিয়ে সম্পর্কে আলোচনা

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) নিকাহ সম্পর্কে মানবজাতিকে দিকনির্দেশ দানপূর্বক একটি সুন্দর আলোচনা পেশ করেছেন- তিনি বলেন, নারী-পুরুষ শরিআহসম্মত বিধান অনুযায়ী দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নাম হচ্ছে নিকাহ বা বিয়ে। মানুষ পরস্পর স্থায়ী ও অকৃত্রিম ভালোবাসার সাথে সুচারুরূপে জীবনযাপন, বংশ রক্ষা, সুনিয়ন্ত্রিত ও সঙ্গত নিয়মে কামস্পৃহা পূরণ করতঃ চরিত্র রক্ষা- এ তিনটি হচ্ছে বিয়ে বা নিকাহের মূল উদ্দেশ্য। রাসুল (সা.) বলেন,

النكاح من سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى

'বিয়ে আমার সুন্নাত, যে ব্যক্তি (কোন প্রকার বিঘ্ন ব্যতীত) আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করে, সে আমার তরিকার লোক নয়।'[১]

স্ত্রীর হক বা স্বামীর কর্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন,

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (হে পুরুষগণ) 'তোমরা তাদের সাথে (স্ত্রীদের সাথে) সদাচরণ, সদ্ব্যবহার ও শান্তিময় জীবনযাপন করো।'[২]

নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন,

أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسبت ولا تضرب الوجوه ولا تقبح ولا تجهر إلا فى البيت

---

১. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৪০১।

২. সুরা নিসা-১৯।

'যখন তুমি আহার করবে, তোমার স্ত্রীকেও আহার করাবে, তুমি পোশাক পরিধান করলে, তাকেও পোশাক পরিধান করাবে, কখনো তার চেহারার ওপর প্রহার করবে না, গালিগালাজ করবে না, তাকে অন্যত্র পৃথক করে রাখবে না, নিজ ঘরেই রাখবে।[১]

স্বামীর হক বা স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন,

স্ত্রী স্বীয় স্বামীকে অভিভাবক ও গৃহকর্তা হিসেবে মান্য করবে। কারণ তার ওপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য বহুবিধ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) পবিত্র হাদিসে ইরশাদ করেন,

ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن ،

'যদি আমি (এক আল্লাহ ব্যতিত) কারো প্রতি সিজদা করার জন্যে কাউকে আদেশ করতাম, তাহলে অবশ্যই মহিলাদেরকে তাদের স্বামীদের সিজদা করার আদেশ দিতাম।'[২]

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি বলেন,

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর ধর্মচর্চা, বংশীয় মর্যাদা, শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও রূপ, গুণ সবকিছু দেখেশুনে বিয়ে দেয়া বা করা কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين

'ধর্ম, ধন-দৌলত ও রূপ- এই তিনটি গুণ দেখে স্ত্রীলোককে বিয়ে করা হয়। তৎমধ্যে ধর্মীয় গুণকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে তোমার বিয়ে করা কর্তব্য।'[৩]

মোহর সম্পর্কে তিনি বলেন, শরিআতের বিধান অনুযায়ী বিয়েবন্ধনের সময় নারীর নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে ও স্বামী-স্ত্রীর মিলন ও সহবাস ইত্যাদি বৈধ ও ধর্মসম্মত হওয়ার নিমিত্ত স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে যেসব অলঙ্কার ও নগদ অর্থ দেয়া হয় বা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় এবং উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিতে যার পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ধারিত হয় তাকে মোহর বলা হয়। স্বামী-স্ত্রীর অবস্থানুসারে মোহর যতোই অধিক হোক না কেনো তাতে শরিআতের কোনো বাধা নেই। অবশ্যই দশ দিরহাম থেকে কম মোহর শরিআতের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় নয়।

আমাদের বাংলাদেশে মোহর আদায় করাকে তেমন একটা কর্তব্য বলে মনে করা হয় না। প্রায় লোক তা আদায় করতে চায় না। মৃত্যুর পরও তার ওয়ারিশগণ তার ত্যাজ্য সম্পদ থেকে মোহর আদায় করতে ইচ্ছা করে না। দাবী করলেও শত-কৌশল অবলম্বনপূর্বক আদায় না করতে সচেষ্ট থাকে। একথা মনে রাখা উচিত যে, নির্ধারিত মোহর যদি আদায় না করা হয় অথবা মাফ করিয়ে না নেওয়া হয়, তবে তা অন্যান্য ঋণের অনুরূপ ঋণ হয়েই কিয়ামতের দিন বোঝা হয়ে থাকবে।

---

১. সুনানে আবু দাউদ, ২১৪২।
২. সুনানে তিরমিযী, ১১৫৯।
৩. সহিহ মুসলিম, ১৪৬৬।

তালাক সম্পর্কে আলোচনা

তালাক সম্পর্কে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) কতো চমৎকার কথাই না বলেছেন,

তালাক (طلاق) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, বন্ধন মুক্ত করা।

শরিআতের মধ্যে নির্দিষ্ট বাক্যসমূহ দ্বারা বিয়ে-বন্ধন (عقد نكاح) কেটে দেয়াকে তালাক বলে।

বৈধ কাজসমূহের মধ্যে তালাক হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক অপ্রিয় ও অপছন্দনীয়। শরিআতে বিয়েবন্ধনের বিধান স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মুহাব্বত আল্লাহ তাআলার পছন্দ। তালাক হচ্ছে এর বিপরীত। ভালোবাসা ও মিলনকে ছিন্ন করে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যে তালাক ব্যবহার করা হয়। কাজেই বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তালাক ব্যবহার করা নিষেধ। অপারগাবস্থায় কাজে এগোবার জন্যে তালাককে মুবাহ বা জায়েজ রাখা হয়েছে। কোনো মতেই যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল-মুহাব্বত না ঘটে এবং উভয়ের মেজাজ ও প্রকৃতির মধ্যে বনিবনা না হয় এমতাবস্থায় তাদের মিলনে সুখ-শান্তির কোনো আশা করা যায় না, তখন তালাক ব্যবহার করে একে অপর থেকে পৃথক হয়ে পরস্পর সুখ-শান্তির পথ বের করবে।

তালাক সম্পর্কে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করেন,

১। তালাকের বাক্যের সঙ্গে ইনশাআল্লাহ শব্দ লাগালে বা এর অর্থবাচক বাক্য সংযুক্ত করলে তালাক হয় না। যথা- তালাক দিলাম ইন শা আল্লাহ, তালাক দিলাম খোদা চাহে তো। কিন্তু তালাকের বাক্য ব্যবহার করে থেমে তারপর ইন শা আল্লাহ বললে তালাক হয়ে যাবে। তালাকের বাক্যের সাথে যুক্ত না হওয়াতে ইনশাআল্লাহ শব্দের ক্রিয়া হয়নি।

২। অতীত ও বর্তমানকাল পরিচায়ক শব্দের সাথে তালাক দিলে তা কার্যকরি হয়ে যাবে। যথা- তোমায় তালাক দিলাম বা দিচ্ছি। ভবিষ্যতকালের পরিচায়ক শব্দ দ্বারা তালাক হয় না। যথা- তোমায় তালাক দিবো ইত্যাদি।

৩। যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে ডাকে হে মুতাল্লাকা! (তালাকপ্রাপ্তা) তাতে তালাক কার্যকরি হয়ে যাবে। হাসিঠাট্টা করে বললেও তালাক হবে। ঐ অর্থের যে কোনো শব্দ দ্বারা স্ত্রীকে আহ্বান করলে তালাক হবে।

৪। স্বামী তালাককে যে কোন শর্তের সাথে যুক্ত করে বললে সে শর্ত যখনই পাওয়া যায় তখনই স্ত্রীর ওপর তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

যথা: তুমি তোমার বাপের বাড়িতে গেলে তুমি তালাক বা তোমার ওপর তালাক। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি পিত্রালয়ে যায় তখনই তালাক কার্যকর হবে।

৫। কেনায়া বা ইঙ্গিতসূচক তালাকের শব্দ ব্যবহার করা হলে যদি তখনকার হাল চাল, স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা ও তাদের স্বভাব দ্বারা বুঝা যায় যে, সে তালাকের অর্থেই এ শব্দ ব্যবহার করেছে, এমতাবস্থায় সে যদি বলে আমি তালাকের ইচ্ছে ও নিয়ত করে এ শব্দ বলিনি, তাহলে বিচারকের (কাজী) কাছে তার কথা গ্রাহ্য হবে না। তালাকই কার্যকর হবে। আর যদি সেরকম

কোনো আলামত পাওয়া না যায় তা হলে তার কথা মতেই হুকুম হবে। কেনায়া বা ইঙ্গিতসূচক তালাক দ্বারা তালাক বায়েন হয়।

৬। প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হওয়ার জন্য স্ত্রী যদি কারো সাথে এ শর্তের ওপর নিকাহ করে যে, তার সাথে সহবাস হওয়ার পর তাকে তালাক দেবে, সে অঙ্গিকারের কোনো মূল্য নেই। দ্বিতীয় স্বামীর ইচ্ছে না হলে তালাক নাও দিতে পারে। এরূপ অঙ্গিকারে বিয়ে করাই গুনাহ। তবে যদি অঙ্গিকার মতে তালাক দিয়ে দেয়, তা হলে ইদ্দত পালনের পর প্রথম স্বামীর সঙ্গে পুনরায় বিয়ে করা বৈধ হবে।

তালাকের বহুবিধ মাসআলা আছে। যেখানে যে রূপ হয়, ঠিক হুবহু বর্ণনা দিয়ে অভিজ্ঞ আলিমের কাছ থেকে তার হুকুম জেনে রাখা প্রয়োজন।

'খোলা তালাক' সম্পর্কে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) বলেন-

(১) অর্থের পরিবর্তে তালাকের নাম 'খোলা'। স্বামীর জিম্মায় স্ত্রীর যা পাওনা মোহর বাবদ থাকে তার পরিবর্তে স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাইলে স্বামী তার কথা মতে কাজ করলে অবশ্যই খোলা হয়। স্ত্রী প্রস্তাব করলো- 'আপনার কাছে মোহর বাবদ আমার যা প্রাপ্য আছে আমি তা দাবী করবো না। তার পরিবর্তে আপনি আমাকে আপনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন। তখনই সে মজলিসে স্বামী তদুত্তরে বললো- আচ্ছা আমি তাই করলাম বা তোমায় মুক্ত করে দিলাম। তাতে এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে। স্ত্রী আর মোহরের দাবী করতে পারবে না।

(২) স্বামী যদি বলে "আমি তোমার সম্বন্ধে 'খোলা' করলাম।" সেই মজলিসে স্ত্রী তা কবুল করলে খোলা হবে। এক তালাক বায়েন হবে।

মোহরের দাবী স্ত্রী আর করতে পারবে না। আর যদি স্ত্রী তা কবুল না করে, তাহলে 'খোলা' হবে না। কাজেই তালাকও হবে না।

(৩) স্বামী যদি বলে আমি একহাজার টাকার বিনিময়ে খোলা করলাম আর স্ত্রী তা কবুল করে তা হলে স্ত্রী মোহর তো পাবেই না তদুপরি স্বামীকে আরো একহাজার টাকা দিতে হবে।

(৪) খোলার ব্যাপারে স্বামীর অন্যায় যদি থাকে তাহলে যা টাকা সে পাবে তা তার জন্য হালাল হবে না। আর যদি স্ত্রীরই অন্যায় থাকে তবুও মোহরের পরিমাণের চেয়ে অধিক টাকা নেয়া স্বামীর উচিৎ হবে না। যদি অধিকও নেয় খোলা হয়ে যাবে বটে কিন্তু অধিক নেওয়াটা মাকরূহ হবে।

(৫) স্ত্রী খোলা করতে সম্মত নয়। স্বামী তাকে ধমকিয়ে বা মারপিট করে খোলার সম্মতি গ্রহণ করে খোলা করলে তাতে খোলা হয়ে যাবে। অর্থাৎ এক তালাক বায়েন হবে কিন্তু স্ত্রীর নিকট থেকে টাকা পাবে না এবং মোহরও মাফ হবে না।

সুদের আলোচনা

সুদ শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। সুদপ্রথা ধনসম্পদকে সমাজের মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত করে দেয়। তাই আল্লাহ তাআলা সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) সুদ ও সুদখোর সম্পর্কে জ্ঞানগর্ব আলোচনাপূর্বক বলেন- সুদখোরকে তার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণও ভালোবাসে না। সে এমনি কৃপণ ও খিটখিটে প্রকৃতির হয় যে, তার কার্পণ্য ও বদমেজাজির কারণে পরিবার-পরিজন সর্বদা তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকে। সে স্বয়ং ভোগ করে না, পরিবার পরিজনকেও ভোগ করতে দেয় না। সে চায় শুধু স্তূপ করে ধনসম্পদ জমা করে রাখতে। সুদখোরের অন্তর হিংস্রপ্রাণীর অন্তরের ন্যায়। সে কারও আপন হয় না। কারো অভাব অনটনে, বিপদে আপদে দুঃখ যন্ত্রণায় তার প্রাণ কাঁদে না। সে শুধু চায় মানবসমাজ বিপদে পড়ে তার কাছে আসুক। সুদের হার ঠিক করে দলিল বা আমানত দিয়ে তার নিকট থেকে টাকা ঋণ নিয়ে যাক। সে টাকা দিনে দিনে, মাসে মাসে বাড়তে থাকুক। ছয়মাস বা বছরান্তে, সুদ-হিসাব করে যদি উশুল না হয়ে থাকে তা আসলের সাথে যোগ হয়ে মূল ঋণের সঙ্গে যোগ হবে, তার সুদও হিসেব করা হবে। এরূপ চক্রবৃদ্ধি সুদের কারণে অনেক গৃহস্থ নিজ বাস্তু-ভিটা থেকেও বিতাড়িত হয়ে পথের ভিখিরি হয়ে গেছে। সুদখোর গৃহস্থের অভাবজনিত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠেকিয়ে এমনিভাবে তার সহায় সম্পত্তির ওপর তাদের দুর্লোভী নখর ঢুকিয়ে দেয় যাতে তা টেনে বের করে আনার সময় সে গৃহস্থের সমস্ত সারবস্তু বেরিয়ে আসে। সুদি ঋণ এতোই অমঙ্গলজনক যে, তা কোনো মতে পরিশোধ হতে চায় না। তা বাড়তে বাড়তে খাতকের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। পরবর্তিতে নিলাম হয়ে তার সম্পদ মহাজনের অজগর পেটে ঢুকে যায়। এ অজগর পেটুক তা এমনভাবে হজম করে ফেলে তার গলার ভিতর থেকে একটা ঢেকুর পর্যন্ত বের হয় না। ঠেকিয়ে উসুল করা আর ঠকিয়ে উসুল করা প্রায়ই একই কথা। (তেজারত বা বাণিজ্য) অতি উত্তম ও মঙ্গলজনক এবং মানবসমাজের জীবনযাপনের জন্যে অতি জরুরি কিন্তু এর ভেতর যখন লোভ এসে পড়ে আর ঠেকিয়ে ও ঠকিয়ে অতিরিক্ত লাভ করতে আরম্ভ করে সে সময় এ কল্যাণময় ব্যবসা মানবসমাজের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর হয়ে পড়ে। সুদের দ্বারা এবং সুদি ব্যাংক ইত্যাদি করে অতিরিক্ত লাভ অর্জন করার যখন চাট লেগে যায়, তখন তা আর ছাড়ান যায় না। বারবার শাস্তি ভোগ করেও এরা এ লোভ সামলাতে পারে না। সুদখোর মহাজনের অনেক ঘটনা এমন আছে যে, স্বীয় সহোদরকে-চাচাকে বাস্তু-ভিটা থেকে উচ্ছেদ করেছে। তারা অশ্রুসজল নয়নে বেরিয়ে গেছে। মহাজন তা দখল করে নিয়েছে। সুদ এমন জিনিস যে, মানুষের মনকে হিংস্র করে তোলে। সমাজে হাহাকার আনে। এজন্যে আল্লাহপাক কর্জে হাসানার প্রচুর সাওয়াব ঘোষণা করেছেন এবং সুদ গ্রহণ হারাম করেছেন।

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) (سورة البقرة)

'যারা সুদখোর তারা হাশরের দিন এমনি বিকৃত মস্তিষ্কপাগল লোকের মতো হয়ে উঠবে যাকে শয়তান জিন স্পর্শ করে পাগল করে ফেলেছে। কারণ তারা বলেছে, বেচাকেনার কারবারও সুদের কারবারের মতোই অথচ আল্লাহ বেচাকেনার কারবার হালাল করেছেন আর সুদের কারবার হারাম করেছেন।

(তারা লোভে মেতে দুটিকে একই রকম দেখাবার চেষ্টা করেছে। অথচ বেচাকেনা ও ব্যয় বিনিময়ের আদান-প্রদান ব্যতীত মানবসমাজ চলতে পারে না। এটি মানবসমাজকে বাঁচাবার জন্যে অতিজরুরি। আর সুদের কারবার হচ্ছে- মানবসমাজের জন্যে মারাত্মক অহিতকর। সুদের দ্বারা কোন এক জাতি খুবই ধনবান হয় আর সে জাতির প্রভাবাধীন জাতিসমূহ অন্নবস্ত্রে কোন প্রকারে জান বাঁচাতেও পারে না। আর যদি কোন জাতি অপর জাতির খাতক না হয়ে নিজেদের মধ্যে সুদের আদান-প্রদান করে তাতে ফলাফল এ দাঁড়াবে যে, মাত্র কিছু সংখ্যক লোক ধনবান হয়ে বাকি সব লোক অন্নবস্ত্রহীন হয়ে যাবে। অতএব সকল অবস্থাতেই সুদের কারবার মানবসমাজের পক্ষে অহিতকর। এ কারণে আল্লাহপাক সুদ হারাম করেছেন। তারা লোভে পড়ে পাগলের মত প্রলাপ করছে আর বলছে বেচাকেনাও সুদি কারবারের মতো। আর এজন্যেই তারা হাশরের দিন জিন্নাতের আঘাতপ্রাপ্ত পাগলের মতোই উঠবে।)

যাদের কাছে আল্লাহর উপদেশ পৌঁছে গেছে এবং তারা (উপদেশ মতো) নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত রয়েছে তবে তাদের পূর্ববর্তী সমস্ত (সুদ যা গ্রহণ করেছে) তাদের জন্যে তা ক্ষমাযোগ্য। (এ আদেশের পূর্বে যা সুদ খেয়েছে সব ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ করা হয়নি।) তাদের বিষয় যা করতে হয় তা আল্লাহ করবেন। আর যারা (এ নিষেধ না মেনে) পুনরায় সে কাজ করে (সুদ খায়) তারা অবশ্যই নরকবাসী। তারা চিরকাল সেথায় থাকবে। আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দান-খয়রাতে বরকত দেন। আল্লাহ অকৃতজ্ঞ পাপী কাফিরকে ভালোবাসেন না। যাঁরা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, নিয়মিত নামাজ পড়েছে, যাকাত আদায় করেছে তাঁদের পুণ্যাদির প্রতিদানসমূহ তাদের প্রভুর নিকট নির্ধারিত আছেই। তাঁদের কোনো আশঙ্কা নেই। তাঁদের চিন্তাযুক্ত হতে হবে না। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, যা সুদ (খাতকের কাছে) বাকি আছে সব ছেড়ে দাও। যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হও। যদি তা না করো তবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো। যদি তোমরা তওবা করো তাহলে তোমাদের আসল টাকা তোমরা নিতে পারো। এতে তোমরা (খাতকের প্রতি) জুলুমকারি হয়ো

না এবং তোমরা (খাতকের পক্ষ থেকে আসল টাকা অনাদায়ে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না। আর যদি সে (খাতক) নিতান্ত অভাবী হয় তা হলে তাকে একটু স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত সময় দাও (যাতে সে জোগাড় করে তোমার আসল টাকা পরিশোধ করে দেয়) আর যদি তাকে দানই করে দাও তবে তা তোমার পক্ষে অধিক মঙ্গলময় হবে (কারণ শতশত গুণ অধিক সাওয়াব তুমি পরকালে হাসিল করবে), যদি তা তোমরা বুঝতে পারো। (তবেই তোমাদের মঙ্গল) (সুরা বাকারা, ২৭৫-২৮০)।

যেনা বা ব্যভিচারের আলোচনা

যেনা বা ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি যে বাস্তব তা যুক্তির কষ্টিপাথরে মূল্যায়ন করে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) বলেন-

ইসলামি শরিআত অবিবাহিত যেনাকার বা ব্যভিচারীকে একশত বেত্রাঘাত ও বিবাহিত যেনাকার বা ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে।

পৃথিবীতে যতো প্রকারের চরিত্রহীনতা আছে এর মধ্যে যেনা বা ব্যভিচার হচ্ছে নিকৃষ্ট ও জঘন্য। এর কুফল সুদূরপ্রসারী।

(১) যেনাকার বা ব্যভিচারী পুরুষ-মহিলা স্বীয় কুকীর্তি দ্বারা স্বীয় গোত্র ও আত্মীয় স্বজনের মুখে কালিমা লেপন করে। তারা সমাজে মুখ দেখাতে পারে না। তাদের নিকটাত্মীয়দের মানসিক অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তারা বিষপান করে প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়।

(২) যেনাকার স্ত্রীলোক তার স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, স্বীয় বংশীয় মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে। অনুরূপভাবে পুরুষও তার স্ত্রীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এভাবে ব্যভিচারী স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরের ওপর আস্থা হারায় এবং সন্দিহান করে তোলে যা স্থায়ী অশান্তির কারণ হয়।

(৩) ব্যভিচারের মাধ্যমে জারজ বা অবৈধ সন্তানের জন্ম হলে জন্মের পরে সে অভিভাবকহীন অবস্থায় অযত্নে মারা যায় অথবা অভিশপ্ত হয়ে বেঁচে থাকে।

(৪) জারজ বা অবৈধ সন্তানের বেঁচে থাকা প্রকৃতপক্ষে তার মৃত্যুর চেয়েও অধিক যন্ত্রণাদায়ক। একটি মানুষ সারাজীবন ঘৃণার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকা এক হাজারবার মৃত্যুবরণের চেয়েও অধিক যন্ত্রণাদায়ক। কোনো মজলিসে সে উপস্থিত হলে সকলের অন্তরে তাকে দেখামাত্র তার জন্মবৃত্তান্তটা স্মরণ হয়। সেও মনে মনে ভাবে সকলে আমাকে অবৈধ সন্তান (জারজ) বলে ঘৃণার চোখে দেখে। চিন্তা করুন, এরকম দীর্ঘস্থায়ী ঘৃণার মূল কারণ ব্যভিচার।

সর্বোপরি এ অবৈধ সন্তানের সাংসারিক জীবনও দুর্বিষহ, তাকে কেউ মেয়ে দিয়ে জামাতা করতে ইচ্ছে করে না। স্ত্রী লোক হলে কোনো পুরুষ তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে রাজি হয় না। আর যদি তাদেরকে কেউ গ্রহণও করে সে গ্রহণকারীও তাদেরই মতো চরিত্রহীন, মর্যাদাহীন ও ব্যক্তিত্বহীন লোক হয়। এদের সংসারে যে সন্তান-সন্ততি আসবে তারাও তাদের মতো অসৎ প্রকৃতিরই হবে। যা পরবর্তিতে সমাজের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

(৫) ব্যভিচারী পুরুষ-মহিলা যে অবৈধ কাজ করেছে তা সম্পূর্ণ গরু-ছাগলের মতো। পশু-পাখির যেমন কোন নিয়ম-নীতি, ধর্মীয় বন্ধন ও বংশমর্যাদা নেই, তাদের পিতা-মাতা নির্ণয়ের প্রশ্ন নেই, ব্যভিচারী পুরুষ-মহিলাও তেমনি পশু-পাখির মতো মানবকুলকে অপমানিত করে কাম-ভাব চরিতার্থ করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা মানবসমাজকে কলুষিত করেছে।

(৬) ব্যভিচারী পুরুষ-মহিলাকে এ ধরনের মারাত্মক গর্হিত কাজের জন্যে যে শাস্তি দেয়া হয় তা দেশের বিধান ও জাতির চরিত্র রক্ষার জন্য সামান্য শাস্তিই দেয়া হয়। এ শাস্তির মাধ্যমে তাদের গুনাহ মাফ হবে না যদি তারা কায়মনোবাক্যে তাওবা না করে।

যাদের অন্তরে ব্যভিচারের শাস্তি কঠিন মনে হয় তারা ব্যভিচারের কদর্যতাকে যেভাবে অনুভব করা উচিত সেভাবে করছে না।

পাশ্চাত্যের অনেক ধনাঢ্য জাতি এতোই চরিত্রহীন হয়ে পড়েছে যে, তারা প্রতি বছর নির্লজ্জভাবে অবৈধ সন্তানের (জারজ) বার্ষিক সংখ্যা সংবাদপত্রে প্রকাশ করে নির্লজ্জতার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমরা তাদের এ গর্হিত চরিত্রের অনুসরণ করছি। দেশের উন্নয়নের জন্যে যদি তাদের থেকে কিছু শেখার প্রয়োজন পড়ে তাতে কোন বাধা নেই। কিন্তু তাদের অপবিত্র হীনকদর্য চরিত্রের কি অনুসরণ করতে হবে? কখনো না। নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন- خُذْ مَا صَفَا وَدَعْ مَا كَدِرَ 'তাদের মধ্যে ভালো বিদ্যা-হিকমত যা পাও তা গ্রহণ করো। আর যা খারাপ নোংরা-কদর্য তা ছেড়ে দাও'।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়- আমরা তাদের ভালগুলো গ্রহণ করি না বরং তাদের গর্হিত রীতি-নীতি অনুসরণ করে চলেছি।

পরিশেষে বলতে হয়- বিশ্বের অপরাপর ধর্মাবলম্বী যদি পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে এতে তেমন একটা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কারণ তারা নিজেরাই বাতিল ধর্মের অনুসারী, অপর এক বাতিল ধর্মের অনুসরণ করছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হচ্ছে- ইসলামের মতো সত্য ও আদর্শ ধর্মের অনুসারী মুসলমানগণ কী করে পাশ্চাত্য রীতি-নীতির অনুসারী হতে পারে?

চুরির শাস্তি হাত কাটা সম্পর্কে আলোচনা

ইসলামি শরিআত চুরির শাস্তি হাত কাটার যে বিধান প্রবর্তন করেছে তা যে বিজ্ঞানসম্মত কোনো বর্বরতা নয় আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন স্বার্থকভাবে। তিনি বলেন, পবিত্র হাদিসে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রহ.) থেকে বর্ণিত-

عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه ، فقالوا ماكنا نراك تبلغ به هذا قال لو كانت فاطمة لقطعتها ،[1]

---

১. সুনানে নাসাঈ- ৩৬০৭১।

'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে একজন চোরকে নিয়ে আসা হলো। রাসুল (সা.) তার হাত কেটে দিলেন। সে সময় উপস্থিত সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি যে তার শাস্তি বিধান সম্পর্কে এতোদূর অগ্রসর হবেন তা আমরা অনুমান করিনি। (আমরা মনে করেছিলাম আপনি তাকে দয়া করবেন) তখন নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন- যদি এ অপরাধী (আমার প্রাণপ্রিয় কন্যা) ফাতিমা হতো তবুও আমি তার হাত কেটে দিতাম, (কারণ অপরাধের প্রমাণ অথবা স্বীকৃতির পর যখন সে অভিযুক্ত লোক দোষী সাব্যস্ত হয় তখন বিচারে তাকে যথোচিত শাস্তি না দিয়ে দয়া করা চলে না। বিচারপতি সে রকম দয়া করতে গেলে দেশ শাসন ও শান্তি রক্ষা হবে না। অপরাধীকে দয়া করার অর্থ দেশবাসী-জনগণের ওপর অত্যাচার করা। অপরাধীকে দয়া করলে দুস্কৃতিকারীদের সাহস বেড়ে যায়। তদ্বারা নিরীহ ও ভদ্রলোকগণের ধন-সম্পদ ও প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়ে।)

রাসুলুল্লাহ (সা.) এসব বিষয়ে কারো ব্যাপারে বিচারকের কাছে সুপারিশ করা নিষেধ করেছেন। বর্তমান সভ্যজগতের লোকজন নাকি বলে যে, চুরির শাস্তি হাত কাটা অত্যন্ত কড়া ও কঠিন শাস্তি বটে। একজন মানুষের একটা অঙ্গ নষ্ট করে দেয়াটা খুব কঠোর বিধান। দেশের যেখানে সেখানে হাতকাটা অকর্মণ্য লোক সৃষ্টি করবে ইত্যাদি।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যুক্তির কষ্টিপাথরে এর জবাব প্রসঙ্গে বলেন- অপরাধসমূহের শাস্তি বিধানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে দেশ শাসন করা, শান্তি রক্ষা করা। অভিযুক্ত অপরাধী শাস্তি ভোগ করে ভবিষ্যতের জন্যে সাবধান হবে এবং এহেন গর্হিত কার্যাবলি থেকে বিরত থাকবে। তার অবস্থা দেখে অপরাপর দুস্কৃতিকারীগণও এরূপ অপকর্ম চিরতরে ত্যাগ করবে। তাতে দেশে শান্তি বিরাজমান থাকবে, অপকর্ম ও অন্যায়ের মূল উৎপাটিত হবে, বিশৃঙ্খলা থাকবে না।

বর্তমান সভ্যজগতে চোরের জন্যে যে শাস্তির বিধান রয়েছে, তাতে উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া তো দূরের কথা মূল উদ্দেশ্যের উল্টো কাজই হচ্ছে, চোর জেলখানায় কিছুদিন অবস্থান করে, সেখানে আরো দুর্ধর্ষ চোরের সাহচর্যে এসে এমন সাহসী, নির্ভিক ও কৌশলী চোর হয়ে পড়ে যে তার কারণে সমাজ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। জেলখাটা চোরগুলো নাকি বাহাদুরি করে বলে থাকে, জেলখানা আবার কী? তাতো আমাদের শশুরবাড়ি।

আমরা ভালোরূপে দেখেছি যে, জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে শতকরা নিরান্নব্বইজন চোর আরো দুর্ধর্ষ চোরে পরিণত হয়। আর শতকরা একজন হয়তো লজ্জিত হয়ে চুরি বিদ্যা ছেড়ে দেয়। এ কথা ধ্রুব সত্য।

ইসলামি শরিআতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শান্তিরক্ষা, জনকল্যাণ এবং সংশোধন, একজন চোরকে হত্যা করলে তাকে ভাল হওয়ার সুযোগ দেয়া হলো না এবং তাকে দেখে অপরাপর চরিত্রহীন লোকদের যে সংশোধন হওয়ার সুযোগ রয়েছে তা হবে না। এজন্যে ইসলামি শরিআতে একখানা হাত প্রথমবারে কাটার বিধান করা হয়েছে। আল্লাহ জাল্লাশানুহু মানব-দানব তথা সব মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। এদের কোন রোগের কী চিকিৎসা করতে হবে তা তিনি ভাল জানেন। আল্লাহপাক যেরূপ অপরাধ, সেরূপ শাস্তির বিধান রেখেছেন, তা এমনই সঙ্গত ও যথাযথ যে, এর বিপরীত কোন সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই।

কেউ কেউ বলে থাকে চোরের শাস্তি-হাতকাটা হলে দেশে হাতকাটা, কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এতে রাষ্ট্রের ভীষণ ক্ষতি হবে। বেকার সমস্যা বেড়ে যাবে। তাদের এ যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। শরিআহ অনুযায়ী চোরের যদি হাত কেটে দেয়া হয় তখন চোরের সংখ্যা এমন কমে যাবে, দু'চার বছরে একজনেরও হাত কাটার প্রয়োজন পড়বে না। যে জেলার মধ্যে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার সাথে নির্দিষ্ট তারিখে প্রকাশ্য স্থানে একটি চোরের হাত কর্তন করা হবে, সে জেলায় বরং সে বিভাগে তেমন চুরির ঘটনা ঘটবে না। সরকার যেদিন ঘোষণা করবে- চোরের হাত কাটা হবে এবং জনসাধারণকে চুরির মামলা চালানো খুবই সহজ করে দেয়া হবে, সেদিন থেকেই চোর তওবা করে চুরি থেকে ফিরে আসবে।

সৌদি আরবে চুরির শাস্তি হাত কাটা কার্যকর রয়েছে। সেখানে হাত কাটা লোক কোথায় দৃষ্টিগোচর হয়? অবশ্য সেখানে চুরি বা ডাকাতির ঘটনা নেই বললেই চলে। নামাযের আযান হওয়ার সাথে সাথে দোকানদার লক্ষ লক্ষ টাকার মালামাল উন্মুক্ত রেখেই নামায পড়তে চলে যায়। শহরে এবং গ্রামে একই চিত্র।

অতএব, বিরুদ্ধবাদীদের কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং কুরআনের আইন যথাযথ ও বাস্তব এবং বিজ্ঞানসম্মত।

পর্দা সম্পর্কে আলোচনা

পর্দা মুসলিম নারীর সৌন্দর্য। নারীর মান-সম্মান, ইজ্জত-আব্রুর রক্ষাকবচ পর্দা। 'মায়েদের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত' ঘোষণার মাধ্যমে নারীকে মহিমান্বিত করেছে যে ইসলাম, নারীর মহামহিম মর্যাদা রক্ষায় পর্দার অপরিহার্যতাও অনিবার্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে সে ইসলাম।

ইসলাম ও পর্দাপ্রথা সম্পর্কে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন তা অত্যন্ত বাস্তবিক ও যুক্তিসঙ্গত। তিনি বলেন- আল্লাহপাক মানব জাতিকে পুরুষ-স্ত্রী দুই শ্রেণিতে সৃষ্টি করেছেন, উভয়ের সম্মিলিত সমষ্টির নাম মানবসমাজ। দু'য়ের কোন একটি না হলে মানবসমাজ অঙ্গহীন। ঠিক তদ্রূপ অন্যান্য প্রাণী ও নর-নারীতে বিভক্ত। কিন্তু এ সব পশু-পক্ষীর মধ্যেও অনেক প্রাণীকে দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট নর-নারীতে জোড়া মিলে তারা বসবাস করে। এক নরের নির্দিষ্ট নারীর সাথে অপর নর এসে মিশতে চাইলে তখন নরে-নরে লড়াই লেগে যায়। এটি হচ্ছে স্বাভাবিক আত্মমর্যাদাবোধ। এদের মধ্যে জোড়া নির্ধারিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের মধ্যে নাম ও গোত্র এবং বংশ মর্যাদার কোন প্রশ্নই আসে না। অবাধ মিলনে তাদের কোন ক্ষতি নেই। পক্ষান্তরে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের মর্যাদা অপরিসীম। এদের নাম, গোত্র এবং বংশ অবশ্যই ঠিক থাকতে হবে। মানুষের বংশমর্যাদা অবশ্যই অক্ষুণ্ন থাকতে হবে।

একজন স্বামী প্রাণের সকল আবেগ, প্রেরণা ও পিপাসা নিয়ে এরূপ আশা করে যে, স্বীয় স্ত্রীর সকল ভালোবাসা ও মুহাব্বত তাকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত। এই অকপট ভালোবাসা, অটল বিশ্বাস ও দ্বিধাহীন নির্ভরতার ওপর ভিত্তি করেই উভয়ের সংসারযাত্রা সুচারুরূপে শান্তিপূর্ণভাবে

নির্বাহ হবে। এই অটুট সম্পর্কের মধ্যে কোন ধরনের দুর্বলতা ও ত্রুটি না আসার জন্যে নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন,

إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله[১]

"ওই ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুমিন যার চরিত্র ও আচার ব্যবহার (সর্ব সাধারনের সাথে) উত্তম এবং যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে উত্তম ভালোবাসা ও দয়া-মুহাব্বতের ব্যবহার করে"। পবিত্র হাদিসে আরো ইরশাদ হয়েছে- خياركم خياركم لنسائهم "তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারা, যারা স্বীয় স্ত্রীদের নিকট উত্তম।" নবী করিম (সা.) আরো ইরশাদ করেন, خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের প্রতি উত্তম, আমি আমার পরিবারের প্রতি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।"

স্ত্রী স্বামীর জন্যে কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التى تَسُرُّه إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فى نفسها ولا مالها بما يكره –[২]

"হুজুরকে (সা.) জিজ্ঞেস করা হলো, স্ত্রীদের মধ্যে কোন স্ত্রী উত্তম? তিনি বলেন- ওই স্ত্রীলোক উত্তম যার দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্বামীর মন-প্রাণ আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করে, যাকে স্বামী কোনো আদেশ করলে তা পালন করে, যে নারী স্বীয় শরীর ও স্বামীর বিত্ত-বৈভব সমন্ধে এমন কোনো কাজ করে তার বিরোধিতা করে না যা সে অপছন্দ করে।"

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন-

اربع من اعطيهن فقد اعطى خير الدنيا والاخرة قلب شاكرو لسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خوفًا فى نفسها ولا ماله.[৩]

চারটি বস্তু যাকে দেয়া হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ প্রদান করা হয়েছে। (১) কৃতজ্ঞ হৃদয় (খোদাপ্রদত্ত নেয়ামতরাজি সমন্ধে যে হৃদয় সর্বদা শুকর গুজারী করে) (২) স্মরণকারী যবান (যে যবান সর্বদা আল্লাহর যিকিরে মাশগুল থাকে।) (৩) বিপদে ধৈর্য ধারণকারী শরীর (দুনিয়া স্বর্গ নয়, কাজেই এখানে সময় সময় বিপদাপদ এসে থাকে। এমতাবস্থায় সবর ও ধৈর্যাবলম্বন করলে আল্লাহ খুশী হন এবং সাহায্য করেন।) (৪) এমন স্ত্রী যিনি দেহ ও মনে স্বীয় স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না এবং স্বামীর সহায়-সম্পদেও তার বিশ্বাসঘাতকতা করে না। এ চারটি বস্তু অর্থাৎ কৃতজ্ঞ হৃদয়, আল্লাহর যিকিরকারী যবান। ধৈর্যশীল শরীর এবং বিশ্বস্ত প্রেমময়ী স্ত্রী যে ব্যক্তিকে আল্লাহ দান করেছেন, সত্যিই তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণময় জীবন দান করেছেন।

---

১. সুনানে তিরমিযী- ১১৬২
২. সুনানে নাসাঈ- ৩২৩১
৩. যঈফুত্-তারগিব- ১২০৬

উপর্যুক্ত হাদিস ও পার্থিব অভিজ্ঞতা দ্বারা এ কথা নিশ্চিত প্রমাণিত যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত সংসার যাত্রা সুচারু ও শান্তিময়রূপে নির্বাহ হওয়ার জন্যে তাদের মধ্যে অটুট বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রয়োজন। এই অটুট বিশ্বাস নির্ভর করে উভয়ের শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতার ওপর। যদি উভয়ের বা কোন একজনের চরিত্র পবিত্র না হয় তবে তাদের মধ্যে অকাট্য বিশ্বাস ও ভালোবাসা থাকতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি চরিত্রহীন হয়, তাহলে তাদের মধ্যে কখনো প্রকৃত ভালোবাসা সৃষ্টি হয় না। ভালোবাসা অতি পবিত্র। অপবিত্র মানবের অপবিত্র হৃদয়ে পবিত্র মুহাব্বত কখনো বাসা বাঁধে না। তারা নিছক কামনা-বাসনা চরিতার্থের জন্যেই বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

অতএব, নর-নারীর চরিত্রকে পবিত্র রাখার জন্যেই ইসলাম পর্দাপ্রথা প্রবর্তন করেছে।

আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের বর্ণনা

এই মহাবিশ্বের অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তিনি সবসময় ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তাঁর অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ও অবশ্যম্ভাবী। প্রশংসনীয় সমস্ত গুণাবলী দ্বারা তিনি গুণান্বিত। সব ধরনের দোষত্রুটি হতে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। সবকিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাশালী। সকল সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছায় আবর্তিত। তিনি সর্বশ্রোতা ও সম্যকদ্রষ্টা। তাঁর কোনো উদাহরণ নেই। তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাঁর কোনো নজির নেই। তিনি বে-মেসাল সত্তা। তাঁর অবশ্যম্ভাবী ও নিত্য অস্তিত্বে, ইবাদত বন্দেগীর অধিকারে এবং বিশ্বজাহানের শৃঙ্খলা বিধানে কেউ তাঁর শরীক নেই।

'আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব সম্পর্কে যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা বাস্তবিকই তাঁর প্রখর মেধা ও পরিপক্ব জ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি বলেন-

মানবসমাজে এমনও কিছুসংখ্যক লোক আছে, যারা অদৃশ্য অজানা এক প্রভু মেনে নিয়ে নিজেদেরকে দাসত্বের দলভুক্ত করতে নারাজ। তাদের মতে "খোদা বলতে কিছুই নেই (নাউযুবিল্লাহ)। তা একটি অলীক কল্পনা বা অন্ধ বিশ্বাসপ্রসূত বস্তুমাত্র। বরং সব কিছুই প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্মে পরিচালিত হচ্ছে। তাদের এ যুক্তি কি বাস্তবিক সত্য? আল্লাহ আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি ও অনুভূতির আওতা বহির্ভূত বটে। কিন্তু তিনি কি সত্যই অজানা? বিশ্বের বড়-ছোট প্রত্যেকটি বস্তু তার অস্তিত্বের সত্যবাদী সাক্ষী নয় কি ? "একে-একে-দুই" কথাটি এরূপ স্বতঃসিদ্ধ যে তা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করার আবশ্যকতা নেই।

তদ্রূপ "আল্লাহ আছে" কথাটিও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। যা অতি উজ্জ্বল তা আবার যুক্তি দ্বারা প্রমাণ কেনো? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুর আদি ও অন্ত আছে। যেমন "অতীতে আমরা ছিলাম না, বর্তমানে আছি এবং ভবিষ্যতে থাকবো না"। যখন আমরা ছিলাম না, আসলাম কী করে? স্বয়ংক্রিয় ডাক? স্বেচ্ছায়? না, তা অসম্ভব। কারণ যখন আমরা ছিলাম না। তখন আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, শক্তি, ক্ষমতা কিছুই ছিলো না বিধায় স্বীয় শক্তিবলেও আপন ইচ্ছায় আমরা অস্তিত্বে আসিনি, আর এখন যে আমরা আছি এ অবস্থায়ও দেখা যাচ্ছে

আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের ইচ্ছা বা এরাদার কোনোই দখল নেই। মরবার ইচ্ছা আমরা মোটেই করি না, বরং অমর হয়ে থাকবার ইচ্ছাই করি, তবুও আমাদের মরতে হয়। আবার জাগতিক জীব বা বস্তুসমূহের মধ্যে কেউবা দীর্ঘস্থায়ী হয়- যেমন রবি, শশী ইত্যাদি-বা স্বল্পস্থায়ী হয়- যেমন মানব, দানব ইত্যাদি বা ক্ষণস্থায়ী হয়, যেমন মাছি-মশা ইত্যাদি। এই বিভিন্ন প্রকার স্থায়িত্বেও আমাদের ভেতর অসংখ্য পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। এ অবস্থা লোপ পেয়ে অন্য অবস্থার উদ্ভব হয়। লুপ্ত অবস্থার পুনরাগমন ও বর্তমান অবস্থার বিলুপ্তি সবই অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের খেলা! বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য, শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত, বসন্ত, আরও কতো কি ! এসব বিষয়ে যখন আমাদের ইচ্ছের কোনোপ্রকার দখল নেই, তা হলে অবশ্যই অপর কোন শক্তির ইচ্ছে-ইশারাতেই এসব হয়ে চলছে মেনে নিতেই হয়। সে অপর শক্তি কি অবাধ, অসীম, অনাদি, অনন্ত? না- সীমাবদ্ধ সসীম? যদি বলা হয় সসীম, তবে আদিতে তার অস্তিত্বে আসাটা কার ইচ্ছায় হলো? অবশেষে কাবু হয়ে বলতে হবে যে, সে শক্তি অনাদি অনন্ত-অসীম। সৃষ্টি জগতের সব কিছুই আদিতে সে অনাদি-অনন্ত-অসীম শক্তিমানের ইচ্ছাতেই অস্থিত্ব লাভ করেছে। তারই নাম 'আল্লাহ' তিনি স্রষ্টা, পালনকর্তা, বিধাতা, হন্তা, জন্ম-মৃত্যু, অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, আবির্ভাব-তিরোভাব সবকিছুই সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছেয় হয়ে চলেছে। সীমাবদ্ধ শক্তি যতো প্রকাণ্ডই হোক না কেনো সে স্বীয় অস্তিত্বের ও স্থায়িত্বের জন্য পরমুখাপেক্ষী ও মুহ্তাজ।

নাস্তিকদের একদল বলে থাকে যে, "সৃষ্টিজগতের সবকিছুই প্রকৃতির লীলা- খেলা বৈ আর কিছু নয়। প্রকৃতির দ্বারা সব হচ্ছে, হবে এবং যাচ্ছে ও যাবে"। তাই যদি হয় তবে প্রশ্ন জাগে যে, প্রকৃতির শক্তি কি অসীম-অবাধ? না সীমাবদ্ধ! যদি সীমাবদ্ধ হয় তবে তার আদিতে তার অস্তিত্ব কার ইচ্ছায় হলো? আর যদি অবাধ অসীম হয় তবে তাকে বাধাপ্রাপ্ত হতে দেখা যায় কেনো? যেমন নারী সন্তান গর্ভধারণের নয় কি দশ মাস বা কিছু কম-বেশি মাতৃগর্ভে থাকার পর এক পূর্ণাঙ্গ শিশু জন্মলাভ করানোই ছিলো প্রকৃতির কর্তব্য। তবে অন্ধ, খোঁড়া, পঙ্গু সন্তান জন্মলাভ করে কেনো? প্রকৃতির শক্তিকে বাধা কে দিলো? রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি যদ্বারা বিঘ্ন ঘটেছে তাও কি প্রকৃতি? যদি তাই হয় তবে প্রশ্ন জাগে প্রকৃতি যে অবস্থায় কর্তা ছিলো ঠিক তদবস্থায় বাধাদানকারী কি করে হতে পারে? বিজ্ঞান তা সমর্থ করতে পারে না। যদি প্রকৃতি ব্যাধিগ্রস্ত ছিলোই বলে তার কাজ পূর্ণমাত্রায় হয়নি বলা হয়, তাহলে ব্যাধির বাধায় যখন প্রকৃতি পরাজিত হলো, তবে তার শক্তিকে অবাধ-অসীম বলা মহাভ্রান্তি নয় কি? কাজেই ঘুরে এসে মেনে নিতে হবে যে প্রকৃতির শক্তি সীমাবদ্ধ ও পরমুখাপেক্ষী। শেষপর্যন্ত এক অনাদি অনন্ত সর্বশক্তিমানের অস্তিত্ব মেনে নিতেই হয়। তিনিই হচ্ছেন আমাদের প্রভু আল্লাহ।

আমাদের ভূমণ্ডলাপেক্ষা কতো লক্ষ গুণ বড় সূর্যকে দূরত্বের কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেনো একখানা পাত্র বা প্লেট! কিন্তু যিনি অনাদি-অনন্ত তাঁর জন্য দূরত্ব বলে কিছুই নেই। তিনি মকান ও লা-মকানজুড়ে আছেন। বিশাল বিশ্বজগতে সূর্যের মতো এবং তার চেয়েও অধিক প্রকাণ্ড লক্ষকোটি গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে যারা অনাদি অনন্ত মহান-মহীম আল্লাহর সামনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালুকণার চেয়েও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র।

"সর্বশক্তিমান আল্লাহপাকই একই সমুদ্রে পাশাপাশি দুটি স্রোতধারা প্রবহমান করে দিয়েছেন। একটি মিষ্টি, সুস্বাদু, পিপাসা নিবারক আর একটি লবনাক্ত-কটু এবং উভয়ের মধ্যস্থলে অদৃশ্য পর্দা ও আড়াল করে দিয়েছেন- যেনো একটির পানি অপরটির সাথে মিশে স্বাদে গন্ধে একাকার না হয়ে যায়...।

এ বাণী দ্বারা আল্লাহ জাল্লাজালালুহু বান্দাগণকে আহ্বান জানাচ্ছেন যে, দেখো, তোমরা একটু চিন্তা করলেই আমার পরিচয় পেতে পারো। এমন সমুদ্র রয়েছে যার ভিতর দু'টি সমুদ্রের স্রোত চলেছে। একটি লোনা আর একটি মিষ্ট, উভয়ের মধ্যস্থলে কোন প্রকাশ্য পর্দা, আড়াল বা মাটির বাঁধ নেই। প্রবহমান তরল পানির স্বভাব হলো মিশে যাওয়া। কিন্তু এখানে মিশে একাকার হয় না কেনো? বাধা কিসের? বিজ্ঞান যদি এর কোনো সুক্ষ্ম কারণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, তবে তা এমন কারণ হবে যার গোড়াতে আর একটি মূল কারণ বেরিয়ে পড়বে। সেই মূল কারণ হলো আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছা। এ যুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে বৈজ্ঞানিক নিয়মেই "আল্লাহ আছে" একথা প্রমাণিত হবেই হবে! পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহপাক এ ধরনের আরও বহু যুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে বান্দাগণকে বলেছেন- "অতএব তোমরা গবেষণা করে দেখো হে জ্ঞানীগণ! সুতরাং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তাআলাকে বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি ও অনুভূতির আওতার বাইরে বলে তাকে অজানা আখ্যায়িত করা কি আস্ত মুর্খের কাজ হয়নি? যাঁরা সাইয়িদ, খান, মির্জা, পাঠান অথবা কুরাইশী, ফারুকী, উসমানী বা আনসারী, তাঁরা কি তাঁদের পূর্ব-পুরুষগণকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন? কখনো না। তবু এ অদেখা অজানা বংশ পরিচয়টি নিজেদের নামের পাশে লিখে বেড়ান কেনো? বিশ্বইতিহাসে লিখিত বিষয়াদি বিশ্বাস করা হয় কেনো? তারা কি এসব ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন? বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য সব শিক্ষাকেন্দ্রে ইতিহাস পাঠ্য কেন? দুনিয়াময় কোর্ট-কাছারিতে যে সমস্ত বিচারাদি চলছে এবং এ সমস্ত বিচারে ফাঁসি ও দ্বীপান্তর পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ বিচারকমণ্ডলী এসব মামলার কিছুই তো স্বচক্ষে দেখেননি। শুধু সাক্ষ্য-প্রমাণ শুনেই বিচারকার্য সম্পন্ন করে রায় প্রদান করেন এবং এসব রায় সকলেই মেনে নেন। তিনি যে মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করলেন, তা কি তিনি নিজ চোখে দেখেছেন? না দেখেননি। কেননা যতক্ষণ তিনি গর্ভ থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়েননি, ততক্ষণ পর্যন্ত তার চোখই ফুটেনি। তা হলে তার জন্মবৃত্তান্তও তার অজানা। তবে তার মা-কে মা বলে ডাকাও বোকামী ও অজ্ঞতা। এই যদি হয়, তবে সারাবিশ্বে বোকামী ছাড়া আর কিছুই থাকে না। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, কোনো কিছু অদৃশ্য হলেই অজানা হয় না। বিশ্বাসযোগ্য ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা যা জানা যায়, তা অনেক সময় চোখে দেখা, জানার চেয়েও উত্তম জানা হয়ে থাকে। দৃষ্টিশক্তি অনেক সময় ভুলও করে থাকে, কিন্তু অকাট্যভাবে প্রমাণিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও গভীর অনুভূতি দ্বারা অনুভূত জ্ঞানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। সুতরাং বোকামি বলে আল্লাহপাকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করাই হবে সবচেয়ে বড় মূর্খতা।

ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেনি

'ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেনি'- এ উক্তির বিরুদ্ধবাদীদের আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন, যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর বক্তব্যই যুক্তিযুক্ত। বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তিনি বলেন-

শত্রুগণের অত্যাচারে হুজুরে আকদাস (সা.) জন্মভূমি ত্যাগ করে প্রায় পৌনে তিনশতো মাইল দূরবর্তী স্থান মদিনায় হিজরত করেন। মুশরিকদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ বদর নামক স্থানে হয়। বদর মক্কা থেকে প্রায় ২৫০ মাইল ও মদিনা থেকে মাত্র ৩০ মাইল। তারপর হলো উহুদের যুদ্ধ। মক্কা থেকে প্রায় পৌনে তিনশতো মাইল ও মদিনা থেকে আড়াই মাইল। তৎপর খন্দকের যুদ্ধ। তাতে তারা এক হাজার সেনাবাহিনী সহ মদিনা শহরকেই অবরোধ রেখেছিলো।

এখন বিচার করুন আক্রমণকারী কারা? হুদাইবিয়াতে ১০ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হলো তার পরের বছরই তারা কয়েকটি মুসলিম বন্ধু গোত্রের ওপর চুক্তি ভঙ্গ করে আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংস করলো। এতো শয়তানি, এতো বেঈমানি কাঁহাতক সহ্য করা যায়? হযরত (সা.) পূর্ণ শক্তি নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হন। বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় হলো যুদ্ধ হলো না। একটি শত্রুকেও মারা হলো না। প্রাণের শত্রু, রক্তের পিপাসুগণকে ক্ষমা করা হলো। ঘোষণা হলো, "লা তাছরিবা আলাইকুমূল ইয়াওম আন্‌তুমুত্তোলাক্বা" আজ তোমাদের ওপর কৈফিয়ত তলব নাই। তোমরা মুক্ত। তারা অবাক। তারা নিজেদের শ্রবণশক্তিকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। তারা হুজুর (সা.)-এর প্রাণনাশের জন্য ও ইসলামকে ধ্বংস করার নিমিত্ত যতো শয়তানি, যতো অন্যায়-অত্যাচার, যতো বেঈমানী ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো এবং যতো যুদ্ধ-বিগ্রহ তারা বাধিয়েছিলো সবইত তাদের স্মরণ ছিলো। তারা আশ্চর্যান্বিত! কি? আমরা মুক্ত? তারা ভেবেছিলো আজ মক্কা নগরীর অলিগলিতে তাদের রক্তস্রোত প্রবাহিত হবে। এমন সময় সংবাদ এলো হাওয়াযেনের বিশ হাজার যুবক সেনা মুসলিমগণের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তিনি স্বসৈন্যে সেদিকে ধাবিত হন। তাও যখন শেষ হলো আরব দেশের ফ্যাসাদের ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কেন্দ্রীয় বড় আড্ডা চুরমার হয়ে গেলে হযরত (সা.) একটু শান্তিতে নিজ কর্তব্য কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অতি অল্প সময়ে সমগ্র আরব ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে গেলো। তিনি কেনো যুদ্ধ পছন্দ করবেন? তিনি সর্বদা যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টাই করতেন। শান্তিকালেইত তাঁর কাজ অধিকতর অগ্রসর হচ্ছিলো। ইসলামের দুশমনরাই যুদ্ধ বাঁধিয়ে তাঁর কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছিলো। মদিনার ইহুদিগণ বারবার চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। শত্রুগণের সাথে মিলিত হয়ে ইসলামের মূল উৎপাটনের নিমিত্ত নতুন নতুন ষড়যন্ত্র করছিলো। তাদের সাথে যুদ্ধ হলো। হযরত (সা.) যতো যুদ্ধ করেছেন প্রায় সমস্তই আত্মরক্ষার জন্য অথবা শত্রুগণের ষড়যন্ত্র এবং সমরায়োজন বিধ্বস্ত করার জন্যে। হুজুর (সা.) এর যতো যুদ্ধ শত্রুগণের সাথে বেঁধেছিলো সকল যুদ্ধে উভয়পক্ষের মোট ক্ষতি নিম্নে দেওয়া হলো-

মুসলমানের পক্ষে আহত হয় ১২৭ জন, নিহত ২৫৯ জন, বন্দী ১ জন। শত্রুদলের পক্ষে নিহত হয় ৭৫৯, বন্দী ৬৫৬৪ জন।

শত্রুর ৬৫৬৪ জন বন্দীর মধ্যে নবী করিম (সা.) ৬৩৪৭ জনকে বিনাশর্তে মুক্তিদান করেন। বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামিন (সা.) দুনিয়াতে এতো বড়ো ইনকিলাব (বিপ্লব) সৃষ্টি করেন, বর্বর বিশ্বকে মানুষ করেন। অত্যাচার, অনাচার ও অধর্মস্থলে সুবিচার, সদাচার, ন্যায় ও ধর্মের ডঙ্কা বাজিয়ে দেন। শিক্ষা, সভ্যতা, মানবতা ও জ্ঞানচর্চার জোয়ার এনে দেন। পশু প্রকৃতির আরব জাতিকে সুসভ্য, ধার্মিক, ন্যায়বান, পরোপকারী, পর-দুঃখকাতর, জনদরদি, জনহিতৈষী ও ত্যাগী জাতিরূপে গঠন করে দুনিয়ার বুকে শান্তিময় আদর্শ হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। সত্যিকারের শাসন ও শৃঙ্খলা কিরূপ তা দেখিয়ে দেন। এতো বড়ো ব্যাপক বিপ্লবে উভয়পক্ষের নিহতের সংখ্যা মোট ১০১৮ জন। তাও শত্রুদের আক্রমণে। বিশ্বের ইতিহাসে এরূপ নগণ্য ক্ষতির বিনিময়ে এরূপ শান্তিময় ও কল্যাণময় বিপ্লব আর একটিও দেখাতে পারবে না। যারা সভ্যতার লম্বা-চওড়া বুলি আওড়ায় তারাও বহু বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। তাদের ক্ষতির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে মর্মান্তিক নয় কি? কিন্তু তাতে মানবজাতির কতটুকু উপকার সাধন হয়েছে? নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানে তার বিচার করুন।

১। নেপোলিয়নের যুদ্ধসমূহে মোট নিহত ২০ লক্ষ। আহত ও পঙ্গু ২ কোটি।

২। নেপোলিয়নের শেষ যুদ্ধ ওয়াটারলুতে মোট ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার নিহত ও পঙ্গু।

৩। ইংরেজ ও ফ্রান্সের প্রাদেশিক যুদ্ধে ইংরেজ ৫০ হাজার ফ্রান্সিস আড়াই লক্ষ নিহত।

৪। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে মোট ৬ লক্ষ নিহত।

৫। সিকান্দর ও পোর্সের যুদ্ধে একদিনে ২১ হাজার (মোট ক্ষতি অনুমান করুন।)

৬। জার্মান ও মিত্র শক্তির প্রথম মহাসমরে ৮০ লক্ষ ৪৫ হাজার নিহত ও ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৬৭ হাজার আহত।

৭। দ্বিতীয় মহাসমরে প্রথম মহাসমর থেকে বহু বেশি।

এতদ্ব্যতীত রাশিয়ার বিপ্লবে বিপ্লবীগণ রাজবংশের ও তাদের দরদিগণের রক্তে দেশে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত করেছিলো তাতে কতো লাখ নিহত হয় তা আল্লাহই জানেন। কিন্তু উপরিউক্ত বিপ্লবসমূহে কতগুলি লম্বা লম্বা বুলি ব্যতীত বিশ্বের কোনো বাস্তব কল্যাণ সাধিত হয়নি। এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করে দেখলে সকলেরই মেনে নিতে ও স্বীকার করতে হয় যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) সত্যি সত্যিই 'রাহমতুল্লিল আলামিন। বিশ্বদরদি, বিশ্বকল্যাণকামী ও বিশ্বনবী ছিলেন, এতে সন্দেহ করার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

মানবদেহকে মাটিতে দাফন করা

মানবদেহকে মাটিতে দাফন করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে অত্যন্ত তথ্যনির্ভর আলোচনাপূর্বক আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) বলেন-

মানবজাতি হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব। তার মর্যাদা আল্লাহর কাছে খুবই বেশি। শরিআতের প্রত্যেক বিধানের মূলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের মর্যাদার ওপর খুবই জোর দিয়েছেন। মানুষ কোনো বিষয়ে কসম করে যদি তা ভঙ্গ করে তখন তার ওপর কাফ্ফারা

ওয়াজিব হয়ে যায়। এজন্যে যে, সে এমন কথা বললোই বা কেনো যা সে পালন করলো না। তার যবানের কি মূল্য নেই? তার মুখের কথা কি পশু পাখির শব্দের মতো? অতএব মানুষ খুবই মর্যাদাবান প্রাণী।

এখন কথা হচ্ছে- এই মানবদেহ থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার পরও কি সেই দেহের কোনো সম্মান-মর্যাদা থাকে না? সে দেহকে তার হাঁড়-গোড় ভেঙ্গে আগুনে নিক্ষেপ করে বাঁশের ফলা দিয়ে গুতিয়ে-গুতিয়ে পুড়ে ফেলা ও তাকে এরূপ হেয় ও অপমানিত করা কি সত্যিই তার যোগ্য মতো কাজ? না কখনো তা হতে পারে না। ইসলাম এ কথা স্বীকার করে না যে, মানুষ মৃত্যুর পর তার দেহ মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে। মৃত্যুর পরও মানবদেহের মর্যাদা রয়েছে। ইসলামি শরিআতের বিধান অনুযায়ী মৃত্যুর পর মানবদেহকে ইষৎ গরম পানি দ্বারা গোসল দিয়ে পাকপবিত্র করে রাখতে হয়। পুরুষকে তিন বস্ত্র ও স্ত্রীলোককে সাদা পাঁচ বস্ত্র দ্বারা মর্যাদা ও ভদ্রতাসূচক পোশাক পরিয়ে খাটিয়ায় রেখে বহন করে বিশেষ দুআ' কালিমা পড়তে পড়তে কবরস্থানে নিয়ে যেতে হয়। সেখানে একজন ইমামের পেছনে জানাযার নামায আদায় করতে হয়। জানাযা শেষে সে দেহকে অতি যত্নের সাথে আল্লাহর নামে নবী করিমের (সা.) ধর্মের বিধান অনুযায়ী কবরস্থ করা হয়। অতঃপর ঐ কবরকে এমনভাবে বন্ধ করা হয় যাতে শৃগাল বা অন্য কোন প্রাণী সে কবর খনন করে লাশ ভক্ষণ করতে না পারে। এটি ইসলামের এমন একটি সুন্দর বিধান যা সর্বজন প্রশংসিত।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মানবদেহ যতোদিন জীবিত থাকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর ও বাইরে জল, বায়ু ও অগ্নির কাজ বলবৎ থাকে কিন্তু আসল দেহ মাটিরই। মানুষ যখন মারা যায় তখন তার দেহ থেকে অগ্নি ও বায়ু বিদায় গ্রহণ করে স্বীয় কেন্দ্রস্থলে চলে যায়। বায়ু বায়ুমণ্ডলে এবং অগ্নি অগ্নিমণ্ডলে; থেকে যায় জলীয় ভাগ মিশ্রিত মাটির দেহখানা।

উপরিউক্ত দুই বস্তু যখন স্বাভাবিক গতিতে তাদের গোঁড়ার দিকে চলে গেলো, অবশিষ্ট দুই বস্তুকেও তাদের গোঁড়াতে পৌছিয়ে দেয়া অবশ্যই কর্তব্য। এ জন্যে ইসলাম মৃতদেহকে কবরে দাফন করার বিধান করেছে। তাই মৃত ব্যক্তিকে কবরে মাটি দেয়ার সময় পড়তে হয়, আল্লাহপাক বলেন-

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى

"এ মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং এর ভিতর তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করাবো, পুনরায় তোমাদেরকে তার ভেতর থেকে (হাশরের দিন) বের করবো।"[১] এটি আল্লাহর বাণী ধ্রুবসত্য। এই মানবদেহে উপর্যুক্ত চার বস্তু ব্যতীত রূহও থাকে। মৃত্যু মুহূর্তে রূহ (আত্মা) বিদায় হয়ে আত্মিক জগতে অর্থাৎ তার আসল জায়গায় চলে যায়। এ সমস্ত জিনিস এতোকাল ধরে আল্লাহর আদেশে মানবদেহে কর্মরত ছিলো।

আদি মানব হযরত আদম (আ.)-এর দেহকে আল্লাহপাক মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পানি আর মাটি মিশ্রিত কাদা দিয়ে তাঁর দেহ তৈরি হয়েছিলো। তাঁর বংশধরগণ (نطفة) বা বীর্য দ্বারা জন্মগ্রহণ করে। বীর্যের সৃষ্টি হয়েছে রক্ত থেকে এবং রক্তের উৎপত্তি হয়েছে খাদ্য সার থেকে।

---

১. সুরা তোয়াহা-৫৫।

খাদ্য বস্তু যেমন মাংস ও তরকারি প্রভৃতি উপর্যুক্ত নিয়মে মাটি থেকে তৈরি হয়েছে। মানবদেহ রক্ষা এবং পরিবর্ধনও হয় মাটির জিনিস দ্বারা। যাহোক, দেহের আদি ও অন্ত উভয় দিকে মাটিই বটে।

মোটকথা, মৃত দেহকে কবরে দাফন করার যে বিধান ইসলামি শরিআহ করেছে তা যুক্তির কষ্টিপাথরে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও অতি মর্যাদাসূচক। এটি এমন এক বাস্তবতা যে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

একতার গুরুত্ব

ইসলামে ঐক্য বা একতার গুরুত্ব অত্যধিক। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যুক্তির কষ্টিপাথরে চমৎকার আলোচনাপূর্বক বলেন- বিশ্বশান্তির নিমিত্ত ঐক্য বা একতা অতীব জরুরি। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা না থাকার দরুণ মাঝে মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বেধে যায় ফলে বিশ্ববাসী অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে। জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হওয়া প্রকৃতপক্ষে মানবতাবিরোধী। আসলে তারা যে একই পিতা-মাতার সন্তান সেদিক দিয়ে বিচার করলে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি না হওয়াই স্বাভাবিক।

হযরত আলি (রা.) বলেন-

الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء

لا فضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء

গোঁড়ার দিক দিয়ে বিচার করলে সকল মানুষ সমান। তাদের আদি পিতা হচ্ছেন- হযরত আদম (আ.) ও তাদের আদি মাতা হচ্ছেন- হযরত হাওয়া (আ.)। অতএব তারা সকলেই ভাই ভাই। কাজেই তাদের মধ্যে একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করার কোন যুক্তি নেই। হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চয় আছে ঐ ব্যক্তির জন্যে যিনি ইলম ও জ্ঞানের অধিকারী। যিনি বিদ্বান ও সুশিক্ষিত এবং মহান চরিত্রের অধিকারী। কারণ তারা স্বয়ং সৎপথে আছেন এবং এই পথের পথিকদেরকে রাস্তা দেখিয়ে দেন। হযরত আলির (রা.) এ বাণী দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এ ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে যে- আমরা প্রত্যেকেই ভাই ভাই, মানুষের মধ্যে যারা সুশিক্ষিত তারা শুধু নিজেরাই সৎপথে থেকে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন না বরং স্বীয় অশিক্ষিত ভাইদের প্রতি দরদী হয়ে তাদেরকে ইহকালের সুখ ও পরকালের শান্তির পথ দেখাতে থাকেন। তাঁরাই হচ্ছেন মর্যাদাবান, শ্রেষ্ঠমানব, তাঁরা অবশ্যই নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্যকে ছোট মনে করেন না, এরূপ ধারণা তাদের অন্তরে আদৌ সৃষ্টি হয় না। তাঁরা সদা ব্যস্ত থাকেন জনগণকে অধপতন থেকে বাঁচাবার চেষ্টায়। অহংকার ও অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তারের সময় ও অবসর তাদের কোথায়? তাঁরা জনগণের খিদমত করতে থাকেন। তাঁরা এ কথা চিন্তা করেন না যে, আমরা শ্রেষ্ঠ, আমরা মর্যাদাবান, অতএব জনসাধারণ আমাদের সেবা করুক। ভোগ, বিলাস, আরাম-আয়েশের অবসর তাঁদের হয় না।

তাঁরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত থাকেন। পবিত্র হাদিসে বর্ণিত আছে, سيد القوم خادمهم। জাতির সর্দার প্রকৃতপক্ষে জাতির সেবক।

অতএব, জাতির খেদমতের কর্তব্যবোধ তাদেরকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করে রাখে যে, তাতেই তাঁরা দিবা-নিশি মগ্ন থাকেন। তাঁরা যে বড়ো আর অন্যলোক যে ছোটো সে দিকে তাঁরা মনোনিবেশ করেন না। কোন কায়েমি স্বার্থবাদির মুখে এরূপ উক্তি শুনলে তাতে তাঁরা ব্যথা পান। প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের অন্তর এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতেই মানব সমাজের কল্যাণ। তাতেই মানব সমাজে একতা থাকতে পারে। চরিত্র ঠিক না করে শুধু একতা একতা করে চিৎকার করলে আর লম্বা চওড়া বক্তৃতা রাখলে একতা আসে না, আসলেও তা সত্যিকারের একতা নয়। আজ বিশ্বময় কতো সভা, কতো কনফারেন্স, কতো কমিটি, কতো সমিতি হয়ে চলছে। কিন্তু সমস্তই অকৃতকার্য, জাতির মধ্যে একতা আনতে হলে সর্বপ্রথম মনোযোগ দিতে হবে জনগণের চরিত্র গঠনের দিকে। এমন কতেক চরিত্র আছে যদ্বারা জাতির মধ্যে একতা অটুট ও বিদ্যমান থাকে। আবার এমন কতেক চরিত্র ও কার্যকলাপ আছে যদ্বারা জাতির একতা ও ভ্রাতৃত্ব ধ্বংস হতে বাধ্য। যেসব চরিত্র দ্বারা জাতির একতা ধ্বংস হয় সেসব কাজ ইসলামি শরিআত হারাম ঘোষণা করেছে। যথা-

১। تكبر (আত্মগৌরব বা অহংকার) ১। غضب (রাগ) ৩। السب والشتم (গালি-গালাজ) ৪। القذف (কারো নামে কোন প্রকার কু-কর্মের অপবাদ দেয়া।) ৫। الضرب (প্রহার করা আইন সঙ্গত কারণ ব্যতীত) ৬। السفك (হত্যা করা কেসাস বা আইন সঙ্গত হুকুম ব্যতীত) ৭। أكل مال الغير (অন্যের মাল ভক্ষণ বা আত্মসাত করা) ৮। الظلم (অত্যাচার, অবিচার) ৯। الحسد (হিংসা, পরশ্রীকাতরতা) ১০। بغضاء (বিদ্বেষ) ১১। سوء ذات البين (পরস্পর বিবাদ-বিরোধ) ১২। مهاجرت (সংশ্রব ত্যাগ) ১৩। اتباع العورات (কারো গোপন দোষ অন্বেষণ করা) ১৪। الغيبة (কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন আলোচনা করা যা তার সামনে করলে মনে কষ্ট পাবে।) ১৫। النميمة (চুগলখোরী করা) ১৬। القتة (গোপনে কারো আলাপ আলোচনা শুনে নিয়ে তা অন্যত্র পৌছিয়ে দেয়া।) ১৭। الثرثرة (ভালোমন্দ চিন্তা না করে বেশি কথা বলা) ১৮। التشرق (অসতর্কভাবে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে কারো বিবরণকে বা কোনো ঘটনার বর্ণনাকে বিস্তারিত করা।) ১৯। التفيهق (আত্মগৌরবের সাথে বড়ো বড়ো ও লম্বা চওড়া কথা বলা) ২০। البذاء (অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা।) ২১। الغطة (কটু বাক্য) ২২। الطعن (হঠকারী মিশ্রিত কথা বলা) ২৩। اللعن (কাউকে লা'নত দেয়া) ২৪। المكر والخداع (প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করা) ২৫। الكذب (মিথ্যাবাদিতা) ২৬। شهادة الزور (মিথ্যা সাক্ষ্যদান) ২৭। كتمان الشهداء (সত্যসাক্ষ্য গোপন করা) ২৮। خلف الوعد (ওয়াদা খেলাপ করা) ২৯। المطل (পাওনাদারের প্রাপ্য আদায়ে টালবাহানা করা) ৩০। التفريق بين الاحبة (বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো) ৩১। الخيانة (কারো আমানত আত্মসাৎ করা) ৩২। العصبية (স্বজনদের জন্যে অন্যায়ভাবে পক্ষপাতিত্ব করা, স্বীয় গোত্রকে জুলুমের কাজে সহায়তা করা) ৩৩। الفخر بالآباء

(পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করা) ৩৪। الحرص (লালসা) ৩৫। البخل (কার্পন্য করা যা গরীব-মিসকিন, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করতে বিঘ্ন ঘটায়। ৩৬। سوء الادب (বেয়াদবী) ৩৭। الاستهزاء (ঠাট্টা বিদ্রুপ করা) ৩৮। التوهين (অপমান করা) ৩৯। الرياء والسمعة (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বা নাম প্রসিদ্ধ কোনো ভালো কাজ করা) কর্তব্যবোধে কাজ করাতেই সমাজের উপকার হয়। ৪০। قساوة القلب (পাষাণ হৃদয় হওয়া)

এসব চরিত্রকে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এসব কাজ অন্যায় হওয়ার সাথে সাথে জাতির একতা ও দেশের শান্তির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর।

পক্ষান্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এমন মহৎ চরিত্রের প্রতি হিদায়াত করেছেন, যেসব গুণ কোনো জাতির মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে জাতির মধ্যে আত্মকলহ ও বিবাদ-বিরোধ থাকতে পারে না বরং তাদের ঐক্য ও একতা নিশ্চিত হয়, যথা-

১। البر والصلة ودعاية حقوق الجيران (ইহসান, পরস্পর পরস্পরের উপকার সাধন, আত্মীয়-স্বজনকে সহায়তা ও তাদের হক আদায় করা, প্রতিবেশীর হক আদায় করা ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া)

২। الشفقة والرحمة على الخلق (আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা ও দয়া করা)

৩। الحب فى الله (কোনো স্বার্থ ব্যতীত শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালোবাসা)

৪। الحذر والتأنى فى الامور (সকল কাজে ও সব বিষয়ে সতর্কতা ও ধীরতা অবলম্বন)

৫। الرفق والحياء وحسن الخلق (নম্রতা ও বিনয়ীসুলভ ব্যবহার অবলম্বন এবং শিষ্টাচার)

৬। الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (সৎ কাজের আদেশ ও উৎসাহ দান এবং অন্যায় কাজে বাধাদান)

৭। السخاوة (দানশীলতা)

৮। السماحة (বদান্যতা)

৯। استحاب المال والعمر للطاعة (ধন-দৌলত ও দীর্ঘায়ু আল্লাহর বন্দেগী ও সৎ কার্যাদি করণার্থে পছন্দ করা)

১০। التوكل والصبر (আল্লাহর ওপর ভরসা করা ও বিপদাপদে ধৈর্য অবলম্বন)

১১। العدل (সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা)

১২। حماية المظلوم (উৎপীড়িত ও মজলুমের পক্ষালম্বন বা সাহায্য করা।)

১৩। توقير الاكابر (গুরুজনের সম্মান করা)

১৪। الترحم على الاصاغر (ছোটো ও অধীনস্তদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন)

১৫। التواضع (বিনয়ী হওয়া)

১৬। مواخاة (পরস্পর ভ্রাতৃভাব)

১৭। مساواة (সাম্যের ওপর বিশ্বাসী হওয়া ও সে নীতির ওপর জীবনযাপন করা।)

১৮। مواساة (সহানুভূতি প্রদর্শন)

১৯। العفو (ক্ষমাশীলতা)

২০। إيثار (স্বীয় অভাব সত্ত্বেও অপরের অভাব মোচন করা)

২১। اللطف والكرم (সদয় ব্যবহার ও বদান্যতা)

২২। الإحسان (পরোপকার)

২৩। التحمل (সহনশীলতা)

২৪। التأمل والتدبر (সকল বিষয়ে ধীরস্থির এবং শান্ত হয়ে চিন্তা করা ও গবেষণা করা)

২৫। التجمل (স্বীয় প্রাপ্যের তাগাদার সময় ভদ্রতা অবলম্বন করা)

২৬। التأدب (প্রত্যেকের সাথে যথাযোগ্য সদাচার করা)

২৭। التشكر (উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ)

২৮। التعهد (গরীব-দুঃখীর ও বন্ধু-বান্ধবের খবরগীরি করা)

২৯। التحابب (পরস্পর নিঃস্বার্থ মুহাব্বত রাখা)

৩০। التسامح (বিশেষ ক্ষতিকর না হলে সময় বিশেষে কারো কোনো দোষ দেখেও না দেখার ভান করে থাকা)

৩১। الإهداء وقبول الهدية ومكاناتها (হাদিয়া বা সওগাত প্রেরণ, হাদিয়া গ্রহণ ও প্রতিদান প্রেরণ)

৩২। إفشاء السلام (সালামের প্রসার ঘটানো)

৩৩। المصافحة والمعانقة (পরস্পর হাত মিলান ও কোলাকুলি)

৩৪। الدعوة (নিমন্ত্রণ করা)

৩৫। إجابة الدعوة (শরিআতবিরোধী না হলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ)

৩৬। التلطف والمداراة (নম্রতা ও শিষ্টাচার অবলম্বন) ইত্যাদি।

উল্লিখিত চরিত্রসমূহের মধ্যে কিছু ফরয, কিছু সুন্নাত আর কিছু মুস্তাহাবরূপে বিধান করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ভ্রাতৃত্ব, একতা ও শান্তির সাথে যাতে কালাতিপাত করতে পারে।

খত্না, সুগন্ধি ও মিসওয়াক সম্পর্কিত আলোচনা

খত্না, সুগন্ধি ও মিসওয়াক সম্পর্কে যুক্তির কষ্টি পাথরে কুরআন-হাদিসের আলোকে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যে আলোচনা করেছেন তা বাস্তবিকই তাঁর পরিপক্ব মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

খত্না সম্পর্কে তিনি বলেন- আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) খত্না করার আদেশ করেছেন এবং এটাকে নবীদের সুন্নাত ও হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সুন্নাত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার বিকাশ হয়েছে আম্বিয়ায়ে কেরামের দ্বারা। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে তা মানবজাতিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মানবকুলের আদি পিতা, হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমে হযরত জিব্রাইল (আ.) কর্তৃক শিক্ষা লাভ করে স্বীয় সন্তানদেরকে ইবাদত-বন্দেগী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, চাষাবাদ, রান্নাবান্না ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তীতে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁরা বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে ও বিভিন্ন ভাষাভাষী হয়ে বিভিন্ন গোত্র ও বহু জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

তখন আল্লাহপাক প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির প্রতি নবী প্রেরণ করে তাদেরকে মানবীয় কর্তব্যাদি ও সভ্যতা শিক্ষা দেন। সুতরাং খত্না যে পয়গাম্বরদের সুন্নাত তা সুস্পষ্ট। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের কলি যে সর্বদা চর্ম দ্বারা আবৃত্ত থাকে, চর্মের সেই অংশটুকু কর্তন না করলে এর মধ্যে ময়লা-আবর্জনা জমতেই থাকবে। সর্বদা চামড়া টেনে কলিকে ফুটিয়ে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা খুবই কষ্টসাধ্য। প্রশ্রাব ও ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের সময় চামড়া টেনে খুলে ধরতে হবে। সকল অবস্থায়, সকল বয়সে পুরুষাঙ্গ স্বয়ং উত্তেজিত ও সজাগ হয়ে তার ডগাকে খোলসমুক্ত করে বের করে দেয় না। বের করে দিলেও নিজ হাতে চামড়া টেনে ধরে রাখতে হবে। কাজেই চর্মের সেই অংশটুকু কর্তন করে খত্না করে দিলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এতে ঐ স্থানে ময়লাও জমবে না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ঢিলা-কুলখ ইত্যাদি ব্যবহারেও কোনো অসুবিধা হবে না।

আমরা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতামত জানতে পেরেছি যে, কলির গোড়াতে ময়লা জমে দূরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হয় যার চিকিৎসা হচ্ছে একমাত্র খত্না করা। অতএব, যুক্তির কষ্টিপাথরে বিবেচনা করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, খত্না স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত একটি অতীব জরুরি পদ্ধতি।

রাসুলুল্লাহ (সা.) পবিত্র হাদিসে ইরশাদ করেন-

أربع من سنن المرسلين الختان والتعطر والسواك والنكاح (سنن الترمذى)[১]

১। খত্না করা (পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চর্ম যা দ্বারা এর অগ্রভাগ ঢাকা থাকে তা কর্তন করা।)

২। আতর ব্যবহার করা।

৩। মিস্ওয়াক ব্যবহার করা।

---

১. সুনানে তিরমিযী- ১০৬২।

৪। বিয়ে-শাদি করা। এগুলো আল্লাহ প্রেরিত নবী-রাসুলের সুন্নাত বা তরিকা।

* আতর (সুগন্ধি) ব্যবহার করা সুন্নাত। এটিও সকল নবীর তরিকা। একে স্বাভাবিক নিয়মে ব্যবহার করা কর্তব্য। এতে সুগন্ধি ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হাসিল হবে। আতর ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, تفريح قلب ودماغ হৃদয়-মন প্রফুল্ল হওয়া, স্বস্তি ও সতেজ হওয়া।

সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه –[১]

'পুরুষদের সুগন্ধি এরূপ হবে যে, তার সুবাস অনুভূত হবে কিন্তু তার রং দৃষ্ট হবে না। (যথা- গোলাপী আতর, কেউড়া আতর ইত্যাদি)

মহিলাদের সুগন্ধি এরূপ হবে যে, যার রং দৃষ্ট হলেও তার সুবাস সুদূর প্রসারী হবে না। (কারণ এরূপ সুগন্ধি পর পুরুষের নাকে পৌঁছার সম্ভাবনা থাকে না।)

উল্লেখ্য যে, যেসব ফুল ইত্যাদি থেকে আতর (সুগন্ধি) বের করা হয় এর জন্মগত সুবাস আমাদের জন্যে উপকারী। এর সঙ্গে স্পিরিট এলকোহল ইত্যাদি মিশিয়ে একে সতেজ ও উত্তেজক বানিয়ে নিলে তাতে কোন স্থায়ী উপকার হবে না। অনেক জিনিস আছে আমাদের পক্ষে উপকারী কিন্তু তা অতিরিক্ত হলে উপকারের স্থলে অপকারই হয় বেশি। অতির পরই গতি বন্ধ হয়।

**মিস্ওয়াক করা নবী করিমের (সা.) সুন্নাত। এটি অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামেরও সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب[২]

'মিস্ওয়াক মুখকে পবিত্র করে এবং আল্লাহপাক পরওয়ারদিগারকে সন্তুষ্ট করে।'

তিনি আরো ইরশাদ করেন-

ماجاءنى جبرائيل عليه السلام قط إلا أمرنى بالسواك لقد خشيت أن أحفى مقدم فمي[৩]

'জিবরাইল (আ.) আমার নিকট যে কোনো সময় এসেছেন আমাকে মিস্ওয়াক করার আদেশ দিয়েছেন। তাঁর এই আদেশের কারণে অতিরিক্ত মিস্ওয়াক করাতে আমার ভয় হয়েছিলো যে, আমার মুখের সম্মুখের দাঁত ও দন্তমূলের মাংস (ঝরে পড়ে) নষ্ট হয়ে যাবে'।

অপর এক হাদিসে তিনি ইরশাদ করেন-

لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلوة

---

১. সুনানে তিরমিযী- ২৯৩৮

২. সহিহ ইবনে হাব্বান- ১০৬৭

৩. সুনানে ইবনে মাজাহ- ২৯১

'যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্টদায়ক হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদেরকে *এশার নামায একটু বিলম্ব করে পড়ার জন্যে এবং প্রত্যেক নামাযের* (ওযুর) সময় মিস্ওয়াক করার জন্য (অবশ্যই করণীয় ফরযরূপে) আদেশ করতাম।'

এশার নামায রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর পড়াতে অধিক সাওয়াব এবং মিসওয়াকের জাহেরি ও বাতেনি উপকার এতো বেশি যে, হুজুর (সা.)-এর মনে এ আকাঙ্ক্ষাটি সৃষ্টি হয়েছিলো যে, এ দু'টি কাজ ফরযরূপে উম্মতের ওপর আদেশ করা, কিন্তু এতে উম্মতের বিশেষ কষ্ট হবে মনে করে তিনি তা করেননি। শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ রাত্রের তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত এশার নামাযের জন্যে বাধ্যতামূলকভাবে জেগে থাকা অবশ্যই কঠিন হতো। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তদ্রূপ প্রত্যেক নামাযের ওযুর সময় বাধ্যতামূলক মিস্ওয়াক ব্যবহার করা ও সহজসাধ্য ছিলো না। অবশ্য এতে যে সাওয়াব ও উপকার খুবই বেশি সেদিকে দৃষ্টি রেখে প্রত্যেক ওযুর পূর্বে মিস্ওয়াক করা আমাদের উচিত। এটি অন্যতম সুন্নত।

যবেহ্ ও বলিদান প্রথা

ইসলামি শরিআতে যে সব জন্তুর গোশত খাওয়া বৈধ, সেগুলো যবেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলাম বলিদান প্রথা সমর্থন করে না। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যুক্তির কষ্টিপাথরে যে তথ্যনির্ভর আলোচনা করেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার দাবীদার। তিনি বলেন, যারা জন্তুর বলিদান প্রথা সমর্থন করে তারা বলে- যবেহ দ্বারা প্রাণীর দীর্ঘ সময় যন্ত্রণা হয় এবং বলিদানে সহসা প্রাণ বেরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এ যুক্তি সঠিক নয়। কারণ দেহের ভিতর শিরা-উপশিরায় যে রক্ত প্রবাহিত হয় তার স্রোত ও তাপের সঙ্গেই জীবনীশক্তি মিশ্রিত বা সেই স্রোত ও তাপই হলো দেহের জীবনী শক্তি। অতএব, যতো শীঘ্রই এ রক্ত দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে প্রাণীটি ততো তাড়াতাড়ি প্রাণহীন হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। যবেহ করে গলার শিরাগুলো কেটে যখন অর্ধ কর্তিত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয় তখন আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেড়ে যায় এবং প্রবলভাবে হৃৎপিণ্ড আলোড়িত হতে থাকে। এতে রক্তের বেগ বেড়ে যায়। এদিকে শিরাগুলোও একটু সংকুচিত হয়ে স্রোতের পথও একটু সরু হয়ে পড়লে রক্তের গতিবেগ আরো বেড়ে গিয়ে গলার কাটা স্থান দিয়ে প্রবল বেগে বেরিয়ে পড়ে। অনেক সময় এমনও হয় যে, যবেহকারি গলার শিরাগুলো ঠিক মতো কেটে সরে যেতে পারে না তার কাপড়ে রক্তের চিটা লেগে যায়। সারা শরীর থেকে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত চলমান রক্ত এদিকে ছুটে এসে বেরিয়ে পড়ে অতঃপর প্রাণী ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে বলিদানের সময় যখন একই কোপে প্রাণীর শরীর থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, হঠাৎ মুচ্ছাগত হয়ে প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া একদম বন্ধ হয়ে যায়। তখন শরীর এক জায়গায় মাথা এক জায়গায় নিঃস্তেজভাবে পড়ে থাকে। তখন শরীরের সবগুলো শিরা ঢিলে হয়ে পড়ে। গলদেশে স্থির রক্ত কয়েক ফোঁটা বেরিয়ে আর বেরোয় না। এমতাবস্থায় দেহের রক্ত চলাচল বন্ধ থাকে। কিছুক্ষণ পর মুচ্ছাগত অবস্থা তিরোহিত হয়ে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আরম্ভ হয়, শরীর একটু একটু কাঁপতে থাকে। কিন্তু হৃদয়ের ক্রিয়া প্রবল না হওয়ার কারণে এবং সব

ধমনী ঢিলে হওয়ার কারণে বেগে রক্ত প্রবাহিত হয় না। গলা কাটার স্থান দিয়ে সামান্য সামান্য রক্ত বের হতে থাকে। তাতে পুরো শরীরের রক্তও বেরোয় না। প্রায় জায়গায় মাংসের সঙ্গে এ রক্ত লেগে থাকে। এজন্য সে মাংস কাটার পর তার রং লাল না হয়ে একটু বেগুনী রঙের হয়ে থাকে। অপরদিকে ধীরে ধীরে অল্প অল্প রক্ত বের হওয়াতে প্রাণী ঠাণ্ডা হতেও অধিক সময় লাগে। কারণ দেহের ভিতরের প্রবহমান রক্ত যেগুলো অচল হয়ে রয়ে গেছে সেগুলোও নিস্তেজ হওয়া প্রয়োজন। যতোক্ষণ সেগুলোর মধ্যে উষ্ণতা থাকবে ততোক্ষণ প্রাণী প্রাণহীন হতে পারে না। উল্লিখিত কারণে বলিদানের মধ্যে প্রাণির কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হয়। যবেহের মধ্যে তা হয় না। কাজেই বলিদানের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠুরতা পাওয়া যায়। কার্যক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়।

মুণ্ডুপাতের পর কতোক্ষণ মুচ্ছিত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে, তাকে মৃত্যু বলে ধরে নেয়া বাতুলতাই হবে। কারণ তারপরে আবার সে হৃদয়ের ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে শরীর অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁপতে থাকে।

সর্বোপরি দেহের প্রবাহিত রক্ত সম্পূর্ণরূপে বের না হওয়ার কারণে সে মাংসও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ঐ রক্তের মধ্যে বহুসংখ্যক জীবাণু থাকে। ইসলামি শরিআতে সে রক্তকে 'দমে মাছফু' বলা হয়। 'দমে মাছফু' পান করা হারাম। একে অপবিত্র বলা হয়েছে। তা কাপড় বা ব্যবহারের কোন জিনিসে লাগলে ধুয়ে তা পবিত্র করতে হয়। এ কারণে ইসলামি শরিআতে যবেহ্ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে সমস্ত 'দমে মাছফু' প্রবল বেগে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

অতএব, কোনো বিষয় সুক্ষ্ম বিচার না করে ও ভালোরূপে তলিয়ে না দেখে মত প্রকাশ করলে তাতে প্রায়ই ভুল হয়ে পড়ে। ইসলামি শরিআতের যত বিধানাবলি রয়েছে প্রত্যেকটি ন্যায়সঙ্গত, যৌক্তিক ও উপকারী।

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) কাব্যপ্রতিভা

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর বহুমাত্রিক কর্মজীবনের আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে তাঁর বহুমুখী কাব্যপ্রতিভা। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। উর্দু, ফার্সি, আরবি এবং বাংলায় রয়েছে তাঁর সমৃদ্ধ কাব্যিক ভাণ্ডার।

তিনি তাঁর ছাত্রজীবন কিংবা কর্মজীবনের প্রারম্ভ থেকেই অর্থাৎ ১৯২৩ কিংবা তারও পূর্বে কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। হয়তো ছাত্রজীবনেই তাঁর কাব্যচর্চার হাতেখড়ি হয়েছিলো- এমন সম্ভাবনাই বেশি। কারণ তিনি চট্টগ্রামস্থ মুহসিনিয়া মাদরাসায় ফাযিল পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করার পর উচ্চশিক্ষার্থে ভারতের সাহারানপুর জেলায় গমন করেন। ভারতের উত্তর প্রদেশ তখন ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিলো। উত্তর প্রদেশে তখন অনেক প্রসিদ্ধ কবি-সাহিত্যিকের অবস্থান ছিলো। এমতাবস্থায় একথা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, তাঁর মধ্যে যে সুপ্ত কাব্যপ্রতিভা রয়েছে তিনি তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন ও তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, এ যাবৎকাল সংরক্ষিত তাঁর বিশাল কাব্যভাণ্ডারের অধিকাংশই তিনি রচনা করেছেন ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭৯ সালে তাঁর ইন্তেকালপূর্ব সময় পর্যন্ত।

* তাঁর কবিতার ভাষা

মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) রচিত কবিতাসমূহের প্রায় ৯৫% ছিলো উর্দু ভাষায়। গোটা দশেক ফার্সি, আরবি ও বাংলা কবিতা বাদ দিলে তাঁর কাব্যভাণ্ডার পুরোটাই ছিলো উর্দু ভাষায় রচিত। উর্দু এসব অঞ্চলের মাতৃভাষা না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাব্যচর্চা উর্দু ভাষায় কেনো হয়েছিলো তার প্রধান কারণ হচ্ছে, সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এদেশে দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাধ্যম ছিল মূলত উর্দু। শিক্ষার্থীরা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করার পর ভারতের বিভিন্ন শহরে উচ্চতর প্রতিষ্ঠানসমূহে সফর করতো অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে। সে অঞ্চলে উর্দুই ছিলো জনগণের ভাষা। তদুপরি উর্দুকে উপমহাদেশের সর্বত্র দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার পাশাপাশি উলামায়ে কিরামের ভাষা হিসেবেও বিবেচনা করা হতো। তাই মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) একজন বাংলা ভাষাভাষী হয়েও উর্দুকে তাঁর কাব্যচর্চার মূল মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

* তাঁর কবিতার শ্রেণিবিন্যাস

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর কাব্যভাণ্ডারে সমাবেশ ঘটেছে হরেক শ্রেণির কবিতার। যেমন হামদ বারী তা'আলা, নাতে রাসূল (সা.), মর্সিয়া বা শোকগাঁথা, হামাস বা জাগরণী কবিতা, গজল, শিক্ষামূলক, দার্শনিক তথ্য ও প্রশংসাগাথা, স্বদেশপ্রেম, দেশাত্মবোধক, তাওহিদ, তাসাউফ, ইতিহাস এবং স্বাগতিক উপলক্ষীয় কবিতা ইত্যাদি। তদ্রূপ আঙ্গিকের বিচারেও রয়েছে নানা জাতীয় কবিতা তথা মসনভী, মুছাল্লাছ, রুবাই, মুসাদ্দাস ও কিত'আ ইত্যাদি। উদাহরণ হিসেবে কিছু নমুনা নিম্নে সন্নিবেশিত হলো-

ক. হামদে বারি তা'আলা

হামদে এলাহি জাল্লা জালালুহু শিরোনামে রচিত একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ-

مطلع:

شان جمال جسکی ہر سو ہے آشکارا　　پیدا کیا ہے جس نے شمس و قمر ستارا

ہے تخت گاہ اس کی میرا یہ قلب مضطر　　بندہ ہوں شیفتہ وہ معبود ہے ہمارا

مطلع:

جذبات جستجو کا سینوں میں ہو تلاطم　　معشوق علم دیں ہو ہو دین ان کا پیارا

অন্য একটি হামদ কবিতার শিরোনাম হচ্ছে- له الحمد এর প্রারম্ভিক ও শেষের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে উল্লেখ করছি।

مطلع:

ای ذات پاک بیچوں ای خالق برایا　　بے ضد وند و ہمتا عالم کو ہے سجایا

صنعت تری نمایاں ہر برگ و بار میں ہے　　ہر بحر و بر بنایا فرش زمیں بچھایا

مقطع:

ای فضل سر بسجدہ اقرار بندگی کر　　حسن کلام جس نے تیری زباں پہ لایا

খ. না'তে রাসুল (সা.) ফার্সি ভাষায় রচিত একটি নাতে রাসুলের প্রারম্ভিক দুটি পঙ্‌ক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো।

مطلع:

شمیم یثرب و بطحا صبا آوردہ است این دم　　کہ آن حبیب کبریا آوردہ است این دم

دل گریان من سوز فراقش در بیاں آورد　　کہ ابر کوہساری گریہ ہا آوردہ ست ایں دم

আরেকটি না'তের কয়েকটি লাইন এখানে উল্লেখ করছি যার শিরোনামে এ কথাগুলো লেখা ছিলো-

نعت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر حضرت کے اخلاق و معجزات بیان ہوئے۔

مطلع:

سکون قلب مضطر راحت دلدادگاں تم ہو　　حبیب خالق عالم ہو پھر جان جہاں تم ہو

نہ ہوتے تم نہ ہوتی خلقت ارض و سما ہرگز　　مُراد ہر دو عالم باعث کون و مکاں تم ہو

آخری بیت:

ہو جاری فیض تیرا گنبد خضراء سے ہر ہر دم　　چنوتی مدرسہ پر فضل پر خود فیض شاں تم ہو

মরহুমের রচিত না'তে রাসুলের সংখ্যা ২০/৩০ এর মতো। সব কটির উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। তবে নিচে আরেকটি না'তের দু'একটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা গেলো না, যার শিরোনাম হচ্ছে-

حبیب پروردگار عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مطلع:

لبوں پہ تبسم ہے چہرے میں جلوے　　نگاہوں سے شفقت برستی رہی تھی
اک اک لفظ شیریں جوان کی زباں سے　　ہو سننے کو خلقت ترستی رہی تھی

مطلع:

ملے فضل کو ای خدا ایک قطرہ　　اسی بحر رحمت سے تیرے کرم سے
تو ہر دو جہاں اسکے ہوں گے اجالا　　یہ منت مرے دل میں بستی رہی تھی

ফারসি ভাষায় রচিত মরহুমের দু'টি নাত কলীম সাহসাহরানী সম্পাদিত ও ইরানি দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশে ফার্সি চর্চা শিরোনামের একটি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে উল্লেখ করছি। এ না'তের শিরোনাম হচ্ছে-

التجا بحضور خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم

ہمچو سیما بم سکون قلب گم کردہ منم　　سوختہ اندوہگین و بس کہ آشفتہ سرم
ای امید عاصیان وراحت آشفتگاں　　روز و شب در خواب و بیداری خیالت ہمدمم

آخری بیت:

راہ نومیدی مرو کاینجا بسے امیدہاست　　حژدۂ لا تقنطوا منصوص ربّ ذوالکرم

অপর দুটি না'ত রুবাই কবিতা, এগুলো যথাক্রমে নিম্নরূপ-

ای آنکہ بحب تو مستانہ ہمہ عالم　　وی آنکہ ز حسن تو دیوانہ دل و جانم
ای رحم مجسم تو آ ای لطف مُحتّم تو　　ای حسن متمم تو ای عزم مصمّم تو
ای خوی دلاویزت محبوب ہمہ عالم　　ای گل کہ ببوی تو مجذوب ہمہ عالم
ای آنکہ بشغف تو آشفتہ سرم دائم　　ای آنکہ بشوق تو حیرت زدہ ام ہائم

গ. গজল তথা প্রেমকাব্য

মরহুমের কাব্যসম্ভারে গজল কবিতার উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। কিন্তু সাধারণত গজল কবিতা বলতে যা বুঝায় তা হতে এ গজল কবিতাগুলোর ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। সাধারণত দেখা যায় গজল কবিতা কোনো এক প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। এতে তার আকর্ষণীয় সৌন্দর্যের বর্ণনা, দেহ সৌষ্ঠব ও কেশ বিন্যাসের বিবরণ এবং কবির সাথে তার প্রেমলীলার একটি চিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে কিন্তু মরহুমের গজল কবিতা এসব কিছু থেকে পবিত্র। গজলের চরিত্র চিহ্নিত করার জন্য যেসব শব্দমালা-বর্ণনা উল্লেখ না করলেই নয় তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি গজল কবিতার কিছু নির্বাচিত পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করা হলো:

"جفا ووفا" শিরোনামে একটি গজল কবিতায় তাঁর অভিব্যক্তি হচ্ছে-

(مطلع) :

ہوں ناشاد دل میں تڑپتا رہا ہوں — نگاہ کرم کو ترستا رہا ہوں
کہ عرصے سے فرقت کی آتش میں سوزاں — غم دل میں ہر آں پگھلتا رہا ہوں
یہ کیفِ محبت، نیاز اور منت — یہ حال صداقت صبابت مودّت
وہ بزم حسیں میں بیاں کسطرح ہوں — فریب حریفاں سے ڈرتا رہا ہوں
وہ حسن جفاخو، یہ عشق وفاجو — وہ کبر خفاخو، یہ عجز رضاجو
ہیں ایسی ستمگاریاں نہ جیبوں کی — جو میں خموشی میں سہتا رہا ہوں
نہ کر فضل نکتہ بیانی یہاں پر — میں مدت سے غمگیں ہوتا رہا ہوں

ঘ. মর্সিয়া বা শোকগাথা

মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহর কাব্যসম্ভারে মর্সিয়া বা শোকগাথার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। যা তিনি বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মৃত্যু উপলক্ষে রচনা করেন। এসব মর্সিয়ার তিনটি মাত্র এখানে উল্লেখ করছি।

(১) হযরত শাহ মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) বায়তুশ শরফ এক হজের সফরে ইন্তে কাল করলে তাঁর উদ্দেশ্যে যে মর্সিয়াটি রচনা করেন তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি-

(مطلع) :

اے گلستان ارم ارض حسین چاٹگام — اے جبال چاٹگام وسر زمین چاٹگام
اے بحار چاٹگام وماء وطین چاٹگام — اے مکان چاٹگام واے مکین چاٹگام
تیرا وہ فرزند اختر تاباں کہاں؟ — وہ چراغ خاندان میر نور افشاں کہاں؟

مقطع:

اے مکیں جنت معلیٰ کے مبارک باد ہے — وافرح! اماں خدیجہ کے قریب آباد ہے

ارض بطحا کی مبارک خاک میں دلشاد ہے — اور جوار رحمت رب میں تو خوش آزاد ہے

پر تری فرقت میں ہر انسان کو ہے آہ و فغاں — ہر مرید و معتقد ہے غمزدہ نالہ کنا

(২) বিশিষ্ট শায়খুত তরিকত হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরকানী'র (রহ.) মৃত্যুতে তিনি ৩০ পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট সুদীর্ঘ যে শোকগাথাটি রচনা করেন তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ-

رخ زیبا تھا جن کا نور افشاں — نگاہیں جستجو میں انکی حیراں

گلستاں پر بہاراں جو رہا تھا — خزاں دیدہ ہے بے رونق ہے بیجاں

چلے معشوق کے دیدار میں تم — رلا کر سبکو ای محبوب رحماں

এর শেষ দুই পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ:

رہی دنیا تری قدموں پہ لیکن — ترا دل خالق دنیا پر قرباں

تیرا فضل و کرم ہو یا آلہی — نہ ہو نسبت سے انکی ہمکو حرماں

(৩) চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনিপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার শায়খুল হাদিস আল্লামা মুহাম্মদ আমিন সাহেবের ইন্তেকালে তিনি যে মর্সিয়াটি রচনা করেন তার কয়েকটি নির্বাচিত পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ:

آہ ای گلشن دار العلوم — تیرا وہ باغباں اب ہیں کہاں؟

جن سے تھی تیری بہار مدام — باغ جناں کے اب مکن ہیں

مولانا محمد امین تھے — علم حدیث کے امین بھی

وہ کر چکے امانت ادا — بااسم و مسمّٰی آپ امین ہیں

تھے آپ نمونۂ سیرت نیک — پابند قوانین فرائض خود

محکم تھے آپ دین و دیانت میں — بیداغ معلم محمد امین ہیں

ঙ. প্রাসঙ্গিক কবিতা

মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহর কাব্যপ্রতিভার এক বিশেষ স্বাক্ষর হচ্ছে তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক কবিতা। এ জাতীয় কবিতার সংখ্যাই তাঁর বিশাল কাব্যসম্ভারের অধিকাংশ স্থান দখল করে আছে। এ জাতীয় কবিতার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথা মাহফিলে সিরাতুন্নবী (সা.), মাদরাসার সভা, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন, বিয়ে-শাদি, কোন প্রিয়জনের ঘরে নবজাতকের আগমন, আপন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিদায়, হজযাত্রীদের বিদায় ও বরণসহ নানা উপলক্ষে রচিত কবিতা ইত্যাদি।

তাছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগের ডি, ডি, পি, আই আলতাফ হুসাইনের চুনতি মাদাসায় আগমন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা (১৯৬৪), ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আফজল আগার সাতকানিয়া আগমন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা (১৯৫৯), আজিজুদ্দিন ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক আলহাজ বশির উদ্দিনের আগমন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা, মাওলানা ইকরামুল হকের কন্যা শাহানাজ লুৎফার বিয়ে উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা, মৌলভী আমির আহমদ চুনতি-এর বিয়ে উপলক্ষে রচিত ৪টি কবিতা, হাফেজ হারুনুর রশীদের বিয়ে উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা উল্লেখযোগ্য। চুনতিতে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত সিরাতুন্নবী মাহফিলের উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় বছরই কবিতা রচনা করেছেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন মাদরাসার বার্ষিক সভা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপলক্ষে রচিত তাঁর অনেক অনেক কবিতা রয়েছে।

চ. দেশাত্মবোধক ও ইসলামি জাগরণী কবিতা

মরহুমের রচিত কাব্যের মধ্যে এ জাতীয় কবিতার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। যেমন

(১) وطن کے سپاہی শিরোনামে রচিত একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ:

بڑھے چل خراماں وطن کے سپاہی　　وطن کے نگہبان وطن کے سپاہی

بڑھے چل بڑھے چل چلن تیری دلکش　　تو عزت کا ساماں وطن کے سپاہی

آخری بیت :

ہے **فضل** خدا تجھ پہ سایہ فگن اب　　بڑھے چل خراماں وطن کے سپاہی

(২) سپاہی سے خطاب শিরোনামে আরেকটি কবিতার প্রথম দু'লাইন নিম্নরূপ:

آی فوج ارض پاک ترے دم سے ہے عیاں　　شان وطن وطن میں ترے دم سے ہے اماں

یہ سر زمین پاک جو اک جسم پاک ہے　　تو اس کی جاں ہے، قوم ترے دم سے شادماں

(৩) خطاب بہ مسلماناں শিরোনামে একটি কবিতার নিম্নোক্ত কয়েকটি লাইন উল্লেখযোগ্য।

ای مسلمان تو بیدار مسلماں ہو جا　　اور دل و جاں سے تو حامی قرآن ہو جا

ہے مسلماں تو ہے عالم ہستی تیرا　　اوج افلاک کی خاطر تو پر افشاں ہو جا

فضل کی ہے یہ نصیحت تجھے پیارے سن لے　　پیکر عمل بن اور مرد مسلماں ہو جا

(৪) ইসলামি জাগরণী কবিতাগুলোর মধ্যে তার বাংলা ভাষায় রচিত কবিতাও রয়েছে। যার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

বিশ্ব মুসলমান! বিশ্ব মুসলমান!! বিশ্ব মুসলমান!!!
প্রেমপথের অভিযানে মহানবীর গুলিস্তানে
শরীআতের সংবিধানে তরীকতে হও আগুয়ান
বিশ্ব মুসলমান! বিশ্ব মুসলমান!
বিশ্বের বাজারে তোরা জাতি ছিলে সর্বসেরা
তোদের প্রশংসাতে সারা দুনিয়া ছিল আত্মহারা
আজ কেন এই অন্ধকারে হাবুডুবু মুহ্যমান?
বিশ্ব মুসলমান! বিশ্ব মুসলমান!

*** নানা প্রসঙ্গে তথা উন্মুক্ত বিষয়ে রচিত কবিতা**

যে কোন বড়ো মাপের কবির অনুরূপ মরহুমের কাব্যসম্ভারে বেশ কিছু কবিতা দৃষ্ট হয় যেগুলোকে উন্মুক্ত কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। তবে এর অর্থ এই নয় এগুলো একেবারে অপ্রাসঙ্গিক, অকারণে রচিত বরং এগুলো রচিত হয়েছে কাব্যস্পৃহার তাড়নায়। পূর্ব থেকে কোন বিষয় নির্ধারণ করে বা কোন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে নয়। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় "Art for arts sake" তথা "শিল্পের তরে শিল্পচর্চা"।

এ জাতীয় কবিতার কয়েকটি উদাহরণ এখানে পেশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি।

(১) بزبان اطفال শিরোনামে রচিত একটি কবিতার কিয়দাংশ দেখুন:

اے تارے آسماں کے 'اے جگمگانے والے

ہم کو بھلانے والے 'اے دل لبھانے والے

بچے سمجھ کے ہمکو' ناداں سمجھ کے ہم کو

چمکارہے ہو ہم کو دہوکے میں لانے والے

ہم شیر دل ہیں بچے منزل کو پا چکینگے

فضل خدا سے ہم ہیں مقصد کو پانے والے

(২) এ জাতীয় কবিতার মধ্যে নিচের মুসাদ্দাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও।

قول اقبال ہے ملا کی کہانی تو نہیں

قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں

عمل وإیمان ہے تو آباد ہو برباد نہیں

وہ نہیں کچھ بھی نہیں ہم بھی نہیں تم بھی نہیں

اسوۂ احمد مرسل کو اجالا کردو

تم پہ ہو فضل خدا اسکو دوبالا کردو

(৩) জনৈক কবির একটি কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করতঃ অভিন্ন قافیہ তে রচিত একটি কবিতা দেখুন:

تیغ ابرو ہم او گلگلوں غدارے عجیبے — صید انداز او مفقود قرارے عجیبے

ناوک افگن نگہش ماہ لقائے عجیبے — نازک اندام عجب خور نگارے عجیبے

عاشق ناز او وارفتہ مزاجے عجیبے — طالب وصل او درماندۂ حالے عجیبے

آتش عشق بجاں شعلہ مزاجے عجیبے — قلب آشفتہ من آہ نوازے عجیبے

(৪) صبح سویرے مورخہ ۱۹ جون ۱۹۶۵م ایک گل شگفتہ سے خطاب শিরোনামে রচিত একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখযোগ্য:

اے گل یہ تیرا حسن دلکش کہاں سے آیا — یہ بو کدہر سے آئی یہ رنگ کیسے لایا

یہ لطف ویہ نزاکت من موھنی یہ صورت — کس نے تجھے ہے بخشی کس نے تجھے سجایا

اے فضل دل کے نقطے میں جلوہ ہو اسی کا — حسن وکشش میں جس نے نظم جہاں بسایا

(৫) "متفرقات" শিরোনামে একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দেখুন:

عندلیب خوشنوا کو کر دیا خاموش کیوں — ہوشمند سمجھا تھا تم کو پر ہوا مدہوش کیوں

اسطرح گلشن تمہارا ہو گیا سنسان کیوں — منظر حسن دلارا ہو گیا بیجان کیوں

اس زمانے میں مروت اور وفا کچھ بھی نہیں　　دل کا دل زخمی ہوا پھر مدعا کچھ بھی نہیں

بلبل خوش نغمہ خواں کو کر دیا بیزار ہے　　زاغ کے چنگل میں پھر تقدیر کی پیکار ہے

(৬) "عاشق بیچارہ" শিরোনামে একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য:

جو دل میں تصور تھا تصویر نہیں بنتی　　گو دل میں محبت ہے تحریر نہیں بنتی

اک چشم زدن میں انکا آنا چلے جانا　　بجلی تھی جھلک تھی کیا تقریر نہیں بنتی

ہو فضل خدا تم پر خوشحال رہو دائم　　بے لطف خدا ہرگز تبشیر نہیں بنتی

(৭) "حال دل" শিরোনামে একটি কবিতার প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ:

وہ دعاؤں کا جو تھا سلسلہ قائم نہ رہا　　دل کے جذبات میں پہلا سا تلاطم نہ رہا

بلبل نغمہ سرا کا جو گلا گھونٹ دیا　　رنگ گل پر جو تھا اسکا وہ ترنم نہ رہا

(৮) "پند چند" শিরোনামে একটি কবিতার প্রারম্ভিক দুটি পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য:

ایک بلبل تھا گلستاں میں ہزاروں داستاں

پر نہیں اس کے ہوے تم جان و دل سے قدرداں

ای گل خاموش تیرا کون ہو اب نغمہ خواں

کون ہو گا نکتہ رس اور نکتہ سنج و نکتہ داں

(৯) "گر کی بات" শিরোনামের একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দেখুন:

سنگریزہ جس کو سمجھا وہ در نایاب تھا　　حسن کا گہوارہ تھا پھر ماہر و مہتاب تھا

پر نظر انکی حقیقت بیں نہ تھی کیا قدر ہو؟　　ہے برابر خاک تھی یا گوہر با آب تھا

خامشی کر اختیار اے فضل گر کی بات سے　　کیا کوئی سمجھے کہ تجھ میں موج تھی سیلاب تھا

(১০) "تضمین" তথা অন্য কোন কবির অভিন্ন বিষয় ও ছন্দ অবলম্বনে কবিতা রচনা উর্দু-ফার্সি কবিদের একটি বিশেষ রীতি হিসেবে চলে আসছে। মরহুমের কবিতাসম্ভারে এ জাতীয় কয়েকটি কবিতা কিংবা কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে এখানে এর একটি উদাহরণ পেশ করা হলো-

از غیر বা অন্যের রচিত কবিতা:

دل میں کیا رکھا ہے اب الفت حضرت کے سوا
اڑ گئے رنگ سبھی رنگ حقیقت کے سوا

حق کو دیکھا ہے خدائی نے جس آئینے میں
کوئی لائیگا کہاں سے تیری صورت کے سوا

نور توحید سے بھٹکے ہوئے پروانوں کو
کوئی رہبر نہ ملا شمع رسالت کے سوا

উক্ত কবিতার ছন্দ ও বিষয় অবলম্বনে (از خود) শিরোনামে তিনি লিখেছেন-

امن کے نظم میں دنیا نے بہت غور کیا
کوئی نسخہ نہ تھا قرآں کی ہدایت کے سوا

بزم امکان کی حقیقت کا تجسّس جو کیا
کوئی باعث نہ ملا ہستیٔ حضرت کے سوا

اہل دانش تو بہت ڈھونڈ چکے راہ نجات
نہ ملا کچھ شہ لولاک کی سیرت کے سوا

জ. শিক্ষামূলক কবিতা

ওস্তাযুল আসাতিযা আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর কাব্যসম্ভারে শিক্ষামূলক ও উপদেশমূলক কবিতার সংখ্যাও নেহাত কম নয় এবং একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত শিক্ষকতার ব্রতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অনাগত প্রজন্মের জন্য শিক্ষা, দর্শন ও আদর্শের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

(১) خطاب بطلبائے سابقین শিরোনামে একটি কবিতা এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তালাবায়ে সাবেকীন তথা চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র সংগঠন। তাদের প্রতি ছিল মরহুমের প্রচণ্ড ভালোবাসা, অগাধ আস্থা এবং বিশাল আশাবাদ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এরা শুধু চুনতি মাদরাসার কল্যাণে আত্মনিয়োজিত হবেন না বরং দেশ ও জাতির বৃহত্তর খেদমতে আত্মনিবেদিত হবেন।

বলাবাহুল্য, এ সংগঠনটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখনও স্বীয় যাত্রাপথে চলমান আছে। এ সংগঠনের সদস্যরা শিক্ষা বিস্তার ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে যে খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে, তা চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসাকে একটি গৌরবের আসনে সমাসীন করেছে দৃঢ় বিশ্বাস।

২১ নভেম্বর ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে তোলাবায়ে সাবেকীনের একটি সম্মেলনকে উদ্দেশ্য করেই তিনি এ কবিতা রচনা করেন?

اہل علم دین ہو تم خوش نصیب وخوش خصال
خوش رہو پھر کامراں مقصود میں ای نیک فال
اور نکو کاری نکو خوئی میں قائم لازوال

مدعائے علم دیں جو کچھ ہے اسکا ہو رہو
خدمت دیں میں جو کچھ کرنا ہے اسکا ہو رہو
دیں گنوا کر نام دنیا کا نہ لوای خوش خیال

ای گلانِ گلعذارانِ حکیمی گلستاں
خوشہ چینان دبستان نذیری بیگماں
منہمک اعلائے دیں میں تم رہو با حال وقال

مذہب اسلام تیری جان ہے تو جسم ہے
روح تیری جزبۂ ایمان ہے تو جسم ہے
یہ نہ ہوں اس قوم پر پھر ہے وبال اندر وبال

(২) "خطاب بطلبائے مدرسہ" শিরোনামে এ জাতীয় আরেকটি কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি এখানে উল্লেখ করা যায়। এতে তিনি লিখেন-

نوجواں مرد مسلماں مسلم باکار بن — سعی پیہم، فطرت جولان چوں پرکار بن
ہمچو پروانہ لپٹ جانور قرآن سے لپٹ — شوق سے چن چن لے نور اور مطلع انوار بن
بحر بے پایاں وہ قراں ہے رموز اسرار کا — آشنا اسکا تو ہو اور مخزن اسرار بن
علم ہے پاکیزہ وہ، پاکیزہ خوئی شرط ہے — چوں گل پاکیزہ بن، پاکیزہ خوش اطوار بن

(مقطع):

فضل ناکارہ ہے بس - لیکن تمنا ہے کہ تو — جان من باکار بن، باکار بن، باکار بن

জীবনের সর্বশেষ কবিতা

কিছুসংখ্যক কবিতার কথা বাদ দিলে আল্লামা মরহুম তাঁর কবিতার রচনাকাল উল্লেখের বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। তারপরেও বিভিন্ন কারণে কিছু কিছু কবিতায় সন, তারিখ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। সৌভাগ্যবশত তাঁর ডায়েরিতে এমন একটি কবিতা পাওয়া গেছে যাতে রচনার সন এবং উপলক্ষের উল্লেখ আছে।

বায়তুশ শরফ আঞ্জুমানে ইত্তেহাদের উদ্যোগে প্রতি বছর কুমিরাঘোনা আখতারাবাদ-এ মাহফিলে ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে নিবেদিত মরহুমের একটি কবিতা পাওয়া গেছে যার রচনাকাল হচ্ছে ১৯৭৯*[১]। এ হিসেবে দেখা যায় যে উক্ত কসিদাটি মরহুমের জীবনের সর্বশেষ কবিতা। তাছাড়া উক্ত কসিদাটির সর্বশেষ পঙ্‌ক্তিতে এমন কিছু ইঙ্গিত আছে যাতে মরহুমের জীবনের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তথা ঈমানের সাথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা। কবিতার শিরোনাম হচ্ছে- برائے کمیرا گھونا

নিম্নে উক্ত কসিদার নির্বাচিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা হলো:

کرشمہ تیرا یارب عالم ہستی بساتا ہے
کہ اس کے دور میں اک کارخانہ نظر آتا ہے

عجب حسن قدم کا ظاہر و باطن میں جلوہ ہے
دل عاقل کو اسکا حسن دیوانہ بناتا ہے

یہی ہے برق عشق خود ہی اچھلکر مانگ لیتا ہے
امانت جس سے ڈر کر آسماں انکار کرتا ہے

ولایت میں رسالت کی امانت آگئی جس دم
ابو بکر و عمر عثمان علی ایک ایک بنتا ہے

(آخری بیت):

سوالی فضل یارب ان بزرگوں کے توسل سے
بہکاری خاتمہ بالخیر کا بنکر کے روتا ہے

---

[১] এ কসিদাটি তাঁর ইন্তেকালের প্রাক্কালে রচিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

মরহুমের কবিতার শৈল্পিক মান

কোনো কবি-সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের শৈল্পিক মান নির্ধারণে তিনটি বিষয় প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। আর তা হচ্ছে-

ক. তাঁর রচনাশৈলী যাকে আরবি ও উর্দুতে اسلوب এবং ইংরেজিতে Style নামে অভিহিত করা হয়।

খ. বিষয়বস্তু বা তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য।

গ. সাহিত্য দর্শন বা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তার মান ও অবস্থান।

প্রত্যেক বড়ো মানের কবি-সাহিত্যিক এ তিনটি বিষয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও একথা অবশ্যম্ভাবী নয় যে, তাঁদের প্রত্যেককে এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিতে উচ্চমানের হতে হবে। ফলে কোনো কোনো কবি তাঁর রচনাশৈলীর কারণে বিশ্বজোড়া প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকেন।

যদিও তাঁদের সাহিত্যকর্মে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান না থাকে কিংবা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁদের দর্শন অগ্রহণযোগ্য। এ জাতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে বিখ্যাত জাহেলী কবি ইমরাউল কায়স, আব্বাসী কবি বাশার, উর্দু কবি গালিব এবং আধুনিক বাঙালি কবি শামসুর রাহমানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিষয়বস্তু বা সাহিত্যের প্রতিপাদ্য নিয়ে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে উমাইয়া কবি ফরযদক, ইংরেজ কবি মিলটন, উর্দু কবি হালী এবং বাঙালি কবি জসীমুদ্দিনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবন দর্শন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি তথা দার্শনিক আবেদনের কারণে যাঁদের কাব্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তাঁদের মধ্যে জাহেলী কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমা, আব্বাসী কবি আল মা'আররী, ফার্সি কবি রুমী, উর্দু কবি আকবর ইলাহাবাদী এবং বাঙালি কবি ফররুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য

আবার কোনো কোনো কবি আছেন যাঁদের বিচরণ সকল ময়দানে। অর্থাৎ উপরিউক্ত সব বিষয়ে তাঁরা দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে আল মুতানাববী, সাদী, শেক্সপিয়ার, ইকবাল ও নজরুলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

মরহুমের কাব্যসম্ভারের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যদিও কবি হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেননি কিন্তু তাঁর কাব্যের ভাষা তথা রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা এবং দার্শনিক তথ্যের অবতারণা তাঁকে একজন বড়ো মাপের কবির সারিতে দাঁড় করাতে সক্ষম। মরহুম কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেননি কেনো এ প্রশ্নের উত্তরে নিম্নোক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) তিনি মূলত ছিলেন একজন শিক্ষক ও জ্ঞান-তাপস। তাই প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়ার পূর্বে তিনি কাব্যচর্চার প্রতি তেমন কোন আগ্রহ প্রদর্শন করেননি।

(খ) মরহুমের অধিকাংশ কবিতার রচনাকাল দেখা যায় ১৯৬২-১৯৭৯ পর্যন্ত। তখন পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে উর্দুচর্চার এবং বিশেষ করে রচিত কবিতাসমূহ প্রকাশের উপযুক্ত কোন পরিবেশ ছিলো না।

(গ) মরহুম ছিলেন প্রকৃতিগতভাবে প্রচারবিমুখ। তিনি যে সমস্ত কবিতা লিখেছিলেন তা নেহাত প্রেরণার বশবর্তী হয়ে রচনা করেছিলেন। রচনা সমাপ্ত হওয়ার পর এবং জনসমক্ষে একবার বা কয়েকবার পেশ করার পর তিনি কাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি লাভ করেছেন বলে মনে করতেন। ১৯৬২-১৯৭৯ সালকে তথা ৮২ বছরের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের শেষ দুই দশককে যে কাব্যজীবনের স্বর্ণযুগ বলে বিবেচনা করা যায় তার যৌক্তিকতা এভাবেই খুঁজে পাওয়া যায় যে, এ সময়ে তিনি যে সব কবিতা রচনা করেছিলেন তাতে কণ্ঠ দেয়ার মতো চুনতি মাদরাসার কোকিলকণ্ঠী ছাত্রদের একটি দল সদা প্রস্তুত ছিলো, যারা বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত তাঁর বিভিন্ন কবিতার সুর দিতো এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের কাছে পেশ করতো। এতে তিনি বেশ তৃপ্তি লাভ করতেন। অতএব তা পত্রিকান্তরে বা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন না। যেমনটি সন্তানসম্ভবা একজন জননী প্রচণ্ড প্রসববেদনা সহ্য করার পর প্রসব করা সন্তানের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে নবজাতক সন্তানের চাঁদমুখ দেখেই সব যন্ত্রণার কথা ভুলে যান।

মরহুমের না'ত কবিতা ও এর শৈল্পিক মান

মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহর কবিতা সম্ভারের মধ্যে না'ত কবিতা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শৈল্পিক মানের বিচারেও তা উচ্চাঙ্গের কবিতাই বলা চলে। রচনাশৈলীর নৈপুণ্য, ভাবের গভীরতা ও ভাষায় মণিমুক্তার সমাহার ঘটানোর ক্ষেত্রে এগুলোর মান তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ। এগুলো একদিকে যেমন তাঁর উচ্চতর কাব্যপ্রতিভার দিক নির্দেশক, তদ্রূপ রাসুল (সা.) এর প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসারও পরিচায়ক। এখানে নির্বাচিত কিছু নাতের কয়েকটি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করা হলো:

মরহুমের রচিত একটি নাতের নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তির প্রতি লক্ষ্য করুন-

توسل با پناہ بے پناہاں ہر زماں دارم　　اجابت از در رحماں ندا آوردہ است ایں دم

এ পঙ্‌ক্তির প্রথমার্ধে রচনাশৈলীর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ পেশ করা হয়েছে যা (با پناہ بے پناہاں) তে গিয়ে চূড়ান্তে (Climax) উপনীত হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ার্ধে প্রদর্শিত হয়েছে এক উচ্চাঙ্গের ভাব। যা মাটির মানুষকে মহামহিম স্রষ্টার পক্ষ থেকে সরাসরি হাম-কালাম হওয়ার মর্যাদা দান করেছে।

আরেকটি না'ত কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি প্রণিধানযোগ্য, যাতে শৈল্পিক মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সাথে ইতিহাসের বিশাল অধ্যায়কে একটি পঙ্‌ক্তির আবর্তে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

ادہر تھا طور سینا میں وہ اعلان لن ترانی کا　　ادہر مخصوص دیدار بصر کے بالعیاں تم ہو

এ ধরনের আরেকটি পঙ্‌ক্তি যাকে সুনিপুণ রচনাশৈলীর পাশাপাশি ভাবের গভীরতার এক উত্তম উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়:

اہل دانش تو بہت ڈھونڈ چکے راہ نجات　　نہ ملا کچھ شہ لولا کی سیرت کے سوا

আরেকটি না'ত কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো যা উচ্চাঙ্গের শৈল্পিক মানের অধিকারী:

سکون قلب مضطر راحت دلدادگاں تم ہو　　حبیب خالق عالم ہو پھر جان جہاں تم ہو

تری رفتار و گفتار اور تری ہر ہر ادا دلکش　　گل خندان گلزار وجود دو جہاں تم ہو

হামদ কবিতার শৈল্পিক মান প্রসঙ্গ

না'ত কবিতার অনুরূপ হামদ কবিতাও মরহুমের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। না'তের তুলনায় হামদ কবিতা সংখ্যায় কম হলেও শব্দ চয়ন, ভাষার লালিত্য ও ভাবের গভীরতা ইত্যাদি বিচারে মরহুমের হামদ কবিতা তথা মহামহিম আল্লাহর স্তুতি রচনাও না'ত কবিতার চাইতে কোনোভাবেই কম নয়। এখানে বিস্তারিত পর্যালোচনায় না গিয়ে দু'একটি পঙ্‌ক্তি উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হলো। একটি হামদ কবিতায় তিনি লিখছেন-

کیسا ہوں کسطرح ہوں پھر جیتے جی ہوں کیسا　　ڈوبا ہوں نعمتوں میں داتا ہے وہ ہمارا

یہ جان و دل جگر خوں یہ شکل وردی گلگوں　　سب ہی دہش ہے اسکی کچھ بھی نہیں ہمارا

تشکر بارگاہ الٰہی শিরোনামের আরেকটি *حمد* কবিতায় তিনি উল্লেখ করেন:

مومن کے گھر میں ہم کو پیدا کیا ہے اس نے　　اسکی تجلیاں ہیں خود ضوء فشاں ہم پر

ایمان کی پرتووں میں ہے پرورش ہماری　　ظلمت سے کفر کی ہے وہ نگہبان ہم پر

আনসারদের ভাষায় *دعا بدربار الٰہی* শিরোনামে আরেকটি কবিতার নিম্নোক্ত লাইন দু'টি প্রণিধানযোগ্য:

الٰہی ہم میں خودداری، وفاداری، شجاعت ہو　　بلندی حوصلہ میں ہمت عالی عنایت ہو

رذالت، پستی ہمت، خساست، سستی و غفلت　　نہ ہوں ہم میں وہ خوجو قوم کے حق میں خجالت ہو

উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তিসমূহের দিকে দৃষ্টি দিলে লক্ষ্য করা যায় যে, তাতে অভিনব অথচ উপযুক্ত শব্দ চয়ন কাব্যের শৈল্পিক মানকে অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। যেমন-

جان و دل، جگر خوں، شکل وردی، دہش، ضوء فشاں، ایمان کی پرتووں میں پرورش، پستی ہمت وفاداری، خودداری، خساست، سستی، وغفلت، خجالت -

ইত্যাদি শব্দমালা বা বাগধারা।

গজল কবিতার শৈল্পিক মান

উর্দু, ফার্সি ও আরবি সাহিত্যে গজল কবিতা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং শৈল্পিকমানের বিচারে এ গজল কবিতাই সর্বোচ্চমানের কাব্য বলে বিবেচনা করা হয়। কেননা এতে কবির জন্য ভাবের ডানায় ভর করে অন্তহীন দিগন্তে উড়ে বেড়াবার একটি স্বাধীনতা থাকে। ফলে যে কবির কাব্য যতো বেশি লাগামহীন তার কবিতা ততো বেশি উচ্চাঙ্গের বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু শব্দ চয়ন ও বিষয়ের অবতারণায় উচিৎ, অনুচিৎ, করণীয়, বর্জনীয় ও রুচিশীলতার বাধ্যবাধকতা মেনে চলার পরও গজল কবিতার মান রক্ষায় মরহুমকে সফল ব্যতিক্রমের একটি উদাহরণ বলা যেতে পারে।

এ জাতীয় কয়েকটি উদাহরণ নিচে পেশ করা গেল:

"جفا ووفا" শিরোনামে রচিত একটি গজলের দু'একটি পঙ্‌ক্তি দেখুন, যাতে শৈল্পিক মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে:

یہ کیف محبت، نیاز اور منّت — یہ حالِ صداقت صبابت مودّت
وہ بزم حسیں میں بیاں کسطرح ہوں — فریب حریفاں سے ڈرتا رہا ہوں
وہ حسن جفاخو، یہ عشق وفاجو — وہ کبر خفاخو، یہ عجز رضاجو
ہیں ایسی ستمگاریاں مہ جبینوں — کی جو میں خموشی میں سہتا رہا ہوں
ادھر عشق و شکوہ، ادہر ناز و عشوہ — ادہر آہ و نالہ اَدہر لاابالی
یہ فقدان احساس و نامہربانی — زمانے سے دل دل مچلتا رہا ہوں

"محبت" শিরোনামে রচিত একটি কবিতার দু'একটি উচ্চাঙ্গের পঙ্‌ক্তির উদাহরণ এখানে পেশ করা হলো:

علاج مرض کا ناصح تقاضا ہر زماں کرتے — مگر داروی چشم خوں فشاں میں کر نہیں سکتا
اداسی چھا گئی ہے بزم حسن و عشق میں لیکن — خموشی ترنّم کیوں؟ عیاں میں کر نہیں سکتا
مِلازاغوں کو رتبہ عندلیب نغمہ ساماں پر — بیانِ گردش وجورِ زمان میں کر نہیں سکتا

এ পঙ্‌ক্তিগুলোতে যেরূপ লালিত্যময় শব্দগুচ্ছের (Phrase and Dictions) ব্যবহার করা হয়েছে তাতে কবিতার মানকে বিশেষভাবে উন্নীত হয়েছে। যেমন-

ملازاغوں کو رتبہ عندلیب "خموشی ترنم" "داروی چشم خوں فشاں" "بیان گردش وجور زماں"

ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক কবিতা ও তার শৈল্পিক মান

মরহুমের কাব্যসম্ভারের এক বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে তার প্রাসঙ্গিক কবিতা। এ কবিতাগুলো তিনি রচনা করেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে, স্বপ্রণোদিত হয়ে কিংবা অন্য কারো দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই। সাধারণত এ জাতীয় কবিতার মান যে উচ্চাঙ্গের হবে তা আশা করা যায় না। কারণ এতে উচ্চমানের সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য তথা স্বতঃস্ফূর্ততা ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে। কেননা এ সময়ে কবি অন্তরে ভাবের উদ্ভব ও তাতে আপ্লুত হয়ে কাব্য রচনা করেন না বরং সমুপস্থিত একটি প্রয়োজনীয়তা পূরণের দায়ে নেহাত আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে কাব্যচর্চা করে থাকেন। অধিকাংশ কবিই এ জাতীয় কবিতা রচনায় কাব্যের সাধারণ মান রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু মরহুম ছিলেন এতেও ব্যতিক্রম। বরং তিনি এ জাতীয় কাব্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈল্পিক মান রক্ষার প্রয়াসে সফলভাবে মানোত্তীর্ণ হয়েছেন বলে মনে হয়।

এজাতীয় কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দেয়া হলো যা শৈল্পিক ও সাহিত্যিক বিচারে মানোত্তীর্ণ।

মৌলভী আমির আহমদের শাদী উপলক্ষে তিনি একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ স্থাপন করে চার চারটি কসিদা রচনা করেন। এগুলোর প্রত্যেকটি হতে একটি উচ্চাঙ্গের পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ:

دریا کو مہ سے الفت، بلبل کو گل سے الفت — اور حسنِ مہ جبیں سے ہے دردِ دل گوارا

ہیں دیدہ ہای عاشق مخمورِ مئ ز الفت — مہرو کے دل میں بھی ہے اب جستجوئِ الفت

دھڑک رہا ہے یہ دل انتظار ہے دشوار — لگن لگن ہے، ہے مخمور دل چوں میخواراں

موسم ہے دلکشا بس ہے لالہ زار عالم — اڑتا ہے ہر نواحی خوشبوں کا اب پہریرا

মৌলভী একরামুল হকের কনিষ্ঠা কন্যা শাহনাজ লুতফার বিয়ে উপলক্ষে আল্লামা ফজলুল্লাহ একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। এতে রচনাকাল উল্লেখ ছিলো ১৩ মে ১৯৬৪ খৃ., এ কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে, শাহনাজ লুতফার স্বামী গোলাম কাদের বিগত ১৬/৫/২০০১ সালে ইহকাল ত্যাগ করেন।

بنا کی اور بنی کی شان ہوں الفت نشاں دائم — ہے دل کی یہ دعا یارب کہ دل نالاں ہے اس دم

ہو ان میں دین کا جذبہ، ہوں دنیاوی میں بھی شاداں — دعائ فضل ہے یہ اور بھی اذعان ہے اس دم

চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্রদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন আঞ্জুমানে তোলাবায়ে সাবেকীন এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কয়েকটি উচ্চাঙ্গের পঙ্‌ক্তির উল্লেখপূর্বক তাঁর বহুমুখী কাব্যপ্রতিভার আলোচনা শেষ করা হলো।

ای گلستان حکیمی کے چمیدہ پھولو — ای چمنزار نذیری کے دمیدہ پھولو

اور ای گلزار چنوتی کے چنیدہ پھولو — بلبل ستان چنوتی کے شمیدہ پھولو

ایک نئی روح جو پھنک جائے تمہارے دم سے
جسم پژمردہ چمک جائے تمہارے دم سے

خود شناسی کا انہیں راز بتایا تم نے　　سعی پیہم کا بھی دمساز بنایا تم نے
مرغ بے پر تھے تو شہباز بنایا تم نے　　راز سربستہ، پرواز بتایا تم نے
بے جلا دل ہے تو اس دل کے مجلّی تم ہو
اور مربی ہو تم ان کے متولی تم ہو

درد ہے ملت بیضا کا تمہارے دل میں　　حال ہے خشیتِ مولا کا تمہارے دل میں
عشق ہے سرور دنیا کا تمہارے دل میں　　شوق ہے رتبۂ علیا کا تمہارے دل میں
شوق پرواز میں تم کو ہے پر افشاں ہونا
نیم رہ پر نہیں زیبا ہے جو ترساں ہونا

عہد حاضر میں جو بچنا ہے مسلمانوں کو　　علم قرآں کو بچانا ہے مسلمانوں کو
اہل باطل سے نمٹنا ہے مسلمانوں کو　　دہریت سے بھی چھڑپنا ہے مسلمانوں کو
عصر حاضر کے فنوں بھی ہے پڑھنا لازم
جب ہی رکھ سکتے ہو ہستی کو تمہاری قائم

সন ১৯৪৫ এ চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার বার্ষিক সভার সময় ফাযিল পরীক্ষা শেষে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক উচ্চাঙ্গের পঙক্তির কিছু কবিতা:

روح کردار بنو، قابل اقوال بنو　　فارغ از قال بنو، صاحب احوال بنو
والۂ علم و حکم جامع افضال بنو　　پیکرِ خُلق حسن، صاحب اعمال بنو
درس خوانانِ وبستانِ حکیمی تم ہو
بادہ نوشانِ خمستانِ نذیری تم ہو

ہاں اکابر کو دعاؤں سے نہ بھولو ہرگز　　خیر خواہوں کو ثناؤں سے نہ بھولو ہرگز

اہل شوری کو بھی جانوں سے نہ بھولو ہرگز　　اہل قریہ کو بھی ناموں سے نہ بھولو ہرگز

پرورش یافتۂ راغِ چنوتی تم ہو

تخم اپناشتۂ باغ چنوتی تم ہو

বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত কসিদাটি অননুকরণীয় সরল কাব্যের (سہل ممتنع) একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া এখানে বিধৃত তাঁর আশাবাদ এবং দু'আ আঞ্জুমানে তোলাবায়ে সাবেকীনের প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মীয় ও পেশাগত জীবনে সাফল্যের জন্য একটি উত্তম পাথেয়।

মরহুমের আরবি কাব্যপ্রতিভা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে- মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহর বিচরণ শুধুমাত্র উর্দুতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না বরং তাঁর কাব্যিক ভুবন ছিলো উর্দু, ফার্সি, বাংলা ও আরবি সব ভাষাতেই। তবে একথা সত্য যে, তাঁর আরবি কবিতার সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। তিনি আরবি ভাষাতে কয়টি কবিতা রচনা করেছিলেন তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনি কি আরবিতে কবিতা লিখতে সক্ষম ছিলেন? এর জবাব খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি উদাহরণের উপস্থিতিই যথেষ্ট। কারণ এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আরবি ভাষায় কাব্যচর্চার ক্ষমতা রাখতেন। এমনিতেই আরবি ভাষার চর্চা আমাদের দেশে শুধুমাত্র উচ্চাঙ্গের আলেমদের মধ্যেই সীমিত ছিলো। তদুপরি এসব আলিম সাধারণত কাব্যচর্চাকে একটি প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে বিবেচনা করতেন না। তাছাড়া আরবিতে কাব্যচর্চার জন্য যে পরিবেশ পূর্বশর্ত তা ছিলো এখানে অনুপস্থিত। কারণ আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ১০% জন আলিম এবং তাঁদের মধ্যে মাত্র ১০% জন লোক আরবি কবিতার অর্থ সরাসরি অনুধাবনে সক্ষম। এসব কারণেই আরবিতে কবিতা রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। তাই আমরা দেখতে পাই যে, মরহুম যখনই এমন একটি পরিবেশের সুযোগ নাগালের মধ্যে পেয়েছেন যাতে আরবি কবিতার যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে; তখন সে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আরবিতে কবিতাচর্চায় ব্রতী হন। বলা বাহুল্য, এ সুযোগটি ছিল ১৩৯৮ হিজরিতে তদানিন্তন সৌদি রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খতিবের চুনতিতে অনুষ্ঠিত সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলে আগমন এবং সময়টি ছিলো মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি নাজুক অবস্থা। তখন ইহুদীরা পবিত্র মসজিদুল আকসা দখল করার পর ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করে একের পর এক ইহুদি কলোনি তৈরি করে যাচ্ছিলো। সৌদি রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামিদের উপস্থিতিতে পঠিত তাঁর রচিত ৬৫ পঙ্‌ক্তির আরবি কসিদার কয়েকটি নির্বাচিত পঙ্‌ক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো:

تبا لحســـاد العـرب تبـا لهم قوم اليهود وكل ذراري الشيطان
قد قدمتم وانتم أجلة في الشان بقدومكم شرفتمونا كل السكان
لنحبكم بحب رسولنا المصطفى و لنحبكم والله جــزء الإيمان

بشـرى لنـا ولكم بحفـلة سي رة النبي هو بـاعـث الأكـوان
فيــها الأسـوة بحسن نظـامـها لحيــاتنا و مماتنــا كل زمــان

السـيرة هي مـرأة دين الإسلام من يبـتغ غـيره ضل بالبـطلان

أعـداؤكم أعداؤنا وأحبـابكم أحبـابنا فأقــولها بالإيمـان

উল্লেখ্য যে, এ কসিদাটি পরবর্তিকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আরবি সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিলো। এ কসিদা ছাড়াও আরবিতে রচিত মরহুমের আরও একটি কিতআ' রয়েছে।

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) ফাতওয়াসমগ্র

'আল ইফতা' ইসলামি আইনতত্ত্বে একটি বিশেষ পরিভাষা। মানবজীবনে উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধানকল্পে ইসলামি বিধান ব্যক্ত করার নাম 'আল ইফতা'। এটি আল কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক স্বীকৃত এবং ইসলামি আইনবেত্তাগণ কর্তৃক অনুসৃত একটি শরিআতসম্মত ব্যবস্থা। আল কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামি আইনশাস্ত্রে পারদর্শী এবং সমসাময়িক সমস্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞাত 'আহল আল ইলম' ও 'আহ্ আল্ রায়' ব্যক্তিবর্গই কেবল আল ইফতার যোগ্যতা রাখেন। আল ইফতার পরিচয়, প্রকৃতি, পরিধি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বর্তমান যুগে এর কার্যকারিতা এবং আল ইফতায় আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর অবস্থান পর্যালোচনা করা হলো-

আল ইফতা باب إفعال এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো 'কোনো বিষয়ে মতামত প্রদান, কোনো জিজ্ঞাসিত বিষয়ে বিধান বর্ণনা করা। এর মূল ধাতু হলো ف + ت + ى যার অর্থ তারুণ্য, সৃজনশীলতা, মজবুত করা ইত্যাদি। সুতরাং আল ইফতা হলো মুফতি কর্তৃক স্বীয় যোগ্যতা, প্রতিভা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় বিষয়ে মতামত/বিধান ব্যক্ত করার মাধ্যমে উক্ত বিধানকে সুস্থিত ও মজবুত করা। এর মূল ধাতু হতে আল ফাতওয়া (الفتوى) আল ফুতওয়া (الفتوى) ও আল ফুতইয়া (الفتيا) প্রভৃতি শব্দ উৎসারিত। প্রাথমিক অবস্থায় শব্দটি যে কোনো বিষয়ে মত প্রকাশ কিংবা যে কোনো সমস্যার সমাধান পেশ করার অর্থে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীতে এটি কেবল শরিআ'তের বিষয়ে মত প্রকাশের পরিভাষা হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে يستفتونك (তারা আপনার নিকট ফাতওয়া চায়, সুরা-৪, আয়াত-১২৭) يفتيكم (তিনি তোমাদেরকে ফাতওয়া দেন, সুরা-৪, আয়াত-১২৭);। (তোমরা আমাকে মতামত দাও, সুরা-১২, আয়াত-৪৩); أفتونى (তুমি আমাকে তোমার মতামত জানাও, সুরা-১২, আয়াত-৪৬) أفتنا তুমি আমাদেরকে তোমার মতামত জানাও, সুরা-১৮, আয়াত-২২) ولا تستفت এ (তুমি তার কাছ থেকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করো না, সুরা-৩৭, আয়াত-১১), تستفتيان তোমরা মতামত গ্রহণ করেছিলে, সুরা-১২, আয়াত-৪১), প্রভৃতি ক্রিয়াপদে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মহানবীর (সা.) হাদিস এবং প্রাথমিক যুগে সাহাবা ও তাবিঈনের রিওয়ায়াতেও أفتوا (তারা ফাতওয়া দিয়েছে), أفتانى (তিনি আমাকে ফাতওয়া দিয়েছেন) تستفتيه (সে তার নিকট চেয়েছে); استفتى (সে ফাতওয়া জানতে চেয়েছে); أفتاك (সে তোমাকে ফাতওয়া দিয়েছে); استفتوه (তারা তার নিকট ফাতওয়া চেয়েছে); تفتى (তুমি ফাতওয়া দাও); استفتيت (আমি ফাতওয়া জানতে চেয়েছি) الفتيا (ফাতওয়া); مفت (ফাতওয়াদানকারী) প্রভৃতি ক্রিয়াপদে শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইমাম

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারি তাঁর আল জামি আল সহিহ গ্রন্থের 'কিতাব আল ইলম' এর অধ্যায় শিরোনামে (ترجمة الباب) এর তিন স্থানে الفتيا শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

আল ইফতা হলো ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত বা প্রকাশিত বিধান। মূলতঃ এটি কোনো উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে আইনগত রায়। যা অনুসরণ করে বিচারক তাঁর বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত সকল খুঁটিনাটি বিষয়ের মীমাংসা প্রচলিত আইন-আদালতে সম্ভব নয়। অপরদিকে সকল মুসলমান শরিআ'তের বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অভিজ্ঞও নয়। তাই তারা ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রদত্ত ফাতওয়া অনুযায়ি নিজেদের প্রাত্যহিক কার্যাবলি সম্পাদন করেন। ইসলামি শরিআ'তের যেসব খুঁটিনাটি মাসআলায় (المسائل الفرعية) মাযহাব প্রতিষ্ঠাতা মুজতাহিদ ফকিহগণ (الفقهاء المجتهدون) (কিংবা তাঁদের অনুসারী ফকিহগণ (الفقهاء المقلدون) হতে কোন সুস্পষ্ট মতামত পাওয়া যায় না। পরবর্তি যুগের আলিমগণ (العلماء المتأخرون) ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাতের মাধ্যমে তার সমাধান পেশ করেন।

ফকিহ ও মুফতিগণ সাধারণত দু'ধরনের মাসআলায় ফাত্‌ওয়া দান করেন। এক. দ্বীনি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলায়। এ প্রকারের ফাতওয়া ইবাদাত, মুআ'মালাত প্রভৃতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তা ব্যক্তি পর্যায়ে সীমিত এবং তা রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে কোনরূপ সাংঘর্ষিক নয়। দুই. আইন ও দণ্ডবিধির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে। এ বিষয়ে প্রদত্ত ফাতওয়া বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকার, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এবং বিচার বিভাগের ওপর বর্তায়। সুতরাং দেখা যায় যে, আল ইফতার আওতা ও পরিধি অনেক ব্যাপক। এটি মানুষের বিশ্বাস ও দর্শন থেকে শুরু করে ব্যবহারিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে পরিব্যাপ্ত করে।

আল ইফতার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নজির (Precedent) অনুসরণ করা হয়। মুফতির জন্য বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার অবকাশ থাকলেও তিনি কেবল বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে ফাতওয়া দিতে পারেন না। তাঁকে আল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস প্রভৃতির মুখাপেক্ষি হতে হয়। তাঁকে ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সচ্চরিত্রবান, আমানতদার, প্রাপ্তবয়স্ক, সচেতন, নিরপেক্ষ, ইস্তিম্বাতের যোগ্যতাসম্পন্ন, অতীতে প্রদত্ত ফাতওয়া বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন, লোভ-মোহ হতে মুক্ত এবং শরিআ'তের বিধি-বিধান সম্পর্কে পারদর্শী হতে হবে। মুফতিকে অন্যান্য মুফতির অবস্থা, রিওয়ায়াত ও দিরায়াতে তাঁদের অবস্থান এবং ফকিহদের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে অবহিত হতে হবে যাতে তিনি তাঁদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় সাধন কিংবা একজনের মতের উপর অন্যজনের মতকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম হন। মুফতিগণ আহকামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হবেন। বিশুদ্ধ ও ভুল মতামতের মাঝে পার্থক্য বিধানে সক্ষম হবেন এবং নিজের অনুসৃত মাযহাব সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত হবেন।

মহানবীর (সা.) যুগ হতেই আল ইফতার প্রচলন ও চর্চা অব্যাহত রয়েছে। তবে যুগে যুগে ফাতওয়া প্রদান ও সংরক্ষণ পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়। মহানবীর (সা.) যুগে

কেবল মৌখিকভাবে ফাতওয়া প্রদান করা হতো। এ যুগে আল কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি ইজতিহাদ ও রায় প্রয়োগ পূর্বক উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের রীতি প্রচলিত হয়। এ যুগে মহানবী (সা.) হযরত মুয়ায ইবন জাবাল ও আলি ইবন আবি তালিবকে পরপর ইয়ামনের কাজী নিয়োগকালে তাঁদেরকে ইজতিহাদ ও রায় প্রয়োগ করে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের অনুমতি প্রদান করেন। সাহাবাদের যুগে মৌখিক ফাতওয়া দানের পাশাপাশি লিখিত ফাতওয়া দানের রীতি প্রচলিত হয়। তাবিঈন যুগে আল ইফতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং মদিনা, মক্কা, কূফা, বসরা, সিরিয়া, মিসর, ইয়ামেন, বাগদাদ প্রভৃতি কেন্দ্রে তাবিঈগণ ফাতওয়া চর্চা করেন। এ যুগে ফকিহ ও মুফতিগণ আহল আল হাদিস ও আহল আল রায় এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের এ বিভক্তির ফলে ফিকহচর্চা এবং ফাতওয়া দানেও দু'টি ধারা সৃষ্টি হয়। ফলে আল ইফতায় মতানৈক্য দেখা দেয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরি শতকে এই মতানৈক্য আরো প্রকট হয়। তাকলিদ যুগে মুসলিম সমাজে ঐক্য ও সংহতি বজায় না থাকায় মুজতাহিদ ইমামদের অনুসারিগণ বিভিন্ন দল ও মাযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

মহানবীর (সা.) মাদানি জীবনের শেষের দিকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় মুফতি ও কাজী নিয়োগের যে ধারা প্রচলিত হয় তা মুসলিম সমাজে দীর্ঘদিন কার্যকর থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরি শতকে মুসলিম সমাজে ফিকহ ও ফাতওয়া চর্চায় অনেক মাযহাব আত্মপ্রকাশ করে। আব্বাসী যুগ পর্যন্ত (খ্রি. ১২৫৮) কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া যেই অঞ্চলে যেই মাযহাবের ফিকহ অধিক চর্চা হয় সেই অঞ্চলে সেই মাযহাবের অনুসারীদের মধ্য হতে কাজী ও মুফতি নিয়োগ করা হতো। পরবর্তীতে ইসলামি খিলাফত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়লে এ ধারা ব্যাহত হয়। ১৮শ খ্রিষ্টীয় শতকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা শাসিত হতে থাকলে কাজী ও মুফতিগণ তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদা হারান। এসময় ফকিহ ও মুফতিদের ফাতওয়া চর্চার পরিধি ব্যক্তি ও পারিবারিক আইনের আওতায় সীমিত হয়ে পড়ে এবং বিবাহ (Marriage), তালাক (Divorce), উত্তরাধিকার আইন (Law of Inheritance) প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্ব পরাধীনতার নাগপাশ হতে স্বাধীনতা লাভ করে সত্য; কিন্তু তখন সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। পাক-ভারত উপমহাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং এই উপমহাদেশে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামোতে বৃটিশ পরম্পরা আইন এবং মুফতিদের প্রদত্ত ফাতওয়ার টানাপোড়নে আল ইফতা অনেক পেছনে পড়ে যায়। এভাবে আল ইফতা সরকারি প্রতিষ্ঠানের পর্যায় হতে ব্যক্তি পর্যায়ে চলে আসার কারণে এ উপমহাদেশের আলিমগণ সমাজে উদ্ভূত পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ফাতওয়া দান শুরু করেন যা সামাজিকভাবে স্বীকৃত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন আদালত দ্বারাও অনুসমর্থিত হয়। এ ধরনের ফাতওয়া দানকারীদের মাঝে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) (১৩১৬-১৩৯৯ হি./১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রি.) ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, গবেষক, অনুবাদক, কবি, বহু ভাষাবিদ, ইসলামি চিন্তাবিদ এবং ফিকহ ও ফাতওয়াশাস্ত্রে একজন বিদগ্ধ আলিম।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন 'আল ইফতা'র একজন যোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলাদেশের খ্যাতনামা দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়নের পর হাদিসশাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন ভারতের প্রখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান মাযাহির উলুম সাহারানপুর হতে। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সিলেবাসের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও তাফসির, হাদিস এবং ফিকহ ও ফাতওয়া বিষয়ে প্রণীত প্রধান প্রধান গ্রন্থসমূহ গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নের মাধ্যমে আল ইফতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতা অর্জন করেন। বহুমাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী আল্লামা ফজলুল্লাহ দীনের খুঁটিনাটি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি লিখিত ও মৌখিক এ উভয় পদ্ধতিতে ফাতওয়া দান করেন। ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে উদ্ভূত সমস্যার সকল দিক ও বিভাগ চিহ্নিত করতেন। অতঃপর প্রতিটি দিক ও বিভাগ পর্যালোচনা করে এর যথাযথ সমাধানকল্পে সম্পূর্ণ শরয়ি দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখে ফাতওয়া দিতেন। উদাহরণ হিসেবে জুন ১৬, ১৯৩৬ সালে তাঁর প্রদত্ত ফাতওয়াটি পর্যালোচনা করা হলো। এই ফাতওয়াটি জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক একজন বিশিষ্ট আলিমের সাথে অশোভন আচরণ, কটূক্তি ও দুর্ব্যবহারকে কেন্দ্র করে দেয়া হয়েছে। জনৈক আজিজুর রহমান এ বিষয়ে তাঁর নিকট ফাতওয়া জানতে চাইলে তিনি ফাতওয়া দানের সকল উৎস ও সূত্রকে পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করে স্বীয় মতামত তুলে ধরেন।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যখন এ ফাতওয়া প্রদান করেন তখন এ উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন বিদ্যমান ছিলো। তিনি ইংরেজদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে উপরিউক্ত বিষয়ে যে বস্তুনিষ্ঠ ফাতওয়া প্রদান করেন তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এই ফাতওয়াটি ছন্দোবদ্ধ আরবি গদ্যে লেখা। ফাতওয়ার প্রথমেই তিনি এ ধরনের গর্হিত কাজে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি ইস্তিগফার করেন তথা নিজের পাপ-তাপ মোচনের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। অতঃপর উক্ত আজিজুর রহমান তাঁর নিকট যেসব বিষয়ে ফাতওয়া জানতে চান তাতে আলোচিত সমস্যাসমূহ একটি একটি করে চিহ্নিত করেন। উপরোক্ত ফাতওয়ায় তিনি প্রধান চারটি সমস্যা পর্যালোচনা করেন। সেগুলো হলো এক. ইলমে দীন শিক্ষা গ্রহণের কারণে কোন আলিমকে গালমন্দ, অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা, দুই. প্রকাশ্য জনসমক্ষে উক্ত আলিমকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে হেয় প্রতিপন্ন করা, তিন. ন্যায়পরায়ণতা অনুসরণের আহ্বান জানানোর কারণে ন্যায়পরায়ণতার প্রতি বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করা এবং চার. দাঁড়ির প্রতি অবমাননাকর কুটূক্তি ও কটাক্ষ করা। অতঃপর আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) আল কুরআন, হাদিস এবং ইসলামের অনান্য বুনিয়াদি গ্রন্থ ও প্রধান প্রধান ফাতওয়ার গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করে সূত্র উল্লেখসহ উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ আলোকপাতপূর্বক ফাতওয়া প্রদান করেন।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) প্রদত্ত ফাতওয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- তিনি যে সমস্যাকে সামনে রেখে ফাতওয়া প্রদান করতেন উক্ত সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে ইসলামি শরিআর উৎসসমূহ পর্যালোচনা করে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিচার বিশ্লেষণ করে জবাব প্রদান করতেন যেন প্রশ্নকারীর সম্মুখে এ বিষয়ে জানার আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে। তাঁর প্রদত্ত ফাতওয়াকে Authenticate (প্রামাণ্য) করার জন্য তিনি আল কুরআন, হাদিস এবং ফিকহ ও ফাতওয়া বিষয়ক নির্ভরযোগ্য

ও বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। ইতোপূর্বে আলোচিত তাঁর প্রদত্ত ফাতওয়ায় দেখা যায় যে, তিনি ইমাম ফখরুদ্দিন আল রাযীর প্রসিদ্ধ তাফসির আল কবির গ্রন্থ, ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ আল তিরমিযীর সুনান আল তিরমিযী এবং ইমাম আবু জাফর আল তাহাভীর শরহুল মাআনী আল আছার নামক প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ, ইমাম শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া আল নববীর মুকাদ্দামাতু শর্‌হ আল মুহাযযাব, ইমাম যয়নুদ্দিন ইবনু নাজিম এর আল বাহর, ফাতাওয়া আল আলমগিরিয়্যাহ, ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, আল্লামা আল হাছকাফী (রহ.)-এর দুররুল মুখতার, ইবনু আবিদীন আল শামী-এর রাদ্দ আল মুখতার, আল শায়বানী-এর শরহ্ আল ওয়াহ্বানীয়্যাহ্, ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ এবং আল্লামা শামসুদ্দিন আল খুরাসানী এর জামি আল রমূয শরহ্ আল নিকায়াহ্ প্রভৃতি ফিক্‌হ ও ফাতওয়া গ্রন্থের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, পাক-ভারত উপমহাদেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আল ইফতাচর্চায় আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর অবদান আল ইফতার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করেছে। তাঁর জ্ঞানের পরিমণ্ডল, ফিক্‌হ ও ফাতওয়া বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং আল ইফতায় তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি ও এ বিষয়ে উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ছিলেন আল ইফতার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় আলিমদের অন্যতম।

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) ঐতিহাসিক ভাষণ: মাদরাসা শিক্ষার্থীদের মর্যাদা ও কর্তব্য

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد آپ حضرات جو چٹوں مدرسہ کیمبج طلبای قدیم ہیں آپ کی اس انجمن اور جمعیت
واتحاد کے مقاصد واغراض کا مطالعہ کرکے میں نے آپکے بعض سرگروہ لیڈر کے سامنے گذارش
کی تھی کہ آپکے اس عظیم الشان من حیث الاغراض اجلاس کی صدارت کیلئے کسی قابل ترین
وسیع المعلومات، غائر النظر، حقائق بین اور دور حاضر کے حالات زیر و بم پر آگاہ انسان
کو نامزد کریں۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور اپنی سابقہ رای پر مصر رہے۔

آپکے مقاصد واغراض کچھ ایسے جذب طلب اور رموز آمیز اور واقع ہوئے ہیں کہ
اگر اون کے متعلق کوئی مقرر کچھ بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اسکو مسلمانوں کے دور روشن
اور اسلام کے ایام طلوع وفیاض کے حالات وکوائف کی طرف ایک محققانہ نظر ڈالنی
ہوگی۔ تاکہ وہ آپکے سامنے ان اسرار ورموز کو صحت واقعیت کے ساتھ پیش کریں
جنکی برکت سے وہ دین ودنیا ہر دونوں حیثیت سے اللہ جل شانہ کے محبوب ترین خلائق
تھے اور کامیابی وسرخروئی کے اعتبار سے فائز المرام ترین گروہ انسان تھے۔ کرۂ ارض کے
جس مقام پر وہ قدم رکھتے تھے غلبہ ونصرت، فتح وحکومت، دولت وسیاست، قیادت
وسیادت، شوکت ومحبوبیت اونکے قدم چومتی تھیں۔ جس ملک پر اونکی حکومت قائم
ہوتی تھی وہاں امن وامان، عیش وآسائش، توافر ارزاق اور فراوانی اسباب معاش کا وہ حال
ہوتا تھا جسکی مثال ونظیر نہ مل سکتی تھی رعایا باوجود اختلاف مذہب وبغض وعناد کے اپنی

১৯৬২ সালে তোলাবায়ে সাবেকিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাষণ।

عداوت قدیمہ کو فراموش کرکے اونکی مدح سرائی میں بلبل ہزار داستان بنجاتے تھے - بنی نوع انسان
کی بحث چھوڑئے کواکب وسیارات، مواشی وطیارات، جمادات ونباتات، عناصر وعوامل
جبال وبحور اور وحوش وطیور پر بھی انکی حکومت نافذ تھی - اقوام عالم اونکے عروج بےرفتار سے
حیرت زدہ احبار وعلمای یہود حسد وحیرت سے بے تاب - رہبان نصاری رشک وغیرت میں
بیچو تاب بے آب - سلاطین ارض اپنے مستقبل کی فکر میں بیقرار بیچو سیماب نظر آتے ہیں -
آخر وہ کون سی حقیقت تھی کہ جس نے مافوق العادت برق رفتاری کے ساتھ تلے آسمان
کے بلکہ ورے آسمان تک انکو یوں ابھارا کہ مخلوق کے حوصلے میں اون کے اوپر کوئی اوپر ہی
نہ تھا -

پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی
ستارے جسکی گرد راہ ہوں وہ کاروان تو ہے (اقبال)

خاکم بہ نور نغمۂ داؤد برفروز
ہر ذرۂ مرا بر و بال شرر بدہ (دعای اقبال)

نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں آپ اگر اس سوال کا جواب دیں تو آپکو کہنا ہوگا کہ دور روشن و طلوع ذہبی
اسلام کے 'مومن' تھے بمصداق لاتھنوا ولاتحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین اور
'مسلم' تھے بمصداق یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ - ایمان وعمل بالارکان
کے مجموعہ کا نام اسلام ہے - اور ایمان کے معنی ہیں تصدیق بالجنان پھر تصدیق نام ہے تصور
مع الحکم کا اور تصور مع الحکم مترادف ہے یقین واعتقاد کا - اب واضح ہوگیا اسلام عبادت

১৯৬২ সালে তোলাবায়ে সাবেকিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাষণ।

کسی غرض نفسانی کی خاطر نہ تھے بلکہ انکا تیور ان صلاتی و نسکی و محیای و ممای للہ رب العلمین تھا
اونکے دلوں میں علوم الٰہیات کے ساتھ سوز محبت تھی یعنی جذبات ایمانی موجزن تھے۔ اسلئے اون کے اعضاء
جوارح سے کوئی ایسا کام صادر ہونا مشکل تھا جو رضای الٰہی کا خلاف ہو۔ کیونکہ قلب مدبر جسم ہے۔

علم مسلم کامل از سوز دل ست - معنی اسلام ترک آب و گل ست
چون زبند آب و گل ابراہیم رست - در میان شعلہ ہا نیکو نشست (اقبال)

شعر

طبع مسلم از محبت قاہر ست - مسلم اگر عاشق نباشد کافر ست
تابع حق دیدنش نادیدنش - خوردنش نوشیدنش خوابیدنش

ناشکرگزار

ایسے ہی مسلمانوں کے حق میں حدیث قدسی وارد ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میرا بندہ میری عبادت کرتے کرتے
ایسے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کے
کان بنجاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ میں اسکی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے

؎ چون فنا اندر رضای حق شود + بندۂ مومن قضای حق شود

قولہ تعالیٰ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کے راز کو سمجھ لیجئے۔ حضرت طارق رضؓ اپنی فوج
کو ہزاروں میل کی مسافت پر اندلس میں کشتیوں سے اتارا اور کشتیوں کو آگ لگا کر جلادیا
اونکی فوج بہ نسبت افواج دشمن بہت قلیل تعداد میں تھی اور سامان جنگ کافی نہ تھا۔ ایسی پرخطر
حالت میں کشتیوں کو جلادینا بحفظ جان و سلامتی نفس کا کوئی راستہ باقی نہ چھوڑنا نزد عقل قابل اعتراض تھا
لوگوں نے سوال کیا۔ انکا جواب سن لیجئے۔

P.T.O.

১৯৬২ সালে তোলাবায়ে সাবেকিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাষণ।

طارق چو بر کنارۂ اندلس سفینہ سوخت - گفتند کار تو بنگاہِ خرد خطا ست
دوریم از سوادِ وطن از جوں رسیم - ترکِ سبب ز روی شریعت کجا روا ست
خندید و دست خویش بہ شمشیر برد و گفت
ہر ملک ملکِ ماست کہ ملکِ خدای ماست (اقبال)

الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون

خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے - یقیں پیدا کر اے غافل کہ مغلوبِ گماں تو ہے
جہانِ آب و گل سے عالمِ جاوید کی خاطر - نبوت ساتھ جسکو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے
پرے ہے چرخِ نیلی فام سے منزل مسلماں کی - ستارے جسکی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے

ان ارمان کے مسلمان کیا کبھی کمزور ہو سکتے ہیں - کوئی مادہ پرست طاقت کیا انپر غلبہ کر سکتی ہے ؟ وہ تو خدائی طاقت سے طاقتور ہیں - ہزاروں تاریخی سچے واقعات روز روشن کی طرح واضح ہیں - کہ مسلمانوں نے دس گونہ زائد بلکہ اس سے بھی بہت زائد تعداد کے دشمنوں سے لڑ کر دور دراز ملکوں میں باوجود بے سروسامانی کے غلبہ حاصل کیا ہے حالانکہ دشمن بلحاظ آں زماں خطرناک سامانِ جنگ کے ساتھ آمادۂ پیکار تھے

سے خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو - پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو

نیز

مردِ مومن با خدا دارد نیاز - با تو ما سازیم تو با ما بساز
عزم کو خلاق تقدیر حق ست - روز ہیجا تیر او تیر حق ست

نیز

مرد حر محکم ز ورد لا تخف - ما بمیدان سر بکیف او سر بکف
لا تخف انک انت الاعلی - خوف مت کھا (کیونکہ باطل نتیجۂ کار تو ہی فتحیاب ہوگا

১৯৬২ সালে তোলাবায়ে সাবেকিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাষণ।

کوئی قوم جب ایمانی قوت و استحکام کے ساتھ محکم ہو تو اسکو مادی قوتیں ہرگز مغلوب نہیں
کر سکتیں بلکہ بقاعدہ من له المولی فله الکل ہر قسم کی مادی قوتیں بھی اس قوم کے ہاتھ
آجاتی ہیں۔ مسلمانان دور روشن باوجودیکہ بالکل بے سروسامان تھے تمام بڑی بڑی مادی
طاقتیں اونکے سامنے ہیچ ہوگئیں۔ اور تمام تران ہی کے ہاتھ آگئیں۔ ضیغم اسلام غازی انور
پاشا نے بخارا کو مرکز بنا کر روس کے ماتحت زبردست وسیع علاقے کے مسلمانوں میں تحریک
پیدا کی کہ سبکو اسلامی اخوت و اتحاد میں منضبط کر کے ایک عالیقدر ملت اسلامیہ
استوار کریں اور روس کی بددینیوں اور الحاد نوازیوں، اسلام دشمنیوں سے مسلمانوں کو
چھڑا کر یہاں اسلامی حکومت قائم کریں۔ جہاد شروع ہو گیا۔ عقلای روس نے دیکھا کہ اگر
یہاں کے سب مسلمان متحد ہو جائیں اور اونکے دلوں میں جذبات قرآنی زندہ ہوں پھر اون سے
مقابلہ کرنا محال ہے۔ انہوں نے خفیہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں شروع کیں * ہر ہر مسلمان علاقے
کے ایک ایک دولتمند سردار سے مل کر کہا کہ آپ اپنے اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لیجئے
ہم آپ کی تائید میں ہیں۔ مستقل آزاد حکومت و سلطنت آپکی ہوگی۔ آپ کیوں اپنی ہستی کو انور پاشا
کی تحریک میں گم کر دیں۔ ؟ اونکے پھسلانے میں سب آگئے۔ دس بارہ چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتیں
اور سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ ترکمانستان، قازقستان۔ تاجیکستان، ازبکستان، کرغیزیہ،
تاتارستان، آذربائیجان وغیرہا قبائلی ریاستیں ہیں۔ انور پاشا کے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ اور
باقی سب مسلمان حرص و آز کے پھندے میں پھنسے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انور پاشا ان درندوں کے ہاتھ شہید ہوئے
اور تحریک ملت اسلامیہ ختم شد۔ ان آزاد سلطنتوں کا یہ حال ہے کہ کس موسم میں کس زمین پر کونسی
زراعت ہوگی اسکی اجازت و حکم بھی ماسکو سے حاصل کرنا لازم۔ تمام مدارس بند۔ اسلامی تعلیم معدوم

১৯৬২ সালে তোলাবায়ে সাবেকিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাষণ।

بڑی بڑی مساجد جامعہ سینما ہال بنے ہوئے ہیں - جو ممنوع - مسلمان عالم سے تعلقات ممنوع نعوذ باللہ منہا - انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے - ایسا کیوں ہوا ؟ اسلئے ہوا کہ ان مسلمانوں میں ایمانی قوت و استحکام نہ رہنے کے سبب وہ محکم نہ تھے - بندۂ حرص آز ہو کر سلطنت کے نشہ میں چور ہو گئے - اور برباد ہوئے - اگر محکم باستحکام ایمانی ہوتے تو چالبازان روس کی مکاری میں نہ آتے اور ملت اسلامیہ قائم ہو جاتی - اسوقت روس کی سلطنت و قوت اس ملت اسلامیہ کے آگے ایک چیونٹی پر سی جاتی - اس ایمانی قوت و استحکام کے نہ رہنے سے یہ لوگ کمزور و ضعیف تھے اور قاعدہ ہے پھر یہ قاعدہ ہر طبقہ کے مخلوق میں رائج ہے کہ کمزور زور آور کا لقمہ بنے - ادنی اعلی کے حق میں فنا یا کا لقمہ ہو جائے - حیوانات کو انسان کھا جائے چھوٹے اور کمزور حیوانات کو بڑے حیوانات کھا جائے - چنانچہ مچھلیوں سانپوں - جنگلی درندوں بلکہ نباتات میں بھی یہی دستور جاری ہے - مولانا روم فرماتے ہیں

ع - جملہ عالم آکل و ماکول دان -

بہرکیف استحکام و قوت و اقتدار و غلبہ اور فتح و نصرت محکم مسلمانوں کا حق ہے - کمزوری اور ضعیفی و ناتوانی ایک فوری موت کا پیغام ہے -

تقدیر کے قاضی کا یہ فتوی ہے ازل سے
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات

مسلمان کا اپنی عالمگیر اخوت و قومیت اسلامیہ کو فراموش کر کے بندۂ حرص و آز ہو کر قبائلی عصبیت اور نسلی و لسانی و وطنی تفریقات میں پھنس جانا اپنی ہلاکت کو بلا لینا ہے اور فلک الافلاک سے تحت الثری میں انحطاط کرنا ہے - اس باب میں علامہ اقبال رح بتاتے ہیں

১৯৬২ সালে তোলাবায়ে সাবেকিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাষণ।

غبار آلودۂ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے - تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا
یہ ہندی وہ خراسانی یہ تورانی وہ ایرانی - تو اے شرمندۂ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا
بتانِ رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا - نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

نیز

؎ فارغ از بابِ دام و اعمام باش ؎ ہمچو سلمانؓ زادۂ اسلام باش

حضرت سلمان فارسی رضؓ سے جب ان کا شجرۂ نسب دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواباً فرمایا
سلمان بن اسلام -

ملت اسلامیہ کی روح پرور و سرابہار عالمگیر اخوت و قومیت سے منحرف ہو کر قبائلی علاقہ داری عصبیت اور لسانی و نسلی و وطن پرستی کے دلدل میں پھنس جانا صرف نفسانی اغراض و غیر مسلمانہ کم نظری و ہوس پرستی کے سبب ہوتا ہے - فرنگی لوگ جو سیاسی قمار بازی و مکاری میں نہایت ہشیار و عیار ہیں خوب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ جہانگیر جاذب عالم اخوت و ملت اگر یوں بحال رہی تو دنیا کی تمام طاقتیں ایکدن انکے سامنے سرنگوں ہو جائینگی - ادھر ان نباضوں نے مسلمانوں کی ایمانی قوت و جذبات اخلاص میں جو فتور آ گیا تھا اسکو بھی تاک لیا - ایسی سازش کی اور پھسلایا کہ انکو حرص و آز خود پرستی و عصبیت و قبائلیت کے نشے میں مست بنا دیا - اور اس ملت کو بہت سے ٹکڑوں میں بانٹ دیا - عرب کو پھر سنگاپور - جاوا سماترا وغیرہا جزائر کو دیکھئے چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بانٹکر اور کمزور بنا کر مدتوں سے اوپر سرداری کرتے رہے - نبض شناس علامہ اقبال رح نے فرنگیوں کی مکاری کے باب میں کہا -

فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ - فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ
عالم ہمہ ویران ز چنگیزی افرنگ - معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز
از خواب گران خواب گران خواب گران خیز
از خواب گران خیز -

১৯৬২ সালে তোলাবায়ে সাবেকিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাষণ।

اسلام کے مسلم الکل واضح راستہ چھوڑ کر غلط راہوں میں بھٹک جانا اور طرح طرح کی پریشانیوں اور مذلتوں میں مبتلا ہونے سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے لا تھنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اور اعدائے اسلام کی سازشوں اور سحر سازیوں کے متعلق بھی ہشیار فرما دیا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواھھم الایہ اور عالمگیر اخوت اسلامی کی طاقت سے طاقتور ہونیکی طرف رغبت دلائی گئی ہے ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی ودین الحق لیظھرہ علی الدین کلہ - مگر افسوس ہم تو یوں بھٹک گئے کہ واپس لوٹنے کا نام ہی نہیں لیتے

؎ اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں
اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ میں چلنا چھوڑ دیا

مسلمانوں میں جب تک خدا طلبی رہی دنیا لوٹ پوٹ ہو کر انکی قدم چومتی رہی - اور جب مسلمانوں نے دنیا طلبی شروع کردی تو دنیا ان سے دور بھاگی - ان الارض یرثھا عبادی الصٰلحون - وکلمۃ اللہ ھی العلیا لگ لگ کہو نہ لگے - مت لگ کہو تو لگے - کرۂ ارض پر مسلمانوں کی حکومتیں شمار میں کم نہیں ہیں - مگر سب کمزور اور بڑی طاقتوں کے دست نگر - اگر آج بھی انکے آپس میں رابطۂ اتحاد و ملت اسلامیہ استوار ہو جائے تو رنگ ہی بدل جائے دنیا کا -

اب لیجئے آپ کی انجمن کے مقاصد میں جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے چنتی حکیمیہ سینیئر مدرسہ کے معیار تعلیم کو یوں ترقی دیجائے کہ اس سے ایسے ذی استعداد علماء پیدا ہوں جو زبان و قلم سے مسلمانوں کو دور حاضر کی مغربیت زدگی و لادینیت سے محفوظ رکھنے کے قابل ہوں - مادہ پرست کج شعور انسانوں کے بیجا اعتراضات اور بے محل تجاویز و بیانات کے کما حقہ صحیح و درست ترکی بترکی جوابات اور دندان شکن تردیدات پیش کر سکیں - میں آپکو آپ حضرات کی عالی ہمتی اور بلند حوصلگی پر مبارکباد کہتا ہوں - اور دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ آپکو توفیق دے

১৯৬২ সালে তোলাবায়ে সাবেকিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাষণ।

آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ادیان قبل از اسلام کا یہ حال رہا کہ اون کے انبیائے مرسلین دنیا سے رخصت ہو کر ایک صدی کا زمانہ گذرنے نہ پاتا تھا کہ مذہب اور اسکی آسمانی کتاب میں ہزاروں مداخلت بیجا اور تحریفات و تلبیسات واقع ہو کر وہ مخزن الاباطیل والاغلاط بن جاتی تھی۔ اسکی اصلی صورت یوں مسخ ہو جاتی تھی کہ اسکا تصور تک ممکن نہ تھا۔ بخلاف مذہب اسلام کے کہ آج ڈیڑھ ہزار سال کا طویل زمانہ گذر رہا ہے مگر کیا مجال کہ اسکی کتاب یا اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرمو برابر فرق آئا۔ خود خدائے قدوس نے وعدۂ منصوص فرما دیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اور مسلمانوں پر لازم کر دیا ہے کہ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنکر۔ ظاہر ہے کہ دعوت الی الخیر کا مقدمہ و موقوف علیہ یہی ہے کہ اس خیر کی کما حقہ حفاظت ہو اور خیر سے مراد مذہب حق (اسلام) اور اسکی کتاب قرآن ہے۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مراد تبلیغ و اشاعت اسلام ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ فلیبلغ الشاھد الغائب۔ بلغوا عنی ولو آیۃ وغیرہا پھر ادھر تنبیہ و تہدید ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ادھر حکم ہے کہ تبلیغ کرو۔ اور اُدھر حکم حتمی ہے کہ ایک حرف بھی غلط یا جھوٹ نہ ہونے پائے۔

اعدائے اسلام اسلام و مسلمین کو مٹانے کی غرض سے زبان و قلم، سنان و علم سب کچھ استعمال کیا۔ تخریبی تدابیر میں انہوں نے جسقدر ہو سکتی تھی اس میں کوئی کسر نہ رکھی گئی۔ اب مسلمانوں میں محافظین و مجاہدین اسلام بھی دو فریق ہو گئے اول اصحاب العلم والقلم دوم ارباب السیف والعلم۔ فریق اول نے اعدائے اسلام کی دروغ بافیوں اور بے اصل اعتراضوں کا یوں استیصال کیا کہ وہ لوگ قرناً بعد قرن جدوجہد کے بعد بالآخر مبہوت اور ہکے بکے ہو گئے۔ ادھر کتاب و سنت تھی اور آثار و روایات الصحیح اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نگہبانی کی کہ دنیا کی نظر کے سامنے انکو روشن آفتاب کی طرح بے داغ نمایاں کر دیا۔ اور اہل عالم کے روبرو اسلام کی کھلی دعوت کا اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ دیگر ادیان کی تحریفات

১৯৬২ সালে তোলাবায়ে সাবেকিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাষণ।

وتلبیسات کی دھجیاں اڑا دیں اور انکا کچا چٹھا نکالدیا - معاندین اسلام کے بڑے بڑے
عقلاء وحکما کو مجبوراً اعتراف کرنا پڑا کہ قرآن تحریف سے پاک اور آثار رسول تمام نقائص سے مبرا ہیں
مارگولیس جیسا معاند وحاسد مؤرخ کو کہنا پڑا کہ میں نے تمام بانیان مذاہب کے احوال پر محققانہ
نظر ڈالی مگر افسوس کہ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے - اور اگر کہیں ذرا سی جھلک محسوس ہوئی بھی
اس سے فائدہ اٹھانا مشکل تھا - ہاں جب میں نے پیغمبر اسلام کے احوال کی طرف توجہ ڈالی
تو دیکھا کہ یہاں سب کچھ بالکل واضح اور روشن ہے - یہاں ہر چیز روشن ہے نہ کوئی خود یہاں
دھوکہ کھا سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے -

فریق ثانی اعنی ارباب السیف والقلم نے بڑی بڑی ہزاروں سال کی پرانی مادی طاقتوں کے
سامنے ایسی داد شجاعت دی اور جان نثاری کا وہ جوہر دکھایا کہ دشمنان اسلام حیرت زدہ وششدر
تھے - اونکے آزمودہ کار جہاندیدہ افسروں کو اقرار کرنا پڑا کہ یہ مسلمان اگرچہ ظاہری مادی طاقت کے اعتبار
سے کچھ قابل ذکر نہیں ہیں - لیکن اونکے سینوں کے اندر ایسی چیز موجود ہے جسکے ہوتے ہوئے وہ کبھی
مغلوب یا فنا نہیں ہو سکتے ہیں - مخفی نہ رہنا چاہئے کہ یہ ارباب سیف مجاہدین ان ہی اہل علم و قلم کے
تربیت وتعلیم دادہ وزائیدہ ہیں - انہیں حضرات نے انکے سینوں کو آباد کیا اور جذبات ایمانی
وانوار روحانی کی آماجگاہ بنا دیا - لہذا ثابت ہو گیا کہ قوم وملت مذہب ودین کی حفاظت وترقی
کی جڑ علم ومعرفت ہے اور بس دیگر اسباب عروج علم ہی کے زائیدہ ہوں گے - یہی سبب ہے کہ کتاب اللہ
اور سنن رسول میں علم کی اسقدر تاکید وترغیب اور فضیلت وتوصیف دیکھتے ہیں - علم جان ہے
زندگی ہے حرکت من الظلمۃ الی النور ہے اور حرکت ایک فعل ہے پس علم وعمل کی وابستگی نشاط ہے
خیالی نہیں ہے - علم وعرفان سریر آرائے قلب ودماغ ہے اسکا جلوہ قال وحال گفتار وکردار میں ہے
مگر یہ قال وگفتار بغیر کردار کے مذموم وبے اثر ہے - لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتا عند اللہ

১৯৬২ সালে তোলাবায়ে সাবেকিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাষণ।

الناس بهوى تلبسوا انفسكم ؟ (اقبال)

واعظ قوم ہیں وہ لذت خیالی نہ رہی ✦ برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی
رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی ✦ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی

واعظ و مبلغ کے دل خود جذبات ایمانی سے پر شہود اور لذت اعمال کے مشتاق نہ ہو تو غیروں کو وہ کیونکر پابند اعمال بننے کا شوق دلاوے۔ "از دل خیزد بر دل ریزد" بات جو دل سے نکلتی ہے وہی دل کو لگتی ہے۔ حسن بیان و فصاحت لسانی کے سبب جو جوش و خروش دیکھتے ہیں یہ اثر نہیں ہے ایک فوری کیفیت سریع الزوال ہے

کیا یہ علم ہمارے اندر موجود ہے ؟ اگر ہے تو پھر عزت و عظمت اور قوت و اقتدار سب کچھ ہم سے کیوں چھن گیا ؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم کیا جو علم مطلوب ہے وہ ہمارے پاس ہے ؟ اور جو علم ہمارے پاس ہے وہ مطلوب و وسیلۂ فلاح ہے ؟ ایکو ما نتا ہی پڑیگا کہ واقعی نہیں ہے۔ اگر ہزاروں میں دو چار ایسے اوصاف کے کاملین بھی تو وہ الشاذ کالمعدوم ہیں۔ تاہم ایسے حضرات کے اثر و توجہ اور ملفوظات و مکتوبات سے مسلمانوں میں کچھ تو رمق جان محسوس ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں درسگاہوں کی عمومی حالت کے متعلق کہ یہ سب ہماری تشنگی کو بجھانے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے زنده طلبہ و زنده علما کی جنکے انفاس سے قوم و ملت کو سیرابی و سرشاری حاصل ہو۔ اب تو ہمارا یہ حال ہے

تو در دل نالۂ زارے نداری ✦ کہ در تن جان بیدارے نداری
درین گلشن کہ چینی حلال ست ✦ تو زخمے از سر خارے نداری

১৯৬২ সালে তোলাবায়ে সাবেকিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাষণ।

× اندر

موجودہ ملت اسلامیہ کے جان ڈالنے کیلئے ایسے برگزیدہ ہستیوں کی ضرورت ہے جو:-

ے ضمیر سے جو نا پیدا کنار ہے - دل ہر قطرہ موج بیقرار ہے

اور وہ حضرات مرد مسلمان ہونا چاہئے:-

ے چہ باید مرد! طبع بلند ہے مشرب ناب ہے - دل نہ ترسے نگاہ پاک بینے جان بے تاب

آپ طلبائے سابقین مدرسہ حکیمیہ چونکہ آپ حضرات ماشاء اللہ سب ہی ممتاز علماء ہیں - آپ کو تو ہم قدیمی محبت و پیار کے سبب طلبا کے خطاب سے بلا رہے ہیں - ہم آپ کے بہت ہی شکر گذار ہیں کہ آپ ہمارے بعض پرانے خوابوں کو جو ابتک رویا ہی رویا رہ گئے تھے واقعیت کا جامہ پہنانے کے عزم مصمم کر چکے ہیں - ہم نے آپکے سامنے مسلمانوں کی تشنگی اور احتیاج و نقائص کی نوعیت کو اپنی ناقص سمجھ اور تجربہ کے بموجب ظاہر کر دیا ہے - اب آپ پر لازم ہے کہ بیان کردہ نقص و کمی کو پورا کرنے کیلئے جو لائحہ عمل کارگر ہو اسکی تشکیل فرمائیں -

میں اس متعلق آپکو چند باتیں بحیثیت مشورہ عرض کر رہا ہوں - (۱) آپ کی انجمن کے مقصد اعظم و اہم جسکے حق میں ابھی بحث ہو چکی اسکی اہمیت کو آپ حضرات کما حقہ تصور کر لیں - درحقیقت یہ ایک خالص مذہبی غیر سیاسی معنوی انقلاب کی دعوت ہے - موجودہ دور کے مسلمانوں کے دینی حالات کا جائزہ لینے سے اور فرقہ ہائے باطلہ نیز دہریت و لادینیت نواز گروہوں کی اسلام دشمنی کو معائنہ کر کے آپکو اسکی ضرورت محسوس ہوئی - جو شرعی حیثیت سے بھی لازم ہو چکی ہے - پس آپ سمجھ لیں کہ کسی انقلابی تحریک میں جو مردان کار محرک اول ہونگے اونکے عزم و ارادہ اسقدر پختہ اور اٹل ہونا ہے کہ ہر ایثار کے موقع اور ہر دفع موانع کی منزل پر پوری جمعیت و استقلال سے پیشقدمی کریں - (۲) جس تعلیمگاہ کو آپ مرکز عمل قرار دیکر کام شروع کریں اسکے متعلق امور مندرجہ کی تحقیق و تصدیق حتمی لازم ہے (الف) اسکے نظام مالیات، نظام تعلیم، نظام تربیت اطفال پر آپکو حتمی استمراری اقتدار ہو رسمی اکثریتی نہیں - ایسا نہ ہو کہ پرواز شروع ہو کر یا کسیقدر اقدام کے بعد شرر انگیز فتنہ ابھرے اور تمام سعی و اجتہاد درہم برہم ہو جائے - (ب) وہ درسگاہ فی الحال ٹائٹل کلاسوں تک ترقی یافتہ ہو فیہا × الا غیر مہم عجلت کے با اسکو اس منزل تک پہونچانا ہے (ج) مدرسہ میں تعلیم و تربیت اخلاق دونوں کی بالکل برابر اہمیت ہو (د) اسلوب تعلیم کی × مدرسہ میں جدید نافذ شدہ اسلوب تعلیم کے قادق مسلمین کا نقیر ہے

تیسرا ہدف اعدادی ہو × (۳) کتبخانہ مدرسے کے علاوہ ایک الگ فیض بار کارآمد قوی دار الکتب والمطالعہ کی تاسیس ہو جسمیں

১৯৬২ সালে তোলাবায়ে সাবেকিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাষণ।

دور جدید و قدیم کے خلاف اسلام کے رسائل و کتب اور انہی مدافعت میں دور جدید و قدیم کے رسائل و کتب کا ذخیرہ
ہو مناظرہ اور دیگر فنون ضروریہ کی کتابیں نیز احادیث و تفاسیر و شروحات اور سیر و تواریخ کے ذخیرے کافی ہوں۔ پھر اسکے
ضمن میں ایک دار التصنیف ہو اور اسکا انتظام ایک ذی استعداد صاحب طول باع وسیع المعلومات شخص کا حوالہ ہو
(۲) عالم سے کامل تک کے طلباء کے اوقات فرصت میں حسب حیثیت مطالعہ کا فہمان و انتظام ہو۔
(۳) مدرسہ کے سرکاری فنڈ کے علاوہ ایک الگ قومی فنڈ کافی مقدار میں ہو اور روز افزوں اضافہ اسمیں ہوتا رہے
(۵) انجمن طلبای قدیمہ کی حمایت میں ایک جمعیۃ الاخوان کی تاسیس ہو۔ اسمیں طلبای قدیمہ لازماً ہونگے اونکے علاوہ
عوام مسلمین و دیگر علما و فضلا ممبر رہ سکینگے۔ اس جمعیت کے مقاصد (الف) انجمن طلبای قدیمہ کی حمایت و اعانت
(ب) تبلیغ و اشاعت (ج) دار الکتب والمطالعہ کی توسیع (د) قومی فنڈ کی تقویت وغیرہا ہونگے۔
(۶) جمعیت الاخوان کی ممبری کیلئے فیس داخلہ متعین ہو۔ پھر ہر ممبر کی مالی مقدور کے مناسب ماہوار چندہ مقرر ہو۔

اب میں اپنا کلام ختم کرتا ہوں۔ آپ خود جب کام کرینگے اپنا تجربہ و ضرورت کی بنا پر دفعات کے محو و اثبات
و اضافہ کرینگے۔ میں نے تو بطور نمونہ ایک تصوراتی تصویر کھینچی ہے جو بر وقت مزید فنون یا ناموزوں ہو سکتی ہے۔
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین۔ اللھم وفقنا لما تحب و ترضی۔

احقر العباد ابو ... محمد فضل اللہ
... سالکانہ - جالندھر

১৯৬২ সালে তোলাবায়ে সাবেকিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অভিভাষণ।

উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক ভাষণের বঙ্গানুবাদ (১৯৬২ খৃস্টাব্দ)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম

আম্মা বাদ, আপনারা যাঁরা এই চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র, আপনাদের এই সংগঠন এবং একতা ও ঐক্যবদ্ধতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ পাঠ করে আমি আপনাদের কোনো কোনো দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের সামনে বলেছিলাম যে মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে আয়োজিত, আপনাদের এই সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে যেনো সুযোগ্য, প্রাজ্ঞ, দূরদর্শী, চক্ষুষ্মান ও সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সম্যক অবগত কোনো প্রখ্যাত মনীষীর নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত না করে পূর্বসিদ্ধান্তের ওপরই অটল থাকলো।

আপনাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলোতে প্রকৃতপ্রস্তাবেই এমন কিছু আলোচনাসাপেক্ষ ও বিশ্লেষণনির্ভর বিষয় রয়েছে যে, কোনো আলোচক যদি ওসবের ওপর আলোকপাত করতে চান, তখন তাকে অবশ্যই মুসলমানদের সোনালি যুগ এবং ইসলামের প্রত্যুষকাল ও প্রথম যুগের অবস্থা ও পরিস্থিতির ওপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে। যাতে তিনি আপনাদের সামনে ওসব রহস্য ও গোপন কথা যথার্থ ও সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেন, যার বদৌলতে তাঁরা দ্বীন-দুনিয়ায় উভয়জগতে আল্লাহপাকের প্রিয় বান্দা ছিলেন। কামিয়াবি ও সাফল্যের মাপকাঠিতে যথেষ্ট কামিয়াব ও সফল এক মানবগোষ্ঠী ছিলেন।

পৃথিবীর যেখানেই তাঁরা পা রাখতেন, বিজয় ও সাহায্য, জয় ও শাসনভার, রাজ্য ও রাজনীতি, নেতৃত্ব ও সরদারি, গৌরব ও প্রিয়তা তাঁদের পায়ে চুমো খেতো। যে দেশে তাঁদের শাসন কায়েম হতো, সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা, জীবন-জীবিকা, রিজিক ও জীবনোপকরণ এতোই সহজলভ্য হয়ে যেতো যে, পৃথিবীর আর কোথাও তার উদাহরণ পাওয়া ছিলো দুষ্কর। ধর্মের ভিন্নতা, হিংসে-বিদ্বেষ সত্ত্বেও আমজনতা নিজেদের পুরনো শত্রুতা ভুলে তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো। মানুষের কথা না হয় বাদই দিলাম। গ্রহ-নক্ষত্র, ভূচর-খেচর, জড়-উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গ, গিরি-সমুদ্র ও পশুপাখির ওপরও তাঁদের হুকুমত চলতো। পৃথিবীবাসী তাঁদের বিদ্যুৎগতির উন্নতিতে বিস্মিত, ইহুদি পাদ্রীরা হিংসা ও ঈর্ষায় অস্থির, খৃস্টান পোপেরা গা জ্বলুনির কারণে পানিহারা মাছের মতো, রাজ্যপতিরা নিজেদের স্থিতির চিন্তায় পারদের মতো স্থৈর্যহারা! যাইহোক, কী এমন যাদু ছিলো, যা তাদের এই ভূমণ্ডলে নয় বরং নভোমণ্ডলেও পৌঁছে দিয়েছিলো অকল্পনীয় উন্নতি-উৎকর্ষের শিখরে। যার 'পরে আর উপর নেই।

پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی
ستارے جسکی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے (اقبال)

নীলিমায় ছাওয়া আজ গন্তব্য মুসলমানের
নক্ষত্র যার পথের সাথী, সে কাফেলা তুমিই! *(আল্লামা ইকবাল)*

خاکم بہ نور نغمۂ داود بر فروز — ہر ذرۂ مرا پر و بال شرر بدہ (دعای اقبال)

মাটি আমার উঠলো জ্বলে দাউদের গানে

আমার প্রতি জাররা-অণু বিপদগ্রস্ত! *(আল্লামা ইকবালের প্রার্থনা)*

খুব অল্পকথায়, যথার্থ শব্দে যদি আপনারা তার উত্তর দেন, তখন অবশ্যই বলতে হবে, ইসলামের সোনালি ও প্রাথমিক যুগের মুমিনেরা ছিলেন ' لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين'[১] 'ভেঙে পড়ো না, চিন্তা করো না, তোমরাই হবে বিজয়ী; যদি মুমিন হও!'– এ আয়াতের বাস্তব নমুনা।

এবং মুসলিমেরা ছিলেন 'يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة'[২] 'হে বিশ্বাসীগণ, ইসলামে প্রবেশ করো পরিপূর্ণ রূপে'-এ আয়াতের দৃষ্টান্ত।

ঈমান-আমল বা বিশ্বাস ও কর্মের সমষ্টির নামই ইসলাম। এবং ঈমান বা বিশ্বাস বলা হয় অন্তরের বিশ্বাসকে; আর তাসদিক বা বিশ্বাস হলো– তাসাউওর মাআল হুকুম বা কর্মসহ কল্পনা। কর্মসহ কল্পনা বিশ্বাস ও আস্থার সমার্থক। অতএব, স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইসলাম বলা হয়, ইলম-আমল বা জ্ঞান ও কর্ম অথবা একিন-আমল বা বিশ্বাস ও কর্ম অথবা আকায়েদ-আমাল বা যাবতীয় বিশ্বাস ও সমস্ত কর্মকে। ঠিক এই কারণেই, আপনারা দেখবেন, পবিত্র কুরআনের যেখানেই ঈমান বা বিশ্বাসের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, সেখানেই সাথে-সাথে 'আমলে সালেহ' বা সৎ কর্মেরও দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

"ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون"[৩]

'অতপর তাকে আমি পাতালে নিক্ষেপ করেছি কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ প্রতিদান'। এখানে 'আজর' বা প্রতিদান থেকে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় প্রতিদানই উদ্দেশ্য। এখানে তাখসিস বা বিশেষ কোনো (পার্থিব অথবা পারলৌকিক) প্রতিদানের কথা বলা হয়নি।

"وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما"[৪] ' যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহপাক তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা এবং মহা পুরস্কারের।' অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

" من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون"[৫] 'যারা ঈমান আনলো আল্লাহ ও পরকালের ওপর এবং যারা সৎকর্ম করলো, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রতিদান; এবং তাদের কোনো ভয় নেই, তাদের কোনো চিন্তা নেই।' অর্থাৎ: না পৃথিবীতে, না আখিরাতে।

---

[১] আলে ইমরান-১৩৯।

[২] আল-বাকারা-২০৮।

[৩] আত-তীন-৪, ৫, ৬।

[৪] আল-হুজুরাত-২৯।

[৫] আল-বাকারা-৬২।

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز " الكبير"[১] " *নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে,* তাদের জন্যে রয়েছে উদ্যান, যার তলদেশে প্রবহমাণ ঝরণা; সেটাই মহান বিজয়।' এ আয়াতে পরকালীন প্রতিদানের কথা উল্লেখ রয়েছে, এবং 'জান্নাত' এর অর্থে ব্যাপকতা উদ্দিষ্ট হলেও সমস্যা নেই। যেহেতু খোদার করুণারাজিতে কোনো সীমাবদ্ধতা বা সংকীর্ণতা নেই। এবং

"والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات"[২] 'সময়ের কসম, নিশ্চয় মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে।' এ আয়াতে সৎকর্মশীল মুমিনেরা ক্ষতিগ্রস্তদের থেকে মুস্তাসনা বা পৃথক। অতএব তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়, না দুনিয়াতে আর না আখিরাতে। এবং উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়াটাই প্রকৃত বিজয়, সাফল্য ও দোজাহানের সৌভাগ্য।

আপনারা ভালো করেই জানেন যে, আল্লাহপাক রাসুল সা. কে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর ওপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এর হিকমত ছিলো এ যে, তিনি যেনো কুরআনের আদর্শকে প্রায়োগিক পোশাক পরিয়ে পৃথিবীবাসীর জন্যে একটা উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে দেন, যার অনুসরণ করে সারা বিশ্বের মানবমণ্ডলী মানবীয় সহজাত মর্যাদা নিয়ে জীবনযাপন করতে পারে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, "إنك لعلى خلق عظيم"[৩] 'নিশ্চয় আপনি সর্বোত্তম আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত।' এই 'খুলুকে আজিম' এর ব্যাখ্যায় হযরত আয়েশা রা. বলেন, " كان خلقه القرآن" 'তাঁর চরিত্রই ছিলো আল কুরআন'। সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কথা শুনেছেন এবং বিশ্বাস করে নিয়েছেন। প্রতিটি কাজ দেখেছেন এবং আত্মস্থ করে নিয়েছেন। অতপর তাঁর এমন অনুসরণ করেছেন যে, বিন্দুমাত্রও বাদ দেননি।

আমিরুল মুমিনিন হযরত উমর রা. এর হাতে যখন মুসলমানেরা খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করলো, এবং তিনি মুসলমানদের খলিফা নির্বাচিত হলেন, তখন তিনি একটি ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে হামদ ও সালাতের পর বললেন, আজ তো আমি খেলাফতের আসনে সমাসীন, যাবতীয় সামর্থ্য ও এখতিয়ার আমার হাতেই রয়েছে। এখন আমি যদি কোনো বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত কিংবা প্রথম খলিফার পদ্ধতির অনুসরণ না করি, তখন তোমরা কী করতে পারো? সাথে-সাথেই একজন গ্রাম্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে খাপ থেকে তরবারি বের করে বললো, এ তরবারি দিয়ে তোমার ঘাড় উড়িয়ে দেবো। হযরত উমর রা. তখন আনন্দের আতিশয্যে হেসে দিয়ে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, ইসলাম এখনো জীবন্ত আছে। (অথবা তিনি যেভাবে বলেছেন)

এমনই ছিলো তাঁদের অনুসরণস্পৃহা, যার কারণে তাঁদের মধ্যে প্রেমাস্পদ ও প্রিয়তার গুণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। যেখানেই গিয়েছেন, আল্লাহর সাহায্য তাদের সহযোগিতা করেছে।

---

[১] আল-বুরুজ-১১।
[২] আল-আসর-১, ২, ৩।
[৩] আল-কলম-৪।

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله"[১] ' হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো; তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।' এঁরা সবাই ছিলেন 'আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবে' এর উদ্দিষ্ট শ্রেণি। অতপর তাবেঈগণ সাহাবিদের ও তবে-তাবেঈগণ তাবেঈদের অনুসরণ করেছেন। এ মহান মানুষেরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার অনুসারী এবং রাসুল সা.-এর আদর্শের বাস্তব চিত্র হয়ে পৃথিবী নামক এই কর্মস্থলে মহান আল্লাহর কলিমাকে সমুন্নত করার প্রত্যয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের প্রতিটি কাজই ছিলো প্রিয় ও আকর্ষণীয়। তাঁদের অভ্যাস ছিলো হৃদয়গ্রাহী। ঈমান-আস্থা, ভ্রাতৃত্ব-একতা, সাম্য-সহমর্মিতা, পরোপকারিতা-হিতৈষিতা, আমানত-বিশ্বস্ততা, সততা-ভালোবাসা, দুনিয়াবিমুখতা-খোদাভীরুতা, প্রভুভক্তি-উপাসনা, প্রতিজ্ঞা-স্থিরতা, দানশীলতা-সাহসিকতা, সাম্য-ইনসাফ, দয়া-করুণা, উপদেশ-শুভাকাঙ্ক্ষা, লেনদেনের সুন্দরতা, স্বচ্ছতা ও কৃতজ্ঞতা, সামাজিক শিষ্টাচারসহ ইসলামের সকল সৌন্দর্য তাঁদের জীবনযাপনে প্রতিফলিত হয়েছিলো। তাঁদের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সংগ্রাম-লড়াই এর কোনোটাই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিলো না; বরং তাঁদের স্বভাবই ছিলো, " قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين"[২] 'বলুন হে নবী, নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আল্লাহরই জন্যেই নিবেদিত, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।' তাঁদের হৃদয়ে ঐশি ইলমের সাথে-সাথে ভালোবাসার জ্বলন অর্থাৎ ঈমানি উচ্ছ্বাসের ঊর্মিমালাও ছিলো। এজন্যেই তাঁদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি হয় এমন কোনো কাজ সংঘটিত হওয়া ছিলো অসম্ভব। যেহেতু হৃদয়ই মূলত মানুষের শরিরের চালিকাশক্তি।

علم مسلم کامل از سوز دل ست　　معنی اسلام ترک آفل ست

چوں زبند آفل ابراهیم رست　　درمیان شعله ها نیکو نشست (اقبال)

হৃদয়-জ্বলন পূর্ণ করে মুসলমানের জ্ঞান/ পড়ে যাওয়ার ভয় পরিহার করা-ই ইসলাম!

ইবরাহিম গেলেন যখন ভয় ছাড়া পড়ে/ স্ফুলিঙ্গের মাঝেই থাকেন আরামে বসে ! (আল্লামা ইকবাল)

অন্যত্র রয়েছে-

طبع مسلم از محبت قاهر ست　　مسلم از عاشق نباشد کافر ست

تابع حق دیدنش نادیدنش　　خوردنش، نوشیدنش، خوابیدنش

মুসলমানের প্রকৃতি আজ প্রেমবৈরী/ যে মুসলিম প্রেমিক নয়, সে অবিশ্বাসী!

আল্লাহপ্রেমিক দেখে না তো নিজে কভু/ তার পানাহার, তার ঘুমানো করান প্রভু!

---

[১] আলে ইমরান-৩১।

[২] আল-আরাফ-১৬২।

এমনিভাবে মুসলমানদের ব্যাপারে হাদিসে কুদসিতে আল্লাহপাক বলছেন, আমার বান্দা, আমার ইবাদত করতে করতে এমন উচ্চপর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, সেখানে আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার জিহ্বা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে কথা বলে।

چوں فنا اندر رضائے حق شود بندۂ مؤمن قضائے حق شود

'যখন প্রভুর জন্যে মুমিন ফানা হয়/ মুমিন তখন আল্লাহপাকের 'ইচ্ছা' হয়!

আল্লাহপাকের বাণী "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"[১] 'আপনি নিক্ষেপ করেননি, যখন আপনি নিক্ষেপ করেছেন; বরং আল্লাহতাআলাই নিক্ষেপ করেছেন।' এর রহস্য বুঝে নেয়া যাক। হযরত তারেক রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় সৈন্যদলকে স্বদেশ থেকে বহু মাইল দূরের স্পেনে নৌকা থেকে নামিয়ে নৌকাগুলো জ্বালিয়ে দিলেন। তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিলো শত্রুবাহিনীর তুলনায় খুবই কম। যুদ্ধাস্ত্রের অনুপাতও ছিলো এমনই। এমন এক বিপদজনক পরিস্থিতিতে নিজেদের নৌকাগুলো জ্বালিয়ে দেয়া। প্রাণরক্ষা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কোনো কৌশল না রাখা ছিলো সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিবিরুদ্ধ কাজ। বাকি লোকেরা এ সিদ্ধান্তের কারণ জিজ্ঞেস করলে, তারেক রাদিআল্লাহু আনহু কী বলেছিলেন শুনে নেয়া যাক:

طارق چو بر کنارۂ اندلس سفینہ سوخت گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست

در رویم از سواد وطن باز چوں رسیم ترک سبب ز روی شریعت کجا رواست

خندید و دست خویش بہ شمشیر بر دو گفت

ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست (اقبال)

তারেক যখন জ্বলিয়ে দিলেন স্পেনের কূলে নাও
বললো সবাই আপনার এ কাজ ভীষণ ভুল বুদ্ধিমতে
স্বদেশ থেকে দূরে আমরা, ফিরবো এখন কী করে
মাধ্যম বাদ দেয়া বলেন বৈধ কোথায় শরিআ'তে?
তারেক তখন মুচকি হেসে তরবারি হাতে বলেন
সব দেশ-ই স্বদেশ মোদের, খোদার বিশাল ধরাতে! -(আল্লামা ইকবাল)

"الا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون"[২] 'জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর অলিগণ, না তাদের ভয় আছে, আর না তাদের দুশ্চিন্তা আছে।'

---

[১] আল-আনফাল-১৭।
[২] ইউনুস-৬২।

خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے

یقیں پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے

جہاں آ و گل سے عالم جاوید کی خاطر

نبوت ساتھ جسکو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے

پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی

ستارے جسکی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے

তুমিই চিরঞ্জীব প্রভুর হাত, তুমিই প্রভুর মুখ / বিশ্বাস সৃষ্টি করো হে অলস, তুমি যে আজ পরাজিত সন্দেহে!

মাটি ও কাদার পৃথিবী থেকে অনন্তের জগতে/ নবুয়তসহ নিয়ে গেছে যাকে, সেই সওগাত তুমিই যে!

নীলিমায় ছাওয়া আজ মুসলমানের গন্তব্য/ নক্ষত্র যার পথের সাথী, সে কাফেলা তুমিই যে!

এসব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মুসলমান কি কখনো দুর্বল হতে পারে? কোনো বস্তুবাদি শক্তিই কি তাদের পরাজিত করতে পারে? তারা তো খোদায়ী শক্তিতে শক্তিমান। হাজারো ঐতিহাসিক ঘটনা দিবালোকের মতো পরিষ্কার। মুসলমানেরা নিজেদের চেয়ে দশ গুণ; বরং তারও চেয়ে অধিকসংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে, দূর-দূরান্তের দেশে সহায়-সম্বলহীন হওয়া সত্ত্বেও জয়লাভ করেছে। অথচ শত্রুরা তখনকার সময়ের সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে মুসলমানদের সম্মুখে এসেছিলো।

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو

پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو

যতোক্ষণ তুমি কাঁচা, ততোক্ষণ তুমি মাটির এক ঢিবি/ পোক্ত হলে তুমি শতোভাগ সফল তরবারি!

অন্যত্র রয়েছে

مردِ مؤمن با خدا دارد نیاز　　با تو ما سازیم تو با ما بساز

عزم کو خلّاق تقدیر حق ست　　روز ہیجا تیر او تیر حق ست

মুমিন মুখাপেক্ষী কেবল খোদাতায়ালার/ তোমার সাথে সন্ধি হবে, যদি মেনে নাও!

যার প্রত্যয়ে খোদাতায়ালার তাকদির গড়ে/ যুদ্ধদিনে তার তীর যে তীর ওই খোদার!

আরো রয়েছে

مردِ حر محکم زورِد لا تخف　　ما بمیداں سر بجیب او سر بکف

স্বাধীন মানুষ 'লা তাখাফ' এর তসবি জপে/ ময়দানে প্রাণ হাতে নিয়ে শির নিই তার!

"لاتخف إنك أنت الأعلى"[১] 'ভয় করো না, (কেননা বাতিলের ভাগ্যনির্ণায়ক) তুমিই হবে নিশ্চিত বিজয়ী।'

কোনো জাতি যখন ঈমানি বলে বলীয়ান ও ঈমানি প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী হয়, তখন কিছুতেই কোনো বস্তুবাদী শক্তি তাকে পরাস্ত করতে পারে না। বরং 'যাঁর আল্লাহ আছে, তাঁর সবই আছে' এই নীতি অনুযায়ী বস্তুবাদী সমস্ত শক্তি ওই জাতির করতলে এসে যায়। সোনালি যুগের মুসলমানেরা সহায়-সম্বলহীন হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন বড়ো-বড়ো বস্তুবাদী শক্তিধরেরা তাঁদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। এবং সবকিছুই তাঁদেরই আয়ত্বে এসে গিয়েছিলো। ইসলামের শার্দুল গাজী আনোয়ার পাশা বুখারাকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার অধীনস্থ বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকার মুসলমানদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন। যাতে সবাইকে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও একতার মধ্যে এনে একটি উন্নত মুসলিম উম্মাহ গড়ে তোলা যায়। রাশিয়ার ধর্মদ্রোহিতা, নাস্তিক্যবাদিতা এবং ইসলামের শত্রুদের হাত থেকে মুসলমানদের মুক্ত করে এখানে তিনি একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। জিহাদ শুরু হয়ে গেলো। তখন রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীরা দেখলো যে, এখানকার সকল মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলে এবং তাদের হৃদয়ে কুরআনের প্রেমোচ্ছ্বাস জাগ্রত হলে, তখন মুসলমানদের মোকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীরা তাই গুপ্তচরবৃত্তি ও গোপন ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে গোষ্ঠীগত বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যেক মুসলিম এলাকা থেকে একেকজন ধনাঢ্য মুসলমান নেতার সাথে সাক্ষাত করে বলে, আপনি আপনার এই এলাকায় স্বায়ত্বশাসন কায়েম করুন। আমরা আপনার সহযোগী হিসেবে আছি। আপনি হতে পারেন স্বাধীন রাজ্য ও স্বতন্ত্র ক্ষমতার মালিক। তো,আপনি কেনো আপনার সত্তাকে আনোয়ার পাশার আন্দোলনে হারিয়ে ফেলবেন? রুশদের এই কুমন্ত্রণায় সবাই এগিয়ে এলো। ফলে দশ-বারোটি ছোট-ছোট মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো। তুর্কিমিনিস্তান, কাজাখাস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তাতারিস্তান, আজারবাইজান ইত্যাদি– সবই মূলত ছিলো গোত্রীয় জমিদারি। আনোয়ার পাশার সাথে থাকলো মাত্র অল্পসংখ্যক লোক। বাকি সব মুসলমান লোভ-লালসার ফাঁদে আটকে পড়লো। ফলে আনোয়ার পাশা ওই পাষণ্ডদের হাতে শহিদ হলেন এবং এর সাথে ইসলামি উম্মাহর আন্দোলনও খতম হয়ে গেলো। বর্তমানে ওসব কথিত স্বাধীন রাজ্যের অবস্থা এমন যে, কোন্ ঋতুতে কোন্ জমিতে কিসের চাষ করা হবে, তারও আদেশ-অনুমতি নিতে হয়ে মস্কো থেকে। সমস্ত মাদরাসা বন্ধ। ইসলামি শিক্ষা বিলুপ্ত। বড়ো-বড়ো জামে মসজিদ এখন সিনেমা হলে রূপান্তরিত। হজ নিষিদ্ধ। মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক নিষিদ্ধ। নাউজুবিল্লাহি মিনহা! এসব চিন্তা করলে মনুষ্য বিবেক অবাক হয়ে যায়।

এমন কেনো হলো? এ কারণেই হলো যে, ওখানকার মুসলমানদের মধ্যে ঈমানি শক্তি ও প্রত্যয় না থাকার কারণে তারা অটল থাকতে পারেনি। লোভ-লালসার গোলাম হয়ে বাদশাহীর নেশায় বেহুঁশ হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। যদি তারা ঈমানি প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী হতো, তখন তারা

---

[১] তোয়াহা-৬৮।

চালবাজ রুশদের ধোঁকায় পড়তো না এবং ইসলামি উম্মাহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো। তখন রাশিয়ার ক্ষমতা ও শক্তি এই ইসলামি উম্মাহর সামনে সামান্য পিঁপড়ের মতো হয়ে যেতো। এই ঈমানি শক্তি ও প্রত্যয় না থাকার কারণেই এরা হীনবল ও দুর্বল ছিলো। এবং সৃষ্টিকুলের সব শ্রেণিতেই এটাই কমন রীতি যে, দুর্বল সবলের মুখের গ্রাস হবে! শক্তিহীনেরা শক্তিমানদের সামনে ধ্বংস বা ধ্বংসপ্রায় হয়ে যাবে। প্রাণীদেরকে মনুষ্যজাতি ভক্ষণ করবে আর দুর্বল প্রাণীদেরকে ভক্ষণ করবে বড়ো প্রাণীরা। ঠিক এ কারণেই, মাছ, সাপ, বনের হিংস্র প্রাণিকুলে; বরং উদ্ভিদজগতেও এটাই প্রচলিত নিয়ম। মহাকবি মাওলানা রুমি রহ. বলেন,

جملہ عالم آکل وما کول داں

সারা পৃথিবীই খাদক ও খাবার, একথা রেখো জেনে!

যেভাবেই হোক, শক্তি-সামর্থ, নেতৃত্ব-বিজয়, জয় ও প্রত্যয়ী সহযোগিতা মূলত মুসলমানদের অধিকার। দুর্বল্য, হীনবলতা, অক্ষমতা আসলে এক আকস্মিক মৃত্যুর পূর্বাভাস।

تقدیر کے قاضی کا یہ فتوی ہے ازل سے

ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات (اقبال)

আদি থেকেই খোদার বিধানের ধরন/ দুর্বলতার শাস্তি– আকস্মিক মরণ!

(আল্লামা ইকবাল)

মুসলমানদের স্বীয় বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও ইসলামি উম্মাহর কথা ভুলে যাওয়া, লোভ-লালসার শিকার হয়ে গোত্র, বর্ণ, ভাষা ও দেশগত বিভেদে ফেঁসে যাওয়া মূলত নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনার নামান্তর। আকাশ থেকে পাতালে অধপতিত হওয়ার মতো। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল রহ. বলেন,

غبار آلودۂ رنگ ونسب ہیں بال وپر تیرے　　توائے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا

یہ ہندی وہ خراسانی یہ تورانی وایرانی　　توائے شرمندۂ ساحل، اچھلکر بے کراں ہو جا

تمیز رنگ وخوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا　　نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

তোমার চুলে লেগে আছে বর্ণ ও গোত্রবৈষম্যের রঙ

হারমের হে পাখি তুমি, ওড়াল দেয়ার আগে পাখনা ঝেড়ে নাও

এ ভারতীয়, ও খোরাসানি, এ তুরানি, সে ইরানি

কুল-লাজে হে লজ্জিত তুমি, উছলে উঠে কুলহীন হয়ে যাও

রক্ত ও বর্ণের প্রাচীর ভেঙে 'মিল্লতে' একাকার হয়ে যাও

না তুরানি থাকুক বাকি, না ইরানি, না আফগানি !

আরো বলেন,

فارغ از باب وام واعمام باش همچو سلمانؓ زادۂ اسلام باش

মা-বাবা ও চাচা-মামা থেকে মুক্ত হয়ে যাও/ সালমানের মতো ইসলামের পুত্র হয়ে যাও!

হযরত সালমান ফার্সি রা. কে যখন তাঁর বংশলতিকা জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি উত্তরে বললেন, আমি সালমান বিন ইসলাম!

মুসলিম উম্মাহর প্রাণশক্তি বিশ্ববিস্তৃত ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য থেকে সরে গিয়ে গোত্রীয়, এলাকাপ্রীতি, ভাষা, বংশ ও দেশপূজার কাদায় ডুবে যাওয়ার কারণ শুধুমাত্র প্রবৃত্তিশাসিত লক্ষ্য এবং অমুসলিমসুলভ অদূরদর্শিতা ও প্রবৃত্তিপূজা। বৃটিশ জাতি যারা রাজনৈতিক চালবাজি ও ধোঁকাবাজিতে খুবই হুঁশিয়ার, তারা ভালো করেই জানে যে, মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী এ ভ্রাতৃত্ব ও একতা যদি টিকে থাকে, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি একদিন মুসলমানদের সামনে নতশীর হয়ে যাবে। ওদিকে ওই ধূর্তের দল মুসলমানদের ঈমানি শক্তি, উচ্ছ্বাস ও নিষ্ঠায় যে ঘুণে ধরেছে, সেটাও দেখে ফেলেছে। অতএব তারা এমন এক ষড়যন্ত্র করলো যে, মুসলমানদের তারা লোভ-লালসা, খোদপুরস্তি, স্বজনপ্রীতি ও গোত্রপ্রীতির নেশায় বেহুঁশ করে ছাড়লো। মুসলিম উম্মাহকে বহুধাবিভক্ত করে দিলো। আরবের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখুন সিঙ্গাপুর, জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপদেশের দিকে। এসব দ্বীপাঞ্চলকে তারা ছোট-ছোট দেশে বিভক্ত করে দুর্বল করে রেখে বহু বছর যাবত আড়াল থেকে শাসন করে যাচ্ছে। নাড়ি নির্ণয়াভিজ্ঞ আল্লামা ইকবাল রহ. ফিরিঙ্গিদের ধোঁকাবাজি সম্পর্কে বলেন,

فریاد از افرنگ ودلاویزائی افرنگ فریاد ز شمشیرینی وپرویزی افرنگ

عالم همه ویراں زچینگیزی افرنگ معمار حرم باز تعمیر جہاں خیز

از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز

از خواب گراں خیز

অনুরোধ ফিরিঙ্গি আর ফিরিঙ্গি পারিষদের প্রতি
অনুরোধ ফিরিঙ্গি দুগ্ধপোষ্য আর বিজয়ীর প্রতি
পৃথিবী উজাড় করেছে ফিরিঙ্গি নিপীড়ন
হারমের পুনর্নির্মাণেই পৃথিবীর পুনর্জীবন!
ঘুমের ঘোর থেকে, ঘুমের ঘোর থেকে, ঘুমের ঘোর থেকে জাগো
ঘুমের ঘোর থেকে জাগো!

ইসলামের সর্বজনমান্য সড়ক ছেড়ে ভুল পথে পা বাড়ানো থেকে এবং নানা ধরনের দুশ্চিন্তা ও অপদস্ততায় লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করে মহান আল্লাহ বলেন, " لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين"[১] 'তোমরা ভেঙে পড়ো না এবং দুশ্চিন্তা করো না আর তোমরাই বিজয়ী

[১] আলে ইমরান-১৩৯।

হবে যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।' ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও ভেলকিবাজি সম্পর্কেও সাবধান করে দিয়ে বলেন, "يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم"[১] 'তারা তাদের মুখের ফুঁক দিয়ে আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়।' এবং পবিত্র কুরআনে বিশ্বব্যাপী ইসলামি ভ্রাতৃত্বের শক্তিতে শক্তিমান হওয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে এভাবে, " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله"[২] 'তিনি সেই সত্তা, যিনি স্বীয় রাসুলকে সা. পাঠিয়েছেন, হিদায়াত ও সত্য ধর্ম দিয়ে। যাতে তাকে বিজয়ী করতে পারেন সকল ধর্মের ওপর।' কিন্তু আফসোস, আমরা এভাবেই বিচ্যুত হয়ে গেছি যে, ফিরে আসার নাম-নিশানাও নেই আমাদের মাঝে!

اللہ کی راہ ابتک ہے کھلی آثار ونشان سب قائم ہیں

اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ مین چلنا چھوڑ دیا

আল্লাহর পথ এখনো রয়েছে খোলা, সকল নিদর্শন ও চিহ্ন আছে অটুট

কিন্তু আল্লাহর বান্দারা আজ, সেই পথে হাঁটা ছেড়ে দিয়েছে!

মুসলমানদের মধ্যে যতোদিন খোদাপ্রেম ছিলো, ততোদিন দুনিয়া দিওয়ানা হয়ে তাঁদের পায়ে চুমো দিচ্ছিলো। আর যখনই তারা দুনিয়া কামনা করা শুরু করলো, তখনই দুনিয়া তাঁদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলো।

"إن الأرض يرثها عبادي الصالحون وكلمة الله هي العليا"[৩] 'নিশ্চয়ই এ জমিন, এর উত্তরাধিকার হবে আমার পূণ্যবান বান্দাদের। আর আল্লাহর বাণীই থাকবে সবার ওপরে।' কথায় বলে, 'এসো এসো বললে, আসে না। দূরে থেকো বললেই কাছে এসে যায়!' পৃথিবীতে আজ মুসলানদের শাসনাধীন দেশের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু প্রতিটা দেশই দুর্বল এবং পরাশক্তির হাতের পুতুল। আজকেও যদি মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, একতা ও ইসলামি উম্মাহর শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে পৃথিবীর চিত্রটাই বদলে যাবে।

সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

এখন কথা হলো, আপনাদের সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য এই যে, চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন উন্নত করতে হবে, যাতে এখান থেকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম সৃষ্টি হয়, যারা কথায় ও লেখায় মুসলমানদের সমকালীন পাশ্চাত্য আগ্রাসন ও ধর্মহীনতা থেকে বাঁচাতে পারে। বস্তুবাদী ভ্রান্ত চিন্তাধারার অনুসারীদের অনর্থক আপত্তি, চরম সীমালঙ্ঘন ও বক্তৃতার যথাযথ, ঠিকঠাক, কঠিন ও দাঁতভাঙা জবাব দেয়ার

---

[১] আস-সফ-৮।

[২] আস-সফ-৯।

[৩] আল-আম্বিয়া-১০৫।

মাধ্যমে খণ্ডন করতে পারে। আমি আপনাদের অসম সাহস ও উন্নত প্রত্যয়কে মোবারকবাদ জানাই। দুআ' করি, আল্লাহ যেনো আপনাদেরকে তাওফিক দান করেন।

আপনারা ভালোভাবেই জানেন, ইসলামপূর্ব ধর্মগুলোর অবস্থা এমন ছিলো যে, তাদের নবী-রাসুলগণ পৃথিবী থেকে যাওয়ার এক শতক পার হতে না হতেই ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থে হাজারো অনভিপ্রেত সংযোজন, পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে ভুলভ্রান্তির ভাণ্ডারে পরিণত হতো। মৌলিক রূপ এভাবে বিলুপ্ত হয়ে যেতো যে, তা কল্পনাকেও হার মানায়! পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মের পথচলার দেড় হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও বাস্তবতা এই যে, এর পবিত্র গ্রন্থ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে সর্বত্র স্বকীয়তা লক্ষ্যণীয়। স্বয়ং আল্লাহপাক প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"[১] 'আমিই নাজিল করেছি এ কিতাব, এবং আমিই এর রক্ষক' এবং মুসলমানদের ওপর আবশ্যক করে দিয়েছেন যে,

"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"[২]

'তোমাদের মধ্যে যেনো এমন এক দল থাকে, যারা পুণ্যের দাওয়াত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে।' প্রকাশ থাকে যে, পুণ্যের প্রতি দাওয়াতের ভূমিকা ও পূর্বশত এ যে, ওই 'পুণ্যের' যথাযথ রক্ষাবেক্ষণ হবে। এবং এখানে 'পুণ্য' থেকে উদ্দেশ্য হলো 'মাযহাবে হক' বা ইসলাম ও এর গ্রন্থ পবিত্র কুরআন। ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ থেকে উদ্দেশ্য হলো ইসলামের প্রচার-প্রসার। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

فليبلغ الشاهد الغائب، بلغوا عني ولو آية

ইত্যাদি। এদিকে আবার সতর্ক ও ধমকি দিয়ে বলেন, " من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" একদিকে আদেশ করা হচ্ছে, প্রচার করো। অন্যদিকে কঠোর নির্দেশনা দিয়ে বলা হচ্ছে, একটি বর্ণও যেনো ভুল বা মিথ্যে না হয়।

ইসলামের শত্রুরা ইসলাম ও মুসলমানদের ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে মুখ ও কলম, অস্ত্র ও বিজ্ঞান সবকিছুই ব্যবহার করেছে। যাবতীয় ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে তারা তাদের সামর্থ্যানুযায়ী কোনো কসুর করেনি। এখন মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের রক্ষক এবং সৈনিকরাও দু' দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রথমত, জ্ঞানী ও লেখক সম্প্রদায়। দ্বিতীয়ত, সামরিক ও রাজনীতিক সম্প্রদায়। প্রথম দল ইসলামের শত্রুদের মিথ্যে কথা ও ভিত্তিহীন আপত্তিসমূহের এমন মূলোৎপাটন করেছেন যে, ইসলামের শত্রুরা যুগের পর যুগ ধরে চেষ্টা-চরিত্রি করার পর শেষমেশ অবাক ও হতবাক হয়ে গেলো! এদিকে কুরআন-সুন্নাহ, আছার-রেওয়ায়াত ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শকে এভাবে রক্ষাবেক্ষণ করলো যে, দুনিয়ার সামনে এসবকে তাঁরা দিবালোকের মতো উজ্জ্বল করে দিলেন। জগতবাসীর সামনে ইসলামের প্রকাশ্য

---

[১] আল-হিজর-৯।

[২] আলে ইমরান-১০৪।

দাওয়াতের ঘোষণা দিলেন। পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতির মুখোশ উন্মোচন করলেন ও তাদের কাঁচা ঘায়ে নুনের ছিটা দিলেন! ইসলামের শত্রুদের বড়ো-বড়ো জ্ঞানী ও মনীষীদের বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হলো যে, পবিত্র কুরআন বিকৃতিমুক্ত এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র হাদিস যাবতীয় দুর্বলতা থেকে পূত-পবিত্র।

মার্গোলিস এর মতো ইসলামবিদ্বেষী, পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাসবিদকেও বলতে হলো যে, 'আমি সকল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও নবীদের জীবনীতে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেছি। কিন্তু সেখানে আঁধার আর আঁধার। কোথাও একটুখানি আলোর দেখা পেলেও তা দ্বারা উপকৃত হওয়া ছিলো ভীষণ জটিল। তবে, আমি যখন ইসলামের নবীর জীবনীর দিকে দৃষ্টি ফেরালাম, তখন দেখি, এখানে সবকিছুই স্পষ্ট, প্রোজ্জ্বল। এখানে সবকিছুই দিবালোকের মতো। না কেউ ধোঁকা খেতে পারেন, না অন্য কাউকে ধোঁকা দিতে পারেন।'

দ্বিতীয় দল অর্থাৎ সৈনিক ও রাজনীতিক নেতারা হাজার বছরের প্রাচীন শক্তিধরদের সম্মুখে এমন অসাধারণ সাহস ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখালেন যে, ইসলামের শত্রুরা অবাক ও হতবাক হয়ে গেলো। তাদের পণ্ডিত ও বিশ্বপর্যটক মনীষীদেরকে স্বীকার করতে হলো যে, 'মুসলমানেরা যদিও বাহ্যিকভাবে বস্তুগত শক্তিতে তেমন উল্লেখ্য নয়, কিন্তু তাদের বুকের ভেতর এমন এক মহামূল্যবান রত্ন রয়েছে, যেটি থাকলে কখনোই তারা পরাজিত বা বিলুপ্ত হবে না।' মনে রাখা দরকার, এ সৈনিক ও যোদ্ধারা সবাই সেই জ্ঞানী ও লেখকবৃন্দের প্রতিপালন ও শিক্ষার ফসল ও প্রোডাক্ট। তাঁরাই এ দ্বিতীয় শ্রেণির হৃদয় আবাদ করে ঈমানি উচ্ছ্বাস ও রুহানি নুরের আবাস বানিয়ে দিয়েছেন।

একারণেই বলা যায়, দেশ-জাতি, দ্বীন-ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির মূল উপাদান হলো ইলম ও মারিফাত তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। উন্নতি-উৎকর্ষের অন্যসব উপকরণ আসলে ইলম তথা জ্ঞানেরই শাখা-প্রশাখা। এজন্যেই আমরা পবিত্র কুরআন ও রাসুলের হাদিসে ইলম বা জ্ঞানের ওপর এতো গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান এবং ফজিলত ও তাৎপর্য দেখতে পাই। ইলম বা জ্ঞান হলো প্রাণ, জীবন, আঁধার থেকে আলোতে আসার একপথ-পরিক্রমা। আর এই পরিক্রমাও একটা কাজ। অতএব ইলম ও আমলের, জ্ঞান ও কর্মের সম্পর্ক জন্মগত; কাল্পনিক নয়। জ্ঞান ও প্রজ্ঞান দিল্ ও দেমাগে আসীন চালিকাশক্তি। তার ঔজ্জ্বল্য কথায় ও কাজে,ব্যবহারে ও আচরণে। কিন্তু এই বাণী ও কথা কর্ম ছাড়া ঘৃণিত ও প্রভাবহীন হয়ে পড়ে। " لم تقولون ما لا تفعلون "[১]'তোমরা কেনো বলো, যা তোমরা নিজেরা করো না।' অন্য আয়াতে এসেছে

" أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم " ' তোমরা কি কেবল লোকদের ভালো কাজের উপদেশ দিবে আর নিজেদের দায়-দায়িত্ব ভুলে যাবে?'

واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی　　برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی

رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی　　فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی　(اقبال)

---

[১] আস-সফ-২।

জাতির বক্তাদের মাঝে এখন আর সেই প্রত্যয় নেই

ব্যক্তিত্বের ছাপ এবং অনলবর্ষী কথাও নেই

আজানের প্রথা আছে, বেলালের সেই হৃদয় নেই

দর্শন ঠিকই আছে, গাজালির সেই শিক্ষা নেই! -(মহাকবি ইকবাল)

বক্তা ও ওয়ায়েজের স্বীয় হৃদয় ঈমানের জযবায় পূর্ণ না হলে এবং আমলের স্বাদলাভের প্রতি আগ্রহী না হলে, তখন তারা অন্যদের কীভাবে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন? কথায় বলে, 'হৃদয় থেকে বের হলেই, হৃদয়ে গিয়ে পশে!' কথা যেটি মন থেকে বের হয়, সেটিই মূলত মনে গিয়ে লাগে। বক্তৃতার সৌন্দর্য ও ভাষার অলংকারের কারণে যে উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা দেখা যায়, তা মূল প্রভাব নয়; সাময়িক এক অবস্থা মাত্র। যা খুব দ্রুতই বিলীন হয়ে যায়।

এমন ইলম কি আমাদের মধ্যে আছে? থাকলে তবে মান-মর্যাদা, শক্তি-নেতৃত্ব সবকিছুই কেনো আমাদের কাছ থেকে ছিনতাই হলো? "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" 'নিশ্চয় আল্লাহ কোনো জাতির কিছুই ততোক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজেরা পরিবর্তিত হয়।' অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে,

"ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"[১]

'আল্লাহপাক কোনো জাতির কোনো নেয়ামত ততোক্ষণ বদলান না, যতোক্ষণ না সেই জাতি নিজেরা বদলায়।'

যেমন ইলম থাকা দরকার, তা কি আমাদের মধ্যে আছে? আর আমাদের কাছে যা আছে, তা কি অভিষ্টলাভে ও সফলতা অর্জনের মাধ্যম? আপনাদেরকে স্বীকার করতে হবেই যে, আসলেই নেই। যদিওবা হাজারে দু-চার জন মাত্র এমন জ্ঞানী পাওয়া যায়, তবে সেই সংখ্যা হবে খুবই অপ্রতুল। যা 'الشاذ كالمعدوم" 'কম থাকা না-থাকারই নামান্তর' এর অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বেও এমন সব মনীষীর প্রভাব-দৃষ্টি, বক্তৃতা-রচনার দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা হলেও প্রাণশক্তির দেখা মিলে। আমি মোটাদাগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষগুলোর অবস্থা সম্পর্কে বলছি যে, এসব আমাদের তৃষ্ণা নিবারণে ব্যর্থ হচ্ছে। আমাদের চাই, জাগ্রত ছাত্র ও অতন্দ্র শিক্ষক। যাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে দেশ-জাতির তৃষ্ণা মিটবে ও মুক্তি অর্জিত হবে। এখন তো আমাদের অবস্থা এমন যে,

تو در دل نالۂ زارے نداری کہ در تن جان بیدارے نداری

درین گلشن کہ گلچینی حلال ست تو زخمے از سر خارے نداری

তোমার হৃদয়ে আজ আহাজারি নেই/ তোমার দেহেও তাই জাগ্রত প্রাণ নেই।

এ উদ্যানে ফুল ছেঁড়া বৈধ তবুও/ তোমার হাতে কোনো কাঁটার আঘাত নেই।

বর্তমান মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্যে এমন জ্ঞানী সমাজ দরকার, যা

---

[১] আর-রাদ-১১।

ضمیرے بحر ناپیدا کنارے دلِ ہر قطرہ موج بیقرارے

হৃদয়, এমন এক সমুদ্র যার থাকে না কো কূল/ তার প্রতিটি বিন্দুই উথাল ঢেউ!

এবং তারা এমন মুমিন মুসলমান হবেন যে,

چہ باید مرد را طبعے بلندے مشربے نابے

دلے گرمے نگاہ پاک بینے جان بے تابے

মানুষের কী চাই? উন্নত স্বভাব আর পিওর পানীয়/উষ্ণ হৃদয়, পবিত্র দৃষ্টি আর প্রশান্ত হৃদয়ও!

হে চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার সাবেক ছাত্রবৃন্দ, ইনশাআল্লাহ আপনারা প্রত্যেকেই কৃতী আলেম। আপনাদেরকে তো আমরা পুরনো ভালোবাসা ও স্নেহের কারণেই 'ছাত্র' সম্বোধন করছি। আমরা আপনাদের ধন্যবাদ দিতে চাই এ জন্যে যে, আপনারা আমাদের এমন কিছু পুরনো স্বপ্ন, এখনো যা অধরা স্বপ্নই রয়ে গেছে, সেগুলিকে বাস্তব রূপদানের প্রতিজ্ঞা করেছেন। আমি আপনাদের সামনে মুসলমানদের তৃষ্ণা, প্রয়োজন ও ঘাটতির ফিরিস্তি আমার অপরিপক্ব বোধ ও অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরেছি। এখন আপনাদের করণীয় হচ্ছে, উপস্থাপিত অপূর্ণতা ও শূন্যতাপূরণে আপনারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করে তুলবেন। আমি এ প্রসঙ্গে পরামর্শস্বরূপ কয়েকটি পয়েন্ট তুলে ধরছি:

১. আপনারা সংগঠনের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, যেটি নিয়ে একটু আগেই কথা হয়েছে, তার তাৎপর্য যথাযথভাবে অনুধাবন করে নেবেন। মূলত এটা শতোভাগ জাতীয় ও অরাজনৈতিক আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক দাওয়াতি সংগঠন মাত্র। বর্তমান মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থার চিত্র সামনে রেখে এবং বাতিল ফিরকাসমূহ ও বস্তুবাদী ও নাস্তিকদের ইসলামদ্রোহিতা অনুধাবনপূর্বক এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। শরিআতের দৃষ্টিতেও তা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতপর আপনারা এটা মনে রাখবেন যে, কোনো বৈপ্লবিক আন্দোলনে যেসব কর্মী অগ্রণী ভূমিকায় থাকেন, তাদের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা এমন দৃঢ় ও অটল হতে হয় যে, ত্যাগের সর্বক্ষেত্রে ও প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধের পথে পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্রের সাথে এগিয়ে যেতে হবে।

২. যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সামনে রেখে আপনারা কাজ শুরু করবেন, তা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়ে তদন্ত ও শতোভাগ বিশ্বস্ততা অর্জন আবশ্যক।

ক. সেখানকার আর্থিক খাত, শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্রদের দীক্ষাদান বিষয়ে আপনাদের নিশ্চিত হতে হবে এবং এতে আপনাদের সার্বক্ষণিক কর্তৃত্ব থাকতে হবে; লোকদেখানো সংখ্যাধিক্য নয় শুধু। এমন যাতে না হয় যে, কাজ শুরু হওয়ার পরই কিংবা কিছু দূর গিয়েই ধ্বংসাত্মক ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং আপনাদের সকল চেষ্টা-সাধনা মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যাবে।

খ. উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টাইটেল পর্যন্ত হলে তো খুব ভালো। নাহলে অতি দ্রুত তার শিক্ষার স্তর টাইটেল পর্যন্ত উন্নীত করতে হবে।

গ. মাদরাসার শিক্ষা ও দীক্ষা (চারিত্রিক প্রশিক্ষণ) দুটোরই সমান গুরুত্ব থাকতে হবে।

ঘ. পাঠদানপদ্ধতি সংশোধন করতে হবে। মাদরাসায় নতুন প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতিতে অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দকে নিয়োগ দিতে হবে।

৩. মাদরাসার লাইব্রেরি ছাড়াও স্বতন্ত্র একটি বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরি ও পাঠাগার নির্মাণ করতে হবে। যেখানে ইসলামবিরোধী পুরনো ও নতুন প্রকাশিত পুস্তিকা ও বই এবং এগুলোর জবাবে রচিত প্রাচীন ও নতুন বইপত্রের সংগ্রহ থাকবে। বিতর্ক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্রের বইপত্র এবং হাদিস, তাফসির, ব্যাখ্যাগ্রন্থ, জীবনী ও ইতিহাসগ্রন্থেরও যথেষ্ট সংগ্রহ থাকবে এবং এর অধীনে একটা 'প্রকাশনা সংস্থা' থাকবে, যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে একজন সুযোগ্য ও যথেষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তির হাতে। আলিম থেকে কামিল পর্যন্ত ছাত্রদের জন্য অবসর সময়ে তাদের উপযোগি অধ্যয়নের আদেশ ও ব্যবস্থা থাকবে।

৪. সরকারি ফান্ড ছাড়াও মাদরাসার আলাদা একটা উল্লেখযোগ্য অংকের পাবলিক ফান্ড থাকবে এবং দিন-দিন এই ফান্ড বাড়াতে হবে।

৫. প্রাক্তন ছাত্র সংগঠনের সাহায্য-সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি 'জমিয়তুল ইখওয়ান' বা ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই জমিয়তে প্রাক্তন ছাত্ররা বাধ্যতামূলকভাবে থাকবেন। তারা ছাড়া সাধারণ মুসলমান ও অন্যান্য উলামায়ে কেরামও সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন। এই জমিয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে:

ক. প্রাক্তন ছাত্র সংগঠনের সাহায্য-সহযোগিতা।

খ. প্রচার-প্রসার।

গ. লাইব্রেরি ও পাঠাগারের প্রশস্তকরণ। এবং

ঘ. পাবলিক ফান্ডকে শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি।

৬. জমিয়তুল ইখওয়ান-এর সদস্যদের জন্য ভর্তি ফি নির্ধারণ হতে হবে। এরপর আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী মাসিক চাঁদা ঠিক করা হবে।

এখন আমি আমার কথা শেষ করছি। আপনারা নিজেরা যখন কাজ করবেন, তখন অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনের নিরিখে দফা ও পদক্ষেপসমূহ বহাল রাখবেন, বাদ দিবেন কিংবা বাড়াবেন। আমি তো শুধু নমুনাস্বরূপ কাল্পনিক একটি চিত্র আঁকলাম মাত্র। এটি যথাসময়ে প্রযোজ্য-অপ্রযোজ্য, সঠিক-বেঠিক দুটোই হতে পারে।

ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল্ হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন! আল্লাহুম্মা ওয়াফ ফিকনা লিমা তুহিব্বু ওয়া তারদা!

[এটি সেই ঐতিহাসিক ভাষণ, যা মরহুম হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ. (সাবেক নাযেমে আলা: চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসা) বিগত ১৯৬২ সালে প্রাক্তন ছাত্র সংগঠন আয়োজিত প্রথম সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে পেশ করেন। সেটি এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো। বক্তব্যটি ছিলো খুবই অর্থবহ। উর্দুতে হলেও খুবই আকর্ষণীয় ও উচ্চমার্গের সাহিত্যশৈলিতে পেশ করা হয়েছে বক্তব্যটি এবং এতে তুলে ধরা হয়েছে ঐতিহাসিক নানা দিক। আমাদের বিশ্বাস, এখনো এই বক্তব্য দেশের আলেম ও ফাজেলদের জন্যে আলোকবর্তিকা হতে পারে। এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বক্তব্যটি ছাপা হলো।]

– প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি।

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) রচনাশৈলী

আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রি.) একাধারে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতি, ফকিহ, ধর্মতত্ত্ববিদ, লেখক ও কবি ছিলেন। তিনি আরবি, ফার্সি, উর্দু এবং বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। উর্দু সাহিত্যে তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন না করলেও বিভিন্ন বিষয়ে আরবি ও উর্দু ভাষায় লিখিত তাঁর রচনাকর্মে সাহিত্যশৈলী বিকশিত হয়েছে। তাঁর রচিত সুনানে-তিরমিযীর শারহের ভূমিকা মুকাদ্দামা-ই-ইলমে হাদিস, ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত আন্‌জুমানে তালাবায়ে সাবেকীনের প্রথম সম্মেলনে প্রদত্ত লিখিত ভাষণ, মাদরাসা শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে তাঁর পুস্তিকা এবং তাঁর পত্রাবলির মধ্যে সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। একজন দক্ষ আলিম, সফল শিক্ষক এবং উঁচুমানের কবি হিসেবে আল্লামা ফজলুল্লাহ এতোই খ্যাত হয়েছেন যে, এর সামনে তাঁর গদ্যরচনা ম্লান হয়ে গেছে।

আল্লামা ফজুলুল্লাহর লিখনী নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা অর্জন করার পূর্ব পর্যন্ত কোন লেখকের রচনাশৈলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে কিনা বলা মুশকিল। কিন্তু একথা সত্য যে, একজন লেখক প্রথমদিকে কোনো একজন সফল লেখকের স্টাইল ও রচনাশৈলীর অনুসরণ করে থাকেন। যেমন সাইয়িদ সুলাইমান নদভী (১৮৮৪-১৯৫৩ খ্রি.) প্রথমদিকে মাওলানা আবদুল হালীম শারারের (মৃ. ১৯২৬ খ্রি.) রচনাশৈলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আবেগ ও অনুভূতিপূর্ণ স্টাইলে মসি চালনা করেছেন। কখনো মুহাম্মদ হুসাইন আযাদের রচনাশৈলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর অনুকরণ করে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। কখনো তাঁর শিক্ষক আল্লামা শিবলী নুমানীর স্টাইলের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু আল্লামা ফজলুল্লাহ কোন লেখকের স্টাইল বা রচনাশৈলীর অনুসরণ করেছেন বলে এরকম তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যায়নি। অবশ্য তিনি তাঁর প্রথম দিকের দু'একটি কবিতা চুনতির অধিবাসী বিশিষ্ট কবি মাওলানা ফাওযুল কবির খান মুন্না মিঞাকে দেখিয়েছিলেন।

লিখনী হচ্ছে একজন লেখকের স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্বের দর্পণ। একজন লেখক ও সাহিত্যিক অন্য কোনো লেখক ও সাহিত্যিকের অনুকরণের যতোই প্রচেষ্টা করুক না কেনো, এরপরও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা অবশিষ্ট থাকে। অতএব, আল্লামা ফজলুল্লাহর রচনাশৈলী অন্য কোন লেখকের স্টাইল ও রচনাশৈলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকলেও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল, অর্থবহ, উপমা এবং রূপক অলঙ্কারে সমৃদ্ধ। তাঁর লেখা ভাষার মাধুর্য, স্বচ্ছতা, উন্নত চিন্তা, জ্ঞানের গভীরতা ও পরিপক্বতা দ্বারা সমৃদ্ধ। অধিকন্তু ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততা, ফার্সি বাক্যগঠনের কলাকৌশল এবং দুর্বোধ্য শব্দ ও জটিল বাক্য পরিহার তাঁর রচনাশৈলীকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে।

উল্লেখ্য, 'সিরাতুন্নবী' ছয়খণ্ডে সমাপ্ত উর্দু ভাষায় রচিত এক অনন্য সিরাতগ্রন্থ। আল্লামা শিবলী নুমানী (মৃ. ১৯১৪ খ্রি.) এবং তাঁর প্রথিতযশা শিষ্য আল্লামা সুলাইমান নদভীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফসল। এ দু'জন মনীষী উনিশ ও বিশ শতকের উর্দু সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন বিধায় সিরাতুন্নবী সাহিত্য গ্রন্থ না হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অনুরূপভাবে মাওলানা ফজলুল্লাহর উর্দু ভাষায় প্রণীত রচনাকর্মসমূহ সাহিত্যগ্রন্থ না হওয়া

সত্ত্বেও এগুলোর মধ্যে সাহিত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। নিম্নে তাঁর রচনাকর্ম থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা হলো:

" قرآن حکیم عہد نبوت کے اخیر تک بالکل مکمل اور محفوظ ہو چکا تھا - حضرت صدیق اکبر کے عہد خلافت میں قرآن کریم کے مکمل نسخے کتاب و مصحف کی صورت میں قلیل التعداد تھے - جنگ یمامہ میں کثیر التعداد حفاظ قرآن کے شہید ہو جانے پر آپ نے سرکاری طور پر قرآن حکیم کا ایک نسخہ مکمل لکھوالیا اور محفوظ کر لیا۔ بعد میں عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں اس کی اور وسعت دی گئی اور روز بروز نسخوں کی تعداد بڑھتی گئی" – (مقدمہ علم حدیث)

"কুরআনে হাকিম নবুওয়াত যুগের শেষের দিকে সম্পূর্ণ এবং সংরক্ষিত হয়েছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা.) খিলাফতকালে কুরআনে করিমের পূর্ণাঙ্গ কপি গ্রন্থ এবং পুস্ত কাকারে অল্পসংখ্যক ছিল। ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফিযে কুরআন শাহাদাত বরণ করার পর তিনি কুরআনে হাকিমের একটি পূর্ণাঙ্গ কপি সরকারিভাবে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন এবং সংরক্ষণ করেছিলেন। পরবর্তিতে হযরত ওমর ফারুক (রা.) এবং হযরত ওসমানের (রা.) খিলাফতকালে এ কপি আরো ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয় এবং উত্তরোত্তর কপিসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

নিম্নপ্রদত্ত উদ্ধৃতিটি তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও পরিপক্বতার সাক্ষ্য বহন করে:

"یوں تو ضروریات دین کا علم سیکھنا مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، لقولہ علیہ السلام "طلب العلم فریضة علی کل مسلم" لیکن تبحر فی العلم اور تفقہ فی الدین امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے کیونکہ حفظ دین اور اس کی اشاعت و تبلیغ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے، پھر ان علمائے ربانی کو اللہ جل شانہ نے کلمہ حصر کے ساتھ وہ خصوصی درجہ عطا فرمایا جس کی فضیلت بے انتہاء ہے، کما قال فی کتابہ "إنما یخشی الله من عباده العلماء" (مقدمہ علم حدیث)

"দীনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ইলম হাসিল করা সকল মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয"। কিন্তু দীনের সকল বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করা মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরযে-কিফায়াহ। কেননা, দীনের হিফাযত এবং এর প্রচার ও প্রসার এটি ছাড়া সম্ভব নয়। অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলা উলামায়ে রাব্বানিকে নিশ্চিত ও দৃঢ় উক্তির মাধ্যমে সে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন, যার ফযিলত অপরিসীম। যেমন তিনি তাঁর পবিত্র গ্রন্থে বলেছেন, তাঁর বান্দাহগণের মধ্য হতে নিশ্চয়ই আলিমগণই আল্লাহকে ভয় করেন"।

উপর্যুক্ত হাদিসে পরিলক্ষিত হয় যে, مسلم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ মুসলিম পুরুষ। হাদিসে কোথাও مسلمة শব্দ (মুসলিম নারী) বর্ণিত হয়নি। অথচ তিনি مسلم শব্দের অর্থ মুসলিম নর-নারী করেছেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা ভুল বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী তিনি সঠিক অর্থই করেছেন। কেননা مسلم শব্দের মধ্যে মুসলিম নর-নারী উভয় অর্থই অন্তর্নিহিত রয়েছে। যেমন "وَالِدَيْنِ" শব্দটি পিতা-মাতা উভয় অর্থ প্রকাশ করে। তদুপরি

একজন সতর্ক মুহাদ্দিস হিসেবে তিনি مسلم এর পরে مسلمة শব্দটি সংযোজন করেননি; অথচ অসতর্ক বর্ণনাকারীগণ এরকম করে থাকেন, যা হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ অবৈধ।

আনজুমানে তালাবায়ে সাবেকীনের প্রথম সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর লিখিত ভাষণে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (মৃ. ১৯৫৮ খ্রি.) এবং মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর আবেগ ও বাগ্মিতাপূর্ণ লিখনশৈলীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। পনেরো পৃষ্ঠা সম্বলিত এ ভাষণটি কুরআন, হাদিস, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং আল্লামা ইকবালের কবিতার উদ্ধৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ। এ ভাষণটির ভাষা প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী এবং সাহিত্যশৈলী দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত। এ ভাষণ শ্রোতাদেরকে যেভাবে আন্দোলিত ও অনুপ্রাণিত করেছিলো, সেভাবে এর পাঠকদের অন্তরেও যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা যোগাতে থাকবে। নিম্নে এর কিছু উদ্ধৃতি প্রদত্ত হলো:

" ای طلبائے سابقین ' مدرسہ حکیمیہ چنوتی ! آپ حضرات توماشاء اللہ سب ہی ممتاز علماء ہیں -آپ کو تو ہم قدیمی محبت و پیار کے سبب طلباء کے خطاب سے بلارہے ہیں - ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے بعض پرانے خوابوں کو جواب تک رویاہی رویارہ گئے تھے ' واقعیت کا جامہ پہنانے کے عزم مصمم کر چکے ہیں ہم نے آپ کے سامنے مسلمانوں کی تشنگی اور احتیاج ونقائص کی نوعیت کو اپنی ناقص سمجھ اور تجربہ کے بموجب ظاہر کر دیا ہے 'اب آپ پر لازم ہے کہ بیان کردہ نقص و کمی کو پورا کرنے کے لئے جولائحہ عمل کار گرہو اس کی تشکیل فرماویں"

کرۂ ارض کے جس مقام پر وہ قدم رکھتے تھے غلبہ و نصرت ' فتح و حکومت ' دولت و سیاست ' قیادت و سیادت ' شوکت و محبوبیت انکے قدم چومتی تھیں ' جس ملک پر انکی حکومت قائم ہوتی تھی وہاں امن و امان ' عیش و اِسایش ' توافر ارزاق اور فراوانی اسباب معائش کا وہ حال ہوتا تھا جسکی مثال و نظیر نہ مل سکتی تھی رعایا باوجود اختلاف مذہب و بغض عناد کے اپنی عداوت قدیمہ کو فراموش کر کے انکی مدح سرائی میں بلبل ہزار داستاں بنجاتے تھے ' بنی نوع انسان کی بحث چھوڑئے کواکب و سیارات ' مواشی و طیارات ' جمادات و نباتات ' عناصر و عوامر ' جمال و بحور اور حوش و طیور پر بھی انکی حکومت نافذ تھی- اقوام عالم انکے عروج برق رفتار سے حیرت زدہ، احبار و علمای یہود حسد و حیرت سے بے تاب، رہبان نصاری رشک و غیرت میں ہچوماہی بے آب، سلاطین ارض اپنے مستقل کے فکر میں بیقرار ہچو سیماب نظر آتے ہیں- آخر وہ کون سی حقیقت تھی کہ جس نے ما فوق العادات برق رفتاری کے ساتھ تلے آسماں کے بلکہ ورے آسمان تک انکو یوں ابھارا کہ مخلوق کے حوصلے میں اون کے اوپر کوئی اوپر ہی نہ تھا-

"চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার হে তালাবায়ে সাবেকীন! মাশাআল্লাহ আপনারা সবাইতো বিশিষ্ট আলিম। পূর্বের মহব্বত ও স্নেহের কারণে আমি আপনাদেরকে তালাবা (ছাত্রবৃন্দ) অভিধায় সম্বোধন করছি। আমি আপনাদের শোকর আদায় করছি যে, আপনারা আমার কিছু প্রাচীন স্বপ্নকে যা এ যাবত স্বপ্নই রয়ে গেছে, বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন। আমি আপনাদের সামনে মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা, অভাব এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির ধরন স্বীয়

অপরিপক্ব বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরেছি। এখন আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে যে, *আপনাদের সামনে উপস্থাপিত অভাব ও ঘাটতি পূরণ করার জন্য বাস্তব ও কার্যকর কর্মসূচি* গ্রহণ করবেন"।

মাকতুব (পত্র)

পত্র মানুষের ভাবের আদান-প্রদানের বাহন হলেও মানুষের মেধা ও জ্ঞানের কারণে পত্র লেখনশৈলী এতো উৎকর্ষ লাভ করেছে যে, এটি সাহিত্যের এক বিশেষ শাখায় পরিণত হয়েছে। প্রতিটি ভাষার সাহিত্যে পত্রসম্ভারের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। উর্দু ভাষায় পত্রলিখন শৈলীর স্টাইল ফার্সি পত্রলিখন শৈলী থেকে গৃহিত হয়েছে। ফার্সি পত্রের শিরোনাম, উপাধি, সমার্থবোধক শব্দ এবং ছন্দোবদ্ধ ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার ব্যবহার উর্দু ভাষায়ও প্রচলিত হয়। আবুল ফজল, আওরঙ্গজেব, আলমগীর, সাবাঈ, মুমিন এবং গালিবের ফার্সি ভাষায় লিখিত পত্রাবলি বিশেষ স্টাইলের কারণে খ্যাতি লাভ করেছে।

একথা সত্য যে, উর্দু ভাষায় পত্রলিখন শৈলী গালিবের পূর্ব থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু উর্দু ভাষায় নতুন স্টাইলে পত্রলিখন শৈলীর প্রবর্তক গালিব, যদিও প্রথম দিকে তিনি উর্দু ভাষায় পত্রলিখনকে মর্যাদাহানিকর মনে করতেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে গালিব উর্দু ভাষায় পত্র লেখা শুরু করেন। যে উর্দু ভাষায় পত্রলিখনকে তিনি সম্মানহানিকর মনে করতেন, সে ভাষায় রচিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উন্নতমানের পত্রাবলির কারণে উর্দু গদ্যসাহিত্যে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর পত্রসমূহ লৌকিকতা ও অতিশয়োক্তিমুক্ত। তাঁর পত্রসমূহ মনোরম স্টাইল, নতুনত্ব, স্বকীয়তা, রসিকতা, গাম্ভীর্য ও জ্ঞানের গভীরতার দরুণ হৃদয়গ্রাহী। তিনি মুরাসালাহকে (পত্রলিখনশৈলী) মুকালামাহ'-এ (কথোপকথন) উন্নীত করেছেন। তিনি লিখেছেন-

"ہم نے مراسلہ کو مکالمہ بنادیا ہے"

গালিবের পরে পত্রলিখন শৈলী উর্দু সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র বিষয়ে পরিণত হয়। স্যার সাইয়িদ, হালি, মুহসিনুল মুলক, শিবলী নুমানী, আমীর মীনাঈ, দাগ, রিয়ায, আকবর, মাহদী, শাদ আরিফী, মুহাম্মদ আলি জওহর, ইকবাল, প্রেম চাঁদ, আবুল কালাম আযাদ, সাইয়িদ সুলাইমান নদভী, আবদুল হক, আবদুল মাজিদ দরয়াবাদী, শাব্বীর আহমদ উসমানী এবং রশীদ আহমদ সিদ্দিকী প্রমুখের হাতে উর্দু সাহিত্যের এ শাখা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে।

আল্লামা ফজলুল্লাহর উর্দু ভাষায় লিখিত মাত্র দু'টি পত্র পাওয়া গেছে। একটি তাঁর বড়ছেলে আবু ছফা নাজমুদ্দিন আহমদের নিকট এবং অপরটি তাঁর জামাতা হাফিয মাওলানা ইরফানের কাছে লিখিত। পত্র দুটির স্টাইল ও লেখনশৈলী একই রকমের যদিও পত্র দুটির বিষয়বস্তু ভিন্ন। তাঁর বড়ছেলে আবু ছফা নাজমুদ্দিন আহমদের নিকট লিখিত পত্রটি তিন পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। হামদ ও সালাতের পর ফার্সি এবং আরবি ভাষার সংমিশ্রণে পত্রের শিরোনাম উপস্থাপন করা হয়েছে। এ পত্রের ভাষা প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী ও ভারসাম্যপূর্ণ। মনোরম স্টাইল, সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং জ্ঞানের গভীরতায় সমৃদ্ধ। কুরআনুল করিমের আয়াতের উদ্ধৃতিসহ মূল্যবান উপদেশমালা এ পত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। নিম্নে এর কিছু অংশ উপস্থাপিত হলো:

خدای وحدہ کی رضامندی کا حصول اطاعت رسول سے ہو سکتا ہے ' اطاعت رسول بعینہٖ اطاعت الٰہی ہے - من أطاع الرسول فقد أطاع الله ' جواں مرد وہی ہے جو اپنی مادی اور روحانی ہر پہلو کو اعتدال کے ساتھ بحال رکھے - اور یہی اسوۂ محمدی ہے -

اخیر میں میرا کہنا یہی ہے کہ :

۱. غلط درویشی اختیار نہ کرو - تمہارے کلام میں مجذوبانہ رنگ ہے جو بہت مضر ہے

۲. بیوی بچوں کی پرورش ' خدمت ' تربیت شریعت ہے - شریعت کے بغیر کوئی معرفت یا درویشی نہیں ہے - صحیح اعتدال پر آجاؤ اور ہر پہلو کو بجا رکھو '

۳. اپنے بچوں کے مستقبل کیلئے ہمیشہ بارگاہ الٰہی میں التجا کرو اور خدائی توفیق کے مطابق ان کے مستقبل کے متعلق حتی المقدور تدبیر کرو -

۴. اپنے رہنما اور بزرگوں کی ہدایت و فرمائش کے مطابق خداوند قدوس کی رضاجوئی کرو - اس میں افراط یا تفریط نہ کرو -

۵. میری خدمت کی کوئی فکر نہیں - اللہ جل شانہ جب تک توفیق دے میں اپنی ۷۲ سالہ ہڈیوں کو بجاتا رہونگا - اہل و عیال کی خدمت کرونگا - توکل ہمیشہ خدا ہی پر رکھونگا -

"একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন রাসুলের (সা.) আনুগত্যের মাধ্যমে সম্ভব। রাসুলের (সা.) আনুগত্য হুবহু আল্লাহরই আনুগত্য। "যে ব্যক্তি রাসুলের (সা.) আনুগত্য করেছে সে নিঃসন্দেহে আল্লাহর আনুগত্য করেছে।" বীরপুরুষ সে ব্যক্তি যে নিজের পার্থিব (বৈষয়িক) ও আধ্যাত্মিক প্রতিটি দিককে ভারসাম্যের সাথে বহাল রাখে এবং এটিই হচ্ছে মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ"। পরিশেষে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে-

১. ভ্রান্ত দরবেশি অবলম্বন করো না। তোমার বাচনভঙ্গিতে মাজযুবের অভিলক্ষণ রয়েছে যা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

২. পরিবারের ভরণ-পোষণ, খিদমত এবং প্রতিপালন হচ্ছে শরিআত। শরিআত ব্যতীত কোন মারিফাত বা দরবেশি নেই। সঠিক মধ্যপন্থায় ফিরে এসো এবং প্রতিটি দিক ও বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করো।

৩. আপন সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করো এবং আল্লাহপ্রদত্ত তাওফিক অনুসারে তাদের ভবিষ্যতের জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাও।

৪. নিজ পথপ্রদর্শক এবং মুরুব্বিদের হিদায়াত ও নির্দেশ মুতাবিক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর। এতে কম বা অতিরিক্ত করো না।

৫. আমার খিদমতের কোন চিন্তা নেই। মহান আল্লাহ যতদিন তাওফিক দান করবেন, আমি আমার ৭২ বছর বয়সের কঙ্কালকে সচল রাখবো, পরিবার-পরিজনের খিদমত করে যাবো। তাওয়াক্কুল (ভরসা) সবসময় আল্লাহর ওপরই রাখবো।

তাঁর আরবি লিখনী

শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি.) বিরচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ'-এর মধ্যে হাদিস, ফিকহ, উসূলুল-ফিকহ, কালামশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা, তাসাওউফ এবং রাজনীতি বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রচুর উপাদান এত সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যে, এতে প্রতীয়মান হয়, এ মূল্যবান হারটির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মণি-মুক্তার সমাহার ঘটেছে। আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভীর মতে হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ' সাহিত্য গ্রন্থ না হওয়া সত্ত্বেও লেখক এ গ্রন্থ প্রণয়নে এমন অনুপম স্টাইল ও রচনাশৈলীর উদ্ভাবন করেছেন যা বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দেওয়ার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এ অনুপম স্টাইল প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনু খালদুনের পরে অন্য কেউ শাহ ওলিউল্লাহর সমকক্ষ হতে পারবেন না। আল্লামা হারীরীর পরে যিনিই কোন বিষয়ে মসি চালনা করেছেন, তাঁরই মাকামার স্টাইলে ছন্দোবদ্ধ গদ্যের শৃঙ্খলে এভাবে শৃঙ্খলিত হয়েছেন যে, পাঠকদের সামনে তিনি আসল বিষয়বস্তু খোলাখুলিভাবে তুলে ধরতে অক্ষম রয়ে গেছেন। এমনকি হারীরীর পরবর্তী লেখকগণের রিসালা (পুস্তিকা), চিঠিপত্র, গ্রন্থের ভূমিকা এবং দীর্ঘ কলেবরের ফাতওয়া পর্যন্ত হারীরীর স্টাইল থেকে মুক্ত নয়। পক্ষান্তরে শাহ ওলিউল্লাহ প্রাঞ্জল অথচ সহজ ও সাবলীল ভাষায় 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ' প্রণয়ন করেছেন।

অনুরূপভাবে আল্লামা ফজলুল্লাহর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে লিখিত তিন পৃষ্ঠা সম্বলিত আরবি ফাতওয়াটি ফিক্‌হশাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তির সাক্ষ্য বহন করার সাথে সাথে আরবি ভাষায়ও তাঁর দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। এ ফাতওয়াটির ভাষা প্রাঞ্জল, সহজ-সরল ও সাবলিল। অপরিচিত ও দুর্বোধ্য শব্দ এবং জটিল বাক্যমুক্ত। আজমি আরবি বা অনারবের কোন জড়তা এ ফাতওয়ার মধ্যে নেই। নিম্নে এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপিত হলো:

رجل تفوه في شان عالم ربانى بما لا يليق به وتكلم بافحش الكلمات وابذء السب والشتم، واهانه اشد الاهانة حتى بكشف عورته بين عينيه واجرى على لسانه بكمال الجرأة بعض كلمات الكفر، واقعة مرقومة مفصلة في قرطاس عليحدة بلساننا الوطني مربوط بهذه الفتيا - فيا ايها السادة من العلماء والاعلام من الفضلاء طالعونا بالامعان وافتونا بشريعة الرحمن رحمكم الله تعالى وايانا بالعفو والغفران -

الجواب :

اللّٰهُمَّ اني اعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا اعلم به واستغفرك لما لااعلم انك انت علام الغيوب - اما الاستفتاء ففيه أمور الاول شتمه رجلاعالما بالعلوم الدينية بافحش الكلمات واهانته اشد الاهانة حتي بكشف العورة بين عينيه وكل ذلك كان بسبب انه دعاه إلي الصلح والعدل والإنصاف وأنه امره بالمعروف اى بطلب الانصاف وترك السب و الشتم - والثانى كشف العورة الغليظة بين أعين الناس ، والثالث اهانته العدل والإنصاف و الضمان با فحش الكلمات مع أنها كلها أمور شرعية يجب احترامها والرابع اهانة اللحية . بالالفاظ الوديئة وبكونها معفاة - فالأمر الأول أن ذلك امر شنيع وفعل فضيح يفضى فاعله الي الكفر علي ما افتي به الفقهاء رحمهم الله تعالي وان اخترت الاحتياط كما اختاره بعض الفقهاء قلت : "يخاف عليه الكفر" ...

"والقول الفصل في هذا الباب انالانحب أن نقول لأحد من أهل القبلة وان صدر عنه بعض مفضيات الكفر " أنه كافر" بل علينا ان نأمره بالتوبة والاستغفار وتجديد النكاح احتياطا ولايسعه شرعا أن يرغب عن هذه الأمور الضرورية له -

هذا ماخطر بالبال والله عليم بحقيقة الحال -

এ ফাতওয়াটির সারসংক্ষেপ হচ্ছে যে, এক ব্যক্তি একজন খোদাভীরু আলিমকে অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করে এবং বিবস্ত্র হয়ে তাঁকে চরমভাবে অপমানিত করে। সাথে সাথে চরম ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকরতঃ কিছু কুফরি বাক্য উচ্চারণ করে এবং হীন ও জঘন্যতম বাক্য ব্যবহার করে অন্যতম সুন্নাত দাড়ির অবমাননা করে। মুফতি সাহেব অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সাবলীল ও মার্জিত ভাষায় খুবই সতর্কতার সাথে এ বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করে বলেন, "প্রথমটি হচ্ছে জঘন্য ও ন্যাক্কারজনক কর্ম এবং সম্মানহানিকর কাজ যা এ অপরাধ সংঘটনকারীকে কুফ্র এর দিকে ধাবিত করে, যে ব্যাপারে ফকিহগণ (রা.) ফাতওয়া প্রদান করেছেন যদিও আমি সর্তকতা অবলম্বন করেছি, যেমন কোনো কোনো ফকিহ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। আমি অভিমত ব্যক্ত করেছি, তার ওপর কুফর আপতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে"।

এ বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতিসহ ইমাম ও ফকিহগণের অভিমত আলোচনা করার পর উপসংহারে নিজ অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বলেন, "এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, কোন কিবলাপন্থির ব্যাপারে যদিও তার নিকট থেকে এমন বিষয় প্রকাশ পেয়েছে যা কুফরের দিকে ধাবিত করে, আমরা এ অভিমত প্রদান করা পছন্দ করি না যে, সে কাফির। বরং আমাদের উচিত হবে তাকে তাওবা ইসতিগফার করা (ক্ষমাপ্রার্থনা) এবং সতর্কতা হিসেবে বিয়ে নবায়নের হুকুম দেয়া। শরিআতের বিধি মুতাবিক এ জরুরি বিষয়গুলো উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ তার নেই।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আল্লামা ফজলুল্লাহর স্টাইল বা রচনাশৈলী নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর লিখনীর মধ্যে শিবলী নুমানীর স্বতঃপ্রবৃত্ততা, ফার্সি বাক্য গঠনের কলাকৌশল ও মনোরম শব্দ চয়ন, আবুল কালাম আজাদের আবেগ ও বাগ্মিতা এবং সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর উন্নত চিন্তা, জ্ঞানের গভীরতা ও পরিপক্বতার ছাপ সুস্পষ্ট। নিঃসন্দেহে এ বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর লিখনশৈলীর মান আরো বৃদ্ধি করেছে।

* বাংলাদেশে সৌদি আরবের প্রথম রাষ্ট্রদূত সাইয়িদ ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আরবি কবিতায় তাঁর নিজস্ব রচনাশৈলী ফুটে উঠেছে।

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) ভাষাগত উৎকর্ষ

আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তি-লিখনী, বক্তৃতা এবং আরবিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর ছিলো সমান পারদর্শিতা। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় হিন্দুস্তানের বিভক্তি নিয়ে সিমলা কনফারেন্সে উপস্থাপিত বিভিন্ন দলের অভিমত একত্রিত করে আরবি ভাষায় রচিত তাঁর নাটকটি আরবি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি বিষয়ে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি চুনতি মাদরাসার ছাত্রদের এই নাটকটি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন।

একজনকে কায়েদে আজম অন্যজনকে লিয়াকত আলী কাউকে মহাত্মা গান্ধী কাউকে নেহেরু, কাউকে নেতা পীটন, কাউকে খাজা নাজিমুদ্দিন এবং কাউকে সোহরাওয়ার্দী-এর ভূমিকায় উপস্থাপিত করে তিনি রচনা করেছিলেন এই নাটক। শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ করে অভিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর উৎকর্ষতা দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন সেদিন।

*সৌদি আরবের তেলমন্ত্রী জনাব যাকী ইয়ামানী লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া গ্রামের গ্যাস কোম্পানির খনি পরিদর্শনের প্রাক্কালে একটি প্রশংসাপত্র (স্বাগতিক কবিতা) আরবি ভাষায় রচনা করে তাঁর নিকট প্রেরণ করেছিলেন আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)। মাননীয় তেলমন্ত্রী আল্লামা ফজলুল্লাহর আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যিক উৎকর্ষ দেখে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে নিজেই চুনতি মাদরাসায় চলে আসেন এবং আল্লামা ফজলুল্লাহর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক একটি আকর্ষণীয় হাদিয়া পেশ করেন তাঁর খিদমতে।

*পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়ার প্রধান মুফতি আযীযুল হক সাহেব একদা আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের তৎকালীন মুহতারাম খতীব সাইয়িদ আবদুল করীম মাদানি (রহ.) এর নামে আরবি ভাষায় একটি পত্র লেখেন। উল্লেখ্য, মুফতি আযীযুল হক ছিলেন আরবি ভাষা ও সাহিত্যে একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম। ফরায়েযের কিতাব সিরাজীকে তিনি আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানি-এর নিকট লিখিত পত্রে তিনি আদব ও তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান রেখে একটি চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুফতি সাহেবের বিরোধীচক্র সাইয়িদ সাহেবকে উল্টো বুঝিয়ে মুফতি সাহেবকে তাঁর নিকট বিরাগভাজন করে তোলেন।

সৌভাগ্যবশত আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) বিষয়টি জানতে পেরে এই চিঠির ভাষায় আরবি সাহিত্য, প্রবাদ ও সম্মানসূচক সম্বোধন ইত্যাদি বিষয়ে সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানি সাহেবকে ভালোভাবে আরবিতে বুঝিয়ে দিলে তাঁর ভুল ভেঙ্গে যায়। ফলে মুফতি আযীযুল হকের সাথে সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানির গভীর ভালোবাসা ও হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে মুফতি আযিযুল হক সাহেব ইন্তেকাল করলে তাঁর জানাযার নামায সাইয়িদ সাহেব পড়ান।

বাস্তবিকই এটি সম্ভব হয়েছিলো আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) আরবি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকার কারণেই।

আরবি প্রবাদ সম্পর্কে আল্লামা ফজলুল্লাহর বিচক্ষণতা

কোলকাতা আকড়া আলিয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন একটি রুমালের ব্যাপারে আল্লামা ফজলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন। এটি কি আপনার রুমাল? মুহূর্তের মধ্যে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর উত্তরে বলেন– كأنه هو মনে হয় তাই।

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের বাক্য রানী বিলকিস স্বীয় সিংহাসনের ব্যাপারে হযরত সুলায়মানকে (আ.) বলেছিলেন। যার বর্ণনা রয়েছে সুরা নামালে। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) একথা শুনে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব আবেগাপ্লুত (وجد) হয়ে পড়েছিলেন।

আরবি পুস্তকের পাঠদান যোগ্যতা

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যেসব আরবি পুস্তক ছাত্রদের পাঠদান করতেন সেগুলোর মতন (Text) পড়তে হতো ছাত্রদের। মতন পড়ার সময় ছাত্ররা নাহু, সরফ এর মধ্যে যে ভুল করতো তা শুধরে দিতেন তিনি অকপটে। তিনি পুস্তকের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত করে ছাত্রদের মেধা ও মনে ঢুকিয়ে দিতেন সার্থকভাবে। ফলে মেধাবী, মধ্যম এবং নিম্নমানের সব ছাত্র তাঁর পাঠদানকৃত পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক অবগত হতো সমানভাবে। হিদায়তুল হিকমা এবং সুল্লামুল উলুম-এর মতো কঠিন গ্রন্থসমূহ তিনি প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থের ন্যায় ছাত্রদের মাঝে উপস্থাপন করতেন অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায়।

তাঁর পাঠদান এবং বক্তৃতা শোনার জন্য শিক্ষার্থীরা একাগ্রচিত্তে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করতো সাগ্রহে।

ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপত্তি

ফার্সি ভাষায় ছিল তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি। ফার্সি ভাষায় লেখা ও বক্তৃতায় তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। এ ভাষায় ছিল তাঁর সাহিত্যিক উৎকর্ষ। গদ্যের পাশাপাশি পদ্যেও তাঁর ছিলো বিশেষ প্রজ্ঞা। তিনি ছিলেন ফার্সি ভাষায় উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত।

তাঁর কাব্য ও কবিতা ছিলো স্বভাবগত। উদাহরণ হিসেবে তাঁর–

"إلتجأ بحضرت خير الورى صلى الله عليه وسلم" কসিদাটি নিম্নে সন্নিবেশিত হল–

(١) ہمچو سیمابم سکون قلب گم کردہ منم　　سوختہ اندوہگین و بس کہ آشفتہ سرم

(٢) اے امید عاصیان وراحت آشفتگاں　　رزوشب درخواب وبیداری خیالت ہمدمم

(٣) یافتم بارے درت صد حیف در چشم زدن　　صحبتت آخر شد و من زاں فغاں ہامی کنم

(٤) ایں تمنا باز حاصل گر بیاید شاہ من　　برق چوں خندان و ہمچوں ابر گریانت دمبدم

(٥) خاک کویت گر بدست آید بُرخ مالم ورا　　باز آں را تو یتائی چشم سازم مدبدم

(٦) شاہ کوئینی کجا تو من کجا بے مایہ خس　　لاف زن بر عشق تو باشم عجب شرمندہ ام

(٧) رحمتہ للعالمین، رحم خو، ذرّہ نواز　　از کرمہای تو من ایں گونہ جرآتہا کنم

(٨) کن کرم بر فضل خستہ غرق دریائے گناہ　　از ندامت شرمگین خجالت زدہ خود دمبدم

* আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) একবার স্বীয় পিতার নিকট ফার্সি ভাষায় চিঠি লিখেন যে, পাঠানো টাকার রশিদ এখনো পাওয়া যায়নি। ভাষা ছিলো এ রকম-

رسید نہ رسید رسیدے بمن نہ رسید

এটা পড়ে তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আল্লামা নুরুল হুদা যিনি ছিলেন ফার্সি ভাষার ইমামতুল্য, বলেন- হে আমার প্রিয় পুত্র মাওলভী ফজলুল্লাহ! তোমার এ বাক্যটি বিশিষ্ট ফার্সি কবি 'শেখ সাদি' এর বাক্যের অনুরূপ।

উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি

আল্লামা ফজলুল্লাহর উর্দু ভাষায় এমন পাণ্ডিত্য ছিল যে, উর্দু ভাষাভাষীকে পর্যন্ত স্বীয় লিখনীর মাধ্যমে প্রভাবিত করতেন। বিশেষ ভাবে উর্দু ভাষায় লিখনী ও বক্তৃতায় তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। হাঁটা-চলায়, সফর ও হদের তথা স্বীয় স্থানে অবস্থানকালীন সময় তিনি কবিতা লিখতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। উর্দু ভাষায় তাঁর রয়েছে বিশেষ কবিতাসম্ভার। এ ভাষায় তাঁর সাবলীলতা, বিশুদ্ধতা ও অলংকারপূর্ণ লিখনী দেখে উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তেন। তাঁর উর্দু ভাষায় রচিত একটি কাব্যিক মুনাজাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

ہو روسیاہ گناہ ہوں سے شرمسار یارب　　کس طرح منہ دکھاؤں احمد گونز و خیزاں

সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা ফজলুল্লাহর বিশিষ্ট ছাত্র মাওলানা হাবীবুল্লাহ সাহেব বলেন- 'তিনি একদিন আল্লামা ফজলুল্লাহর সাথে চুনতি মাদরাসায় যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বৌদ্ধদের একটি কিয়াং দৃষ্টিগোচর হয়। কিয়াং এর চতুষ্পার্শ বিভিন্ন রঙের ফুলে ফুলে সুশোভিত ছিলো। এই চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখামাত্র তিনি পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে আমাকে বলেন- স্মৃতির মানসপটে আমার কিছু কবিতা এসেছে, একথা বলে তিনি চলার পথে এগুলো লিপিবদ্ধ করেন।' একথা ধ্রুবসত্য যে তাঁর কাব্যিক প্রতিভা ছিলো স্বভাবগত; অর্জিত নয়।

উর্দু ভাষায় তাঁর সাহিত্যিক মান ছিলো উচ্চাঙ্গের। নিম্নের ঘটনাটি এর জ্বলন্ত প্রমাণ। একবার চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার কোনো এক অনুষ্ঠানে সেই সময়কার ডি.সি এফ.আই করিম যিনি ছিলেন উর্দু ভাষাভাষী, তাঁকে অতিথি হিসেবে দাওয়াত করা হয়। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) তাঁর প্রশংসায় উর্দু ভাষায় রচনা করেন একটি কবিতা। যেটি তিনি আমন্ত্রিত মেহমানের উপস্থিতিতে সে অনুষ্ঠানে পাঠ করেন। উর্দু ভাষায় তাঁর উচ্চারণভঙ্গি, লেখার স্টাইল ও পাণ্ডিত্য দেখে মেহমান খুবই বিমুগ্ধ হন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আল্লামা ফজলুল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন- আমি দীর্ঘদিন স্বীয় মাতৃভূমি থেকে দূরে অবস্থান করছি, দীর্ঘদিন পর আমি চুনতি মাদরাসার পাহাড়ে এসে স্বীয় মাতৃভাষা তাঁর সার্বিক সৌন্দর্য সহকারে শুনতে পাচ্ছিলাম। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের উচ্চাঙ্গের ভাষা শুধু হিন্দুস্তানে অবস্থানের কারণে নয়, বাস্তবতা হচ্ছে এটি একটি স্বভাবগত বিষয় যাকে ইচ্ছে আল্লাহ তাকে দান করেন–

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ'র সম্মেলনে তিনি উর্দু ভাষায় ১৫ পৃষ্ঠার যে লিখিত ভাষণ পাঠ করেছিলেন তা এখনো তাঁর হস্তলিপিসহ সংরক্ষিত রয়েছে। এ ভাষণ উর্দু সাহিত্যে তাঁর কল্পনাতীত পাণ্ডিত্যের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। অপরদিকে এতে রয়েছে তাঁর আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার ও সংরক্ষণমূলক ধ্যান-ধারণার বহিঃপ্রকাশ। উক্ত ভাষণকে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক বলা চলে। এর কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো-

قولہ تعالیٰ "ومار میت اذ رمیت ولکن اللہ رمی" کے راز کو سمجھ لیجئے۔ حضرت طارق رض نے آپنی فوج کو ہزاروں میل کی مسافت پر اندلس میں کشتیوں سے اتارا اور کشتیوں کو آگ لگا کر جلادیا - انکی فوج بہ نسبت افواج دشمن بہت قلیل مقدار میں تھی اور سامان جنگ کا بھی یہی حال تھا - ایسی پر خطر حالت میں کشتیوں کو جلادینا اور حفظ جان وسلامتی نفس کا کوئی راستہ باقی نہ چھوڑنا نزد عقل قابل اعتراض تھا —لوگوں نے سوال کیا - انکا جواب سنئے :

طارق رض

چوں بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت — گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست

دوریم از سواد وطن باز چوں رسیم — ترک سبب زروئے شریعت کجا رواست

خندید ودست خویش بہ شمشیر برد وگفت — ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست

বাংলা ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি

বাংলা ভাষায় ছিলো তাঁর বিশেষ প্রজ্ঞা। বাংলা ভাষায় তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দীন। চট্টগ্রামের আলিম সমাজের মধ্যে বাংলা ভাষায় আলোচনা রাখার ক্ষেত্রে তাঁরই খ্যাতি ছিলো

সর্বাপেক্ষা বেশি, তাই হাইস্কুলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষায় আলোচনার জন্যে তাঁকে দাওয়াত দেয়া হতো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে।

আল জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুফতি আযীযুল হক সাহেব বাংলা ভাষায় তাঁর পারদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তাই তো জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা বিভাগের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য হযরত মুফতি আযীযুল হক সাহেব আল্লামা ফজলুল্লাহকে অনুরোধ করেছিলেন একান্ত বিনয়ের সাথে। কিন্তু তিনি বিভিন্ন অনিবার্য ও সঙ্গত কারণে এ গুরুদায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, বিশিষ্ট ওলামায়ে কিরাম এ বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্যে মুফতি সাহেবের নিকট এ মর্মে আবেদন করেন যে, তিনি যেনো আল্লামা ফজলুল্লাহকে এ বিভাগের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান। উত্তরে মুফতি সাহেব বলেন- আমি আল্লামা ফজলুল্লাহকে দায়িত্ব পালনের জন্য যারপর নেই অনুরোধ জানিয়েছি; কিন্তু পারিনি। এবং পুরাতন আজান খানাতে قسم الترجمة و التصنيف-এর অফিস তাঁর জন্যে তৈরি করেছিলেন।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর কয়েকটি কারামাত

প্রসঙ্গকথা:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা মতে ওলি-আউলিয়াদের কারামাত সত্য। এর ভিত্তি হলো,

وكرامات الأولياء حق اى ثابت بالكتاب والسنة (شرح فقه الأكبر-٧٩)

অর্থাৎ: আউলিয়াদের কারামাত সত্য তথা কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

তবে এর পাশাপাশি আমাদের এও জেনে রাখা উচিত যে, কোন কারামাত বা অলৌকিক বিষয় বুজুর্গদের ইচ্ছাধীন নয়। সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার ক্ষমতাধীন। কোন বুযর্গ ইচ্ছে করে কোন কারামত প্রকাশ করতে পারেন না। বরং আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলেই কেবল তা প্রকাশিত হয়। তাই কারামত দেখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইবাদত নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করতে হবে। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কারামত প্রকাশের মূল ক্ষমতা বুজুর্গের হাতে রয়েছে মনে করা শিরক।

হযরত ঈসা (আ.) এর মাতা হযরত মরিয়ম (আ.) নবী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও আল্লাহপাক তাঁর মাধ্যমে অলৌকিক বিষয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁকে অমৌসুমি ফল আহার করিয়েছেন। সঙ্গতকারণেই প্রতীয়মান হয় যে, এটি ছিলো হযরত মরিয়ম (আ.) এর কারামত। ইরশাদ হচ্ছে:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ [٣:٣٧]

অর্থাৎ: অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন-অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?" তিনি বলতেন, "এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন।"
(সুরা আলে ইমরান-৩৭)

তেমনিভাবে হযরত ওমর (রা.)-এর মদিনায় বসে বহুদূরের জিহাদরত মুজাহিদদের নির্দেশ প্রদান। হযরত হানজালা(রা.) কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে গোসল দান।এসবই বুজুর্গদের কারামত সত্য হবার প্রমাণ।

নিম্নে পাঠকদের উদ্দেশ্যে আল্লামা ফজলুল্লাহ্ (রহ.) এর কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ও কারামাত তুলে ধরা হলো। এর মাধ্যমে আমরা যেমন আল্লামা (রহ.) এর ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য

সম্পর্কে জানতে পারবো, তেমনি পরবর্তী প্রজন্ম নিজেদের জীবনপথে কিছুটা হলেও আল্লাহর পথে চলার উৎসাহ পাবে, ইনশাআল্লাহ!

১. গায়েবি আওয়াজ

বহুকাল আগের কথা। আব্দুন নবী নামে আল্লামা ফজলুল্লাহর এলাকার এক ভক্ত ছিলো। সে কাজ করতো তখনকার ছোট্ট দেওদীঘি বাজারের এক দোকানে। স্বাভাবিকভাবেই সেসময় যোগাযোগ ও রাস্তাঘাটের অবস্থা ছিলো অনুন্নত। বিদ্যুৎ তো ছিলোই না। গাড়ি-ঘোড়াও চলতো নাবললেই চলে। তাই আব্দুন নবী প্রতিরাতে কাজ শেষে হেঁটে-হেঁটেই বাড়ি ফিরতো। এভাবে একদিন অমাবস্যার রাতে আব্দুন নবী দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যেতে চাইলে, সওদাগর বললো, আজ অন্ধকার বেশি, হাতে একটা লোহা-টোহা নিয়ে যাও। এই বলে তিনি দোকানে থাকা একটা দা আব্দুন নবীকে দিলেন। আব্দুন নবী সেই দা-হাতে হাঁটা শুরু করলো। হাঁটতে-হাঁটতে সে বুড়িরখাল পর্যন্ত আসার পর ঘটে গেলো অদ্ভুত এক ঘটনা! তক্তারপুলের ওপর দেখতে পেলো, বিশাল এক দৈত্য দাঁড়িয়ে। সে আব্দুন নবীর পথ আগলে উচ্চস্বরে কী যেনো বলছিলো। কিম্ভূৎকিমাকার দৈত্য দেখে ও আওয়াজ শুনে আব্দুন নবী ভড়কে যায়। ভয়ার্ত কণ্ঠে দু'আ-দুরুদ পড়া শুরু করে। কিন্তু ওই দৈত্য চলে যাচ্ছিলো না। এভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর হঠাৎ এক গায়েবি কণ্ঠ শুনতে পায়। যেখানে তাকে বলা হচ্ছে, দু'আটা পড়ো, আব্দুন নবী। তখন সে ছোট্ট দু'আটি পড়লো। আল্লাহর কী শান! মুহূর্তেই ওই দৈত্য পুল থেকে খালে নেমে গেলো। আব্দুন নবীর বর্ণনামতে দৈত্যটা এতো লম্বা ছিলো যে, খালে নামার পরও তার কোমর পর্যন্ত পানির ওপর ছিলো!

ঘটনার কয়েকদিন পর আল্লামা ফজলুল্লাহ বাড়িতে আসলে আব্দুন নবী তাঁর সাথে দেখা করেন, তখন আল্লামা নিজ থেকেই তাকে বলেন, তোমাকে যে দু'আটি শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। সেটা মনে রেখো এবং কারো ক্ষতির জন্য এটি ব্যবহার করলে তুমি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এই বিষয়টি কাউকে বলার দরকার নেই।

তাঁর আদেশ মতে আব্দুন নবী তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত বিষয়টি কারো সঙ্গে শেয়ার করেননি। আল্লামার ইন্তেকালের পর সে তাঁর মাহাত্ম্য তুলে ধরতে গিয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করে তাঁর সন্তান আবুজিয়াকে।

২. চোরের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলা

আল্লামা ফজলুল্লাহর ইন্তেকালের পরে এক প্রতিবেশী যার নামের আদ্যাক্ষর 'আ' দিয়ে শুরু, আল্লামার কারামাতের সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, একদিন রাতের বেলা আমি মৌলভী সাহেবের (আল্লামাকে সম্মান করে সম্বোধন করতেন) বাড়িতে গেলাম। দেখি, দক্ষিণের নির্ধারিত রুমে তিনি ঘুমিয়ে আছেন। আমি সুযোগ বুঝে মেইন দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে চাই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বাইরে থেকে মৌলভী সাহেবকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পাই। তখন উত্তরের দরজা দিয়ে ঢোকার পরিকল্পনা করলাম। অবাক ব্যাপার, ওই দরজায় গিয়েও একই ধরনের অভিজ্ঞতার শিকার হলাম। ওখানেও তাঁকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখি।

ঘটনার অস্বাভাবিকতায় কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে আমি আবার দক্ষিণের রুমের বাইরে যাই। গিয়ে দেখলাম, মৌলভী সাহেব ঘুমাচ্ছেন। তখন দরজার সামনে তাঁকে দেখার বিষয়টিকে দৃষ্টিভ্রম হিসেবে নিয়ে সাহস করে মেইন দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ি।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, ঘরে ঢোকার পর চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। তখন আমার বুঝে আসলো, আমি আসলে অনেক বড়ো পাপ করে ফেলেছি। তাহাজ্জুদের জন্যে মৌলভী সাহেব উঠলে আমাকে দেখতে পান। তিনি বুঝতে পারেন। আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিলে আমি আবার চোখে দেখতে পাই।

উল্লেখ্য, ওই প্রতিবেশীর স্বীকারোক্তিমতে তিনি সেদিন অন্যজনের হয়ে জমিজমার কাগজপত্র চুরির উদ্দেশ্যে আল্লামার ঘরে ঢুকেছিলেন।

৩. কবিয়ালের মৃত্যু

তৎকালীন দেশের অন্যান্য জায়গার মতো আল্লামা ফজলুল্লাহর গ্রামের বাড়ি সাতকানিয়া মাদার্শায় তখন কবিগানের আসর বসতো। কবিয়ালরা শরিআতবিরোধী বিভিন্ন কথাবার্তা কবিগানে পরিবেশন করতো। এসব দেখে, একদিন আল্লামা আসর করতে নিষেধ করলেন এবং বকাঝকা করলেন। তিনি চলে আসার পর জনৈক কবিয়াল হুজুরকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে। লোকজন তাকে বারণ করলেও সে গালি দিতেই থাকে। ফলে কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায়, উক্ত কবিয়ালের গলা দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। এবং রক্ত বের হতে-হতে সে অনুষ্ঠানস্থলেই মারা যায়। উপস্থিত দর্শকদের ধারণা, এটা হয়েছে হুজুরের মতো একজন আল্লাহঅলা মানুষকে গালিগালাজ করার কারণেই।

৪. অধ্যয়নের সময় সাপ

একবার চুনতি মাদরাসায় হুজুর নিজ রুমে চিরাচরিত নিয়মে চৌকিতে আধ-শোয়া অবস্থায় হেলান দিয়ে কিতাব অধ্যয়ন করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ উপস্থিত এক ছাত্র দেখতে পায় যে, হুজুরের শিয়রে একটি সাপ ফণা-তোলা অবস্থায় কিতাবের দিকে তাকিয়ে আছে। ছাত্ররা আতংকিত হয়ে সাপটাকে মারতে চাইলে, হুজুর নিষেধ করেন। পরে সাপটি অদৃশ্য হয়ে যায়। ছাত্রদের বর্ণনামতে এ ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে।

৫. অজু করার সময় সাপ

লোহাগাড়া উপজেলাধীন পুটিবিলা হামেদিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ মাওলানা হাসান আলীর বর্ণনামতে আল্লামা ফজলুল্লাহ মাদরাসার উদ্বোধক হিসেবে সেখানে উপস্থিত হন। আসরের সময় হুজুর মাদরাসার বারান্দায় বসে ওজু করছিলেন। এমন সময় দেখা গেলো, একটা সাপ হুজুরের পাশে ফণা তুলে আছে। সাপ দেখে উপস্থিত ভক্তরা সাপটাকে মেরে ফেলতে চাইলে হুজুর নিষেধ করেন। দেখা গেলো, হুজুরের অজু শেষ হলে সাপটি নিজ থেকেই চলে যায়! সুবহানাল্লাহ!

৬. স্বপ্নযোগে ইন্তেকালের সংবাদ

আল্লামার ইন্তেকালের সময় অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে এতদাঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থা এতো সহজ ছিলো না। সেলফোন বা মোবাইল তো ছিলোই না। টেলিফোনও ছিলো শহর কিংবা মফস্বল শহরের হাতেগোনা কিছু প্রতিষ্ঠানে। জনে-জনে হাতে-হাতে ফোন তো কল্পনাই করা যায় না! সঙ্গতকারণেই তখন কারো ইন্তেকাল হলে স্বশরীরে গিয়ে মৌখিকভাবেই মৃত্যুসংবাদ পৌঁছানো হতো। তাই মুখে যতোদূর বা যাদের পর্যন্ত খবর পৌঁছানো যেতো,শুধু তারাই জানাজায় অংশ

নিতে পারতেন।কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা ! তাঁর জানাজায় দূরদূরান্ত হতে এমন সাতজন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন. যাদের কাছে আল্লামার ইন্তেকালের খবর পৌঁছেনি বা পৌঁছানো সম্ভব হতোই না।

পরবর্তীতে তাঁদের প্রত্যেকের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় যে, স্বপ্নযোগেই তারা হুজুরের ইন্তেকালের বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ককসবাজার হাশেমিয়া মাদরাসার সাবেক রেক্টও আল্লামা মুযহির আহমদ (রহ.), আল্লামা ফজলুল্লাহর জামাতা বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসার সাবেক সহকারী অধ্যাপক (আরবি) ও মুহাদ্দিস মাওলানা ফৌজুল কবির এবং চট্টগ্রাম রহমতগ্রঞ্জস্থ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাওলানা মুস্তফা মুনিরুদ্দিন আখতার অন্যতম। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে স্বপ্নযোগে আল্লামা ফজলুল্লাহর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিয়েছেন মুজাদ্দিদে মাহফিলে সীরাতুন্নবী (সা.) শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ রহ. (চুনতির শাহ সাহেব রহ.) সুবহানাল্লাহ!

৭.জিনের চিঠির মর্মোদ্ধার

মুফতি মাওলানা গোলাম কাদের রহ.। তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর ছাত্র ও আত্মীয়। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) জীবদ্দশায় মুফতি গোলাম কাদেরের জ্যেষ্ঠ সন্তান গ্রামের বাড়ি হতে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি ও অপেক্ষায় কেটে যায়। বিভিন্ন ঘনিষ্ঠজনের পরামর্শে মুফতি সাহেব একজন আলিমের মাধ্যমে এক জিনের সাথে কথা বলে এ বিষয়ে তাঁর সহযোগিতা কামনা করে একখানা উর্দু চিঠি দেন জিনের বাদশাহ বরাবর। এক সপ্তাহ পর এর জবাব আসে। কিন্তু এ চিঠি কেউ পড়তে পারছিলেন না বিধায় মর্মোদ্ধারও করা যাচ্ছিলো না। অবশেষে মুফতি গোলাম কাদের রহ. হাটহাজারী হতে বাড়িতে এসে আল্লামা ফজলুল্লাহর কাছে যান এবং তিনি অনায়াসেই চিঠি পড়ে এর সারসংক্ষেপে বলেন, 'তোমার ছেলেকে ২/৩ দিনের মধ্যে চলাচলের পথে পেয়ে যাবে এবং অপহরণকারী সে দুষ্টু জিনকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে চিঠিতে।'

এর ২/৩ দিন পর মাওলানা গোলাম কাদের রহ. বাড়ি হতে হাটহাজারীর মেখল মাদরাসায় আসার পথে চট্টগ্রামের কালুরঘাট এলাকায় তাঁর ছেলেকে ঘোরাঘুরি করাবস্থায় পেয়ে যান। সুবহানাল্লাহ! কী পরিমাণ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানপ্রজ্ঞার অধিকারী হলে এটা সম্ভব তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।[১]

৮. অপূর্ব অসিয়ত

আল্লামার কনিষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিনের বর্ণনামতে ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে (২মার্চ ১৯৭৯) আল্লামা ফজলুল্লাহ তাঁর সহধর্মিণীসহ সবাইকে ডাকলেন। সবার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিলেন। এবং বললেন, 'আমার মনে হয়, আমার সময় আর খুব বেশি দিন নেই। আমার ইন্তেকাল যদি এখানে (ঘরে) হয়, তাহলে তোমরা আমার নাতির পাশেই (উঠোনের অদূরে এক নাতির কবর ছিলো) আমাকে দাফন করবে। আর যদি আমার ইন্তেকাল চুনতিতে হয়, তাহলে লাশ এখানে আনার জন্যে জোরাজুরি করবে না। শাহ্সাহেবের সিদ্ধান্ত মেনে নিবে।' একথা শুনে আল্লামা পুত্র আবুজিয়া বলেন, 'তা হবে না আমরা নিয়ে

---

[১] আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. এর পুত্রবধু আনজুমান আরা শামসুদ্দিন ও মুফতি মাওলানা গোলাম কাদের রহ.

আসবো।' তখন আল্লামা ফজলুল্লাহ তাঁকে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে বলেন, 'ওখানে মাদরাসার কাছে কবর হলে ভালো, কারণ জেয়ারত বেশি হবে।'এরপর তিনি মরহুম খদিজাকে (মরহুম মাওলানা সিরাজের স্ত্রী, যিনি আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. এর অভিভাবকত্বে পড়াশোনা করেন এবং খদিজার সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করেন) বলেন, 'তোমাকে একজন নেককার স্বামী দিয়েছি এবং তাঁকে পড়ালেখা করিয়েছি। বিনিময়ে আমার মৃত্যুর পর কুরআন তিলাওয়াত করে দু'আ পৌছিয়ো এবং পাঁচওয়াক্ত নামাজের পর আমার জন্যে বিশেষ করে দু'আ করবে।' এর পরদিন সকালে তিনি জাফরাবাদ মাদরাসার মাহফিলে চলে যান এবং রাতেই চুনতি শাহ্ সাহেবসহ (রহ.) মাদরাসায় চলে আসেন।

আর এটাই ছিলো তাঁর শেষ যাওয়া। এরপর তিনি চুনতি মাদরাসাতেই ইন্তেকাল করেন। দেখা গেলো, শাহ্ সাহেব (রহ.) আল্লামার জন্যে চুনতিতেই কবরের ব্যবস্থা করলেন। আরো আশ্চর্য ব্যাপার, শাহ্ সাহেব (রহ.) কবরের জায়গাটি দেখিয়েতখন বলছিলেন, নাজেম সাহেব হুজুর সারাজীবন কুরআন-হাদিস পড়িয়েছেন, দাফন এ জায়গায় করো, ইনশাআল্লাহ, কিয়ামত পর্যন্ত তিনি কুরআন-হাদিস শুনবেন।' আল্লাহর রহমতে পরবর্তীতে তা-ই হয়েছে। হুজুরের কবরের পাশেই এখন মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে সবসময় কুরআন-হাদিস পঠিত হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ!

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর মহীয়সী সহধর্মিণী

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর সহধর্মিণী রত্নগর্ভা রহিমা খাতুন (রহ.)-এর ইন্তেকাল পূর্ব কয়েকটি ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বভাবতই তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার ও নেককার মহিলা। সর্বদা যিকিরে-ফিকিরে থাকতেন। পরিবারের সবাইকে মায়া-মমতায় আগলে রাখতেন। আল্লামা (রহ.) অধিকাংশ সময় মাদরাসায় (কর্মস্থলে) অবস্থান করায় পরিবারের প্রায় দায়িত্ব তিনিই পালন করতেন। সুচারুরূপে সবকিছু সামলে নিতেন। অধ্যক্ষ ডা. মাওলানা হাবীবুল্লাহ (রহ.)-এর ভাষায় তিনি ছিলেন সাবেরা, যাহেদা, আবেদা, যাকেরা ও শাকেরা তথা ধৈর্যশীলা, দুনিয়াবিমুখ, ইবাদতগুযার, যিকিরপ্রিয় ও শোকরকারিণী।

অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন সাহেব মা সম্পর্কে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

১. ১৯৯১ সালের কথা। অসুস্থ আম্মাজান তখন অবস্থান করছিলেন আমাদের মেঝো বোনের চাক্তাইস্থ বাসায়। এমন সময় আমার অগ্রজ সহোদর প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী ভারত গমনের মনস্থ করেন। সম্ভবত তিনি দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা থেকে সার্টিফিকেট ইত্যাদি আনতে যাচ্ছিলেন। ঘটনার দিন তারিখ ঠিক মনে নেই। ঘটনাস্থলেও আমি উপস্থিত ছিলাম না।

আম্মার ইন্তেকালের পরে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের সিনিয়র পেশ ইমাম মুহিব্বুল্লাহ নদভী জবানিতেই এ ঘটনা শুনি। তিনি বলেন, 'সেদিন নদভী সাহেব যখন তাঁর মায়ের কাছে বিদায় নিতে যান, তখন খালাম্মা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বেশ কিছুক্ষণ কান্না করেন। অথচ ইতোপূর্বে নদভী সাহেব যে প্রায় সাত-আট বছর পড়াশোনার সুবাদে ভারত যাওয়া–আসা করেছেন, কখনো তিনি এভাবে চোখের পানি ফেলেননি। দীর্ঘক্ষণ কান্নার পর খাল্লাম্মা নদভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন:

– ভারত থেকে কয়দিন পর ফিরবি?

উত্তরে নদভী সাহেব বলেন,

এক মাস পর।

– 'এক মাস পর নয়; তুই বরং ২০ দিন পরই ফিরে আসিস।' এই কথাটি তিনি দুইবার বলেছিলেন।

উত্তরে নদভী সাহেব বলেন,

– আচ্ছা, ঠিক আছে আম্মা। চলে আসবো, ইনশাআল্লাহ।'

এরপর অনিবার্য কারণে নদভী সাহেবের পক্ষে ২০ দিন পর দেশে ফেরা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে ঠিক ২০দিন পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। তিন দিন অসুস্থ থেকে চতুর্থ দিন ২৭ নভেম্বর ১৯৯১ইং বুধবার বাদে ফজর তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

এই ঘটনা মুহিব্বুল্লাহ নদভী নিজেই বর্ণনা করে বলেন, আপনারা তো কেবল আপনাদের আব্বার কারামাত সম্পর্কেই অবগত আছেন। কিন্তু আপনাদের আম্মাজানও যে আধ্যাত্মিক জগতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, এ ঘটনায় তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং এর সাক্ষী আমি।

২. একই বছরের অর্থাৎ ১৯৯১ সালের কথা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অনার্স ফাইনাল ইয়ারের লিখিত পরীক্ষা শেষ। ভাইভার ডেট পড়েছে। কিন্তু ভাইভার তিন-চার দিন আগে গ্রাম থেকে খবর আসে যে, আম্মা ভীষণ অসুস্থ। এমনকি কথাবার্তা বলা বন্ধ হয়ে গেছে! খবরটা শুনে তৎক্ষণাৎ আমি শহর থেকে বাড়ি চলে যাই। কিন্তু আম্মার কোনো প্রকার উন্নতি হয়নি। বিধায় আম্মাকে এমন অবস্থায় রেখে শহরে এসে ভাইভা দিতে ইচ্ছে করছিলো না। কিন্তু, আল্লাহর কী মহিমা, ভাইভার দিন সকালে আম্মা আওয়াজ ফিরে পেলেন। কথা বলতে পারলেন! এবং আমাকে বললেন, 'যা, পরীক্ষা দিয়ে আয়। ইনশাআল্লাহ, আমার কিছু হবে না।'

   সুতরাং তৎক্ষণাৎ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে চলে যাই এবং ভাইভা দিয়ে যথারীতি রাতে বাড়ি ফিরি। পরদিন ফজরের পর আম্মা ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

৩. আম্মার ইন্তেকালের পর দেখা যায়, তাঁর রুমে লাখ-লাখ যিকর-তাহলিলের সুতো ও রশি। যেসব সুতো ও রশিতে তিনি গিট মেরে-মেরে তাসবিহ-তাহলিলের হিসেব রাখতেন। কেউ যাতে দেখে না ফেলে, তিনি তা আড়াল করে রাখতেন। আম্মার এ জিনিসগুলো বের করেছেন, আমাদের সম্মানীয়া ভাবী (চেয়ারম্যান সেলিমের আম্মা), তিনি আল্লাহর রহমতে এখনো জীবিত আছেন।

আধ্যাত্মিকভাবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী না-হলে এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাবলি যে সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ পাক আমাদের মহীয়সী মা-কে জান্নাতুল ফেরদৌসের সম্মানিত আসন নসিব করুন। আমিন!

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) স্মরণীয় বাণীসমূহ

(١) " مسلمانوں کا اپنی عالمگیر اخوت و قومیت اسلامیہ کو فراموش کر کے بندۂ حرص وآز ہو کر قبائلی عصبیت اور نسلی و لسانی و وطنی تفریقات میں پھنس جانا اپنی ہلاکت کو بلا لینا اور فلک الافلاک سے تحت الثریٰ میں انحطاط کرنا ہے۔" ... علّامہ فضل اللہ

(১) "মুসলমানদের বিশ্বজোড়া ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামি জাতীয়তাবাদ ভুলে লোভ-লালসার মোহে গোষ্ঠী, ভাষা, বর্ণ ও দেশভিত্তিক বিভাজনে আটকা পড়ার অর্থ হলো নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনা এবং উন্নতির আকাশ থেকে ধ্বংসের পাতালে নিপতিত হওয়া।"
–আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

(٢) " مسلمانوں میں جب تک خدا طلبی رہی دنیا لوٹ پوٹ ہو کر ان کے قدم چومتی رہی اور جب مسلمانوں نے دنیا طلبی شروع کر دی تو دنیا ان سے دور بھاگی۔ ....علّامہ فضل اللہ

(২) "মুসলমানদের মাঝে যতোদিন খোদাপ্রেম ছিলো, ততোদিন পৃথিবী তাদের চরণতলে ছিলো। মুসলমানরা যখন দুনিয়ার পেছনে ছোটা শুরু করলো, পৃথিবী তখন তাদের থেকে দূরে চলে গেলো।"
–আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

(٣) اعدائے اسلام نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی غرض سے زبان و قلم، سنان و علم سب کچھ استعمال کیا۔ تخریبی تدابیر میں ان سے جس قدر ہو سکتی تھی اس میں کوئی کسر نہ رکھیں"۔ ...علّامہ فضل اللہ

(৩) "ইসলামের শত্রুরা ইসলাম ও মুসলমানদের নিঃশেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে মুখ ও কলম, তরবারি ও জ্ঞান-সবকিছুরই সর্বাত্মক ব্যবহার করেছে। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে সম্ভাব্য সবকিছুর প্রয়োগে তারা কোনো কার্পণ্য করেনি।"
–আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

(٤) ای مسلمان تو بیدار مسلمان ہو جا

اور دل و جاں سے تو حامی قرآن ہو جا

ہے مسلمان تو ہے عالم ہستی تیرا

روح افلاک کی خاطر تو پرافشاں ہو جا

..... علامہ فضل اللہ

(৪) "হে মুসলিম, তুমি জাগ্রত মুসলিম হয়ে যাও
প্রাণ-মনে তুমি কুরআনের রক্ষক হয়ে যাও
মুসলিম তুমি, সৃষ্টিকুলের সবকিছু তোমারই
মহাবিশ্বের জন্যে তুমি আলোকিত হয়ে যাও!"
–আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

(٥) "مرض وعلالت یا صحت وعافیت ایسی حالتیں ہیں جو انسانی اختیارات سے باہر ہیں۔ یہ دنیا ہے جنّت نہیں ہے۔ یہاں سرّاء وضرّاء دونوں لازم ہے۔ مؤمن کیلئے رضا بالقضا لازم ہے۔ ...علّامہ فضل اللہ

(৫.) "রোগ-ব্যাধি, স্বাস্থ্য-সুস্থতা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। এটা পৃথিবী, বেহেশত নয়। এখানে আনন্দ-বেদনা দুটোই থাকবে। মুমিনকে তাই, তাকদিরে বিশ্বাসী হওয়া অপরিহার্য।"
–আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

(٦) "کوئی قوم جب ایمانی قوت واستحکام کے ساتھ محکم ہو تو اسکو مادی قوتیں ہرگز مغلوب نہیں کر سکتیں"۔
...علّامہ فضل اللہ

(৬) "কোনো জাতি যখন ঈমানী বলে বলীয়ান এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তখন কিছুতেই তাকে বস্তুবাদী পরাশক্তি পরাজিত করতে পারে না।"
–আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

كلمة الترحيب

تبا لحساد العرب تبا لهم

قوم اليهود وكل ذراري الشيطان

فضيلة الشيخ العلامة أبو البركات محمد فضل الله

رئيس المدرسة الحكيمة العالية بشنوتى شيتاغونغ

القيت هذه القصيدة بحضور صاحب السعادة سفير المملكة العربية السعودية الأسبق السيد فؤاد عبد الحميد الخطيب لدى بنغلاديش في المؤتمر الذي عقد للسيرة النبوية من ١١ الى ٢٢ ربيع الاول سنة ١٣٩٨هفي مجلس الوحدة بشنوتى (القرية التاريخية العريقة المليئة بكثرة العلماء الربانيين و الأولياء و كبار رجال العلم و الثقافة من الزمن القديم)، شيتاغونغ.

(١) قد قدمتم وأنتم اجلة في الشأن # بقدومكم شرفتمونا كل السكان

(٢) لنحبكم بحب رسولنا المصطفى # ولحبكم والله جـــزء الإيمان

(٣) وهذا الحب حقيقة لا تصنع # ولا تملق بل ناش من الإيقـــان

(٤) لنـــؤقر سكان ديار حـبيبنا # ويعـــزهم كل من أهل الإتقـــان

(٥) لم لا؟ وقد نزل هناك جبرئيلنا # بالـــوحي والآيات للقـــرآن

(٦) فرح الرجال والنساء بـجميعهم # نشط الشيوخ والكهول كالصبيان

(٧) يا من تـــحلى بالمكارم خلقكم # يا من تجلى نوركم بالفيضـــان

(٨) شرف لكم لا ريب فيه بحصولكم # شرف الجوار بسيد الأكوان

(٩) ولفضلكم حـــتما بدأ بوصولكم # فخر الجوار بكعبة الرحمن

(١٠) فطلعتمونا وأنتم شموسنا # وبنور وجوهكم حجل القـــرآن

(١١) ياحبذا شرف العرب بلسانهم # كلسان القرآن وأهل الجـــنان

(١٢) فلنعم ذا فخر العرب هي مولد # لنبينا هو فخر نوع الإنســـان

(١٣) حبالكم أهل العرب وكرامة # وســـتأتكم نصرة الـــرحمن

(١٤) تبا لحساد العرب تبالهم # قوم اليـــهود وكل ذراري الشيطـــان

(١٥) ندعو الاله لجلالة الملك السعود # أبقاه قائد ملكه طول زمان

(١٦) ويكون رعبه غالبا أعداء # ويســـوغ نظـــمـــه جملة البلـدان

(١٧) هو خادم الحرمين مأوى المسلمين # فلذا هو أنسان عين الإنسان

(١٨) فالله بارك فى إســـمه هو خالد # فيخلد ملكه بحـــــفظ المنان

(١٩) فاحفظ اللّٰهُمَّ دول المسلمين # منه شر أعدائها بـحتم الحفظان

(٢٠) بشرى لنا ولكم بحفلة سيـ # رة النبى هو باعـث الأكـوان

(٢١) فيها لأسوة بحسن نظامـــها # لحياتنا ومماتنا كل زمـــــان

(٢٢) فيها أساليب المعاشرة كلها # فيها لتكميل ضوابط الإحسان

(٢٣) فيها نظام معاشرة الإنسان # فيها قيام عبادة الـــــرحمن

(٢٤) فيها السياسة بحسن أطوارها # وإقامة العدل حقا بـميزان

(٢٥) فيها لهدى لصغارنا وكبارنا # تربية فيها وتقوية الإيمـان

(٢٦) أغراضنا بحفلة ليست إلّا # إشاعة السيرة هي ناسخة الأديان

(٢٧) وصبابة حب النبى فى قلوبنا # لابد لنا منه في لقاء الرحمن

(٢٨) وهداية الناس إلى الأمن المدام # فان السيرة توضح طرق الأمان

(٢٩) خلق عظيم للنبى كالقرآن # فنشرها هي خدمةالقـــرآن

(٣٠) فسيرته والله حرز قلوبنا # هي روحنا هي محكمة البنيـــان

(٣١) قد ألهمت هي قبل ست سنوات # في قلب شاه شنوتي شهيد زمان

(٣٢) فأشاعها الله فى الأرض أفاقها # وأطرافها النائية بقليل زمان

(٣٣) السيرة هى مرأة دين الإسلام # من يبتغ غيره ضل بالـــبطلان

(٣٤) إسلامنـــا دين لنـــا لحياتنا # ومماتنا هوناسخ الأديـــــان

(٣٥) فحفلة السيرة أثلجت قلوبنا # تمايل إليها الشيوخ مع شبان

(٣٦) علمائنا شغفوا بها بعـلومهم # وبوعظهم وفصاحة وبيـــان

(٣٧) رؤسائنا اشتاقوا إليها خدمة # بمعونة مالية ونظام وعمران

(٣٨) فقرائنا فتبادروا بمـحبة # وبخـــدمة بمـــشقة الأبـــدان

(٣٩) إن الأمور ثلاثة بعزيمة # لشاه شنوتي العارف الـــــربانى

(٤٠) المدرسة والحفلة والمسجد # فالأوليان جرتا بعون السبحان

(٤١) ثالثها هو مسجد قد أرسمت # لم يبرز هو في الوجود حتى الان

(٤٢) نرجو من الله الإعانة من لديه # هو لايرد راجيه بالحرمان

(٤٣) وصلت علوم الدين الجوانب كلها # اذ بادرت إلى الافاق والبلدان

(٤٤) سفائن تجار العرب بشراعها # سارت إلى الممالك الشرقانى

(٤٥) وصلت إلى مناطق غرب بنغالة # منها إلى شيتاغونغ بحسن الجريان

(٤٦) هذا المقام قد ساغهم بمناخه # فكثيرهم استوطنوه بالعمران

(٤٧) فثلاثة أرباع من أهل الوطن # أولادهم والباقي قديم السكان

(٤٨) فعلوم العرب شاعت من هنا إلى ال # جوانب بدينه طول زمان

(٤٩) فمدارس بنجلاديش أن آلافها # فرقانيات بتجويد القـــرآن

(٥٠) مدارس الحفظ جارية آلافها # لخدمة كتاب الله الفـــرقان

(٥١) والوسطيات في الملك وكبرياتها خمـ # سة آلاف بفنون علم القرآن

(٥٢) فالصرف والنحو والأدب مع نظمه # وعلم البلاغة والبديع بالبيان

(٥٣) والمنطق بالحكمة والفقه وأصوله # علم الحديث بالأصول وتفسير القرآن

(٥٤) وهذه المدرسة بين أعينكم # منسوبة إلى عبد الحكيم قطب الزمان

(٥٥) ومؤسسها الأستاذ الشاه نذير أحمد # حبر العلوم ونحرير العرفان

(٥٦) والشاه حافظ هذا فأخوه نسبة # وتلميذه في العلم والعـــرفان

(٥٧) مستغرق حب الرسول على رسله # باني هذه الحفلة بهذا الشان

(٥٨) ساداتنا أن أرضنا جميلة خضراء # لكن ثروة بطنها مخفية إلى الآن

(٥٩) فما استطعنا سعى إخراجها بأصولها # فلم نقدر التمتع بها بشئوم الحرمان

(٦٠) فأهل ديارنا بعمومنا مساكين # لانقدر توسيع المدارس بالحسبان

(٦١) والحال أن طلابها لكثيرة # بكثرة جزيلة برغـــبة وميـــلان

(٦٢) فها أنا خادمكم أحقر الورى # فضل الله الغـــافر الرحـــمان

(٦٣) قدمت إليكم شئوننا ملخصا # لضيق الوقت لا بخدعة الكتمان

(٦٤) ساداتنا! خـتم الكلام بكلمة # فأقولـــها من اسة الفيضـــان

(٦٥) أعدائكم أعدائنا وأحبابكم # أحبابنا فـــاقولها بالإيمـــان

خدمتگزاران فارسی

در بنگلادیش

دکتور محمد کلیم سهسرامی

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

داکا

نام کتاب : خدمتگزاران فارسی در بنگلادیش

نویسنده : دکتور کلیم سهسرامی

ناشر : رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - داکا

شمارهٔ پلاک - ۵۴، شمارهٔ خیابان - ۸/ ای

دانموندی، داکا - ۱۲۰۹، بنگلادیش

تاریخ انتشار : ۱۹۹۹م

تیراژ : ۱۲۰۰

قیمت : ۲۰۰ حروفچینی و صفحه بندی : طارق سراجی

چاپ : چوکش، ۱۳۱-دی-آی-تی اکستنشن رود

داکا - ۱۰۰۰

عہد پاکستان (413-353)

مولانا فضل اللہ فضل

مولانا فضل اللہ بہ سال ۱۸۹۷/ ۱۸۹۸ میلادی در روستای بابونگر مضافات ستکانیا چشم بجہان گشود. پدرش مولانا نور الہی عالم با عمل و ولی کامل عصر خود شمردہ میشود. مولانا فضل اللہ از مدرسہ محسنیہ چاٹگام (دانشکدۂ محسن کنونی) در سال ۱۹۱۹ میلادی باخذ مدرک فاضل موفق شد و برای ادائہ تحصیلات عالی رہسپار ہند شد سپس در مدرسہ مظاہر العلوم، سہارپور (اترپردش- ہند) در علم حدیث، تفسیر، فقہ، فلسفہ و منطق تحصیلات خود را بپایان رسانید. پس از تکمیل نصاب در مدرسہ عالیہ اکارا (کلکتہ) بہ سمت مدرس اول تا سال ۱۹۴۲ میلادی مشغول درس وتدریس ماندہ. در ہنگامیکہ بوطن خود مراجعت نمود در مدرسہ حکیمیہ عالیہ در دہ چنوتی تا وفات خود عہدۂ ناظم اعلی را دارا بود. در علوم قدیم و جدید دستگاہ کامل داشت و در زمان خود یکی از علمای متبحر بہ شمار میرفت. در کنفرانس سیرت النبی صلعم کہ بایمای شاہ صاحب چنوتی برگزار شدہ بود، ایشان ہم بہرۂ وافر داشتند. علاوہ بر تدریس علوم اسلامی ایشان از مضامین نشر خدمات شایان اسلامی انجام دادند. از تالیفات مولانا فضل الہ بیشتر تراجم کتب بزبان بنگلا بہ چشم میخورد کہ بعضی از اینہا بہ زیور طبع آراستہ شدہ اند. ایشان پس از زندگانی طویل بہ سال ۱۹۷۹ میلادی در چہارم مارس سفر آخرت بربست، مزار مولانای نامبردہ در نزد مدرسہ دخترانہ بہ نام فاطمہ بتول در روستای چنوتی میباشد.

مولانا فضل الہ در ہر سہ زبان عربی و فارسی و اردو شعر میسرودند وی تخلص خود فضل را در شعر می آوردند. اشعار شاعر مذکور بیشتر مشتمل بر نعت پیغمبر اسلام صلعم و یک نظم در مدح علم در زیر نقل میشود کہ برای بندہ زحمت فرمودہ فرستادہ اند:

التجا بحضرت خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم

ہمچو سیمابم سکون قلب گم کردہ منم — سوختہ اند وہگین و بس کہ آشفتہ سرم
ای امید عاصیان و راحت آشفتگان — روز و شب در خواب و بیداری خیالت ہمدمم
یافتم باری درت صد حیف در چشم زدن — صحبتت آخر شد و من زان فغان ہامی کنم
ایں تمنا باز حاصل گر بیاید شاہ من — برق چوں خنداں و ہمچوں ابر گریانت شوم
خاک کویت گر بدست آید برخ مالم ورا — باز آں را توتیای چشم سازم دمبدم
گاہ آں بر سینہ مالم گاہ آں بر سر نہم — گاہ از بہر سکون قلب آں بر دل نہم
دلبرا! روحی فدایت ایں تمنا در دل ست — حاضر دربار باشم خاک بوس در شوم

حامی و غمخوار مظلوماں و مسکیناں توئی　　خلق تو خلق عظیم ست ای شہ والا شیم

کن کرم بر «فضل» خستہ، غرق دریای گنہ　　از ندامت شرمگیں خجلت زدہ خود دمبدم

ای شفیع المذنبیں چارہ گر روز جزا　　کس ندارم جز توای سر تاج اصحاب کرم

راہ نومیدی مرو اینجا بسی امیدہاست　　خژدۂ لاتقنطوا منصوص رب ذوالکرم

* * *

ای آنکہ بحب تو مستانہ ہمہ عالم　　وی آنکہ ز حسن تو دیوانہ دل و جانم

ای رحم مجسّم توای لطف محتم تو　　ای حسن متمم توای عزم مصمم تو

* * *

ای خوی دلاویزت محبوب ہمہ عالم　　ای گل کہ بہ بوئ تو مجذوب ہمہ عالم

ای آنکہ بشغف تو اشفتہ سرم دائم　　ای آنکہ بشوق تو حیرت زدہ ام ہائم

****

در مدح علم:

آمدہ بی شک خطاب ایزدی　　عالم و جاہل برابر کی شود

گفت پیغمبر شنای عالمان

مایہ صد نازہا ہل یستوی　　عامی و بینا کجا یکسان شود

افضیلت داد بر کل زاہدان

از ہزار عابد برابلیس شقی　　علم پیدا می کند خوف خدا

قلب عالم مخزن اسرار شد

سخت تر شد یک فقیہ متقی　　انما یخشی بہ بین نی افتراء

ہم دلش خود مطلع انوار شد

نور علم آمد ز انوار خدا　　بہر علم دین کی جانہا فدا

نیت دنیا مکن از علم دین

جہل را ظلمت شماری بی دعا　　تا شوی لاریب محبوب خدا

کہ شوی آخر پشیمان و حزین

عالمی کو شد بدنیا حرص و آز　　صاف گفتہ مولوی معنوی

ہم خدا خواہی و ہم دنیای دون

پندہا بپذیر تا «فضل» خدا　　بر سرت نازل شود بی انتہا

***

تیغ ابرو ہم او گلگون عذاری عجب　　صید انداز او مفقود قراری عجیب

ناوک افگن نگہش ماہ لقائی عجیب　　نازک اندام عجب صورنگاری عجیب

عاشق ناز او وارفتہ مزاجی عجیب　　طالب وصل او درماندۂ حالی عجیب

آتش عشق بجان شعلہ مزاجی عجیب　　قلب آشفتہ من آہ نوازی عجیب

***

চতুর্থ অধ্যায়

হাদিস চর্চায় আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) : বিদগ্ধ আলিম মাওলানা মুযহির আহমদ (রহ.)-এর মূল্যায়ন

অসাধারণ প্রতিভাধর ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) এখন জান্নাতবাসী। তিনি পশ্চিমবঙ্গ চব্বিশ পরগনার দারুল উলুম আকড়া কুদসিয়া মাদরাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট (পরবর্তীতে অধ্যক্ষ) ও মুহাদ্দিসরূপে দু'দশককাল ধরে অধিষ্ঠিত থেকে মাদরাসার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। পরে ১৯৪৩ থেকে তাঁর ওফাত পর্যন্ত মাত্র এক দশক ছাড়া বাকি সময় দক্ষিণ চট্টগ্রামের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার হেড মুহাদ্দিস ও নাযেম-এ-আ'লা পদে নিয়োজিত থেকে মাদরাসাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়ে দেন।

১৯৩৫ সনের জুন মাসে হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ সাহেবের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে কলকাতা ওয়েলেসলি স্কোয়ারে অবস্থিত কলকাতা আলিয়া মাদরাসার ইলিয়েট হোস্টেলের ৪১নং রুমে। সেদিনটি ছিল রবিবার। বেলা প্রায় তিনটার দিকে আমরা রুমে অবস্থানরত তিনজন খোশগল্পে লিপ্ত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি সাদা পায়জামা, ঘৃত রঙয়ের শিরওয়ানি, মাথায় কালো টুপি পরিহিত টুকটুকে লাল চেহারার এক ভদ্রলোক হোস্টেল বয় করিমের সাথে পাশের দরজায় উপস্থিত হয়ে আমার নাম উল্লেখে আমাকে খুঁজছিলেন। আমার নাম শুনতেই আমি ভদ্রলোককে এসতেকবাল করে ভেতরে নিয়ে এসে চেয়ারে বসতে দিলাম। আলাপচারিতার মাধ্যমে পরিচিতির বীজ অংকুরিত হলো। উক্ত রুমের আমরা তিনজনই টাইটেল হাদিস ১ম বর্ষের ছাত্র। প্রসঙ্গক্রমে তিনি হাদিসের অনেক তত্ত্ব ও তথ্য আমাদেরকে শোনালেন। আমরাও বিমোহিত হয়ে তার মুখনিঃসৃত বাণীসমূহ গিলছিলাম। পাঁচটার দিকে তিনি আকড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে আমি রুম হতে বের হয়ে তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছিলাম। এই সময় তিনি আমাকে কিছু মূল্যবান উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, আপনি কলকাতায় নতুন এসেছেন। কলকাতা একটি বিরাট শহর, বের হলে মাগরিবের পূর্বে অবশ্যই হোস্টেলে চলে আসবেন। মাগরিবের নামাজ হোস্টেল মসজিদে পড়বেন। অপরিচিত কারও সাথে শহরে বেড়াতে যাবেন না। বেঙ্গল মাদরাসা একজামিনেশন বোর্ডে আপনি ১ম স্থান অধিকার করে চট্টগ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, আপনিও সুনাম অর্জন করেছেন। এই সুনামকে ধরে রাখতে হবে। কাজেই মনোযোগ সহকারে নিয়মিত লেখাপড়া করতে হবে। ঘরের জন্য মন জ্বললে আকড়া মাদরাসায় বেড়াতে যাবেন। চকরিয়ার শফিকুর রহমান নামে আমাদের মাদরাসায় এক ছাত্র আছে আমি তাকে পাঠাবো।

"আমি যতোদিন কলকাতায় ছিলাম মাসে একবার হলেও এই কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী মাওলানার খেদমতে উপস্থিত হতাম। ১৯৪২ সাল অবধি তিনি এই মাদরাসার উন্নতি সাধন করেন। ১৯৪২ সালে ২য় মহাযুদ্ধে কলকাতায় জাপান কর্তৃক বোমা বর্ষিত হলে এক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা এক ভূতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়। তখন অন্যদের সাথে হযরত মাওলানা সাহেব কলকাতা ত্যাগ করে চলে আসেন। তখন চুনতির প্রাণপুরুষ হযরত শাহ মাওলানা নজির আহমদ সাহেবের আমন্ত্রণে তিনি চুনতি আলিয়া মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট-এর

দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন হতে তিনি একনিষ্ঠভাবে হাদিস চর্চার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং অবসর সময়ে ইলমে হাদিস থেকে আহকামের ইসতেখরাজ ও গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। এর ফলস্বরূপ অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি শামায়িলে তিরমিযী গ্রন্থের প্রাঞ্জল ভাষায় বাংলায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের মাধ্যমে অলক্ষ্যে তিনি যে হাদিস চর্চাকারী তথা মুহাদ্দেসিন কেরামের কাতারে শামিল হয়ে গেছেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। হযরত মাওলানা সাহেবের শামায়িলে তিরমিযী অনুবাদ রচনার সমাপ্তির খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে রসুলপ্রেমিক হাদিসপিপাসুরা এই মূল্যবান গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে থাকেন। সাথে সাথেই দস্তে গায়েবের সক্রিয়তায় স্থানীয় মাওলানা শামসুল হুদা খান ছিদ্দিকী গ্রন্থটি তাঁর অফসেট প্রেস থেকে প্রকাশনার অনুমতি চাইলে মাওলানা আনন্দচিত্তে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। অতঃপর তিনি التعليقات على الجامع للإمام الترمذي ও مقدمه علم حديث নামক হাদিস বিষয়ের ওপর আরো দুটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত দুটি গ্রন্থ এখন মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে। মরহুমের উপরিউক্ত তিনটি গ্রন্থই আমি আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি এবং আমার বিশ্বাস জন্মেছে فنونات এ তিনি অতুলনীয়, হাদিস চর্চায়ও অনন্য। তাঁর হাদিস চর্চাকালীন সময়ে চুনতির এক স্বনামধন্য বুজর্গ একরাত স্বপ্নে দেখলেন যে, হুজুরপুরনূর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসায় তশরিফ এনেছেন ও মাদরাসার আঙ্গিনা ও বারান্দায় পায়চারি করছেন, কিন্তু মাদরাসায় ঢুকে কোথাও বসলেন না।

এই সংবাদ আশেকে রসুল জনাব শাহ সাহেবের কানে পৌঁছুলে তিনি তাৎক্ষণিক স্বপ্নের তাবির করলেন যে, ফাজিল পর্যন্ত মাদরাসায় শুধু مباديات ই পড়ানো হচ্ছে কিন্তু مقاصد যা মূল উদ্দেশ্য-এর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ মাদরাসায় নাহু-সরফ, হেকমত, বালাগত, সাহিত্য, গদ্য-পদ্য, ফিক্‌হ ও উসুল পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু এর উৎস ও মূল রসুলে পাক-এর মুখনিঃসৃত হাদিস ও কুরআনে পাকের তাফসির শিক্ষার গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। মাদরাসার প্রচলিত শিক্ষার ওপর রসুলে পাকের অনুমতি থাকলেও পূর্ণ সন্তুষ্টি নেই। অতএব এই মুহূর্ত হতেই মাদরাসায় সিহাহ সিত্তার হাদিস ও কুরআনে পাকের তাফসির শিক্ষার ত্বরিত ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় এই মাদরাসা বন্ধ করে দিতে হবে। সেইদিন হতেই শাহ সাহেবের শ্রুত সেই স্বপ্নের নিদর্শন ও মাওলানা ফজলুল্লাহর অন্তরের আকর্ষণ একত্রিত হয়ে দরজায়ে কামিলের ইফতিতাহ ও বাস্তবায়ন অপরিকল্পিত উপায়ে অধ্যক্ষ সাহেবের হাতের মুঠোয় এসে গেলো।

জ্ঞানতাপস হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) শুধু হাদিসশাস্ত্রে অনন্য ছিলেন তা নয়। যাবতীয় فنونات তথা ফিক্‌হ, উসূলে ফিকহ, আকায়েদ, আরবি, ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যেও তিনি অতল সমুদ্রস্বরূপ ছিলেন। কবিতাশিল্পে তিনি ছিলেন নজীরবিহীন। ১৯৭৮ সালে মরহুম শাহ সাহেব-সহ তিনি হাশেমিয়া আলিয়া মাদরাসার বার্ষিক সভায় পদধূলি দিয়েছিলেন। সভার শুরুতে সমাগত মেহমানদের নাম উল্লেখে একটি قصيدة مدحية গাওয়া হয়। উপস্থিত মেহমানদের মধ্যে ছিলেন হযরত খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, চুনতির শাহ সাহেব হুজুর, গারাঙ্গিয়ার ছোটোহুজুর, আল্লামা ফজলুল্লাহ সাহেব। কসিদার শেষ পঙ্‌ক্তিতে অধমের নাম

উল্লেখ ছিলো লেখকরূপে। কসিদা শেষ হতেই ফজলুল্লাহ সাহেব আমার নিকট এক ফর্দ কাগজ ও একটি কলম চাইলেন। সভার হুলুস্থুল বয়ান বক্তৃতার মাঝে বসে আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটি কবিতা তিনি রচনা করলেন এবং সভাপতির নিকট তা পাঠ করার অনুমতি চাইলেন। এমন স্বর ও সুরের মিশ্রণে পাঠ করা হলো শ্রোতারা উপভোগ করে মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে "দুবারা এরশাদ" ধ্বনি দিতে লাগলো।

আল্লামা ফজলুল্লাহর জ্ঞানের গভীরতা ও বাগ্মিতা অতুলনীয় ও বর্ণনাতীত। তাঁর ইন্তেকালের দিনের একটি ঘটনা না বলে পারা গেলো না।

হযরত মাওলানার ইন্তেকালের রাত আমি চকরিয়ায় ছিলাম। শেষরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি যে, মরহুম শাহ সাহেব চুনতি যেনো আমাকে বলছেন, 'অ মঁও ডঁর মলই গেলগই' কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। (অর্থাৎ হে মামু, একজন বড় আলিম চলে গেলেন)। শাহ সাহেব পাঠ্য অবস্থা থেকে আমাকে মামু ডাকতেন, এরূপ একটা সম্পর্কও ছিলো। পরদিন সকাল ৮টার দিকে কক্সবাজার যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে চিরিঙ্গা বাস স্টেশনে আসলাম। হঠাৎ আমার মনে রাত্রের স্বপ্নের কথা জেগে উঠলো। মনে মনে বললাম অলি-দরবেশদের ব্যাপার, মামলা কি একটু জেনে যাই। তখন কক্সবাজার-এর পরিবর্তে চুনতির দিকে রওয়ানা দিলাম। সিরাতুন্নবীর গেইটে অবতরণ করতেই শুনলাম হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। একথা শুনে সোজা মাদরাসায় চলে গেলাম। শাহ সাহেবের ছেহনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তথায় একটি চেয়ারে উপবিষ্ট। আমাকে দেখতেই বললেন রাত্রের সেই কথা, 'অ মঁও ডঁর মলই গেইয়েগই' তুমি কেমনে আসলে। তখন সেখানে বসা ছিলেন আমার পরম পাঠ্যবন্ধু হযরত মাওলানা আলহাজ মাহমুদুল হক খতিবী। পুরোদিন সেখানে অবস্থান করে সন্ধ্যায় হযরত মাওলানার দাফন শেষে আবার চকরিয়া ফিরে আসলাম। মহান আল্লাহ মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউসে সম্মানের উচ্চ আসন দান করুন। আমিন!

চুনতি মাদরাসায় আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) শুভাগমন

শাহ মাওলানা হাবীব আহমদ

আমার পাঠ্যাবস্থায় দেখেছি তৎকালের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদগণ ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও অতিশয় মুখলিস বা আন্তরিক। ছাত্রদের পড়াশুনার সাথে সাথে তাদের আদর্শ চরিত্র গঠনের প্রতি রাখতেন সতর্ক দৃষ্টি, এ কারণে ছাত্ররা তাদেরকে করতো ভয় ও আন্তরিক ভক্তি। এ ধরনের উঁচুমানের শিক্ষকদের একজন ছিলেন জনাব মরহুম মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আমি কলকাতা আলিয়া মাদরাসার ছাত্র ছিলাম। কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ওয়াসেল মোল্লা তাঁর গ্রাম আকড়ায় একটা মাদরাসা স্থাপন করেছিলেন। আমার এক সহপাঠী সেখানকার ছাত্র ছিলো। একদিন সে আমাকে ওখানে বেড়াবার জন্য নিয়ে গেলো। মাদরাসার অধ্যক্ষ সাহেব আমার সাথে অতিশয় স্নেহ-আদরের সহিত ব্যবহার করলেন। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাবতে লাগলাম আমার মতো একজন নগণ্য ছাত্রের প্রতি তাঁর মতো একজন উঁচুদরের ওস্তাদের এ ব্যবহার কেনো? পরে জানতে পারলাম তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামে। তিনি আমার আব্বার একজন প্রিয় ছাত্র এবং আমার আব্বার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল। তাঁর নাম মাওলানা ফজলুল্লাহ। এখানেই হলো তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয়।

লেখাপড়া শেষে বাড়ি এসে আমাকে চুনতি মাদরাসার সাথে জড়িত হতে হলো। যেহেতু আমি একজন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মানুষ ছিলাম সেহেতু মাদরাসায় একজন অভিজ্ঞ সুপারিন্টেডেন্টের প্রয়োজন দেখা দিলো। সন তারিখ আমার মনে নেই, খবর পাওয়া গেলো জনাব মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব আকড়া মাদরাসা থেকে চলে এসে বাড়িতে আছেন। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সাথে তাঁকে চুনতি মাদরাসায় নিয়ে এলেন। এসে জানালেন যে, তিনি সুপারিন্টেন্ডেন্টের যাবতীয় কাজ, দায়দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু যেহেতু হাবীব আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ওস্তাদের ছেলে সেহেতু সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে তার নাম বহাল থাকবে। আমার শত ওজর আপত্তি তিনি মানলেন না। সুতরাং এতে আমাকে রাজি হতে হলো।

দেখা গেলো তিনি ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যাপারে নিরলস ও অতিশয় আন্তরিকতার সাথে খাটছেন। সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছলতার ব্যাপারেও নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। নিজেসহ আমাদেরকে খাটিয়েছেন। তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে আমরা শ্রদ্ধার সাথে তাঁর সকল আদেশ পালন করেছিলাম। এভাবে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম চলছিলো এবং তিনি যেনো আমাদের সমাজেরই একজন হয়ে গেলেন। তিনি সমাজের বিয়ে-শাদি ইত্যাদির ব্যাপারেও সহযোগিতা করছেন এবং প্রয়োজনে ধারকর্জ দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন, এভাবে তাঁর সামাজিক মানসিকতার পরিচয় আমরা পাচ্ছিলাম।

মাঝখানে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হলো যার কারণে এ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যেতে তিনি বাধ্য হলেন। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা-তদবির করেও সে সময় তাঁকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম

হলেন না। কয়েক বছর পর অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ 'নাযেমে আলা'র (সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা বিধায়ক) পদ সৃষ্টি করে তাঁকে আবার নিয়ে আসেন।

তখন অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছিলো আমাকে। সে সময় আমরা মাদরাসাকে কামিল পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম একবার। কিন্তু আন্দোলনের কারণে সে প্রচেষ্টা স্থগিত হয়ে যায়। পরে অবস্থা অনুকূল হলে তাঁর পরামর্শ ও নিরলস প্রচেষ্টায় মাদরাসা কামিল পর্যায়ে উন্নীত হয়। তখন তিনি তাঁর ঘরবাড়ি ছেড়ে মাদরাসাকেই তাঁর আবাসস্থল বানিয়ে ফেলেছিলেন। এ অবস্থায় হঠাৎ তিনি একদিন আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

একনজরে আমার শ্রদ্ধাভাজন অভিভাবক ও ওস্তাদ আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

অধ্যক্ষ ডা. মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (রহ.)*

পরিচিতি : মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া উপজেলার বাবুনগর গ্রামে ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নুর বখশ সাহেব (রহ.) যিনি নুরুল হুদা নামে খ্যাত ছিলেন একজন বিদগ্ধ আলিমে দীন ছিলেন। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর জন্মের সংবাদ তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার নিকট পৌঁছলে তাঁর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত বেরিয়ে আসে ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء এই আয়াতকে সামনে রেখে তাঁর নাম রাখা হয় 'ফজলুল্লাহ' আবুল বারাকাত হচ্ছে তাঁর কুনিয়ত তথা উপনাম।

জীবনসঙ্গিনী (স্ত্রী) : তাঁর ক্রমাগত পাঁচজন স্ত্রী ছিলেন। দু'জন তালাকপ্রাপ্ত, দু'জন জান্নাতবাসী, একজন তাঁর মৃত্যু অবধি জীবিত ছিলেন। যিনি ছিলেন শান্তশিষ্ট, ইবাদতগুজার এবং অত্যন্ত ধৈর্যশীল। কোনো সময় যদি আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) রাগান্বিত হয়ে কোনো কথা বলতেন, তিনি চুপচাপ থাকতেন। টু-শব্দ পর্যন্তও করতেন না।

আল্লামা ইকবালের ভাষায়- گل کو زبان دیکر تعلیم خاموشی دی - ফুলকে কথা বলার শক্তি দেয়ার পরও চুপ থাকার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

সন্তান-সন্ততি : আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর **ছয় ছেলে-** (১) আবু ছফা মুহাম্মদ নজমুদ্দিন, (২) আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন, (৩) আবুল ওফা মুহাম্মদ শিহাবুদ্দিন, (৪) আবুল আতা মুহাম্মদ এমাদুদ্দিন, (৫) আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন ও (৬) আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন।

চার মেয়ে : (১) জাহান আরা। (২) জয়নব আরা। (৩) হাফসা ও (৪) হুমায়রা।

তাঁর জীবদ্দশায় কিছুদিন আমি তাঁর খিদমতে নিয়োজিত থাকার সৌভাগ্য লাভ করি। আমি তাঁর স্নেহের পরশে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। কামিল ডিগ্রি অর্জন পর্যন্ত তাঁরই তত্ত্বাবধানে থাকি। তিনি আমার একনিষ্ঠ অভিভাবক ছিলেন। আমার বিয়ে-শাদির ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। আমার স্ত্রী নির্বাচনে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিলো। শাদির পূর্বে স্ত্রীকে দেখার আমার ইচ্ছেও ছিলো না এবং সাহসও ছিলো না। তাঁর নির্বাচনে আমি জিতে গেছি। বিয়ের পর আমার স্ত্রীকেও তাঁর ঘরে নিয়ে আসেন এবং নিজের সাথে আমাদের খানাপিনারও ব্যবস্থা নেন। ঘর তৈরির জন্যে তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তির কিছু জমি আমাকে দিয়ে দেন। এখন যেখানে আমরা বসবাস করছি। কিছুদিন পর আমার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তাঁর থেকে পৃথক হয়ে যাই, যাতে আমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা চিরদিন অটুট থাকে।

আমার বিয়ের ব্যাপারে তাঁর নির্দেশনা : আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) বলেন, তোমাকে বর হয়ে কনের বাড়িতে যেতে হবে। আমি হেঁটে যাওয়ার ইচ্ছে করেছিলাম, কিন্তু তিনি হেঁটে যাওয়াকে বরের জন্যে স্বীয় মর্যাদার পরিপন্থী মনে করেন এবং আমার হেঁটে যাওয়ার ইচ্ছে প্রত্যাখ্যান করেন। বরের জন্যে একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করেন। আমার বরযাত্রীদের সাথে যাওয়া পছন্দ ছিলো না। আমি তাঁর কাছে প্রস্তাব রেখেছি, আমার সাথে শুধু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু জনাব মুহাম্মদ আমিন (মুহাদ্দিস, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা) যাবেন, তিনি এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন। মাওলানা আমিন সাহেব আমার সাথে যেতে সম্মতি প্রদান করেন। আমি ঘোড়ার ওপর উপবিষ্ট ছিলাম, মাওলানা মুহাম্মদ আমিন সাহেব পদব্রজে আমার সাথে চলছিলো। এটি ছিলো একটি অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা যা আজকে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই স্মরণীয় ঘটনাটি পুনরায় সংগঠিত হয়- মাওলানা মুহাম্মদ আমিন যেদিন ইন্তেকাল করেছেন, তাঁর লাশ মুবারক খাটিয়ার ওপর ছিলো, আমি ঐ খাটিয়ার পেছনে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সামনে চলছিলাম। এই দু'টি ঐতিহাসিক ঘটনার কী অপূর্ব সামঞ্জস্য; আমার শাদির দিন আমি ছিলাম আরোহী এবং মাওলানা মুহাম্মদ আমিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পায়ে হেঁটে চলছিলো। আজ তিনি আরোহী, আমি শোকাহত অবস্থায় পায়ে হেঁটে তাঁকে শেষ মঞ্জিলে (কবরে) নিয়ে যাচ্ছিলাম। আহ! এ দৃশ্য পুনর্বার দৃষ্টিগোচর হবে না।

স্বভাব : আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন খুবই রাগী, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে প্রশমিত হতো তাঁর রাগ। মজযুব আল হাসান (রহ.) বলেন,

ادہر تو در نہ کھولیگا اُدہر میں در نہ چھوڑونگا　　حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری

انکی چھوکٹ نہ چھوڑی　　یہاں ہمارے ہاتھ پتھر تلے نہ تھے

'ঐ দিকে তুমি দরজা খুলবে না, এ দিকে আমি দরজা ছাড়বো না
রাজত্ব নিজ নিজ অবস্থানে, কখনো তোমার, কখনো আমার,
তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করিনি, এখানে আমার হাত পাথরের নিচে ছিল না'।

আমরা তাঁর প্রতি ছিলাম একান্ত অনুগত। তিনি আমাদের মতো খাদিম এবং ছাত্রদের সাথে নিকটাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করতেন। যদ্দরুন সকল ছাত্র ও খাদিমরা তাঁর প্রত্যেক নির্দেশনাকে মাথা পেতে নিতেন। তিনি তাঁর অধীনস্থদের প্রতি খুবই দয়াশীল ছিলেন।

মর্যাদাবোধ : আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। তিনি ভারতে অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর প্রথম স্ত্রী তাঁর ভগ্নিপতির সাথে (যিনি মুহরম ছিলেন না) বাইরে যাওয়ার কারণে তাকে তালাক দিয়েছিলেন।

অভ্যাস : আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর জাল দিয়ে মাছ শিকার করার প্রবল আগ্রহ ছিলো। অধিকাংশ সময় নিজ পুকুরে জাল নিক্ষেপ করে মাছ শিকার করতেন। তাঁর ধূমপানের অভ্যাস ছিলো। কোন্ কারণে ধুমপান করতেন এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করার এ দুঃসাহস কারো ছিলো না। তিনি সুগন্ধিযুক্ত তামাক সেবন করতেন, কিন্তু এ অভ্যাস তাঁর পুরো জীবন ছিলো না।

মিতব্যয়ী : তিনি ছিলেন মিতব্যয়ী। অপচয় থেকে দূরে থাকতেন। বিভিন্ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন, কৃপণতা পরিহার করতেন। তিনি উন্নত খাবার গ্রহণ এবং উন্নত পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন।

মেহমানদারি : তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ। মেহমানদারিতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মেহমানদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন এবং তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। মেহমানদের খাবারের মধ্যে কিছু লৌকিকতা করতেন। মেহমানদের আরাম-আয়েশের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন।

স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা : তিনি ছিলেন খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ময়লা-আবর্জনাকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁর নির্দেশনা ছিলো প্রত্যেক কাজ যেনো সুষ্ঠুভাবে হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁর ছিলো বিশেষ দৃষ্টি। নিজেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। শিশু ও খাদিমদেরকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চলতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

আর্থিক স্বচ্ছলতা : তিনি আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি চট্টগ্রামের জহুর হকার্স মার্কেটে একটি দোকান ক্রয় করে স্বীয় ছেলে আবু জিয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। জমিও ক্রয় করেন।

একসময় তিনি আমাকে নির্দেশ দেন, আমি যেনো তাঁর দু'জন প্রিয় ছেলে আবুল আতা এবং আবু রেজাকে ব্যবসায় নিয়োজিত করি। যখন তারা উভয়ে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করছিলো। যাতে তারা ভবিষ্যতে পারিবারিক জীবন পরিচালনায় পরমুখাপেক্ষী না হয় এবং দরিদ্রতার করালগ্রাসে নিপতিত না হয়। আমি তাঁকে বললাম, আবুল আতা এবং আবু রেজা উভয়ই মেধাবী ছাত্র, যদি আপনি তাদেরকে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট রাখেন তাহলে তারা উভয়ই প্রজ্ঞাসম্পন্ন আলিম হবে, এটি আমার প্রত্যাশা। আলহামদুলিল্লাহ, মাওলানা আবু রেজা (দা.বা.) তাই হয়েছে। তিনি আমার পরামর্শ অনুসরণপূর্বক উভয়কে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় ভর্তি করে দেন।

ব্যক্তিগত গুণাবলি : তিনি অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন। সুন্দরের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং লাখের মধ্যে একজন ছিলেন। যেমন ছিলেন সুন্দর, তেমনি শারীরিক উচ্চতা ছিলো মধ্যম। যখন শিরোয়ানি পরিধান করতেন তখন মোম্বাইয়ের অধিবাসীর মতো মনে হতো। চাল-চলনে মধ্যপন্থী, ওঠা-বসা গাম্ভীর্যপূর্ণ। কথাবার্তার মধ্যে ছিলো বিশেষ আকর্ষণ। সভা-সমাবেশে বিশেষ মর্যাদার সাথে তাঁকে মূল অতিথির আসনে সমাসীন করা হতো।

স্বাভাবিক নমনীয়তা : তিনি নমনীয়তায় সাইয়িদুস সা'দাত মির্জা মাযহার জানে জাঁনা আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি প্রকাশ শামসুদ্দিন হাবিবুল্লাহর (১৬৯৯-১৭৮১ খৃ.) রহ.-এর অনুরূপ

ছিলেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, বাসন, গ্লাস, পেয়ালা এগুলো একটার সাথে যেন অন্যটার সংঘর্ষ না লাগে। আমরা এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতাম। তবুও গ্লাসের সাথে বাসনের সংঘর্ষ হতো। তখন তিনি বলতেন, জিনিসপত্র একত্রে রাখতে তোমরা এখনো সচেতন হওনি। তাই আমরা তাঁর সামনে অনেক সতর্কতার সাথে চলাফেরা করতাম। কবি বলেন,

ای بلبل خوش الحان آہستہ لب بہ جنباں نازک مزاج شاہ تاب سخن ندارد

দয়ালু : তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। আমাদেরকে স্বীয় ঔরশজাত ভাইয়ের মতো মনে করতেন। স্বীয় ছাত্রদেরকে দয়ার দৃষ্টিতে দেখতেন। দরিদ্রের প্রতি ছিলেন দয়ালু। কারো কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আমি সরসিনা মাদরাসায় কামিল পড়ছিলাম এবং আমার বড়োভাই মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাহেব চট্টগ্রামে লেখাপড়া করতেন। একসময় আমাদের দু'জনের চিঠি একসাথে পৌছলে তাঁর পরপরই তিনি ধান বিক্রি করে আমাদের জন্যে টাকা প্রেরণ করেন। ধান বিক্রি করার কারণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার দু'জন প্রিয় ছেলে বাড়ি থেকে দূরে লেখাপড়া করছে, টাকা পয়সা ছাড়া তারা প্রয়োজন কীভাবে মিটাবে? আল্লাহপাক তাঁকে স্বীয় রহমতে বেষ্টন করে নিন, আমিন। চুনতির মধ্যে মুফতি মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের আর্থিক দুর্দশা দেখে তিনি নিজের ধান বিক্রি করে তাঁর জন্যে একটি ঘর নির্মাণ করে দেন। এতে হযরত মুফতি সাহেব সারা জীবন তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন।

কৌতুকপ্রিয় : তিনি রাগ এবং নমনীয়তার সাথে সাথে কৌতুকপ্রিয়ও ছিলেন। তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন কাহিনী শুনাতেন। একবার খাবারের সময় তিনি আমাদেরকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একজন শাহজাদা ধৃত হয়ে গোলাম হয়ে যায়। একদিন শাহজাদা ভ্রমণে বের হন, তখন এই গোলাম রাস্তার পাশে বসে ক্রন্দন করছিলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কাঁদছো কেনো? উত্তরে সে বললো, আমিও আপনার অনুরূপ প্রতাপশালী শাহজাদা ছিলাম, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! আজ আমি গোলাম হয়ে গেছি। এই অনুশোচনায় কাঁদছি। শাহজাদা জিজ্ঞেস করেন, মুরগির স্বাদ কিসে? সে বললো, চামড়ায়। এই উত্তর শুনে শাহজাদা তাকে আজাদ করে দেন এবং বলেন, তুমি বাস্তবিকই শাহজাদা। এই ঘটনা শুনে অপর একজন গোলাম পথিমধ্যে ক্রন্দন করছিলো, শাহজাদা জিজ্ঞেস করে তুমি কাঁদছো কেনো? সে বললো, আমিও আপনার মতো শাহজাদা ছিলাম, তাকদিরের মারপ্যাঁচে আজ গোলাম হয়ে গেছি। এই অনুশোচনায় কাঁদছি। শাহজাদা জিজ্ঞেস করে, বলো দেখি, ছাগলের স্বাদ কিসে? সে বললো, চামড়ায়। শাহজাদা বললো, তুমি কোনো শাহজাদা না, তুমি একজন মিথ্যুক। তুমি গোলাম হয়ে থেকো।

বাজারে গমন : তিনি মাঝেমধ্যে বাজারে যেতেন এবং স্বীয় ইচ্ছে অনুযায়ী দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করতেন এবং বাজারের থলে নিজে বহন করে ঘরে প্রত্যাবর্তন করতেন। এ ব্যাপারে অন্যের

সাহায্য তেমন একটা গ্রহণ করতেন না। অবশ্যই পথিমধ্যে লোকজন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক তাঁর থেকে বাজারের থলে নিয়ে নিতেন এবং তাঁর ঘরে পৌঁছে দিতেন।

খাবার ও পানীয় : তিনি গোশ্‌ত, মাছ এবং তরি-তরকারি পছন্দ করতেন। বিশেষ করে কচুর প্রস্ফুটিত ডিগি সিদ্ধ করে মুরগির ডিম মশলা মিশ্রিত করে তৈরিপূর্বক খেতে ভালোবাসতেন। সামান্য তরি-তরকারিতে পরিতৃপ্ত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। খাবারের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। সকালের নাস্তার মধ্যে ফ্রাই করা ডিম এবং উন্নতমানের চা পানে তিনি অত্যন্ত আনন্দ পেতেন।

ভ্রমণ : তিনি কোথাও ভ্রমণে যেতে ইচ্ছে করলে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। যাতে যথাসময়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারেন। তিনি চুনতি মাদরাসায় যাওয়ার প্রাক্কালে আমাদেরকে শেষ রাতে ঘুম থেকে জাগরিত করতেন। অধিকাংশ সময় ফজরের নামাজ সেনের হাটে আদায় করতেন; যার দূরত্ব তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় চার মাইল।

অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব : কলকাতা আকড়া মাদরাসার একজন শিক্ষক হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর মুরিদ ছিলেন। মাদরাসা বন্ধের সময় তিনি থানভী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে এমদাদিয়া খানেকায় ঐ সময়টুকু কাটানোর ইচ্ছে করেন, কিন্তু থানভী (রহ.)-এর সাথে যাঁরা সম্পর্কিত তাঁরা জানেন- খানেকায়ে এমদাদিয়ায় অবস্থানের জন্যে কিছু বিধি-বিধান রয়েছে। পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে পীর-মুরিদের মধ্যে যে চিঠি আদান প্রদান হয়, এতে যে প্রশ্নোত্তর হয় তা নিম্নে সন্নিবেশিত হলো:

মুরিদ - মাদরাসা বন্ধের সময়টুকু আপনার খিদমতে অতিবাহিত করার অনুমতি চাচ্ছি।

থানভী (রহ.) - কী জন্যে?

মুরিদ - নফসের পরিশুদ্ধির জন্যে।

থানভী - যদি নফসের পরিশুদ্ধি না হয়?

মুরিদ - আমি দৃঢ় বিশ্বাসী, আমার নফসের পরিশুদ্ধি হবে।

থানভী - এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রমাণ পেশ করুন।

মুরিদ - আমি এর কোনো উত্তর দিতে না পেরে এ বিষয়ে আমি আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর সাহায্য কামনা করি। তিনি আমার পুরো বিষয়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এর উত্তর লিখেন- হুজুর! শুধু আপনার সাথে সাক্ষাতই উদ্দেশ্য।

থানভী - অনুমতি দেয়া গেলো।

প্রাথমিক শিক্ষা : তিনি প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় পিতার নিকট থেকে হাসিল করেন। দেওদীঘি প্রাইমারি স্কুল ও পরবর্তীতে রূপকানিয়া দারোগা স্কুল থেকে শিক্ষা অর্জনের পর চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদরাসা হতে ফাজিল ডিগ্রি গ্রহণ করেন এবং হাদিস ও তাফসির বিষয়ে উচ্চতর

ডিগ্রি অর্জনের জন্যে ভারতের সাহারানপুরস্থ মাযাহির উলুম মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে *দাওরায়ে হাদিস, দাওরায়ে তাফসির এবং বিভিন্ন বিষয়ে* জ্ঞান হাসিল করার পর কৃতিত্বপূর্ণ সনদ লাভ করেন। সেখানকার বুযর্গ শিক্ষকমণ্ডলীর সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- বজলুল মাজহুদ ফি হল্লে আবি দাউদ-এর লেখক মাওলানা খলিল আহমদ সাহেব সাহারানপুরী এবং মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেব সাহারানপুরী।

শিক্ষকতা-জীবন : সাহারানপুর থেকে দাওরায়ে হাদিস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন শেষে কলকাতা আকড়া সিনিয়র মাদরাসায় তিনি হেড মাওলানা পদে নিয়োগ লাভ করেন। হেড মাওলানা পদে কিছুদিন দায়িত্ব পালনের পর তিনি ঐ মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এ পদে তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে থেকে তিনি দেশে চলে আসার পর দু'বার চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় সুপারিনটেনডেন্ট ও নাযেমে আলা (প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদ) পদে অধিষ্ঠিত হন। ইতোমধ্যে তিনি কিছুদিন সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। কিছুদিন তিনি পদুয়া হেমায়াতুল ইসলাম মাদরাসায়ও অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় নাযেমে আলার পদে অধিষ্ঠিত থেকে দীন এবং ইলমে দীনের মহান খিদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন।

ভাষাগত পাণ্ডিত্য : তিনি সর্ববিষয়ে পারদর্শী একজন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। আরবি, ফার্সি, উর্দু এবং বাংলা ছিলো তাঁর মাতৃভাষাতুল্য। ইংরেজি ও সংস্কৃতি ভাষায়ও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিলো। সংস্কৃতি ভাষায় তাঁর বক্তৃতা শুনে কলকাতার কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিত তাঁর মুবারক হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত বিভিন্ন ভাষায় তিনি চমৎকার কবিতা রচনা করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিলো পরিপক্ব। তিনি আরবি, ফার্সি, উর্দু এবং বাংলা সাহিত্য রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। প্রত্যেক ভাষাভাষী তাঁর ক্ষুরধার লিখনীর মধ্যে ভাষাগত সাবলীলতা, বিশুদ্ধতা, অলংকার এবং সাহিত্যিক মান দেখে অভিভূত হতেন।

বিভিন্ন ভাষায় তাঁর উৎকর্ষ

আরবি ভাষায় উৎকর্ষ : আরবি ভাষায় পাণ্ডুলিপি তৈরি, আরবি বক্তৃতা, আরবিতে অনুবাদে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

আরবি ভাষায় নাটক রচনা : পাকিস্তান আন্দোলনের সময় হিন্দুস্তানের বিভক্তি নিয়ে সিমলা কনফারেন্সে উপস্থাপিত বিভিন্ন দলের অভিমত একত্রিত করে আরবি ভাষায় রচিত তাঁর নাটকটি আরবি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি বিষয়ে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি চুনতি মাদরাসার ছাত্রদের এই নাটকটি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন। একজনকে কায়েদে আজম, অন্যজনকে লিয়াকত আলী খান, কাউকে মহাত্মা গান্ধী, কাউকে নেহেরু, কাউকে নেতা প্যাটেল, কাউকে মির্জা নাজিমুদ্দিন, কাউকে সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকায় উপস্থাপন করে রচনা করেছিলেন এই নাটকটি। শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ করে অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অবিশ্বাস্য পাণ্ডিত্য দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন সেদিন।

আরবি প্রশংসাপত্র : সৌদি আরবের তৎকালীন তেলমন্ত্রী জনাব যাকী ইয়ামানি লোহাগাড়ার বড় হাতিয়া গ্রামের গ্যাস কোম্পানির খনি প্রদর্শনের প্রাককালে গ্যাস কর্তৃপক্ষের অনুরোধে একটি প্রশংসাপত্র আরবি ভাষায় রচনা করে তাঁরই নিকট প্রেরণ করেন আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)। মাননীয় তেলমন্ত্রী আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যিক উৎকর্ষ দেখে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্যে নিজেই চুনতি মাদরাসায় চলে আসেন এবং আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক একটি আকর্ষণীয় হাদিয়া তাঁর খেদমতে পেশ করেন।

আরবি ভাষাবিদ : পটিয়া আল জামিয়া আল ইসলামিয়ার প্রধান মুফতি, মুফতি আযীযুল হক (রহ.) একদা আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের মুহতারাম খতিব সাইয়িদ আব্দুল করিম মাদানি-এর নামে আরবি ভাষায় একটি পত্র লিখেন।

উল্লেখ্য যে, মুফতি আযীযুল হক (রহ.) ছিলেন আরবি ভাষা ও সাহিত্যে একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম। যিনি ফরায়েজের কিতাব সিরাজীকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানি-এর নিকট লিখিত পত্রে তিনি আদব ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এই চিঠিটি লিখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুফতি সাহেবের বিরোধীচক্র সাইয়িদ সাহেবকে উল্টো বুঝিয়ে মুফতি সাহেবকে তাঁর নিকট বিরাগভাজন করে তোলেন। সৌভাগ্যবশত, আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) বিষয়টি জানতে পেরে এ চিঠির ভাষায় আরবি সাহিত্য, প্রবাদ এবং সম্মানসূচক সম্বোধন ইত্যাদি বিষয়ে সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানিকে ভালোভাবে আরবিতে বুঝিয়ে দিলে তাঁর ভুল ভেঙ্গে যায়। ফলে মুফতি আযীযুল হক (রহ.)-এর সাথে সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানির গভীর ভালোবাসা ও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে মুফতি আজিজুল হক (রহ.) ইন্তেকাল করলে তাঁর জানাযার নামাযে সাইয়িদ সাহেব ইমামতি করেন। বাস্তবিকই এটি সম্ভব হয়েছিলো আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকার কারণেই।

আরবি বাক্যে বিচক্ষণতা : কলকাতা আকড়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা *মুহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব একটি রুমালের ব্যাপারে আল্লামা ফজলুল্লাহকে* (রহ.) জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটি কি আপনার রুমাল? তৎক্ষণাত আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) উত্তরে বলেন, كأنه هو 'মনে হয় তাই'। এ ধরনের বাক্য সাবা রাণী বিলকিস স্বীয় সিংহাসনের ব্যাপারে হযরত সুলাইমানকে (আ.) বলেছিলেন, যার বর্ণনা রয়েছে সূরা নমলের মধ্যে। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) এ কথা শুনে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। (وجد)

আরবি পুস্তকের পাঠদান যোগ্যতা : আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যেসব আরবি পুস্তক ছাত্রদের পাঠদান করতেন সেগুলোর মতন পড়তে হতো ছাত্রদের। মতন পড়ার সময় ছাত্ররা নাহু সরফ-এর মধ্যে যে ভুল করতো তা শুধরে দিতেন তিনি অকপটে। তিনি পুস্তকের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত করে ছাত্রদের মেধা ও মননে ঢুকিয়ে দিতেন সার্থকভাবে। ফলে মেধাবি, মধ্যম এবং নিম্নমানের সব ছাত্র তাঁর পাঠদানকৃত পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সমানভাবে অবগত হতো। হিদায়াতুল হিকমাহ্ এবং সুল্লামুল উলুম-এর মতো কঠিন গ্রন্থগুলোকে তিনি প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থের ন্যায় ছাত্রদের মাঝে উপস্থাপন করতেন অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায়।

তাঁর পাঠদান এবং বক্তৃতা শোনার জন্যে শিক্ষার্থীরা একাগ্রচিত্তে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করতো সাগ্রহে।

ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপত্তি : ফার্সি ভাষায় ছিলো তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি। ফার্সি ভাষায় লেখা ও বক্তৃতায় তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। এ ভাষায় ছিলো তাঁর সাহিত্যিক উৎকর্ষ। গদ্যের সাথে পদ্যেও মানসম্মত কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর কাব্য ও কবিতা ছিলো স্বভাবগত। উদাহরণ হিসেবে তাঁর

التجاء بحضور خير الورى صلى الله عليه وسلم

কসিদাটি নিম্নে সন্নিবেশিত হলো-

(١) ہمچو سیمابم سکون قلب گم کردہ منم — سوختہ اندوہگین وبس کہ آشفتہ سرم

(٢) ای امید عاصیان وراحت آشفتگاں — روز شب در خواب وبیداری خیالت ہمدمم

(٣) یافتم بارے درت صد حیف در چشم زدن — صحبتت آخر شد ومن زاں فغاں ہامی کنم

(٤) ایں تمنا باز حاصل گر بیاید شاہ من — برق چوں خنداں وہمچوں ابر گریانت شوم

(٥) خاک کویت گر بدست آید برخ مالم ورا — باز آں راتوتیای چشم سازم دمبدم

(٦) شاہ کوینی کجاتو من کجا بے مایہ خس — لاف زن بر عشق تو باشم عجب شرمندہ ام

(৭) رحمۃ للعالمین رحم خو، ذرہ نواز از کرمہائے تو من ایں گونہ جرا تہا کنم

(৮) کن کرم بر فضل خستہ غرق دریائے گنہ از ندامت شرمگں خجلت زدہ خود دمبدم

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) একবার স্বীয় পিতার নিকট ফার্সি ভাষায় চিঠি লিখেন যে, পাঠানো টাকার রশিদ এখনো পাওয়া যায়নি। ভাষা ছিলো এরকম-

رسید کہ نہ رسید، رسیدے بمن نہ رسید

এটি পড়ে তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান যাঁকে ফার্সি ভাষায় ইমামতুল্য বলা হয়, তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! মৌলভী ফজলুল্লাহ! তোমার এই বাক্যটি বিশিষ্ট ফার্সি কবি শেখ সাদীর বাক্যের অনুরূপ।

উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি : আল্লামা ফজলুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উর্দু ভাষায় এমন পাণ্ডিত্য ছিলো যে, উর্দু ভাষাভাষীকে পর্যন্ত স্বীয় লিখনীর মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতেন। উর্দু ভাষায় লিখনী ও বক্তৃতায় তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। হাঁটা, চলা, সফর ও কর্মস্থলে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি উর্দু ভাষায় কবিতা লিখতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। উর্দু ভাষায় তাঁর রয়েছে বিশেষ কাব্য ভাণ্ডার। উর্দু ভাষায় তার সাবলীলতা, বিশুদ্ধতা ও অলংকারপূর্ণ লিখনী দেখে উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পর্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও বিস্মিত হয়ে পড়তেন। তাঁর উর্দু ভাষায় রচিত একটি কাব্যিক মোনাজাত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

ہوں روسیاہ گناہوں سے شرمسار یارب کسطرح منہ دیکھاؤں احمد گو نزد میزان

মাওলানা হাবিবুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমরা একদিন আল্লামা ফজলুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সাথে চুনতি মাদরাসায় যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে বৌদ্ধদের একটি কিয়াং দৃষ্টিগোচর হয়। কিয়াং এর চতুর্পার্শ্ব বিভিন্ন রঙের ফুলে সুশোভিত ছিলো। এই চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখা মাত্র তিনি পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে আমাকে বলেন- স্মৃতির মানসপটে আমার কিছু কবিতা এসেছে, একথা বলে তিনি চলার পথে কিছু কবিতা লিপিবদ্ধ করেন। একথা ধ্রুবসত্য যে, তাঁর কাব্যিক প্রতিভা ছিলো স্বভাবগত, অর্জিত নয়। উর্দু ভাষায় তাঁর সাহিত্যকর্ম ছিল উঁচুস্তরের। নিম্নের ঘটনাটি এর জ্বলন্ত প্রমাণ। একবার চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার কোনো এক অনুষ্ঠানে সেই সময়কার ডি.সি.এফ.আই করিম, যিনি ছিলেন উর্দু ভাষাভাষী, তাঁকে অতিথি হিসেবে দাওয়াত করা হয়। আল্লামা ফজলুল্লাহ তাঁর প্রশংসায় উর্দু ভাষায় রচনা করেন একটি কবিতা, যেটি তিনি আমন্ত্রিত মেহমানের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে পাঠ করেন। উর্দু ভাষায় তাঁর উচ্চারণ ভঙ্গি এবং লেখার স্টাইল ও পাণ্ডিত্য দেখে মেহমান খুবই আনন্দিত ও প্রভাবান্বিত হন। ডিসি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে আল্লামা ফজলুল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, আমি দীর্ঘদিন স্বীয় মাতৃভূমি থেকে দূরে অবস্থান করছি। দীর্ঘদিন পর আমি চুনতি মাদরাসার পাহাড়ে এসে

স্বীয় মাতৃভাষা তার সার্বিক সৌন্দর্য সহকারে শুনতে পাচ্ছিলাম। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের উচ্চাঙ্গের ভাষা শুধু হিন্দুস্তানে অবস্থানের কারণে নয়, বাস্তবতা হচ্ছে এটি স্বভাবগত বিষয়, যাকে ইচ্ছে আল্লাহ তা দান করেন। ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি : বাংলা ভাষায় ছিলো তাঁর বিশেষ প্রজ্ঞা। বাংলা ভাষায় তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দীন। চট্টগ্রামের আলিম সমাজের মধ্যে বাংলা ভাষায় আলোচনা রাখার দক্ষতা তাঁরই ছিলো বিশেষভাবে। তাই হাইস্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আলোচনা রাখার জন্য তাঁকেই নির্বাচন করা হতো। জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুফতি আযীযুল হক সাহেব (রহ.) বাংলা ভাষায় তাঁর পারদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

তাই তো জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় বাংলা ভাষায় বিশেষভাবে এবং অন্যান্য ভাষায় সাধারণভাবে বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনার একটি বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের জন্য মুফতি আযীযুল হক সাহেব (রহ.) আল্লামা ফজলুল্লাহকে (রহ.) নির্বাচন করেন। উল্লেখ্য যে, বিশিষ্ট ওলামায়ে কিরাম এই বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্য মুফতি আজিজুল হক সাহেবের নিকট এই মর্মে আবেদন করেন যে, তিনি যেনো আল্লামা ফজলুল্লাহকে এ বিভাগের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান। উত্তরে মুফতি সাহেব বলেন, আমি আল্লামা ফজলুল্লাহকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য যারপরনাই অনুরোধ জানিয়েছি-বাকি রয়েছে আমার মাথার টুপি তাঁর কদমের ওপর রাখা। কিন্তু তিনি বিভিন্ন কারণে এ গুরুদায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রদর্শন করেন।

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ : তরিকতের ক্ষেত্রে তিনি হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ছয় মাস পর্যন্ত ইমদাদিয়া খানেকায় অবস্থানের সৌভাগ্য অর্জন করেন। কৃত্রিম পীর থেকে সাবধান থাকার জন্য তিনি সব সময় নির্দেশ দিতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আমাকে একটা ঘটনা শোনান- কলকাতা আলিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা পদে দু'জন বিশিষ্ট আলিমে দীন আবেদন করেন। ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনি একজন মাওলানা থেকে জিজ্ঞেস করেন- তরিকত দ্বারা ইসলাম বেশি লাভবান হয়েছে না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? সংশ্লিষ্ট মাওলানা তরিকতের মাধ্যমে ইসলাম প্রভূত লাভবান হয়েছে প্রসঙ্গে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে অপর মাওলানা জনাব ইয়াহিয়া সাহেব থেকে অনুরূপ প্রশ্ন করা হয় যে, তরিকত দ্বারা ইসলামের লাভ বেশি হয়েছে নাকি ক্ষতি? তিনি জবাব দেন- প্রথম যুগের তরিকত দ্বারা ইসলামের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে, এখন কিন্তু ক্ষতি বেশি হচ্ছে। তাঁর জবাব এর ভিত্তিতে খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁকে হেড মাওলানা পদে নিয়োগ দেন। আল্লামা ফজলুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো মিথ্যা পীরের হাতে বায়আত হয়ে পথভ্রষ্ট হওয়ার চেয়ে পীর ছাড়া থাকাই শ্রেয়।

সম্মানসূচক সিজদা : তিনি পীরকে সিজদা করা যাকে সিজদায়ে তাহাইয়া বা সম্মানসূচক সিজদা বলা হয়, তা হারাম বলতেন। তিনি একথা বলতেন, যদি সিজদায়ে তাহাইয়া সালামের পরিবর্তে হয়, তাহলে শরিআ'তে সালাম দেয়া সুন্নাত এবং সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব। পবিত্র কুরআনের আয়াত فحيوا بأحسن منها او ردّوها এর ভাষ্য অনুযায়ী পীর মুরিদকে এর পরিবর্তে দু'টি সিজদা বরং একটি সিজদা করা ওয়াজিব হবে।

আল্লাহভীতি : তিনি একজন আমলধারী আলেম ছিলেন। আল্লাহভীতি তাঁর মধ্যে ছিলো অত্যাধিক। তিনি ইবাদত-বন্দেগিতে খুবই আন্তরিক ছিলেন। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের প্রথমদিকে মসজিদে উপস্থিত থেকে জামাতের সাথে নামায আদায় করতে অভ্যস্ত ছিলেন। ১৯৬০ সালে পবিত্র হজও পালন করেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর ছিলো প্রবল ঝোঁক। তিনি শুধু নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদিকে ইবাদত মনে করতেন না বরং এর সাথে সাথে পৃথিবীর সকল কাজ সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করাকে তিনি দীন মনে করতেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস- لارهبانية فى الإسلام 'বৈরাগ্যবাদ ইসলামে নেই।' একথা সবসময় বলতেন। তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন যে, যদি দীনের কোনো কাজ সুন্নাহ অনুযায়ী না হয়, তাকে তিনি পার্থিব কাজ মনে করতেন। পক্ষান্তরে পার্থিব কোনো কাজ যদি সুন্নাহ অনুযায়ী হয়, তাকে তিনি দীন মনে করতেন।

ইবাদত-বন্দেগির সাথে সাথে দুআ'-দরুদ বিশেষ করে হযরত আবুল হাসান সাজলি রাহমতুল্লাহি আলাইহি-এর হিজবুল বাহার-এর দুআ'সমূহ তিনি যথানিয়মে আদায় করতেন। চলাফেরার সময় তার মুখ থেকে দুআ'-দরুদ জারি থাকতো। তিনি দুআ'-দরুদ এবং নফল ইবাদত গোপনভাবে আদায় করার চেষ্টা করতেন। তিনি আল্লামা ইকবালের নিম্নের কবিতাটি জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়নের নির্দেশ দিতেন-

بمصطفی برساں خویش را کہ دیگر ہمہ اوست اگر باو نہ رسیدی تمام بولہبی ست

মিথ্যা দরবেশি থেকে সতর্ক থাকা: তিনি তাঁর প্রিয় ছেলে আবু ছফা মুহাম্মদ নজমুদ্দিনকে মিথ্যা দরবেশী পরিহারের জন্য চিঠি লিখে নিম্নের হিদায়াতবাণী পেশ করেন-

(১) মিথ্যা দরবেশি অবলম্বন করো না, তোমার কথার মধ্যে আবেগ রয়েছে। যা খুবই বিপদজনক।

(২) স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির দেখাশোনা, খিদমত ও তাদের লালন পালন হচ্ছে ইসলামি শরিআতের বিধান। শরিআত ব্যতিরেকে কোনো মারিফত গ্রহণযোগ্য নয়। সঠিক পথে ফিরে এসে সকল কাজ যথানিয়মে সম্পন্ন করো।

(৩) স্বীয় সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর হওয়ার জন্যে আল্লাহর দরবারে দুআ' করো। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সার্থক হওয়ার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও।

(৪) স্বীয় মুরশিদের নির্দেশনা অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করো।

(৫) আমার খিদমতের কোনো চিন্তা করো না, আল্লাহ তাআলা যতোদিন শক্তি দেন, স্বীয় ৭২ বছরের বয়সেও পরিবার পরিজনের খিদমত করেই যাবো। সবসময় আল্লাহর ওপর ভরসা রাখবো।

অন্য একটি কথা শোনো, ভালো মনে করলে গ্রহণ করো।

যেহেতু মানবজাতি স্বীয় জ্ঞান-গরিমা দ্বারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, তাই আল্লাহপাক মানুষের হিদায়াতের জন্য রাসুল প্রেরণের প্রক্রিয়া জারি রেখেছেন। যুগে যুগে নবী-রাসুলের আগমন ঘটেছে। মানুষ স্বীয় জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেক নবী ও রাসুল এক একটি উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। যাতে মানুষ সেসব উত্তম আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন করে।

অতএব, একথা হৃদয়ঙ্গম করো, আমাদের প্রিয়নবী, সাইয়িদুল মুরসালিন, শাফিউল মুজনিবিন, খাতিমুল নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুন্দর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই জীবন পদ্ধতি গোঁড়াপন্থী ব্যতিরেকে পৃথিবীর সকল মুসলিম, অমুসলিম, জ্ঞানী-গুণী সবাই মেনে নিয়েছে, এই আদর্শ অনুসরণ অতীব প্রয়োজন। এছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। কবি বলেন,

خلاف پیمبر کسے راگزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

নবী করিম (সা.)-এর আদর্শের মধ্যে বৈরাগ্যবাদ নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন, ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই। পরিবার-পরিজন এবং বাড়িঘর সব কিছু ত্যাগ করে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাওয়া, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন-এর ওপর দয়াপরবশ না হওয়া এবং তাদেরকে উপেক্ষা করার মানসিকতা আত্মিক উন্নতির পথে চরম বাধা। জরুরি প্রয়োজনাদি এবং অর্পিত দায়িত্ব এড়িয়ে চলা কোনো মারিফাত এবং ইবাদত নয় বরং এসব হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। আল্লাহর সন্তুষ্টি রাসুলের আনুগত্যের মধ্যে নিহিত। আল্লাহর আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে রাসুলেরই আনুগত্য। আল্লাহ বলেন: من أطاع الرسول فقد أطاع الله 'যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করে'। প্রকৃত যুবক সে, যে স্বীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। এটি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রাসুল (সা.) এর আদর্শ।

তিনি একজন মুফতি ছিলেন : তিনি ফাতওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে استفت قلبك এর ভিত্তির ওপর ফাতওয়া লিখতেন। বিশেষ করে তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

ইলমুল ফারায়েজ : ফারায়েজ এর বিষয়ে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত এবং যুগশ্রেষ্ঠ। তিনি বাংলা ভাষায় সম্পদ বণ্টনের যে ফরায়েজ করতেন, সে অনুযায়ী আদালত বিচার ও মতামত প্রদান করতো। যতো স্তরের ফরায়েজ হোক না কেনো, তিনি খুবই সহজভাবে তা সম্পন্ন করতে সক্ষম ছিলেন। মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক, যাতে কারো হক বিনষ্ট না হয়।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা : রাজনীতির প্রতি তাঁর ছিলো প্রবল আকর্ষণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে তিনি মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন। পরবর্তীতে নেজামে ইসলামের মনোনীত মাওলানা মাহমুদুর রহমান সাহেবকে জাতীয় পরিষদ সদস্য (এমপিই) নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তাঁর একজন হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেন।

তিনি জুরী (বিচারকার্যে সহযোগী) ছিলেন : রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোর্টের মধ্যে কঠিন মামলার রায় দেয়ার বিষয়ে জজ সাহেবের উপদেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু জ্ঞানী-গুণী উপযুক্ত দীনদার ব্যক্তি নির্বাচিত করা হতো। তাঁরা মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাদী ও বিবাদীর বর্ণনা জজ সাহেবের সহযোগিতার জন্যে লিপিবদ্ধ করতেন। জজ সাহেবের রায় দেয়ার সময় তাঁরা স্বীয় মতামত প্রকাশ করতেন। জজ সাহেবও তাঁদেরকে মামলার বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দিতেন এবং তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন কিন্তু রায় দিতেন জজ সাহেব নিজেই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। তিনিও এ ধরনের একজন জুরী হিসেবে সরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মিলাদ মাহফিল : তিনি মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করতেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কসিদায়ে বুরদা পাঠ করতেন এবং মধ্যে মধ্যে নিম্নের কবিতাগুলো রাসুলুল্লাহ (সা.) এর শানে আবৃত্তি করতেন।

ای چہرۂ زیبائے تو رشک بتان آذری — ہر چند وصفت می کنم لیکن آزاں بالاتری

ہر گز نیابد در نظر صورت زروئے خوب تر — شمسی نہ دانم یا قمر یا زہرا یا مشتری

کشتے کہ عشق دارد نہ گذاردت بدیساں — بہ جنازہ گر نہ یائی بمزار خواہی آمد

وصلی اللہ علی نور کز وشد نور ہا پیدا — زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا

بلغ العلی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ — حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ

তিনি ছিলেন একজন লেখক : তাঁর খ্যাতনামা লিখনী হচ্ছে- কাশফুল জালালাইন বাংলা ভাষায় অনূদিত শামায়িলে তিরমিযী; উর্দু ভাষায় অনূদিত আদ দুররুল বহীয়্যু ফি শরহে আল জামে লিল ইমামিত তিরমিযী। যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম, উর্দু ভাষায় অনূদিত শরহে ঈসাগুজী, উর্দু ভাষায় রচিত আদ-দুরুসুস সারফিয়্যা, বাংলা ভাষায় অনূদিত কাসিদায়ে বুরদাহ, উর্দু ভাষায় রচিত আদ-দুরুসুন নাহবিয়া, আসান উর্দু তালিম, হাইস্কুলের নবম শ্রেণির জন্যে রচিত উর্দু গ্রামার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী : তিনি প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। সংকীর্ণ মানসিকতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। সবাইকে পারস্পরিক মতানৈক্য থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিতেন। বিশেষ করে ওলামায়ে কিরামকে একতাবদ্ধ থাকতে অনুরোধ করতেন। ছোটো ছোটো মাসআলায় মতানৈক্য করতে বারণ করতেন। বিশেষ করে শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে মতানৈক্য থেকে দূরে থাকতে বলতেন। তিনি বলতেন, সাহাবায়ে কিরামগণের মধ্যে মতানৈক্য ছিলো, তা ছিলো মৌলিক। আমাদের বাংলাদেশের ওয়াহাবি-সুন্নির মতানৈক্যকে তিনি শাখা-প্রশাখাগত বলতেন। বিদআত থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিতেন। শিয়া এবং খারেজিদেরকে বিদআতি বলতেন।

ইন্তেকাল : তিনি ৪ মার্চ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ, ৫ রবিউস্‌সানি ১৩৯৯ হিজরি, ১৯ ফাল্গুন, রবিবার মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান।

---

* প্রবন্ধকার, হযরত মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলল্লাহ (রহ.)-এর একজন কৃতী ছাত্র। সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে তাঁর লালন পালন এবং তাঁরই অভিভাবকত্বে তিনি পড়ালেখা সম্পন্ন করেন।

আমার অভিভাবক আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (রহ.)

হযরতুল আল্লামা আল ফাহহামাহ্ যিনি বুদ্ধিলব্ধ ও বর্ণিত বিবৃত জ্ঞানরাজির অধিকারী, যিনি মৌলিক নীতিবিজ্ঞান এবং বিশদ ও বিস্তারিত বিষয়ে প্রাজ্ঞ, আল্লাহ তার আশ্রয়স্থলকে আলোকিত করুন এবং বেহেস্তকে তাঁর চিরস্থায়ী ঠিকানা করুন। আমিন!

মহাসৃষ্টির স্রষ্টার এটাই প্রচলিত নিয়ম যে, তিনি নিজের বান্দাদের কল্যাণ এবং সার্থকতার জগতে দুষ্পাপ্য অথচ বরকতময় কিছু ব্যক্তিবর্গকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে থাকেন। যাঁদের দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টিকুলের জ্ঞান, কর্মকাণ্ড তথা বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় এবং পার্থিব উপকার সাধিত হয়। অনুরূপ ক্ষণজন্মা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ওস্তাবৃন্দের ওস্তাদ, বিচক্ষণ আলিম এবং প্রখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) প্রথম সারির অন্তর্ভুক্তদের অন্যতম। তিনি ১৮৯৭/৯৮ সনের এক মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলার ইসলামের প্রাণকেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বরেণ্য পিতা বিখ্যাত আলিমে দীন এবং বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল হুদা (রহ.) এ বাচ্চার ভূমিষ্ঠ হবার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء আয়াতটি উচ্চারণ করতঃ তাঁর নাম ফজলুল্লাহ (আল্লাহর অনুগ্রহ) রাখেন।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় পিতার স্নেহবন্ধনে সম্পন্ন হয় এবং মধ্যবর্তী শিক্ষা চট্টলার বিখ্যাত দ্বীনি প্রতিষ্ঠান মুহসিনিয়া মাদরাসায় কৃতিত্ব সহকারে সমাপ্ত হয়। চূড়ান্ত যশ-নাম সহকারে সরকারি ডিগ্রি লাভ করতঃ তিনি 'মাদরাসা ফাইনাল' পাশ করেন। কিছু ঘনিষ্ঠ জনের চাপ সত্ত্বেও তিনি ইংরেজি শিক্ষাক্রম ত্যাগ করতঃ ১৯২০ সনে ইসলামি বিদ্যাভ্যাস এর লক্ষে হিন্দুস্থানের স্বনামধন্য বিদ্যাপিঠ মাদরাসা মাযাহির উলুম সাহারানপুরে চলে যান। সেখানে মেধা বুদ্ধিগত এবং কিতাবি জ্ঞানসমূহের বিদ্যা তিনি আহরণ করেন। সুবিখ্যাত ওলামা এবং দীনের মহতি ব্যক্তিবর্গের অধীনে তিনি নবুওতভুক্ত বিদ্যাচর্চা সম্পন্ন করেন। মরহুম সে যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু দাউদ শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'বজলুল মজহুদ'-এর প্রণেতা আল্লামা শাইখ খলীল আহমদ সাহারানপুরী এবং অন্যান্য মান্যবর স্নেহধন্যদের মধ্যে শামিল হন। আমাদের মরহুম ওস্তাদ মাওলানা ফজলুল্লাহ ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনকারী মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (রহ.)-এর মুরিদানভুক্তও ছিলেন।

দ্বীনি বিদ্যাভ্যাস ছাড়াও তিনি সমকালীন জ্ঞান-গরিমাসমূহে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এজন্য এখানে সর্বত্র বিদ্যাবর্ত্তী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানসমূহে তাঁকে 'যুগশ্রেষ্ঠ' মেনে নেয়া হতো। প্রকৃতিগতভাবে মেধা, বিচক্ষণতা, নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা এবং ধর্মশীলতা, পূতঃপবিত্রতা, দীনি বিষয়ে স্থিরতা ইত্যাদির মতো প্রশংসনীয় গুণাবলি তাঁর মধ্যে যেনো ঠেসে দেয়া হয়েছিলো। কাব্যগীতি রচনায়ও তাঁর প্রকৃতি সুরুচি সমৃদ্ধ ছিলো। তিনি একজন বড়ো মাপের বাকপটু বাগ্মী ছিলেন। কসিদাহ প্রস্তুতি কাব্য এবং গযল রচনায় তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে কবিতা প্রণয়নে তাঁর ব্যুৎপত্তি পরিপূর্ণ ছিলো। আরবি ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় তিনি সমানে পদ্য-গদ্য মাধ্যমে বিচিত্র বিষয় লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম ছিলেন। বিদগ্ধজন তাঁর কাব্যকর্মের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। সর্বস্তরের লোকজন

তাঁর কাব্য-লালিত্য উপভোগ করতেন। আমাদের মরহুম ওস্তাদের বক্তৃতামালাও অনেক উচ্চমানসম্পন্ন হতো। তাঁর দ্বীনি আলোচনা শোনার জন্য দূর-দূরান্ত হতে লোক তাঁর মাহফিলে শরিক হতো। তাঁর জাদুমন্ত্রবৎ ভাষণ প্রবাদবাক্যের রূপ লাভ করে। তিনি তাঁর সারা জীবনটাই দ্বীনি বিদ্যাভ্যাসে ব্যয় করেন। সাহারানপুর মাদরাসার উচ্চতর পড়াশুনা সমাপন করতঃ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগেই তাঁর ওস্তাদবৃন্দ, তাঁকে কলকাতার অদূরে চব্বিশ পরগনাস্থ আকড়া কুদসিয়া আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা কর্ম করার জন্য নিয়োজিত করেন। অতএব এ বরেণ্য ওস্তাদ সাহারানপুর থেকে সোজা কলকাতা চলে আসেন। বিশ বৎসরাধিককাল তিনি উক্ত মাদরাসার বিকাশ-প্রগতি কর্মে কর্তৃত্ব সহকারে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার সদিচ্ছা সুউচ্চ কর্মপ্রেরণা এবং নিঃস্বার্থ সেবাকর্মের সুবাদে এ মাদরাসা উন্নয়নের রাজপথে গতি লাভ করে এবং সুউন্নত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়।

ভারত বিভক্তির আন্দোলনমুখর সময়কালে তিনি কলকাতা থেকে নিজ দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯৪৫ সনে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলার) প্রথম শ্রেণির দ্বীনি প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং অন্তিম মুহূর্তকাল পর্যন্ত (মধ্যবর্তী কয়েক বছর ব্যতিরেকে) এর অব্যাহত সেবাকর্মে আত্মনিয়োজিতপ্রাণ ছিলেন। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশে দ্বীনি মাদরাসাসমূহের ক্ষেত্রে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা যে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তা আমাদের মরহুম ওস্তাদের নিঃস্বার্থ সেবাকর্ম এবং উচ্চতর উপযুক্ততার কাছে চিরঋণী থাকার কথা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে তাঁর লক্ষ হাজার ছাত্রবৃন্দ দ্বীনি মাদরাসা কিংবা সরকারি-বেসরকারি কর্মক্ষেত্রসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বহুবিধ কর্তৃত্ব মর্যাদার অধিষ্ঠানপ্রাপ্ত আছেন- নিবন্ধকার বান্দা মুহাম্মদ আমীনের (আল্লাহ তার সহায় হউন) ও তাঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁর বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ এবং পরিপালন প্রক্রিয়ার সুবিশাল অবদানে আমি নিজেই ভারাক্রান্ত, যা জীবনে-মরণে কোনক্রমে বিস্মৃত হবার নয়।

আমাদের ওস্তাদ মরহুম অজস্র রচনাসম্ভার রেখে গেছেন। তন্মধ্যে শামায়িলে তিরমিযীর বঙ্গানুবাদ অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাছাড়া সুনানে তিরমিযীর বিশদ টীকা-ভাষ্য, আরবি ব্যাকরণভুক্ত আদ-দুরুস্ আস্ সরফীয়্যাহ এবং আদ-দুরুস আন নাহভিয়্যাহ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

তাছাড়াও রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরও অনেক আছে- যা সময়মত লিপিবদ্ধ করা হবে। স্বনামধন্য হযরত মাওলানা ৫ রবিউস-সানি রবিবার ১৩৯৯ হিজরি, ৪ মার্চ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে অস্থায়ী এ জগৎ থেকে স্থায়ী ঠিকানায় যাত্রা করেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন!

نور سے بھر دے خدایا قبر کو انکی سدا اور نازل ان پہ رحمت ہو امین کی یہ دعا

নূর সে ভর দে খোদায়া কবর কো উনকী সদা

অউর নাযিল উন পে রহমত হো আমীন কী য়েহ দু'আ

মুহাম্মদ আমীন, আল্লাহ যেনো তাঁর পিতামাতা এবং ওস্তাদের সহায় হন। খাদিমুল হাদিস, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা।

আমার স্মৃতিতে আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)

প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান (রহ.)

হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেব একজন অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলিমে দীন ছিলেন। তাঁর ধীর, শান্ত, স্থিরচিত্ত চেহারায় সর্বদা একটি প্রশান্তভাব লেগে থাকতো। তিনি কথাবার্তায় অত্যন্ত সংযত ছিলেন। লোকজনের সাথে ঠাট্টা-মশকারী করতেন না। তিনি সর্বদা লেখাপড়া এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আমাদের ছোটবেলায় তাঁর চেহারার দিকে তাকালে, যেনো একটি আরবি ভাব ফুটে উঠতো। পরবর্তীতে দেখলাম তিনি আরবি ভাষায় মাহের ছিলেন। আরবি ভাষার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অনুবাদে দক্ষ ছিলেন। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তিনি আরবি, ফার্সি ও উর্দুতে কবিতা রচনা করতে পারতেন। তিনি আরবি কবিতা আবৃত্তির ব্যাপারেও যথাযথ সুর, মাত্রা ও উচ্চারণের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। চুনতি মাদরাসার বার্ষিক সভায় যে বছর সউদি আরবের মহামান্য রাষ্ট্রদূতের আগমন হয়েছিলা, সে বছর তিনি আরবি কবিতায় চুনতি মাদরাসার ইতিবৃত্ত রচনা করেন। মাওলানা আবদুর রশিদ সাহেব তাঁর প্রিয়ছাত্র ছিলেন। মজলিশে কবিতাটি কে আবৃত্তি করবে, তার কথাবার্তা হচ্ছিলো। মাওলানা আবদুর রশিদ সাহেব কবিতাটি আবৃত্তি করার অনুমতি প্রার্থনা করলে, তিনি তাঁকে বললেন: তুমি আমার সাথে অঙ্গীকার করো, শুদ্ধভাবে পড়বে এবং সঠিকভাবে আবৃত্তি করবে। তিনি মাওলানা আবদুর রশিদ সাহেবকে নিয়ে অত্যন্ত গৌরব করতেন।

তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে, যখন তিনি চুনতি মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে যোগদান করেন। তখন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা তাহের আহমদ খান চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসার দেখাশোনার কাজে ন্যস্ত ছিলেন। তিনি মাদরাসায় শিক্ষকতাও করতেন। মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেব তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর সাথে প্রায়শ আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতো। দুই চারটা কথাও হতো। তিনি আমাকে অনেক উপদেশমূলক কথা বলতেন। তাঁর সাথে যে এভাবে একপ্রকার ঘনিষ্ঠভাব হয়েছিলো, তা তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত বজায় ছিলো। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং সম্মান করতেন। তিনি ১৯৫১ সনে চুনতি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। কিন্তু ১৯৬৩ সন থেকে ১৯৭৯ সন পর্যন্ত তিনি পুনরায় চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসা এবং পরবর্তীতে আলিয়া মাদরাসার নাযিমে আ'লা বা রেকটর হিসেবে কার্যনির্বাহ করেন। এই সময়ে তিনি আল্লাহর ওলি হযরত শাহ সাহেব কেবলার একনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে একদিকে চুনতি মাদরাসার উত্তরোত্তর উন্নয়ন সাধন করেন এবং অন্যদিকে প্রফেসর ড. আবু বকর রফীকের সহযোগিতায়, হযরত শাহ সাহেবের অনুরোধে সিরাতুন্নবি (সা.)-এর আনুষ্ঠানিক অবকাঠামো তৈরি করে, একটি বাৎসরিক সিরাতুন্নবি (সা.) উদ্‌যাপন প্রতিষ্ঠানরূপে তা পরিচালনা করেন। একজন সহকর্মী হিসেবে আমি এতদ উভয় কর্মকাণ্ডে যথাসম্ভব তাঁর কার্যক্রমের সাথে জড়িত হই।

মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব আরবি সাহিত্যে, পবিত্র কুরআনের তাফসির ও হাদিসশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এসব জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে আমরা মুগ্ধ

হতাম। জ্ঞানের প্রশস্ততার দরুন তাঁর মধ্যে পক্ষপাতিত্বের সংকীর্ণতা ছিলো না। সে যুগে কেবল চট্টগ্রাম নয়, সারা বাংলাদেশের আলিম-ওলামাদের মধ্যে তিনি উদারনৈতিক ছিলেন। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এবং তিনি সমসাময়িক মযহাবি ও ফেরকাবাজি ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কের উর্ধ্বে অবস্থান করতেন। তাঁদের জ্ঞানের গভীরতায় ও বিবিধ শাস্ত্রীয় বিদ্যার ব্যাপ্তিতে সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মতবিরোধ, অন্তরে প্রশান্তিমূলক সমাধানের পথ খুঁজে পেতো। তাই তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেনো, তাঁদের নিকট সর্বদা লোক সমাগম হতো।

তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার প্রক্রিয়া একটি বিরল ধারাবাহিকতায় অগ্রসর হয়। তাঁর পারিবারিক উপাত্ত অনুযায়ী তিনি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক গ্রামের নাম ছিলো বাবুনগর। তাঁর পূর্বপুরুষের আবাসস্থল 'মক্কারো বাড়ি' নামে পরিচিত ছিল। তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা যায় যে, তাঁর পূর্বপুরুষ শায়খ ইয়াসিন মক্কি, পবিত্র মক্কানগরী থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন। পূর্বযুগে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ লোকেরা জনসাধারণের বিনোদনের জন্যে বার্ষিক মেলা, বলীখেলা, গরুর লড়াই, ঘোড়দৌড় ইত্যাদির আয়োজন করতো। ১৯৩৯ সনের দিকে যখন আমি পার্শ্ববর্তী এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতাম, তখন আমি একবার মক্কারো বলীখেলা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন বিস্তীর্ণ এলাকায় হরেক রকম পণ্যদ্রব্যের বাজার ও মেলা বসেছিলো। তাতে বুঝা যায়, তাঁর পূর্বপুরুষগণ খ্যাতিমান লোক ছিলেন।

তাঁর পিতা মাওলানা নুরুল হুদা (রহ.) একজন প্রসিদ্ধ আলিম এবং স্বনামধন্য সুফিসাধক ছিলেন। তিনি ইসলামি ধর্মীয়শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন শিক্ষক বা ওস্তাদ ছিলেন। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ বিশ্বপ্রসিদ্ধ দেওবন্দ মাদরাসার একজন স্থপতি শিক্ষক মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর শিষ্য বা মুরিদ ছিলেন।

মাওলানা নূরুল হুদা সাহেবের খ্যাতনামা ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা শাহসুফি আহমদুর রহমান প্রকাশ চূড়ামনির শাহ সাহেব, মাওলানা বদিউর রহমান (রামপুর), মাওলানা আমিন উল্লাহ (বারোদোনা) অন্যতম ছিলেন। বালক ফজলুল্লাহর শিক্ষা-দীক্ষাও পিতার হাতেই শুরু হয়।

পারিবারিক সূত্র মতে, পুত্রের জন্মের সুসংবাদ পেয়ে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে মাওলানা নূরুল হুদা পবিত্র কুরআনের "যালিকা ফদ্‌লুল্লাহি ইয়ূতিহি মাইয়াশা", অর্থাৎ এটি আল্লাহর দান, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে থাকেন, আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। এর থেকে শিশুপুত্রের নাম রাখা হয় 'আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ'।

তিনি পিতার নিকটেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ঘরোয়া পরিবেশে উর্দু, ফার্সি ও আরবি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর সে যুগের প্রাচীনপন্থী মাদরাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম মহসিন কলেজে (প্রাক্তনরূপ: মুহসিনিয়া মাদরাসা) অধ্যয়ন করেন। ১৯১৯ সনে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাশ করেন। এরপর তিনি হাদিস ও তাফসিরের উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের সাহরানপুরস্থ মাদরাসায়ে মাযাহির উলুম এ গমন করেন। সেখানে তিন বছর (১৯২০-১৯২২ খ্রি.) অবস্থান করে হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়াদিতে প্রভূত ব্যুৎপত্তি অর্জন করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

ভারতে অবস্থানকালে তিনি প্রখ্যাত পীর মাওলানা আশরাফ আলি থানভী সাহেবের আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, মুরিদ হন।

সাহারানপুরে পাঠ শেষ করার পর তাঁর শিক্ষকমণ্ডলী তাঁর অনন্য মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিবেচনা করে তাঁকে ১৯২৩ সালে কলকাতা আকড়া আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার জন্যে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে অচিরেই প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হন, তথায় দীর্ঘ ২০ বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৪৩ সনে সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসা তাঁকে বরণ করে নেয়। তিনি বিগত ৪০ বছর ধরে ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে যেরূপ ইসলামি ধর্মীয় ঐতিহ্যের আওতায় এবং উর্দু, আরবি, ফার্সি সংস্কৃতিচর্চার পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করে এসেছিলেন, সাতকানিয়ায় তাঁর বসতবাড়ির আশেপাশে সেরূপ জীবনযাপন করার কোনো পরিবেশ ছিলো না। গোটা চট্টগ্রামে চুনতি গ্রামই ছিলো এক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রসর। ফলে তিনি চুনতিকে ব্যক্তিগতভাবে আপন করে নেন। তদুপরি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা জন্মের দিক দিয়ে ওনার সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি মিশনারি ইংলিশ স্কুল থেকে নিম্ন মাধ্যমিক এন্ট্রান্স পাশ করে মুহসিনিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে আরবি শিক্ষায় নিবৃত হন। তাতে উভয়ের সখ্য অত্যন্ত আন্ত রিক ছিলো। তাই তাঁর শেষ জীবনে তিনি চুনতির বন্ধু-বান্ধবদের এবং ছাত্র-শিষ্যদের সাথে স্নেহ-মমতায়, অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে সসম্মানে ভালোবাসায়, সৌহার্দ্যে বিজড়িত হয়ে আনন্দে ও স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করেন। চুনতিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং চুনতির ঐতিহ্যবাহী ওলি-উল্লাহদের কবরস্থানে তিনি সমাহিত হন।

বিগত বিশ শতকের চট্টগ্রামস্থ অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম হযরত মাওলানা মুফতি আযীযুল হক সাহেব তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চধারণা পোষণ করতেন। তিনি বলতেন- সাঙ্গুনদীর দক্ষিণে দ্বীনি ইলম দু'জন মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে অবস্থান করছে। তাদের একজন হলেন- মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ এবং অন্যজন মাওলানা আবুল মুযাফ্ফর আহমদ সাহেব। আল্লাহ তাদের কবরগাহ আলোকিত করুন। আমিন!

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) সম্পর্কে প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ'র (রহ.) অভিব্যক্তি

সভ্যতার মহাপ্রবাহে ইসলামের আবির্ভাব (৬১০ খ্রি.) মহাকালের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট সূত্র নির্দেশ করে। এক হাজার বছর পূর্বে গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা অনুশীলনের স্বর্ণযুগ ছিলো, আর এক হাজার বছর পর সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষিত বৈজ্ঞানিক যুগের (সপ্তদশ শতাব্দী) সূত্রপাত ঘটে। মাঝখানে সাত শতকের অধিক কাল (৬১০-১৩৫০) ইসলামি সভ্যতার সদর্প অবস্থান সপ্তদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত অনবদ্য এক ঐতিহ্য অবস্থান, শত তাৎপর্য অধিকার করে আছে। যার অবদান সঙ্গত কারণে শাশ্বত বলে স্বীকার্য; কারণস্বরূপ উল্লেখ্য, ইসলামি সভ্যতার আংশিক প্রবৃদ্ধি বৈজ্ঞানিক সভ্যতার উদ্ভবকালে যেমন ক্রিয়াশীল ছিলো এর বহুমুখী প্রয়োগসিদ্ধতা এবং ফলপ্রসূতার ক্ষেত্রেও একইভাবে তা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে বলে আধুনিকতা উত্তর মন-মানসিকতা আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী। সব চাইতে বড় কথা- বৈজ্ঞানিক সভ্যতাপুষ্ট আধুনিকতা উত্তরকালেও (Era of post modernism) অধুনা ইসলামের অপরিহার্যতা মেনে নিচ্ছে বলে ইসলামি সভ্যতা মোটামুটি সর্বংসহা বলে স্বীকৃত। এজন্য যে, ইসলামে অব্যাহত বুদ্ধি-বৃত্তিক চর্চা নানাভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস ভিত রচনা করেছে বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত। অতএব অতি সীমিতভাবে হলেও মরহুম মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব-এর মানস প্রতিভা সুমহান ঐতিহ্যকে যেমন লালন করছে- তাঁর আজীবন অবদানসমূহ অসামান্য উৎসাহ-অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতঃ তাঁর সাহচর্যপ্রাপ্তরা উজ্জীবিত প্রোজ্জ্বল এক প্রজন্ম রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে, তাঁর জীবন ও সময়কাল একাডেমিক পর্যালোচনার দাবিদার।

মরহুম মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেবের সময়কাল (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রি.) ৮২ বছর যা বৈজ্ঞানিক যুগের মোক্ষম দুই শতাব্দীর সংযোগ এবং ক্রান্তিকাল বলে সুবিদিত। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় বৃহত্তর সাতকানিয়ার পশ্চিমাঞ্চল প্রতিভা প্রসবিনীস্বরূপ খ্যাত ছিলো বলে এতদঞ্চলে তাঁর সমসাময়িকদের কিছু ওলামা মাশায়েখবৃন্দ দেশ-বিদেশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় আত্মনিবেদিত ছিলেন। তাঁর বাবা মাওলানা নূরুল হুদা বিপুল খ্যাতি সম্মানের অধিকারী এবং জ্ঞাননন্দিত ব্যক্তিসত্তায় ভূষিত ছিলেন- বলে জানা যায়। একই সময় এবং কাছাকাছি সময়কালের বিজ্ঞজনের মধ্যে মরহুম মাওলানা ফজলুর রহমান (বাঁশখালী), মাওলানা আবদুল হাই, মাওলানা মুহাম্মদ মুহাদ্দিস আমিন (চরতী), মাওলানা মুখলেসুর রহমান (হযরত শাহ), মাওলানা রমিয আহমদ (উভয়ই গঙ্গুহী (রহ.) এর খলিফা), মাওলানা আমিনুল্লাহ (বড় মাওলানা), মাওলানা আবুল হাশেম শেরে খোদা, মাওলানা মোজাফফর আহমদ (হেড মাওলানা), মাওলানা আবুল মোজাফফর, মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফা, মুফতি মাওলানা ইব্রাহিম (হেড মাওলানা), শাহ্ মাওলানা আবদুল মজিদ ও শাহ মাওলানা আবদুর রশীদ (বড়হুজুর এবং ছোটহুজুর) মাওলানা মাহমুদুর রহমান এমপি, মাওলানা দানেশ, মাওলানা বদিউর রহমান রামপুর, মাওলানা আবুল খাইর (বড়ো মুফতি), মাওলানা মফজ্জলুর রহমান

সাহেবান-সহ কামিনী বাবু, ডলু পণ্ডিত, ডিপুটি মুস্তাফিজুর রহমান, ডিপুটি কবির উদ্দিন খাঁ, মৌলভী আবুল মকসুম, উকিল হাফেজ মিয়া, মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবী, কামিনী বাবু, যোগেশ বাবু, সুভাষ বাবু, শশাংক মহারাজ গুপ্ত, খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, মুফতি আযীযুল হক পটিয়া, মাওলানা আবদুল ওহহাব এবং অন্যান্য ওলামা মাশায়েখের সাথে আমরণ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। বর্তমান লেখার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিসত্তা, যিনি সবার কাছে একক শিরোনাম 'নাযেমে আ'লা' নামে সুপরিচিত। বলাবাহুল্য, উল্লিখিত সময়কালে 'বন্দর নগরী চট্টলার মননশীলতা শিক্ষা-দীক্ষা, সাংস্কৃতিক প্রগতিশীলতার ক্ষেত্রে সারা বাংলায়, এর মেধাদীপ্ত সৌকর্য এমন কি, উপমহাদেশব্যাপী তাৎপর্যমণ্ডিত দেখা যায়, যাতে সুদূর বার্মা-শ্যাম' এর সুদীর্ঘ সংযোগ সড়ক বিখ্যাত আরাকান রোডস্থ ঐতিহ্যবাহী সাতকানিয়ার ভূমিকা ব্যুৎপত্তি সমুজ্জ্বল ছিলো এবং এরই এক কৃতী সন্তানস্বরূপ অনেকের সাথে তাঁর নামে চিরস্মণীয় হবার কথা- এ বিষয়টিই প্রধানত বর্তমান সংকলনের মর্মবাণীস্বরূপ উল্লেখযোগ্য।

আল্লামা শিবলী নুমানী, যিনি উপমহাদেশের সর্বোচ্চ মেধা-মনন এর মূল্যমান নির্ণায়ক বলে খ্যাত, 'সীরাতুননুমান (সা.)' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, "অনেক অনেক বিজ্ঞ লোকের মধ্যে কিছু লোক জীবিত এবং মৃত অবস্থায় সমানে কৌতূহলোদ্দীপক এবং অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন- তাঁরাই মহত্তর জীবনযাপন করেছেন, তাঁরাই মরেও অমর হয়ে থাকেন।"

নিবন্ধকারের বিবেচনায় 'নাযেম সাহেব, সীমিত অর্থে হলেও, অনুরূপ কালজয়ী, মেধাদীপ্ত, ব্যক্তিবর্গের শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের যৌবনকালের প্রথম বিশ বছর পশ্চিমবঙ্গের আকড়া কুদসিয়া মাদরাসায় থাকাকালীন তাঁর যশস্বী ব্যক্তিসত্তার পরিচয় মেলে সৌভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত মাত্র দুটি তথ্যের মাধ্যমে। (ক) মুসলিম ভারতের প্রখ্যাত মুসলিম ব্যবসায়ী ওয়াসেল মোল্লার আবেদনক্রমে সাহারানপুর মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা ইয়াকুব সাহেব কর্তৃক মনোনীত চৌকস ছাত্র, মৌলভী ফজলুল্লাহ সাহেবকে 'আকড়া মাদরাসা' গড়ে তোলবার লক্ষ্যে তাঁর মনোনয়ন দান (খ) (১৯২৩-৪২) দীর্ঘ বিশ বছর কালব্যাপী তিনি মফস্বলীয় অঞ্চলে থেকেও আধুনিক হিন্দুস্থান-তীর্থ 'কলকাতা' শহরের প্রগতিশীল আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা-প্রবাহের সাথে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। হাশেমিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য রেক্টর আল্লামা মুযহির এবং চুনতির আধ্যাত্মিক গুরু শাহ্ মাওলানা হাবিব আহমদ সাহেবান-এর সূত্রে তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার মধ্যেও তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতা সূত্রে এ. কে. ফজলুল হক, খাজা নাযিমুদ্দীন, আবুল হাশেম, সি. আর. দাশ, মাওলানা আকরাম খাঁ-সহ মাওলানা আযাদ, শায়খুল হিন্দ, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের কর্মতৎপরতার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়।

বলাবাহুল্য, ১৯৩৫-১৯৪৫ এ দশ বছরের সময়কাল বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারচ্যুত হবার পর বিশেষতঃ মুসলিম জাতি স্বাধিকার বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা অর্জনের ক্ষেত্রে সবেমাত্র প্রবেশাধিকার লাভ শুরু করে। তখনকার আত্মসচেতন ব্যক্তিবর্গের যারা অনুরূপ জ্বালাময়ী প্রেরণামূলক কর্মকাণ্ডে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তাঁর নাম অনবদ্যভাবে এসে পড়ে। স্মর্তব্য, বিশ্বজনীন সাম্রাজ্যবাদ তথা উপনিবেশবাদ-এর মহাপতন সূত্রে উজ্জীবিত এ ব্যক্তিত্ব কলকাতা কেন্দ্রিক উথাল-পাতালমুখী বজ্র নিনাদিত

নাট্যমঞ্চ ছেড়ে চুনতি গ্রামে এসেও তিনি স্বাধিকার স্বাধীনতার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর জ্বালাময়ী 'ভরানা' বা দেশাত্মবোধক গীতিকাব্যগাঁথা রচনা এবং (কামাল পাশা) 'জয় হিন্দ', 'আযাদ কাশ্মীর' প্রভৃতি নাটকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করত চুনতি মাদরাসায় সেগুলোর সফল মঞ্চায়নের মাধ্যমে বিস্ময়কর সার্থকতার স্বীকৃতি লাভ করেন তখনকার গণনন্দিত বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে। যদিও চুনতি মাদরাসার গণসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অবশ্যই কুলীন এবং সুপ্রাচীন উক্ত ধারাবাহিকতায় মাদরাসায় মঞ্চায়িত নাটকগুলো কক্সবাজার, কুতুবদিয়া, পেকুয়া, রাউজান, পটিয়া ইত্যাদি এলাকায় গুণীজনের আমন্ত্রণক্রমে একাধিকবার মঞ্চায়িত হতে দেখা যায়; যাতে করে প্রচণ্ড কর্মোদ্যম ও প্রাণচঞ্চল তৎপরতার মধ্যে মাওলানা স্বয়ং প্রাণপুরুষ হবার সাথে সাথে এক ঝাঁক কুশলী, অভিনেতা, যন্ত্রবিদ, গায়ক এবং প্রযোজকবৃন্দ ঈর্ষান্বিত। সার্থকতা সহকারে মাদরাসা ছাত্রদের মধ্যে আবির্ভাব হয়ে চুনতির মহিমা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিতে তিনি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় প্রতিভাধর ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মরহুম মাওলানা একরাম, মুত্তাসিম বিল্লা, নেযামুদ্দীন বুড্ডু খান, রফি খান, মওলভী মুহাম্মদ হুসাইন, মাওলানা ইব্রাহিম, মাওলানা আবদুল্লাহ, মাওলানা মুনাওয়ার, মাওলানা আবু সফা, মাওলানা মুসলিম খান, মাওলানা আবদুল মালেক, মাওলানা আবদুল গফফার, মাওলানা কুতুবুদ্দীন, মাওলানা আব্দুল মজিদ, মাওলানা আবদুল হাফেয প্রমুখ। এ সময়কার কাঠের উড়োজাহাজে চর্বি-মিশ্রিত রশি দিয়ে দ্রুতগতিতে উঠা নামায় বোমা নিক্ষেপের ক্রিয়াকর্ম করাচির জংগ পত্রিকার আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়।

বর্তমান নিবন্ধকার তাঁর জীবনকালে দু'জন মনীষীর প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ এবং তীব্র একাত্মতা অনুভব করে; অথচ তাঁদের সান্নিধ্য-সংগম লাভ করতঃ মতান্তর প্রক্রিয়ার মারফত তাদের জ্ঞান-গর্ব প্রভাব পরিক্রমায় আপ্লুত হয়ে ধন্য হতে পারেনি বলে অদ্যাবধি আপন সত্তার উপলব্ধি অন্বেষার ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় 'ক্ষতি' বলে বিবেচনা করে, যদিও দু'জনকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিলো- একজন 'বড়ো মুফতি' মাওলানা ফয়জুল্লাহ এবং অন্যজন নাযেমে আ'লা মাওলানা ফজলুল্লাহ। বলাবাহুল্য, উভয়ের নাম উচ্চারণগত এবং ভাবার্থক্রমে প্রায় অভিন্ন এবং অনবদ্য। উভয় ব্যক্তির বাহ্যিক দৃশ্য প্রকৃতি প্রায় এক রকম হলেও মেধাগত অভিব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। নাযেম সাহেবের জীবনী বর্ণাঢ্য ও বহুমাত্রিক এবং মুফতি সাহেবের হলো অবিমিশ্র একাগ্র সাধনায় পরিপূর্ণ এবং উভয়ই নির্বিকার নিবেদিতপ্রাণ মহাত্মাস্বরূপ জ্ঞানপিপাসু এবং কৌতূহলী। অন্বেষার পাত্র হবার যোগ্য। বড় মুফতি সাহেবের চারিত্রিক নির্মল্য ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ 'আদর্শ'স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়, আর নাযেম সাহেবের উদ্ভাবনী প্রতিভা নিকটজনকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমন স্পর্শ করে। তাঁর জন্য ভক্তরা পাগলপারা; আর মুফতি সাহেবের সাধনা-সৌকর্যের ঋজুতা-স্বচ্ছতা তাঁর অনুরক্তদের মধ্যে ভক্তিজনিত ব্যবধান রচনা করে বসে বলে তিনি আধ্যাত্মিক গুরুর আসনে উপবিষ্ট; আর নাযেমে আলা সাহেবের রোমাঞ্চ সুধাময় আকর্ষণ সর্বৈবভাবে আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়ই হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রথমজন অনুসারীকে সংকেত দেয় দূর থেকে; আর দ্বিতীয়জন টানে আর টানে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকে। মোটকথা, উভয়ই অনেকাংশে অনুপম অতুলনীয়; অথচ নাযেমে আলা সাহেবের সাথে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই একাত্ম হতে চায় এবং ভাবাবেগের ক্ষেত্রে অভিন্নতা অনুভব করতে সক্ষম; যা অন্যজনের সাথে কল্পনাতীত বলে নাযেম সাহেব

অত্যন্ত আপনজন আর মুফতি সাহেব অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন গুরুজন। উভয়ের মহিমা ও অবদান ভক্ত-অনুরক্তদের কাছে চিরস্থায়ী আবেদন ও অনুপ্রেরণার উদ্রেক করে এবং এতেই ঐতিহ্য অনুপ্রেরণার উৎস নিহিত বলে স্বীকার্য। ঠিক এভাবে তাঁর জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক মনীষীর সাথে বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনার তুলনামূলক পাঠাভ্যাস করা যায়- নিদেনপক্ষে ছায়াপথের মতো তাঁর বৈদগ্ধপূর্ণ সত্তা যাঁদেরকে আকৃষ্ট করেছিলেন কিংবা যাঁরা তার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন বা প্রভাবপুষ্ট ছিলেন, অনুরূপ কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞজনের প্রসঙ্গ অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মরহুম মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহিম সাহেব। তাঁর বাড়ি আনোয়ারা; তিনি জিরি ও দেওবন্দ মাদরাসার ফারেগ ছিলেন। হাটহাজারীর সূত্রে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিলো। ১৯৪৫ সনে চুনতি মাদরাসায় তাঁকেও নিয়ে আসা হয় 'হেড মাওলানা'স্বরূপ। বলাবাহুল্য, তখনকার দিনে, ১৯১৫ সনের 'নিউ স্কিম' মডেল অনুযায়ী সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাদরাসায় মুহতামিম/সুপারিন্টেন্ডেন্ট, প্রশাসনমুখী ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন; আর হেড মাওলানা পঠন-পাঠন/অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ বিধায়ন কর্মে দায়িত্বশীল হতেন। চুনতি মাদরাসায় এভাবে জাঁদরেল ওলামাবৃন্দ উক্ত পদ অলংকৃত করেন বারবার। তন্মধ্যে মুফতি মাওলানা ইব্রাহিম সেরাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর সতীর্থ, সহকর্মী ও ছাত্রকুলের মধ্যে তাঁর প্রভাব একনিষ্ঠ এবং অপরিসীম। স্বভাবতঃ কষ্টসহিষ্ণু ও তেজোদীপ্ত হওয়ায় তাঁকে অনেকটা স্বাধীনচেতা ও স্বেচ্ছাচারী মনে হতো। নাযেম সাহেব তাঁর পাণ্ডিত্য ও ধীশক্তি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতঃ কৌশলে তাঁকে নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুবর্তী রাখতেন। 'সুল্লাম' ও 'মুসল্লাম' নামের শক্ত কিতাবদ্বয় পড়াতে নাযেম সাহেব সক্ষম কিনা-কথা উঠলে তিনি কিতাব দু'টি নিজের নামে রুটিনভুক্ত করে নেন। মুফতি মাওলানা ইব্রাহিম ফিকাহ, উসুল ও 'ফুনুনাত' এর জন্য অনবদ্য ওস্তাদরূপে স্বীকৃত ছিলেন। ওলামারা বলাবলি করতেন, তিনি পারতপক্ষে কোনো মাওলানার সাথে বুঝতে চাইতেন না এবং প্রকৃতপক্ষে কাউকেও তিনি উপযুক্ত প্রতিপক্ষ বলে মেনে নিতেও পারতেন না। তাঁর সাথে মাওলানা মীর হাফেয গোলাম মোস্তফা ছিলেন অসাধারণ মেধাপুষ্ট অত্যন্ত জনপ্রিয় ছাত্রদের বন্ধুবৎসল একজন ওস্তাদ, মাওলানা গোলাম কাদের (রসুলাবাদ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা), মাওলানা আবুল হাশেম (শেরে খোদা); মাওলানা আবদুল হাফিয (ছোবহানিয়ার মুহাদ্দিস) ও মাওলানা আবদুল বারী (মহেশখালী); তন্মধ্যে মাওলানা আবদুন নূর, মাওলানা আবদুর রশিদ (মুহাদ্দিসে সুওম), মাওলানা রশিদ আহমদ, মাওলানা মুহম্মদ আমিন এবং মাওলানা হাবিবুল্লাহ প্রমুখ। বিজ্ঞ ওলামারা নাযেম সাহেবেরই ছাত্র এবং একনিষ্ঠ ভক্তকূলের অন্যতম ছিলেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্নজনের মারফত বিশেষভাবে এ তথ্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হই যে, কোন 'জাদু স্পর্শে' তিনি অনুরূপ জাঁদলের ওলামাদের ওপর আপন কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখতেন তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসাপেক্ষ ব্যাপার বটে। তাঁর অনুসৃত পদক্ষেপসমূহ আইনানুগ এবং অবশ্যই বিধি-বিধান সম্মত হতো। তিনি সংশ্লিষ্ট ওলামা এবং শিক্ষকবৃন্দের সবিশেষ গুণাবলী এবং মেধাদীপ্ত ব্যুৎপত্তিসমূহ অকপটে স্বীকার করতেন ও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতেন। এ সুবাদে তিনি সর্বজননন্দিত হবার বিষয়টি পাকাপোক্ত রাখতেন। কারণ, একথা সর্বজন স্বীকৃত ছিলো যে, নাযেম সাহেব অন্যান্য ওলামাদের মেধাগত ব্যুৎপত্তিসমূহ স্বয়ং চর্চা করতে সক্ষম ছিলেন;

অথচ নাযেম সাহেবের কাব্যচর্চা ও বিচক্ষণতাপূর্ণ 'বিধি-বিধান প্রণয়ন' এ কাজ অন্যদের দ্বারা সম্ভবপর হতো না– এহেন কর্মনিষ্ঠাই তাঁকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে রেখেছিলো। অনুরূপ বৈশিষ্ট্য তাঁকে প্রভাবশালী এবং প্রভুত্বমণ্ডিত রেখেছিলো যা অন্যান্যদের মধ্যে উৎসাহ অনুপ্রেরণার উদ্রেক করতো।

তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখিত তথ্যে জানা যায়- মুফতি মাওলানা ইব্রাহিম চুনতি মাদরাসায় মাওলানার অনুপস্থিতিতে সাংঘাতিক তোলপাড় শুরু করাতে মরহুম ইলিয়াস মিয়া পদুয়া মাদরাসায় স্বয়ং গিয়ে মুফতি মাওলানা ইব্রাহিমের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে আপত্তি জানান নাযেম সাহেবকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাযেম সাহেব ১৯৫১ সনে ৬ জন উস্তাদসহ মাদরাসা ত্যাগ করার এক দশক পর তাঁর পুনর্বার যোগদানের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি; দ্বিগুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট হন। আরও উল্লেখ্য, চুনতি মাদরাসার দু'জন বরেণ্য হেড মুফতি মাওলানা ইব্রাহিম এবং মাওলানা মোজাফফর আহমদ সম্পর্কে নাকি তাঁর সরস মন্তব্য প্রবাদবাক্যের মতো মুখে মুখে চালু ছিলো। ১৯৬৪/৬৫ সনের দিকে ২য় হেড মাওলানাকে লক্ষ্য করে নাকি তিনি বলেছিলেন যে- চুনতির ভাগ্য ঈর্ষণীয়, কারণ এর হেড মাওলানাদ্বয়- هر فن مولی از ہمہ اولی অর্থাৎ- এ দু'জন প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

একটি প্রাচীন এবং কুলীন প্রতিষ্ঠানস্বরূপ চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র সর্বজনবিদিত। চুনতিবাসীর সার্বজনীন সেবা-যত্ন ও অবিভক্ত উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানটির ওপর স্থানীয় প্রভাব প্রতিপত্তিকে সর্বাত্মকভাবে কার্যকর রাখে। এ বিষয়টি মামুজান মাওলানা ফসিহ উল্লাহ সাহেব এবং মাওলানা মরহুম আমিন (তদীয় বেয়াই সাহেব) সূত্রে প্রাপ্ত। বাহিরিক পৃষ্ঠপোষকতা যদিও সবসময় অনবদ্য মনে করা হতো। মরহুম হেড মাওলানা সাহেব (২য়) নাকি একবার কমিটিতে লম্বা বিতর্ক দৃষ্টে বলেছিলেন, এ সভার সদস্যবৃন্দ সর্বাধিক সুশিক্ষিত এবং বহুমুখী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। অনুরূপ সদস্যদের মধ্যে নাযেম সাহেব কীভাবে আপন 'নীতিমালা' পাশ করিয়ে নিতেন? সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ বিশেষত মরহুম আবদুল্লাহ মিয়া (সাবেক প্রেসিডেন্ট চুনতি ইউনিয়ন পরিষদ) ও মওলভী মুযহির (চুনতি) সাহেবের মারফৎ জানা যায়, তিনি বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সহকারে বিশদ আলোচনার জন্য সদস্যদের কাছে ছেড়ে দিতেন। বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্রে কখনও হস্তক্ষেপ করতেন না। তবে বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো তিনি নোট করতেন। সবাই শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গেলে চূড়ান্তকালে তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যমুখী বিষয়সমূহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যত্নবান হতেন। আবদুল্লাহ মিয়ার বরাতে জানা যায়, তখন মনে হতো যেনো নাযেম সাহেবের মতামত গ্রহণ ছাড়া উপায়ান্তর নেই। হেড মাওলানা সাহেব (২য়) নাকি একবার বলেছিলেন- 'ওলামারা প্রকৃতপক্ষে ওহির অংশীদার বরং সিংহভাগের অধিকারী (له حظ وافر) বলে তাঁরা অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে থাকেন; যতক্ষণ না তাঁরা ন্যায়নীতি বিরুদ্ধ না হোন, তাঁদের পক্ষে অদৃশ্য হস্ত (دست غیب) কার্যকরী থাকে। কথাটি শুনে নাযেম আলা সাহেব নাকি বলেছিলেন, হেড মাওলানা সাহেব দরকার মতো চমৎকার কথা উপহার দেন। এরকম অনেক উক্তি জুরি সদস্যস্বরূপ তিনি

বলতেন বলে উকিল হাফেয মিয়া ও উকিল বদরুল হক খাঁ তাঁর গুণ-কীর্তনে পঞ্চমুখ ছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, নাযেম সাহেব এবং হেড মাওলানা সাহেব উভয়ই জনসেবা এবং গণকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে নিবেদিত ছিলেন। মরহুম মাওলানা কামালউদ্দিন মূসা খতিবী (চুনতির ৩য় হেড মাওলানা) একবার গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, নাযেম সাহেব নাকি হেড মাওলানা সাহেবের উপস্থিত বুদ্ধির কাএ'ল (প্রবক্তা) ছিলেন এবং মাকূলাত্ ভিত্তিক তাঁর চিত্তবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করতেন- উভয়ের মধ্যে কোনোক্রমে সহৃদয়তার অভাব ঘটেনি। একথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ অনেক সময় বহুমুখী গুণধর ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংঘাত-সংকট অনিবার্য হয়ে ওঠে, যা এক্ষেত্রে হয়নি; এবং এতে নাযেম সাহেবের বিচক্ষণতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শাহ মাওলানা হাবিব আহমদের প্রতিবেদনে নাযেম সাহেবের প্রথমবার চুনতি মাদরাসায় যোগদান সম্পর্কে দুটি তথ্য-নির্দেশ আঁচ করা যায়।

১. পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় কোম্পানি আমল থেকে পরবর্তী শতকব্যাপী চুনতির অধিবাসী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ সরকারি বেসরকারি কর্মকাণ্ডে কর্মরত থাকায় এ গ্রামের প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন এবং বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন; মাওলানা হাবীব সাহেবের সাথে স্বীয় ওস্তাদ-তনয়স্বরূপ, ভক্তিজনিত অনুরাগের সম্পর্ক ছিলো। মাওলানা জিয়াউল হক, মাওলানা হারুন সূত্রে মরহুম মওলভী তাহের আহমদ খাঁ সাহেবানদের উদ্যোগে তিনি চুনতি মাদরাসায় যোগদানে মানসিক সাড়া অনুভব করেন বলে জানা যায়। যাতে তাঁর সহপাঠী মাওলানা দানেশ সাহেবের প্রত্যক্ষ সংযোগ সক্রিয় ছিলো এবং তাই ছিলো প্রত্যক্ষ কারণ।

২. শাহ মাওলানা হাবীব সাহেবকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট এর পদে এবং তিনি 'নাযেম' বা ব্যবস্থাপকস্বরূপ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন বলে তাঁর স্থিরচিত্ত মতামত ব্যক্ত করেন। ১৯৩৮-৪৩ পর্যন্ত সময়কালে দু'একজন সুপারিন্টেন্ডেন্টদের মধ্যে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত সমগ্র বাংলার মেধাদীপ্ত বরেণ্য সন্তান কলকাতা আলিয়ার প্রখ্যাত ছাত্র চুনতিবাসী মাওলানা নুরুল হুসাইন সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হবার বিষয়টিকে পরীক্ষামূলকভাবে এড়িয়ে যাবার লক্ষ্যে 'সুপার' এর পদ মাওলানা হাবীব সাহেবকে অর্পণ করে তিনি নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান গ্রহণ করেন বলে মনে হয়। এহেন সতর্ক পদক্ষেপসমূহ তাঁর সুবিজ্ঞ অন্তরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তখনকার সময়ে চুনতি মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দের সমপর্যায়ভুক্ত মূল্যমান ভূষিত ছিলেন বলা যায়। যাঁদের মধ্যে নাযেমে আলা সাহেব নিজ গুণে অনন্য ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্রস্বরূপ সশ্রদ্ধ অধিষ্ঠানপ্রাপ্ত ছিলেন। এ কথাটি বহুমুখী তাৎপর্যবহ অনুচ্ছেদস্বরূপ স্মরণীয়।

মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব চুনতি গ্রাম এবং চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার আধ্যাত্মিক মহিমার প্রতি আত্মনিবিষ্ট হবার বিষয়টি আমার বিবেচনায়, পারস্পরিক হবার ক্ষেত্রে বিদ্যায়তনিক এবং সাংস্কৃতিক চর্চা ও হৃদয়বৃত্তিক অনুশীলন কর্মসমূহের মধ্যে যুগপৎভাবে কেন্দ্রীভূত ছিলো। অর্থাৎ চুনতির আধ্যাত্মিকতার সূত্রে মাওলানা আবদুল হাকিম (সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরেলভীর (রহ.) খলিফা এবং বালাকোটের গাযী) তদীয় পুত্র-প্রপৌত্রগণ, হযরত হামেদ হাসান আযমগড়ী সাহেবের খলিফাবৃন্দ-ফাজেল আফজল, তফজ্জল ও

মোফজ্জল সাহেবান, শাহসুফি মাওলানা নযীর আহমদ তদীয় ওস্তাদ মাওলানা ফইয়াজ, প্রফেসর হাসান, যিনি কলকাতা আলিয়ার আরবি ফার্সির স্বনামধন্য শিক্ষকস্বরূপ ইংরেজ DPI-কে শিক্ষা দেবার প্রতিদানে লেকচারার পদে চট্টগ্রাম কলেজে যোগদান করেন, শুকুর আলী মুন্সেফ, মনু মিয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ দেশ-বিদেশে খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তাছাড়া, এঁদের রচিত আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষার গদ্য-কবিতা রূপক বিচিত্র সাহিত্য কর্মসমূহ উপমহাদেশব্যাপী খ্যাতি অর্জনে সক্ষম ছিলো।

উল্লেখ্য, চুনতির অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে উর্দু, ফার্সি ভাষায় মঞ্চাভিনয় এমনকি নাট্যকার ও স্ক্রিপ্ট লেখক ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে একাধিক ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেন। মাওলানা একরামুল হক প্রমুখ সিদ্ধচিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ সব সময় বিনোদনমূলক ও সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকতেন। তাঁর অপর ভাই মাস্টার এনামুল হকও বিভিন্ন নাটকের মঞ্চায়ন উপযোগী সংলাপ প্রণয়নে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বলাবাহুল্য, এতোসব কর্মকাণ্ডের মর্মগুরুর ভূমিকায় মাওলানার নাম অগ্রগণ্য যদিও তখন চুনতিতে অভিনয় শিল্প পরিস্ফুটনের জন্য সময়োচিত এক অভিনব 'কর্মী-বত্ত'-কলা কুশলী সমৃদ্ধ একটা দল ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছিলো যে রকম কিছু অভিনয় প্রতিষ্ঠান ষোড়শ শতাব্দীর বৃটেনে মার্লো-শেক্সপিয়র এর রচনা মঞ্চায়ন পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ করেছিলো।

মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেব বহুমুখী দুর্লভ গুণাবলীর পাত্র ছিলেন বহুবিচিত্র অনুরূপ গুণাগুণের সমাবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বকে অবিশ্বাস্যভাবে জনগণ নন্দিত করে তুলেছিলো। অথচ ইত্যকার অভিনব আচার-আচরণ, একজন মাদরাসার ওস্তাদ কিংবা নাযেম-ই-আ'লার পক্ষে শোভন কিংবা যথাযথ কিনা নানা প্রশ্নের উদ্রেক করতঃ তাঁর নান্দনিক কার্যক্রম এবং শৈল্পিক কর্মকাণ্ডসমূহ তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং ক্লেদাত্মক সমালোচনার ঝড় উঠতে পারতো যা কখনও ঘটেনি। অশীতিপর এ বিজ্ঞ-বৃদ্ধ জীবনের বিশাল পরিসরে বর্ণাঢ্য ও বিচিত্র নান্দনিক ক্রিয়া-কর্ম এবং হৃদয়বৃত্তিক অনুশীলন চর্চা করা সত্ত্বেও নৈতিকতা ও নীতিগর্হিত কিছুই তাঁকে কোনোক্রমে আড়ষ্ট করতে পারেনি। বরং বলা যায়, তাঁর হৃদয়তাড়িত জৌলুস ধর্মপ্রাণ চরিত্র-নির্গলের অনুশাসন সংঘাতে বিপর্যস্ত ছিলো বলে তাঁর কাব্যললনা স্বতঃস্ফূর্ত বিহার বিচরণে বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য ছিলো। অতএব তাঁর কাব্য-সুষমার সাবলীলতা অনেক সময় ভয়ংকরভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে- একথা স্বীকার করে এ মনীষীর কাব্যপ্রতিভার ভাব-ব্যঞ্জনা মূল্যায়ন করলে তাঁর সীমাবদ্ধতাসমূহ বোধগম্য হয়ে ওঠবে। শুধুমাত্র এভাবেই নিরপেক্ষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ মূল্যায়ন কর্ম অর্থবহ হবার বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত। একজন আরব কবি কথাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন- كفى للمرأ حبا أن تعد عيوبه অর্থাৎ- একজন ব্যক্তি পরম সম্মানিত হবার জন্য তাঁর দোষক্রটি সংখ্যায়িত কিছু হওয়াটাই যথেষ্ট। মাহের আল কাদেরী নামক শ্লেষাত্মক কবি এবং ওস্তাদ কবি আকবর এলাহাবাদী-এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় ড. তাসীর আকবর, এঁদের কাব্যে সমমানে উত্তীর্ণ নয়, এমন কবিতাগুলোকে সৌন্দর্য-সুষমার ক্ষেত্রে প্রাসাদ হেরেমে রাজরাণী ও রাজকুমার রাজকুমারী-সুন্দরী নর্তকীদের মধ্যে দাস-দাসী ও পরিচারক-পরিচারিকার বিচরণ কোনক্রমে সুশ্রী সুন্দর পরিবেশকে ব্যাহত না করে মান-মর্যাদা বিকাশে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে বলে দাবী করেছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর রচিত উপলক্ষমূলক কাব্য যা অসংখ্য লোকের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তিনি সর্বাধিক সময় রচনা করেছেন- بتقریب جشن شادی শিরোনামের অধীনে-

(ক) غنچہ ہے، نازنین ہے دُر غیر سفتہ ہچون نسیم بن جا - کر لے اسے شگفتہ

(খ) رفتے ملیں الفتوں کے الجھائے قید کر لے دولہا میاں کے دل کو عشوہ کے صید کر لے

উক্ত দুটো কবিতার বাণী এবং অর্থগত সৌন্দর্য-সুষমা একটি নববধু আশ্রিত রোমাঞ্চকর যাবতীয় কাল্পনিক কারুকর্ম মণ্ডিত শিহরণ জ্ঞাপক (ক) "ওহে বর! (এ নববধু) অর্থাৎ, হাস্যোন্মুখ এ কলি হলো একটি অস্ফুট মুক্তা; তাই (হে বর) তুমি সুকোমল মৃদুমন্দ বায়ুর মতো হয়ে যাও; এবং তাকে ধীরস্থিরভাবে যত্ন সহকারে প্রস্ফুটিত করো" রোমান্টিক কবি Jhon Donne এর উক্তি Lo! 0, shivering hands be up for careful handling, she is not yet used to it, as you see. অর্থাৎ- সযত্ন কর-স্পর্শের জন্য আবেগে কম্পমান, সে আদৌ এজন্য তৈরি নয়, যা তুমি লক্ষ্য করছো।

(খ) "হে বধু, প্রীতির সম্পর্ক সূত্রে ওলট-পালট করে (বিপর্যস্ত করে) তাকে বন্দীদশায় বশীভূত করো। দুলহা মিয়ার হৃদয়কে 'ফুর্তি-বিনোদন' এর নিশানা করে ফেলো।"

এ চরণগুলো অপরূপ ভাব-ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ এবং কাব্যময় অথচ পাশাপাশি বিবেচনা করতে হয়-

(ক) دولہن سے ہو محبت اور ہوں وفا مودت دونوں میں ہوں صداقت ایمان و دیں مروت

(খ) مردانگی مروّت ہوں جاں نوازیاں ہوں عشرت معاشرت میں جنت نشانیاں ہوں

উভয় শে'র আমাদের কাছে মুরুব্বিদের শুভেচ্ছা সদ্ভাব প্রসূত 'দুআইয়াহ'স্বরূপ পরিচিত। এ ক্ষেত্রে 'ক' এর ভাষ্য নিছক মুনাজাত হলেও 'খ' এর ভাষ্য কাব্যিক শিহরণমূলক রোমাঞ্চকর ও স্পন্দন-আপ্লুত অবস্থাকে 'স্বর্গীয় আনন্দানুভূতিপূর্ণ অপূর্ব অভিজ্ঞতামণ্ডিত করে তুলেছে। শেষোক্ত দু'টো শে'র প্রথমোক্ত দুটোর সাথে 'বেমানান' হলেও (ক) এর পঙ্‌ক্তি দুটো এ কবিতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না- এককভাবে এ পঙ্‌ক্তিটি অন্যান্য কাব্যের গুণ-মানের সাথে শুধু যে সামঞ্জস্যশীল নয়, তা নয়; তা পুরো কাব্যগুণকে ক্ষুণ্ন করেছে বলে মন্তব্য করা হতে পারে বৈকি। প্রকৃতপক্ষে কাব্যরসিকরা এগুলোকে 'ফেলনা' বলে পরিত্যাগ করেনি; তবে ওগুলোকে অবশ্যই মান-মর্যাদামত সনাক্ত করতঃ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতঃ হীরা-জহরত এর পাশাপাশি এগুলোর মূল্যমান নির্ধারণ করা হলে কবিতার প্রতি সুবিচার হবে; আর একটি কথা- কবি-মন সাংঘাতিকভাবে স্পর্শকাতর, তার কাব্যগুণ মর্মস্পর্শী হতে বাধ্য। মাওলানার قطعات বা 'অসংলগ্ন ভাবনা'মূলক কিছু পঙ্‌ক্তি তাঁর মরমী ভাব-বলয়ের বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ ঘটিয়েছে (অন্যরা যা ভাবে) যথা- ازغیر।

چشم مستے عجبے # مے پرستے عجبے

تیر نگاہے عجبے # فتنہ طرازے عجبے

(অন্যরা যা ভাবে) ভাবমত্ত দৃষ্টি অদ্ভুত হয়! মদ-ভক্তরা আরও অদ্ভুত!
তীরতীক্ষ্ম দৃষ্টি অদ্ভুত! অঘটন ঘটন পটিয়সী হয়ে যায় সর্বাধিক অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর!
از خود; (স্বগতোক্তি):

تیغ ابرو ہم او گلگوں غدارے عجیے صید انداز او مفقود قرارے عجیے

কবি মনের বিস্ময়াভিভূতির আর একটা নিদর্শন এ পঙ্ক্তিদ্বয়ের মধ্যে গুঞ্জরিত।

یہ شان دلربائی کس نے تجھے سکھائی بیجان! کس نے تجھکو مانوس جاں بنایا

অর্থাৎ, মনমোহনী এ ভাব তোমাকে কে শেখালো (হে ফুল!) তুমি প্রাণস্পন্দনবিহীন এক সত্তা! প্রাণ-মনে চেতনায় এ অভিষিক্তকারী করে কে তোমাকে গড়লো?

تو ایک گل ہے پر شاعر کا ہے دل گلستاں نغمہ سرا بکر تجھکو بے خزاں بنایا

তুমি তো একটাই মাত্র ফুল; কিন্তু কবি-মন হলো আস্ত একটি বাগান; এ কবিই স্বয়ং বিভিন্ন গুণ-গুণানী। গান ভাঁজতে ভাঁজতে তোমার বাগানকে দুর্যোগমুক্ত রেখেছে।
পুরো ৭টি ষষ্ঠপদী (মসদ্দস) কবিতা অনুপম ছন্দগাঁথায় এক উজ্জীবনী সুধা বলা যায়।

خود شناسی کا انہیں راز بتایا تم نے سعی پیہم کا بھی دمساز بنایا تم نے
مرغ بے پر تھے تو شہباز بنایا تم نے راز سر بستہ پرواز بتایا تم نے
بے جلا دل ہے تو اس دل کے مجلی تم ہو اور مربی ہو تم اونکے متولی تم ہو

অর্থাৎ- তোমার জন্য পাগলপারাদেরকে তুমি অচেতনতামূলক 'আত্ম-জ্ঞান' এর রহস্য শিখিয়েছো; অব্যাহত সাধ্য-সাধনার লক্ষে তাদেরকে নিবেদিতপ্রাণ তুমিই করেছো; পাখাবিহীন পাখীকে ঈগলরূপী শিকারী পক্ষি তুমিই করেছো;

জট-বদ্ধ রহস্যাবৃততাকে তুমিই উড্ডয়নে পারদর্শী করেছো;
আলো-দ্যুতিহীন অন্তরাত্মাকে তুমিই একমাত্র আলোকোজ্জ্বল করো;
তুমিই তাদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক এবং তত্ত্বাবধায়ক।

ষষ্ঠ পদী এ কাব্যাংশ মরহুম হালীর পরিব্যাপ্ত হতাশা অতিক্রান্ত উদ্দীপিত কর্মোদ্যমী একদল উচ্ছ্বসিত সমাজকর্মী যাদের উজ্জীবিত মানস, কর্মবলে বলীয়ান; এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অতীত জরাগ্রস্ততা বর্জন করতঃ নতুন প্রত্যয়ে যারা আত্মবিশ্বাসী কবি তাদের ওপর আস্থাশীল এবং অনুরূপ প্রেরণা ও জীবনীশক্তিতে তিনি গ্যেটে-ইকবাল-নজরুলকে সরাসরি প্রতিধ্বনি করতে সক্ষম বলে এঁদের প্রভাব-আবেদন অনাবিল এবং চিরন্তন। মাওলানার 'প্রাণ-প্রাচুর্যগত আত্মোপলব্ধি তথা কর্মোদ্যমী মননশীলতা, তাঁর সামগ্রিক কাব্য-সুষমার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে, স্বীকৃতিযোগ্য একটি বিষয়। এটি বোধগম্য না হলে কবির নিজ ভাষ্যে আরবি 'ফযলুন' এর অর্থ হয় 'অতিরিক্ত' নয়ত কিছু প্রশংসনীয় 'গুণাগুণ' কর্মের স্তুতিবাদ হবে মাত্র। কবি দাবী করেন, তাঁর অন্তরের 'দাহন-জ্বালা' উপলব্ধি করতে হবে- ইকবালের ভাষ্যে তা কবি খসরুর

سوز বা 'দাহন' প্রবৃত্তি বলে নির্ণীত। এ তত্ত্ব তাঁর রোমাঞ্চপূর্ণ এক মকতা বা 'শেষাংশে' চমৎকারভাবে বিধৃত।

یاالٰہی فضل کے نالے میں اب وہ سوز ہوں　　قوم پر انکے اثر ہوں ان میں ہوں بیداریاں

نہ تڑپے فضل تم گر کے سکوں سے ہوتے خوگر　　نہ یہ راز فاش ہوتا نہ کے شرمسار ہوتا

অর্থাৎ- হে 'ফযল'! তুমি কখনও এমন অস্থিরচিত্ত হতে না, যদি তুমি নির্ঝঞ্জাট নিরিবিলি প্রশান্তি তে অভ্যস্ত হতে! তাহলে তো এ মূল রহস্য প্রকাশ পেতো না এবং তুমিও এতো ঘাত-প্রতিঘাতে কুণ্ঠিত হতে না। তাই তিনি প্রার্থনা করেন, হে আল্লাহ! (বৃদ্ধাবস্থায় উচ্ছ্বাস না থাকলেও কান্না তো আছে) ফযলের ক্রন্দন' এর মধ্যে অমন 'দাহন' (سوز) যেনো থাকে, যাতে জাতির ওপর তার প্রভাব পড়ে এবং এতে করে সার্বিকভাবে তাদের মধ্যে জেগে উঠার মতো সাড়া পড়ে যায়। বলাবাহুল্য, অনুরূপ 'অন্তর্দহন' সবাই মনমত প্রকাশ করেছে; কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার দরুন তিনি ইচ্ছেমত তা প্রকাশ করতে পারেননি বলে 'দহন'-এর ইঙ্গিত করেছেন মাত্র। এ প্রার্থনা ইকবালের প্রার্থনার সাথে অভিন্ন-তাঁর ভাষায়-

عطا کن شور رومی سوز خسرو　　عطا کن صدق واخلاص سنائی

"হে আল্লাহ আমাকে রুমীর সাড়া-শব্দ এবং খসরোর 'দহন' দাও। মোটকথা তার তারানাহ এবং রূমানিয়ত সমানে প্রবহমান।

আমাদের 'মমদুহ' (ممدوح) মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব, উপমহাদেশের আন্দোলনমুখর এবং মুসলমানদের স্বাধিকার তৎপরতার যুগসন্ধিক্ষণে উত্তর ভারত ও কলকাতায় কালাতিপাত করেন। মধ্যযুগীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির পট পরিবর্তনে আলীগড়মুখী শিক্ষাক্রম এবং দরসে নিযামীয়াহ এর প্রাচীনপন্থী শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে আল্লামা শিবলী নুমানীর নেতৃত্বে নদওয়ামুখী আধুনিকতাগত 'সমন্বয়কামী' আধ্যাত্মিক তৎপরতাসমূহের সাথেও তিনি আত্মিকভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। দেওবন্দ-সাহারানপুরের ছাত্র হলেও সমন্বয়কামী কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক হোক কিংবা সাংস্কৃতিক তিনি মনেপ্রাণে সংস্কারপন্থী ছিলেন। তাঁর কাব্যে অবশ্য আরবি-ফার্সি ঐতিহ্যের সাথে হালী ইকবালের জাতিগত 'স্বাধিকার'বোধ এবং 'আকবর'-ওয়াহশত্ এর সাংস্কৃতিক উত্তরণ তৎপরতাও ক্রিয়াশীল দেখা যায়; যাঁর সাথে তাঁর আত্মিক ধ্যানধারণা কিছু স্বাতন্ত্র্য সহকারে লক্ষণীয়। কারণ, তাঁর মন চাইলেও 'কাব্য রোমাঞ্চ' এর লক্ষ্যে "رند" বা ভোগবাদী মনোরঞ্জনমূলক কবিতায় হাত দিতে তিনি অসমর্থ ও অপারগ প্রতিপন্ন হন; যদিও বস্তুতঃ তিনি অসমর্থ কখনও ছিলেন না। একজন প্রধান "رند" দীন ইসলামি তাহযিব-এর সেবক হয়ে আধুনিকতায় উত্তরণে তাঁর মানসিক প্রবণতা ও অনুরাগ তাঁর সংবেদনশীল মন-মানসকে সর্বক্ষণ, আপ্লুত করে রাখে। তাই কবিতার মাধ্যমে তাঁর বহু-বিচিত্র কর্মকাণ্ড, এমনকি বিপরীতমুখী সংবেদনশীল অন্তরাত্মার প্রতিদ্বন্দ্বী নানাবিধ বহুবিচিত্র অভিধায় প্রকাশ পেয়েছে। এজরা পাউন্ডের ভাষায় তিনি ছিলেন "As susceptible mind of square qualities of head-and heart a genious to live a life worth living here and hereafter."

মাওলানার জীবনগাথা খুবই সাদাসিধে হলেও, তিনি চিন্তা-চেতনায় গুরুগম্ভীর, কথাবার্তায় পরিমিতি জ্ঞানসম্পন্ন, চাল-চলনে কেতাদুরস্ত, আচার-আচরণ ভদ্র-সুশীল, বাক্যালাপে মিষ্টভাষী এবং অতিমাত্রায় দরাজদিল্ ও বন্ধুবৎসল ছিলেন তিনি। তাঁর চটুল প্রত্যুৎপন্নমতির বিষয়গুলি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিলো। একদা তাঁকে একখানা রুমাল দেখিয়ে কেউ একজন জানতে চাইলো, এটা তাঁর কিনা? উত্তরে তিনি (শেবা-রাণী বিলকিসের ভাষ্যে) বললেন- كأنه هو অর্থাৎ 'মনে হয় যেনো তাই'। কিছু কিছু দরবারে প্রচলিত সালাম– 'সজিদাহ্' 'তাহিয়াহ' বা আদাবস্বরূপ মতাবলম্বীদের কাছে তিনি বলেন, কুরআন মজিদে তাহিইয়াহ-এর উত্তরে উত্তম 'তাহিইয়াহ' দেবার আদেশ আছে (فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها) সুতরাং মুরুব্বি 'পীর' বা রাজ-রাজাদেরকে কেউ আদাবের 'সজিদাহ' করলে 'মুরুব্বি-পীর বা রাজা' এর কর্তব্য, উত্তমভাবে বিনয়াবনত সজিদাহ্ সহকারে প্রতিউত্তর দেয়া। তাঁর মুরিদের এক সজিদাহ এর বিনিময়ে পীর ৩/৪ সজিদাহ উত্তর দেবেন। অথচ এমন আচরণবিধি কল্পনাও করা যায় না। বলাবাহুল্য, প্রতিপক্ষকে জব্দ করার এমন লাগসই কৌশল সুগভীর পাণ্ডিত্য ব্যতিরেকে কখনও সম্ভবপর হয় না। অতএব মাওলানার গদ্যরীতিও সৌষ্ঠবমণ্ডিত বলে সবাই স্বীকার করেন। স্বভাবতই তিনি সুন্দর সব কিছুতেই গভীরভাবে প্রভাবিত হতেন এবং সৌন্দর্যবোধ দ্বারা অন্যরাও প্রভাবিত হবার প্রত্যাশা তিনি অবশ্যই করতেন-

تم نے اپنے قدرداں کی قدردانی کچھ نہ کی　　حیف ہے ارزاں ہوے خود قدر اپنی کچھ نہ کی
لیک دیکھو گے زماں میں قدرداں ملتا نہیں　　رسم کا ملتا ہے دل کا رازداں ملتا نہیں
عندلیب خوشنوا کو کر دیا خاموش کیوں؟　　ہوشمند سمجھا تا تمکو پر ہوا مدہوش کیوں؟

তাঁর প্রিয় ছাত্র প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতিবীর সুন্দর হস্তাক্ষর দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন-

خنداں شواری شگوفہ، زریں نقاب تو　　تا عندلیب شاخ شود مست و نغمہ گو
فضل خدای پاک بتو سایہ افگند　　ہم ظل لطف بر من ہے مایہ افگند

সোনালি নেকাবের কলি তুমি হাস্যোমুখ হও, যেনো ডালের বুলবুলি গান গেয়ে উঠে। খোদার কৃপা তোমার 'পরে ছায়াপাত করে।

আমার মতো নিঃস্বের ওপরও যেনো মায়া মমতার ঢল উপচে পড়ে! এসব কিছু একদিকে, আর তাঁর طبعی رومانیت অর্থাৎ রোমান্টিক প্রকৃতি সবিশেষ এক কাব্যময় ব্যঞ্জনীয় সুতীব্র অর্থ-লালিত্য এবং অন্তরঙ্গ স্পর্শকাতরতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিম্নের দু'টি শে'র চমৎকার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য-

شگوفے بند منہ کو گدگدانا پھر ہنسانا ہے　　سجا کر موتیاں شبنم کو پھر جادو دکھانا ہے
نظارے گلستاں کے دیکھ کر دل مست جاناں ہے　　کچھ اپنے درد دل کی داستاں انکو بتانا ہے

প্রাচ্য সংস্কৃতিতে শব্দগত লীলাবৈচিত্র্যে স্বভাবতই কাব্য সুষমার অলংকরণ নৈপুণ্য ভীষণভাবে চমকপ্রদ এবং মনমোহনী ভাবলেশমুখর হয়ে থাকে। অর্থগত লালিত্য ছন্দোবদ্ধ করার অপরূপ এক জনপ্রিয় কৌশল-এর প্রচলন দেখা যায়। আরবি, ফার্সি, উর্দুতে আছেই, পালি সংস্কৃত, হিন্দী, পশতু ইত্যাদির মধ্যেও তা ঝংকৃত অলংকার শৈলীর প্রাদুর্ভাব ঘটায় বলে বর্ণিত। মাওলানার নিম্নোক্ত কবিতাগুলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ-

وہ حسن جفاخو، یہ عشق وفاجو، یہ کبر خفاخو، یہ عجز رضاجو

ہیں ایسی ستمگاریاں مہ جبینوں کی جو میں خموشی میں سہتا رہا ہوں

পরিশেষে, মাওলানার বিভিন্নমুখী আধ্যাত্মিকতার বিষয়টি যে সবিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ববহ অনুরূপ ক্রিয়াকর্মের চর্চা অনুশীলনক্রমে আশা করি, বিষয়টি কালক্রমে আরও প্রস্ফুটিত হবে। ভাষান্তর প্রক্রিয়ায় তাঁর অনুবাদকর্ম, ফুনুনাত বা বিষয়-বিশেষের গ্রন্থসমূহের বিশ্লেষণগত গ্রন্থাদির প্রণয়ন, সমাজ সংস্কারমুখী সমস্ত সংকটের সনাক্তকরণ এবং সমাধানের উপায় নিরূপনমূলক রচনা এবং আরও বিভিন্ন গঠনমূলক প্রক্রিয়াসমূহের উদ্ভাবন এবং বিশেষতঃ শিক্ষা সমস্যা, তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনামূলক অজস্র রচনাসম্ভার, আরবি, উর্দু, ফার্সি এবং বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম তাঁর অবদানকে চিরঞ্জীব রাখবে। মহান আল্লাহ মহত্তর প্রতিদানে তাঁকে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করুন। আমিন!

চুনতি মাদরাসা ও নাযেমে আ'লা

মাওলানা মুসলিম খাঁন (রহ.)

চুনতি গ্রামবাসীর অতীত ঐতিহ্য-এর বিকাশধারায় চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার অবস্থান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধব্যাপী এলাকার অগ্রযাত্রার সাথে যুক্ত মাদরাসা-উন্নয়নে অবিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তিসত্তাস্বরূপ সংখ্যায়িত কয়েকজনের মধ্যে মুহাম্মদ মুসলিম খাঁর নাম প্রায় অগ্রগণ্য। অস্থি-চর্মসার নিরেট জীর্ণ-শীর্ণ খর্বকায়, পরিণত বয়স্ক ও সেরা গুণমানসম্পন্ন এ ব্যক্তিসত্তা সর্বজননন্দিত এবং সর্বাধিক পরিচিত এক সাংস্কৃতিক উদ্যোক্তা বলে সর্বত্র সুপরিচিত। মাদরাসার একনিষ্ঠ সেবক মরহুম আবদুস সোবহান খান সাহেবের কনিষ্ঠ সন্তানটির পড়াশোনা সুষ্ঠু হবার জন্য মাদরাসার বরেণ্য শিক্ষকবৃন্দকে তিনি মাসোহারার বিনিময়ে নিয়োজিত করেছিলেন বলা হয়। এতে করে তাঁর সতীর্থ সবাই প্রাইভেটভাবে বিদ্যাভ্যাস করতে সক্ষম হয়। মুসলিম খাঁ কখনও নাযেমে আলা সাহেবের প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু অবুঝ মনে তাঁর সুবিশাল প্রভাব অবশ্যই পড়েছিলো এবং মাওলানার ২য় বার যোগদানকালে বহুবিধ উন্নয়ন কর্মপ্রবাহে তিনি একজন 'সমর্থক' কিংবা সক্রিয় সদস্যস্বরূপ সবসময় যুক্ত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত নিরিখে মাওলানাকে তিনি বহুবিধ গুণাবলীর আধার এবং সমসাময়িক কাল-উর্ধ্ব ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুবিজ্ঞ একজন আলিমে দীন ছিলেন বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, মাওলানার প্রগতিশীল চিন্তাধারার সফল বাস্তবায়নের জন্য চুনতিবাসীর মেধা-মননকে যথাযথ ক্ষেত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে তিনি নিজস্ব মেধার সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করেন-যাতে সমকালীন মাদরাসা ছাত্রকূল প্রভূতভাবে লাভবান হন- ওলামা সম্প্রদায় অনেকটা প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত হন; মাদরাসার ছাত্ররা বিপুলভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করে। তাইতো দেখি, এ মাদরাসার ছাত্ররা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং বরেণ্য ছাত্ররা এ মাদরাসার ঋণ স্বীকার করছে বহুবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে। অদ্যাবধি ছাত্রজীবনে পঠিত কঠিনতম কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি প্রদান, আরবি কাব্যমালার যুৎসই প্রয়োগ এবং উদ্ধৃতি দান, ফার্সি-উর্দু বিষয়ে পদ্য-গদ্যের বিশাল অংশ হুবহু পুনর্ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি একক এবং প্রতিপক্ষবিহীন অনন্য সাধারণ মেধার অধিকারী বলে সর্বজনস্বীকৃত। খেলাধুলা ইনডোর এবং আউটডোর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, সমাজসেবা, রাজনৈতিক ব্যুৎপত্তি এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে তাঁর নেতৃত্বসুলভ তৎপরতা, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় মেধাপুষ্ট দক্ষতা; শিল্পকলা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন-বিকাশে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ আয়োজনসমূহ, দৃশ্যত দুর্বল, অথচ প্রকৃতপক্ষে অমিত শক্তিধর ও জ্ঞানে-গুণে বলীয়ান এ ব্যক্তিটি ঘরে বাইরে সার্বিক কর্মকাণ্ডের মধ্যমণিস্বরূপ সর্বত্র পরিগণিত এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তাঁর জীর্ণ-শীর্ণ দেহ যে বিশাল মন এবং গভীর ধীশক্তিসম্পন্ন মেধা-মনন ধারণ করে আছে- এতে তিনি স্বয়ং আপন দৃষ্টান্ত ہے مثال آپ (He is next to none)। নেপোলিয়ন এর বহুমুখী কর্মকাণ্ড ও বর্ণাঢ্য জীবন দৃষ্টে ফস্টার এর মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণীয় এবং নিবিড়ভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। যে কোনো ব্যক্তি যা দেখায় তার শতগুণ বেশি সে কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে; তারও সহস্রগুণ অধিক সে

জীবনকে 'ভোগ' এবং উপভোগ করে ছেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটাই চিরন্তন বিস্ময় হলেও তা ঘটে যায় বলে সভ্যতা নতুন গতিপ্রাপ্ত হয়। খান সাহেবের সাধারণ জীবন কথাটার সম্যক প্রতিধ্বনি করে বলে আমার বিশ্বাস। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে শুধু চুনতি মাদরাসা নয়; বৃহত্তর সাতকানিয়া তথা চট্টগ্রাম (তখনও চট্টগ্রামেই ঐতিহ্যগত শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্রসমূহ এবং প্রখ্যাত ওলামা-মাশায়েখবৃন্দ সাতকানিয়া কেন্দ্রিক অ্যাকাডেমিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডগুলো সম্পন্ন করতেন- প্রেসের সুবাদে সবার সাথে তাঁর সর্বাত্মক যোগাযোগ সর্বজনবিদিত) এর মাদরাসা শিক্ষা কিংবা প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা সব কিছুতে নানা প্রসঙ্গে তিনি গঠনমূলক প্রক্রিয়াসমূহে বলিষ্ঠ ভূমিকায় ব্যাপৃত থাকতেন বলে তিনি সাংবাদিকতা ও শিক্ষিত মহলে নিজস্ব স্থান করে নিতে সক্ষম ছিলেন। ফলে অধ্যক্ষ-সুপারিন্টেন্ডেন্টসহ বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের বৃত্তে তাঁর নাম অনবদ্যভাবে পরিশ্রুত এবং পরিগণিত ছিলো। বলাবাহুল্য, তিনি ৩৫ বছরাধিককাল মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, মহিলা মাদরাসা ইত্যাদির বিকল্পবিহীন একজন ব্যক্তিত্ব বলে তাঁর ভাষ্য বিশেষভাবে অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ হবার কথা অনস্বীকার্য।

তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, আল্লামা ফজলুল্লাহর প্রথম চুনতি আগমন, তাঁর কাছে অবিস্মরণীয় এবং কৌতূহল উদ্দীপক এক ঘটনা। কলকাতা নিবাসী একজন অধ্যক্ষের পদার্পণ-বার্তায় সবাই কৌতূহলী হয়ে দর্শনার্থীর ভীড়ে তিনিও মরহুম ইলিয়াস মিঞার কাছারিতে গিয়ে পাজামা-শেরওয়ানি (আসকান নয়) পরিহিত হালকা-পাতলা ধরনের অপরূপ এক সুপুরুষ দেখতে পান এবং হর্ষোৎফুল্ল মনে তিনি বিষয়টির আলাপ আলোচনায় অযাচিতভাবে হলেও অংশগ্রহণ করতে থাকেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, মাওলানা হাবিবুল্লার বড়ভাই, মাওলানা সিরাজ চুনতি মাদরাসায় পাঠরত অবস্থায় তাঁর দেশীয় একজন সুবিজ্ঞ আলিম, যিনি হিন্দুস্থানে উচ্চশিক্ষা শেষ করে কলকাতার অদূরে এক মাদরাসার অধ্যক্ষস্বরূপ যশ-খ্যাতি লাভ করেছেন, নিজ বাড়িতে অবস্থানরত আছেন এবং অসুখের দরুন বিদেশ যেতে নারাজ বলে খবর দিলে, মরহুম মাওলানা দানেশ তাঁকে নিজ সতীর্থস্বরূপ চিনে ফেলেন। তিনি বিষয়টি তাহের আহমদ খাঁ সাহেবের সাথে পরামর্শক্রমে দু'জনই কাজী ইসমাঈলের শরণাপন্ন হলে কাজী সাহেব, ফার্সি ভাষায় তিন পৃষ্ঠায় প্রণীত একটি আমন্ত্রণলিপি রচনা করে মৌলভী সিরাজসহ তাহের মিয়া ও মৌলভী দানেশ সাহেবান মাওলানার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হন। মাওলানা পত্র পড়ে ততোবেশি অভিভূত হন যে, তিনি পত্র রচয়িতার দর্শন লাভের জন্য চুনতি চলে আসেন এবং কাজী সাহেবের সাথে সর্বপ্রথম আলাপচারিতায় মিলিত হয়ে তিনি ব্যক্ত করেন, "উক্ত অনবদ্য লিপি-কলা চুনতির জন্য 'আমার পণবন্দীস্বরূপ' চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।" উক্তিটি এজন্য যথার্থ যে, ওয়াসেল মোল্লার জ্যেষ্ঠ পুত্র মক্কার বাড়িতে এক সপ্তাহ অবস্থান করতঃ তাঁকে চব্বিশ পরগণায় দ্বিতীয়বার নিয়ে যান। কিন্তু নানা অসুস্থতার কারণে চূড়ান্তভাবে আকড়া ত্যাগ করে তিনি চুনতি চলে আসেন এবং প্রায় ২২ বছরকাল যাপন করে তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে দেশবরেণ্য ওলামা-মাশায়েখের কাতারবন্দী হয়ে চিরশয্যায় শায়িত আছেন। উপরিউক্ত পটভূমিকার আলোকে মুসলিম খাঁ সাহেবের প্রতিবেদনটি পাঠকবর্গের যথাযথ অনুধ্যান কর্ম ও তাত্ত্বিক মূল্যায়নের লক্ষ্যে আক্ষরিকভাবে সংযুক্ত করা গেলো।

**অনুলিখন : প্রফেসর ড. মাওলানা শব্বির আহমদ (রহ.)*

পরশমণি নাযেমে আলা আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

নাযেমে 'আলা। সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক বা শৃঙ্খলা বিধায়ক। এটি ছিলো দক্ষিণ চট্টগ্রামের চুনতি মাদরাসার সর্বোচ্চ তত্ত্বাবধায়কের অভিধা। সাধারণত মাদরাসা বা স্কুল কলেজের প্রধানের বেলায় সুপার, প্রিন্সিপাল, মুহতামিম, মুন্তাযিম, হেডমাস্টার, অধ্যক্ষ প্রভৃতি অভিধা ব্যবহার করা হয়। একমাত্র চুনতি মাদরাসাতেই প্রিন্সিপালের ওপরে নাযেমে 'আলা অভিধা সঠিক অর্থে প্রযোজ্য হতো একজন জ্ঞানসাধকের বেলায়, যার নাম মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ। মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) এখন চুনতির আউলিয়াদের কবরস্থানে শায়িত এবং আল্লাহর রহমতের ছায়ায় জান্নাতকাননের অধিবাসী। তাঁর তিরোধানের সাথে নাযেমে 'আলা অভিধাটিও অস্তিত্ব হারিয়েছে।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে আমি যখন চুনতি মাদরাসার ছাত্র, তখন নাযেমে 'আলা সাহেবের অবস্থান আকাশচুম্বি খ্যাতির শীর্ষে। তিনি মাদরাসার সকল শিক্ষকের মাঝে ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র, মান্যবর। ছাত্ররাও তাঁকে সমীহ করতো পিতার মতো। মনে পড়ে, আমরা তখন দাখিল পরীক্ষার্থী। দাখিল আর আলিমের নির্বাচনী পরীক্ষা না দিয়ে কেন্দ্রিয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বাতিক পেয়েছিলো আমাদের। আমাদের হিসাবনিকাশ ছিলো, সামনে কেন্দ্রিয় পরীক্ষা। তাই আমাদের ভিন্ন কদর থাকতে হবে এবং মাদরাসা কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবি মানতে বাধ্য। আমরা মিটিং করলাম উত্তরে ছিরা মুরায় গিয়ে। ছিরা মুরা বলতে মাদরাসার উত্তরে অনুচ্চ টিলা। যেখানে মাওলানা আবদুল করিম সাহেব ও মাওলানা আহমদুর রহমান সাহেবের বাড়ি হয়েছে। আমরা অপেক্ষায় ছিলাম, কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে এমন খবর নিয়ে কোনো বার্তাবাহক আসবেন। তবে বার্তাবাহক আসলেন বটে; খবর আনলেন উল্টো। তোমাদের মাদরাসা যাওয়া নিষেধ। সবার নাম কাটা যাবে। মাথায় যেনো আকাশ ভেঙে পড়লো। বার্তাবাহক আরো বললেন, তবে একটিমাত্র পথ আছে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বলে দিয়েছে, যদি নাযেমে 'আলা সাহেব তোমাদের এই আচরণ ক্ষমা করেন তাহলে নতুন তারিখে পরীক্ষা দিতে পারবে।

নাযেমে 'আলা সাহেবের সামনে যাবে, তেমন বুকের পাটা কার আছে। উপায়ান্তর না দেখে সিদ্ধান্ত হলো, সন্ধ্যায় মাগরিবের আগে আগে হুজুরের রুমে তেমন আলো থাকবে না, তখন সবাই তার পা দু'খান জড়িয়ে ধরবো। সত্যিই সে দৃশ্য ভোলার মতো নয়। আলিম পরীক্ষার্থী ফৌজুল কবির ভাই সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললেন। আমরা অনেকে কান্নার ভান করলাম। মাওলানা ফৌজুল কবির নরম তবিয়তের ছিলেন। পরবর্তীতে হুজুরের জামাতা হন। এই ঘটনা ছিলো অসংখ্য ঘটনার একটি, যা প্রমাণ করে চুনতি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ছিলেন নাযেমে 'আলা সাহেব। তিনি যা বলতেন, সিদ্ধান্ত দিতেন সবাই তা সানন্দে মাথা পেতে নিতো।

মাদরাসায় এমন কোনো অনুষ্ঠান হতো না, যেখানে নাযেমে 'আলা সাহেবের উপস্থিতি থাকতো না। প্রায় অনুষ্ঠানে উর্দু বা ফার্সিতে তাঁর রচিত শের (কবিতা) পাঠ করা হতো। কবিতাপাঠে

কণ্ঠ দিতো সৈয়দ নূর ও নূরুল হুদা। কবিতার ছন্দ ও সুরে আমরা মোহিত হলেও দু'একটি শব্দ ছাড়া অর্থ বুঝতাম না। অন্য ওস্তাদ বা বড়ো ভাইদের চেহারায় অর্থ খুঁজতাম। হুজুরের কবিতা পাঠকালে তাঁরা যে আনন্দ ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেন বা তাদের চেহারায় যে দ্যুতি খেলে যেতো তা পরখ করে কবিতার মর্ম আঁচ করার চেষ্টা করতাম। হুজুরের এসব কবিতার ভাব ও ঐশ্বর্য কতো গভীর ছিলো তা কিছুটা আঁচ করতে ইরান-তুরান ঘুরে আসতে হয়েছে। ফার্সির দেশ ইরানের রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠানে সাত বছর খবর পাঠের পর দেশে ফিরে দু'একটি প্রবন্ধ লিখি চট্টগ্রামে ফার্সিচর্চা বিষয়ে। তাতে একটি অংশ ছিলো হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেবের ফার্সি কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা। প্রবন্ধটি ইরানের ইসলামি নির্দেশনা মন্ত্রণালয়ের ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন 'নামেয়ে ফার্সি'তে মুদ্রিত হয়েছে।

চুনতি মাদরাসার ব্যতিক্রমধর্মী কিছু নিয়মের মধ্যে ছিলো মাদরাসার কোনো প্রতিভাবান প্রাক্তন ছাত্র বেড়াতে আসলে তাকে ক্লাসে পড়াতে দেয়া হতো। ড. আবু বকর রফিক ও অধ্যাপক সিরাজুল আরেফীন সিদ্দিকী প্রায় সময় এ ধরনের ক্লাস নিতেন। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের দিয়ে আধুনিক জগতের চলমান কোনো বিষয়ের ওপর ছাত্রসমাবেশে বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থা করা হতো। মাদরাসার দোতলায় এমন জায়গায় মঞ্চ করা হতো, যেখান দিয়ে 'আজ আর ক্লাস হবে না' বলে ফাঁকি দিয়ে কারো পালানোর সুযোগ থাকতো না। মনে আছে, মানুষ প্রথম চাঁদে যাওয়ার বিষয়ে যখন সর্বমহলে আলোচনা চলছিলো তখন মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র শিক্ষা অফিসার মাওলানা ফসিহুল্লাহ বিষয়টির ওপর তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। নিয়মিত ক্লাস স্থগিত রেখে এভাবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সবাইকে সম্পৃক্ত করার এই পরিকল্পনাটি ছিলো নাযেমে 'আলা সাহেব হুজুরের। তখন এই আয়োজনের সঠিক মর্ম না বুঝলেও এখন বুঝতে পারছি আমাদেরকে জ্ঞানের জগতের সাথে যুক্ত করার জন্য হুযুরের চিন্তা কতো সুদূরপ্রসারী ছিলো।

আমাদের মাদরাসার ছাত্র সংসদের নাম ছিলো আঞ্জুমনে এসলাহুত তোলাবা। এর অর্থ 'ছাত্রদের সংশোধনী সমিতি বা সংঘ।' প্রত্যেক ক্লাসের দু'জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হতো ছাত্র সংসদ। দু'জনের একজন হতো নম্বরে আউয়াল বা ক্লাসের ফার্স্টবয়। আরেকজন হতো ক্লাসের অপেক্ষাকৃত চালাক, আদর্শবান ও নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রটি। তাদের নিয়ে ছাত্র সংসদের জিএস বা অন্যান্য পদবী ঠিক করে দিতেন হুযুররা। মাদরাসায় কখনো নির্বাচনের মাধ্যমে জিএস নির্বাচিত হয়েছে বলে জানি না। তবে স্বাধীনতার পর চারদিকে যখন ভোটের জোয়ার চলছিলো, তখন কথা উঠলো আমাদের মাদরাসায়ও জিএসের ভোট হবে। মুখে মুখে দু'জন জিএসপ্রার্থীর একজন ছিলাম আমি। নিচের ক্লাসের ছাত্র হওয়াতে নিচের সব ছাত্রের সমর্থন ছিলো আমার প্রতি। চকরিয়ার মাশুক ওপরের ক্লাসের ছিলো, তার প্রতি শিবিরের সমর্থন থাকলেও ভোটের পাল্লা ঈসা শাহেদীর দিকেই ভারি মনে হচ্ছিলো।

মাঝখানে কী হলো জানি না। হঠাৎ একদিন জোহরের নামাযের পর মসজিদে সব ছাত্রদের উপস্থিতিতে আমার বিচার বসলো। বিচারক নাযেমে 'আলা সাহেব হুযুর। অভিযোগ মাদরাসায় দলাদলির জন্য আমি দায়ী। বাইরের ছাত্রদের খেদানো এবং মাদরাসার পরিবেশ নষ্ট করার পরিকল্পনা নাকি আমি করেছি। আমার জীবনের স্মরণীয় এই ঘটনার বিবরণ একটুতে দেয়া

সম্ভব নয়। অন্য কোনো সময়ের জন্য রেখে দিলাম। তবে হুজুর সেদিন আমাকে যেভাবে শাসিয়েছিলেন তার ফলে আমি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করি। সেদিনের বিচার না হলে, নাযেমে 'আলা সাহেবের স্নেহের কোলে আশ্রয় নেয়ার সৌভাগ্য আমার হতো না। প্রতিপক্ষের এই ষড়যন্ত্রের কারণে তাদের প্রতি আমার অন্তহীন কৃতজ্ঞতা। শেষ পর্যন্ত জিএস নির্বাচন হয়নি। হুজুরদের মনোনয়নে আমার ভাগ্যে পড়েছিলো সাহিত্য সম্পাদকের পদ আর জিএস বানানো হয়েছিলো ক্লাসমেট রশীদুর রহমানকে। এ ঘটনাও প্রমাণ করে মাদরাসার যাবতীয় বিষয়-আশয়ের নিয়ন্ত্রণ ছিলো নাযেমে 'আলা হুজুরের হাতে। মূলত ছাত্র সংসদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পেছনে সূক্ষ্ম কারিগর ছিলেন তিনি আর তাঁর সহযোগী ছিলেন মাদরাসার মুহতামিম চুনতির অঘোষিত অলি মওলানা শফিক আহমদ (রহ.)।

ছাত্র সংসদের নিয়মিত কাজ ছিলো দু'টি। প্রতি বুধবার বাদ জোহর মসজিদে বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আসর হতো। আমার বক্তৃতা প্রতিভার বিকাশে এই আসরের ভূমিকার কথা আলাদা একটি নিবন্ধে তুলে ধরেছি। প্রতিভার শক্তি মেপে ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে তুলে আনার এই কারিগরির পাশে আরেকটি উদ্যোগ ছিলো 'আল ইবরাত'। 'আল ইবরত' দেয়াল পত্রিকার নাম। সাহিত্য সম্পাদক মাদরাসায় ক্ষুদে লেখিয়েদের মনের চিন্তা সাজিয়ে 'আল ইবরত' বের করতে পারলেই মনে করতো সফল। চুনতি মাদরাসার ছাত্র হিসেবে আমার আনন্দময় স্মৃতি হলো স্বাধীনতা পরবর্তী ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক আর বুধবারের সাপ্তাহিক জলসার লড়াকু তার্কিক ছিলাম। ছাত্রদের জ্ঞানচর্চা, প্রতিভা শিকার ও পরিচর্যা এবং বক্তৃতার ও লিখনী শক্তির বিকাশের জন্য উল্লিখিত তিনটি ব্যবস্থা এখনো প্রত্যেক মাদরাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করা যায়। তাতে লেখা, বলা ও চিন্তার ব্যতিক্রমী যোগ্যতা নিয়ে ছাত্র নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে।

শুনেছি মাদরাসার আয় বৃদ্ধি ও পাঠ পদ্ধতিতেও হুজুর বেশ পরিবর্তন আনেন। কিন্তু এর স্বরূপ আমার জানা নেই। তবে ক্লাসে পাঠ দানকালে তিনি যে পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন তা ছিলো, ক্লাসে ঢুকেই প্রত্যেক ছাত্রের অবস্থান দেখে নিতেন। দু'একটি রসালো মন্তব্য ব্য গল্প বলে সবার মনোযোগ মুঠোয় নিয়ে নিতেন। যে পাঠটি তিনি দিবেন তার ওপর একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন। কিছু পরিভাষার অর্থ বলে দিতেন। তাতে মূল পাঠদানের আগেই সবচে অমনোযোগী ছাত্রটিও মনে করত পড়া অর্ধেক বুঝে গেছে। আমাদেরকে প্রশ্ন করার জন্য বলতেন। আমি একটু বাচাল প্রকৃতির ছিলাম। সারাক্ষণ নানা যুক্তিতর্ক করতাম। হুযুরদের সাথেও খোশালাপে আমার জুড়ি ছিলো না।

নাযেমে 'আলা সাহেব ক্লাসরূমে ঢুকেই বলতেন এই মানতেকি। মানতিক মানে যুক্তিশাস্ত্র। আগেকার দিনে মাদরাসার অবিচ্ছেদ্য পাঠ্য ছিলো। ইংরেজি বাংলার ধকল সামাল দিতে আমরা মানতিক পড়ার সুযোগ পাইনি। এরপরও হুযুর বলতেন, মানতেকি, যুক্তিবাদী। একদিন মানতিকের মারপ্যাঁচ দিয়ে বললেন, 'মুরগি নাজাসাত (নাপাক) খায় আর ঈসা মুরগি খায়। কাজেই ঈসা নাপাক খায়।' এই যুক্তি খণ্ডন করতে না পারায় আমাকে জরিমানা দিতে হয়েছিলো। জরিমানা ছিলো ক্লাস শেষে করম আলীর চায়ের দোকান থেকে এক কাপ চা, চায়ের কাপের ওপর এক প্লেট মুড়ি আর মুড়ির ওপর একটি গরম পেয়াজু। এমন জরিমানা দেয়ার সৌভাগ্য সম্ভবত ছাত্রদের মধ্যে আমারই জুটেছিলো। বলেছিলেন, কিছু কিছু মুরগি

নাপাকি খায়, সবগুলোই নয়। কাজেই এই যুক্তির আওতায় সবাই আসবে না, তুমিও না। সত্যি বলতে কি, হুজুরের ক্লাস শেষে সবচে অঘা ছেলেটিও মনে করতো আজকের পড়াটি আমি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করেছি। সভামঞ্চে যাকে সভাপতির আসনে দেখতাম, মাদরাসার অফিসে যার প্রতাপে সবকিছু কাঁপতো, ক্লাসে তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো আচরণ করতেন, ভাবতেই অবাক লাগে।

১৯৭১ সালে আমরা মাদরাসা হোস্টেলে থাকি। ১২ রবিউল আউয়ালের পরের দিন সকালে ঘুম থেকে জেগে শুনি গত রাতে শাহ মঞ্জিলে একটি মাহফিল হয়েছে। সাতকানিয়া থানার লোহাগাড়া তখনো ভাগ হয়নি, সবচে খ্যাতিমান দু'জন আলেম ওয়াজ করেছেন। একজন মওলানা আমিনুল্লাহ (র), অপরজন মওলানা মোবারক আহমদ (র)। তাঁদের দু'জনকে নাকি একশ টাকা করে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। একশ টাকা হাদিয়া তখনকার দিনে বিরাট ব্যাপার ছিলো। পরের বছর এই মাহফিল হয় একদিন ব্যাপী। জোহরের পর থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শাহ মঞ্জিলের লাগোয়া দক্ষিণে পূর্বমুখী প্যান্ডেল করা হয়। জোহরের আগে অনানুষ্ঠানিক দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ কেড়ে নিয়েছিলাম আমি। পরের বছর থেকে মাহফিলকে গতানুগতিকতার উর্ধ্বে একটি উন্মুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের উদ্যোগ নেন নায়েমে 'আলা হুজুর।

সিরাত মাহফিলের আয়োজক, প্রতিষ্ঠাতা ও মধ্যমণি ছিলেন শাহ হাফেজ আহমদ (রহ.)। তিনি ছিলেন আশেকে রাসুল (সা.), মজযুব অলী। অলী আল্লাহদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ নিজ থেকে টেনে নেন, সংসার জীবনের নানা ব্যস্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের জন্য পাগল করে রাখেন শাহ হাফেজ আহমদ ছিলেন সে ধরনের অলী। কম কথা বলতেন। নিজেই নিজের সাথে স্বগত-আলাপ করতেন। তবে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্বের আভা, চলনে-বলনে সুদর্শন পুরুষের ভঙ্গি ও নবীপাকের মহব্বতের কারিশমা চোখে না দেখলে বুঝানো যাবে না। সিরাতুন্নবী (সা.) নামে ইতিহাসের প্রথম মাহফিলের প্রবর্তক তিনি এবং তাঁর রূপকার নায়েমে 'আলা মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.)।

আমাদের দেশের মাহফিলগুলোর মূল আকর্ষণ, ওয়াজি আলেমদের আলোচনা। পূর্বে রবিউল আউয়াল মাসে ইয়াউমুন্নবী (সা.), ফাতেহা দোয়াজদাহুম বা মীলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল অনুষ্ঠানের রেওয়াজ ছিলো শহরে গ্রামে সর্বত্র। আকর্ষণীয় কণ্ঠমাধুরীর অধিকারী আলেমগণ এসব মাহফিলে উর্দু, আরবি, ফার্সি কবিতার মিশেলে আলোচনা করতেন নবীজির জন্মকালীন বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা। নবীজীবনের মুজেযাগুলোই ছিলো তাদের আলোচনার উপজীব্য। এর বাইরে গোটা মানবজীবনের জন্য কুরআন হাদিসে বা নবী করিম (সা.)-এর জীবনীতে যে নির্দেশনা রয়েছে তা উঠে আসতো না সে আলোচনায়। এসব মাহফিলে নায়েমে 'আলা সাহেব বিরাট গুণগত পরিবর্তন আনেন চুনতি সিরাত মাহফিলের মাধ্যমে।

চুনতি সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল পর্যায়ক্রমে তিনদিন, পাঁচদিন, সাতদিন, দশদিন, বারদিন, পনের দিন ও সতের দিন হয়ে উনিশ দিনে গিয়ে স্থিত হয়। মাহফিলকে কয়েকটি অধিবেশনে ভাগ করা হয়। সারা দেশের জ্ঞানবৃদ্ধ আলেম, পীর ও মুরুব্বিদের বিভিন্ন অধিবেশনের সভাপতির পদে সম্মানিত করা হয়। অধিবেশনের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত ও নাতে রাসুল পাঠের আসরে প্রতিভা উজাড় করার সুযোগ পায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিল্পী ছাত্ররা। প্রত্যেক

বক্তার জন্য নির্ধারিত থাকে একেকটি মজমুন বা বিষয়বস্তু। সারা দেশের বিশেষজ্ঞ আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদদের কাছে দু'তিন মাস আগেই পত্রযোগে জানিয়ে দেয়া হয় নবীজীবনের বা ইসলামের অমুখ দিকটির ওপর তথ্যনির্ভর আলোচনা করতে হবে। কোনো বক্তা তাঁর জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুর বাইরে গিয়ে কথা বলতে পারতেন না।

নাযেমে 'আলা সাহেব হুজুর হাদিসের বড়ো বড়ো কিতাবের সূচিপত্র সামনে রেখে বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করতেন। তাতে নবীজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত হতো। বিষয়বস্তুও বক্তার নাম তালিকা একটি পুস্তিকায় ছাপা হতো, এখনো হয়। শিক্ষিত লোকেরা সিরাত মাহফিলের এই বিষয়পুস্তিকা পড়েই নবীজীবন ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চিত্র মনের আয়নায় খুঁজে পেতো। বক্তাদের মধ্যেও শুরু হতো পড়াশোনার সাজ সাজ রব। মুখস্থবিদ্যা নিয়ে সিরাতের পারাপার পার হওয়ার সুযোগ নেই। আগের মতো এলোপাতাড়ি ওয়াজ করার দিন শেষ। সিরাত মাহফিলের পরিচালক নাযেমে 'আলা সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী বক্তাদের নাম ও বিষয়বস্তু ঘোষণার দায়িত্ব ছিলো আমরা দু'জনের। ড. আবু বকর রফিক আহমদ চুনতির সন্তান, চুনতি মাদরাসার অসাধারণ প্রতিভাবান ছাত্র। তিনি চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো ভিসি।

সিরাতুন্নবী (সা.) বলুন বা মিলাদুন্নবী (সা.) নবীজীবন আলোচনার এই পদ্ধতি নিশ্চয়ই আমাদের দেশে ধর্মীয় মাহফিলের ইতিহাসে এক গুণগত বিপ্লব আর তার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে চুনতি মাদরাসার নাযেমে 'আলা মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেবের।

আমরা '৭৪-এর ফাযিল। পরীক্ষা দিয়েছি '৭৫ সালে। চুনতি মাদরাসায় কামিল খোলা হয় আমাদের পরের বছর। কাজেই কামিল পড়তে হবে অন্যত্র। আলিয়া নেসাবের ছাত্রদের ব্যাপারে বলা হয়, তারা আরবি ব্যাকরণে খুব দুর্বল। ফাযিল পরীক্ষা দেয়ার পর এই দুর্বলতা আমার মানসিক যন্ত্রণার কারণ হলো। কামিলে সিহাহ সিত্তার হাদিসের মতন (টেক্সট) পড়তে হয় ছাত্রকে। হুজুর সেই পাঠের ওপর মন্তব্য বা টীকা দেন। এভাবেই কামিলের দরস হয়। ভালো ছাত্র প্রমাণ করতে হলে হাদিসের মতন পড়তে হবে বিশুদ্ধ উচ্চারণে। হাদিসে তো কুরআন শরিফের মতো যের যবর নাই। যে ছাত্র আরবি ব্যাকরণে দক্ষ সেই মতন পড়তে পারে। ভুল করলে তো ছাত্রদের প্রতিবাদ গুঞ্জরিত হয়। চিন্তা করলাম, হাদিসের মতন পড়তে হলে এতদিনের চাপাবাজি চলবে না। পরীক্ষার পর রেজাল্ট পর্যন্ত তিন মাস কোনো মাদরাসায় বা ওস্তাদের কাছে আরবি ব্যাকরণ পড়ার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরলাম। কিন্তু তিন মাসের ছাত্রকে গ্রহণ করতে কোথাও কেউ রাজি হলো না।

চুনতি মাদরাসায় করম আলির চায়ের দোকান ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন। তফাৎ শুধু করম আলির দোকানে সিনিয়র হুজুররাও বসতেন। মাদরাসা পাহাড়ে চায়ের দোকানটি ছিল সম্পূর্ণ বেড়ার। দুই খণ্ডের দোকানে ভেতরের অংশে ছাত্ররা আড্ডা দিতাম। বাইরের রুম রিজার্ভ ছিলো হুজুরদের জন্য। করম আলির গায়ের রঙ ছিলো কুচকুচে তেলতেলে। তবে তার অন্তরটি ছিলো স্ফটিকের মতো ঝলমলে। মাদরাসার হুজুর আর ছাত্রদের সাথে কোন মাত্রায় কথা বলতে হবে সে রসায়ন তার আয়ত্ত ছিলো।

একদিন আড্ডায় গপ্প উড়াচ্ছিলাম, সারা চট্টগ্রাম ঘুরেছি। আমাকে পড়ানোর মতো ওস্তাদ কোথাও পাইনি। কথাবার্তা শুনেই ভয়ে কেউ আমাকে গ্রহণ করে না। জানতাম না সামনের রুমে কোনো ওস্তাদ আছেন। হঠাৎ আওয়াজ আসলো, এই পণ্ডিত! আমি লজ্জায় কাচুমাচু। তিনি যে নাযেমে 'আলা হুযুর। তোকে আমি পড়াবো, রাজি আছিস। জি হুজুর! পরদিন থেকে শুরু হলো ক্লাস। মিয়াজিপাড়া সিদ্দিক হাজির লজিং বাড়ি থেকে সাতসকালে চলে আসি। মরহুম সিদ্দিক হাজির স্ত্রী ছিলেন এ যুগের রাবেয়া বসরী। তিনি আমাকে তার দুই ছেলের চেয়েও বেশি আদর করতেন। লজিং-এ কাউকে পড়াতে হত না। এরপরও দুর্ভিক্ষের দিনে আমার আদর যত্নে তার উদারতার অন্ত ছিলো না। সেই আনুকূল্যে দিনরাত পড়া আর পড়া। হুজুরের রচিত আরবি ব্যাকরণের সহজ-সরল দুটি কিতাব 'আদ্দুরুসুস সরফিয়া' ও 'আদ্দুরুসুন নাহবিয়া।' শব্দের ভেতরগত গঠন প্রণালীর নাম সারফ আর শব্দ শেষে যের জবর পেশের বিধানের নাম নাহু। একটানা দুই মাস এক ওস্তাদের একমাত্র ছাত্র হয়ে রপ্ত করলাম সারফের শাজারা বৃক্ষটি। নাহুর পাঠও আয়ত্ত হলো অনায়াসে। এই দুটি কিতাব উর্দুভাষায়। তবে আরবি ব্যাকরণ শেখার সহজ পদ্ধতিতে এর বিকল্প চিন্তা করা যায় না। বই দুটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে বন্ধুবর ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিলো দৈনিক ইনকিলাবে।

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ চলছে। কামিল হাদিস পড়তে যেতে হবে চট্টগ্রাম শহরে চন্দনপুরা দারুল উলুম মাদরাসায়। এক বন্ধু খবর দিলো, চাদগাঁও-এ একটি লজিং আছে। সেখান থেকে দারুল উলুম মাদরাসায় বাসে আসা-যাওয়া করা যাবে। হুজুরের কাছে এযাজত চাইলাম শহরে চলে যাবার। বিদায়কালে তিনি বললেন, তোমাকে তো বাবা ফার্সিটা শিখিয়ে দেয়ার খেয়াল ছিলো। হুজুরের একটুখানি মুখের ইশারা আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ফার্সির দেশ ইরান যাওয়া আর ইরানিদের মতো করে ফার্সি শেখার সৌভাগ্য ছিলো হুজুরের সেই ইশারার ফসল। আমার একাধিক নিবন্ধ ও বইতে বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। সত্যি বলতে কি, নাযেমে 'আলা হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর স্নেহের পরশে ও দোয়ায় জ্ঞানচর্চা ও ফার্সির জগতে এতদূর আসতে পেরেছি।

আরবি ব্যাকরণের উল্লিখিত বই দুটি ছাড়াও তিনি উর্দু, ফার্সি ও আরবিতে বহু কবিতা ও গ্রন্থরচনা এবং অনুবাদ করেছেন। তাঁর একটি পাণ্ডুলিপি চরম্বানিবাসী একজন প্রাক্তন ছাত্র নিয়েছিলেন। সেই পাণ্ডুলিসন্ধান নিয়ে জানতে পারি, দু'এক কিস্তি ছাপা হওয়ার পর মাসিক আত-তাওহীদ পত্রিকা অফিসে পড়ে আছে। সেখান থেকে দ্বিতীয় খণ্ডটি উদ্ধার করে হুজুরের হাতে দিয়েছিলাম। প্রথম খণ্ড পাওয়া যায়নি। শেষজীবনে এই অমূল্য বাংলা রচনার পাণ্ডুলিপি 'যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম' আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'যখন পারো ছাপানোর ব্যবস্থা করবে। তোমাকে দিলাম।' ছাপানোর সামর্থ্য আমার ছিলো না। তাই ইরানে অবস্থানকালে আমার সনদপত্রের সঙ্গে সযত্নে রাখতাম। দেশে ফেরার পর হুজুরের সন্তানগণ উপযুক্ত হয়েছে দেখে ছাপানোর শর্তে ড. হোছামুদ্দিনের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) আমার জন্মদাতা পিতা নন, তবে আমার জ্ঞানের জন্মদাতা ও প্রতিভার পরিচর্যাকারী পিতা। যখনই তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করি অনুভব করি, এখনো তিনি আমার মাথায় স্নেহের পরশ বুলাচ্ছেন।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.

আ.ন.ম. আতীক আহমদ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের জন্য নিবেদিত। অযুত কোটি দরুদ ও সালাম প্রিয় নবীজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর বর্ষিত হোক। স্বাভাবিকভাবে এটি প্রত্যাশিত বরং ইতিহাসের অন্যতম দাবীই হচ্ছে জাতির স্মরণীয়, বরণীয় জ্ঞানী-গুণীদের জীবনচরিত রচনার মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা। প্রবাদ আছে, যে জাতি গুণীর কদর করতে জানে না, তাদের মধ্যে গুণীলোক জন্মায় না। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সে মহৎ উদ্দেশ্যে রচিত। এখানে যে মহান আদর্শ ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আমার যতকিঞ্চিৎ আলোচনার অবতারণা: তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. প্রকাশ নাযেমে আ'লা সাহেব। যিনি ছিলেন আমি অধমসহ আমার মতো অগণিত ছাত্রদের জন্য আল্লাহপাকের নিয়ামত। তাঁর শ্রদ্ধেয় মাতা-পিতার দেয়া নামের সার্থকতা এখানেই।

আমার ছাত্রজীবনে ফাজিল পর্যন্ত চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (কামিল) মাদরাসায়, কামিল (হাদিস) চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় এবং কামিল (ফিক্বহ) সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া-ঢাকায় অধ্যয়নকালীন যে সমস্ত আদর্শবান কামিল উস্তাদের সান্নিধ্যধন্য হবার সুযোগ লাভ করেছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়জন হলেন- সর্বজনাব আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ., মাওলানা মুজাফফর রহ, মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমিন (প্রকাশ শায়খুল হাদিস রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (প্রকাশ মুহাদ্দিস দাওম সাহেব রহ.) মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ (প্রকাশ মুহাদ্দিস সাওম সাহেব রহ.), মাওলানা কামালুদ্দীন মুসা খতিবী (প্রকাশ হেড মাওলানা রহ.) এবং মাওলানা মিয়া মুহাম্মদ কাসেমী রহ. প্রমুখ। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এবং সীমাবদ্ধতার কারণে এদের মধ্যে দু'জনের কিছু তুলনামূলক স্মৃতির সামান্য অংশ তুলে ধরতে প্রয়াস পাচ্ছি। এরা দু'জন হলেন যথাক্রমে আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ ও আল্লামা মিয়া মুহাম্মদ কাসেমী রহ.। আমি এ দুজনের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেছি।

ছাত্রবাৎসল্যের দিক দিয়ে উভয়েই ছিলেন অতুলনীয় আদর্শ। অতি গোপনে দারিদ্র্যক্লিষ্ট অসহায় ছাত্রদের আর্থিক সহযোগিতায় তাঁরা ছিলেন অনুপম আদর্শ। আত্মমর্যাদাবোধ এবং আলেম হিসেবে সকল হীনমন্যতাকে পায়ে মাড়িয়ে মাথা উঁচু করে সর্বক্ষেত্রে বিচরণের সাহসিকতাবোধ বিদ্যমান ছিলো উভয়ের মধ্যে। উভয়েই ছিলেন যেহেতু অভিজাত পরিবার থেকে উঠে আসা তাই তাদের চলাফেরা, কথাবার্তা আচার-আচরণ এবং খুদি তথা আত্মপরিচয়, মর্যাদাবোধ ও আত্মোপলব্ধির মাত্রা ছিলো উন্নীত। বড় বড় ব্যবসায়ী, ধনাঢ্য ব্যক্তি, সরকারি অফিসার, আলিম-ওলামা সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গ ওনাদের খুবই শ্রদ্ধাভরে বরণ করতেন। উপস্থিত উত্তরপ্রদান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে উভয়ের মধ্যে ছিলো সাদৃশ্য। নাযেমে আ'লা রহ. ছিলেন বিচারক জুরি বোর্ডের সদস্য। আর কাসেমী সাহেব ছিলেন মাদরাসা বোর্ডের বিভিন্ন কমিটির মধ্যমণি। পাঠদানের ক্ষেত্রেও তাঁরা উভয়েই ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। 'উসুলুশ শাশী'-এর মতো কঠিন কিতাবটি আমাদেরকে পড়ানোর সময় নাযেমে আ'লা সাহেব পাঠ্যবিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপন করতেন যাতে যে কোনো ছাত্র মনোযোগ দেয়া মাত্রই সহজেই অন্তঃকরণ করতে সক্ষম হতো। অপরদিকে কাসেমী সাহেব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-

এর মতো কঠিন কিতাবটির এমন অভিনব পদ্ধতিতে পাঠ দিতেন যাতে সকলের বোধগম্য হতো। কাসেমী সাহেব মাদরাসা-ই-আলিয়ায় যোগদানের সময়কার ইন্টারভিউতে দেয়া উত্তরের ঘটনাটি তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। অনুরূপভাবে তৎকালীন পাকিস্তানের পার্লামেন্ট স্পিকার থাকা অবস্থায় ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে নাযেমে আ'লা রহ.-এর সাক্ষাৎকারের ঘটনাটিও চুনতি মাদরাসার ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। উভয় ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরতে প্রয়াস পাচ্ছি। সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়ায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপূর্ব ইন্টারভিউ পর্বে ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্য জাঁদরেল সরকারি অফিসার তৎকালীন ডিপিআই প্রফেসর বাকি বিল্লাহ খান আমার ওস্তাদ মিয়া মুহাম্মদ কাসেমীকে প্রশ্ন করলেন, 'মাওলানা বলেন দেখি কাবাগৃহে সংরক্ষিত ৩৬০টি মূর্তির মধ্যে প্রধান মূর্তিটি কি রকম ছিলো?' তাৎক্ষণিক তিনি উত্তরে বলে উঠেন- 'বিলকুল আপনার মতো'। এক উত্তরেই সব শেষ। তার উত্তর শ্রবণে বোর্ডের সকলে থ বনে গেলেন। প্রশ্নকারী প্রদত্ত উত্তরে তার বাগ্মিতা দর্শনে এতোই বিমোহিত হলেন যে নিজ আসন ছেড়ে উঠে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করে বুকে জড়িয়ে ধরতে বাধ্য হলেন। অনুরূপভাবে আমার ওস্তাদ নাযেমে আ'লা সাহেবের সাথে পাকিস্তান পার্লামেন্টের স্পিকার ফজলুল কাদের সাহেবের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গটি কাকতালীয়ভাবে মিলে যায়।

ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ, স্পিকার ফজলুল কাদের চৌধুরী সড়কযোগে কক্সবাজার যাচ্ছিলেন। নাযেমে আ'লা সাহেব চুনতি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে চুনতি ডাকবাংলা রাস্তার মাথায় তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় স্পিকারের গাড়িবহর যাত্রাপথে উক্ত স্থানে এসে একটুখানি বিরতি দিয়ে চলে যেতে উদ্যত। মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্ররা বলে তো কথা আছে! নাযেমে আ'লা রহ. স্পিকারের উদ্দেশ্যে ওনার স্বরচিত কবিতাটি ওনার কতিপয় ছাত্রের কণ্ঠে পাঠ করতে নির্দেশ দিলেন। কবিতার ভাষা ও সুরের মূর্ছনায় হারিয়ে গেলেন স্পিকার সাহেব। হুজুরের সম্মোহিত মোহিনীশক্তি মর্দে মুমিন মাননীয় ইমামে কামিলের ফিরাসৎ তথা দিব্যদৃষ্টি এড়িয়ে চলা কার সাধ্য!

স্পিকার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। নিজের অজান্তে গাড়ি থেকে নেমে ছাত্রদের কাছ থেকে হুজুরের রচিত আয়নার ফ্রেমে আবদ্ধ কবিতাটি হাতে নিয়ে হুজুরকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে বাধ্য হলেন এবং মাদরাসার জন্য ১০০০০ টাকার (যা বর্তমানে ১০ লক্ষাধিক টাকার সমান) অনুদান ঘোষণা করলেন। অতঃপর তিনি কক্সবাজারের পথে রওনা দিলেন।

পরিশেষে আমার সাথে আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদের সম্পর্ক নিয়ে সামান্য আলোকপাত করে আমার এই ক্ষুদ্র লেখাটির ইতি টানবো। নাযেমে আ'লা রহ.-এর সাথে আমাদের বহুমাত্রিক সম্পর্ক শতাব্দীকালের প্রাচীন। তিনি ছিলেন আমার নানাজান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা শাহ মাওলানা নজির আহমদ রহ.-এর অন্যতম প্রিয় ছাত্র। আর আমি হুজুরের প্রিয়তম ছাত্র এবং সবশেষে একই সাথে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় শিক্ষকতার সুবাদে বিশ্বস্ততম সহকর্মী। হুজুরের কয়েকজন সন্তান তথা আবুল আতা ও ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন চুনতি মাদরাসায় আমার ছাত্র। বিশেষ করে প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী এমপি সাহেব আমার অনুজ প্রফেসর ড. আবুল কালাম মুহাম্মদ শাহেদের এককালের সহপাঠী। হিন্দুস্তানের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম নদওয়ায় অধ্যয়নকালে আমার শ্যালক প্রফেসর ড. নাজমুল হকের সহপাঠী। অনুরূপভাবে আমার অপর প্রিয় ছাত্র আল্লামা ফজলুল্লাহ

রহ. ফাউন্ডেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাওলানা ড. হোছামুদ্দিন আমার ভাগিনা প্রফেসর হামেদ হাসানের সহপাঠী। আমরা পাঁচ ভাই যথাক্রমে আমি, আমার বড় ভাই প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক, অধ্যক্ষ মাওলানা আবু নঈম সিদ্দিক আহমদ, প্রফেসর ড. আবু ওমর ফারুক আহমদ এবং ড. আবুল কালাম মুহাম্মদ শাহেদ নাযেমে আ'লা (রহ.)-এর অত্যধিক প্রিয়। ছাত্র হিসেবে ওস্তাদ নাযেমে আ'লা রহ. সম্পর্কে আমার স্মৃতিভাণ্ডারে পুঞ্জিভূত বিষয়াদির স্মৃতিমন্থন এক বড় পুস্তকের রূপ পরিগ্রহণ করবে কিন্তু প্রিয়ভাই ড. হোছামুদ্দিনের অনুরোধে সীমিত পরিসরে কিছু স্মৃতি তুলে ধরতে আমার এই ক্ষুদ্রতম প্রয়াস মহান আল্লাহর দরবারে আমার ওস্তাদের মাগফিরাত এবং রফ'য়ে দরজাত কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

** উপাধ্যক্ষ (অব.), চুনতি মাদরাসা, সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং আল্লামা ফজলুল্লাহ্‌র (রহ.) কৃতী ছাত্র।*

আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) অনূদিত 'শামায়িলে তিরমিযী'

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আল-বূগী আত-তিরমিযী (রহ.) বিশ্ববরেণ্য এক হাদিস বিশেষজ্ঞ। তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন এ মুহাদ্দিস তাঁর যুগের বিভিন্ন দেশের বিশেষত খুরাসান, বুখারা, মাওরাউন নাহার, ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মক্কা-মদিনা, মেসোপটেমিয়া, পারস্যের বিখ্যাত আলিমদের দরবার ও শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে ইলমে দ্বীন হাসিল করেন। সে যুগের খ্যাতনামা হাদিস বিশেষজ্ঞ বিশেষভাবে ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম আবূ দাউদ (রহ.), ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ (রহ.), মাহমূদ ইবন গায়লান (রহ.)-এর কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেন। জীবনের ৭০টি বছর জ্ঞানসাধনায় তিনি অতিবাহিত করেন। তাঁর বিরচিত 'শামায়িলে তিরমিযী' এক কালজয়ী হাদিসগ্রন্থ। এ কালোত্তীর্ণ গ্রন্থের কদর ও সমাদর গোটা দুনিয়াব্যাপী বিস্তৃত। ১২শ' বছর ধরে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দ্বীনি মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত রয়েছে। ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.) ছিলেন ইমাম বুখারি (র.)-এর খাস শিষ্য। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ইমাম বুখারি (র.) তাঁর শীষ্য ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। এতে ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.)-এর ইলমি গভীরতা ও গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় মেলে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.) রাহমাতুল লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৈহিক গঠন, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রা, আহার-বিহার, অভ্যাস-চরিত্র, ইবাদাত, রুচিবোধ, সম্পদ-জীবিকা, নিদ্রা-স্বপ্নের বিস্তারিত আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে।

'শামায়িলে তিরমিযী'-এর প্রথম বাংলায় ভাষান্তর করেন হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর খাস শিষ্য ও চট্টগ্রাম চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার নাযিমে আ'লা (রেক্টর) হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেব (রহ.)। ১৯৬০ সালে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় চট্টগ্রামের ইসলামিয়া লাইব্রেরি হতে। এর পর আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেব (রহ.)-এর দু'জন সুযোগ্য সন্তান বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন প্রফেসর মাওলানা ড. আবু রেজা মোহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (হাফি.) এমপি ও মাওলানা ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন (হাফি.)-এর সম্পাদনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা থেকে এটি প্রথম প্রকাশ পায় ২০১৬ সালে, দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালে। গ্রন্থের শুরুতে ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.) এবং শেষে অনুবাদক আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেব (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থের মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে পাঠক গ্রন্থকার ও অনুবাদকের বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, শিক্ষা সফর, মেধা, স্মৃতিশক্তি, মাযহাব, মনীষীদের অভিমত, রচনাবলি ও ইন্তেকাল সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।

আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেব (রহ.) যখন এ গ্রন্থের অনুবাদ শুরু করেন তখন আলিম-ওলামাদের মধ্যে বাংলাচর্চা ছিল একেবারে সীমিত। তখন দেশব্যাপী শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু

ও আরবি। ফার্সিভাষার চর্চা ছিল ব্যাপক। বহুমাত্রিক মেধার অধিকারী বিজ্ঞ অনুবাদক আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেব (রহ.) ছিলেন অনেক উঁচু মাপের আলিমে দ্বীন, মুহাদ্দিস, মুফতি, কবি, লেখক ও গবেষক। বাংলা, আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ও পারঙ্গমতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আমার মনে আছে জীন জাতির এক সর্দার হাটহাজারী মেখল হামিউস সুন্নাহ মাদরাসার সাবেক ওস্তাদ হযরত মাওলানা গোলাম কাদের সাহেব (রহ.)-কে আরবি বর্ণমালায় সংক্ষিপ্ত একটি চিঠি দেন। কেউ এ চিঠির পাঠোদ্ধার করতে পারেননি। আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেব (রহ.) ওই চিঠির মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেব (রহ.)-এর অনুবাদ যথার্থ ও যুৎসই। ভাষান্তর করতে গিয়ে হাদিসের মূল ইবারতের সৌকর্য ও বৈশিষ্ট্য বিঘ্নিত হতে দেননি তিনি। শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস ও রচনাশৈলী পাঠককে কাছে টানে। বর্ণনাভঙ্গি সাবলীল ও ঝরঝরে। ৫৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ৪০৬ পৃষ্ঠার এ অনুবাদিত গ্রন্থে রয়েছে বর্ণমালাভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জি। প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি হাদিসে তিনি প্রয়োজনীয় টীকা ও রেফারেন্স সংযুক্ত করেন। বাজারে বাংলা ভাষায় যত 'শামায়িলে তিরমিযী' আছে এটি ব্যতিক্রমধর্মী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ গ্রন্থটির অনুবাদ ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে তৈরি করা হয়। কাগজ উন্নত, মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন ও বাঁধাই মনোরম। আমি গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি।

বাবাকে যেমন দেখেছি

অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন

বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলো। আমার মুহতারাম বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) ছাত্র, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় আমার শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ মরহুম মাওলানা কামালুদ্দিন মুসা খতিবী (রহ.) সহাস্য বদনে বাবার কাছে এসে বললেন যে, হুজুর, হোছামুদ্দিন তো পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। বাবা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পাশাপাশি বললেন যে, পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া মুখ্য নয়, যথাযথ জ্ঞানার্জনই মূল কথা। আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন তবে আবু রেজার মতো তাকেও আমি নাহু-সরফসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে শক্ত ভিত্তি স্থাপন করাবো, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, এর ২/৩ মাস পরই ৪ মার্চ ১৯৭৯ খৃস্টাব্দে বাবা ইন্তেকাল করেন। এর আগে ১৯৭৮ খৃস্টাব্দের শুরুতে বাবা আমাকে চুনতি মাদরাসায় জামাতে নাহুম (বর্তমান ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে) ভর্তি করিয়ে দেন। বাবার ক্লাস পাবার সুযোগ না হলেও তাঁর সকল ছাত্রের একই বক্তব্য, তা হলো হুজুরের ক্লাসের পড়া বাড়িতে এসে শেখার দরকার পড়তো না। হোক সে ক্লাসের একেবারে দুর্বল ছাত্র। বাবার ক্লাস পাবার সুযোগ না পেলেও একবছরে রুমে আমাকে যা পড়িয়েছেন তার স্টাইল, ভাষা সবই আলাদা। এখনো তা আমার স্মৃতিতে দেদীপ্যমান। চুনতি মাদরাসার জাঁদরেল শিক্ষকগণকে প্রায়শ দেখেছি বিভিন্ন জটিল কিতাবি সমস্যার সমাধানের জন্য বাবার কাছে আসতেন। এখনো মনে আছে শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (রহ.) ও মুহাদ্দিসে সুওম শাহ মাওলানা আব্দুর রশিদ (রহ.) দু'জনে সহিহ বুখারি হাতে নিয়ে এসে বাবাকে বলেন, হুজুর এক ঘণ্টা চেষ্টা করেও এই জটিল সমস্যার সমাধান পাচ্ছি না। বাবা তৎক্ষণাৎ সমাধান দিলে উনারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। এরকম বহু বড় বড় ওয়ায়েজকে দেখেছি সিরাতুন্নাবীর (সা.) সময় বাবার কাছে এসে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের সমাধান নিয়ে ফিরতেন। বাবার ইন্তেকালের পরও মাদরাসার শীর্ষস্থানীয় ওস্তাদবৃন্দ যথাক্রমে মাওলানা হাফেয মীর গোলাম মোস্তফা, অধ্যক্ষ শাহ মাওলানা হাবীব আহমদ, মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মাদ আমিন, শাহ মাওলানা আব্দুর রশিদ, মাওলানা কামালুদ্দিন মুসা খতিবী প্রমুখের মুখে যখনই কোনো কিতাবাদি বা বড়ো ওলামাদের আলোচনা হতো তখন প্রায় শুনতাম যে, সবার মধ্যে নাযেমে আলা' আল্লামা ফজলুল্লাহর স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে তিনি হারফনী (সব বিষয়ে পারদর্শী), তার ওপর তিনি যে কোনো বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে পারঙ্গম ছিলেন। এছাড়াও তিনি আবার সহজাত কবি। চুনতির শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ, খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ, শাহ মাওলানা আবদুর রশিদ (ছোটো হুজুর), বায়তুশ শরফের মরহুম পীর শাহ মাওলানা আব্দুল জব্বার, রেক্টর মাওলানা মুযহের আহমদ, শাহ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস রাহ. (হাজী সাহেব হুজুর পটিয়া), বড়ো মাওলানা আমীনুল্লাহ সাহেব, হাফেজুল হাদিস মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবী, অধ্যক্ষ শাহ মাওলানা আতিকুল্লাহ খাঁন, মুফতি মাওলানা ইবরাহীম, বাইতুল মুকাররমের সাবেক খতিব মাওলানা ওবাইদুল হক, শাহ মাওলানা কুতুবুদ্দিন, শাহ মাওলানা ইলাহি বখ্শ (বাঁশখালী), শাহ মাওলানা শফিকুর রহমান (বাঁশখালী), মুফতি মাওলানা সুলতান আহমদ, মুহাদ্দিস মাওলানা আফলাতুন

কাইসার, অধ্যক্ষ (সিলেট আলিয়া) ও মুহাদ্দিস (ঢাকা আলিয়া মাদরাসা) মাওলানা ফখরুদ্দিন, *শাহসুফি সাইয়েদ মাওলানা মুহাম্মদ দায়েমউল্লাহ (সুফি দায়েমউল্লাহ)* ঢাকা, প্রখ্যাত ওয়ায়েজ মাওলানা মুবারক আহমদ, প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ মাওলানা আব্দুল গনী, মাওলানা রশিদ আহ্‌মদ নদভী, মুহাদ্দিস মাওলানা নেসারুল হক, মাওলানা হাবিবুল্লাহ মেসবাহ, হেকিম মাওলানা ইসমাঈল হেলালি (শায়ের), প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম (রহ.) প্রমুখ-সহ আরো অনেক বড়ো-বড়ো ওলামায়ে কেরামকে দেখেছি সকলে বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহকে খুবই সমীহ করতেন এবং তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। ১৯৭৭ সালে কুমিরাঘোনা আখ্‌তারুল উলুম মাদরাসার সভায় মুফতি মাওলানা সুলতানসহ অনেক ওলামা উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে তখন আমি চিনতাম না। বক্তৃতার এক পর্যায়ে শাহ মাওলানা আবদুল জব্বারকে (রহ.) বলতে শুনেছি; এখনো কানে বাজে উক্তিটি **"দক্ষিণ চট্টগ্রামের সকল ওলামাকে এক পাল্লায় এবং নাযেমে আলা' হুজুরকে এক পাল্লায় দিলে তাঁর ইলমের পাল্লাই ভারী হবে।**

আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি; ১৯৮৮/১৯৮৯ সালের কথা। ১৯ দিন ব্যাপী চুনতি সিরাতুন্নবি মাহফিল চলছিলো। শেষ দিবসের কয়েকদিন আগে শাহ মাওলানা এলাহি বখশ মাহফিলে তাশরিফ আনার সংবাদে মানুষের ঢল নামে। তবে তিনি অসুস্থতার দরুণ তাঁকে নিয়ে যাওয়া গাড়ি অপারগতার কথা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে ফেরত পাঠান। এতে মাহফিল কর্তৃপক্ষ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং জনাব ইউসুফ মিয়া, মরহুম মাওলানা মুসলিম খান ও মরহুম হাফেজ হারুনুর রশিদ পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, হোছামুদ্দিনকে পাঠানো হোক শাহ মাওলানা এলাহি বখশকে আনতে। কারণ সে নাযেমে আলার সন্তান হওয়ায় তিনি আসতে না করবেন না। তাঁরা আমাকে মরহুম ইউসুফ মিয়ার গাড়ি নিয়ে বাঁশখালী পাঠান। মাগরিবের আগে আমি মাওলানা এলাহি বখশের বাড়ির সামনের রাস্তায় পৌঁছে তাঁকে ধীর পায়ে পায়চারি করতে দেখে আমি গাড়ি থেকে নেমে সালাম দিয়ে তাঁকে চুনতি সিরাত মাহফিলে নিতে আসার কথা জানাতে তিনি বলেন, আমি তো অসুস্থ তাই যেতে পারিনি। তখন আমি তাঁকে আমার পরিচয় জানাতেই তিনি বলে উঠেন তুমি তো আমাকে বেকায়দায় ফেলে দিলে। এতো বড়ো বুযর্গ আলেমের সন্তান তোমাকে তো ফেরত দিতে পারি না। তবে শর্ত আছে, বললাম আমি রাজি। তিনি বললেন দশ কেজি ওজনের একটা সমুদ্রের মাছ রান্না চলছে; মাগরিবের নামাজান্তে একসাথে খেয়ে রওয়ানা দেবো, ইন শা আল্লাহ। এমন এক মহান আল্লাহর ওলীর সাথে বসে আহার করতে পারাকে আমি নে'মত মনে করলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি আমাকে পূর্ব থেকেই বাবার কারণে স্নেহ করতেন এবং আমাকে দুর্লভ অনেক দুআ শিখিয়েছেন। ওলামায়ে কেরাম এবং অনেক পীর-আউলিয়ার অজানা ইতিহাস শুনিয়েছেন। তবে বার্ধক্যের কারণে পরিচয় বলতে হতো। আমরা মাগরিবের নামাজান্তে খাওয়া-দাওয়ার পর চুনতির উদ্দেশ্যে বের হই। বাইঙ্গাপাড়া মাদরাসা জলদি আসতেই তিনি বললেন মাওলানা শফিক সাহেবকেও নিয়ে যাই, বললাম ঠিক আছে। তবে আমি তাঁকে আগে কখনো দেখিনি, আমাকেও তিনি চিনেন না। বাইঙ্গাপাড়া মাদরাসায় পৌঁছার পর এশার আযান হলো, আমি ওযু করার জন্য পুকুরে যেতে চাইলে মাওলানা শফিকুর রহমান বরং ওযুর পানি আনিয়ে আমাকে ওযু করতে দিলেন; বললেন এতো বড়ো আলিম ও জ্ঞানসাধকের ছেলেকে তো সম্মান

দেখাতেই হয়। রাত ১১টার পর মাহফিলে পৌঁছুলাম আমরা। পরের দিন আবার বাঁশখালী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও আমার ওপর বর্তালো। যেহেতু একদিন পর দু'দিনের হরতালের ঘোষণা পূর্ব নির্ধারিত ছিলো তাই পরের রাতে মাওলানা মুসলিম খানের মাইক্রোবাস নিয়ে বাঁশখালীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। আমরা যখন সাতকানিয়ার দেওদীঘি বটতলায় পৌঁছি তখন রাত ১টা। (যেখান থেকে আল্লামা ফজলুল্লাহ সড়ক নির্মিত হয় ১৯৯৬ সালে, বর্তমানে এটি বাঁশখালীর সদর আমিনহাটে গিয়ে উঠার জন্য কাজ চলছে) তখনই শাহ মাওলানা শফিকুর রহমান (রহ.) ও শাহ মাওলানা এলাহি বখশ (রহ.) একসাথে বলে উঠলেন এদিকেই তো নাযেমে আলা সাহেবের বাড়ি। চলো তোমাদের বাড়ি যাবো, তোমার আম্মাকে একটু সালাম জানিয়ে আসি। বাড়িতে পৌঁছে আমাকে দিয়ে আম্মার কাছে সালাম পৌছালেন, আম্মা তখন খুবই অসুস্থ। তাঁদেরও আম্মার সালাম পৌঁছুলাম। আম্মার অসুস্থতার সংবাদ শুনে তাঁরা অনেকক্ষণ দুআ করলেন। চা-নাস্তা খেয়ে বাঁশখালীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। ভোর চারটায় আমি চুনতি ফিরে আসি। এটি ছিলো আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্য ও স্মরণীয় সময়। কারণ এ সুযোগে আমি তাঁদের পড়ালেখা, কর্মজীবন, তাঁদের পীর ও তরিকতের সিলসিলা খিলাফত লাভ, তাঁদের ইতিহাসসহ বিভিন্ন জ্ঞানমূলক বিষয় খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানার চেষ্টা করি। তাঁরা আমাকে অত্যন্ত সস্নেহে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। বিভিন্ন আলেম-ওলামার আলোচনা আসলে সেখানে বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) বিষয়ে তাঁরা বলেন, এমন সর্ববিষয়ে পারদর্শী আলেম হাতে গোনা কয়েকজনের মধ্যে তিনি শীর্ষে। চুনতিতে তাঁরা দু'জন শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.)-এর কবর জিয়ারতের পর সকালে তাঁরা দু'জন আমাকে নিয়ে বাবার কবর জিয়ারত করেন। এমন দু'জন শীর্ষ আলেম ও বুযর্গ ব্যক্তিত্ব একজন ছাত্র (কামিলের) হবার পরও আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন এবং স্নেহ করেছেন তা একমাত্র বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) কারণেই প্রাপ্তি।

খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দীক আহমদ (রহ.) তাঁর বেয়াই, আমাদের শ্রদ্ধেয় চাচা বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন অধ্যক্ষ ডাক্তার মাওলানা হাবীবুল্লাহর (রহ.) বাড়িতে বেড়াতে এলে আমি ও বড়োভাই মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া তিরমিযী শরিফের তরজমার পাণ্ডুলিপিটি (তখন সেটা কি আমরা বুঝতেছি না বিধায়) তাঁকে দেখাই। তিনি বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ সহকারে পড়ে বললেন, এটি ছাপাতে পারলে বেশি ফায়দা হবে। সাথে সাথে মন্তব্য করলেন, "এই দইন চাটগাঁত তেঁইর নান হলম শক্ত আলেম আর কেয়ায় নাই" (দক্ষিণ চট্টগ্রামে তাঁর মতো ভালো লেখক সমকালীন আলেমদের মধ্যে আর কেউ নেই)। সময়ের ব্যবধানে বাবার লেখাগুলো যখন পড়তে এবং বুঝতে শুরু করলাম তখনই উপর্যুক্ত উক্তিগুলোর কিছুটা মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হলাম যে, সমকালীন সময়ে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) শুধু চট্টগ্রাম নয়, পুরো বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের মধ্যে অন্যতম। তবে সেভাবে প্রচারিত নয় বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)। এর দু'টি কারণ: বাবার একজন কৃতী ছাত্র বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, সাবেক উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক বলেন, "আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন নেপথ্যচারী তথা প্রচারবিমুখ, যেমন তিনি একটি কবিতা লিখে কোনো শিক্ষার্থীকে দিয়ে আবৃত্তি করিয়েই প্রশান্তি লাভ করতেন। সেটি আর প্রকাশের প্রতি মনোযোগী হতেন না"। বাবার আরেক কৃতী ছাত্র, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য

প্রফেসর ড. আহসান উল্লাহ (আহসান সাইয়েদ) বলেন, "আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) আলিম ও *শিক্ষাবিদ হিসেবে সুনাম অর্জনের পাশাপাশি* লেখালেখির ময়দানেও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। সমকালীন সময়ে ঢাকা-চট্টগ্রামের অন্যান্য অনেক ওলামা লেখালেখির মাধ্যমে সুখ্যাতি অর্জন করলেও আল্লামা ফজলুল্লাহর প্রচারণা সেভাবে হয়নি। কারণ, তাঁরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান করলেও আল্লামা ফজলুল্লাহ অবস্থান করতেন চট্টগ্রাম শহর থেকে ৪০ মাইল দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চল চুনতি গ্রামে। তৎকালে যোগাযোগ-ব্যবস্থা ছিলো একেবারেই অনুন্নত। যে কারণে গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করা, গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করা সহজসাধ্য ছিলো না। তারপরও তাঁর সাহিত্যের তাড়না, জাতির চিন্তা ও বাঁধভাঙ্গা প্রতিভা সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে তিনি মসি চালিয়েছেন। প্রকাশকের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তাঁর হাত দিয়ে রচিত হতো আরো অনেক মূল্যবান গ্রন্থ"।

বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সাথে চুনতি মাদরাসা ছাত্রাবাসে এক বছর থেকে যে সকল ইসলামি ব্যক্তিত্বকে দেখেছি এবং তাঁর ইন্তেকালের পর ওস্তাদবৃন্দ, বিভিন্ন মাহফিলের শীর্ষস্থানীয় ওলামাগণের তাঁর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য, তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিকমানের চেতনা, উদারতা ও আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে শুনে আসলেও বাবাকে পরিমাপের সে যোগ্যতা তখনো গড়ে ওঠেনি আমার। কিন্তু বিভিন্নজনের কাছ থেকে জেনে বাবার রচিত বেশ কিছু বই, পাণ্ডুলিপি, ৫০/৫৫ বছর পূর্বে প্রকাশিত কিছু বইয়ের কপি এবং তাঁর রচিত কিছু শে'র (কবিতা) সংগ্রহ করে সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। এরপরও বাংলায় রচিত একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি, লাহোর থেকে প্রকাশিত ايساغوجي ও كشف الجلالين এবং শিকওয়া ও জাওয়াবে শিকওয়ার কপি সংগ্রহ করা যায়নি। তাঁর রচিত আমার দেখা ও শোনা অনেক কবিতা ডায়েরিতে নেই। বাবার ইন্তেকালের মাত্র মাস দুয়েক আগে মাদরাসার সভায় শোনা বাবারই আবৃত্তি দুটি পঙক্তি:

ایک طرف ہے شمع روشن ایک طرف ہے شمع رو

بیچ میں دو شمع کے جگنو بنو کیا ضو فشاں

তখন আমি স্টেইজ থেকে ৪টি ইভেন্টে পুরস্কার গ্রহণ করেছি। ইন্তেকালের পূর্বরাতে আমাদের গ্রামের বাড়িতে বাবার ছাত্র মাওলানা ছরওয়ার কামালের আবৃত্তি:

محمد محمد و نور محمد کہ جس سے خلائق برستی رہی تھی

এছাড়াও কক্সবাজারসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিনিধি এসে বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) কাছ থেকে ১৯৭৮ সালে অন্তত ৮/১০টি উর্দু ও বাংলায় রচিত কবিতা নিয়ে যেতে দেখেছি যা বাবার ডায়েরিতে নেই, আমাদের সংগ্রহেও না। এরমধ্যে বড়হাতিয়ার 'জবলে সিরাত' উপলক্ষে রচিত বাংলা কাব্যের একটি চরণ মনে পড়ছে:- "ধন্য ধন্য ধন্য তোমরা বড়হাতিয়ার অধিবাসী"।

জানতে পেরেছি কয়েকশ শে'রের একটি ডায়েরি নাকি বাবার সময়ই উইপোকা নষ্ট করেছে। যাহোক, বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহ কতো উঁচু স্তরের আলিম, লেখক, মুফতি, মুহাদ্দিস, কবি, সাহিত্যিক, আধুনিকমনা ইসলামি চিন্তাবিদ এবং বিশ্ব মুসলিম দরদী ছিলেন তাঁর লিখনী পড়ার

মাধ্যমে কৈশোরে তাঁর ব্যাপারে বিশিষ্টজনদের কাছ থেকে শ্রুত উপরিউক্ত কথাগুলোর যথার্থতা মোটামুটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। তবে তাঁর লিখনীর ভাব ও ভাষা, চিন্তা ও চেতনা এতো উচ্চাঙ্গের যে, বোদ্ধাজনরাই তা পুরোপুরি অনুধাবনে সক্ষম হবেন। বিশেষ করে তাঁর শে'রসমূহ।

শে'রসমূহ সহজবোধ্য নয় বটে; তবে একেবারে অবোধ্যও নয়। ভাষাজ্ঞান যাঁদের সীমিত তাঁদের জন্য তাঁর কবিতা হৃদয়ঙ্গম করা দুর্বোধ্য। তাঁর বর্তমান কবিতামালার ছাপানো বই এর কলেবর ২৪৩ পৃষ্ঠার। তাঁর কাব্যভাণ্ডারে হরেক শ্রেণির কবিতার সমাহার রয়েছে। যেমন, হামদে বারী তাআ'লা, না'তে রাসুল (সা.), মুনাজাত, মুসলমানদের প্রতি আহ্বান, মযলুম কাশ্মিরী মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতা, মার্সিয়া বা শোকগাথা, দেশাত্মবোধক, ইসলামি জাগরণী কবিতা, শিকওয়া ও মুহাব্বত, নৈসর্গিক দৃশ্যের প্রতি অনুরাগ, উপলক্ষীয় কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে ছন্দোবদ্ধ, চমৎকার ও আকর্ষণীয় কবিতা রচনা করেছেন তিনি। ছন্দ, ঝংকার, আঙ্গিক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অলংকরণ প্রভৃতি দিক দিয়ে তাঁর কবিতাগুলো অতি উচ্চাঙ্গের আরবি, ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যের সাথে তুলনীয়। একজন বাঙালি হয়ে ভিনদেশী ভাষায় এত স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল গতিতে কবিতা রচনা করাটা চাট্টিখানি কথা নয়। তাঁর কবিতা পর্যালোচকদের দৃষ্টিতে বিষয়বস্তু ও সাহিত্যের প্রতিপাদ্য, জীবন দর্শন ও জগৎ এসকল ময়দানে আল মুতানাব্বি, শেখ সা'দী, শেক্সপিয়র, ইকবাল ও নজরুলের মতো আল্লামা ফজলুল্লাহও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর উর্দু কবিতাসমগ্র ইকবাল, গালিব, আকবর ইলাহাবাদি ও জোশ মালিহাবাদির সমপর্যায়ের।

নিচে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক রচিত তাঁর কবিতার কিছু পঙক্তি উল্লেখ করছি।

হাম্‌দ বারি তা'আলা حمد باری تعالی

اے ذات پاک بے چوں اے خالق برایا — بے ضد و ند و ہمتا عالم کو ہے سجایا

صنعت تری نمایاں ہر برگ و بار میں ہے — ہر بحر و بر بنایا فرش زمیں بچھایا

না'তে রাসুল (সা.) نعت رسول ﷺ

سکون قلب مضطر راحت دلدادگاں تم ہو — حبیب خالق عالم ہو پھر جان جہاں تم ہو

نہ ہوتے تم نہ ہوتی خلقت ارض و سما ہرگز — مراد ہر دو عالم باعث کون و مکاں تم ہو

অন্য একটি না'ত

لبوں پہ تبسم ہیں چہرے میں جلوے نگاہوں سے شفقت برستی رہی تھی

اک اک لفظ شیریں جوان کی زباں سے ہو سننے کو خلقت ترستی رہی تھی

وہ فتار و گفتار و عادات و اطوار و گفت و شنید و ریاضت، رفاقت

ہر اک چیز دشمن کا دل موہ لیتی محبت سبھی دل میں بستی رہی تھی

গজল غزل

وہ حسن جفا خو، یہ عشق وفا جو — وہ کبر خفا خو، یہ عجز رضا جو
ہیں ایسی ستمگاریاں مہ جبینوں کی — جو میں خموشی میں سہتا رہا ہوں

মর্সিয়া বা শোকগাথা مرثیہ

اے گلستان ارم ارض حسین چاٹگام — اے جبال چاٹگام و سر زمین چاٹگام
اے بحار چاٹگام و ماء وطین چاٹگام — اے مکان چاٹگام وائے مکین چاٹگام
تیرا وہ فرزند اختر تاباں کہاں؟ — وہ چراغ خاندان میر نور افشاں کہاں؟

দেশাত্মবোধক وطن کے سپاہی

بڑھے چل خراماں وطن کے سپاہی — وطن کے نگہبان وطن کے سپاہی
بڑھے چل بڑھے چل چلن تیری دلکش — تو عزت کا ساماں وطن کے سپاہی

শিক্ষামূলক কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি خطاب بطلبۂ مدرسہ

نوجواں مرد مسلمان مسلم باکار بن — سعی پیہم، فطرت جولان چو پرکار بن
ہمچو پروانہ لپٹ جانور قرآن سے لپٹ — شوق سے چن چن لے نور اور مطلع انوار بن

ইসলামি জাগরণীমূলক কবিতার দু'টি পঙ্‌ক্তি خطاب بہ مسلماناں

اے مسلمان تو بیدار مسلماں ہو جا — اور دل و جان سے تو حامیٔ قرآں ہو جا
ہے مسلمانان تو ہے عالم ہستی تیرا — اوج افلاک کی خاطر تو پر افشاں ہو جا

একটি প্রস্ফুটিত ফুলকে সম্বোধন خطاب بہ گل شگفتہ

اے گل تیرا یہ حسن دلکش کہاں سے آیا — یہ بو کدھر سے آئی یہ رنگ کیسے لایا
بے جان تو ہے خود پھر یہ دلبری ہے کیسی — جانوں کو موہ لینا یہ گن ہے کس سے پایا
یہ لطف و یہ نزاکت من موھنی یہ صورت — کس نے تجھے ہے بخشی کس نے تجھے سجایا
ہنستا ہے تو چمن میں گلشن کو بھی ہنساتا — بے جان شئ ہو کیسے بلبل کو پھر رلایا

ইসলামি জাগরণী কবিতা

বিশ্ব মুসলমান! বিশ্ব মুসলমান!! বিশ্ব মুসলমান!!!
প্রেম পথের অভিযানে মহানবির গুলিস্তানে
শরীআ'তের সংবিধানে, তরিকতে হও আগুয়ান
বিশ্ব মুসলমান! বিশ্ব মুসলমান!!
বিশ্বের বাজারে তোরা জাতি ছিলে সর্বসেরা
তোদের প্রশংসাতে সারা দুনিয়া ছিলো আত্মহারা
আজ কেন এই হাবুডুবু মুহ্যমান
বিশ্ব মুসলমান ! বিশ্ব মুসলমান !!

কবিমনের অবস্থা : দুটি পঙ্‌ক্তি حال دل

وہ دعاؤں کا جو تھا سلسلہ قائم نہ رہا — دل کے جذبات میں پہلا سا تلاطم نہ رہا
بلبل نغمہ سرا کا جو گلا گھونٹ دیا — رنگ گل پر جو تھا اس کا وہ ترنم نہ رہا

কতেক উপদেশ پندے چند

ایک بلبل تھا چمن میں ہزاروں داستاں — پر نہیں اس کے ہوئے تم جان و دل سے قدرداں
اے گلِ خاموش تیرا کون ہو اب نغمہ خواں — کون ہو گا نکتہ دس اور نکتہ سنج و نکتہ داں
اپنے گُن پر، حسن پر بیخود رہا نازاں رہا — یاد رکھ ہے حسنِ ظاہر چندہ روزہ میہماں

আরবি ভাষায় রচিত দীর্ঘ স্বাগতিক কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি

كلمة الترحيب

تبا لحساد العرب تبا لهم — قوم اليهود وكل ذراري الشيطان
قد قدمتم وأنتم أجلة في الشأن — بقدومكم شرفتمونا كل السكان
لنحبكم بحب رسولنا المصطفى — ولحبكم والله جزء الإيمان
لنؤ قر سكان ديار حبيبنا — ويعزهم كل من أهل الاتقان

কবিতা ছাড়াও তাঁর হস্তলিখিত কয়েকটি চিঠি রয়েছে, সংক্ষিপ্ত হলেও যার ভাষা অত্যন্ত উঁচুমানের এবং এতে এমন উপদেশাবলী রয়েছে যাতে একজন মানুষ ভালো মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় মূল উপাদানগুলো বিদ্যমান। চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার

তোলাবায়ে সাবেকীন তথা প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের ১৯৬২ খৃস্টাব্দের একটি সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তিনি উর্দু ভাষায় ১৫ পৃষ্ঠা সংবলিত একটি লিখিত ভাষণ প্রদান করেছিলেন। এ ভাষণ উর্দু সাহিত্যে তাঁর কল্পনাতীত পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। অপরদিকে এতে রয়েছে তাঁর ঈমানি চেতনা, আন্তর্জাতিক চিন্তাধারা, সংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণা এবং ইতিহাস বিশ্লেষণে তাঁর দক্ষতার বিশেষ প্রকাশ। উক্ত ভাষণকে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক বলা চলে।

হযরত উমর (রা.)-এর খলিফা হিসেবে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রথম ভাষণের সূত্র টেনে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) বলেন,

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله[১]

এই আয়াত অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরাম রাসুলে মাকবুল (সা.)-এর, তাবেয়ীগণ সাহাবায়ে কিরামের এবং তাবেয়ীগণ, তাবে তাবেয়ীগণের একনিষ্ঠ অনুসরণ করেন। অর্থাৎ তাঁরা কুরআনের বাস্তব প্রতিচিত্র ও রাসুলের আদর্শের জীবন্ত নমুনা হয়ে ইসলামের আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। এ বিষয়ে আল্লামা ফজলুল্লাহর বক্তৃতার একটি খণ্ডিত অংশ নিম্নে উল্লেখ করছি,

یہ حضرات تعلیمات قرآن کے پیکر عمل ہو کر اور اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجسم تصویر بن کر اس دار العمل دنیا میں اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر چاروں طرف بکھر پڑے' ان کی ہر ادا محبوب و مرغوب تھی' اور شیوہ دلاویز تھا ایمان و اتقان' اخوت واتحاد' مساوات و مواسات' ایثار واعتبار' امانت و دیانت' صداقت و محبت' زہد و تقوی' خشیت وعبادت' عزم واستقلال' سخاوت وشجاعت' عدل و انصاف' رحم و کرم' نصیحت وخیر خواہی' حسن معاملات و خجستگی' آداب معاشرت' ودیگر تمام خوبیاں اسلام کی ان کے اسلوب زندگی کے اندر نمایاں تھیں' ان کے تمام جد واجتہاد' رزم وجہاد اپنی کسی غرض نفسانی کی خاطر نہ تھے بلکہ ان کا شیوہ **(قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین)** تھا. ان کے دلوں میں علوم آلہیات کے ساتھ سوز محبت تھی یعنی جذبات ایمانی موجزن تھے. اس لئے ان کے اعضاء جوارح سے کوئی ایسا کام صادر ہونا مشکل تھا جو رضائے الٰہی کا خلاف ہو کیونکہ قلب مدبر جسم ہے۔

علم مسلم کامل از سوز دل است　　معنی اسلام ترک آفل ست

چون زبند آفل ابراہیم رست　　درمیان شعلہ ہا نیکو نشست　(اقبال)

হৃদয় জ্বলন পূর্ণ করে মুসলমানের জ্ঞান + পতিত হওয়ার ভয় পরিহার করাই ইসলাম

ইবরাহীম গেলেন যখন ভয় ছাড়া পড়ে + স্ফুলিঙ্গের মাঝেই থাকেন আরামে বসে।

(ইকবাল)

"তিনি বলেন, তাঁদের (সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন) প্রতিটি চলন-বলন, আচার-আচরণ, অভ্যাস-অভিরুচি ছিলো আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর। ঈমান-অবিচলতা,

---

[১]. সুরা আলে- ইমরান, আয়াত নং – ৩১

ভ্রাতৃত্ব-সংহতিবোধ, সাম্য ও পরার্থপরতা, শিক্ষা ও সততা, ধার্মিকতা ও সত্যবাদিতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, তাকওয়া-পরহেযগারি, ইবাদত, খোদাভীতি, দৃঢ়তা ও স্বাতন্ত্র্য, ঔদার্য, সাহসিকতা ও বীরত্ব, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার, দয়া ও মহানুভবতা, সদুপদেশ ও জনহিতৈষণা, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ও কল্যাণকামিতা, অনুসন্ধিৎসা, সৌজন্যবোধ এবং অন্যান্য ইসলামি গুণাবলীতে তিনি ছিলেন দীপ্তিমান। তাঁর দৃঢ়তা, ক্ষিপ্রতা, লড়াই-সংগ্রাম কোনোটাই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিলো না। বরং তাঁর জীবন চরিত ছিলো কুরআনের বাণী- "বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত" এ আয়াতের প্রতিবিম্ব। এসব মনীষীর আল্লাহর জ্ঞানজ্যোতির পাশাপাশি ভালোবাসার উত্তাপ অর্থাৎ ঈমানের স্পৃহা থাকে তরঙ্গমুখর। ফলে তাঁদের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা এমন কোনো কাজ সংঘটিত হওয়া বড়োই কঠিন যা আল্লাহর সন্তুষ্টির বিপরীত হয়। কারণ, অন্তর তো শরীরের নেপথ্য সঞ্চালক।"

সবশেষে, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, 'আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আমার শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এমপির নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে "كليات فضل الله" এবং প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এমপি-রচিত القواعد الفقهية (আরবিতে) কুয়েত ধর্ম মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থখানি বর্ধিত কলেবরে আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি 'যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম', 'কাদিয়ানিবাদ' (বাংলা, আরবি, উর্দু), سنن الترمذي- এর كتاب الطهارة ও كتاب الصلوة অংশের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (উর্দু) "الدرر البهيّ فى شرح الجامع للامام الترمذي", "الدروس الصرفية" (বাংলা, আরবি, উর্দু) الدروس النحوية (বাংলায়) এগুলোর মতো আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-রচিত ও অনূদিত গুরুত্বপূর্ণ অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলি 'আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনে'র মাধ্যমে দ্রুত প্রকাশের লক্ষ্যে কাজ চলছে। উপর্যুক্ত গ্রন্থাবলি বিজ্ঞ পাঠকমহলের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

মহান আল্লাহ উক্ত প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং শ্রদ্ধেয় বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) লিখনীসমূহের বিনিময়ে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান দান করুন। আমিন!

সাক্ষাৎ ও অভিব্যক্তি

হাফেজ মাওলানা আব্দুর গফুর

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যেই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সে মহান সত্তার ওপর, যাঁর পরে কোনো নবী নেই; এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের ওপর, যারা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। অতঃপর...

হযরতুল আল্লাম মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) : বঙ্গভূমির সেসব মনীষী ব্যক্তিত্বের অন্যতম, যাঁরা জাতির কণ্ঠস্বর, খতিবে আজম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) এবং কুতবে জামান, মুর্শিদে বরহক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি আযীযুল হক (রহ.) এর প্রিয়ভাজন ছিলেন। ঢাকা পতনের (স্বাধীনতা যুদ্ধের) পূর্বে আমি তাঁর সম্পর্কে জানতাম না। ১৯৭৩ সাল থেকে তাঁকে জানতে শুরু করি। বন্ধুবর ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ও স্নেহাস্পদ আ হ ম জাহেদ হোসাইনের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে। ১৯৭৫ সালে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর সঙ্গে আমার সর্বপ্রথম সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়। অনুজ ও স্নেহাস্পদদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা দেখে আমি বেশ প্রভাবিত হই। তখন 'আল্লামা'র কাছে আমি শুধু একটি কথাই জানতে চেয়েছিলাম। তা এই যে, আমাদের বেরেলভি ঘরানার ওলামায়ে কেরাম তো রাসুলকে (সা.) 'আলিমুল গাইব' মনে করেন। আল্লাহ ছাড়া কি আর কেউ 'আলিমুল গাইব' হতে পারেন? এটা কি 'শির্ক ফিস-সিফাত' নয়?

তখন তিনি আমাকে জিগেস করলেন, আল্লাহর জন্যে কি কোনো কিছু গায়েব হতে পারে? আমি বললাম, সেই গায়েব বলতে ما غاب عنا উদ্দেশ্য। এবার তিনি বললেন, তাহলে তো কোনো-কোনো ما غاب عنا-র ব্যাপারে আমাদের রাসুল (সা.)-ও জানতে পারেন। فلا يظهر على غيبه أحدا এরপরে إلا من ارتضى من رسول অংশটি নিয়ে কি কখনো চিন্তাভাবনা করেছো তুমি? কোনো কথায় 'তাবিল' (ব্যাখ্যা প্রদান)-এর সুযোগ থাকলে 'তাকফির' (কাফের বলে ফতোয়া দেয়া) ও 'তাদলিল' (পথভ্রষ্ট বলে ফতোয়া দেয়া)-এর অনুমতি নেই। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা চাই। সেদিনের আলাপে আমি তাঁর গভীর দৃষ্টির পাশাপাশি তাঁর উদার মানসিকতারও প্রমাণ পেয়েছিলাম। যার ফলে আমি তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ি। সত্যিই, তিনি একজন উদার, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুদক্ষ আলেম ছিলেন এবং তিনি নববী-চরিতের বিপুল মাধুরী পেয়েছিলেন। যা সত্যিই ঈর্ষণীয়!

দ্বিতীয় সাক্ষাতের অভিব্যক্তি

আল্লামা (রহ.)-এর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাত হয় ১৯৭৬ সালে। যেহেতু আমি আল্লামা ফজলুল্লাহকে (রহ.) কেবল একজন ধীমান ব্যক্তিই ভাবতাম না; বরং তাঁকে আমি পবিত্র কুরআন অধ্যয়নে আগ্রহী বিশিষ্ট আলেমদের অন্যতম মনে করতে শুরু করেছিলাম। তাই আমি আমার অবসরকে মূল্যবান জ্ঞান করে 'মুশকিলাতুল কুরআন' (পবিত্র কুরআনের দুর্বোধ্য জায়গা)-গুলোকেই আলোচ্য বিষয় করার মনস্থ করলাম। তাই এবারের সাক্ষাতে আমি সুরা নিসা'র ৩নং ও ১২৭নং আয়াত; সুরা সোয়াদ-এর ৩১-৩৫নং আয়াত এবং সুরা ইউসুফের

২৪নং আয়াতকে আলোচনার জন্যে চয়ন করলাম। পাঠকের মানসিক বিরক্তির কথা মাথায় রেখে এখানে আমি উপর্যুক্ত সুরা তিনটির আয়াতসমূহের ওপর হওয়া আলোচনার সার-সংক্ষেপই কেবল তুলে ধরছি।

(ক) সুরা নিসার ৩নং ও ১২৭নং আয়াত

"وإن خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الخ"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ৩নং আয়াতে 'আন-নিসা' দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এবং ১২৭নং আয়াতে **"ويستفتونك في النساء قل اللهم يفتيكم فيهن وما يتلى في الكتاب في يتامى الناس الخ"** অংশে সুরা নিসার কোন অংশের উদ্ধৃতি? আল্লামা (রহ.) বলেন, 'আন-নিসা' শব্দের লামকে আহদি হিসেবে নিয়ে বললেন, তারা হলেন 'উম্মুহাতুল ইয়াতামা' এবং 'ইয়াতামান-নিসা' থেকে উদ্দেশ্য হলো ওসব এতিম সন্তান, যাদের সংশ্লিষ্ট মহিলাগণ অর্থাৎ মায়েরা আছেন। এমন এতিমদের সুবিধার্থে সমীচীন হলো, তাদের মায়েদের যেনো দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার করে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি আরো বললেন, পবিত্র কুরআনে একাধিক বিয়ের বিধান 'হুকুকুল আইতাম'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

(খ) সুরা সোয়াদ এর ৩১-৩৫নং আয়াত: সুরা সোয়াদের ৩১নং আয়াত **"إذ عرض عليه بالعشي الصفنت الجياد فقال إني احببت حب الخير عن ذكر ربي ....."** তারপর ৩২ নং আয়াত **"حتى توارت بالحجاب ردوها على فطفق مسحا بالسوق ."** **"والأعناق** এখানে উল্লিখিত যামায়ের এর মারজা হলো ঘোড়া। এবং **' عن ذكر ربي '** কে **". من ذكر ربي."** এর অর্থে ধরে তিনি যাবতীয় ইশকাল-আপত্তি দূর করে দিলেন। এখানে সুলায়মান (আ.)-এর প্রসঙ্গটি, মহান আল্লাহ থেকে তাঁর অমনোযোগিতা নিয়ে নয়; বরং আল্লাহর নেয়ামতরাজির ওপর তাঁর শুকরিয়াজ্ঞাপনেরই বর্ণনা হিসেবে এসেছে।

(গ) ৩৩নং আয়াত **"ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب"** এখানে শানে নুযুলের বর্ণনার আলোকে সম্ভাব্য ব্যাখ্যার যেসব আপত্তি রয়েছে, তা শোনার পর তিনি বললেন, সুলায়মান (আ.)-এর কোনো স্ত্রীর পূর্ণ বা অপূর্ণ সন্তান প্রসবের আলোচনা হিসেবে **". على كرسيه"** টেক্সটির সামঞ্জস্য কই? বরং এটা সুলায়মান (আ.) এরই বিশেষ এক অবস্থার বর্ণনা হতে পারে। তা এভাবে যে, সুলায়মান (আ.) স্বীয় সিংহাসনে ভিতর-বাহিরের বিভিন্ন ফেতনার ফলে এমন এক করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যে, তিনি তাতে নিঃসাড় দেহের মতো পড়ে রইলেন! আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাশৈলী থেকে এটাই বোধগম্য হয়। যেহেতু এরপরের আয়াতেই সুলায়মান (আ.) দোয়া করছেন এভাবে যে, **" رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب."** এর দ্বারা তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যায়। এবং এর প্রেক্ষিতে সুলায়মান (আ.) এর দোয়াও কবুল হলো। বাতাস ও জিন জাতিকে তাঁর অনুগত করে দেয়া হলো।

(ঘ) সুরা ইউসুফের ২৪নং আয়াত সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর:

একই বৈঠকে সবশেষে-করা প্রশ্নটি ছিলো, সুরা ইউসুফের ২৪নং আয়াত **" ولقد همت به وهم بها لولا"** এর তাফসিরে বলা হয়ে থাকে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-ও ইচ্ছেপোষণ করেছিলেন

অথবা কিছুটা কুমন্ত্রণা তার মনেও সৃষ্টি হয়েছিলো। এর ফলে 'ইসমতে আম্বিয়া'-এর আকিদাটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে?

সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি এর উত্তরে বলেন: وهم بها لولا ان راى ربه এখানে " ."هم بها" "لولا" এর জওয়াবে মুকাদ্দামা। যার মাধ্যমে ইউসুফ (আ.) এর মনে ইচ্ছে বা কুমন্ত্রণা সৃষ্টি না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায় এবং এখন আর কোনো আপত্তিও থাকলো না।

আল্লামার সঙ্গে আমার তৃতীয় সাক্ষাত

এ সাক্ষাত সম্ভবত ১৯৭৭ সালে হয়েছিলো। যাতে 'মুশকিলাতুল কুরআন' সংক্রান্ত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আলোচনায় আসে।

(ক) "فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ايتها العير أنكم لسارقون."

সাধারণত এ আয়াতের অর্থ এই ধরা হয় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) সামান প্রস্তুত করে দেয়ার পর শাহী পেয়ালা নিজ ভাইয়ের উটের হাওদায় রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি এই বলে এলান করান যে, 'তোমরা চোর'। অথচ এভাবে নিজে পেয়ালা রেখে অন্যের ওপর চুরির অপবাদ দেয়া শানে নবুয়ত এমনকি মনুষ্যত্ববোধেরও বিপরীত!

এই 'ইশকাল' বা আপত্তিটা তাঁর সামনে তুলে ধরলে তিনি বলেন, " "جعل السقاية" এখানে এরও অবকাশ রয়েছে যে, এটা ছিলো ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের কর্ম। এবং এটাই তুলনামূলক শক্তিশালী সম্ভাব্য দিক। যেহেতু প্রথমত 'তাযহিয' বা জিনিসপত্র দিয়ে দেয়ার পর সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে এমনটা করা কোনোক্রমেই সহজ নয়। যেহেতু এখন মাল কাফেলার হাতে। হ্যাঁ, তবে এরা নিজেরাই কোনোকিছু চুরি করে কোনো হাওদায় রেখে দিলে– তা খুবই যুক্তিসঙ্গত ও সহজ বটে! সবশেষে আল্লামা (রহ.) বলেন যে, " هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون" এ আয়াতে বিনইয়ামিনের বিরুদ্ধে চক্রান্তের যে বর্ণনা রয়েছে, তা এও হতে পারে যে, তারা নিজেরাই পেয়ালা চুরি করে বিনইয়ামিনের হাওদায় রেখে দেয়– ধরা পড়লে যাতে বিনইয়ামিনেরই বদনাম হয় এবং ঘরে নিয়ে গেলে যাতে পেয়ালাটি বিনইয়ামিনের হাওদা থেকে পিতা ইয়াকুব (আ.) এর সামনে বের করে শাহী পেয়ালা চুরির অপবাদ দিয়ে পিতার চোখে তাকে ছোট করে দেয়া যায়।

(খ) " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس الآية" দ্বিতীয় দুর্বোধ্য জায়গা যেটি এ সাক্ষাতে আলোচিত হয়, তা হলো সুরা নিসার ১২নং আয়াতের এ অংশ। এ আয়াত সম্পর্কে তাঁকে জিগেস করি, আয়াতের তাফসির ও ব্যাখ্যায় অনুবাদক ও আহলে ফারায়েজবৃন্দ যেসব ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন, তাতে দু'টি আপত্তি রয়ে যায়। ১. أخ أو أخت কে আখয়াফি হিসেবে নেয়া। অথচ এর কোনো প্রমাণ নেই। ২. أخ أو أخت এর উদ্দেশ্য যা-ই হোক– বণ্টন যদি এমন হয় তখন "وإن كان كلالة وله أخ أو أخت" টেক্সটই যথেষ্ট। "رجل، يورث أو امرأة" এসব টেক্সট অতিরিক্ত বৈ কিছু নহে! যা মহান আল্লাহর বাণীর শানের অনুপযোগী। বরং তা যেকোনো মর্যাদাপূর্ণ কথার শানেরও বিপরীত।

তখন আল্লামা (রহ.) সঙ্গে-সঙ্গেই বললেন, মোল্লা জিয়ুন (রহ.) এর আত-তাফসিরাত আল-আহমদিয়া গ্রন্থে বর্ণিত তাফসিরে "يورث" ক্রিয়াপদটিকে মুজাররাদ থেকে না নিয়ে বাবে

ইফআল থেকে নেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় رجل أو امرأة নায়েবে ফায়েল এবং كلالة মাফউলে সানি হবে। এবং وله أخ أو أخت হাল হয়ে কইদ হবে। এবং এ অবস্থায় এটা মৌরসী উত্তরাধিকারীর বদলে আহদি উত্তরাধিকারীর বর্ণনা হয়ে যায়।

এই তাফসিরের আলোকে আয়াতের অর্থ হবে এমন যে, যদি কোনো পুরুষ বা নারীকে কোনো كلالة এর উত্তরাধিকারী বানানো হয়, তখন ওই কালালাহ ভাই-বোনের মতো মৌরসী উত্তরাধিকারী থাকার সুরতে একা হলে সুদুস বা এক ষষ্ঠাংশ; একাধিক হলে সুলুস বা এক তৃতীয়াংশের শরিক হবেন।

সাক্ষাতগুলোর সময়ে আমার বয়স এমন ছিলো যে, তখন আমি মানসিকভাবে পরিপক্ব বা বালেগ হইনি। আহ! আমার যদি কয়েক বছর তাঁর সান্নিধ্যে কাটানোর সৌভাগ্য হতো, তাহলে হয়তো মহান ইলাহির অপার ফজল থেকে কিছুটা অংশ আমিও পেয়ে যেতাম!

যুগশ্রেষ্ঠ এ মনীষী ও কুতবে জামান– যা আমি লেখার শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, এ দেশের অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য ওলামায়েকেরাম ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ। এবং তাঁর সঙ্গে হওয়া সাক্ষাতগুলোর মাধ্যমে আমি বুঝতে পারি যে, যেকোনো শাস্ত্রের দুর্বোধ্য বিষয়ের তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদান ছিলো তাঁর বাম হাতের খেল্ বা পান্তাভাতের মতো সহজ! অথবা যদিও তিনি সাতকানিয়ার মাটিতে জন্মেছিলেন; কিন্তু জ্ঞানবিশ্বে তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্রে সুদক্ষ একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব।

আফসোস! দেশের দ্বিমুখী ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার ফলে জাতি শুধু গোত্রপ্রীতি ও দলবাজিতেই লিপ্ত হয়েছে। নিজ অঙ্গনের বাইরে জ্ঞান-প্রজ্ঞার কোনো ভাণ্ডার অথবা সমৃদ্ধ কোনো সমুদ্র পরিলক্ষিত হলেও তারা গোঁড়া ঘরানাপ্রীতির কারণে ইলমি দৈন্য ও মূর্খতার মৃত্যু মেনে নিতে প্রস্তুত; কিন্তু কিছুতেই স্বগোত্রের বাইরের কারো কাছ থেকে কোনো ধরনের জ্ঞানলাভের মানসিকতা লালন করতে ইচ্ছুক নয়!

আমার আন্তরিক দোয়া রইলো, আল্লাহপাক আল্লামা মরহুমকে নিজ রহমতের প্রতিবেশে বিশেষ মর্যাদা দান করুন। তাঁর সন্তানদের বিশেষত প্রিয়ভাজন প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপিকে সকল সাগরের মোহনা হওয়ার, জ্ঞান-প্রজ্ঞার সমস্ত ঝর্ণাধারা থেকে যথার্থভাবে উপকৃত হওয়ার, স্বভাবজাত ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত যোগ্যতাসমূহকে কাজে লাগানোর এবং পূর্ণ গতিতে চতুর্মুখী খেদমত আঞ্জাম দেয়ার বিশেষ করে যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব শতভাগ সাফল্যের সঙ্গে পালনের তাওফিক দান করুন। আমিন!

শ্রদ্ধেয় শ্বশুরআব্বা আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) সম্পর্কে আমি যেমন শুনেছি

রিজিয়া রেজা চৌধুরী*

যেভাবে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এই বরকতময় নামের সাথে আমার প্রথম পরিচয়

১৯৯৪ সালে আমার দাখিল পরীক্ষার পরপর শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরীর সাথে চট্টগ্রাম শহর থেকে চরতি হয়ে আমার বড়ো আপার শ্বশুর বাড়ির একটি পারিবারিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য যাচ্ছিলাম সাতকানিয়া সদর ইউনিয়নের চিব্বাড়ী গ্রামে। পথিমধ্যে আমাদের গাড়ি কাঞ্চনা-এওচিয়া হয়ে দেওদীঘি বটতলায় যখন আসলো তখন আমার আব্বা আমার আম্মাকে পশ্চিম দিকে দেখিয়ে বললেন ঐখানে মক্কারবাড়ি নামক এক জমিদার বাড়ি আছে যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অনেক বড়ো একজন জ্ঞানী মানুষ যার নাম মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এবং আরো বললেন এই ব্যাপারে আরো অনেক কথা আছে তোমাকে পরে বলবো। যথানিয়মে আমরা বড়ো আপার শ্বশুরবাড়ি থেকে দাওয়াত খেয়ে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসলাম। এর কিছুদিন পরে লক্ষ্য করলাম আব্বা-আম্মা কি যেন বলাবলি করছে। আমার নাম আসাতে আমি একটু কানপেতে শুনলাম আব্বা বলছে বায়োডাটাগুলো দেখো, অনেক দিনের আশা ছিলো একজন আলেমে দ্বীনকে মেয়ের জামাই বানাবো, হয়তো আল্লাহ কবুল করেছেন। অনেক বড়ো আলেমে দ্বীনের সন্তান, সে নিজেও অনেক বড়ো আলেম। আমি দারুল মাআরিফ আল ইসলামিয়ায় দেখেছি দেশ-বিদেশের বড়ো বড়ো ইসলামিক স্কলারদের সাথে প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে। তখন আম্মা বায়োডাটাগুলো নেড়েচেড়ে দেখে বললো- যে চার ভাষায় বায়োডাটা দিতে পারে সে নিঃসন্দেহে অনেক জ্ঞানী। তাকে আমার মেয়ে দিবো এবং আপনি কথা চালিয়ে নিয়ে যান। এখানে উল্লেখ্য, আমার স্বামী ড. নদভী সাহেব বাংলা, আরবি, ইংরেজি, উর্দু চার ভাষায় নিজ হস্তে লিখিত বায়োডাটা আমাদের বাসায় পাঠিয়েছিলেন এবং হস্তলেখাগুলো ছিলো অপূর্ব সুন্দর এবং প্রিন্ট করা কপির চেয়েও সুন্দর ছিলো। সেই সাথে সেখানে বিভিন্ন খতের ব্যবহার শব্দগুলোকে আরো অনিন্দ্য সুন্দর করে তুলেছিলো।

সে মহান মনীষীর নামে নাযেমে আলা একাডেমি নামক সংস্থা করে সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে আমার বিয়ে হয় মাওলানা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীর সাথে এবং মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর ৫ম ছেলের বউ হিসেবে আমিও এ পরিবারের সদস্য হই। পরিবারের সদস্য হওয়ার সুবাদে ধীরে ধীরে আমার শ্বশুর আব্বার অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে আমি জানতে পারি ওনার মহিমামণ্ডিত জীবনের বিভিন্ন দিক বিশেষ করে কাব্য প্রতিভা, ফাতওয়া ও রচনাশৈলীর বিভিন্ন দিক সর্ম্পকে সম্যক অবগত হই। ওনার সুযোগ্য সন্তান আমার স্বামী প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভীর সাথে ওনার হস্তলিখিত অনেক কিতাব নিয়ে আলোচনার সুবাধে ওনার ইসলামি দুনিয়ায় বিচরণের কিছুটা সুযোগ হয়। আমার বিয়ের আগে নাজেমে আলা একাডেমির নামে কুয়েতের দাওয়াতকালীন আইআইসিও-এর ডেপুটি ডিরেক্টর কুয়েতের ধর্মমন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সাহায্য ডিপার্টমেন্টের ডিজি বিশিষ্ট

ইসলামি চিন্তাবিদ নাদের নুরীর লিখিত রসায়িলুল ইখওয়াহ নামের একটি বইয়ের বাংলা অনুবাদ ভ্রাতৃত্বের পয়গাম নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম বইটি আমার পড়ার সৌভাগ্য হয় এবং বইটির অনুবাদ, ছাপানো ও রয়েলিটি হিসেবে শায়খ নাদের নুরী ১০০০ দিনার বর্তমানে ২ লক্ষ ৮০ হাজার (হতে পারে) গিফট করে। তখন ড. নদভী, আমি ও আমার দেবর ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন-সহ আমরা পরামর্শ করতে থাকি কিভাবে এটাকে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়া যায়। তখন আমরা তিনজন মিলে নাযেমে আলা একাডেমি নামের পরিবর্তে আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন নামকরণ করে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চিন্ত াভাবনা শুরু হয়। পরবর্তীতে আমার ভাসুর আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দীন ও আবুল আতা মুহাম্মদ এমাদুদ্দিন-এর সাথে পরামর্শ করে আমার আব্বা মরহুম মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরীর সাথে আলোচনা করে "আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন" নামে একটি সমাজসেবামূলক সংস্থা করার সিদ্ধান্ত হয়। উল্লেখ্য নাযেমে আলা পদবীটা কেবল ওলামা ও মাদরাসা কেন্দ্রিক পরিচিতি বিধায় সাধারণের মধ্যে পরিচিতির জন্য আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন নামকরণের বিষয়ে আল্লামার একান্ত ভক্ত, জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার ফারেগ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ড. মরহুম মুহাম্মদ রশিদেরও জোরালো পরামর্শ ছিলো। আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করার জন্য আমার আব্বা মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী ইসলামি সমাজ কল্যাণ ফেডারেশনের তৎকালীন মহাসচিব জনাব সিরাজুল কবিরের সাথে আমার দেবর ড. হোছামুদ্দিনকে পরিচয় করিয়ে তাকে রেজিস্ট্রেশনের কাজে সার্বিক সহযোগিতার জন্য দায়িত্ব দেন এবং বাবা মাওলানা চৌধুরী রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে নিয়মিত খবর রাখেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আমার শ্বশুর আব্বা মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর নামের বরকতে ২০০০ সালে এ সংস্থা সমাজসেবার রেজিস্ট্রেশন লাভ করে। পরবর্তীতে আলহামদুলিল্লাহ ফাউন্ডেশনের ১ম প্রকাশনা হিসেবে ভারতের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন আবদুল মাজীদ নদভীর লিখিত বই মুআ'ল্লিমুল ইনশার বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী ও ফাউন্ডেশনের তৎকালীন গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. হোছামুদ্দিন যৌথভাবে। নজরে ছানি করেন মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর সুযোগ্য ছাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর প্রবীণ শিক্ষাবিদ মরহুম প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী। ধীরে ধীরে এভাবে এই মহান মনীষীর নামে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন দেশ-বিদেশে সুনাম খ্যাতি অর্জন করে এবং বাংলাদেশে মসজিদ নির্মাণে, শিক্ষা বিস্তারে, ধর্মীয় উন্নয়নে ও সমাজসেবায় অসাধারণ ভূমিকা রাখে।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ কাব্য প্রতিভা, রচনাকর্ম, মনন মিশন, ইতিহাস, সিরাত ও আধ্যাত্মিকতা চর্চা সম্পর্কে আমার ধারণার নিজস্ব বিশ্লেষণ আমার হৃদয়ে প্রথমে যে বিষয়টি রেখাপাত করে সেটি হলো ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সালে যেখানে সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার মানুষ নিজের এলাকায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হিমশিম খেতো তখন চট্টগ্রাম শহরে গিয়ে পড়াশোনা করা কল্পনাতীত বিষয় ছিলো সেই সময়ে সাতকানিয়ার মক্কারবাড়ীর মতো অজপাড়া গাঁয়ের একজন মানুষ ভারতের ধর্মীয় শিক্ষাজগতের অনন্য প্রতিষ্ঠান মুযাহির উলুম সাহারানপুরের ফারেগ হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সেখান থেকে কতো চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিতে হয় আর সেই ১০০ বছর আগের কথা চিন্তা করে দেখুন, জ্ঞান

আহরণের অদম্য স্পৃহা না হলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে ডুবুরীরা যেমন নদীর তলদেশ থেকে মুক্তা আহরণ করে তেমনিভাবে জ্ঞানসমুদ্র থেকে জ্ঞান আহরণ করা কখনো সম্ভবপর হতো না। আমার স্বামীর কাছ থেকে শোনা একটি গল্প থেকে আমার শ্বশুর আব্বার বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার শিকড় কতো গভীর ছিলো তা অনুমান করা যায়।

গল্পটি হলো–

তিনি যখন কলকাতা আকড়া আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন তখন একদিন বিকেলে এক খৃস্টান পাদ্রী আমার শ্বশুর আব্বার কাছে আসলেন এবং চা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন গল্প-গুজবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- আচ্ছা প্রিন্সিপাল সাহেব, আপনারাতো বলেন আপনাদের ধর্মে আছে আপনাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সব নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু নবী মুহাম্মদকে (সা.) কবর দেয়া হয়েছে মাটির নিচে। অথচ আমাদের নবী হযরত ঈসাকে (আ.) আল্লাহপাক আসমানের ওপর নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছেন; তাহলে বলেন আল্লাহপাকের কাছে যাকে নিয়ে গিয়েছেন তিনি শ্রেষ্ঠ হবেন নাকি মাটির নিচের কবরে যিনি শুয়ে আছেন তিনি শ্রেষ্ঠ হবেন? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? আমার শ্বশুর আব্বা মনে মনে ভাবলেন একে কুরআন-হাদিসের দলিল দিয়ে বুঝালে কাজ হবে না ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তিনি জবাব দিলেন- পাদ্রী সাহেব আপনি কিভাবে এখানে এসেছেন? তখন পাদ্রী জবাব দিলেন কেনো আমি এসেছি টাঙ্গা নিয়ে। তখনকার দিনে ঘোড়া চালিত টাঙ্গাগুলোতে চালক বসতেন ওপরে আর মালিকের সিট ছিলো পেছনে নিচে। এ প্রশ্নে পাদ্রী যা বুঝার বুঝে গেলেন এবং ওনার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব শুনে নতমস্তকে পাদ্রী সেখান থেকে চলে গেলেন। ওনার এরকম অনেক অত্যাশ্চর্য উপস্থিত মেধা ও ধীশক্তির কথা শুনেছি বিজ্ঞজনদের মুখে-মুখে।

আমার শ্বশুর আব্বার রচনাকর্ম ও কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে যথাযথ বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা আমার নেই। তবে ওনার রচিত ও অনুবাদকৃত বইগুলো পর্যালোচনা করলে উপনীত হওয়া যায় যে- তিনি আরবি, উর্দু, বাংলা ও ফার্সি ভাষায় কতো অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে ওনার কবিতাগুলোর বাংলা অনুবাদ দেখে আমি অভিভূত এ কারণে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যর বড়ো বড়ো লেখকরা তাঁদের কবিতার মধ্যে এ ধরনের উঁচুমাপের শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। শব্দচয়ন এবং ভাষার পাণ্ডিত্যে ওনার জ্ঞান ও প্রতিভা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিভিন্ন সময় রচিত কবিতাগুলোর বাংলা অনুবাদ পড়লে বুঝা যায় ওনার আধ্যাত্মিকতা, নবীপ্রেম, শিক্ষামূলক, দার্শনিকতা, ধর্মের পথে যুবকদের জাগরণ ও অনুপ্রেরণার অপূর্ব নিদর্শন। কুরআন, হাদিস ও ইলমে দ্বীনের খেদমতে ওনি সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছেন। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় ওনার ছাত্ররা মোমের আলোর মতো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দ্বীনি শিক্ষার আলোয় আলোকিত করছে দেশ ও মানুষকে।

ওনার রচনা সমগ্রের মধ্য থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ শামায়িলে তিরমিযী শরিফটি আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৬০ সালে এ অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৈহিক ও নৈতিক সৌন্দর্য ও নবী করিম (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দিক প্রাঞ্জল ও সুনিপুণভাবে উঠে এসেছে এই গ্রন্থে। নবীপ্রেমিক বাঙালিদের জন্য এ বইটি বড়ো একটি নেয়ামত। উম্মতে মুহাম্মদি (সা.) ও হাদিসপ্রেমী জ্ঞানসাগরের ডুবুরিরাই বুঝতে পারবেন এ কিতাবের মর্যাদা ও গুরুত্ব।

তিনি মৌলিকভাবে একজন শিক্ষক ও জ্ঞানতাপস ছিলেন, জ্ঞান বিতরণ ও আহরণ করাই ওনার নেশা ও পেশা ছিলো। যার প্রমাণ পাওয়া যায় আদ-দুরুসুস সারফিয়্যাহ বইটিতে। এ বইটিও আমার দেখার ও পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। বইটি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় সমসাময়িককালে আরবি শিক্ষিতরা বিশেষ করে মাদরাসা ছাত্ররা যাতে আবরি ব্যাকরণে জ্ঞান অর্জন করতে পারে সেই লক্ষ্যে তিনি চেষ্টা করেছেন এবং সার্থক হয়েছেন। আরবিপ্রেমী জ্ঞানপিপাসু ছাত্রদের আরবি চর্চার ক্ষেত্রে এ বইটি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম-সহ অনেক বই ওনি রচনা ও অনুবাদ করেছেন যা জ্ঞানপিপাসুদের জন্য রীতিমত মহামূল্যবান রত্ন।

আমার শ্বশুর আব্বার জীবন ও কর্ম, কাব্য প্রতিভা, রচনাশৈলী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিজ্ঞজনেরা "আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)" স্মারক গ্রন্থে অনেক স্মৃতিচারণ করেছেন ওনার জ্ঞানের গভীরতা, বাগ্মিতার ব্যাপারে তাত্ত্বিক আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন, জ্ঞানী-গুণীদের এসব লেখাগুলো গভীরভাবে পাঠ করলে পরিমাপ করা যায় ওনার জ্ঞানের সীমা-পরিসীমা। আমার মতো নগণ্য শিক্ষানবিশ পুত্রবধু ওনার মতো ইসলামি জগতের এমন মহান দিকপাল সম্পর্কে কিছু লিখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুদ্রে-মহাসমুদ্রে ওনার বিচরণ ও সাহিত্যকর্ম আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় বিচরণের অনুপ্রেরণা ও পাথেয় হয়ে উঠুক মহান আল্লাহর দরবারে এ কামনাই রইলো। আল্লাহ সুবহানুহু ওয়াতায়ালা এই মনীষীকে ইলমে কুরআন ও ইলমে হাদিসের মর্মবাণীকে নবী প্রেমিকদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার উসিলায় জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন- আমিন, সুম্মা আমিন!

.....

** আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. এর ৫ম পুত্রবধু। প্রধান নির্বাহী, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন ও সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।*

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) দশদিক : যেমন দেখেছি

সাইয়িদ মুসতাফা মুনীরুদ্দীন (আখতার)

প্রসঙ্গকথা

মহাকালের চিরন্তন প্রবহমানতায় রুহের জগত হতে মহাজীবনের জাহাজটি অনন্ত পথপরিক্রমায় হায়াত নামক অস্থায়ী বন্দরে কিছু সময়ের জন্য নোঙর করে। সময় হলেই যে কোনো মুহূর্তে নোঙর তুলে রওয়ানা দেয় চূড়ান্ত গন্তব্যে। এরই মধ্যে সাব্যস্ত হয়, কে সফল, কে সৎকর্মশীল। যাঁরা সফল, সৎকর্মশীল; তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ এমন থাকেন, যাঁরা নিজেকে এবং নিজের প্রয়োজন ও প্রত্যাশাকে অতিক্রম করতে পারেন। অতিক্রম করতে পারেন; আত্মসত্তা, আত্মজ মনন এবং পার্থিব সকল চাওয়া-পাওয়াকে। পৌঁছে যান, এক হিরন্ময় অনন্য উচ্চতায়। যেখানে সার্বজনীনতার শাশ্বত মুক্তচিন্তা বিরাজমান। যেখানে সমগ্র সৃষ্টির প্রয়োজন, মনন ও কল্যাণ চেতনা প্রস্ফুটিত, বিকশিত এবং সম্প্রসারিত।

যুগে যুগে কালে কালে সময়ের অনিবার্য প্রয়োজনে এমন কিছু মানুষের আগমন ঘটে, যাঁরা যুগের ও কালের গতিধারাকে পরিবর্তন করেন, সংস্কার করেন, সমৃদ্ধ করেন। পরবর্তীতে কালের নিখুঁত, নির্মোহ বিশ্লেষণে মানুষ তাঁদেরকে যুগ সংস্কারক, অনন্য মানুষ কিংবা মহামানব হিসেবে চিহ্নিত করেন।

ইন্তেকালের এতো যুগ পর, আজকের নির্মোহ মেধাবী সময় নির্দ্বিধায় এই সত্য সাব্যস্তে উপনীত হতে পারে যে, হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তেমন রকমেরই যুগ সংস্কারক ও অনন্য মানুষদেরই একজন।

এই অকিঞ্চন, ১৯৭৬-১৯৭৮ সালের শেষাংশ পর্যন্ত, কালের সংক্ষিপ্ত কিছু সময় তাঁর একান্ত শিষ্য হিসেবে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর জ্যোতির্ময় সান্নিধ্যে কাটানোর সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! সেই সোনালী সময়ের কিছু নির্মেদ নির্যাস এখানে সবিনয়ে উপস্থাপন করা হলো। বিজ্ঞজনদের সদয় সমীপে বক্ষমান লেখার সকল ত্রুটির জন্য বিনীত ক্ষমা ও দোয়াপ্রার্থী।

আলোচ্যসূচি

১. হুজুরের সাথে প্রথম দেখা এবং একজন 'বাহরুল উলুম'র চিঠি ও বিনয়ী শ্রদ্ধা

২. হুজুরের প্রতি যুগের সর্বজনগ্রাহ্য একজন 'মকবুল বুযর্গ'র অকপট শ্রদ্ধা ও সম্মান।

৩. সর্বজনস্বীকৃত যুগশ্রেষ্ঠ এক আলেমেদ্বীন ও মুর্শিদে কামিলের প্রতি হুজুরের হৃদয় নিংড়ানো সম্মাননা ও কিংবদন্তি শোকগাথা।

৪. স্বাধীনতা উত্তর নবীন বাংলাদেশে ইসলামি পুনর্জাগরণে চুনতি সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের ভূমিকা এবং এর ইলহামি প্রতিষ্ঠাতা ও নেপথ্য রূপকার প্রসঙ্গ।

৫. পুরোনো কায়দার গতানুগতিক ওয়াজ ও ইসলামি মাহফিলের যুগোপযোগী সংস্কার ও সার্বজনীন মাত্রায় উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

৬. হুজুরের সামনে সমকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ আলিম ও বক্তাগণের সমীহপূর্ণ ভব্যতা ও বিনয়ী সংকোচ।

৭. কঠিন যুগজিজ্ঞাসার জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সমাধানে হুজুরের স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতা।

৮. হুজুরের ক্ষুরধার লিখনী, সাহিত্যজ্ঞান, সুকুমারবৃত্তি ও সুশীল সংস্কৃতিচর্চা।

৯. শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানময় ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে হুজুরের বদান্যতা, মমতা ও মহানুভবতা।

১০. এক নিরহংকার, নিভৃতচারী জ্ঞানতাপস ও রুহানি সাধক।

সংক্ষিপ্ত কথন

১. হুজুরের সাথে প্রথম দেখা এবং একজন 'বাহরুল উলুম'র চিঠি ও বিনয়ী শ্রদ্ধা

১৯৭৬ সালের শুরুর দিককার কথা। চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। জামাতে হাফতুম থেকে শশুমে উত্তীর্ণ হয়েছি। রোল নম্বর চার কি পাঁচের মধ্যে আছে। তবু, মাথায় কি যেনো ভূত চাপলো, চুনতি মাদরাসায় পড়বো। মায়ের সাথে প্যান-প্যান করতে লাগলাম। যদিও মা মন থেকে রাজি নন, তবুও আমার লাগাতার প্যানপ্যানানিতে অবশেষে, বাবাকে রাজি করাতে পেরেছেন। আমার চুনতি যাওয়া মঞ্জুর হলো।

এই বাতিক আমার মধ্যে এমনিতে আসেনি, আমার বাবা আলহাজ সাইয়িদ মুহাম্মদ সোলায়মান, বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা যুগশ্রেষ্ঠ পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ মীর মুহাম্মদ আখতার রহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ। বায়তুশ শরফের ভক্তকুলের নিকট রহমতগঞ্জের হাজি সোলায়মান হিসেবে অধিক পরিচিত। পীর মুরশিদের প্রতি জান কুরবান ভক্ত যাকে বলে, –তিনি তাঁরই প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। চুনতির সন্নিকটে বড়হাতিয়ার কুমিরাঘোনায় লক্ষ মুসল্লির অংশগ্রহণে বায়তুশ শরফের বার্ষিক ইসালে সাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর বাবা কমসে কম ছয়-সাতদিনের জন্য সেখানে চলে যেতেন। আর, প্রতি বছর চুনতি মাদরাসার বার্ষিক সভায় জীবদ্দশায় হযরত শাহ আখতার রহ. তো যেতেনই, তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরীগণ প্রত্যেকেই এই কর্তব্য চালু রেখেছেন। সুতরাং বাবা ও পীর মুরশিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতি বছরই চুনতি মাদরাসার সভায় হাজিরি চালু রেখেছিলেন। এসব কিছুই আমার মনে চুনতির প্রতি আকর্ষণ তৈরির মূল উপাদান। চুনতির প্রতি আমার আকর্ষণের আরেকটি মজবুত কারণ ছিল, আমি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসায় পড়ার সময় আমাদের একজন জাঁদরেল ওস্তাদ ছিলেন মরহুম হযরত মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি এর আগে এবং পরেও চুনতি মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন, –তাঁর মুখে প্রায় সময়েই চুনতি মাদরাসার ভূয়সী প্রশংসা শুনতাম। এটাও আমার মধ্যে চুনতি মাদরাসায় পড়ার প্রবল আগ্রহ তৈরির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে।

বাবা রাজি হয়েছেন, এটাই যথেষ্ট। কিভাবে, কখন ভর্তি হবো, এ নিয়ে আমার আর কোনো চিন্তা নেই। বাবাই সময় মতো সব ব্যবস্থা করবেন। একদিন সময় চলেও এলো। বায়তুশ শরফের আরেক ভক্ত, লোহাগাড়া বাড়ি, বাবার পীরভাই, মাওলানা সিরাজ মামা একদিন সকালে আমাদের রহমতগঞ্জের বাসায় এলেন। তিনিই আমাকে সাথে নিয়ে চুনতি পৌঁছে দেবেন। মা-বাবার মনের মধ্যে –মাত্র ষোল বছর বয়সী ঘরের বড় ছেলেকে দূরে পাঠিয়ে

দিচ্ছেন, আদরের ছোট ছেলেটা একা অচেনা জায়গায় চলে যাচ্ছে, কোথায় থাকবে, কী খাবে?– এ নিয়ে নানাবিধ কষ্ট মনকে ভাঙচুর করলেও, আমার সামনে খুব শক্ত থেকে, স্বাভাবিকভাবেই আমাকে বিদায় দিয়েছেন। আমার ছোট্ট অবুঝ মন যেনো ভেঙে না পড়ে। পরে মায়ের মুখে শুনেছি, মা আধো রাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বিছানায় বসে বসে বাবার অগোচরে আমার জন্য কাঁদতেন। কিন্তু, চুনতি মাদরাসার কি এক অদম্য আকর্ষণ আমাকে মায়ের এই বুকফাটা মমতার কান্নার ব্যথাটুকু বুঝতে দেয়নি। তখন চট্টগ্রাম শহরের লালদীঘির পূর্ব পাড় থেকে কক্সবাজারের গাড়ি ছাড়তো। কয়েক ঘণ্টার লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে চুনতি মাদরাসায় পৌঁছলাম। দুপুর বারটার দিকে মসজিদের উত্তর পাশে লাগানো মাদরাসা হোস্টেলের বারান্দায় পৌঁছাতেই দেখি, তিন নম্বর রুম থেকে একজন প্রায় হাঁটুর নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত হালকা নীল জামা পরিহিত, সৌম্য চেহারার সফেদ লম্বা দাড়ির বয়োবৃদ্ধ মুররুব্বিজন বেরিয়ে আসছেন। সিরাজ মামা একটু হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে কদমবুচি করলেন। আমিও করলাম। মামার ভাবসাব দেখে বুঝে নিলাম, আমরা তাঁর কাছেই এসেছি। বুঝলাম, তিনি এখানকার বড়ো কোনো হুজুর হবেন। হ্যাঁ! ইনিই সেই মহান ক্ষণজন্মা মনীষী, আমার জীবনের এক জ্যোতির্ময় আলোর মিনার, হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

তাঁর সাথে সিরাজ মামার প্রাথমিক কথায় বোঝা গেল, তিনি আগে থেকেই তাঁর পরিচিত। মামা প্রথমে হযরত শাহ মাওলানা আখতার রহ. তৎকালীন বায়তুশ শরফের পীর সাহেব মরহুম হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রেফারেন্স দিয়ে আমার বাবার পরিচয় পেশ করলেন এবং তাঁর পকেট থেকে একপৃষ্ঠার সাদা কাগজের একটা চিঠি হুজুরের হাতে দিলেন। সুন্দর হস্তাক্ষরে আরবিতে লেখা চিঠিটি ছিলো বায়তুশ শরফের সদ্য প্রয়াত পীর সাহেব 'বাহরুল উলুম' হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ কুতুবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে-লেখা। যেখানে আমার এই মাদরাসায় ভর্তি এবং এই হুজুরের একান্ত তত্ত্বাবধান ও পূর্ণ অভিভাবকত্বে সোপর্দ করার অনুরোধ বিবৃত ছিল। যে চিঠি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমি কিছুই জানতাম না। এটা আমার প্রতি বাহরুল উলুমের অনন্য স্নেহ, মমতা ও ইহসানের অনেক নিদর্শনের একটি।

পরবর্তীতে হুজুরের মুখে বারবার শুনেছি, এই চিঠির সোনালি কারুকার্যময় হস্তাক্ষর, বালাগাত ফাসাহাত সমৃদ্ধ ভাষাশৈলী এবং হুজুরের প্রতি 'বাহরুল উলুম' রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিনীত শ্রদ্ধার সুনাম ও আবেগময় বয়ান। এ প্রসঙ্গে একটি কথা হুজুর প্রায়ই বলতেন, মাওলানা কুতুবউদ্দীন আমার ছাত্র নয়, তবু সে আমাকে এতো শ্রদ্ধা করে যে, যত বারই দেখা হয়, পা ছুঁয়ে সালাম করে। এটা তার পিতার কৌলিন্য এবং উচ্চবংশীয় শরাফত ও আদব। হুজুর আরো একটা কথা বারবার বলতেন, এই চিঠির নিবেদকের স্থলে পরম বিনয়ী শ্রদ্ধা মিশ্রিত যে, সমর্পণী বাক্য লিখেছিলেন, তার কথা। এতে হযরত 'বাহরুল উলুম' শেষ বাক্য লিখেছিলেন, 'ফাক্বাত হামিলু না-আ'লিকুম, মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন'– আপনার নিছক একজন জুতা বহনকারী, মুহাম্মদ কুতুবউদ্দিন। হযরত বাহরুল উলুমের এই বিনয়ী শ্রদ্ধার কথা হজুর আবেগাপ্লুত স্বীকৃতিতে আমাদের সামনে অনেকবার উল্লেখ করেছেন। এখানে আমরা দুই মনীষীর মহানত্বের উচ্চতা অনুমানের চেষ্টা করতে পারি।

এই চমৎকার সোনালি চিঠির বদৌলতে খুব সাবলীল প্রবহমানতায় আমার ভর্তি সম্পন্ন হলো এবং সিট বরাদ্দ হলো, হুজুরের এক্কেবারে পাশের সিট। মাঝখানে তফাৎ শুধু হুজুরের টেবিল। টেবিলের উত্তর পাশে আমার সিট, আমার পাশের সিটে বায়তুশ শরফের বর্তমান পীর সাহেব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী হাফিজাহুল্লাহ এবং তাঁর পাশের সিটে হুজুরের কলিজার টুকরা, সুযোগ্য সন্তান হযরত মাওলানা প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নিজামুদ্দিন নদভী এমপি দা'মাত বারাকা'তুহুমুল আলিয়া। যতদিন চুনতি ছিলাম, হুজুরের সন্তানতুল্য অনন্য স্নেহ মমতায় সিক্ত তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্বে উদ্ভাসিত ছিলাম।

২. হুজুরের প্রতি যুগের সর্বজনগ্রাহ্য একজন 'মকবুল বুযর্গ'র অকপট শ্রদ্ধা ও সম্মান:

এককথায় সবাই একমত হবেন যে, সমকালীন সময়ে সকল মত ও পক্ষের সকল সমর্থক, চিন্তক ও মুরুব্বিগণের নিকট সার্বিক দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য একজন মকবুল বুজুর্গ ছিলেন, বায়তুশ শরফের পীর সাহেব হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর চিন্তা, কর্ম ও বহুমুখী সেবা কার্যক্রম এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর অবদান ও প্রসিদ্ধি, সমগ্র উম্মাহ'র জন্য তাঁর ভাবনা ও কাজই তাঁকে সর্বজন সম্মানীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। যিনি একাধারে একজন ধীমান আলিমেদ্বীন ও মেধাবী মুহাদ্দিসও ছিলেন। হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট তিনি পড়েননি। কিন্তু তবুও তিনি হুজুরকে ওস্তাদতুল্য সম্মান করতেন। তাঁর পীর মুরশিদ হযরত শাহ মীর মুহাম্মদ আখতার রহমাতুল্লাহি আলাইহি যে মুহাব্বত ও সম্মানের উদাহরণ রেখে গেছেন, তার উত্তম অনুসরণ করেছেন। বিভিন্ন সময় ও অনুষ্ঠানে হুজুরের প্রতি বায়তুশ শরফে কিংবা বায়তুশ শরফের বাইরে, যখন যেখানে হুজুরকে পেতেন, পীর সাহেব (রহ.) সবিনয় সম্মান ও সম্ভাষণে আপ্লুত হতেন।

এ প্রসঙ্গে হুজুর নিজেই একবার সসংকোচ লাজরাঙা মুখে বললেন, –আমি বিব্রত হই, মাওলানা আবদুল জব্বার এতো বড় একজন জইয়দ আলিম ও মুহাদ্দিস, যাঁর এতো এতো ছাত্র, ভক্ত মুরিদ, তিনি তো আমার কোনো ছাত্রও নন, তারপরও তিনি যেখানেই পান, আমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করেন। আমার পাশে কোথাও চেয়ারে বসতে হলে, খুব জড়োসড়ো হয়ে বসেন। এটা তার হুসন খুলুক্ব, বিনয়ী এখলাস। আসলে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে তার নিয়ৎ ও গুণের জন্যই বড়ো করেন। একদিন আমি শক্তভাবে তাকে নিষেধ করে দিয়েছি যে, তিনি আমাকে যেন এভাবে জনসমক্ষে সংকোচিত না করেন, সাধারণ মানুষের সামনে দৃষ্টিকটু অবস্থা থেকে আমাকে যেন মুক্ত রাখেন। আমি এও বলেছি, –আপনার অন্তরের মুহাব্বত, সম্মান তো আমি পেয়েছি, অনুভব করি, সুতরাং সবার সম্মুখে এটা আর না করলেই আমি বেশি খুশি হবো এবং আল-হামদুলিল্লাহ, তিনি আমার কথা রেখেছেন।

৩. সর্বজনস্বীকৃত যুগশ্রেষ্ঠ এক আলিমেদ্বীন ও মুর্শিদে কামিলের প্রতি হুজুরের হৃদয় নিংড়ানো সম্মাননা ও কিংবদন্তি শোকগাথা:

চুনতি ঐতিহাসিকভাবে বরাবরই তুখোড় মেধাবী শিক্ষাবিদ, প্রশাসক, আলিম ও বুজুর্গ প্রসবিনী ভূমি। এখানে শত শত বছর ধরে উপমহাদেশখ্যাত, বিশ্বখ্যাত মনীষীর জন্ম হয়েছে। লালন-পালন, আগমন-সমাগম, সম্মান-সমাদর হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, রাঙ্গুনিয়ায় জন্ম ও চট্টগ্রাম শহরে বসবাস হলেও যুগশ্রেষ্ঠ আলিমেদ্বীন, প্রসিদ্ধ হক্কানি মুরশিদে কামেল হযরত

মাওলানা শাহ মীর মুহাম্মদ আখতার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোনো এক অদৃশ্য রুহানি টানে বারবার ছুটে আসতেন চুনতি। তাঁর মুবারক উপস্থিতি এখানকার পরিবেশ, পরিস্থিতি, মাদরাসা, মসজিদ ইত্যাদিকে করেছে অধিকতর আলোকিত, সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত।

এমনতরো খ্যাতিসম্পন্ন মেধাবী আলিমেদ্বীন, প্রসিদ্ধ হক্কানি পীরে কামেলের নজর কেড়েছেন আমাদের হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হুজুর গল্পচ্ছলে বলেছেন, তিনি চুনতি এলে কিংবা আমি শহরে বায়তুশ শরফে বা মাদারবাড়ির মীরবাড়িতে গেলে আমাকে ভালোবাসা, আপ্যায়ন, মুহাব্বত, সম্মান করতেন এতে আমি খুবই অভিভূত হয়ে যেতাম। আমি নিজেকে অনেক ধন্য মনে করি, দেশের বড়ো বড়ো আলিম ও ওলি বুযর্গগণ আমাকে অনেক অনেক মুহাব্বত দিয়েছেন, অশেষ সম্মান দিয়েছেন। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে এজন্য অনন্ত শোকরগুজার।

হযরত মীর মুহাম্মদ আখতার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র এ অনন্য সাধারণ আচরণ, ব্যবহার হুজুরকে এতো বেশি মুগ্ধ করেছিল যে, ১৯৭১ সালে মক্কা শরিফের হজ আদায়রত অবস্থায় যখন ইন্তেকাল করলেন এবং সেই মর্মন্তুদ শোকবার্তা যখন হুজুর পেলেন, খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি এক গভীর শোক বেদনায় আক্রান্ত হলেন। কি করবেন, দিশেহারা। এহেন, শোকবিধ্বস্ত মনোজাগতিক দুর্যোগময় মুহূর্তে তুলে নিলেন, তাঁর চিরায়ত মনোসঙ্গী ধীমান কলম। বুকের ভেতরকার এন্তার বিরহের তোলপাড় তোলা তুফানে লণ্ডভণ্ড হৃদয়ের অব্যক্ত শোকাশ্রু তাঁর হিরন্ময় কলমের ছোঁয়ায় হয়ে গেলো এক কিংবদন্তি শোকগাথা, এক যুগান্তকারী হৃদয় নিংড়ানো ঐতিহাসিক মর্সিয়া।

হযরত বাহরুল উলুম মাওলানা কুতুবউদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর স্বভাবজাত সুললিত কণ্ঠে অশ্রুসজল নয়নে বারবার সে মর্সিয়া পড়ে পড়ে অজস্র ভক্তকুলকে অপার কাঁদিয়েছেন, শোকে ভাসিয়েছেন। বায়তুশ শরফের লক্ষ লক্ষ ভক্ত অনুরক্তগণ, ওলামা, ওয়ায়েজগণ বিভিন্ন মাহফিলে, বৈঠকে এখনো যেটি পড়ে পড়ে হযরত মীর মুহাম্মদ আখতার রহ.-এর রুহানি নুরানি মুহাব্বতে কাঁদেন, শোকাশ্রুতে ভাসেন।

এখনো সসম্মানে টাঙানো রয়েছে সেই কিংবদন্তি এপিটাফ, হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহির মীরবাড়ির হুজরাখানায়, যেখানে তিনি শেষযাত্রার হজ গমনের মুহূর্ত পর্যন্ত অবস্থান করেছেন। কালের বিবর্তনের অনিবার্য পরিবর্তন, পরিবর্ধনেও যেটি কখনো স্থানচ্যুত হয়নি।

৪. স্বাধীনতা উত্তর নবীন বাংলাদেশে ইসলামি পুনর্জাগরণে চুনতি সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের ভূমিকা এবং এর ইলহামি প্রতিষ্ঠাতা ও নেপথ্য রূপকার প্রসঙ্গঃ

সময়কাল স্বাধীনতা উত্তর নবীন বাংলাদেশ। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে নিবিষ্ট নিয়োজিত স্বাধীনতার স্থপতি। আর, অন্যদিকে দেশি বিদেশি স্বার্থান্বেষী মহলের সদ্যপ্রসূত স্বাধীন রাষ্ট্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনাশী দূরপ্রসারী দুষ্কৃতির জাল বিস্তার ও আখের গুছানোর অপতৎপরতায় সৃষ্ট দেশব্যাপী শৃঙ্খলা ও শান্তি বিধ্বংসী অরাজকতা। এর মধ্যে, দেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকদের অদূরদর্শী ও অমেধাবী ভুল দৃষ্টিভঙ্গির ব্যর্থ পরিণতি এবং ধর্মহীন গোষ্ঠীর মৌলিক ধর্মবিরোধী তথ্যসন্ত্রাস, বিবাদ, বিসম্বাদ, নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও হানাহানিতে দেশের ধর্মপ্রিয় বৃহত্তর গণসামাজিক পরিমণ্ডলে এক ব্যাপক ভয়ঙ্কর অস্বস্তিকর থমথমে ও

দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। যা ছিল স্বাধীনতার মৌলচেতনা বিরোধী এবং বঙ্গবন্ধুসহ প্রকৃত দেশপ্রেমীদের নিকট একান্তই অপছন্দের ও অপ্রত্যাশিত। তবু, তিনি নিজ প্রচেষ্টা ও তাঁর প্রকৃত ইতিবাচক কল্যাণকামীদের পরামর্শে সর্বসাধারণের সার্বিক কল্যাণচিন্তা ও জাতীয় ঐক্য প্রশ্নে খুবই ধৈর্য, ক্ষমা ও সহনশীল প্রীতিময় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সুচিন্তিত পরিকল্পনায় ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু তবু, এমন অসংগত পরিস্থিতিতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার মনস্তাত্ত্বিক ভাংচুর ও পঙ্কিল পরিণতির উষ্মা ও ঘৃণাকে ধর্মবিরোধীরা যখন মৌলিক পবিত্র ধর্মীয় চেতনা, বিশ্বাস, ও পরিমণ্ডলে প্রলেপনের অশুচি চেষ্টা শুরু করলো, তখন মহান রাব্বুল আলামিন হয়তো চূড়ান্ত বিচারে তা গ্রহণ করেননি। তাই, তিনি তাঁর প্রিয় ওলি বুযর্গানের প্রতি ইলহামের মাধ্যমে এই থমথমে বন্ধ্যাত্ব থেকে সাধারণ ধর্মীয় গণসামাজিক পরিমণ্ডলকে রক্ষা, পুনর্গঠন ও পুনর্জাগরণের উদ্যোগ নিলেন; খালেস মুমিনগণের গোপন রুহানি আহাজারিকে কবুলিয়াতের মাধ্যমে।

এমতাবস্থায়, দেশের এহেন গুমোট অচলায়তনের নিগড় থেকে জাতিকে মুক্তির নতুন বাতাবরণের সুসংবাদ দিলেন, চুনতির আরেক যুগান্তকারী মনীষী, জাঁ'নেসার আশেকে রাসুল, হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহমদ প্রকাশ চুনতির শাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। একদিন এক শুভক্ষণে হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে হযরত শাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন– ওয়া! নাযেম সাহেব, মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সা.-এর জন্মদিন উপলক্ষে ১২ রবিউল আউয়াল একটি মাহফিল করতে হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, চুনতি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ 'নাযেমে আ'লা' হুজুর (রেক্টর) নামক নতুন পদ সৃষ্টি করে হুজুরকে মাদরাসার সর্বোচ্চ সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত রেখেছিলেন। সেই সুবাদে হুজুর সবার নিকট নাযেমে আ'লা বা নাযেম সাহেব হুজুর নামে পরিচিত ছিলেন। তাই, শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁকে নাযেম সাহেব বলে সম্বোধন করে হুজুরকে বললেন, –'তখন বড় মাওলানা আমীনুল্লাহ রহ., নাযেমে আলা হুজুর রহ. এবং শাহ সাহেব রহ. তিনজন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে হায়াতুন্নবী, মিলাদুন্নবী এবং সিরাতুন্নবী এ তিনটি নামের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে নাযেমে আ'লা হুজুর 'সিরাতুন্নবী' অর্থের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব তুলে ধরে এর নামকরণের প্রস্তাব করলে শাহ সাহেব হুজুর রহ. তা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেন এবং বলেন, সিরাতুন্নবী সা. করতে হবে; আমি মুহাম্মদ সা.-এর অনুমতি নিয়েছি। তখন কোথাও এই নামে কোনো মাহফিল প্রচলিত ছিল না। হ্যাঁ, কিতাব ছিল এই নামে, অনেক প্রসিদ্ধ কিতাব ছিল দেশে-বিদেশে। কিন্তু কোনো মাহফিলের এরকম নাম তখনো শোনা যায়নি পৃথিবীর কোথাও। হুজুর তখন হযরত শাহ সাহেবের এই কথার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করলেন মুহূর্তে, এর গভীরতা, দূরবিস্তৃত প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা এবং রুহানি গুরুত্ব ও তাৎপর্য কী হতে পারে তা বুঝে ফেললেন। এটা যে হযরত শাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র প্রতি মহান আল্লাহ তাআলার ইলহামি নির্দেশনা, এটা বুঝতে হুজুরের আর বাকি রইলো না। অতঃপর, তিনি একটু চিন্তা করে, অবশেষে হযরত শাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন যে, –তাহলে এটাকে সর্বাধুনিক যুগজিজ্ঞাসার সমাধানে সময়োপযোগী জ্ঞান ও গবেষণাভিত্তিক অবকাঠামোয় সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্তভাবে আয়োজন করতে হবে। এর প্রতিউত্তরে হযরত শাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, –অহ, অহ, করতে হবে, করতে হবে ওয়া! সেই জন্যই তো

আপনাকে বললাম। ব্যস! এরপর হুজুর নেমে পড়লেন গভীর গবেষণা ও পরিকল্পনায়। নিমগ্ন হলেন এর অবকাঠামো, বিষয় বিন্যাস, অবয়ব বিনির্মানে। বিষয় নির্ধারণ, বক্তা নির্বাচন, শিডিউল, সময়সীমা, আলোচনার সীমারেখা ইত্যাকার যাবতীয় কর্মপরিকল্পনা, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনাসহ সকল কিছুই সাব্যস্ত ও রূপায়ন হলো হুজুরের একমাত্র চিন্তা, গবেষণা ও কলম থেকে।

শুরু হলো নতুন নাম, নতুন আঙ্গিকের এক ধর্মীয় সামাজিক ওয়াজ ও আলোচনার জলসা– মাহফিলে সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যাত্রা শুরু হলো, দেশে নতুন এক সর্বজনগ্রাহ্য ইসলামি পুনর্জাগরণের। যেখানে ওয়ায়েজ, আলোচক, বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হচ্ছেন, সকল দল, মত, পথ ও পক্ষ নির্বিশেষে সবাই। যেখানে উপস্থিত হচ্ছেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্ভেদে সার্বজনীন উদার ও আন্তরিক সম্প্রীতিতে। স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ, আস্তিক-নাস্তিক, দূরের-কাছের ভেদাভেদহীন নির্বিবাদে এক পারলৌকিক মমতার বন্ধনে কাঁধে কাঁধ হাতে হাত মিলিয়ে সবাই যার যার কর্তব্য আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন। এ ছিলো এক অলৌকিক রুহানি, জান্নাতি পরিবেশ। যা এখনো নিরন্তর চলমান। আর দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যুগ সংস্কার আন্দোলনের নতুন এই মাইলফলক– সার্বজনীন সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের সামগ্রিক আয়োজনে মাদরাসার ছাত্র শিক্ষক থেকে শুরু করে চুনতির ভেতর-বাইরের, দূরের-কাছের সকল মত ও পক্ষের ইসলামিক স্কলারস, আলিমে দ্বীন, ওয়ায়েজ, আলোচক, বক্তা, উপস্থাপক, সেবক, কর্মীসহ সবার আন্তরিক অংশগ্রহণ ও হৃদ্যিক সেবা এই মাহফিলকে পৌঁছে দিয়েছে সময়ের কালোত্তীর্ণ এক অনন্য উচ্চতায়। এবং মহান রাব্বুল আলামিনের অপার রহমত ও ইচ্ছায় এই মাহফিল ইনশাআল্লাহ চলবে কিয়ামত পর্যন্ত।

স্বাধীনতা উত্তর নবীন বাংলাদেশে ইসলামি পুনর্জাগরণে চুনতির এই সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল এক নুরানি আলোর মিনার, অনন্য সোনালী তোরণ। এর ইলহামি প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহমদ প্রকাশ চুনতির শাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আর এর মৌলিক গবেষণা, পরিকল্পনা, গ্রন্থনা, নির্দেশনা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নিউক্লিয়াস চিন্তক ও নেপথ্য রূপকার হচ্ছেন, আমাদের হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এখনো পর্যন্ত এই মাহফিলের যে তরতীব, রীতিনীতি ও কাঠামো চলছে, তা তাঁরই করা। তিনিই মৌল কাঠামো তৈরি করে গেছেন সবার সার্বিক সহযোগিতায়, যা হুবহু এখনো বলবত এবং যথার্থ প্রাসঙ্গিক।

৫. পুরোনো কায়দার গতানুগতিক ওয়াজ ও ইসলামি মাহফিলের যুগোপযোগী সংস্কার ও সার্বজনীন মাত্রায় উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানে আধুনিকায়ন :

সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বলতে আমরা যা বুঝি, তা হলো, একটি বিষয়ে একাধিক বক্তার তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক গবেষণামূলক আলোচনাবা বক্তৃতা এবং একাধিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বক্তার তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক গবেষণামূলক ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা বা বক্তৃতা। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে– ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বৈশ্বিক ক্ষেত্রে শিক্ষা, সুখ, শান্তি, শৃঙ্খলা, ধর্ম ও সুশাসন ইত্যাদির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় গবেষণা, আবিষ্কার, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং তার প্রচার, প্রকাশনা ও বিস্তার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখি, গণপর্যায়ে এসবের আয়োজন হয়ে থাকে খুবই কম। এগুলোর

বেশির ভাগ আয়োজন হয়ে থাকে, রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার প্রকাশনা সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক পরিমণ্ডলে। এবং এগুলোর আয়োজক, বক্তা শ্রোতাও আলাদা এবং নির্দিষ্ট স্তর ও পরিমণ্ডলেরই হয়ে থাকেন। এখানে আমজনতার উপস্থিতি খুব একটা থাকে না বললেই চলে।

আরো একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে খেয়াল করার মতো গুরুত্বপূর্ণ যে, ইতিহাসের নিকট অতীতের নাতিদীর্ঘ কয়েক শতকের ধর্মীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে, এ ধরনের চিন্তা ও গবেষণাধর্মী কোনো অনুষ্ঠান বা মাহফিল আমরা খুঁজে পাবো না। হ্যাঁ, বড়ো বড়ো ওয়াজ, যিকর ও অন্যান্য মাহফিল হয়। ওখানে নসিহত, আলোচনা, বক্তৃতা সবই হয় এবং তা অবশ্যই সমাজে ইতিবাচক কল্যাণ বয়ে আনছে, বিশ্বাস ও চেতনার সংরক্ষণ ও লালন পালন হচ্ছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্ম ও দর্শনের যে দূরপ্রসারী গভীর চিন্তা, ভাবনা ও গবেষণার চর্চা, লালন ও বিস্তারের প্রয়োজন ছিলো, সে চাহিদার উপযুক্ত কোনো প্রতিফল গণমানুষ, জাতি ও সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে পায়নি।

ধর্মীয় সামাজিক পরিমণ্ডলের তৎকালীন এই শূন্যতা ও প্রেক্ষাপটের দিকে নির্মোহ পর্যবেক্ষণ ও বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি দেখি, তবে একটি সরলরেখার মতো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের বিষয় বিন্যাস, বক্তা নির্বাচন, সময় সীমার বন্ধনী স্থাপন, বিষয়বস্তুর গণ্ডির মধ্যে বক্তার স্থিতিস্থাপন, তৎকালীন আধুনিক সরঞ্জামের প্রয়োজনীয় ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক সর্বাধুনিক উপকরণসমূহ আজ থেকে অর্ধশতাব্দী কাল আগের অজপাড়াগাঁয়ে আয়োজিত একটি মাহফিলে সর্বোতভাবে প্রবিষ্ট, প্রতিষ্ঠিত ও চমৎকার অলংকরণে চর্চা শুরু হয়েছিলো। এ এক অনন্য সাধারণ উন্নয়ন, সংযোজন এবং কিংবদন্তি যুগসংস্কারক কর্মযজ্ঞ, যা ছিল, পুরোনো কায়দার গতানুগতিক ওয়াজ ও ইসলামি মাহফিলের যুগোপযোগী সংস্কার ও সার্বজনীন মাত্রায় এর উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানে আধুনিকায়ন। যেখানে জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সর্বসাধারণ স্তরের আমজনতার উপস্থিতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং ব্যাপক। আর ছিলো, সকল পক্ষ-বিপক্ষ, দলমত, জাতিগোষ্ঠী সবার সাদর আমন্ত্রণ।

যা সমকালীন যুগবিখ্যাত বুযর্গ, আশেকে রাসুল, হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহমদ প্রকাশ চুনতির শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র প্রতি মহান রাব্বুল আলামিনের দয়ায় প্রাপ্ত ইলহামি নির্দেশনা এবং মেহেরবান আল্লাহ তাআ'লার পরম মেহেরবানিতে হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র চিন্তা, গবেষণা, রচনা, গ্রন্থনা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় সংস্থাপিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়কে উত্তম প্রতিদানে সম্মানিত করুন।

৬. হুজুরের সামনে সমকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ আলিম ও বক্তাগণের সমীহপূর্ণ ভব্যতা ও বিনয়ী সংকোচ:

হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, সম্মান সর্বস্তরের বুযর্গানে দ্বীন, ওলামা মাশায়েখ, বক্তা আলোচক, মুসল্লি ও শ্রোতা সকলের নিকট তাঁকে যেন এমন এক সর্বজন সন্মানীয় আসনে আমৃত্যু অধিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন, মহান আল্লাহ তাআ'লারই সদয় কৃপায়, যার ছোট ছোট কিছু উদাহরণ এরকম যে, –মাহফিলে আগত

কোনো বক্তা, আলোচক, ওয়ায়েজ হুজুরকে সালাম, সম্মাননা না জানিয়ে মঞ্চে উঠতেন না এবং উপস্থাপনা শুরু করতেন না। কেউ কেউ তো আবেগ, ভালোবাসায় পা ছুঁয়ে নিতেও দ্বিধা করতেন না।

একাধিক প্রসিদ্ধ হক্কানি আলিমেদ্বীন অকপটে বলেছেন, –'চুনতি মাহফিলের দাওয়াতনামা পাওয়ার পর থেকে চোখের ঘুম চলে যায়। বুকে দুরু দুরু কম্পন শুরু হয়। কিতাব, রেফারেন্স ইত্যাদিতে ডুবে থাকতে হয়। যেখানে হযরত আল্লামা নাযেমে আ'লা সাহেবের মতো ওস্তাদগণের ওস্তাদ রয়েছেন, সামনে পেছনে দেশবিখ্যাত স্কলার্স, ওলামা মাশায়েখ উপস্থিত, সেখানে কথা বলা প্রকৃতই ভীতিকর ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার বটে'।

একেবারেই গ্রামের একটি সাধারণ ধর্মীয় মাহফিলকে এমনতরো উচ্চতায় উন্নীত করতে পারা, শুধুমাত্র সেই সময়ের জন্য নয়, আজকের জন্যও সত্যই বিস্ময়কর। যখন রাজধানী ঢাকা থেকে চুনতি পৌঁছাতে কম করে হলেও দুদিনের সফর লাগতো। বিদ্যুৎ পৌঁছেনি, শামিয়ানার নীচে খড় আর ছালার বিছানায় অডিয়্যান্স- শ্রোতাসাধারণ, আর হেজাক বাতির আলোয় চলতো রাতের মাহফিল। এমনি এক আনকোরা গ্রামীণ মাহফিলকে আন্তর্জাতিক, একাডেমিক ও সর্বাধুনিক উপকরণ-উপাদানে সমৃদ্ধ ও সৌকর্যমণ্ডিত করা বাস্তবিকই কঠিন, অকল্পনীয় এবং অভূতপূর্ব। যেখানে এসে প্রায় সকল বক্তাই অবাক, থতমত খেয়ে যেতেন।

এই অবাক বিস্ময়াবিষ্ট বিমূর্ত জিজ্ঞাসায় যখন খুঁজে পেতেন, এর নেপথ্য কারিগর ও রূপকার হচ্ছেন, হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, তখনই তাঁরা হয়ে যেতেন বিমুগ্ধ, অভিভূত। আর তখনই তাঁরা সরল স্বতঃস্ফূর্ততায় হুজুরের প্রতি এবং সকল আয়োজকদের প্রতি জানাতেন আন্তরিক অভিনন্দন, স্বীকৃতি এবং অকপট, নির্ভেজাল সম্মাননা ও ভালোবাসা। জানাতেন সমীহপূর্ণ ভব্যতা মিশ্রিত বিনয়ী সংকোচ ও বিনম্র শ্রদ্ধা।

৭. কঠিন যুগজিজ্ঞাসার জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সমাধানে হুজুরের স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতা: সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকের ধারণা, মাদরাসাপড়ুয়া ছাত্র, শিক্ষক, আলিম, মৌলভিগণ পুরনো দিনের চিন্তা-ভাবনা ও মনমানসিকতা সম্পন্ন হয়ে থাকেন। আধুনিক বিশ্বের সাথে, সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে তাঁরা পরিচিত নন। অবশ্য, এ ধারণা যে সবাই পোষণ করেন, এমন কথাও যেমন সঠিক নয়, তেমনি আলিমগণের একটা বড়ো অংশও যে এমন অবস্থা থেকে মুক্ত নন, সেটিও পুরোদমে সত্য।

আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগের বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে যে ক'জন আলিমে দ্বীন এই অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এবং চিন্তাভাবনা ও মনমানসিকতার দিক থেকে আধুনিক বিশ্বের সাথে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে আপাদমস্তক পুরোদস্তুর সংযুক্ত ও সমৃদ্ধ ছিলেন, তন্মধ্যে, হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ছিলেন অনন্য, তা তাঁর সাহারানপুর, কোলকাতা ইত্যাদিতে থাকাকালীন ইতিহাস সাক্ষী। যিনি গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্যন্ত কোলকাতা শহরের আকড়া দারুল উলুম কুদসিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও মুহাদ্দিস ছিলেন, কোলকাতা আলিয়া মাদরাসার নিয়োগ বোর্ডের সদস্য ছিলেন, কোলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির মেম্বার ছিলেন।

একবার হলো এক ঘটনা। সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল চলাকালীন সময়ে হুজুরকে তো পুরো মাহফিলে পরিচালক হিসেবে সর্বক্ষণ মঞ্চে উপস্থিত থাকতে হতো।

জোহরের নামাজ ও দুপুরের খাবারের বিরতিতে হুজুর রুমে এসেছেন এবং প্রতিদিনের মতো খুব তাড়াহুড়োর মধ্যেই হাযত সেরে অজু, নামাজ, খাবার ইত্যাদি সম্পন্ন করছেন, কম সময়ের মধ্যে আবার মাহফিলে পৌঁছে যেতে হবে বলে। আমি হুজুরের এই বয়সে এমন শ্রমসাধ্য তাড়াহুড়ো দেখে প্রতিদিন কষ্ট পেলেও কোনদিন বলবার সাহস পাইনি। আজ কেমন যেন একটু সাহসী হয়ে বলে ফেললাম– 'হুজুর, সেই সকাল থেকেই এই পর্যন্ত কি আপনি মাঝখানে আর হাযত, অজু ইত্যাদি সারতে পারেন নি? হুজুর বললেন, –'না বাবা, কি করে পারবো, দায়িত্ব না? মাহফিলের মাঝখান থেকে তো আর ওঠা যায় না!' আমি অবাক বিস্ময়ে হুজুরের দায়িত্বশীলতার মাত্রা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিলাম। আবার জানতে চাইলাম, –'তাহলে, এতো দীর্ঘ সময় কীভাবে থাকতে পারেন? আমি ছোট মানুষ, ছোট বিস্ময়, ছোট প্রশ্ন।' হুজুর, মুখে স্বভাবসুলভ মমতামাখা হাসির রেখা তুলে বললেন, –'দেখো বাবা, এ অভ্যাস হয়েছে আমার কোলকাতা আদালতের জুরি বোর্ডের জুরি থাকাকালীন সময়ে। সকালেই অজু করে শেরওয়ানি সুট বুট মোজা পরে যে চলে যেতাম, সেই জোহর ও দুপুরের খাবারের বিরতিতে সময় পেতাম। আদালত চলমান সময়েও ওঠা যেতো না। তাই, সেই থেকেই আমার এ অভ্যাস গড়ে উঠেছে।'

এই ঘটনার মাহাত্ম্য তখন উপলব্ধি করতে না পারলেও এখন বুঝতে কষ্ট হয় না যে, হুজুরের জ্ঞানের উচ্চতা, যুগজিজ্ঞাসার সমাধান বিধায়ক হিসেবে কোলকাতা আদালতের জুরি করার মূল্যমান, সর্বোপরি কর্তব্যের প্রতি হুজুরের দায়িত্বশীলতা ও মনোযোগের মাত্রা ও গভীরতা কতটা ব্যাপক ও বিশাল ছিলো।

আরেকটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে, –সকাল সাতটা আটটা হবে। আমরা আমাদের পড়ায় ব্যস্ত, হুজুর তাঁর লেখালেখি ও মোতালয়ার কাজে নিমগ্ন। তখন সম্ভবত তিরমিযী শরিফের শরাহ লেখার কাজ চলছিল। এমন সময়ে রুমে ঢুকলেন আরেক বিজ্ঞ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফা সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি কামিল ক্লাসের সিনিয়র মুহাদ্দিস। তিনি তাঁর ক্লাসের পাঠদানের সময়ে উদ্ভূত কোনো বিষয়ের জটিল কোনো সমস্যার কথা বলতে লাগলেন, বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে এবং এ-ও বললেন যে, মাদরাসার সকল সিনিয়র মুহাদ্দিস ও ওস্তাদগণের নিকট এ সমস্যা পেশ করা হয়েছে, কিন্তু কেউই এ সমস্যার সমাধান বাতলে দিতে পারেননি। তিনি এটাও উল্লেখ করলেন যে, এই মাদরাসার লাইব্রেরিতে এই কিতাবের যতো শরাহ রয়েছে, সবগুলো দেখেছেন, কোথাও কোনো কিতাবেই এই সমস্যার উল্লেখ বা সমাধান বর্ণিত নেই। আমি নিচের শ্রেণির ছোট শিক্ষার্থী হওয়ার কারণে সেই সমস্যার প্রসঙ্গ বুঝতে না পারলেও, হযরত মীর সাহেব হুজুরের উত্থাপিত সমস্যা যে জটিল এটা নিসন্দেহে বুঝতে পারছি। হযরত মীর সাহেব হুজুর খুব হতাশার সাথে অভিযোগ করলেন, –'নাযেম সাহেব হুজুর জে! এমন একটি জটিল সমস্যা শরাহকারীগণ কেউ উল্লেখ করলো না, এটা কি কথা হলো?'

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর স্বভাবজাত সারল্য ও প্রশান্ত ভঙ্গিতে বললেন, মীর সাহেব জে, আপনি আগে বসেন, তাহলে, সমস্যাও বসবে।' এতোক্ষণ তিনি দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন, যা আমরা খেয়ালই করিনি। হযরত মীর সাহেব হুজুর চৌকির পূর্ব প্রান্তে বসলেন।

এবার হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর চিরায়ত মধুর হাসিমুখে দুহাত বুলিয়ে বললেন, –'হুজুর, 'হাশিয়াওয়ালা'ও শরাহকারীগণ এটাকে হয়তো সমস্যা মনে করেননি, তাই, উল্লেখ করেননি।' হযরত মীর সাহেব হুজুর আরো অস্থিরচিত্তে কিন্তু কমজোর কণ্ঠে বললেন, –'এতো বড়ো একটা সমস্যাকে সমস্যা মনে করলো না তাঁরা!' হুজুর হালকা গলায় বললেন, –'করলো না আর কি।' এরপর হুজুর অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল প্রবহমানতায় সংক্ষিপ্ত কথায় এর সমাধান বয়ান করলেন। শুনে হযরত মীর সাহেব হুজুর তো খুশিতে আটখানা। আমার দুর্ভাগ্য, আমি এই চমৎকার উপাদেয় সমস্যা ও সমাধানের কিছুই বুঝিনি। কিন্তু, অপার খুশিতে বাগবাগ হযরত মীর সাহেব হুজুরের আনন্দ দেখে বুঝলাম, তাঁর সমস্যা যতো জটিল, তিনি তার সমাধানও পেয়েছেন, তার চেয়ে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং তিনি অভিভূত ও আশ্চর্যান্বিত। সমাধান নিয়ে চলে গেলেন, হুজুর মমতাময় সম্ভাষণে তাঁকে বিদায় জানালেন।

কিছুক্ষণ পর হাসতে হাসতে হযরত মীর সাহেব হুজুর আবার ঢুকলেন। হাতে সেই কিতাব। হুজুরের সামনে কিতাব খুলে বললেন, –'আমি সমস্যা নির্দিষ্ট স্থানে চিহ্নিত করে, পাশে (আরবিতে) লিখেছি এবং তার পাশে আপনার প্রদত্ত সমাধান লিখে দিয়েছি, এবং এর সমাধান উপস্থাপক হিসেবে আপনার নাম লিখে দিয়েছি।' এটা শুনে হুজুর খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে হাসলেন ও বললেন, –'এতো কিছু কেন করলেন আবার!' হযরত মীর সাহেব হুজুরের আনন্দ উত্তেজনা এখনো কমেনি। কৃতজ্ঞতাপ্লুত আবেগ ও শ্রদ্ধায় বললেন, –'আগামীর ছাত্র, শিক্ষক ও পাঠকগণের জানতে হবে, এই সমস্যার সমাধানদাতা কে ছিলেন !'

আজ বুঝলাম, কৃতজ্ঞতা, সৌজন্য উদারতা কাকে বলে! দুই মহারথীর চিন্তা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিরাটত্ব ছিলো কতো অকল্পনীয় এবং অবর্ণনীয়!

যুগজিজ্ঞাসার উপলব্ধি ও সমাধানে হুজুরের পাণ্ডিত্য যে কতটা সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত ছিলো, তা আমরা হুজুরের জীবদ্দশায় গ্রন্থিত, সম্পাদিত ও সংকলিত সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের বিষয় সমাহার ও তার কাঠামো বিন্যাস দেখলেই কিছুটা হলেও আঁচ-অনুমান করতে পারি।

৮. হুজুরের ক্ষুরধার লিখনী, সাহিত্যজ্ঞান, সুকুমার বৃত্তি ও সুশীল সংস্কৃতিচর্চা:

একজন মানুষের কত ধরনের মেধা ও যোগ্যতা থাকলে তাঁকে বহুমুখী মেধাবী বলা হয়, আর, তারও চেয়ে কত রকমের বেশি মেধা ও যোগ্যতা থাকলে তাকে বহুমুখী মেধাবী বলা যায়, তা একাডেমিক পণ্ডিতগণের কাজ। আমরা অকিঞ্চনদের পক্ষে তা বলা অসম্ভব।

কিন্তু এই আমরাই হুজুরের মধ্যে সেই অসম্ভব কারিশমাগুলো দেখেছি নিরন্তর। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী, সাহিত্যজ্ঞান, সুকুমারবৃত্তি, সুশীল সংস্কৃতিচর্চা, আধুনিক মননশীল চিন্তা-চেতনা, কোনটা ছিলো না হুজুরের মধ্যে। ছোটবেলা থেকেই কবিতা, গান, সংগীত ও সংস্কৃতিচর্চার প্রতি ঝোঁক ছিল আমার প্রবল। সে ঝোঁক শুধু শোনার মধ্যেই সীমিত এবং বাংলা, উর্দু ও হিন্দির গণ্ডি পর্যন্ত। এখানে এসে দেখি, হুজুরের মধ্যে তা ফার্সি, আরবিতেও সম্প্রসারিত এবং শুধু শোনায় নয়, সমৃদ্ধ কারুময় প্রোজ্জ্বল রচনাশৈলীতে উদ্ভাসিত, বিস্ফোরিত।

শুধু এটুকু বলতে পারি এভাবে– তৎকালীন চুনতি মাদরাসা ছিলো যেমন একদিকে দেশ-বাছা মেধাবী শিক্ষার্থীদের মিলনক্ষেত্র, তেমনি অপরদিকে, উপমহাদেশের বিখ্যাত, তুখোড় ধীমান

ওস্তাদগণের অতুল গুলশান। যাঁদের মধ্যে অর্ধ ডজনের বেশি ওস্তাদ ছিলেন, যাঁদের সমৃদ্ধ কবিতা, লিখনীর ক্ষুরধার চমৎকারিত্ব ছিলো সর্বজনস্বীকৃত, সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ। তাঁরা তাঁদের কবিতা ও রচনাবলি হুজুরের সামনে লুকিয়ে রাখতেন, প্রকাশ ও উপস্থাপন করতে লজ্জা ও শঙ্কা বোধ করতেন। পরবর্তীকালে এঁদের কারো কারো কিতাব জাতীয় পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রকাশিত হয়েছে।

আরবি ভাষার ব্যাকরণিক শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় রচিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিতাব বহু বছর ধরে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মাদরাসায় পাঠ্য হিসেবে চালু রয়েছে। হাদিসের তাফসির, কাসিদা বোর্দাসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক রচনার ভাষান্তর হুজুরের ধীশক্তির বহুমুখীত্বকেই নির্দেশ করে।

হুজুরের হামদ ও না'ত রচনার দক্ষতার কথা তো সর্বজনবিদিত। চুনতি সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের আলাদা রোশনাই ও বিশেষত্ব ছিলো হুজুরের রচিত হামদ ও না'ত। চুনতি সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের প্রতিষ্ঠাতা, যুগের বিখ্যাত আশেকে রাসূল, হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নাযেমে আলা হুজুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। যখনই না'ত শুনতেন, তখনই ইশকে রাসূলের প্রাবল্যে তোলপাড় দিওয়ানাপনায় আন্দোলিত হতেন, নবীপ্রেমে অঝোরে কাঁদতেন। এভাবে হুজুরের হামদ ও না'ত হাজার হাজার আশেক মুমিন ও ওলামা মাশায়েখকে নবীপ্রেমের বুকফাটা কান্নার আবেগাশ্রুতে উদ্ভাসিত করেছেন। এখনো করে যাচ্ছেন সেই থেকে অর্ধশতাব্দী কালব্যাপী।

৯. শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানময় ভবিষ্যৎ বিনির্মানে হুজুরের বদান্যতা, মমতা ও মহানুভবতা:

হিন্দুস্তানের সাহারানপুর মাদরাসায় হুজুরের লেখাপড়া তখনো শেষ হয়নি, চলছে। তখনই দুই জায়গা থেকে শিক্ষকতার প্রস্তাব চলে আসলো মাদরাসা কর্তৃপক্ষের কাছে। একটি হচ্ছে, জাপানের টোকিও কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব হিসেবে, আরেকটি হলো, ভারতেরই কোলকাতার আকড়া দারুল উলুম কুদসিয়া সিনিয়র মাদরাসায় হেড মাওলানা পদে শিক্ষকতার জন্য। নিঃসন্দেহে জাপানের প্রস্তাব ছিলো আর্থিক বিবেচনায় অনেক সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়। কোটিপতি হওয়া ছিলো সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু, হুজুর খুব স্পষ্ট ভাষায় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন, –'সপ্তাহে মাত্র একবার খুতবা দেয়ার জন্য আর কতটুকুইবা লেখাপড়ার প্রয়োজন হবে! ওখানে যাওয়া মানে তো পড়ালেখা যা করেছি, সব ভুলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আমার ওখানে যাওয়ার দরকার নেই।' সবাইতো অবাক! তিনি অবলীলায় পছন্দ করলেন, কোলকাতার আকড়াস্থ দারুল উলুম কুদসিয়া সিনিয়র মাদরাসার শিক্ষকতাকে। শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং শিক্ষাসেবার প্রতি কতটা মমত্ববোধ থাকলে, এখনো পেশাজীবনে প্রবেশ করেননি, মাত্র আয়োজন, নির্বাচন চলছে; এমন সময়ে কতটা মহৎপ্রাণ, কতটা ত্যাগী ও মহান লক্ষ্যাভিসারী এবং কতটা আত্মিক আধ্যাত্মিক চেতনায় বিশ্বাসী ও সমর্পিত হলে, নিজের নতুন আনকোরা পেশাজীবনের সূচনার জন্য এহেন অনিশ্চিত, অসমৃদ্ধ কিন্তু হিরন্ময় পেশা ও জ্যোতির্ময় গন্তব্য নির্ধারণ করতে পারেন এবং তার ওপর আজীবন প্রতিষ্ঠিত থেকে তৃপ্তিময় যাপিতজীবনের স্বর্ণিল যবনিকা টানতে পারেন মনে হয়, আমরা তা শুধু কল্পনাই করতে পারি মাত্র, প্রকৃত উপলব্ধির সীমারেখা হয়তো আমাদের জন্য অধরাই থেকে যাবে।

হুজুর তাঁর কত গরীব, অভাবী, অসহায় ছাত্র ও শিক্ষার্থীকে গোপনে পড়ালেখা ও খাওয়া-পরার খরচ দিয়েছেন, কতজনকে সরাসরি হাতে-কলমে তোতাপাখির মতো শিক্ষা দিয়েছেন, তা শুধু তিনিই জানেন, আর যিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি জানেন। অন্য কারো পক্ষে এটা জানা প্রায় অসম্ভব।

আমরা যারা হুজুরের রুমে থাকতাম, তাদের সবার খাওয়া-পরা, পড়ালেখা, ঘুম গোসল, চলাফেরার চব্বিশ ঘণ্টার রুটিন তৈরি করে দিতেন হুজুর নিজেই। এর ব্যত্যয় করার সাধ্য কারোর ছিলো না। হুজুরের মমতাময় হৃদয় নিংড়ানো আদর, স্নেহ, তত্ত্বাবধান আমাদের জীবনের জন্য যেন আল্লাহ তাআলার এক অনন্য সাধারণ উপহার ছিলো।

একবার এমন হলো যে, মাদরাসায় গ্রীষ্মকালীন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বন্ধু, সহপাঠী সবাই খুশি, আনন্দ উল্লাসে বাড়ি চলে যাচ্ছে। আমরা হুজুরের রুমের অধিবাসীদের হুজুর ডেকে বললেন, –'তোমরা কেউ বাড়ি যাবে না।' মাথার ওপর তো বাজ পড়লো! বাড়ি যাবো না! 'হোস্টেল তো বন্ধ হয়ে যাবে, হুজুর! আমরা কোথায় থাকবো, কি খাবো?' কঠিন জিজ্ঞাসার সরল জবাব –'তোমরা আমার সন্তানদের সাথে আমার বাড়িতে থাকবে। তাদের সাথে খাবে-দাবে, পড়বে লিখবে, খেলবে বেড়াবে।' হুজুরের প্রাঞ্জল বয়ানে লেখাপড়ার একটা অব্যক্ত পাথরচাপা থাকলেও, বাকি সব আনন্দ সংবাদে আমাদের হৃদয়পটে নিজের বাড়ি যেতে না-পারার দুঃখ মুহূর্তে উধাও হয়ে, নতুন এক আনন্দ হাওয়া বইতে শুরু করলো।

পরের দিন আমরা পৌঁছে গেলাম, সাতকানিয়ার মনোরম সবুজ ঘেরা গাঁ, মাদার্শার মক্কার বাড়ি। যার পাশে মনোমুগ্ধকর পাহাড় জঙ্গল বেষ্টিত এক মাঠ ছিলো, যেখানে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হতো ঐতিহাসিক মক্কার বলিখেলা। এখনো হয় কিনা, জানি না।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো, বাড়ির সামনের দেউরি ঘরে। চমৎকার পরিবেশ। দেউরির সামনে ছোট উঠান, উঠানের পূর্ব পাশে পায়ে-চলা পথ- বাড়ির রাস্তা, পথের পূর্ব পাশে পুকুর, পুকুরের উত্তর পাড়ে ছোট মসজিদ। আর উঠানের দক্ষিণ দিকে চলে যাওয়া পথ বেয়ে গিয়ে ডানে পশ্চিমে গেলে ঐতিহাসিক মক্কার খেলার মাঠ, বামে পূর্ব দিকে চলে গেছে দেওদীঘি হয়ে সাতকানিয়া শহরের রাস্তা। প্রসিদ্ধ মক্কার বাড়ির উর্বর সোঁনা মাটির মৌ মৌ গন্ধে বেড়ে ওঠা জাম-জারুলের শ্যামল বনানী ঘেরা এই মনোহরী গাঁয়ে আস্তে আস্তে মন বসতে শুরু করেছে।

আমার এক বছরের অগ্রজ আবুল আতা ভাই, এক বছরের অনুজ প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী এমপি, অনেক আদরের ছোট ভাই ড. মুহাম্মদ হোছামুদ্দিনসহ আমরা পাঁচ কি সাতজন ছিলাম এই অপূর্ব আনন্দ-শিক্ষা-ছুটিতে। আহা ! কী এক অপার্থিব মায়া বিধৌত স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ সোনালি ছুটি। যা জীবনে কখনো ভুলবার নয়।

রাতে আমরা সবাই একসাথে দেউরিতে ঘুমাতাম। হুজুর তাহাজ্জুদের জন্য পুকুরে অজু করতে যাওয়ার সময় জানালায় টোকা দিয়ে ও শব্দ করে আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। আমরা অজু কালাম করে কখনো দু'রাকাআত তাহাজ্জুদ নামাজ কেউ পড়লে পড়তাম, না হয়, কিতাব পড়তে বসে যেতাম। মনে সর্বদা হুজুরের ভয়, কখন চলে আসেন ঠিক নাই। তাই, ফাঁকি দেওয়ারও জো নাই। নিয়মিত ফজরের নামাজের পরপরই আসতেন এবং সারাদিনের পড়া বুঝিয়ে দিতেন। কিছুক্ষণ পরপর, হয়তো ওখান থেকে ডাক দিতেন, নয়তো আমাদেরকে ডেকে নিয়ে পাঠ পরিকল্পনা, ফায়'ফরমায়েশ দিতেন। এদিকে, নির্দিষ্ট সময়ে হুজুরের স্ত্রী

–আমাদের খালাম্মার পরম মমতায় রান্না করা মজাদার খাবার যথারীতি চলে আসতো আমাদের টেবিলে। আহা ! সে কি সুখের সময় ছিলো!

হুজুর ভিতরের ঘরে থাকতেন, কিন্তু সারাক্ষণই মনে হতো, আমাদের ঘাড়ের ওপরই আছেন। ডান-বাম করার সুযোগ নাই। পড়া ছাড়া উপায় নাই। কি আর করা, পড়া গিলা ছাড়া ! এর মধ্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা, কখন বিকেল হবে, খেলা ও বেড়ানোর ছুটি পাবো। সে এক অনন্য স্বর্গীয় আনন্দসুখে কেটেছিলো আমাদের শিক্ষা ও ছুটিময় দিনরাত্রি।

আমাদের এই নিঃস্বার্থ, নিষ্কলুষ আনন্দ স্মৃতির সোনালি কণাগুলো কি পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার অপার করুণা ও রহমত হয়ে বর্ষিত হতে পারে না, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় হুজুরের বিদেহী রুহের ওপর? ও আল্লাহ! আপনি তো রাহমা-নুর রাহিম।

১০. এক নিরহংকার, নিভৃতচারী হক্কানি জ্ঞানতাপস ও রুহানি ধ্যানসাধক হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি :

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আত্মিক আধ্যাত্মিক ধ্যানী ও জগদ্বিখ্যাত বুজুর্গ সাধকদের বর্ণিল লালনভূমি, জ্ঞান ও রুহানি ধ্যানসাধনার স্বর্ণিল উপত্যকা এই চুনতি। উপমহাদেশের বিখ্যাত সুফি, অলি, বুযর্গ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্কলার্স ও আলিম-ওলামা-প্রসবিনী এই চুনতি, দূরের কাছের, ভেতর বাইরের সবাইকে তার রক্তভাঙা লালমাটিয়ার বুকে-পিঠে ঠাঁই দিয়েছে অবারিত।

এই সরল মাটির বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা এতোই খাঁটি ও ফলপ্রসূ যে, এখানে আসা সকল আগন্তুক অতিথিই জ্ঞান ও ধ্যানের রুহানি আলোয় আলোকিত হবেনই। শত শত বছরের ধ্যানী সাধকদের ধ্যান, সাধনা ও রিয়াজত, পদচারণার বরকত, এই জনপদকে গড়ে তুলেছে এমনই রত্নপ্রসবিনী হিসেবে। তাই বরাবরই এখানকার স্বল্প জ্ঞানসাধনা কিংবা ধ্যানসাধনা, দুটোই ব্যাপক ইলমি ও রুহানি তরক্কির নুরানি সোপান হিসেবে প্রতিভাত হয়। খালেস নিয়ৎ ও বিশুদ্ধ আমলের মাধ্যমে অন্যস্থানের দশ বছরের ধ্যান-সাধনার ফসল, এখানে দশমাসে অর্জনের সুযোগ, সম্ভাবনা ও সৌভাগ্য বিদ্যমান। এসবই অলি, বুজুর্গানের ইবাদত ও রিয়াজতের বরকত এবং পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার রহমত।

চুনতির এই কীর্তিময় কৌলিন্য ও সম্ভ্রান্ত সুনাম হুজুরের মুখেই শোনা। চুনতির জন্য এবং এর বুজুর্গানের জন্য হুজুরের অন্তরে ছিলো এমনই নিখাদ সম্মাননা ও হৃদ্যিক সমীহ। এজন্যই তিনি চুনতির বাইরে কোথাও বেশিদিন থাকতেন না, এমনকি নিজের বাড়িতেও না। তাই তো, তিনি তাঁর চিরনিদ্রার শেষ বিছানাও নিয়েছেন, চুনতিরই বুকে।

হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র জীবন ছিলো নিখুঁত শৃঙ্খলার ছকে বাঁধা রুটিন। ঘড়ির কাঁটার সাথে যেন সবকিছু বাঁধা। দিনের চব্বিশ ঘণ্টার একটি মুহূর্তও পরিকল্পনাহীন নিরর্থক এলোমেলো ব্যয় করতেন না। তাঁর প্রতিটি কাজ পূর্ব-পরিকল্পনা, ধারাক্রম ও সময়ানুবর্তিতার ছকেই সম্পন্ন করতেন। কখনো এর ব্যত্যয় হতে দিতেন না। হুজুর, পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া কোনোদিন কোনো ক্লাসে পাঠদান করতেন না। হুজুর তাঁর দৈনন্দিন ক্লাসের পাঠদান প্রসঙ্গে পূর্বপরিকল্পিত– ক্লাস পরিকল্পনা, ক্লাস কাঠামো, ক্লাস প্রস্তুতি ইত্যাদি নিয়মিত রুটিন আকারেই অনুসরণ করতেন। তাঁর সবকিছুই লিখিত থাকতো।

হুজুরের দিন শুরু হতো তাহাজ্জুদ নামাজের মধ্য দিয়ে। অতঃপর একে একে ফজরের নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, কিতাব অধ্যয়ন, লেখালেখি। সবকিছুর জন্যই সময়ক্রম নির্দিষ্ট থাকতো। এমনকি বাদে আসর মাথায় পানি ঢালতেন, সেটাও প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট নিয়মে।

কারো জীবনে কুরআন হাদিসের এত পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ এমনভাবে খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। অন্যের হক্বের ব্যাপারে হুজুরের সচেতনতা ছিলো অনুকরণীয়। অপরের পাওনা পাই-পয়সা পর্যন্ত হিসেবে করে আদায় করে দিতেন। শরিয়াহ পরিপালনের ক্ষেত্রে ছিলেন, চুলচেরাসুক্ষ্ম বিশ্লেষক।

যেমন, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করতে হয়, ডান পা পরে। আর জুতা পরার সময় ডান পা আগে পরতে হয়, বাম পা পরে। অনেকে এ দুটি আমলের ক্ষেত্রে ঝামেলা মনে করে, যে কোনো একটি আমল বাদ দিয়ে দেন। যেমন, হয় মসজিদ থেকে বাম পা দিয়ে বের হতেই, বাম পা দিয়ে জুতা পরে নেন ঝামেলা এড়ানোর জন্য। অথবা মসজিদ থেকে ডান পা দিয়ে বের হয়ে যান, ডান পায়ে জুতা পরার সুবিধার জন্য। এভাবে ঝামেলা এড়ানো জন্য যে কোনো একটি আমল বাদ দিয়ে দেন অনেকেই। কিন্তু হুজুর, উভয় আমলই আদায় করতেন সচেতনভাবে। প্রথমে মসজিদ থেকে বাম পা বের করে জুতার ওপর দাঁড়াতেন, এরপর ডান পা পরে বের করতেন, এবার প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরতেন অতঃপর বাম পায়ে। এভাবে, উভয় সুন্নাতই আমল করতেন সাবলীলভাবে।

হুজুর, ইবাদত ও আমলের ক্ষেত্রে ছিলেন কঠোর গোপনীয়তা রক্ষাকারী, প্রদর্শনী মুক্ত। হুজুরের টেবিলের পাশের চৌকিতেই তো আমি থাকতাম। রাতে হুজুর তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য উঠতেন পা টিপে টিপে সন্তর্পণে সংগোপনে। যেন আমাদের ঘুম ভেঙ্গে না যায়। দরজার ছিটকিনি খুলতেন নিঃশব্দে। তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন রুমে অন্ধকারে, অতঃপর, ফজরের আযান হলে মসজিদে যেতেন। মসজিদে দাঁড়াতেন কোনো এক পিলারের আড়ালে, যেন মসজিদে ঢুকতে সরাসরি কেউ না দেখে।

যাঁর হৃদয় ছিলো আল্লাহ ও নবীজির প্রেমের শহর। যাঁর রচিত হামদ না'ত ছিলো, আল্লাহ ও নবীপ্রেমের আবেগি আকর। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে প্রেম জারি ছিলো অবিরাম। এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ-রাসুলের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হননি। যিনি তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে ফজরের নামাজের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় মওলা'র সান্নিধ্যে চিরবিদায় নিলেন, রবিবার, ৪ মার্চ, ১৯৭৯ সাল। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সমাপনী

যোগাযোগব্যবস্থা দুর্বল। ল্যান্ডফোনে এবং সরাসরি খবর দেয়া ছাড়া আর কোনো সহজ মাধ্যম ছিলো না। এমন অবস্থায়ও হাজার হাজার ভক্ত, ছাত্র, মুসল্লি জানাযায় শরিক হলেন। এর মধ্যে জানাযার নামাজ পাওয়ার সুযোগ নেই, এমন দূরত্ব থেকে কেউ কেউ জানাযায় উপস্থিত হয়েছেন, স্বপ্নে মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে। চট্টগ্রাম শহর থেকে এই গুনাহগারেরও এক অলৌকিক স্বপ্নের সুবাদে তড়িঘড়ি চুনতি গিয়ে প্রিয় হুজুরের পবিত্র জানাযার নামাজ নসিব হয়। শোকর আল-হামদুলিল্লাহ। হে, মহান রাব্বুল আলামিন, আপনার ও আপনার প্রিয় নবীর প্রকৃত প্রেমিক, কিংবদন্তি সাধক পুরুষ, আমার প্রিয় হুজুরকে দয়া করে জান্নাতুল ফিরদৌস নসিব করুন, আমিন!

আমার স্মৃতিতে দাদাজান

জোহরা জেবীন (বেবী)

আমার দাদাজানের জীবনীগ্রন্থ রচিত হচ্ছে। বিশাল কলেবরে, গণ্যমান্য, বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের অসাধারণ লিখনীর নৈপুণ্যে অবিভক্ত ভারত হতে আরম্ভ করে বাংলাদেশের জন্ম ও বিস্তার পর্যন্ত সুবিস্তৃত কর্মযজ্ঞের ঘটনাবলিসহ দাদাজানের বহুমাত্রিক প্রতিভার বর্ণনায় সম্ভারটি পরিপূর্ণ থাকবে। এই রথী-মহারথী বহু গুণীজনের পঙ্‌ক্তিমালার সমাহারে আমার লিখনী এক দুঃসাহসী প্রচেষ্টামাত্র।

আমি আমার দাদাজান আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র আবু ছফা মোহাম্মদ নাজিমুদ্দিন আহমদের *জ্যেষ্ঠকন্যা জোহরা জেবীন (বেবী)*। দাদাজান যতটুকু না আমার স্মৃতিতে আছেন তার চেয়ে বেশি আছেন অনুভবে। অস্তিত্বে তো আছেনই আমার দেহবল্লরীর ধমনীতে তাঁর রুধিরধারা প্রবহমান। আজ লিখতে বসে, স্মৃতির দুয়ার খুলে দিলাম। আবছা কুয়াশার উত্তরীয় সরাতে সরাতে পৌঁছে গেলাম অতীতের সুদূর বিস্মৃত দিনগুলোতে। খুঁজে ফিরতে লাগলাম স্মৃতির ভাণ্ডারে দাদাজানকে। আমার জন্ম আব্বার কর্মস্থল বেলুচিস্তানের রাজধানী বরফে ঢাকা সুরমা রংয়ের পাহাড়ে পরিবেষ্ঠিত আখরোট-কাজু-কিসমিস-ঘেরা কোয়েটা শহরে। ঊনসত্তরের উত্তাল সময়ে আব্বা সরকারি চাকুরে হওয়ায় বদলি হয়ে ঢাকায় আসেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ঢাকায়, মাঝে গ্রামের বাড়িতে পরে আবার ঢাকায় আসতে হলো আব্বাকে চাকরিতে যোগদানের জন্য, সঙ্গে আমরাও। বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের দিন ১৬ ডিসেম্বর আব্বাসহ পাগলা জেঠা (মাহবুব জেঠা) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের রেসকোর্সের মাঠে যান যেখানে আরোরার নিকট নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন। আব্বাসহ সবাই অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে জয়ধ্বনি দিতে দিতে আমাদের মগবাজারস্থ বাসায় আসেন। আমি তখন খুবই ছোটো, আব্বা আমাকে কোলে তুলে নিলেন জয়বাংলা ধ্বনি দিতে দিতে। আর বছর দেড়েক পর কেনো জানি না, আব্বা আমাদের গ্রামের বাড়িতে রেখে আসেন। তখন আমার কিছুটা বুদ্ধি হয়েছে। এটা ১৯৭৩-৭৪ সালের কথা। আমি তখন বাবুনগর প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রী। সেই সময়ে দাদাজানকে যতটুকু দেখেছি তাই স্মৃতিচারণ করার প্রয়াস মাত্র। কারণ দাদাজান উনার তখনকার কর্মস্থল চুনতি মাদরাসায় অবস্থান করতেন, সেটা আমাদের নিকট বর্তমান অক্সফোর্ড-ক্যামব্রিজের চেয়ে কোনো অংশে কম প্রসিদ্ধ ছিলো না। দাদাজান সপ্তাহে দু'সপ্তাহে দু'-একদিনের জন্য বাবুনগর মক্কার বাড়িতে নিজ আলয়ে আসতেন। সেই কারণে আমার মানসপটে উনার স্মৃতি কয়েকখানা মাত্র। এজন্যই উপরিউক্ত ভূমিকার ঘনঘটা।

কোনো এক ঈদুল ফিতরের দিনের স্মৃতি আমার হৃদয়পটে আজও শুকতারার মতো জ্বলজ্বল করে আছে। আমার দেখা দাদাজানের অবয়ব এভাবে স্মৃতিপটে গ্রথিত আছে। দাদাজান ঈদগাহে নামাযে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে ঘর থেকে পাকা শান বাঁধানো বারান্দায় এসে দাঁড়ান। আমি ঠিক এক চিলতে উঠোন পেরিয়ে ঠিক সামনাসামনি ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ঈদের পোশাকে। মুগ্ধ হয়ে দাদাজানের দিকে তাকিয়ে আছি। দাদাজান শুভ্র ধবল পায়জামা-পাঞ্জাবি

পরিহিত, তার ওপরে কালো রঙের সাদা ডোরাকাটা আজানুলম্বিত আলোয়ান, মাথায় চারদিকে সাদায় গুটি গুটি করা রুমাল। ঠিক যেমনটি শেখরা পরিধান করে সেভাবে পরিপাটি করা পরিধেয়। কালো আলোয়ানের বামদিকের পকেটে রুপালী চেইন লাগানো ঘড়ি, পায়ে কালো রংয়ের জুতো পরা সুন্দর, সুদর্শন পুরুষ। প্রায় ছয় ফুটের মতো একহারা দীর্ঘ ঋজু দেহ। গৌরবর্ণ, আর্য চেহারা, নাক খাড়া, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, ছোটোও নয়, আয়তও নয়। চোখে সুরমা দেয়া লম্বাটে চেহারা, সুগঠিত চিবুক, সাদা চাপদাড়ি। একটু কেশ তবে বলিষ্ঠ পৌরুষের ব্যঞ্জনা তাঁর সর্বাঙ্গে। গুরুগম্ভীর এবং সর্বোপরি কঠিন ব্যক্তিত্বের আবরণ যা দুর্ভেদ্য। উনি বুক-পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখলেন, আবার যথাস্থানে রাখলেন। যেনো এক সুলতান তৈরি হয়ে এলেন দরবারে যাওয়ার জন্য। এরপর চকচকে লাঠিতে ভর দিয়ে সতর্কভঙ্গিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দৃঢ় পদক্ষেপে ঈদগাহে চলে গেলেন। আমিও মুগ্ধ আবেশে দূরত্ব বজায় রেখে উনার পিছু পিছু ছোটো ভাইদের হাত ধরে কোম্পানি হাটখোলা ঈদগাহে গেলাম। আমার বেশ মনে পড়ছে, দাদাজান ঈদের নামায পড়ালেন, বয়ান দিলেন। আমি বহুদূর থেকে উনাকে দেখছি আর মুচ্চড়ি খাচ্ছি।

এই মুহূর্তে আমার চোখের পলকে আর একটি স্মৃতি ভর করছে। গ্রামের বিকালবেলা, রোদ মরে এসেছে, চারিদিকে বেশ একটা শান্ত-ভাব। আমরা ছোটোরা বাড়ির উঠানে খেলছি। দাদাজান সাধারণত শুক্রবার নয়তো শনিবার আসতেন চুনতি থেকে। তখন সাপ্তাহিক ছুটি ছিলো রবিবার। যেদিনের স্মৃতিটি উল্লেখ করছি সেদিন দাদাজানের আসার কথা নয়। তাই সব ঢিলেঢালা চলছে। হঠাৎ একটা গলার খাকারী শোনা গেলো। নিমিষের মধ্যে উঠানে ক্রীড়ারত ছেলেমেয়েরা উবে গেলো। আমি উঠানের এককোণে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলুম দাদাজান রসগোল্লার হাড়ি হাতে বাড়িতে প্রবেশ করলেন। এ দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। উনি ব্যাগ ও হাতের লাঠি ছাড়া কোনো কিছু বহন করতে এর আগে কোনোদিন দেখিনি, অভ্যস্তও নন। আজ আর খেলার অবকাশ নেই বুঝতে পারলাম। গোধূলি বেলার সোনালি বিকেল ফিকে হয়ে আসছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। আমি বাড়ির ভিতরের পুকুরের দিকে চললুম। তখনকার দিনে সন্ধ্যার আগে ছোটো ছেলেমেয়েরা হাত-মুখ ধুয়ে ডেয়ালা অর্থাৎ বারান্দায় বসে মাদরাসায় শেখানো নামাযের সুরাসমূহ উচ্চস্বরে পাঠ করতো। অন্ধকার হয়ে গেলে পাটি বিছিয়ে হারিকেনের আলোয় স্কুলের পড়া উচ্চস্বরে মুখস্থ করতো। আমিও পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে শুনি দাদাজান ছোটোদের সবাইকে বারান্দায় ডেকেছেন। আমার যতদূর মনে পড়ে আমরা তখন চার ভাইবোন আর আবুল ওফা চাচা, আবু রেজা চাচা, হোছামুদ্দিন চাচা, হুমায়রা ফুপি ও সেলিম বারান্দায় একত্রিত হই। দাদাজান এসে জলচৌকিতে বসলেন। মিষ্টির হাড়ি থেকে নিজ হাতে আমাদের সবাইকে কয়েকটি করে রসগোল্লা খাইয়ে দিলেন এবং খুব আনন্দিত স্বরে বললেন, খাও। আমাদের মুখে কোনো কথা নেই, মুখে গোগ্রাসে মিষ্টি গিলছি। তখনকার সময় বিকালে নাস্তা বলে কিছু ছিলো না মুড়ি (উরুম) ছাড়া। এ যে রসগোল্লা! সেই রকম মজা! পরে বড়োদের কাছ থেকে জেনেছিলাম দাদাজান চুনতিতে সেজ ফুপির আক্‌দ পড়িয়ে এসেছেন। তাই আমরা তাঁর স্পেশাল আদরের পরশ পেলাম। আর একটি বেশ মজার স্মৃতি মনে পড়ছে। দাদাজান যেমন আমিও যেনো উনার কিছুটা প্রতিচ্ছবি। দাদা-নাতনির যে সাধারণ চিত্র বেশ আহ্লাদ-আবদার, ঠাট্টা- রসিকতার লেশমাত্র নেই পিতামহ-দৌহিত্রীর মধ্যে। দাদাজান বাড়ি আসামাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে গোটা বাড়ির পরিবেশ কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন

হয়ে যেতো। গত রাতে দাদাজান বাড়ি এসেছেন। সকাল এগারটার দিকে আব্বা একটা বড়ো মাছ কেটে আমাকে পুকুরঘাটে ঘষে-ডলে ধুতে পাঠালেন; কারণ দাদাজান পুকুরে গোসল করতে গেছেন। উনি সাধারণত আমাদের পশ্চিমের মসজিদের বড়ো পুকুরে স্নান করতে যেতেন। সেদিন কেনো জানি না বাড়ির পুকুরে গেলেন। আমিও গোটমাছ নিয়ে পুকুরে গেলাম। পাকা কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এক পাশে মাছ ধুতে লাগলাম। দাদাজান সবেমাত্র ডুব দিয়ে নেমে উঠে অপর পাশে লুঙ্গি বদলে ভেজা লুঙ্গি ঘাটে রেখে চলে গেলেন। ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি আমার আম্মা ও দাদীজানকে ডেকে বললেন, আমি ঘাটে ভেজা লুঙ্গি রেখে এসেছি। দেখি, আমার নাতনির কতোটা বুদ্ধি। আর এদিকে আমি মাছ ভালোভাবে ধুয়ে ফিরে দেখি, দাদাজানের ভেজা লুঙ্গি ঘাটের একপাশে পড়া। আমি খুব অবাক হলাম। কারণ এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি কখনো দাদাজানকে ঘাটে কাপড় রেখে আসতে দেখিনি। নিজের লুঙ্গি-গামছা স্নান সেরে এসে খড়ম পায়ে বাড়ির উঠানের তারে মেলে দিতেন শুকানোর জন্য। আমি তখন কিশোরী, তবে ঠিক বুঝতে পারলাম, আমাকে দাদাজান পরীক্ষা করার জন্য এই কাণ্ডটি করেছেন। আমিও লুঙ্গিটি ভালোভাবে ধুয়ে এনে আম্মাকে মাছের পাত্রটি দিয়ে কাঁধে রাখা ধোয়া লুঙ্গিটি উঠানের তারে শুকাতে দিয়ে চুল উড়াতে উড়াতে বাড়ির ফটক দিয়ে পূর্বদিকে খেলতে চলে গেলাম।

দাদাজান আমার আম্মাকে অতিশয় স্নেহ করতেন। আম্মাকে 'আম্মিজান' বলে সম্মোধন করতেন। আম্মার হাতের পশ্চিমী রন্ধন দাদাজানের খুব পছন্দের ছিলো। আমার আম্মা অত্যন্ত সাদাসিধা, সহজ-সরল, পরিশ্রমী, স্বল্পে-তুষ্ট, শ্বশুরবাড়ি-অন্তঃপ্রাণ এক রমণী। গ্রামের বাড়ির ছোটো-বড়ো, ধনী-দরিদ্র, দূরের-কাছের, উঁচু-নিচু সবাইকে সম্মান ও সমাদর করতেন। এজন্যই আমার মনে হয় দাদাজান উনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কষ্টিপাথরে যাচাই করে স্নেহের পরশ বুলিয়ে নিয়েছিলেন উনার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধুটিকে। তিনি অকপটে আম্মার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে নিজের মতামত জানাতেন। দাদাজান বেশ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতেন। আমার মনে পড়ে, বারোটা-সাড়ে বারোটায় উনি দুপুরের আহার গ্রহণ করতেন। দাদাজান বাড়িতে অবস্থানকালীন আম্মা উনার পছন্দ মতো ভালো কিছু রান্না করে রাখতেন।

আম্মা উনার শ্বশুর মশাইকে অদ্যাবধি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করেন। আম্মার মুখে শুনেছি, আমার জন্মের পর যখন সবে বসতে শিখেছি তখন আম্মা ফটোগ্রাফ তুলে আমার মুখটুকু রেখে বাকিটুকু কেটে সুদূর কোয়েটা থেকে দাদাজানের নিকট পাঠান। দাদাজান তাঁর প্রথম দৌহিত্রীর মুখচ্ছবি দেখে নাকি আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন। উনার ওয়ালেটে আমার ছবি স্থান পায় এবং সবাইকে দেখাতেন। এই স্নেহার্দ্রটুকু আমার হৃদয়কে আজো আনন্দিত করে আর নয়নকে করে সিক্ত। দাদাজান আম্মাকে এতোটা স্নেহ-ভালোবাসা দিয়েছিলেন যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রবধু হিসেবে নিজবাড়িতে আগমনের জন্য সাদর আহ্বান জানিয়ে সম্মানিত করেন। আম্মাসহ আমরা দুই ভাইবোন প্রথম পূর্ববাংলায় গ্রামের বাড়িতে আসলে অত্যন্ত উৎসব-আনন্দের আয়োজনের সাথে বরণ করে নেন। শ্বশুরবাড়িতে পর্দাপণের পর আম্মা উনার শ্বশুরসহ সব বয়োজ্যেষ্ঠদের আদেশ-উপদেশ কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করার এমন নজির আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি, দাদাজানের সাথে আম্মা দাদিজানেরও পূর্ণ স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছিলেন। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে দাদীজান দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে হোছামুদ্দিন চাচা জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেন। এক ভর-সন্ধ্যায় দাদীজান এলেন হোছামুদ্দিন চাচার সাথে আমাদের ঢাকার পশ্চিম রামপুরাস্থ বাসায়, যেনো খুশির জোয়ার বয়ে গেলো আমাদের মাঝে। আব্বা-আম্মা দাদীজানের সেবা-শুশ্রুষার সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার সচেষ্ট হন। আমি ও আমার প্রয়াত স্বামী দুজনেই সরকারি-বেসরকারি হাতপাতালে সুচিকিৎসার জন্য ভর্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমার ছোটবোন টুনি দাদীজানের জর্দার কৌটা লুকিয়ে ফেলে দিতো জাতীয় চিকিৎসক প্রফেসর ডা. নূরুল ইসলামের নির্দেশে। আমি তখন ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের বি.এড-এর ছাত্রী। দাদীজানকে মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখার জন্য আমি তাঁকে সাথে নিয়ে টি.টি কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার কাছে বসে চটপটি খাওয়া, শিশুপার্কে বেড়ানো আব্বার অফিসে Geologycal Servey of Bangladesh কাকরাইলে নিয়ে যাই। আব্বা তো অবাক হয়ে গিয়ে নিজের চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে মাকে বসান। আর আম্মা হাসপাতালে রান্না করে খাবার পাঠানো, বিকালে ডাক্তারখানায় নিয়ে ইনজেকশন দেয়াসহ তিনমাস হাসিমুখে শাশুড়ির খেদমত করেন। বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় দাদীজানও আম্মাকে অশেষ দুআ' করে যান।

১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসের এক গ্রীষ্মের সকালবেলা আব্বা আমাদের সবাইকে ঢাকায় নিজ কর্মস্থলে নিয়ে আসেন নয়াটোলাস্থ বাসায়। গ্রামের অবারিত মাঠ-ঘাট-প্রান্ত-পাহাড়ি বাগান এমন বাঁধনহারা কিশোর জীবন ছেড়ে ঢাকার আবদ্ধ জীবনে একা একা কেঁদে ফিরেছি বহুদিন। তারপর শুরু হলো আমাদের শিক্ষাজীবনের দ্বিতীয় স্তর। যখন আমি সপ্তম/অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী আব্বা তখন প্রায় রবিবারে আমাকে ও সালাউদ্দিনকে কাকরাইলে বাসা হওয়ায় রমনাপার্কে নিয়ে গিয়ে বাংলা ও ইংরেজি পড়াতেন। সেই সময় প্রায়শই আব্বা দাদাজানের কৃতিত্বপূর্ণ শিক্ষাজীবন, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, বড়োলাট কর্তৃক নিয়োগকৃত দারুল উলুম কুদসিয়া আকড়া আলিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা পদে যোগদানের পর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা– ১৯৪২ সালের পর কর্মজীবনের শেষে চুনতিতে যোগদান, তদানীন্তন রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তৃতা প্রদান, ইসলামি সমাবেশে তথ্য-তত্ত্ব সমৃদ্ধ আলোচনা, সিরাতুন্নবীর প্রধান পরিকল্পনাকারী ও প্রবর্তকসহ ঘটনা আমাদের শুনাতেন। লাহোরের শাহি মাদরাসায় দাদাজানের রচিত গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্তকরণ আব্বা আমাদের অবহিত করে যেনো তৃতীয় নয়ন খুলে দেন। চুনতিতে আব্বার অধ্যয়নের সময় প্রশাসনের গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের আগমনে দাদাজানের স্বরচিত ফার্সি কবিতা আব্বা মাত্র নয় বছর বয়সে স্টেজে অভিনয়সহ আবৃত্তি করে পরিবেশন করে প্রশংসা লাভ করেন। আব্বার গলা সুরেলা, এই প্রায় পঁচাশি বছর বয়সেও তার রেশ আছে। মির্জা গালিবের সুদীর্ঘ শের (কবিতা) মুখস্থ সুরেলা গলায় গেয়ে যান অবলীলায়। আব্বার কাছে আরো শুনেছি, বেশ কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী দাদাজানের রচিত বহু গ্রন্থের নাম। হাতের লেখার সুখ্যাতি, প্রথম পৃষ্ঠায় ঠিক যে আকার-আয়তনে, সৌন্দর্যে লেখা আরম্ভ করতেন শতপৃষ্ঠা শেষে সেভাবেই বহাল থাকতো। আরো জানলাম শ্রদ্ধেয় জেঠা মরহুম জনাব ফরিদুল আলম চৌধুরী প্রায় ছত্রিশ বছর আমাদের এলাকার চেয়ারম্যান ছিলেন। তখন সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আগমনে দাদাজানকে

আমন্ত্রণ জানাতেন জেঠা এবং দাদাজানই উনাদের সাথে এলাকাসহ দেশ-দশের উন্নতি সমৃদ্ধিকল্পে জ্ঞানগর্ব আলোচনা করতেন। চট্টগ্রাম জজকোর্টের জুরিবোর্ডের একজন সম্মানিত সদস্যও ছিলেন আমার দাদাজান। আমার প্রপিতামহও বিদ্বান, জ্ঞানী-গুণী ও কামেল ব্যক্তি ছিলেন বলে আব্বা গর্ব করতেন।

দাদাজানের সম্যক ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়ে ধীরে ধীরে আমার অনুভবের মানসপটে একটি স্থান তৈরি হয়। আমার দেখা রূপের সাথে অনুভবের ব্যক্তিত্বের নিপুণ সমাহার ঘটে। আমার মনের একান্তে মনে হতে লাগলো, দাদাজানের এই দুর্লভ গুণাবলির বিমূর্ত যে রূপ আব্বা ও আমাদের মাঝে ছড়াচ্ছে তার বিশেষ কোনো দিক আছে। আব্বা আমাদের অলক্ষ্যে বংশের ঐতিহ্য-গৌরবোজ্জ্বলগাঁথা অবগত করে নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণা দিচ্ছেন অনাগত কোনো সোনালি দিনের আবীরকে। আমার জীবনও খুব মসৃণ ছিলো না। এসএসসির পর মেয়েদের জীবনে অভিভাবকত্বের হাত-বদল ঘটে। আমার জীবনেও তাই ঘটলো। কিন্তু আমি কোনোদিন ভুলিনি, আমাকে আমার দাদাজানের যোগ্য দৌহিত্রী হতে হবে। সংসার জীবনের শত প্রতিকূলতা সত্ত্বে ও সমান্তরালভাবে আমি শিক্ষাজীবন চালিয়ে গেছি। এই সর্বোচ্চ কৃতিত্ব অর্জনে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন আমার প্রয়াত স্বামী ওমর ফারুক চৌধুরী। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানিতে আজ আমি বাংলাদেশের খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকার ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ-সহ বিভিন্ন খ্যাতিমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

আব্বা বয়সের কারণে লিখতে প্রায় অক্ষম হওয়ায় দাদাজানের স্মৃতিচারণ করেছেন আমার নিকট তাঁর কাছ থেকে শোনা কিছুকথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

দাদাজান চুনতি মাদরাসার প্রধান হওয়াতে মাদরাসায় পাঠদান চলাকালে তিনি পরিদর্শনে যেতেন। কোনো সময় কোনো শ্রেণির শিক্ষক উপস্থিত না থাকলে তিনি স্বয়ং ঐ শ্রেণিতে পাঠদান করতেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দাদাজান সর্ববিষয়ে যেমন- তাফসির, হাদিস, ফিকাহ, মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন বলে পাঠদান করতেন অবলীলায়। আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, দাদাজানের পাঠদান সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ছাত্রটিও বুঝতেন এবং আনন্দিত হতেন কারণ, পাঠদানকালে কঠিন বিষয়কে খুব সহজবোধ্যভাবে তিনি উপস্থাপন করতে পারতেন। দাদাজানের কণ্ঠস্বর ছিলো সুন্দর ও সাবলীল। তাছাড়া দাদাজান যখন শুদ্ধভাষায় কথা বলতেন বা বক্তৃতা দিতেন তখন নদীয়া শান্তিপুরের বাংলাভাষা ব্যবহার করতেন। উনার বাংলা বক্তৃতা শুনে বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ও যশস্বী ব্যক্তিরাও মুগ্ধ হতেন। তিনি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দাদাজান অন্যান্য ওয়াজি মাওলানাদের মতো সুর করে টেনে টেনে ওয়াজ করতেন না, উনার ওয়াজ করার নিজস্ব সুন্দর ধরন ছিলো। আব্বা আরো বলেছেন, দাদাজানকে তিনি প্রায়ই লিখতে দেখেছেন, পড়তে দেখেছেন কদাচিত। মাদরাসার প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ যে কোনো বিষয়ে পাঠদানে সমস্যায় পড়লে দাদাজানের কাছে ছুটে আসতেন এবং তিনি মুহূর্তেই তাদের সমাধান দিতেন। দাদাজান 'হাজের জওয়াব' (উপস্থিত উত্তরদাতা) ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এক মিনিটও কেউ তর্কে টিকে থাকতে পারতো না।

আব্বা আরো বলেন, কলকাতা মাদরাসায় থাকাকালীন দাদাজানের নিকট প্রায়ই হিন্দু, ব্রাহ্মণ ও খ্রিস্টান পাদ্রীরা আসতেন এবং ধর্মীয় প্রশ্ন করতেন যার সবসময় উপযুক্ত উত্তর দিতেন দাদাজান। আব্বা যখন ১১-১২ বছর বয়সের তখন দাদাজান অন্য কাউকে বলতে শুনেছেন যে, একবার এক পাদ্রী ঘোড়াগাড়িতে চড়ে এসে দাদাজানকে প্রশ্ন করেন, "মাওলানা সাহেব আপনারা বলেন যে, আপনাদের নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী কিন্তু তিনি মাটির নিচে কবরে শায়িত আছেন অথচ আমাদের নবী হযরত ঈসা (আ.) তৃতীয় আসমানে অবস্থান করছেন"। তখন দাদাজান উত্তর দিলেন, "আপনি তো ঘোড়াগাড়ি করে এসেছেন, আপনি ঘোড়াগাড়ির কোথায় বসেছিলেন আর ঘোড়াগাড়ির চালক কোথায় বসেছিলো?" একথা শুনে পাদ্রী মহাশয় দাদাজানকে ধন্যবাদ দিয়ে তড়িঘড়ি করে প্রস্থান করেন।

আব্বার মুখের বর্ণনায় আরেকটি ছোটো ঘটনা। তখনকার দিনে আমাদের বাড়ি থেকে চট্টগ্রাম শহরে যেতে দোহাজারী থেকে রেলগাড়ি করে যেতে হতো। একবার দাদাজান ও আব্বা রেলগাড়িতে চড়ে চট্টগ্রাম শহরে যাচ্ছিলেন। বগিতে উপবিষ্ট এক হিন্দু ব্রাহ্মণ রেলগাড়ির ঐ বগির সকল মুসলিমযাত্রীদের উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেন, "আমাদের হিন্দুধর্মে তারিখ গণনা করা হয় দিবস থেকে। কিন্তু আপনাদের তা করা হয় রজনী থেকে, এটা কি সঠিক?" বগির সকল যাত্রীরা নীরব হয়ে রইলো। দাদাজান এমন পোশাক পরিধান করতেন যাতে অপরিচিতরা তাঁকে সওদাগর বলে মনে করতেন। উল্লেখ্য যে, তখনকার দিনে বড়ো ও অভিজাত ব্যবসায়ীদের সওদাগর বলা হতো। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন দাদাজানকে লক্ষ্য করে বললেন, "সওদাগর সাহেব, অন্ততপক্ষে আপনি তো কিছু বলেন।" তখন দাদাজান বললেন, "কেউ গাছে উঠলে আগা দিয়ে নাকি গোড়া দিয়ে ওঠে?" সবাই বললেন, "গোড়া দিয়েই উঠতে হয়"। দাদাজান বললেন, "কিন্তু ব্রাহ্মণ মশাই যদি আগা দিয়ে উঠতে চান তাহলে আমি কি বলবো"। তখন ব্রাহ্মণ বললেন, "আপনার কথাটা বুঝতে পারলাম না"। তখন দাদাজান বললেন, "গোড়ায় ছিলো অন্ধকার, আলো এসেছে সূর্যের আবির্ভাবের পর। সেজন্য আমরা মুসলমানেরা রাত থেকে তারিখ গণনা করি।" এরপর বগির সব যাত্রীরা হর্ষধ্বনি দিয়ে উঠলো। এরপর ব্রাহ্মণ মশাই পরের স্টেশনে নেমে যান।

১৯৭৯ সালের ৪ মার্চ দাদাজান এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। রেখে যান এক অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর। দাদাজানের স্মৃতিচারণও উনার দুর্লভ প্রতিভার নানাদিক অবলোকনের পর আমার মনে হয়, তিনি বড়ো বেশি নেপথ্যচারী ছিলেন। প্রসিদ্ধির প্রতি উনার কোনো মোহ ছিলো না; বরং এড়িয়ে গেছেন। প্রচারই প্রসার বর্তমানের এই ধরনের কোনো প্রয়াস উনার জীবনধারায় বিন্দুমাত্র পরিলক্ষিত হয়নি। আমার পিতামহের এই অসাধারণ যশস্বী প্রতিভা বহুমাত্রিকতা নিয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের ধারায় নিরন্তরভাবে বিকশিত হোক, আলোকিত হোক এই সুন্দর ভুবন। এই অনুপম আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশা আমার। পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা- তিনি যেনো আমার দাদাজানকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। আমিন, সুম্মা আমিন!

কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ-সমুদ্র সেঁচার প্রয়াস

চৌধুরী গোলাম রব্বানী

তিনি এক কিংবদন্তী! হয়তো তার চেয়েও বেশি! তিনি হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)। উনবিংশ শতকের শেষপাদে সাতকানিয়ায় জন্ম নেয় ধনাঢ্য-আলিম পিতার সন্তান; দেশে প্রাপ্ত সকল শিক্ষা সমাপন করে উপমহাদেশের ইলমি মারকাজ মাযাহেরে উলুম সাহারানপুরে যান। ছাত্র থাকাকালে তাঁর শিক্ষক বিশ্ববরেণ্য আলিম মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বজলুল মাজহুদ' রচনায় সহযোগী হন। কলকাতার উপকণ্ঠ আকড়ায় স্থাপিত কুদসিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাযাহেরে উলুম মাদরাসা কর্তৃপক্ষ আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহকে মাদরাসার হেড মাওলানা মনোনীত করেন। ২য় মহাযুদ্ধের কালে কলকাতায় জাপানি বোমা বর্ষণের ফলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। আল্লামা ফজলুল্লাহ গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন।

সাতকানিয়ার ঐতিহ্যময় গ্রাম চুনতির বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ এই সুযোগকে কাজে লাগান। তাঁরা আল্লামা ফজলুল্লাহর বাড়িতে এসে সবিনয় অনুরোধ করেন- তিনি যেনো চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসায় যোগ দেন। বিধিলিপি এমনই। চুনতিবাসীরা সফল, আল্লামা ফজলুল্লাহ বিফল! কারণ কলকাতায় মাদরাসা বন্ধ না হলে তিনি উপমহাদেশের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহে দ্যুতি ছড়াতেন। তাঁর দরস ও কিতাবি প্রকাশনা ব্যাপকতর হয়ে বিশ্বখ্যাতি এনে দিতো। ভাগ্যক্রমে চুনতির ইলমি পরিবেশ তাঁর পছন্দ হয়ে যায়, তিনি সেখানেই স্থিত হন।

এতদঞ্চলের মানুষ 'নাযেমে আলা' নামে তাঁকে জানে। অন্য প্রতিষ্ঠানে নাযেমে আলার পদ থাকতে পারে- অনেকে মনে করে আল্লামা ফজলুল্লাহর নাম 'নাযেমে আলা'। এই শব্দবন্ধ তাঁর কারণে সম্মানিত হয়েছে। দেশে কতো কতো কবি-সাহিত্যিক আছেন। তাঁদের লেখা ক'জনের স্মৃতিতে আছে? এমন এক সময় ছিলো আলেম-উলামা, শিক্ষার্থী, ছাত্র, সাধারণ মানুষের মজলিসে-আড্ডায় 'নাযেমে আলা'র লেখা হামদ-নাত মুখে মুখে ফিরতো।

"লবৌ পে তবসসুম হেঁ চেহরে মেঁ জ্বলওয়ে
নিগাহোঁ ছে শফকত বরস্তি রেহি থী
এক-এক লফযে শিরীঁ যো উনকি জবাঁ সে-
হোঁ, সুননে কো খিলকত তরস্তি রেহি থী!"

এটি 'যিকরে সরকারে কায়েনাত' অধ্যায়ে নাতের ১ম চরণ বাংলা ভাষার পাঠকই বলুন- কানে মধু ঢালা এমন শব্দমালার কি অর্থের দরকার আছে? শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কবিতায় শব্দ ব্যঞ্জনা দিয়ে শ্রোতাকে মোহাবিষ্ট করা। উর্দু ভাষায় হাতে গোনা কিছু কবি এ কাজ করতে পেরেছেন। হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) তাঁদের অন্যতম।

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য- 'নাযেমে আলা' মরহুমের সূর্যসন্তান, জাতীয় সংসদ সদস্য প্রফেসর ড. আল্লামা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী হাফিজুল্লাহর সম্পাদনায় 'কুল্লিয়াতে

ফজলুল্লাহ' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এটি দেখে আমার মনে হয়েছিলো বৈরুত বা কায়রো থেকে প্রকাশিত কোনো বই! এর কাগজ-ছাপা-বাঁধাই আন্তর্জাতিক মানের।

এদিকে আমিও পড়লাম বিপদে। আমার মতো ক্ষুদ্রজনের পক্ষে 'নাযেমে আলা'র মতো সমুদ্র মন্থন অবান্তর। আমার ক্ষুদ্র চামচে সমুদ্র সিঞ্চন কখনো সম্ভব নয়। কারণ প্রশংসায় ছোটোর মাপকাঠি ক্ষুদ্র হবার কারণে বড়োরা ছোটো হয়ে যান। যেখানে প্রখ্যাত আলিম, কবি ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আল্লামা সুলতান যওক নদভী লিখেছেন, "আমার মতো অধমের নাযেমে আলা (রহ.) সম্পর্কে কিছু লেখা বা আলোচনা করার যোগ্যতা নেই।' (দেখুন পেশগুফত, পৃ. ৪০)। তাঁর পূর্বে তিনি অভিমত দেন যে, "আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. এর মতো মানুষ হাজার বছরে জন্ম নেন।" (সূত্রঃ ঐ)

এখানে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন তালুকদার লিখেছেন, "এটি এমন ব্যক্তির উপাখ্যান এ দেশ তাঁর মতো খুব কমই দেখেছে... ইলম ও মারেফতের প্রতি তাঁর আগ্রহ তাঁকে হিন্দুস্থানি ইলমের মারকায হেদায়েতের মিম্বারে নিয়ে গেছে। তিনি পূর্ণতার সাথে যথার্থ উৎস থেকে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে স্বল্প সময়েই নিজেকে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত সুউচ্চ ইলমি মহল গড়েছেন। স্মৃতিশক্তি ও মেধার ক্ষেত্রে সর্বত্রই উপমা ছিলেন তিনি। ... তাঁর দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে মাদরাসা তথা দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের ফলে এক সময় ইলমি মহলে বড়ো বড়ো আলিম ও দাঈর দল বের হয়। ... আল্লামা ফজলুল্লাহ ছিলেন জ্ঞানকোষ ও ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার। ... তিনি ছিলেন সৃজনশীল প্রতিভাবান সুরুচিসম্পন্ন কবি। তাঁর কাব্যছত্র অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নির্গত। ইসলামি সমাজের বাস্তবতা, জাতির ব্যধি নিরাময়ে প্রতিষেধক নির্ণয় করতে এবং গৌরবময় অতীতের উজ্জ্বল ইতিহাসকে রূপ দিতে তিনি সফল হয়েছেন। ... তাঁর ইলমি কৃতিত্ব ও নানা বিষয়ে রচিত মূল্যবান কিতাবগুলো যার প্রমাণ। এগুলো তাঁকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রেখেছে। দেশের আলিম-উলামাদের মাঝে দিয়েছে এক বিশাল কর্তৃত্ব। যেই তাঁর গ্রন্থ/রচনাবলি পাঠ করে– সেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। এগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় উচ্চ শিক্ষার্থীদের জন্য অনুবাদ হওয়া আবশ্যক।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি ড. আবু রেজা নদভীকে তাঁর উত্তরসূরী বানিয়েছেন। যদি কেউ তাঁকে পিতার সদৃশ বলে তবে তা যথার্থই হবে। এই শাবকটি তো ওই সিংহ; যেমন পিতা তেমন পুত্র! আমরা তাঁকে পিতার অনুলিপি হিসেবে দেখতে পাই। তিনি তাঁর পিতার উত্তরাধিকারী হয়েছেন জ্ঞান, ধার্মিকতা, জ্ঞানের প্রচার-প্রসার, বিশুদ্ধ আকিদা, প্রজন্ম গঠন, সমাজ ও দেশের সেবার ক্ষেত্রে। ... তিনি ইসলাম ও মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আরব এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার এবং ক্ষতিগ্রস্ত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক সাহায্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা রাখার পথ সুগম করে দিয়েছে।

লোকে জানে, নাযেমে আলা (রহ.) বিখ্যাত শিক্ষক ও কবি ছিলেন। তাঁর দানশীলতা, সমাজসেবা, দরিদ্র পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে কম লোকই জানে। চুনতি মাদরাসার শিক্ষক মুফতি ইবরাহিমকে (পরে পটিয়া মাদরাসায় স্থিত) বাবুনগরের বাড়ি থেকে ধান বিক্রি করে ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন। (তখন মাদরাসায় এমপিও ছিলো না, ফান্ডে টাকা না থাকলে শিক্ষকরা বেতন পেতেন না)। তিনি বাড়ির ধান বিক্রি করে বেতন দিয়েছেন অনেক সময় যে

টাকা তিনি আর ফেরত নেননি। অগণিত এতিম-নিরাশ্রয় শিশুর শিক্ষা ও ভরণ-পোষণ করেছেন। সমাজ ও এলাকার কল্যাণ কাজে যুক্ত থেকেছেন। সকলেই জানি ঐতিহাসিক চুনতি সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলের আয়োজক ছিলেন শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.)। কিন্তু মাহফিলের পরিকাঠামো (খাকা) ও ব্যবস্থাপনা করেছিলেন হযরত নাযেমে আলা (রহ.)।

গ্রন্থটি ভূমিকা বাদে ১২ পর্বে বিন্যাস করা হয়েছে। সম্পাদক আল্লামা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি হাফিজাহুল্লাহ ১১ পৃষ্ঠার ভূমিকার ভেতর মহান পিতাকে উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর বিশ্বমানের জ্ঞান ও চিন্তা, সন্তানের হৃদয় এবং ইসলামি জ্ঞানের পাণ্ডিত্যে এটি একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের মর্যাদা পায়। এখানে পিতার মহত্ত্ব, সামাজিকতা, জ্ঞানের বিশালতা, কাব্য সাহিত্যের মান নিরুপনের চেষ্টা আছে। নদভী সাহেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে উপমহাদেশখ্যাত গুণিজন নাযেমে আলার (রহ.) প্রতি শ্রদ্ধা অর্পনের সুযোগ পেয়েছেন। মাওলানা যুলতান যওক নদভী, মাওলানা মুফতি আবদুল হালিম বুখারি, মাওলানা কারী মুহাম্মদ ইলয়াস, শাহ মাওলানা মুহাম্মদ কুতুবউদ্দিন, মাওলানা আবদুল মালেক হালিম, মাওলানা ফুরকান উল্লাহ খলীল, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসানউল্লাহ, ভারতের আফতাব আলম নদভী, প্রফেসর ড. নাজমুল হক নদভী, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন তালুকদার-সহ পরিশিষ্ট পর্বে মাওলানা শফিক আহমদ (রহ.), মাওলানা নঈম উল্লাহ, মাওলানা আবু তাহের কাসেমী নদভী, মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ, হাফেজ মাওলানা জাহেদ হোসাইন, ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী, মাওলানা মুহাম্মদ আমিন নদভী, মাওলানা শফিক আহমদ (শুলকবহর মাদরাসা) এবং মাওলানা মকসুদুর রহমান ফেরদৌস (রহ.), নঈমউল্লাহ বিন আবদুস সালাম প্রমুখ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। এদের অনেকে কবিতামালায় সম্মাননা জ্ঞাপন করেছেন- মরহুম পীরে বায়তুশ শরফ হযরত মাওলানা কুতুবউদ্দিন, মরহুম ড. মাওলানা শব্বির আহমদ, মাওলানা মুহাম্মদ ফুরকান উল্লাহ খলীল ও মাওলানা শফিকুল ইসলাম শায়েক।

এখানে গ্রন্থিত কাব্যগাঁথাগুলো ১১টি অনুচ্ছেদে বিন্যাস করা। ৮টি হামদে বারি তায়ালা, ২৯টি যিকরে সরকারে কায়েনাত, ৯টি গজল, ৫টি দেশাত্ববোধক, বিভিন্ন বিষয়ে ১৭টি, দুআ পর্বে ১৫টি, মদহিয়্যত (প্রশংসাগীতি) ১৩টি, স্বাগত সম্ভাষণ ১৯টি, তাহনিয়াত ২২টি, মর্সিয়া (শোকগাঁথা) ৭টি, দাঈয়াত ৭টি।

তাঁর বহু লেখা হারিয়ে গেছে। ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন এখানে প্রফেসর ড. আবু বকর রফীকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন- "আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন নেপথ্যচারী তথা প্রচারবিমুখ, যেমন তিনি একটি কবিতা লিখে কোনো শিক্ষার্থীকে দিয়ে আবৃত্তি করিয়েই প্রশান্তি লাভ করতেন। সেটি আর প্রকাশের প্রতি মনোযোগী হতেন না।" অনেক লেখা নাত খাঁ-ওয়ায়েজদের দিয়ে দিতেন; কপি রাখতেন না। প্রকাশিত সব বইও যোগাড় করা হয়নি। প্রকাশিত রচনার একটি বিবরণ দিয়েছেন জনাব আহসান সাইয়েদ। শামায়িলে তিরমিযী (অনুবাদ), কাশফুল জালালাইন (বিখ্যাত তাফসিরের উর্দু ব্যাখ্যা), আদ-দুরুসুস্ সরফিয়াহ, আদ-দুরুসুন নাহবিয়্যাহ, কাসিদাতুল বুরদাহ (বাংলা তরজমা), গুলজারে সুন্নাত (অনুবাদ), শরহে ইসাগুজি, আসান উর্দু তালিম, উর্দু কায়েদা, যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম, শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া (অনুবাদ), আল ইনসাফ, ইয়াদে মুহসিন, ফাতওয়া সংকলন।

তিনি একটি বিখ্যাত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির তথ্য দিয়েছেন- আদ-দুররুল বাহিয়্যু ফি শারহিল জামে-লিল ইমাম আত তিরমিযী। সেকালে উপমহাদেশের সর্বদক্ষিণে থেকেও তাঁর জ্ঞানের স্বাদ নিতে হয়েছে প্রকাশকদের। এসব বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রাখে।

আধুনিক কবিতার পাঠকদের জন্য নাযেমে আলার একটি কবিতা অনুবাদ পেশ করা হলো-

ভালোবাসা

ভালোবাসা সে কেমন বুঝাতে পারবো না আমি
বুক পুড়ে যায় তবু করতে পারিনে স্নান।
সকল রোগের চিকিৎসক আছে জানি
চোখ থেকে যখন রক্ত ঝরে- সে চিকিৎসা করবে কে?
সময় সুন্দর আর প্রীতিময় আর উদাস আমার হৃদয়
নীরবে গুনগুনিয়ে কেনো কাঁদে অবিরাম
যুগের যন্ত্রণা কি করে করি প্রকাশ!

অনুবাদ- প্রফেসর ড. আহসান উল্লাহ।

একটি দুর্লভ সাক্ষাৎকার

সংকলন: প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ

মাওলানা মুযহির, ১৯৩৫ সনে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় কামিল হাদিসে পাঠরত অবস্থায় তাঁর ধারণায়, 'মোহনী শক্তিসম্পন্ন একজন চাটগামী আলিমের সাথে পরিচয় ঘটে। যার নাম মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ। তিনি দীর্ঘদিন ধরে চব্বিশ পরগনার আকড়া কুদসিয়া মাদরাসার শিক্ষক-সুপারস্বরূপ কর্মরত। ৯৩ বছরবয়স্ক বয়ঃবৃদ্ধ আলিম, কক্সবাজার হাশেমিয়া আলিয়া মাদরাসার রেক্টর আপন স্মৃতিতে ভাস্বর মরহুমের সম্পর্কে বলেন: কলকাতা গিয়ে দু'এক মাসের মধ্যে সুদর্শন একজন আলিমকে মাদরাসায় ছাত্র-শিক্ষক তথা বিভিন্ন গুনিজনের সাথে আলাপরত দেখতে পাওয়া যায়- একদিন 'চাটগাইয়া কথা বলতে শুনে সাহস সঞ্চয় করে তাঁকে তসলিমসহ সম্বোধন করলে, তিনি আমির মীনাঈর পঙ্‌ক্তি সহকারে বললেন, "বেশ সুন্দর নব্য-তরুণ তো, বাড়ি দক্ষিণে- তবে তুমি হালকা-পাতলা দেখতে খুব ভালো। তুমি বন্ধু-বান্ধবসহ আমার কাছে বেড়াতে যাবে, আসা-যাওয়া ৬ আনা খরচ।" বলাবাহুল্য, মাওলানা মুযহির চার বছরের মধ্যে যে কোনো সুযোগে একাকী বা দলবল নিয়ে আকড়া চলে যেতেন এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিদ্যা-বুদ্ধি, তাহযিব-তামাদ্দুন, শিবলি-সাদী-হালী-আযাদ, জিন্নাহ-গান্ধী এবং ১৯৩৫ সনের অ্যাক্ট সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা হতো। তিনি আমাদেরকে উজ্জ্বল মনস্কতার روشن خیالی, তালকিন দিতেন। উর্দু-ফার্সি-আরবি কবিতা এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের রেফারেন্স এভাবে শুনতে শুনতে আমাদের تبادلہ خیالات দেখে উনি তৃপ্ত হতেন এবং আমাদেরকে ইকবাল, আযাদ, ওয়াহশত্ প্রমুখের লিখা হৃদয়ঙ্গম করার তাগিদ দিতেন। "উলুম ওয়া ফুনুন"-এ ব্যুৎপত্তি লাভের সাথে সাথে চলমান সমস্যা সম্পর্কে অবগত না হলে, বিদ্যাচর্চা নিরামিশ হতে বাধ্য এ কথায় তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাসী ছিলেন।

আকড়ায় তিনি একা থাকলেও তাঁর ঘরে এবং বিভিন্ন হওয়ালিতে 'উলুম ওয়া ফুনুন্'-এর সাথে সাথে 'মুনাযারা' 'মুশা'আরা' প্রভৃতির ব্যাপক চর্চা হতো। রেক্টর সাহেব বলেন, 'কলকাতায় চিড়িয়াখানাসহ দর্শনীয় বিষয়গুলোতে তিনিই আমাদেরকে নিয়ে যেতেন। এসব জায়গার প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং সমকালীন জীবন পরম্পরা তিনি অনায়াসে "چشم دیدہ واقعہ"-এর মতো বর্ণনা করে যেতেন। এগুলোতে শ্রোতাদের কৌতূহল ক্রমশ বৃদ্ধি পেতো; এতেই আমরা তাঁর ভক্ত অনুরক্ত হয়ে পড়ি। তখনকার ঘটনাবলির সাথে দৈবক্রমে একাত্ম হবার পেছনে মাওলানার অনুপ্রেরণা কার্যকর ছিলো বলে তিনি মনে করেন। তিনি স্মরণ করেন, এ. কে. ফজলুল হক সাহেব কৃষক প্রজা পার্টির নামে ১৯৩৬ সনে পটুয়াখালী গমন করে নির্বাচনী প্রচারণায় শামিল হন এবং তিনি পটুয়াখালী ও উত্তর কলকাতা উভয় আসনে নবাব লিয়াকত আলীকে পরাজিত করার পর মুসলিম লীগের ভরাডুবির আশঙ্কা দেখে উত্তর কলকাতার আসনটি লিয়াকত আলী খান সাহেবের অনুকূলে ছেড়ে দেবার জন্য হক সাহেবকে রাজি করাবার ক্ষেত্রে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার ছাত্ররা একক এবং অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। হক সাহেবকে দেয়া অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি বলেন, লীগ মুসলমানদের সংগঠন এবং বাংলাবাসীই এর অবলম্বন তা

প্রমাণ করার লক্ষ্যে আমি লীগের নয়, মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান, 'আলিয়ার ছাত্রদের দাবীতে আত্মসমর্পণ করলাম। বলাবাহুল্য, তখন মাওলানার মতো যিন্দাহ্ দিল্ মানুষ এ সমস্ত ঘটনা পরম্পরায় তীব্র এবং ব্যাপকভাবে সরগরম ছিলেন। স্মর্তব্য, ১৯৩৫ উত্তর ঘটনাপ্রবাহে মাওলানার সম্পৃক্ততা নিয়ে রেক্টর সাহেব কিছুই বলতে না পারলেও অন্যান্য সূত্রাবলি মারফতপ্রাপ্ত তথ্যসমূহ মাওলানার সমকালীন রাজনৈতিক তৎপরতায় তাঁর অংশীদারিত্বের কথা নানাভাবে ব্যক্ত করে থাকে বলে জানা যায়। রেক্টর সাহেবের কাছে মাওলানার চুনতির প্রতি আত্মিক আকর্ষণ-এর হেতু জানতে চাইলে তিনি জানান যে, 'গুণীজনের কদরদানি' চুনতির মতো সুশিক্ষিত এবং বিদগ্ধপূর্ণ জনগোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি।' তাঁর 'অনুমান' দেখে আমি, মরহুম আব্বাজান, হেড মাওলানা। (তাঁরই অপর একজন সহকর্মীর) বরাত দিয়ে যোগ করি, 'চুনতিবাসী নাকি সাধারণ যোগ্যতায় বিশ্বাসী নয়, পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অসাধারণ হলেই তাঁরা অবনত মস্তকে আত্মসমর্পণ করে, এর মাঝামাঝি অবস্থান বলতে কিছুই নেই।' কথাটি তিনি লুফে নিলেন এবং বললেন, "আল্লামা ফজলুল্লাহ একজন জাঁদরেল ব্যক্তি, যিনি চুনতিবাসীকে হাড়ে হাড়ে চিনেছেন এবং নিজেকে চিনতে তাঁদেরকে বাধ্য করেছেন। এতেই পরিষ্কার বোঝা যায়, মাওলানা তিন তিনবার চুনতি ছেড়েও চিরতরে সেখানেই শায়িত আছেন, কোন্ ধ্রুবশক্তির আকর্ষণ এবং কিসের মায়ায়-কারণ সুস্পষ্ট। কদর-শেনাসী বা গুণীজনের মান-মর্যাদা দান।

রেক্টর সাহেব সমসাময়িক কৃতী সন্তানদের সাথে মাওলানার পরিচয় পর্ব ও যোগাযোগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী না হলেও যে ধরনের (حسّاس) তিনি ছিলেন, মাওলানা আকরম খাঁ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মাওলানা ইসলামাবাদী, হযরত থানভী, আদালত খান এবং কলকাতার যাবতীয় কলেজ মাদরাসার 'ওলামা মাশায়েখ'বৃন্দের সাথে তাঁর যোগাযোগ না থাকাই বিচিত্র বলে মনে হয়। অতএব তিনি 'যুগ-জিজ্ঞাসার সাথে শুধু জ্ঞাত নন, সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সাথে সক্রিয় ছিলেন বলে জানা যায়। প্রায় ৯৩ বছর বয়স্ক প্রবীণতম আলিম কক্সবাজার হাশেমিয়া আলিয়া মাদরাসার রেক্টর আল্লামা মুযহির সাহেব আল্লামা ফজলুল্লাহর ইন্তেকাল দিবস সম্পর্কে এক অলৌকিক ঘটনা ব্যক্ত করেন। রেক্টর সাহেব নাকি সেদিন চুনতির শাহ সাহেবকে (উনি তাঁর প্রাণের বন্ধু ছিলেন) স্বপ্নে দেখেন এবং বলতে শোনেন, "অ মউ বঅর উঁর মলই গেলগই-আহ্"। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ রওয়ানা করে চুনতি পৌছান। তাঁকে দেখা মাত্র শাহ সাহেব আবার একই কথা বলে উঠলেন, "বঅর উঁর মলই গেলগই, গরদ্দে কি ওহ, ওহ"। এভাবে মাওলানার জীবন এবং জীবন সায়াহ্ন রেক্টর সাহেবের স্মৃতিতে চির জাগরুক হয়ে আছে।

খেদমত গোযারানে ফার্সি দর্ বাংলাদেশ

[ফার্সি ভাষায় বরেণ্য বাংলাদেশি কবি ও লেখক]

ড. মুহাম্মদ কলিম সাহসারামি

রায়যনি ফরহাঙ্গি জমহুরি ইসলামি ইরান, ঢাকা

[ইরান কালচারাল সেন্টার বাংলাদেশ]

গ্রন্থের নাম
খেদমত গোযারানে ফার্সি দর্ বাংলাদেশ
(ফার্সি ভাষায় বরেণ্য বাংলাদেশি কবি ও লেখক)

লেখক
ড. কলিম সাহসারামি

প্রকাশক
ইরান কালচারাল সেন্টার, ঢাকা।
ব্লক নং-৫২; ফ্ল্যাট নং: ৮/এ; ঢাকা, ১২০৯, ঢাকা।

প্রকাশকাল : ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ।

সংখ্যা : ১২০০

মূল্য : ২০০ টাকা

অক্ষর বিন্যাস ও বাঁধাই
তারেক সিরাজি

প্রেস
চকস, ১৩১, ডি আই টি সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০।

ঢাকাস্থ ইরান কালচারাল সেন্টার প্রকাশিত 'খেদমত গোযারানে ফার্সি দর বাংলাদেশ' (ফার্সি ভাষায় বরেণ্য বাংলাদেশি কবি ও লেখক পরিচিতি) গ্রন্থে আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) জীবনালেখ্য ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে ইরানে ইসলামি সংস্কৃতি ও নির্দেশনা মন্ত্রণালয়ের ১৯৯৬ সালের জার্নাল 'নায়েমেও' ফার্সি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে ফার্সি ভাষার প্রভাব শীর্ষক ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদীর ফার্সি প্রবন্ধের বিশাল অংশজুড়ে আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) ফার্সি কাব্য প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করা হয়। নিচে 'খেদমত গোযারানে ফার্সি দর বাংলাদেশ' গ্রন্থে আলোচিত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হলো:

পাকিস্তান আমল

(১৯৪৮-১৯৭১ খৃস্টাব্দ // ১৩৬৭-১৩৯১ হিজরি)

১. রেজা আলি ওয়াহশাত ২. হাফেজ মুহাম্মদ শফি ফেরদৌসি ৩.শরফ আল-হোসাইনি ৪. রাগিব বরাকপুরি ৫. আসিফ বেনারসি ৬. আমিরুল ইসলাম শরকি ৭. শামসি মুর্শিদাবাদি ৮. মুহাম্মদ আজিজুল হক আজিজ ৯. শেখ গোলাম মকসুদ হিলালি ১০. আবুল মোকারম সলিমুল্লাহ ফাহমি ১১. ড. খাজা মুঈনুদ্দিন জমিল ১২. ড. ইনদিলিব শাদানি ১৩. ইবরাহিম আলি ১৪. আনজাব আলি শওক ১৫. আলহাজ মুহাম্মদ হোসাইন ১৬. হুরমুজ উল্লাহ শায়দা ১৭. মাওলানা তামান্না ইমাদি ১৮. মালিক রিয়াজ উদ্দিন হায়দার ১৯. ড. মুআইয়্যিদুল ইসলাম বোরা (বোরাহ) ২০. মাওলানা ফজলুল্লাহ ফজল।

মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ ফজল

১৮৯৭/৯৮ সালে সাতকানিয়াস্থ বাবুনগর গ্রামে তিনি পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম চোখ মেলেন। তাঁর পিতা মাওলানা নুর হুদা ছিলেন পরহেজগার আলেম ও সমকালের অন্যতম কামেল ওলী। মাওলানা ফজলুল্লাহ ১৯১৯ সালে চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদরাসা (দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসিন প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা এবং বর্তমানে যা চট্টগ্রাম মুহসিন কলেজ নামে প্রসিদ্ধ) থেকে ফাজিল পাশ করেন। অতপর উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে তিনি হিন্দুস্তান (বর্তমান ভারত) গমন করেন। ভর্তি হন উত্তরপ্রদেশস্থ সাহারানপুরের মাযাহির উলুম মাদরাসায়। এখানে তিনি হাদিস, তাফসির, ফিকহ, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন। এখানকার পড়ালেখা শেষে তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন কলকাতার আকড়া মাদরাসায়। উক্ত মাদরাসায় তিনি পঠন-পাঠনে ব্যাপৃত থাকেন ১৯৪২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। বাড়ি ফেরার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি দেশে এসে যোগ দেন চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসায়। এখানে তিনি আমৃত্যু 'নাযেমে আলা'- (প্রধান নির্বাহী)-এর খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যান। শ্রেণিকক্ষে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানের আলো ছড়াতেন। সমকালে গণ্য হতেন প্রাজ্ঞ আলেমদের অন্যতম হিসেবে। চুনতি সিরাত মাহফিল, যেটা শাহ সাহেব রহ.-এর উদ্যোগে পথচলা শুরু করেছিলো। তাতেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ইসলামি শাস্ত্রাবলি অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি ইসলামি ভাবধারার বিপুলসংখ্যক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের খেদমত আঞ্জাম দেন। মাওলানা ফজলুল্লাহ রহ.-এর অধিকাংশ রচনারই বঙ্গানুবাদ হয়েছে। তার কিছু-কিছু ইতোমধ্যেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশেষে দীর্ঘ জীবনের ইতি টেনে তিনি ১৯৭৯

সালের ৪ মার্চ পরপারে পাড়ি জমান। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) চুনতি গ্রামের ফাতেমা বতুল মহিলা মাদরাসার পাশেই তাঁর কবর অবস্থিত।

মাওলানা ফজলুল্লাহ চার ভাষায় (আরবি, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা) কাব্য রচনা করেন। চার ভাষাতেই তিনি স্বতন্ত্র রচনাশৈলির ছাপ রাখতে সক্ষম হন। রাসুল সা.-এর শানে রচিত তাঁর একটি নাতে রাসুল এবং জ্ঞানের মর্যাদা বিষয়ে রচিত ক'টি কবিতা এবং বাংলা কাব্যানুবাদ নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে। নবীপ্রেমিক হৃদয়ের আর্তিকে ফুটিয়ে তুলে যেখানে তিনি লিখেন:

সৃষ্টিকুল শিরোমণী নবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন...

পারদের মতো আমি, হারিয়েছি হায় হৃদয়ের প্রশান্তি
বিরহানলে দগ্ধ আমি, বিরহব্যথায় অস্থিরমতি।

হে পাপীদের ভরসা, হে প্রেমীদের প্রশান্তি
শয়নে-স্বপনে দিনরাত আমি, তোমাকেই ভাবছি!

সুযোগ হলো তো শুধু একবার তোমার দরবার দেখার
তোমার সে সান্নিধ্য বিরহেই, করি আজ আহাজারি।

আবার কখনো যদি পূর্ণ হয় আশা, হে অধিপতি
মেঘ ও বিজলির ছটার মতো খুশিতে কাঁদবো আমি।

আপন মনের দুঃখগাথা পড়ে-পড়ে বিরহ ব্যথায়
বিরহী গীতিকা গেয়ে-গেয়ে হবো আমি ক্রন্দসী বুলবুলি।

তোমার মাটি পেলে আমি মেখে নেবো আমার চেহারায়
তারপর সে মাটিকে চোখের সুরমা করে রাখবো আমি।

কখনো মাখবো বুকে তা, কখনো রাখবো মাথায়
কখনো হৃদয়ে রেখে খুঁজে নেবো হারানো প্রশান্তি।

প্রাণসখা হে, আমার এ প্রাণ কুরবান হোক তোমার তরে
তোমার দরবারে এসে, চুমবো আমি, শুঁকবো মাটি !

দুর্ভাগ্য আমাকে তোমার কাছ থেকে রেখেছে দূরে
সে দুখে মন আজ করে হা-হুতাশ, করে আহাজারি !

দুজাহানের বাদশা তুমি, আমি অধম, নালায়েক
তোমার প্রেমে মুখর হবো, মরি মরি লাজে মরি।
নিখিলের করুণা তুমি, দয়ালুপ্রাণ আর কণাপ্রেমী
তোমারই কৃপা-ভরসায় হলাম আমি দুঃসাহসী!

নিপীড়িত, দুস্থ মানবের হে আশ্রয় হে সমব্যথী
মহত্তম চরিত তোমার, তুমি চরিত্রবান অতি !

দয়া করো এ ফজলের পরে, পাপের সাগরে ডোবা সে
লজ্জায় লজ্জিত আমি, কুণ্ঠিত আমার প্রতি নিঃশ্বাসই!

শেষবিচারের দিনে পাপীর সহায় হে অনন্য নবী
তোমাকে ছাড়া রাখি না তো আমি কাউকে তরণী!

স্বাগত ফজল, তুমি, সুখবর নাও, পড়ো না ভেঙে
খোদাই আমায় করবে ক্ষমা, সুপারিশ করবে রাসুলই।

নিরাশ হয়ো না তুমি, এ যে কেবলই আশার স্থল
হৃদয়পটে রয়েছে তো আঁকা– 'নৈরাশ্য কুফরি'!

নিরাশার পথে যেও না, এখানে তো আশা অগণন
'নিরাশ হয়ো না' এ যে আমার মহান আল্লাহর মহা বাণী।

***

যে তোমার প্রেমে পাগলপারা পুরো পৃথিবী
যে তোমার রূপে পাগল আমার মনোপ্রাণ সবি।

যে তুমি করুণা-আধার, যে তুমি নিখাদ স্নেহ
যে তুমি পূর্ণ সুন্দর, যে তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

যে তোমার মোহন চরিত, প্রিয় এ বিশ্বের
যে তোমার পুষ্পঘ্রাণে, মোহ সারা বিশ্বের।

যে তোমার প্রেমঘোরে নতশীর প্রেমী আমি
যে তোমার সন্ধানে হতবাক প্রেমিক আমি।

***

জ্ঞানের গুরুত্ব

সন্দেহ নেই, এ যে আল্লাহর ফরমান / কীভাবে কও, জ্ঞানী ও মূর্খ হবে সমান
জ্ঞানীসমাজের সম্মানে তা বলেছেন নবী!

অপূর্ব গৌরব এ যে, নয় সমান / মানবকুলে অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান
দরবেশ নয়, সম্মান অধিক জ্ঞানীদের-ই !

শয়তানের সম্মুখে সহস্র দরবেশের চেয়ে / সত্যিকারের একজন জ্ঞানীই শক্তিশালী
জ্ঞানীর হৃদয় রহস্যাধার, জ্ঞানের খনি!

জ্ঞানেই সৃষ্টি হয় জেনো খোদার ভয় / জ্ঞানেই জ্ঞানী খোদাকে ডরায়; মিছে নয়।
এবং জ্ঞানীর হৃদয় আলোক-উৎসারী!

খোদার আলো থেকেই এলো জ্ঞান-আলো / জ্ঞানের তরে জান কুরবান করো প্রিয়
জ্ঞান দিয়ে করো না নিয়ত দুনিয়াবি!

প্রার্থনাহীন মূর্খতাকে জেনো আঁধার / যেনো হতে পারো প্রিয় খোদাতালার
পরিশেষে না পাও যেনো লাজ তুমি !

ঠিক বলেছেন আধ্যাত্মিক মৌলভী / যে জ্ঞানীর থাকে লালসা দুনিয়াবি
চায় সে খোদা, তার সাথে চায় পৃথিবী !

উপদেশ নাও, খোদার করুণা যেনো / তোমার পরে বর্ষিত হয় অসংখ্য!

***

তার তরবারি ও ঘোড়া, চরম ধূর্ত, আফসোস / তার শিকারের দুরভিসন্ধি বাতিল, আফসোস!
তার তীরন্দাজ দৃষ্টি চন্দ্রসখী, আফসোস / কোমল সৌষ্ঠবী হুরপরীর দৃষ্টি, আফসোস!
তার গর্বিত প্রেমিকের ম্রিয়মাণ মেজাজ, আফসোস / তার মিলনপ্রার্থীর অবস্থা শোচনীয়, আফসোস!
প্রেমের আগুন শিখা জ্বাললো হৃদয়ে, আফসোস / পাগল মন আমার, করছে আহাজারি, আফসোস!
***

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) শানে নিবেদিত কবিতাসমূহ

" گلہائے عقیدت "

بر حالات، مقالات، خطبات، جامع الصفات علامہ ابوالبرکات محمد فضل اللہ صاحب رحمہ اللہ

ناظم اعلی مدرسہ حکیمیہ عالیہ چنوتی

حسب دعوت و حرکت محبی مولانا ابورضاء خلف الرشید استاد مرحوم و اشارۂ فائقہ

مکرمی ڈاکٹر مولانا شبیر احمد صاحب المبجل صانناوایاہم اللہ بکرمہ الجلی والخفی۔

مولانا محمد قطب الدین [1] رح

بمورخہ ۲۲/۷/۲۰۰۱ع بروز یکشنبہ

فضل حق، لطف الٰہی بیگماں — ناظم اعلی چنوتی مہرباں

ظل یزداں، حل عقدہ مغلقاں — ناصر ہر بیکساں پیر و جواں

لوذعی جامع و ماہر ہر فنون — المعّی حافظ، لغاتِ بیکراں

انجمن بس موجزن آں نعرہ زن — ہمتِ ہر پست و ناکس ناتواں

لُمعۂ شمع دراست روز و شب — نّیر بُرج ہدایت ضوء فشاں

لہجہء خطبات شیریں پُر بلیغ — صیقل ہر زنگ دل ظلمت نشاں

ہیبت رُستم جلال و رعب تام — بر عوام و خاص چوں شیر زماں

جابجا جاری سبق اندر طبق — تادمِ آخر چوں سیلاب رواں

ناظم و ناثر بروں از حد تمام — شاعر فطری، نرم گو خوش بیاں

حُجّۃ السلف و براہیں قاطعہ — جوہر تاباں، مُناظر ہمعناں

قطب دیں یک خوشہ چیں بے دست و پا

نَاعلِ حق، خاکپائے عاشقاں

---

[1] মাওলানা কুতুবুদ্দিন (রহ.) একজন বিদগ্ধ আলিম ও স্বভাব কবি। পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ এবং বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ। তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহর (র.) একজন কৃতী ছাত্র।

مرثیہ

بروفات حسرت آیات حضرت مولانا الحاج محمد فضل اللہ
ناظم اعلی چنوتی حکیمیہ عالیہ مدرسہ، چنوتی، چاٹگام۔

شاہ مولانا حبیب احمد

آہ فضل اللہ ہم کو چھوڑ کے اب چل بسے
ایک استاذ جلیل القدر تھے اب چل بسے

انکی برکت ہے حکیمی درسگاہ کی یہ بہار
اک پلک میں دیکھتے ہی دیکھتے اب چل بسے

سن رہا ہوں دل کے کانوں سے تیرے اشعار خوب
ہائے ہمکو چھوڑ کے اس پار سے اب چل بسے

دل مرا اب رو رہا ہے جل رہا میرا جگر
ہر گھڑی ہر آن انکے ہجر سے اب چل بسے

دل کے گوشوں میں جگہ تھی آپکی ہر شخص کے
اسلئے تو محو غم ہر فرد ہے اب چلے بسے

صبح کو جب انکے گرنے کی خبر مجھکو ملی
بے دھڑک بولا یہ دل وہ فضل تھے اب چل بسے

دل ہی دل میں میں نے رضواں سے جو پوچھی ہے خبر
مژدہ آیا باب جنت کھل گئے اب چل بسے

یہ درسگاہ نذیری تھی ہمیشہ پُر بہار
فضل کے تازہ سخن اور شعر سے اب چل بسے

کوئی آتا تھا یہاں اہل ہنر ہو یا باکمال
شاعری انکی اُبلتی سینہ سے اب چل بسے

میں یہ کہتا تھا ہمیشہ اور حق کہتا تھا میں
بے بدل تھی ان کی ہستی بزم سے اب چل بسے

رو رہے ہیں ان کی فرقت میں یہاں کے خاص وعام
سب کے وہ مخدوم اور مرجع تھے اب چل بسے

کوئی آئے اور کوئی جائے یہی دستور ہے
پر سوا ہے ان کا جانا قوم سے اب چل بسے

غیر شاعر ہی کے دل سے یہ ابلتی شاعری
یہ سراسر فضل کی برکت سے ہے اب چل بسے

مرجع ہر طالب و استاذ تھے عالی جناب
تھے وہ اک دارالشفا ہر درد کے اب چل بسے

علم و فن کے مختلف شعبوں میں یکتا انکی ذات
طالبوں کے بغرض ہمدرد تھے اب چل بسے

یہ دعا کرتا ہوں یارب فضل تیرے ہیں غلام
دامن رحمت سے انکو ڈھانپ لے اب چل بسے

---

* শাহ মাওলানা হাবীব আহমদ (রহ.) পীর সাহেব চুনতি, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা।

رثاءعلى الأستاذ الفقيد السيّد مولانا محمد فضل الله أنزله الله في جوار رحمته، الذي توفّي فى بداية شهر آذار (مارس) سنة١٩٧٩ وقد أتم من عمره نيفًا وثمانين حولا، وكان من كبار علماء العصر في البلاد وكان شاعرًا موهوبًا باللغة الأردية والفارسية كما كان خطيبا بارعًا واستاذا موفّقا فى المواد الاسلامية، وقضى معظم حياته في سبيل العلوم الاسلامية منذ عنفوان شبابه الى اللحظة الأخيرة من عمره ودفن بجوار المدرسية الحكيمية العالية، بشنوتى، شيتاغونغ معهد عمله في السنوات الأخيرة من حياته

نـعـيت بأسـتاذ جـليل ورَحـلـه ... مجيـبًا الى ماقـد أتـاه مـن الأمرِ
ودُمتُ رهينَ الجسم في أرض غربةٍ ... فأصبحتُ محروم العزاء ومن نظرِ
نهضتَ لتقضي الفجرَ مع الناس جمعةً ... صحيحًاولم تشكو بِسُـقمٍ ولا عُذرِ
تُلبّي نـداءَ الـرب سرًّا وَلم تقـل ... بانك قد وفّيـت ما بك مـن عمرِ
وجهّـزت للسـفر بفرضٍ وواجبٍ ... وصـالح اعمـال الجهـاد وبالخـيرِ

* * * * ... * * * *

رأينـاه يحي مـن ليـال كثيرة ... و يـترك طعـم النـوم باكٍ وذاكـرِ
رأينـاه حيـنًا فى المجـامع قائمًا ... ليـلقى خـطابًا بالجـوامع والندرِ
رأينـاه حينًا في المحافل جالسًا ... يزين الصـدارة بالانـاقة والنـورِ
وكم مـن رأينـاه في ثوب شاعرٍ ... عظيم يجـود بالمـديح وبالشكرِ
وحينًا رأيناه في الفصول مدرّسًا ... ليلقي دروسا من علومه كالبحرِ

* * * * ... * * * *

كانه بـدر والجمـيع كـواكـب ... بمـابه من شيمٍ تخصّـه والقـدرِ
حسـين بوجـهه كريم بخُـلقه ... عفيـفُ بتقـواه دووم في الـذكرِ
وثيـق بنفسـه سـديد بـرائه ... عظيم بشـخصه وجيه في العمرِ
ولم أر مثـله من يظل معـلما ... ثمانين حولًا لا يُشـاكى من الكبرِ
بقيت على عَزْمِك لغـاية عُمرك ... عكوفًا على العلم الى مَوعد القدرِ

* * * * ... * * * *

تحـب رحـابَ العلم وهو يحبك ... وأخـرجتَ منه لك جزءًا من القبرِ
رحـلت من الدنـيا ولمّا تفـارق ... مدينـة علـم من مـرآك ومنـظرِ
وذلـك من فضـل الإله يجـد به ... لمن شاء من عبد فيعطى ويكثرِ
ونرجـوا الإله أن يجازى بفضله ... مجـازاة أعمـالك جـزيلا واكـثرِ
وَيـنزلُك الـربُّ الرّحـيم بمـنزلٍ ... كـريم بدار الخلد فافرحه واشكرِ

الخرطوم: ٢٩/ أيار (مايو) ١٩٧٩م – بقلم ابو بكر رفيق احمد البنغلاديشى-

---

* প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক, সাবেক অধ্যাপক: আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া ও সাবেক উপ-উপাচার্য: আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম। প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক। তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) অন্যতম কৃতী ছাত্র।

کلمات چند

بر حیات ابوالبرکات محمد فضل اللہ سقی اللہ ثراہ و جعل الجنہ مثواہ

پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد[1]

برگزیدہ شخصیت اک چل بسے خلد بریں
نام و ناموس عزیمت لیکے اب برزخ مکیں

شاعر رومانیت طبعی فراست زندہ دل
سربراہ انجمن تھے سرور علم و یقین

سالخوردہ عمر میں بھی مستطاب ہم عصر
جامع علم و ہنر کامل بطرز اولین

صاحبدلوں کی سرفرازی میں انکا جو ہاتھ
تھا تجدد زیر نظر بر اولین و آخرین

انکی دنیا میں نہ تھی جائے عبث انسانیت
حظ وافر کیلئے ان کی طلب ہر جا گزیں

دین و دنیا پر رہی یکساں نظر انکا مدام
ناظم اعلی لقب ان کے لئے زیبا ترین

آکڑا کے مدرسے میں آپ تھے دارومدار
نام و ناموس آپ کا مافوق رأس الاولین

ناظم الدین کے علاوہ فضل حق کے کف کفا
آپ کی آماج گاہ پر سہروردی ہم نشیں

تھی جو انمردی تیری بنگالیوں کا خضر راہ
کلکتہ یا پرگنہ ہر جا رہے بالا نشیں

تم رہے واں میزبان طالبان چاٹگام
تیری امداد و محبت کے رہے وہ شاکریں

درس و تدریس پرانی میں ہٹا کر انقلاب
کس طرح تم نے سراہا عز و جاہ علم دین

طالب اسکول تھے پھر مدرسہ کا رخ کیا
یا عجب ہو نہار فضل اللہ طفل محسنین

تھی سہارنپور میں شہرت ذہانت کی تری
طالب بنگال کو ملتی سند جو بہترین

طفل سرّے تھانویؒ تو تلمذ سہانپوری
روح غزالی و اقبال سعدی و رومی کہیں

---

[1] প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ (রহ.) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের প্রাক্তন ডিন এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। তিনি চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার একজন কৃতী ছাত্র।

تیری نسبت شہرتیں اڑتی گئیں یوں ہر طرف　　نامور ہے تیری ہستی سے چنوتی کی زمین

ہے ثقافت آپ کے طبعی تقاضے کا ثمر　　اعتراف اھل فن سے گونجتی تھی سرزمین

خوبی قسمت سے جو مدفون ہیں پہلو میں تیرے　　فیض وبرکت سے سدا محفوظ رہے وہ خوشہ چیں

تھا براھیم ی ن ظر م یر ومظ فر عبد الحفیظ　　عبد سبحان وغ لام قادر ابو طاہر امین

باحیات اب تک رہے جو قاسم عبد الرشید　　وہ سلف کے خوش خلف مقبول یزداں بالیقین

دیر تک نایاب جیسا تیرے بس کا انتظام　　تو نہیں تیرا کرشمہ اب تک ہے دلنشیں

یا الٰہی ان پہ نازل رحمتیں ہوں روز و شب

آرزو ہم سب کی ہو پوری بھرے ہوں آستیں

یاور فتگان

پروفیسر ڈاکٹر محمد انوار الحق خطیبی[1]

مجھے ہر دم گلزار حکیمی یاد آتا ہے
مولانا عبد حکیم وشاہ نذیر یاد آتے ہیں

مجھے جب بھی گلشن نذیری یاد آتا ہے
ماہر عبد سبحان وبو طاہر ناظر یاد آتے ہیں

مجھے اب باغبان گلزار حکیمی یاد آتے ہیں
نور حسین وشفیق نیز علامہ فضل اللہ یاد آتے ہیں

مجھے سدا حامیان باغ حکیمی یاد آتے ہیں
خان طاہر ودانش دانشمند یاد آتے ہیں

مجھے ہر دم مالیان گلشن نذیری یاد آتے ہیں
میر اختر وحافظ شاہ چنوتی یاد آتے ہیں

مجھے اس وقت لالہ زار چنوتی یاد آتا ہے
جج وجیہ اللہ وخان بہادر حسن یاد آتے ہیں

مجھے جب بھی چنوتی کا شاندار ماضی یاد آتا ہے
تو ڈپٹی ناصر الدین ومنصف شکور علی یاد آتے ہیں

کسی محفل میں شمع جب جلوہ گر ہوتی ہے
تو عارف فضل حق وحکیم منیر یاد آتے ہیں

کہیں جب سننے میں آتی ہیں محو بدعت کی باتیں
تو مولانا محمود حق وشیخ عبد جبار یاد آتے ہیں

مجھے ہر دم گلزار حکیمی کے پھول یاد آتے ہیں
عبد نور وخاکی نیز موسیٰ خطیبی یاد آتے ہیں

کہیں جب سننے میں آتے ہیں فقہ وحدیث کے چرچے
تو شیخ الحدیث امین ومفتی ابراھیم یاد آتے ہیں

نوٹ: وابستگان چنوتی حکیمیہ عالیہ مدرسہ نیز چنوتی کے بعض اکابر کی یاد میں یہ نظم لکھی گئی ہے

---

[1] প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী (রহ.)। সাবেক চেয়ারম্যান, আরবি বিভাগ ও সাবেক প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) কৃতী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম।

حرف نالہ

مولانا شفیق احمد

حرف نالہ بر وصال پدر روحانی ما
تاجدار علم و فن ہمچوں غزالی زماں

فوقیت کی ہر فضا کا نجم ثاقب آپ تھے
ناظم اعلی سے تھے مشہور وہ عالی نشاں

آجکل کا نامور سب طفل مکتب آپکا
تھی ادا ہر ہر نرالی جملہ جاہ و عز و شاں

ان سے روشن تھا گلستاں و دبستان علوم
ہم جو سب یان خاک و گل ہیں آپ برگ و جان جاں

ناز کرتی ہے انہیں پر کرسی بالائے درس
تھی ودیعت در جبلّت جو ہر شعلہ نہاں

زندہ دل شرمندرو فصل المقال ہی آپ تھے
تھی لڑی موتی کی ہر ہر بات انکی بر عیاں

آپ کا زور قلم زور زباں چوں ذوالفقار
پُرزہ پُرزہ کر کے چھوڑا حق تلف بے باکیاں

وہ سپہ سالار ہر میدان علم و فضل تھے
شیر دل عالی ہمم تھے بحر لطف بے کراں

ہمچنیں و خود دار تھے وہ اور دور اندیش بھی
کچھ نہیں انکے لئے ہو بھی کوئی فخر زماں

مایۂ ناز دھر شاعر خطیب و بو المقال
عابد و زاہد تھے مخفی ذاکر سحری فغاں

صورت و سیرت میں بالکل رونما مکی اثر
خاندانی تھی شرافت لفظ مکی سے عیاں

محفل سیرت کا بانی شاہ صاحب ارجمند
ناظم اعلی کا خاکہ ہو پڑا رشک جناں

عرض دین و ملت بیضا کا سدِّ ذوالقرن
بر قد عزم و عزیمت حصن و حصین کرّوبیاں

خود کہا توشہ میرا بس قال اللہ قال الرسولؐ
جنت الفردوس ان کی خوابگاہ ہو ہمعنان

بو العطا و بو رضا اور یہ حسام و بو صفا
ان کے حق میں ہو دعائے قرۃ العینی نشاں

تو سمندر رہے جو اسکا ایک قطرہ ہے شفیق
خوشہ چیناں سب کے سب ہوں تیرے در کے کامراں

نبذة موجزة من حياة العلامة الشيخ / ابو البركات محمد فضل الله - قدس الله سره (١٨٩٨م - ١٩٧٩م)

أبو الرضاء محمد نظام الدين الندوى*

النائب في البرلمان الوطني، بنجلاديش

التمهيد:

قد جرت عادة الله تعالى منذ ظهور هذا الكون إلى حيز الوجود انه لم يزل يرسل رسلا وانبياء لهداية الأمة البشرية وفلاحها، حينًا لآخر، وقد بدأت شبكة النبوة والرسالة من أول البشر آدم عليه السلام واستمرت وامتدت حتى انتهت إلى خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى الرغم من انقطاع امتداد النبوة والرسالة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ماترك الله عباده سدًى - بل انتقلت وتحولت هذه المسئولية الملقاة على كواهل الأنبياء والرسل إلى الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم وهذه منة عظيمة منحت هذه الأمة وهذه من مميزات الأمة المحمدية وخصائصها، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "العلماء ورثة الأنبياء"

فلذا شاءت إرادة الله تعالى أن يظهر في هذه الأمة أئمة وعلماء ودعاة ومصلحون قاموا بأداء المسئولية التي ألقيت على عواتقهم، وهي القيام بعمل الدعوة والتبليغ إلى الدين الحنيف، فقامت علماء الأمة المحمدية منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا بتضحيات نادرة وخدمات جليلة تتعلق بإعلاء كلمة الله في الأرض. وقامت طائفة منهم بخدمة الحديث وطائفة بخدمة الفقه وطائفة بخدمة التفسير وطائفة بالوعظ والإرشاد وطائفة بالتأليف والتصنيف وما إلى ذلك، وقد يندهش المسلم اليوم حينما يرجع وينظر إلى تاريخه المجيد الحافل.

وأن شبه القارة الهندية لها حظ وافر في إنجاب الدعاة والعلماء الفحول والمؤلفين ولا يمكن ان يكتب التاريخ الإسلامي الحافل بصرف النظر من شبه القارة الهندية، ومن هؤلاء العلماء الافذاذ الذين أفادوا الأمة والشعب بتوجيهاتهم وهداياتهم بمختلف أساليبهم العلامة/محمد فضل الله - قدس الله سره العزيز -

---

* মাননীয় সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম ১৫ (সাতকানিয়া, লোহাগাড়া), প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন, সদস্য আন্তর্জাতিক ইসলামি সাহিত্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক মুসলিম উলামা এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, চেয়ারম্যান, আইআইইউসি ট্রাস্ট ও একজন খ্যাতনামা আরবিবিদ।

الولادة، الأسرة، الوطن

ولد الشيخ/فضل الله رحمه الله تعالى - في منطقة "ستكانيا" لمديرية شيتاغونغ عام ١٨٩٨م، وقد احتلت منطقة ستكانيا منذ قديم الزمان شهرة مرموقة كمنبت رجال الفكر والدعوة وفحول العلماء وكملتقى الكثير من المدارس الاسلامية، وكان أبوه الشيخ/ نور الهدى عالم ربانيا جليلا وداعيا مخلصا تلمذ عليه عدد كبير من العلماء الكبار القدماء في ستكانيا- وكان تلميذاً للشيخ رشيد أحمد الكنكوهى رح وله خمس مخطوطات في مختلف المواضيع الإسلامية، ولما اطلع على بشرى ولادة نجله الكريم شكر الله تعالى وقرأ الآية القرآنية "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" وسماه بفضل الله ، وجده القديم الشيخ يّس المكي ارتحل من مكة المكرمة إلى هذه المنطقة لغرض الدعوة والتبليغ وسافر الى مكة المكرمة بحملة الحجاج ثم لم يرجع بعد ذلك وتوفي هناك- وأخوه الآخر سافر إلى اندونيسيا لنفس الغرض.

حياته التعليمية

درس أولا عند والده في البيت، واجتاز شوطا من الدراسات الاسلامية على النطاق المتوسط في اللغة العربية والفارسية والأردية، ثم التحق بالمدرسة المحسنية بمدينة شيتاغونغ، وكان الشيخ الربانى عبد المجيد (مؤسس مدرسة غار نغيا) زميل صفه في هذه المدرسة، تخرج فيها عام ١٩١٩ م بتفوق وامتياز - وحصل على شهادة الفاضل.

رحلته إلى الهند لطلب العلم

بعد ان تخرج في المدرسة المحسنية أشار عليه بعض أساتذته بأن يرتحل إلى الهند ليتزود بالعلوم العالية في التفسير والحديث، وعند قلة اعتنائه بهذه المشورة أمر بطريق مؤكد في المنام بأن يرتحل إلى الهند لنيل مزيد من العلوم العالية، وكان أبوه أيضا يتمنى ذلك، حتى عزم على سفر الهند، وشد الرحال إليها والتحق بمدرسة مظاهر علوم بسهارنبور عام ١٩٢٠ م وقضى فيها ثلاث سنوات في طلب العلم - وتخرج فيها بتفوق وامتياز عام ١٩٢٣م وحصل على الشهادة النهائية في الحديث و التفسير و الفقه و المنقولات والمعقولات، وكان من أهم أساتذته خلال تعلمه في سهارنبور الشيخ / خليل احمد السهارنبورى (مؤلف بذل المجهود في حل أبى داؤد) والشيخ عبد اللطيف السهارنبوري وكان الشيخ / عبد الوهاب (المدير السابق لدار العلوم معين الإسلام بهاتهزارى) صديقه اثناء تعلمه في مظاهر علوم، بسهارنبور ، وكان يحضر في زاوية حكيم الأمة اشرف على التهانوى "حينا لأخر وبايع على يده وقضى مدة لا بأس بها في

صحبته واستفاد من مجالسة العلمية والروحية وكانت زاوية الشيخ / التهانوى ملتقى العلماء الكبار آنذاك، خلاصة القول انه قضى حياته التعليمية كطالب ممتاز صاحب ذكاء نادر متوقد وذاكرة قوية مغتبطة، واستلفت أنظار الأساتذة إليه وكسب إعجاب الناس، وكان الطلاب وزملاء صفه يتهافتون عليه تهافت الفراش على النور، وتقاطر الظمآى على الماء ، ليستفيدوا من حلقة مذاكرته في سهارنبور . وكان من أصدقائه و معاصريه كذلك العلامة الشيخ زكريا الكاندهلوي صاحب كتاب "أوجز المسالك" شرح المؤطأ للإمام مالك رح، و العلامة المفسر الشيخ المفتي شفيع العثماني صاحب تفسير معارف القرآن، العلامة المقرى محمد طيّب كان مدير دار العلوم بديوبند لمدة ٤٥سنة، وقد كان يتلمذ على العلامة المحدث أنور شاه الكشميري حينا لاخمه.

حياته التدريسية

على إثر تخرجه في سهارنبور عام ١٩٢٣م تلقى الشيخ / خليل احمد رح رسالة من قبل مسؤل مدرسة آكرا بكلكتة وقد طلب فيها أن يرسل عالما جيدا ليكون صدر المدرسين في المدرسة المذكورة، فاتفق الشيخ وكبار أساتذة مظاهر علوم على إرساله إلى هذه المدرسة، فتعين فيها أولا كرئيس الأساتذة ثم كمدير للمدرسة، وبقي على هذا المنصب طوال ٢٠ سنة منذ ١٩٢٣ إلى ١٩٦٢م ، فتقدمت المدرسة في زمن إدارته تقدما هائلا، علميا وماليا وشهرة، وقد توجد ذخيرة كبيرة من فتاويه التي قام بإعدادها أثناء إقامته بالمدرسة المذكورة كمدير ومفت ومحدث واكثرها في الأردية والعربية.

ولما رجع الشيخ إلى وطنه في الزمن الذي حدثت فيه حركة تحرير الهند انتهز المجلس الاستشاري للمدرسة الحكيمية العالية بشوناتي هذه الفرصة، والتقى بعض أعضائه به وساقه إلى المدرسة المذكورة ، وجعله الرئيس العام لها، وكان الشيخ يقوم بخدمة تدريس البخارى والترمذي بجنب إدارتها والإشراف عليها بكل دقة وأمانة، وان حسن سمعتها يرجع إلى فضل جهوده الجبارة التي بذلها في سبيل تقدمها وازدهارها ، واستطاعت المدرسة في زمن نظامته أن تنجب عددا كبيرا من العلماء الأكفاء والدعاة والأساتذة الذين انتشروا في أنحاء البلد من اقصاه إلى اقصاه ليقوموا بعمل الدعوة والتبليغ والتدريس والتربية، ومن نتيجته انه قلما توجد مؤسسة أو مدرسة أو جامعة في هذا البلد إلا ويوجد فيها تلاميذه النجباء، وقد بلغت المدرسة في زمن إدارته ونظامته قمة الشهرة والسمعة، وان حياته كلها حافلة بمكرمات وبطولات قلما يجتمع مثلها في عالم، وقد قضى حياته في جهاد مستمر، ولم يزل قائما بعمل التدريس والنظامة والإشراف على المدرسة المذكورة حتى لفظ نفسه الأخير عام ١٩٧٩ م،

بعض خصائصه ومميزاته

كان الشيخ بنفسه كمنظمة وجمعية مفردة تقوم بإنجاب الرجال من طريق الدعوة والتربية وكانت شخصيته مترامية الجوانب، وقد منحه الله تعالى مواهب متنوعة قلما يجتمع مثلها في الآخرين، وقد نال التقدير البالغ من الشعب لسمو أخلاقه ولين جانبه وحسن وفادته ، ومن نتيجة ذلك انه كان مرجعا للعلماء الكبار في بنجلاديش يأتون ويجلسون إليه وينهلون من منهله الصافي الزلال ، وكان متضلعا ونابغا في العلوم العصرية أيضا بجنب العلوم الاسلامية ، وكانت نظرته على السياسة العالمية عميقة، وقد لعب دورا هاما في حركة طرد الإنجليزمن هذا البلد مشاركا مع أسد البنغال أي فضل الحق، كما قام بدور بارز في إقامة النظام الإسلامي في باكستان بعد انفصالها من الهند ، وان حفلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشوناتي التي غرست نواتها الأولى عام ١٩٧٢م بيد الشيخ / حافظ أحمد رح كانت من نتائج جهود الشيخ المذكور، وقد احتلت الحفلة شهرة مرموقة على نطاق الدولة، ويجتمع فيها كبار علماء البلد من جميع أنحائه ، وكان يقوم الشيخ بترتيب المواضيع وتوزيعها بين الخطباء وكذلك كانت معلوماته واسعة وعميقة جدا حول الديانات والمذاهب المنحرفة المعاصرة أيضا، وقد كان حضر بعض البراهمة في بعض حفلات خطابه ولما استمعوا إلى خطابه المدهش ذي المعلومات الوافرة حول ديانته اندهش وتحير وبهت، وقد منحه الله تعالى موهبة الارتجال في كثير من الفنون وكان يرتجل الإجابة المقنعة على الشبهات الواردة حول الإسلام ، وكان قادرا على العربية والأردية والفارسية والبنجالية على السواء كتابة وخطابة وعلى الانجليزية ايضا على مستوى جيد، وكان شاعرا طبيعيا في أربع لغات، وكان يرتجل الأشعار في شتى المواضيع في اللغات الأربع المذكورة، ولا يقل عدد قصائده ومواضيع أشعاره من الألف، وكان من أبرز مميزاته أن فكرته كانت واسعة في معنى الإسلام الشامل و كانت نظرته على المنهج الدراسي الإسلامي عميقة وقد قام بترتيب كتيب و بحث فيه عن العوامل التي حالت في المدارس الاسلامية دون إنجابها الرجال الأكفاء وهو يتعلق بإدخال التعديلات والتطويرات اللائقة في المنهج التعلمى النظامي السائد في مدارس شبه القارة الهندية جمعا بين القديم الصالح والجديد النافع وقد تم ترتيب هذا الكتيب عام ١٩٦٥ م في الزمن الذي لم يشعر علماء بنجلاديش بأهمية إدخال التعديلات في المنهج الدراسي، بل كان هذا عيبا عندهم ، وان دل هذا على شئ فإنما يدل على فكرته الواسعة الشاملة ودراسته الفاحصة وإمعان نظره في المناهج المعاصرة، وكان رجلا ذا عواطف إسلامية صادقة، وقد أقام مسرحية إسلامية حول تحرير كشمير المحتلة في زمن

الخمسينات الميلادية، وكان يساهم في المؤتمرات والندوات العلمية والسياسية كرئيس وباحث وخطيب ومقدم مقال في إلى جانب نظامته في المدرسة الحكيمية العالية في شوناتى وكثير من مقالاته العلمية والفكرية موجودة في صورة المخطوطة –

خدماته العلمية في مجال التأليف

إذا درسنا مختلف جوانب حياة الشيخ دراسة فاحصة لرأينا أن شخصيته كانت متحلية بمواهبه المتنوعة لم يكن بعضها فائقا على بعض ، بل كان مستوى جميع مواهبه متنوعة على الدرجة السواء ، وكانت موهبة كتابته طبيعية وكان كاتبا قديرا في اللغات الأربع المذكورة على السواء وكانت قدرته عليها أدبية وكان متطلعا على رفع هذه اللغات وخفضها، وقد يصعب التمييز بين كتابته وكتابة أهل اللغة ، وعلى الرغم من عدم ملائمة الجو في بنجلاديش في مجال التأليف والتصنيف انه لم يتخلف منه بل انه ترك تراثا علميا كثيرا للأجيال المسلمة –

وفيما يلي قائمة مصنفاته في مخلتف المواضيع

١- ترجمة شمائل الترمذى مع التعليقات الهامة (في البنجالية) كثرت طبعته في مطبعة اسلامية" بشيتاغونغ ونال قبولا عظيما في الأوساط العلمية، وتمت طبعته الأولى عام ١٩٦٥ م. ونشرته المؤسسة الإسلامية الحكومية مرتين.

٢- الدر البهي في شرح الجامع للإمام الترمذي (في الأردية مخطوط) كان عمل إعداد هذا الشرح جاريا على قدم وساق إلى آخر حياته وقد بلغ الشرح إلى نهاية كتاب الصلاة تقريبا مع مقدمة مستقلة في الحديث و أصوله وتاريخ تدوينه،

٣- الإسلام في ميزان العقل (في اللغة البنجالية، مخطوط) عدد الصفحات ٧٠٠ صفحة في ورق حجم كبير (যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম) وان مضامين الكتاب عميقة جدا ، وفيه إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته و واقعية الإسلام في ضوء الدلائل والبراهين ، وطبع عدد كبير من مقالاته في مجلة " التوحيد" الشهرية الصادرة من الجامعة الإسلامية فتية، وقدفقدت مقالات عديدة من هذا الكتاب، والمقالات الموجودة لا تزيد على ٣٠٠ صفحة –

٤- كشف الجلالين، (شرح الجلالين في اللغة الأردية) طبع في لاهور عام ١٩٥٤م

٥- شرح ايساغوجى، (في الأردية) طبع في لاهور عام ١٩٥٤م –

٦- الدروس الصرفية، (في الأردية) مطبوع ، وهو في ثلاثة أجزاء مع تقاريظ نوابغ العصر وفي مقدمتهم الشيخ الرباني / عبد المجيد رح والخطيب الكبير الشيخ / صديق احمد رح

، كان هذا الكتاب مقررا دراسيا في المدارس الحكومية، لاسيما في مدارس شيتاغونغ . وما زال مقررا وراسيا في كثير من المدارس الحكومية –

٧- ترجمة قصيدة البردة للبوصيرى رح (في البنجالية) مطبوع ، هذا الكتاب قد كثرت قراءته وتلقاه الناس بالقبول، ونشرته المؤسسة الإسلامية الحكومية مرارا.

٨- الدروس النحوية، (مخطوط في جزئين) عرض فيه مبادئ قواعد اللغة العربية في أسلوب سهل ميسور، والكتاب في اللغة الأردية .

٩- ترجمة كتاب "اسلام كا اقتصادى نظام" لمولانا حفظ الرحمان سيوهاروى " إلى البنجالية و(مخطوط).

١٠- ترجمة كتاب "گلزار سنت" (حديقة السنة) لمولانا السيد اصغر حسين الديوبندى رح إلى البنجالية. (مطبوع)

١١- أسان اردو تعليم (مطبوع) ألف ليكون مقررا دراسيا في باكستان الشرقية.

١٢- اردو پاك گرامر ، (مطبوع) ألف ليكون مقررا دراسيا في باكستان الشرقية.

١٣- ترجمة شكوه وجواب شكوه للدكتور / محمد اقبال رح إلى البنجالية ، (مطبوع) منظوما .

١٤- الإنصاف (في البنجالية) كتيب هام يتعلق بمسئلة الهلال مع مقدمة للخطيب الأسبق الجامع شيتاغونغ، الشيخ / عبد الكريم المدني رح طبع عام ١٩٦١ .

٢٦- ديوان ضخم للأشعار ، (مخطوط) في العربية والأردية والفارسية والبنجالية ومعظمها في الأردية وكثير منها طبع في الكتيبات المختلفة المتوفرة في المكتبات.

١٦- رسالة تتعلق بالمنهج الدراسي ، (مخطوطة في الأردية)

١٧- مجموعة للفتاوى الفقهية ، وهي في العربية والأردية والبنجالية .

١٨- ياد محسن (مطبوع)

١٩ - قاديانيت . (مخطوطة في البنجالية)

فيما يلي بعض نماذج من كلامه المنثور والمنظوم في اللغة العربية.

اخترنا من كلامه المنظوم بعض الأبيات من قصيدته التي ألقيت بحضور صاحب السعادة السيد فؤاد عبد الحميد الخطيب (السفير الأسبق للمملكة العربية السعودية لدى بنجلاديش) في مؤتمر السيرة النبوية المنعقد في منطقة صوناتى عام ١٣٩٨هـ، شيتاغونغ ، بنجلاديش.

(هذه القصيدة تشتمل على ٦٩ بيتا)

وطبعت في مجلة المؤسسة الإسلامية بداكا

قد قدمتم وأنتم أجلة في الشأن ... بقدومكم شرفتمونا كل السكان،
لنحبكم بحب رسولنا المصطفى ... ولحبكم والله جزء الإيمان،
وهذا الحب حقيقة لاتصنع ... ولا تملق بل ناش من الإيقان،
لنوقر سكان ديار حبيبنا ... ويعزهم كل من أهل الإتقان،
لم لا؟ وقد نزل هناك جبرئيلنا ... بالوحي والأيات للقران،
فرح الرجال والنساء بجميعهم ... نشط الشيوخ والكهول كالصبيان،
يامن تحلى بالمكارم خلقكم ... يا من تجلى نوركم بالفيضان ،
شرف لكم لاريب فيه بحصولكم ... شرف الجوار بسيد الأكوان ،
ولفضلكم حتما بدا بوصولكم ... فخر الجوار بكعبة الرحمان ،
فطلعتمونا وأنتم شموسنا ... وبنور وجوهكم خجل القمران ،
ياحبذ اشرف العرب بلسانهم ... كلسان القرآن وأهل الجنان ،
فلنعم ذا فخر العرب هو مولد ... لنبينا هو فخر نوع الإنسان ،
تبا لحساد العرب تبا لهم ... قوم اليهود وكل ذراري الشيطان ،

(وينشد في موضع آخر من هذه القصيدة)

وصلت علوم الدين الجوانب كلها ... إذ بادرت إلى الآفاق والبلدان ،
سفائن تجار العرب بشراعها ... سارت إلى الممالك الشرقانى ،
وصلت إلى بجبج غرب بنغالة ... منها إلي شيتاغونغ بحسن الجريان،
هذا المقام قد ساغهم بمناخه ... فكثيرهم استوطنوه بالعمران ،
فثلاثة أرباع من أهل الوطن ... أولادهم والباقي قديم السكان ،
فعلوم العرب شاعت من هنا إلى أل ... جوانب بدينه طول زمان ،
فمدارس بنجلاديش أن الآفها ... فرقانيات بتجويد القرآن ،

والوسطيات في الملك وكبر ياتها خم سة الآف بفنـون علم القرآن ،
مـدارس الحفـظ جـارية الآفها لخـدمة كتـاب الله الفـرقان ،

اخترنا من كلامه المنثور نموذجا لبعض فتاويه التي قام باعدادها وإصدارها في اللغة العربية وهي تتعلق برجل أطال قوله في شأن عالم ربانى وأهانه أشد الإهانة، والفتوى كما يلى :

"اللّٰهُمَّ اني اعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به واستغفرك لما لااعلم انك أنت علام الغيوب .

"أما الاستفتاء ففيه أمور، الأول: شتمه رجلا عالما بالعلوم الدينية بأفحش الكلمات وإهانته أشد الإهانة حتى بكشف العورة بين عينيه وكل ذلك بسبب انه دعاه إلى الصلح والعدل والإنصاف وانه امره بالمعروف أي بطلب الإنصاف وترك السب والشتم، والثاني : كشف العورة الغليظة بين أعين الناس، والثالث: إهانته العدل والإنصاف والضمان بأفحش الكلمات مع انها كلها أمور شرعية يجب احترامها، والرابع: اهانته اللحية بالألفاظ الرديئة وبكونها معفاة طويلة –

فالأمر الأول أن ذلك أمر شنيع وفعل فضيح يفضى فاعله إلى الكفر على ما أفتى به الفقهاء " وان اخترت الاحتياط كما اختاره بعض الفقهاء ، قلت " يخاف عليه الكفر" ولا ريب في أن شتمه وإهانته عالما ربانيا في الحادثة المسئولة عنها لم يكن إلا بسبب انه دعاه إلى الصلح والعدل والأقساط المأمور بها شرعا وأمره بالمعروف أي بطلب العدل والإنصاف وترك الشتم والتلفظ بأفحش الكلمات (كما هو ظاهر من السؤال) فإهانة العالم في أمثال هذه الصورة تستلزم إهانة العلم والدين البتة وذلك أمر فظيع أشد الفظاعة، والأمر الثاني : ان ستر العورة فرض شرعا فمن كشف عورته بين أعين الناس فقد ارتكب إثما مبينا وعلم انه لايستحي من الله تعالي ولا من عباده مع ان الحياء شعبة من الإيمان، وأيضا أن هذا الفعل ينبئ عن غاية دناءة فاعله فعليه أن يتوب فتاب الله عليه –

وأما الأمر الثالث فحكمه أيضاً كالأول يخاف عليه الكفر ، لأن إهانة الأمور التي ثبت وجوبها من الشرع على وجه الرد والإنكار كفر ، فان الصلح والعدل والإنصاف كلها واجبة وكذا ضدها أي الجدل والظلم والجور كلها محرمة شرعا وقس عليها الضمان أيضًا.

وأما الأمر الرابع : إهانته اللحية بكونها معفاة طويلة كذلك كفر صريح، لأن إعفاءها واجب ثابت بالسنة وهو من أعظم شعائر الإسلام وأوضحها ، وان تذليل شعائر الإسلام يفضي إلى الكفر لا يليق بأن يكون عذرًا.

الملاحظة: هذه الفتوى تشتمل على ثلاث صفحات في ورق حجم كبير (فل اسكيب) وتركت سطورا كثيرة في البين خوفا للاطناب ، وفيها إحالة إلى كتب كثيرة من مصادر الفقه الإسلامي ، كما أحيل فيها إلى عدد كبير من الأحاديث النبوية ، بذكر مصادرها في كتب الأحاديث .

إعداد:

*عضو البرلمان الوطني شيتاغونغ ١٥ (ستكانيه-لوهاغارا)

رئيس مجلس الأمناء: الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ.

পঞ্চম অধ্যায়

তৃতীয় প্রজন্মেও মক্কারবাড়ীর ঐতিহ্য অমলিন

বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ ও লোকশ্রুতি মতে, হযরত ইয়াছিন মক্কী (রহ.) সুদূর মক্কা থেকে ইসলাম প্রচার করতে এসে সাতকানিয়ার বাবুনগর এলাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর এক ভাই ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে সেখানেই স্থায়ী হন। তাঁদের বংশধররাই ঐতিহ্যবাহী মক্কার বাড়ির গর্বিত উত্তরাধিকার। এই বংশধারার সবচেয়ে আলোকিত যুগশ্রেষ্ঠ তিন ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন-

১. যথাক্রমে হযরত আল্লামা নুরুল হুদা (রহ.)

২. তদীয় পুত্র হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)

৩. তদীয় পুত্র প্রফেসর আল্লামা ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি ও তাঁর অনুজ অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন।

হযরত আল্লামা নুরুল হুদা (রহ.) ছিলেন উপমহাদেশ বিখ্যাত হযরত রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর শিষ্য। তিনি ছিলেন একজন ইসলামি চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, সাহিত্যিক, তর্কশাস্ত্রবিদ, হেকিম, গণিতজ্ঞ, ক্ষুরধার লেখক। কাজ করেছেন বর্ষপঞ্জিকা, ভূগোল, জ্যামিতি নিয়েও। প্রজ্ঞায়- পাণ্ডিত্যে, আধ্যাত্মিকতায়, আদর্শবাদিতায়, সততায়, নিষ্ঠায়, উদারতায়, আমলে আখলাকে ছিলেন অনন্য। তাঁর জীবন ও কর্মই তাঁর বাস্তব প্রমাণ। একজন মানুষের মধ্যে এতো প্রতিভার সমন্বয় ঘটতে আমরা সচরাচর দেখি না। তিনি ছিলেন আল্লামা ইকবালের ভাষায় পরিপূর্ণ মানুষ বা ইনসানে কামিল। খত্তে কুফী, খত্তে নছতাআলিক বর্ণে আজ থেকে ১৪২ বছর পূর্বে তাঁর স্বহস্তে লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি তাঁর নাতি প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি ও তাঁর অনুজ অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিনের তত্ত্বাবধানে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। হুবহু ছাপানো অক্ষরের মতো পাণ্ডুলিপি দেখে যে কেউ-ই বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারেন না।

হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) বহুমাত্রিকতার সংমিশ্রণে একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন হযরত আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরি (রহ.)-এর ছাত্র এবং হাকিমুল উম্মত হযরত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর মুরিদে খাছ। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও যুগশ্রেষ্ঠ এই আলেমেদ্বীন ছিলেন ঐক্যের প্রতীক এবং নেতৃত্ব ও সেবার প্রেরণা।

তিনি ছিলেন সদালাপী, বন্ধুবৎসল, অতিথিপরায়ণ, উদার ও অমায়িক। এ মনীষীর সান্নিধ্যে এসে যে কেউই মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না। তাঁর বদান্যতা ও উদারহস্তের অবারিত দানে উপকৃত হয়েছেন বহু মানুষ; আজীবন শিক্ষকতার সাথে জড়িত এই মনীষীর বদান্যতায় আলোর দিশা পেয়েছেন অনেক সুবিধা-বঞ্চিত ছেলে। তিনি তাঁর সময়ের চেয়ে আধুনিক ছিলেন। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও জরাজীর্ণ ইতিহাস বদলে দিয়ে নিজেই রচনা করে গেছেন নতুন ইতিহাস। তিনিও বাবার ন্যায় জ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করেছেন অবাধে এবং সৃষ্টি করেছেন অনেক মূল্যবান গ্রন্থ। এমনকি নাট্যকলা এবং সঙ্গীতও বাদ যায়নি তাঁর জ্ঞানপিপাসার তালিকা থেকে। তাঁর স্বহস্তে লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই মনীষীর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে পড়ি। বাবার চেয়েও কোনো অংশে কম নয়। একজন হক্কানি-রব্বানি আলেমকে অপমানিত করলে তার পরিণতির ওপর ১৯৩৬ সালে স্বহস্তে লিখিত ফতোয়ার ওপর তদানীন্তন বরেণ্য ওলামা-মাশায়েখদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দির ছাত্র হযরত আল্লামা বদিউর রহমান (রহ.), দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারীর তদানীন্তন মুহতামিম হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরফ আলী থানভী (রহ.)-এর খলিফা হযরত আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব (রহ.), হযরত আল্লামা মিয়া আজগর হোসাইন দেওবন্দি (রহ.) এর খলিফা হযরত মাওলানা আহমদুর রহমান প্রকাশ চুড়ামণির পীর সাহেব, মুফতিয়ে আজম আল্লামা ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর প্রথম খলিফা খতিবে আজম আল্লামা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) কর্তৃক সহমত ও প্রশংসাসূচক মন্তব্যই প্রমাণ বহন করে মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর উপর্যুক্ত ফতোয়া কতো উচ্চ মার্গীয় ছিল।

তদীয়পুত্র প্রফেসর আল্লামা ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি*

রাজনীতি, সমাজসেবা, শিক্ষাক্ষেত্রে দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহুল আলোচিত এই গুণী ব্যক্তিত্ব হযরত আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর ছাত্র ও শিষ্য। এছাড়া তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা ও জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার শীর্ষস্থানীয় সাবেক কৃতীছাত্র। তাঁর বদান্যতা ও উদারহস্তের অবারিত দানে উপকৃত হয়েছেন বহু মানুষ। আত্মপ্রত্যয়ী, নির্ভীক, অধ্যবসায়ী, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর, কর্মবীর প্রফেসর আল্লামা ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি এক জীবন্ত ইতিহাস। বিস্ময়কর একাডেমিক ক্যারিয়ারের অধিকারী এই গুণী ব্যক্তি সম্পর্কে অনেকেই জ্ঞাত। অসাধারণ নৈপুণ্যেতায় ভরপুর তাঁর হস্তাক্ষর দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, যোগ্য পিতা আর প্রপিতার যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে প্রফেসর আল্লামা ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি কোনো অংশেই কম নন।

** তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী, দ্রষ্টব্য 'আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) খ্যাতনামা ছাত্রবৃন্দ'।*

অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন একজন বহুমাত্রিক প্রতিভাধর, খ্যাতিমান ইসলামি ব্যক্তিত্ব। যিনি নিরলসভাবে দেশ, জাতি ও দ্বীনের সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন মাদার্শা ইউনিয়নের বাবুনগর গ্রামের প্রসিদ্ধ মক্কারবাড়ীর সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। উপমহাদেশের অন্যতম ইসলামিক স্কলার আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহর রহ. (যাঁর নামে **আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ** প্রতিষ্ঠিত)-এর কনিষ্ঠ পুত্র তিনি। তাঁর রত্নগর্ভা মায়ের নাম **রহিমা খাতুন রহ.**। আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও বিদগ্ধ আলেমেদীন, চট্টগ্রাম-১৫ আসনের মাননীয় সাংসদ প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি তাঁর অগ্রজ সহোদর।

শিক্ষাজীবন: তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ১৯৮৩ খৃস্টাব্দে দাখিল, ১৯৮৫ খৃস্টাব্দে আলিম, ১৯৮৭ সালে ফাজিল এবং ১৯৮৯ সালে কামিল পাশ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হতে ১৯৯১ খৃস্টাব্দে বি.এ (অনার্স) এবং ১৯৯২ খৃস্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে এম.এ সম্পন্ন করার পর ২০১৫ খৃস্টাব্দে একই বিশ্ববিদ্যায়ের আরবি বিভাগ হতে জগৎবিখ্যাত আলিম সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল-হাসানী নদভীর জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারার ওপর পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবন: শিক্ষকতার মহান পেশার মধ্য দিয়েই শুরু হয় ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিনের প্রতিভামুখর কর্মজীবন। ১৯৯৮ সালে তিনি চট্টগ্রামের স্বনামধন্য উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ'র ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে কিছুদিনের জন্য তিনি বাকলিয়া শহীদ এন.এম.এম.জে কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ইসলামিয়া কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন এবং বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিএসএসএইচএল ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-ও ক্লাস নিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি তিনি অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। মাঝখানে তিনি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সদ্যবিলুপ্ত 'দৈনিক ঈশান' পত্রিকায়ও কিছুদিন কাজ করেন। দেশের বৃহত্তম বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠা ও মৌলিক কাঠামো তৈরিতে সহোদর প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এমপি'র সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। চট্টগ্রামের অন্যতম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল 'চিটাগাং ইন্টারন্যাশনাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা ও বর্তমান অবস্থানে উত্তরণে তার অনন্যসাধারণ অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

বহুমুখী প্রতিভাধর এ মানুষটি সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা ও আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানের গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আরো বহু গুরুত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে বহুমুখী কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। যেমন:

তিনি আমেরিকান সরকারের অর্থায়নে ও এলপিসি চট্টগ্রাম চাপ্টার পরিচালিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং শিক্ষার্থীদের ইংলিশ এক্সেস প্রোগ্রাম'র কো-অর্ডিনটর, দৈনিক দেশের কণ্ঠ পত্রিকার চট্টগ্রাম বিভাগের ব্যুরো চীফ, চুনতী হাকিমিয়া কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সভাপতি, এরাবিয়ান লিডারশিপ মাদরাসার পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান,চিটাগাং ইন্টারন্যাশনাল স্কুল সিআইএস (ইংলিশ মিডিয়াম) এর জয়েন্ট সেক্রেটারি ও একাডেমিক এডভাইজার, পতেঙ্গা ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদরাসা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি,বেসরকারি শিক্ষকদের বৃহৎ সংগঠন স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদ (স্বাশিপ)-এরসাবেক প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক,উই কেয়ার অটিজম ট্রাস্ট এবং স্কুলের কো-চেয়ারম্যান ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি 'সাতকানিয়া সমিতি চট্টগ্রাম', 'চাটগাঁ ভাষা পরিষদ, চট্টগ্রাম' এবং 'বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ'-এর আজীবন সদস্য। বাংলাদেশ শিক্ষা ও গবেষণা ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম-এর উপদেষ্টা।

লেখালিখি ও গবেষণা: ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন একজন একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধক,গবেষক ও প্রতিভাবান লেখক। ছাত্রজীবন থেকে বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে তার লেখকসত্তার উন্মেষ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাজীবনে আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের রচনা প্রতিযোগিতায় একবার প্রথম এবং দু'বার দ্বিতীয় স্থান অধিকারের পুরস্কার অর্জনেরও কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর।গবেষণা ও লেখালিখির ভাষা মূলত বাংলা হলেও ইংরেজির পাশাপাশি আরবি, উর্দু ও হিন্দিতেও তিনিবিশেষ পারঙ্গম।ইতোমধ্যে তাঁর অনূদিত, সম্পাদিত ও লিখিত বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ দেশ-বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে এবং বোদ্ধামহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভটির গ্রহণযোগ্যতা ও উপযুক্ততা বিবেচনা করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ(ইফাবা) গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে। তার অন্যান্য রচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

গ্রন্থাবলি :

- সম্পাদিত: আল্লামা ফজলুল্লাহ (রাহ্) এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা : স্মারকগ্রন্থ আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৮৩।
- সম্পাদিত এবং রেফারেন্স সংযুক্তি (যৌথ) : বঙ্গানুবাদ শামায়িলে তিরমিযী, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০৬।
- মুআ'ল্লিমুল ইনশা-১ম খ- (যৌথ) : উর্দু হতে বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনা, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৪৩।

- মুআ'ল্লিমুল ইনশা (২য় খ-) যন্ত্রস্থ।
- আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ:) সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য (সংকলন) আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা:.....
- সম্পাদনা: বিরল প্রতিভাধর জ্ঞান তাপস, আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.।
- সম্পাদনা : আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন ও অধ্যাপক আবু রেজা নদভী (বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় রচিত) আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৭৫।
- জমিয়াতে শাবাবুল ইসলাম : উর্দু হতে বাংলায় অনুবাদ (পাণ্ডুলিপি)
- সম্পাদনাধীন : যুক্তির কষ্টি পাথরে ইসলাম লেখক: আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ:) পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৭০।

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী : জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা, (৪৪০ পৃষ্ঠা) ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত।

বিদেশভ্রমণ: তিনি ইউকে সরকারের অর্থায়নে বৃটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ড সফর এবং প্রাইমারি স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়াও ব্যক্তিগত ও পেশাগত প্রয়োজনে একাধিকবার ভারত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, ও ইউনাইটেড আরব আমিরাত সফর করেন।

ঐতিহ্যবাহী মক্কারবাড়ীর তৃতীয় প্রজন্মের অন্যতম সার্থক কর্ণধার অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন তাঁর প্রজ্ঞা ও কর্ম দ্বারা দেশ-জাতি ও মানুষের কল্যাণে আরো বহুবর্ণিল অবদান রেখে যাবেন। এ-ই আমাদের প্রতীতি ও প্রত্যাশা। আল্লাহপাক তাঁকে সুস্থতাসহ কর্মমুখর জীবন দান করুন। আমিন!

আলোচ্য পরিসরে আমার আলোচনার বিষয়বস্তুও কিন্তু উপর্যুক্ত তিন মনীষীর বংশ পরম্পরায় অসাধারণ হস্তাক্ষর নিয়ে। সুধী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এখানে আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর স্বহস্তে লিখিত কিছু হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি (ছবি) তুলে ধরা হলো।

সম্পাদনায়

অধ্যাপক শাব্বির আহমদ

প্রেস সচিব, মাননীয় সাংসদ

মক্কার বাড়ীর বংশলতিকা

ইয়াসিন মক্কী

- হাসান আলী তালুকদার
  - আল্লামা নুরুল হুদা (রহ.)
    - আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)
      - আবু ছফা মুহাম্মদ নজমুদ্দিন
      - আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন
      - জাহানারা বেগম
      - জয়নাব বেগম
      - হাফসা বেগম
      - আবুল ওয়াফা মুহাম্মদ শিহাবুদ্দিন
      - আবুল আতা মুহাম্মদ এমাদুদ্দিন
      - আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন
      - আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন
- মনসুর আলী তালুকদার
  - সাদেক আলী
    - কাদের বখশ
      - কাদের বখশ
        - ফরিদুল আলম চৌধুরী
        - সাহেব মিয়া চৌধুরী

উল্লেখ্য,

* **ইয়াসিন মক্কী:** বাংলাদেশে আসেন সতেরো'শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৭০০-১৭২০ -এর দিকে) ইসলাম প্রচারের জন্য। তিনি এ দেশ থেকে হাজী নিয়ে যেতেন, এর পাশাপাশি সম্ভবত বাণিজ্যও ছিল।

* **হাসান আলী তালুকদার :** আধ্যাত্মিক সাধক, জমিদারও। তবে তিনি আধ্যাত্মিকতাই রক্ষা করেন। তার ঘুমানোর পর প্রতিটি লোমকূপ হতে আল্লাহ যিকির এবং মৃত্যুর পর তাঁর শরীর হতে আকাশ পর্যন্ত একটি নীলাভ আলোর ধারা বেরিয়েছিল বলে জনশ্রুতি ছিল।

* **মনসুর আলী তালুকদার** জমিদারি প্রথায় ছিলেন।

* **আল্লামা নুরুল হুদা (নূর বখশ :** ১৮৫২-১৯৩৪ খৃ.) হুগলী পাশ করা প্রথিতযশা আলিম। ফার্সি, আরবি, উর্দু, ফাতওয়া, জ্যামিতি, বীজগণিতবিশারদ, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর শিষ্য ও আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। (পৃথক জীবনাংশ দ্রষ্টব্য) তাঁর ৯টি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

* **আল্লামা আবুর বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ :** (১৮৯৮-১৯৭৯খৃ.) (জীবনীগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

* **কাদের বখশ :** (১৮৪০-১৯৬০ খৃ.)

বলীখেলা ও মেলার প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৯ খৃ.। খাজনা দিতে আসা লোকজনের বিনোদনের জন্যে এই বলীখেলা ও মেলার প্রবর্তন করা হয়েছিলো। নববর্ষের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিলো ৭ বৈশাখ। বড় গাছের গুড়ি যারা তুলতে সক্ষম, তারাই বলীর জন্যে বাছাই হতো প্রথমদিকে।

আল্লামা নুরুল হুদা রহ.-এর স্বহস্তে লিখিত কিছু হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি (ছবি)

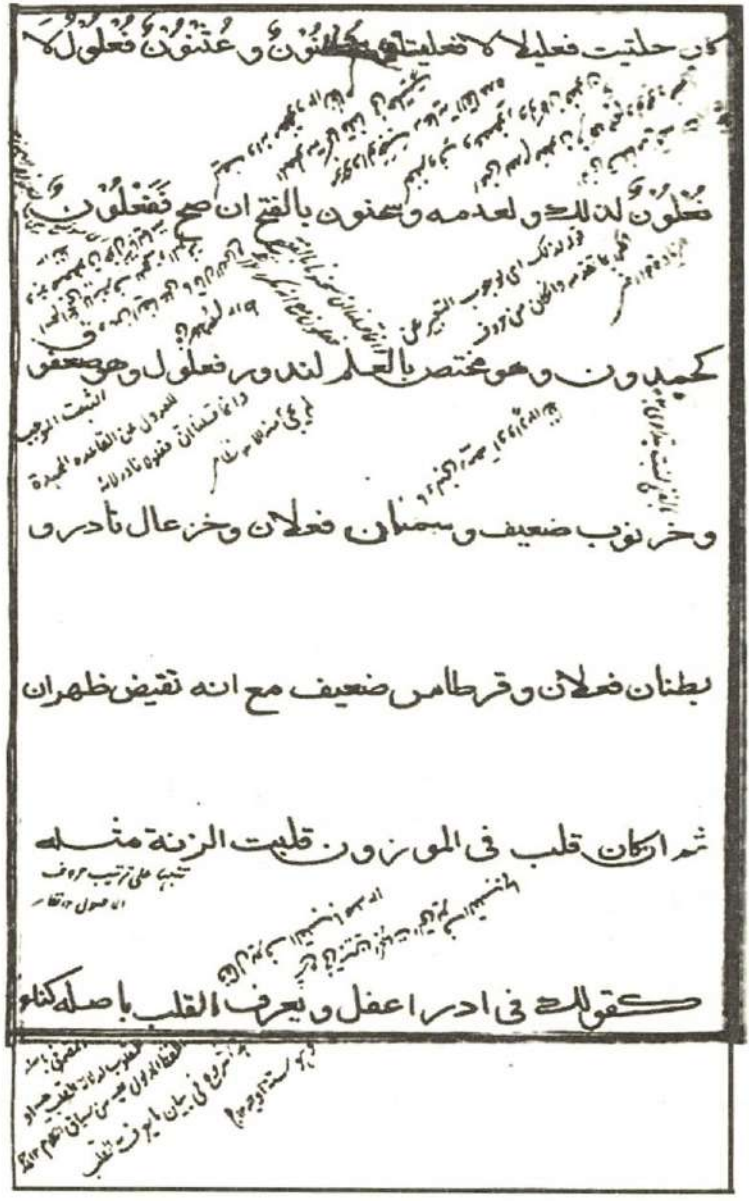

খত্তে কুফি অনুকরণে আল্লামা নুরুল হুদা রহ.-এর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি

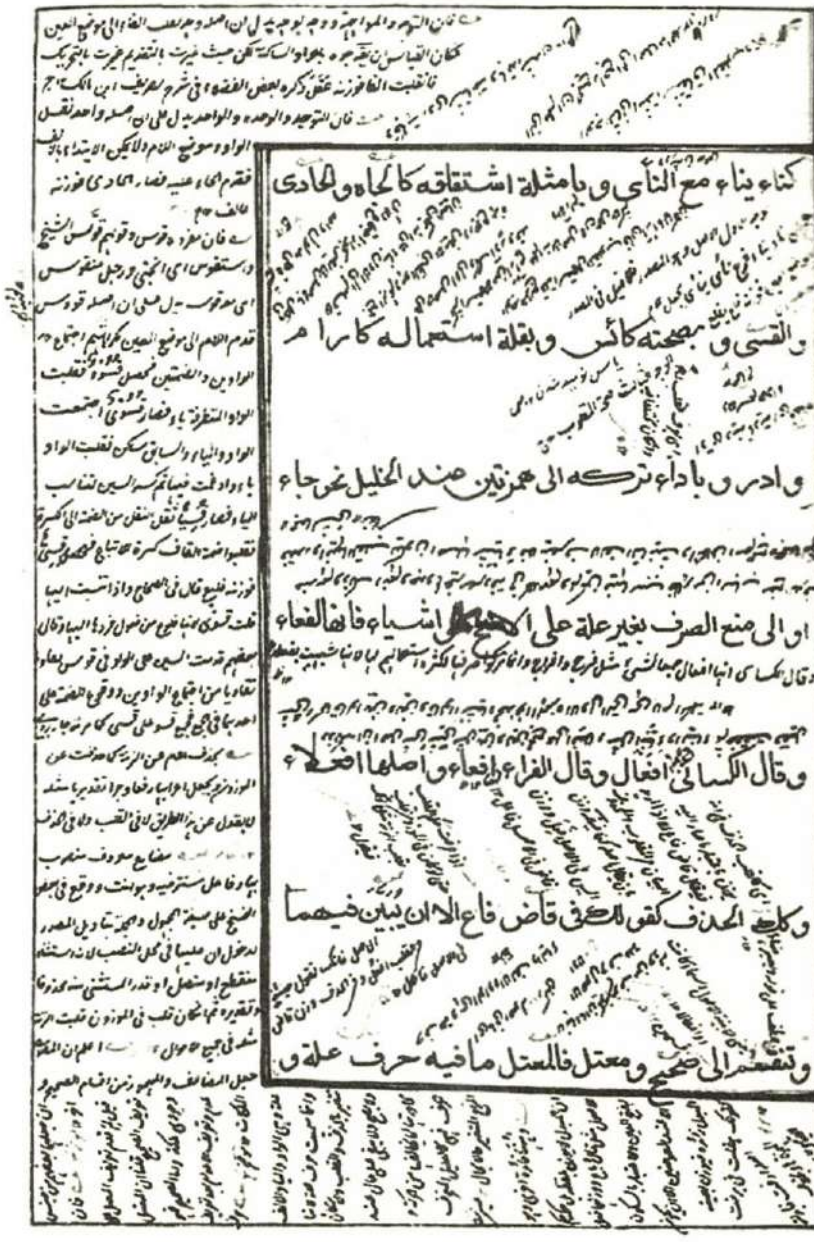

খত্তে কুফি অনুকরণে আল্লামা নুরুল হুদা রহ.-এর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه رسالة مشتملة على تحقيق معنى التصور والتصديق وتعريفهما حررتها لبعض
الاصحاب متوكلا على ملهم الصدق والصواب اعلم ان العلم الذى هو مورد
القسمة فى التصور والتصديق هو العلم المتجدد الذى لا يكفى فيه مجرد الحضور كعلم البارى تعالى
وعلم المجردات بانفسها وعلمنا بانفسنا والا لم ينحصر العلم فى التصور والتصديق اذ
التصور هو حصول صورة الشئ فى العقل والتصديق يستدعى التصور الذى هو كذا و
العلم الحضورى لا يكون بحصول الصورة واما العلم المتجدد بالاشياء الغائبة عنا
فلا بد ان يكون بحصول صورها فينا اذ حالة العلم انما يحصل لنا امر ولا زال عنا امر فاستوى

খত্তে নছতাআলিক অনুকরণে আল্লামা নুরুল হুদা রহ.-এর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি

حال العلم وما قيل وهو محال وان زال امر فالزائل عند العلم بهذا غير الزائل عند
العلم بذلك والا كان العلم باحدهما هو العلم بالاخر فيلزم ان يكون فينا امور غير متناهية
بحسب ما في قوتنا ادراك الامور الغير المتناهية كالاشكال والاعداد المترتبة وتلك
الامور الحاصلة فينا مترتبة موجودة معا لانه لما كان العدد الاكثر مثلا مستلزما
لعدد الاقل فعدم الاقل يكون مستلزما لعدم الاكثر فاذا كان عدم الواحد والاثنين او
علة عدمهما موجودة فينا بالفعل فعدمات الاعداد الغير المتناهية يكون موجودة فينا
بالفعل الخ وتبين بطلان هذا في الحكمة فتبين بهذا ان العلم تحصيل لا ازالة ولان كون
العلم تحصيلا لا ازالة هو من الامور التي نجدها في انفسنا ولا نحتاج فيها الى بيان ولامر
الحاصل عند العلم باحد المعلومين غير الحاصل عند العلم بالمعلوم الاخر لا سبق
فيلزم ان يكون لكل معلوم امر في العقل يطابقه وهو العلم بدون العلم بما عداه وذلك هو
المراد بحصول صورة الشيء في العقل ويجب ان يكون هذا العلم اعم من ان يكون مطابقا

খত্তে নছতাআলিক অনুকরণে আল্লামা নুরুল হুদা রহ.-এর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি

الى وصف الاكبر لنسبته الى ذات الاصغر فصل

الشرطى من الاقترانى اما ان يتركب من متصلتين او

منفصلتين او حملية ومتصلة او حملية ومنفصلة او

متصلة ومنفصلة وينعقد فيه الاشكال الاربعة

وفى تفصيلها طول فصل الاستثنائى ينتج من

المتصلة وضع المقدم ورفع التالى ومن الحقيقية وضع

كل كمانعة الجمع ورفعه كمانعة الخلو وقد يختص باسم

قياس الخلف وهو ما يقصد به اثبات المطلوب بابطال

نقيضه ومرجعه الى استثنائى واقترانى فصل

الاستقراء تصفح الجزئيات لاثبات حكم كلى فصل

التمثيل بيان مشاركة جزئى لاخر فى علة الحكم ليثبت

খত্তে নছতাআলিক অনুকরণে আল্লামা নুরুল হুদা রহ.-এর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি

فيه والعمدة في طريقه الدوران والترديد فصل

القياس اما برهاني يتالف من اليقينيات واصولها الاوليات

والمشاهدات والتجربيات والحدسيات والمتواترات والفطريات

ثم ان كان الاوسط مع علته للنسبة في الذهن علة لها

في الواقع فلمي والا فاني واما جدلي يتالف من المشهورات

والمسلمات واما خطابي يتالف من المقبولات والمظنونات واما

شعري يتالف من المخيلات واما سفسطي يتالف من الوهميات

والمشبهات ❊ خاتمة ❊ اجزاء العلوم ثلثة الموضوعات

وهي التي يبحث في العلم عن اعراضها الذاتية والمبادي وهي

حدود الموضوعات واجزائها واعراضها ومقدمات بينة

او ماخوذة يبتني عليها قياسات العلم والمسائل وهي قضايا

খত্তে নছতাআলিক অনুকরণে আল্লামা নুরুল হুদা রহ.-এর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি

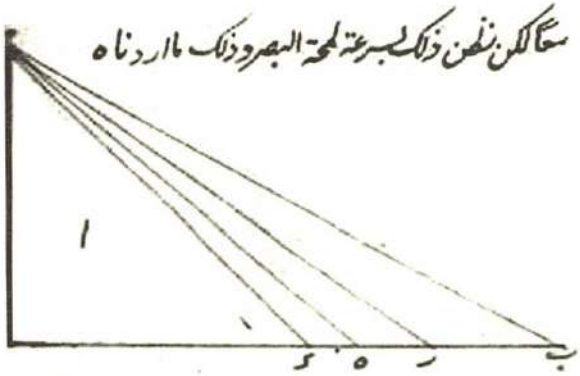

ب اقرب المقادير المتساوية المختلفة الابعاد اصدقها روية فليكن
اب ج د متساويتين وه العين و ج د اقرب اليها من اب
ونخرج ه ج ه د ه ا ه ب فان زاوية ج ه د اعظم من زاوية ا ه ب
يكون الواقع على ج د من الشعاع اكثر من الواقع على اب فكذلك
يكون روية اصدق من روية اب وذلك ما اردناه

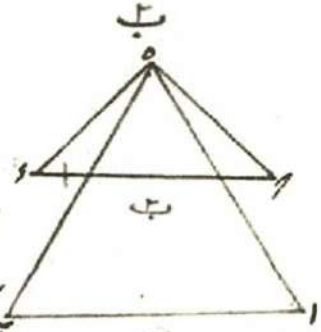

٣/٦

ج كل مبصر فله غاية من البعد اذا جاوزها لم يبصر فليكن المبصر
اب والعين ج والشعاع ج ا ج ب ج و لينقل اب
حتى يجوز ج ونرسم عليه د ه فلان اب يقع عليه الشعاع

ب ه ر د

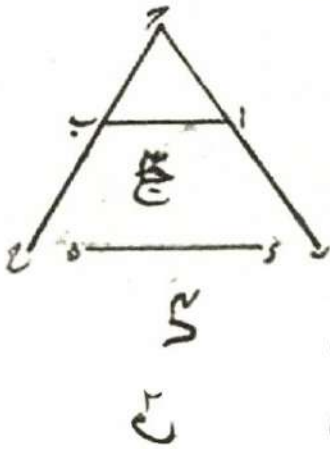

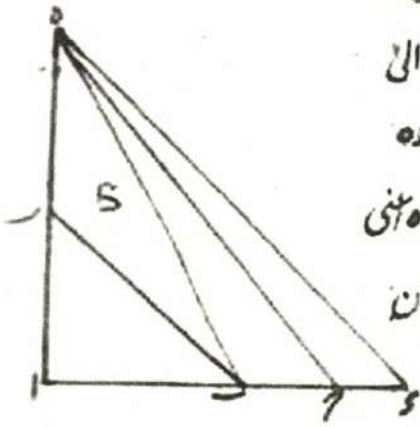

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর স্বহস্তে লিখিত কিছু হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি (ছবি)

চুরির শাস্তি হাত কাটা

সম্বন্ধে বিচারকের কাছে সুপারিশ করা নিষেধ করেছেন। বর্তমান সভ্য জগতের লোকগণ নাকি বলে থাকেন যে চুরির শাস্তি হাত কাটা অত্যন্ত জঘন্য ও কঠিন শাস্তি বটে। একজন মানুষের একটা অঙ্গ নষ্ট করে দেওয়াটা খুবই কঠোর বিধান। দেশে যেখানে সেখানে হাত কাটা অর্থহীন লোক দৃষ্ট হয়। একথা বলবার আগে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি নিয়ে একটু চিন্তা করা উচিত।

১) অপরাধের শাস্তি বিধান কেন? উদ্দেশ্য কি?

২) চুরির অপরাধের প্রতিক্রিয়া গৃহস্থের এবং দেশের ও সমাজের এবং চোরের প্রতি লক্ষ্য করে কি কি?

৩) বর্তমান সভ্য জগতে চোরের যে শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে তাদ্বারা মূল উদ্দেশ্য হাছেল হচ্ছে কিনা?

৪) চুরির শাস্তি হাত কাটা রাখলে সত্যই দেশের মধ্যে হাত কাটা অর্থহীন লোকের সংখ্যা কমবে?

৫) বর্তমান যুগের নব্য শিক্ষিতগন এ বিধানের অযথা প্রলাপ করেন কেন?

প্রথম—

অপরাধী সম্বন্ধের শাস্তি বিধানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশ

(২) ইসলাম ও পর্দা—প্রশ্ন—

কিছু কাল থেকে কতকগুলি লোককে বলতে শুনা যায় যে ইসলামে স্ত্রীজাতির জন্য যে পর্দার বিধান রাখা হয়েছে তা সেটা পুরানো কালে ছিল। কিন্তু এই উন্নত যুগে আমাদের জাতীয় উন্নতির পক্ষে তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বর্তমান যুগে শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নহে। এই পর্দা প্রথা স্ত্রীশিক্ষার গুরুতর বিঘ্ন বটে। তারা শুধু একথা বলে ক্ষান্ত হয় নাই বরং স্ত্রীকন্যাগণ সদরে বাজারে খোলা খুলি ভাবে ঘোরে পদব্রজে বেড়াতে আরম্ভ করেছে। এ বিষয়ে এখানে দুই একটি কথা বলা হচ্ছে।

(ক) আল্লাহ পাক মানব জাতিকে পুরুষ, স্ত্রী দুই শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। উভয়ের সম্মিলিত জাতির নাম মানব সমাজ। দুয়ের কোন একটি না হলে সমাজ অচল। কিন্তু উভয় জন্মগত প্রকৃতি ও নর নারীতে বিভক্ত। কিন্তু এখন পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ কিছু লোক এমন আছে যে, নিরক্ষর নর নারীকে মেয়ে মিলে ভাল বলে থাকে। এক নরের নিরক্ষর নারীর সঙ্গে অপর নর এসে মিলতে চাইলে তখন নরের নারী [illegible] হয়, হয় তখন স্বাভাবিক গায়রত [illegible] রাগ। কিন্তু সেই রূপ জোড়া বিবাহ আজকে কোন প্রয়োজন সাধিত নাই। কারণ তাদের উভয় নাম উপাধি ঠিক থাকায় বংশ মর্যাদার কোন প্রশ্ন নাই। সম্মিলনে তাদের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু স্ত্রীর শ্রেণী মানবের মর্যাদা অসীম। এদের নাম উপাধি ঠিক থাকতে হবে। এদের বংশ মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ করতে হবে। স্ত্রীজাতিকে পুরু

ইছলাম ও কাদিয়ানী—

বাদ দিয়ে দিলেন। কিন্তু এতেও তিনি ক্ষান্ত হচ্ছেন না বরং এই পুস্তকের ৪৩ ও ৪৪ পৃষ্ঠায় পৌঁছে তিনি একনাকে "ان نشان دیں" - অর্থাৎ "১০ লক্ষের ও অধিক নিশান (মোজেযা) দিলেন। এরচেয়ে বাড়াবাড়ি, মুবালগা ও অতিরঞ্জিত বর্ণনা আর কিছু পারে? এটা অতিরঞ্জিত বলাও ভুল। কারন অতিরঞ্জিত বলতে গেলে এর ভিতর কিছু আসল পুঁজি থাকে-যাকে বাড়িয়ে বলা হয়। এখানেত আসল কিছুই নাই। সবটুকুই মিথ্যা, যেমন ঝুটা নবী তেমন ঝুটা মোজেযা।

(১২) মির্জা সাহেবের পয়গাম্বরী দাবী হতে মোতে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া - তিনি বলেন:- "اس فقرہ میں دان ایل نبی نے بتلایا ہے کہ اس نبی آخر الزمان کے ظہور سے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب بارہ سو لوں برس گزرینگے تو وہ مسیح موعود (مرزا) ظاہر ہوگا اور تیرہ سو پینتیس ۱۳۳۵ ہجری تک اپنا کام چلائیگا - یعنی چودھویں صدی میں پینتیس ۳۵ برس برابر کام کرتا رہیگا" (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۱۹۱ کا حاشیہ طبع دوم)

অর্থাৎ এই বাক্যে দানিয়েল নবী জানাচ্ছেন যে শেষ জামানার নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রকাশ হওয়ার পর যখন ১২০০ বৎসর গত হয়ে যাবে তখন ঐ মসীহে মওউদ (মির্জা) আসবেন।

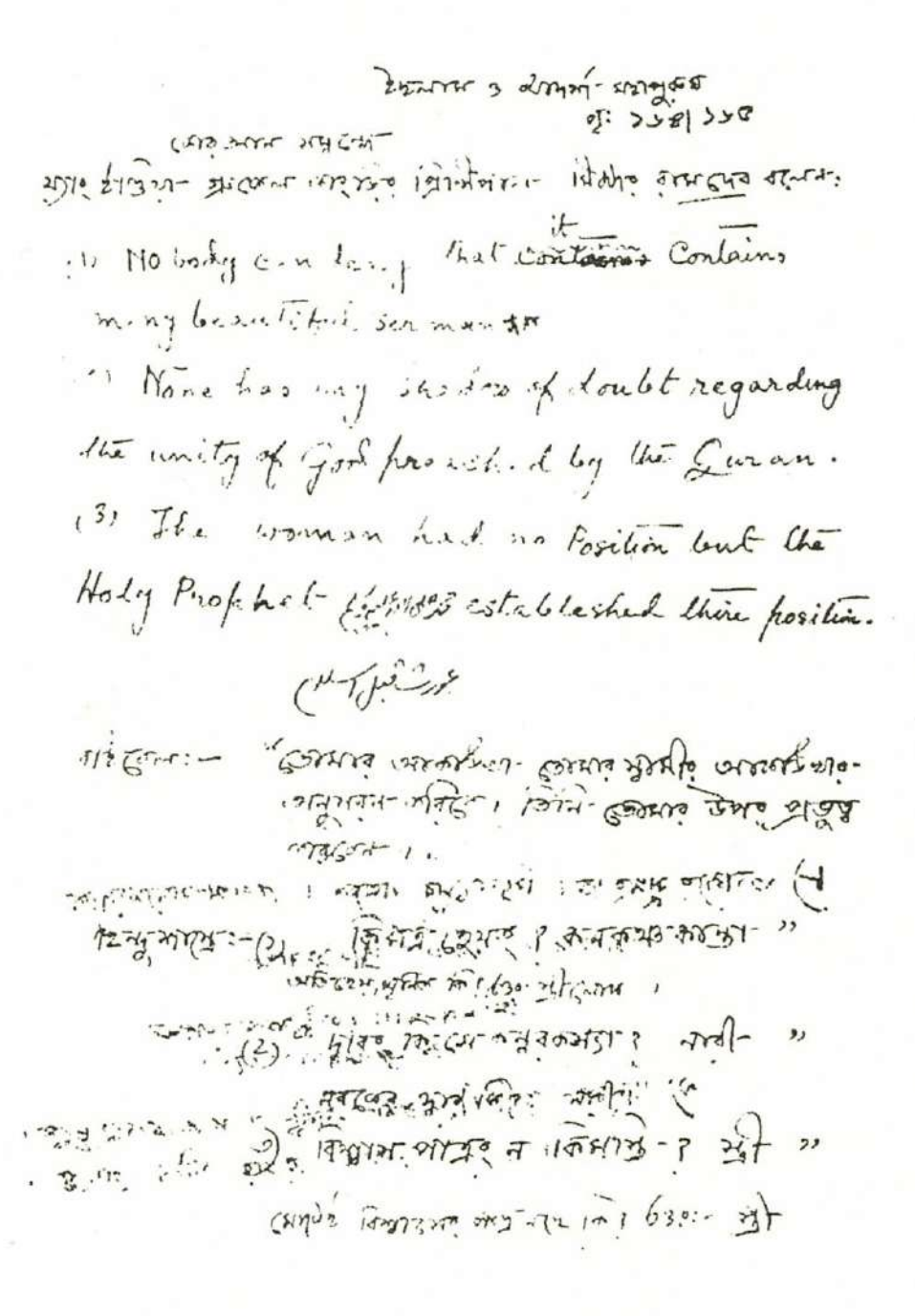

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) রচনাবলির পাণ্ডুলিপি হতে

(২)

মাটির ভিতর হইতে শস্য এবং তাদের (মানব দানব প্রাণী) ভিতর হইতে ও এবং বস্তু সৃষ্টি হইতে যাহা- তারা জানেনা।

বৈজ্ঞানিক বলেঃ- সরল রেখায় চলাই আলোকের ধর্ম্ম। তবে চুম্বক (মগনেট) এর আকর্ষণে- বাঁকা পথে বক্র পথে পারে। কাজেই মানুষের স্বভাব সরল সৎপথে চলা। তবে শয়তানের আকর্ষণে বক্রপথে ধাবিত পারে-

القرآن - اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

এখন আসুন

বিজ্ঞান- নাস্তিক বাদকে বিশ্লেষণ করেছে:- যিঁহারা- তাহা- অস্বাভাবিক স্থানীয় অস্বীকার করিল। কিন্তু তা আজ পড়ে গেছে। সমস্ত- বৈদ্যুতিক শক্তি- দ্বারা- আজ- মূলদেহী- বক্ষে- লইয়া- বায়ু স্তর ভেদ করিয়া- মহাশূন্যে হাজার হাজার মাইল ঘুরে- আসল।

বিজ্ঞানীরা বলছে- অর্থাৎ এক যুগে যাহা অস্বাভাবিক মনে করি, পরবর্তী যুগে- তাহাই স্বাভাবিক হইয়া- দাড়ায়।

এখন বুঝে নিতে হয় সেই নূর হইতে সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে উহার বৈদ্যুতিকার জোর কত? সেই বিদ্যুত বা জ্যোতিঃ কে সংক্রিন করিয়া সন্দেহে আকাশে যাওয়াতে কি অস্বাভাবিকতা আছে

(৩)

বিজ্ঞানী লেপ্লেস (Laplace) বলেন-

বাইবেলে মাত্র ধর্মনীতি আছে —

কোরআনে ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শাসননীতি, সমরনীতি বিচারনীতি, দিনলিপি লেখনীতি, শারীরিক স্বাস্থ্যনীতি, আর্থিক পরিচালনীতি, ব্যবহার নীতি সমস্ত আছে।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

নরওয়ের দক্ষিণাংশে তিব্বত সমস্যায় সম্রাট — ওলফ্রেড কেজম খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী অধীনস্থ লোকদের প্রতিমাদর্শন, দেশান্তর, প্রাণে বিনাশ করেন। ইসলাম ধর্ম কখনও এহেন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেনাই।

Mr. চ্যাটফিল্ড বলেন :-

"ইউরোপ বাসিগণ কোরআন পাঠগণের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিয়া থেন, যদি উহাদের প্রতি খৃঃ, তুর্কী ও অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়গণ তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে প্রাচ্যে ইউরোপীয় ধর্ম লোপ পাইত।"

(৪)

১) আরবাগানী ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রে "জ্যা" এর পরিবর্তে 'সাইন' ও 'কোসাইন' ব্যবহার প্রচলন করেন। তাঁহারই উদ্যমে ত্রিকোণমিতি একটি স্বনিয়ন্ত্রিত শাস্ত্রে উন্নিত হয়।

২) মহা "চাতুরাত্রিক সমীকরণ" শাস্ত্র আবিষ্কার করেন। আবার তিনি "গোলীয় ত্রিকোণমিতি" (Spherical Trigonometry) শাস্ত্রে এক খানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

৩) আরবাগানী 'জাবির' একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া হিপ্পার্কাসের নষ্ট "ত্রিকোণমিতি" শাস্ত্র পুনরুদ্ধার করেন।

(৪) মুসলিমগণ দৃষ্টির অন্তর্গত যাবতীয় নক্ষত্র মণ্ডলীর তালিকা ও মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া জ্যোতির্বিদ্যা শাস্ত্রে বিশ্বমানীর ঠকা — অবিস্মরণীয় স্থান রাখিয়া গিয়াছেন।

বহু নক্ষত্রগুলি আরবী নামধারণ পূর্বক সদ্যাপি — আরব পণ্ডিতগণের গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

বৎসরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য, পৃথিবীর আয়তন-ফল, মেরুকক্ষের আবিষ্কার, সূর্যকক্ষের উৎকেন্দ্রতা, ক্রান্তিবিন্দুর বক্রতা হ্রাসের হার, ইত্যাদি তাঁহারাই সূক্ষ্মগণনা দ্বারা সর্ব প্রথম নির্ভুলরূপে নির্ণয় করেন।

JULY

۸- شناسا عبد کو معبود کا ہے کر دیا تو نے
انیس عاشقاں تم ہو چراغ عارفاں تم ہو

۹- ہو جاری فیض تیرا گنبد خضرا سے ہر ہر دم
چنوتی مدرسہ پر فضل پر خود فیض شاں تم ہو

---

۱۱ ۴/۲۴ التجا بحضرت خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم

۱- ہمچو سیماب سکون قلب گم کردہ منم
سوختہ اندوہگین دلبس کہ آشفتہ سرم

۲- اے امید عاصیان و راحت آشفتگاں
روز و شب در خواب و بیداری خیالت ہمدم

۳- یافتم بارے درت صد حیف در چشمم زدن
محبت آخر شد و من زاں فغاں ہا می کنم

۴- ایں تمنا باز حاصل گر بیاید
برق چوں خنداں و ہمچوں ابر گریاں شوم

۵- داستان درد دل خوانم و ہم سوز فراق
نغمہ پرداز ہمچوں بلبل نالاں کنم

انیس بے درد دل

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) স্বরচিত কবিতাসমগ্র এর (শের) পাণ্ডুলিপি হতে

(২)

OCTOBER 1964

26 Jamadi-I 1384 SATURDAY 3 18 Asuj 2021

১৭ আশ্বিন ১৩৭১

خطاب بطالبے کہ تحفۂ گل پیش کرد

۱- گلے بتحفہ سپردی چو گل دلم بردی
چہ خوش نصیب بدستت دلے درآوردی

۲- عجیب صفقۂ بیع و شرا درانجامید
کہ جنسِ اکبر بے داغ زاں سرانجامید

۳- وزے رعایتِ دلداریاں بتو شدہ لازم
کہ وصفِ دلبریت ہمچو گل بود دائم

باآمد مہمان بخانہ

۱- "خوش آمدید، کہ "مبارک باد" می خوانیم
کہ ما بمقدمِ تو شرفہا بہ پنداریم
بخیر مقدمِ تو ما ہمگنان خوشنودیم
زدیر باآمدت انتظارہا می داریم

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) স্বরচিত কবিতাসমগ্র এর (শের) পাণ্ডুলিপি হতে

(৩)

OCTOBER 1964

11 Jamadi-II 13b.. SUNDAY 18 2 Kartak 2021

২ কার্তিক ১৩৭১

گر کی بات

۱- سنگریزہ جس کو سمجھا وہ دُرِ نایاب تھا
حسن کا گہوارہ تھا پھر ماہرو مہتاب تھا

۲- پُر نظر انکی حقیقت بیش نہ تھی کیا قدر ہو؟
ہے برابر خاک تھی یا گوہر بآب تھا

۳- کیا خبر اُن کو کہ یاں دریا چھپا سینے میں ہے
نہر وہ سمجھا جسے وہ قُلزُمِ سیلاب تھا

۴- زاغ کو سمجھا برابر بلبلِ خوش خوان کا
کامراں سمجھا جو خود کو بے حقیقت خواب تھا

۵- وہ دعا خواں دل جو تھا تیرے لئے اب ہے کہاں؟
اب فلک پرواز ہے وہ گرچہ خاک و آب تھا

۶- خامشی کر اختیار ای فضل گر کی بات سے
کیا کوئی سمجھے کہ تجھ میں موج تھی سیلاب تھا

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) স্বরচিত কবিতাসমগ্র এর (শের) পাণ্ডুলিপি হতে

(8)

OCTOBER 1964

19 Jamadi-II 1384 | MONDAY 26 | 10 Kartek 2021

৯ কার্তিক ১৩৭১

پندے چند -

۱ - ایک بلبل تھا گلستاں میں ہزاروں داستاں
پر نہیں اس کے ہوے تم جان و دل سے قدرداں

۲ - ای گل خاموش تیرا کون ہو اب نغمہ خواں
کون ہوگا نکتہ رس اور نکتہ سنج و نکتہ داں

۳ - اپنے گل پر حسن پر بیخود رہا نازاں رہا
یاد رکھ ہے حسن ظاہر چند روزہ میہماں

۴ - حسن باطن گر ہے تم میں قدر کی شئی ہے وہی
لیک وہ بے پرورش کیونکر بنیگا جلوہ شاں

۵ - ہے کہاں وہ نکتہ داں جو پرورش دیگا اسے
تم نے سمجھا خود بخود ہو جاؤ گے خندہ دہاں

۶ - بے زینت صبحدم غنچہ کبھی ہنستا کہیں -؟
کیا شگفتہ ہو کے وہ ہوتا ہے زیب گلستاں

۷ - جان لو تم سا بہت تھے گن کے مالک دہر میں
لیک وہ بے پرورش کے ہو گئے ہیں بے نشاں

۸ - گو ہے تاباں ہے ہر نقطہ تیرا افضل لبیب
پر حقیقت ہو گر خاموش ہو جا اس زماں

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) স্বরচিত কবিতাসমগ্র এর (শের) পাণ্ডুলিপি হতে

(৫)

NOVEMBER 1964

19 Rajab 1384 TUESDAY 24 عشق 10 Magghar 2021

৯ অগ্রহায়ণ ১৩৭১

۱- یہ دل ہے کسکے لئے بیقرار و بے تاباں
تڑپ تڑپ ہے سدا ہر زماں ہے وہ نالاں

۲- ہے سوز سوز بسینہ پگھل رہا ہے جگر
تپش تپش ہوں بدل در فراق او سوزاں

۳- ہے درد درد بقلب حزیں عشق صنم
بعشوہ عشوہ خراماں بدبر نازاں

۴- خبر کسے کہ یہ آتش عشق ہے کیا شئی
ہوں شعلہ شعلہ بداماں باندہش خفقاں

۵- نگاہ دیدۂ ناوک فگن سے ہوں ترساں
کہ پُر خطر ہے یہ جذبات عشق کے طوفاں

۶- ادا ادا ہے کہ ہر ہر ادا دلاویزاں
نگہ نگہ پہ ہوں بسمل بمقتل جاناں

۷- ایک ایک نگاہ تھی - بسمل تڑپ رہے ہوں ہزار
رواں تھا خوں کا سمندر پھر اسمیں تھا ہیجاں

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) স্বরচিত কবিতাসমগ্র এর (শের) পাণ্ডুলিপি হতে

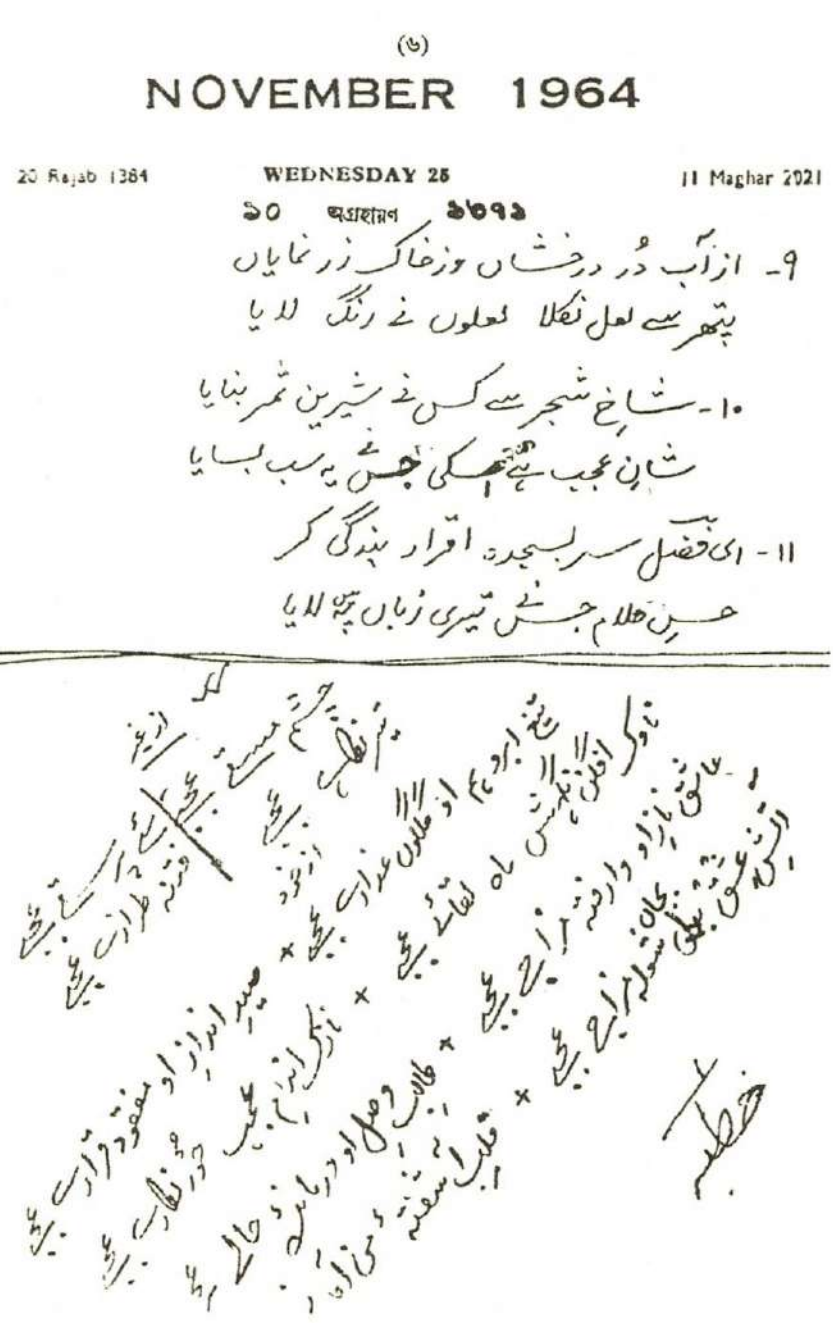

(৬)

NOVEMBER 1964

20 Rajab 1384 WEDNESDAY 25 11 Maghar 2021

১০ অগ্রহায়ণ ১৩৭১

৯- از آب دُر درخشاں و ز خاک زر نمایاں
پتھر سے لعل نکلا لعلوں نے رنگ لایا

۱۰- شاخ شجر سے کس نے شیریں ثمر بنایا
شانِ عجیب ہے تجھ کی جس نے یہ سب بسایا

۱۱- ای فضل سر بسجدہ اقرار بندگی کر
حسنِ کلام جس نے تیری زباں پہ لایا

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) স্বরচিত কবিতাসমগ্র এর (শের) পাণ্ডুলিপি হতে

(৮)

DECEMBER 1964

16 Shaban 1384 | MONDAY 21 | 7 Poh 2021

৬ পৌষ ১৩৭১

از فضل

برزبانِ اطفال

اے تارے آسماں کے، اے جگمگانے والے ؛ ہمکو بھلانے والے اے دل لبھانے والے
بچے سمجھ کے ہم کو، ناداں سمجھ کے ہم کو ؛ چمکا رہے ہو ہم کو، دھوکے میں لانے والے
بچے ہیں ہم مسلماں اور حوصلے ہمارے
اوپر بہت ہیں تم سے پرواز لانے والے

مخلوق تم ہو اور ہم خلّاق کے ہیں عاشق ؛ قربان اسکے احسانوں پر ہیں ہونے والے
پیارے خلیل کے اور اُمّت ہیں مصطفےٰ کے ؛ پیغام رانیٔ وجہت ہم سنانے والے
ہیں قوم کے دُلارے ہم نونہال ان کے
کردار سے ہم اونکی عزّت بڑھانے والے

عاشق ہیں علم دیں کے، ہیں پاسباں وطن کے ؛ جوشِ جہاد دل میں موجوں میں آنے والے
یارب ہمیں بچانا فضل و کرم سے اپنے ؛ عشرت پرستیوں سے تو ہے بچانے والے
ہم کمتر دل ہیں بچے منزل کو پا چکینگے
فضل خدا سے ہم ہیں مقصد کو پانے والے

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) স্বরচিত কবিতাসমগ্র এর (শের) পাণ্ডুলিপি হতে

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি'র স্বহস্তে লিখিত কিছু হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি (ছবি)

(٧)

القاعدة السابعة

" الاضطرار لا يُبطل حق الغير" (١)

يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر بغير قيمته (٢)

أساس هذه القاعدة

هذه القاعدة مستقاة من قوله عليه الصلاة والسلام " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام (٣)

كما أشار إلى ذلك الإمام الطحاوي " في النص الآتي :

" قال أبو جعفر : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " واتفقوا أنه لو اضطر إلى طعام غيره ، فأكله : ضمنه ، فدل أن الضرورات لا تبيح إتلاف مال الغير بغير ضمان " (٤)

(٨)

القاعدة الثامنة

" أن تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل والتحويل " (٥) (ذكرها فقهاء الحنفية)

بنية هذه القاعدة

عن عروة البارقي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار يشتري له أضحية - وقال مرة : أو شاة ، فاشترى له شاتين ، فباع واحدة بدينار ، وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة في بيعه ، (٦) أن الرسول جوّز بيع الأضحية ودعا له بالبركة ،

١. المجلة : ص - ٢٨ ، المادة : ٣٣ ، انظر أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية ص ١٥٩ ،
٢. المجلة : ص ٢٨٠ ،
٣. أخرجه البخاري بلفظ " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام " صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب قول النبي ﷺ " رب مبلغ أوعى من سامع " ١ : ٢٣ ، (٤) الطحاوي ، اختلاف الفقهاء ص ٢٥٧ ،
٥. انظر : قاضيخان " شرح الزيادات " ٣٥٤ ، والمبسوط ٢ : ١٧٣ ، (٦) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري كتاب البيوع ص ٣٣٢ ومسند أحمد ٤ : ٣٧٦

খত্তে কুফি অনুকরণে প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি'র স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি

إلى ما يتضمنه الحديث ، والقاعدة الناشئة عنه من الأبواب والأحكام ،

أما الأحاديث الأخرى التي تؤصل هذه القاعدة ، بجانب الحديث المشهور الذي ذكرناه

فهي كثيرة جداً ،

منها ما روى البخاري (١) عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : جاء رجل

إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ! ما القتال في سبيل الله ،

فإن أحدنا يقاتل غضباً ، ويقاتل حمية ، فرفع إليه رأسه - قال : وما رفع إليه

رأسه ، إلا أنه كان قائماً - فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل

الله ، (١)

ففي هذا الحديث نرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد إلى

تصحيح النية في الجهاد ، وبيّن أن إعلاء كلمة الله هو الغاية القصوى التي

يطمح إليها عند القتال ، وأن يكون العمل خالصاً عن كل شائبة من الرياء

والسمعة والحمية الجاهلية ،

وقد أشار الحافظ ابن حجر رح إلى هذا المعنى في شرح الحديث المذكور

فقال : "من قاتل (الخ) : هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ، لأنه أجاب

بلفظ جامع لمعنى السؤال مع الزيادة عليه ، وفي الحديث شاهد لحديث "الأعمال بالنيات" (٢)

(١) الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ،

(٢) الحديث رواه الأئمة المشاهير

القاعدة الثانية

"الأمور بمقاصدها" (١)

إن هذه القاعدة من قواعد الهامة في الفقه الإسلامي وقد اهتم بها الفقهاء اهتماما بالغا، فأفاضوا في شرحها والتفريع عليها، لأن تنطوي أكبرا من الأحكام الشرعية يدور حول هذه القاعدة،

والذي توخاه الفقهاء من وضع هذه القاعدة في ضوء الحديث الذي سيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله هو بيان ان تصرفات الإنسان وأعماله تختلف أحكامها ونتائجها باختلاف مقصود الإنسان من تلك التصرفات والأعمال،

الحديث الذي اقتبست منه القاعدة

والأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم - إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، (٢)

رواه الأئمة المشاهير، أما الإمام البخاري فقد ذكره في مواضع متعددة، منها: في باب "ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان، والوضوء والصلاة، والزكاة والحج، والصوم، والأحكام، ففي ترجمة الباب هنا إشارة واضحة

---

(١) المجلة، مادة: ٣، (٢) الحديث رواه الأئمة المشاهير،

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد :

فانطلاقا من حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني يسرني أن أبارك في زفاف النجلين الكريمين للأخ الفاضل التاجر الناجح أبي البشر أبو المحترم وهما عبد الله المسعود وعبد الله المعصوم،

اسأل الله عز وجل لهما ذرية صالحة وأن يوفقهما لما يحبه ويرضاه
وصلى الله على محمد وسلم،

كتبه
ابو الرضاء
١٦/١/٢٠٠٣

البروفيسور الدكتور ابو الرضاء محمد نظام الدين الندوي
عضو البرلمان الوطني، سنجلادش

البروفيسور د. ابو الرضاء محمد نظام الدين الندوي
عضو البرلمان الوطني ووج، شبنا غونج 15
البرلمان الوطني بنغلاديش
وعضو اللجنة البرلمانية الدائمة لوزارة الصناعة

বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব আবুল বশর আবুর ছেলের বিয়েতে
প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি'র স্বহস্তে লিখিত শুভেচ্ছা বাণী

চুনতিতে অধ্যয়নকালীন অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন-এর ক্লাস লেকচার নোটের উর্দু হস্তলিপি

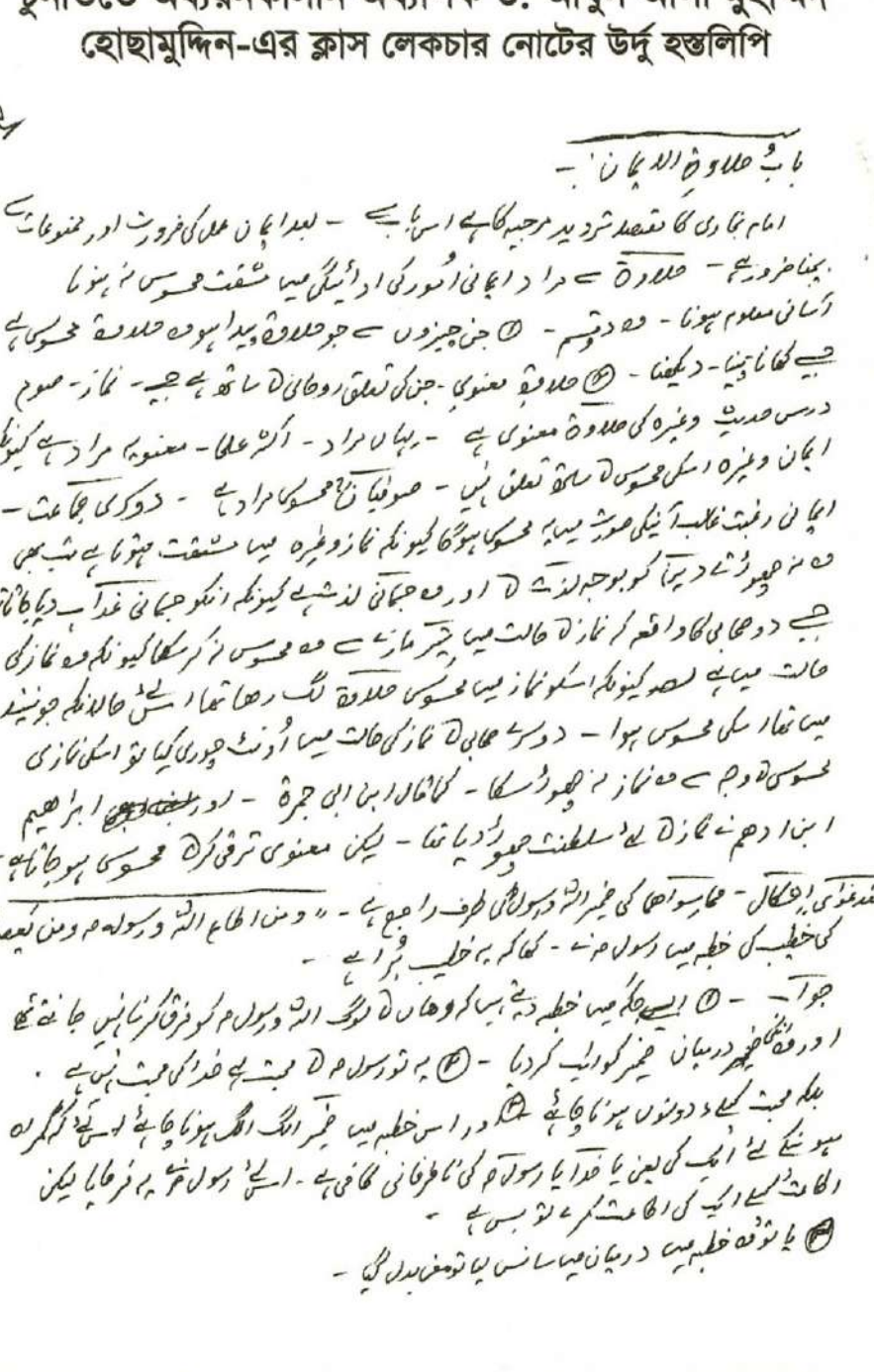

باب حلاوۃ الایمان -

امام بخاری کا مقصد شروع میں مرجیہ کا رد اس باب سے - بعد ایمان عمل کی ضرورت اور ممنوعات سے بچنا ضروری ہے - حلاوۃ سے مراد ایمانی امور کی ادائیگی میں مشقت محسوس نہ ہونا آسان معلوم ہونا - وہ دو قسم - ① جن چیزوں سے جو حلاوۃ پیدا ہو وہ حلاوۃ محسوس ہے جیسے کھانا پینا - دیکھنا - ② حلاوۃ معنوی - جن کی تعلق روحانی کے ساتھ ہے جیسے - نماز - صوم درس حدیث وغیرہ کی حلاوۃ معنوی ہے - یہاں مراد - اکثر علما - معنوی مراد ہے کیونکہ ایمان وغیرہ اسکی محسوس کے ساتھ تعلق نہیں - صوفیا نے محسوس مراد ہے - دوسری جماعت - ایمانی رغبت غالب آنیکی صورت میں یہ محسوس ہوگا کیونکہ نماز وغیرہ میں مشقت ہوتا ہے تب بھی وہ نہ چھوڑنے دینا کو بوجہ لذت کے اور وہ جسمانی لذت ہے کیونکہ انکو جسمانی غذا دیا جاتا تھا جیسے دو صحابی کا واقعہ کہ نماز کے حالت میں چیر مارے - وہ محسوس نہ کر سکا کیونکہ وہ نماز کی حالت میں ہے لیکن کیونکہ اسکو نماز میں محسوس حلاوۃ لگ رہا تھا اسلئے حالانکہ جو نیند میں تھا اسکی محسوس ہوا - دوسرے صحابی کے نماز کی حالت میں اونٹ چوری کیا تو اسکی نمازی محسوس کے وجہ سے وہ نماز نہ چھوڑ سکا - کمال ابن ابی جمرۃ - اور ابراہیم ابن ادھم نے نماز کے لئے سلطنت چھوڑ دیا تھا - لیکن معنوی ترقی کرکے محسوس ہو جاتا ہے -

فقہ فتوی اشکال - محاسوا کی ضمیر اللہ و رسولہ کی طرف راجع ہے - " ومن اطاع اللہ و رسولہ ومن یعصہما " کی خطبہ کی خطبہ میں رسول صلعم نے - کہا کہ یہ خطیب برا ہے -

جواب - ① ایسے جگہ میں خطبہ دیتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اللہ و رسول صلعم کو فرق کرنا نہیں جانتے تھے اور وہ ضمیر درمیان ضمیر کو ایک کر دیا - ② یہ تو رسول صلعم کے محبت ہے خدا کی محبت نہیں ہے . بلکہ محبت کیلئے دونوں ہونا چاہئے اور اس خطبہ میں ضمیر الگ الگ ہونا چاہئے لیکن ہو سکتے ہے ایک کی یعنی یا خدا یا رسول صلعم کی نافرمانی کافی ہے - اسلئے رسول صلعم نے یہ فرمایا لیکن اطاعت کیلئے ایک کی اطاعت کرے تو بس ہے -

③ یا تو وہ خطبہ میں درمیان میں سانس لیا تو معنی بدل گیا -

١٧/

اُن کے بارے اشکال ہوگا کہ وہ نبی کی اولاد نہیں ہو مگر ولی تو ہونا چاہیے لیکن اُن سے منافقین
کی یہ تمام شرطیں علامتیں پائی گئی ہیں - اسی لئے مذکورہ جواب دیا گیا ہے -
اور اس حدیث میں رسول اللہ نے تین علامتوں کو ذکر کیا عمل - نیت - اعتقاد کی خرابی کی طرف اشارہ کیا نہ کہ تینوں میں محدود کیا ہے -

باب قیام لیلۃ القدر من الایمان :- یعنی جھوٹ بولنا اعتقاد کی خرابی اور خلاف عہد کرنا
خرابی عمل اور خیانت نیت کی خرابی ہے -

باب قیام لیلۃ القدر من الایمان :-

لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ میں دو وجہ - (۱) اس رات میں نزول قرآن ہوا (۲) اس رات میں
لوگوں کی رزق کی تقسیم کی جاتی ہے (۳) لیلۃ القدر یہ سال بھر ہو سکتا ہے (۴) یا تو رمضان میں
ہو سکتا ہے (۵) یا تو رمضان کی آخری دس دن میں ہو سکتا ہے (۶) یا تو ہر بے جوڑ رات میں ہو سکتا ہے
(۷) اکیس سترہ ۲۱ رات میں ہونا زیادہ مشہور ہے - یعنی جو چیز جتنی قیمتی ہو وہ اتنی مخفی ہوتی ہے
اس لئے اللہ نے جو زیادہ عبادت کرتا ہے وہ پورا رمضان تلاش کرے گا جو اس کا عمل ہے وہ آخری
دس دن میں تلاش کرے گا اس جو زیادہ کاہل ہے وہ ۲۷ ویں رات میں تلاش کرے گا -
اور اس کی قدر ہونے اور ثواب ملنے کیلئے خلاف عادت عمل یعنی جس کو تہجد کی عادت ہے اس کو اس سے
زیادہ پڑھنا ہوگا -

باب الجہاد من الایمان :- قتال و جہاد میں فرق ہے قتال یہ جہاد کی ایک طریقہ ہے -
جہاد بمعنی مشقت و تکلیف کے اٹھانا ہے یعنی اللہ کی راہ میں جو کوئی مشقت اٹھائے تو وہ جہاد
ہے - امام بخاری رح یہاں جہاد کہکر قتال مراد لیا ہے جو کافروں سے کرنے کے ہیں -
ایمان کے اندر فرض عین نہیں صرف بلکہ فرض کفایہ بھی داخل ہے -
انتداب انتداب سے ہے بمعنی کفیل بنا جانا - ذمہ داری لینا - یعنی بشرنیا لوگوں پر اللہ نے
ثواب جلدی ثواب دینے کیلئے ذمہ لے لیا ہے -

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ :- اکیس دونوں جزء ہے - مگر حکم کے اعتبار سے دونوں ایک ہے
اسی وجہ سے دونوں کو ایک بھی ہو سکتا ہے اور دو بھی - یعنی تصدیق کرے تو دونوں ضروری ہے دونوں
لازم و ملزوم ہے
(P.T.O.) پر مقبول ہیں -

17

ان الشرک لظلم عظیم = ظلم دون ظلم ثابت ہوجاتا ہے کیونکہ شرک کو بڑا گناہ کہا گیا ہے تو اسکے مقابلہ میں دوسرا گناہ ادنیٰ ہے - ظلم = شرک مراد ہونا نکرہ = بھی جو نکرہ تحقیق کیلئے آتا ہے - محققین نے اسکے علاوہ دوسرے قرینہ بھی کہے ہیں ظلم = مراد شرک ہونیکی (ظلم کا محض جو چیز جسمیں رکھنا ہے وہاں نہ رکھنا ظلم ہے) تو قرینہ یہ ہوا کہ لم یلبسوا یعنی جو عقیدہ کے ساتھ خلط ملط ہونیوالی چیز شرک ہے کیونکہ شرک بھی اعمال و عقیدہ قلوب ہے اور ایمان بھی اعمال قلوب ہے -

باب علامۃ المنافق :-

① کافر ظاہرہ باطنہ دونوں اعتبار سے کافر ② مؤمن - ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے مؤمن ③ منافق - ظاہر میں مسلمان باطن میں کافر یہ کافر کی گروہ میں ہوگا اور وہ کافر باطنہ اور جو دونوں اعتبار سے کافر ہے وہ ظاہرہ ہے -

منافق نافق = ہے بمعنی سوراخ چوراہ دروازہ جو ضرورت میں استعمال کرے یعنی بوقت ضرورت کفری کرے گا اور بوقت ضرورت مؤمن کا کام کریگا -

جو عمل کے اندر خلل ڈالے وہ کافر نہیں بلکہ منافق خالص ہے اگر کافر ہوتا تو رسول صلعم کافر فرماتے - اس میں امام بخاری رح کا مقصد پورا ہوتا ہے کہ امر میں خلل ڈالنے سے بھی کافر نہیں ہوتا ہے - اور منافق مؤمن یا منافق رہیگا نہ کہ کافر اسکو صرف نفاق کو دور کرنا ضروری ہے -

اشکال - اس حدیث شارح کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں مسلمان پائے نہ جاتے ہیں - ؟

جواب - نفاق کی دو قسمیں ① نفاق فی العمل ② نفاق فی الاعتقاد - اور فی الاعتقاد وہ کافر ہے اور فی العمل وہ منافق خالص ہوگا اس حدیث میں بھی مراد یہی فی العمل ہے - زمانہ رسالت صلعم کی منافق وہ فی الاعتقاد تھے اور زمانہ ھذا کی منافق فی العمل ہے

③ حضور صلعم بطور تہدید فرمایا ہے ④ حضور صلعم یہ خاص خاص لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے -

⑤ بعض نے کہا - یہ حضور صلعم کے زمانہ کی منافق کے بارے میں کہا ہے نہ کہ اس زمانہ کے لوگ کے بارے میں - ~~خاص کر~~

اشکال - خاص کر کے اگر عام کے بارے یہ وارد ہو تو یوسف ع کے بھائی جو اولاد رسول ہیں

٢٦/

باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وأنبأنا :-

محدثین کا حدثنا - اخبرنا - أنبأنا یہ بدعت ہے یا نہیں؟ معتبر ہے یا نہیں؟ قید کے ساتھ کہا جائیگا یا بلا قید کے ساتھ؟ حدثنا کے جگہ اخبرنا لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ -

جواب - قوت میں انبأنا واخبرنا دونوں برابر - اہل کوفہ - حجاز - بخاری - ابوحنیفہ وغیرہ کے نزدیک - مالک وغیرہ بلا قید کے ساتھ کہہ رہا ہے -

باب طرح الامام المسئلة على أصحابه الخ :-

ابوداود میں - نهى النبي صلعم عن الاغلوطا - اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب علموں سے الٹا پالٹا سوال کرنا جائز نہیں - امام بخاری رح فرماتے ہیں اس طرح کا سوال کرنا اسوقت جائز نہیں جبکہ سائل کا مقصد اچھا نہیں اگر مقصد بھلا ہو تو جائز ہے - جیسے اس ترجمۃ الباب میں حضور صلعم نے صحابہ کرام کے علم کے متعلق جاننے یا ان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا کرنے یا مسلمان کی اوصاف بیان کرنے کے لیے سوال مشکل کیا ہے وہ جائز ہے - اسمیں اہم سوال یہ ہے کہ کھجور کا سیدھا ہونا یہ ظاہری اعتبار سے اور مسلمان کے تشبیہ دینا باطنی سیدھا کا تشبیہ ہے وجہ شبہ - مسلمان کی زندگی نیک عمل سزاوار رضا ہے - (۲) کھجور کی درخت میں نفع ہی نفع ہے اور عرب کے کھجور کی درخت میں کانٹا نہیں ہے یہ ان کی اہم خصوصیت ہے - اور وہ کھجور کچا بھی لذیذ ہے بخلاف ہمارے دیس کے کھجور کی - اسیطرح مسلمان کی زندگی بھی دوسری مسلمان کیلئے نفع ہی نفع ہے جیسے کھجور کے پتہ سے وہ گھر چاتے ہیں اور درخت کو کھانا اور جڑ سے برتن وغیرہ بنایا جاتا ہے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ ہے مسلمان کی طرح ہے -

بعض کہا کہ مسلمان جیسے مرنے کے بعد بھی دوسرے کیلئے فائدہ ہے کھجور بھی اسیطرح آگے کی تشبیہ عدم ضرر کی ہے اور اسمیں فائدہ کی ہے جیسے وہ مرنے سے دوسرے مسلمان زیارت کو جائے تو وہ بھی ثواب ہوتا ہے - (۳) یا تو مستقیم الایمان کی تشبیہ ہے

(P.T.O.)

مولانا محمدفضل‌الله فضل

محمد فضل‌الله در سال ۱۳۱۶ هـ.ق. (۱۸۹۸) در قریهٔ بابونگر / Babunagar بخشداری ساتکانیه / Satkania در جنوب چیتاگنگ چشم به‌جهان گشود. پدرش مولانا نوراحمدی عالمی بزرگ و صالح بود. وی در سال ۱۹۱۹م از مدرسهٔ محسنیه مدرک درجهٔ فاضل (فوق‌دیپلم) دریافت کرد. سپس به‌اتراپردش هند رفته مراحل عالی در فقه و حدیث و تفسیر و فلسفه و منطق را در مدرسهٔ مظاهرالعلوم گذراند. مولانا فضل‌الله تا سال ۱۳۲۱ مدرس مدرسهٔ عالی کلکته بود. بعد از برگشت به‌کشور خود منصب ناظم اعلی را در مدرسهٔ حکیمیهٔ چنوتی برعهده گرفت و تا آخر عمر بر این سمت بود. وی کتابهایی به‌زبان بنگالی برجای گذاشته است. او به‌سه زبان عربی، اردو و فارسی مسلط بود و شعر می‌سرود. تخلص او «فضل» بود. اینجانب افتخار دارم که یکی از شاگردان آن عالم عالی مقام و استاد پدرگونه بوده‌ام. استاد بزرگوار در ۱۳۵۸ دیده بر جهان فانی فروبست و در تپهٔ روبه‌روی مدرسهٔ حکیمیهٔ چنوتی در کنار مدرسهٔ (حوزه) دخترانهٔ فاطمهٔ بتول مدفون گردید. موضوع اشعار او بیشتر نعت و حمد است. نمونه‌ای از آنها نقل می‌شود:

همچو سیمابم، سکون قلب گم کرده منم
سوخته اندوهگین وبس که آشفته سرم

ای امید عاصیان و راحت آشفتگان
روز وشب درخواب‌وبیداری خیالت همدمم

یافتم باری دُرّت صد حیف در چشمم زدن
صحبتت آخر شد و من زان فغانها می‌کنم

বাংলাদেশস্থ ইরানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কর্তৃক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে সংকলিত আল্লামার জীবনীর অংশ

দৈনিক

ইত্তেফাক

মৌলানা ফজলুল্লাহ (রঃ) এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী

আগামীকাল প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাতকানিয়া থানার চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান পরিচালক (নাজিম) হজরত মৌলানা মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রঃ) এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হবে।

এ উপলক্ষে চুনতি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মরহুমের জীবনের উপর এক সেমিনারের আয়োজন করেছেন এছাড়া ঐ দিন সকালে তাঁর বাবুনগরস্থ বাসভবনে এক কোরানখানি অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য যে মরহুম মৌলানা ফজলুল্লাহ ইসলামী গ্রন্থ রচয়িতা হিসাবে ... বাংলা ভাষায় ... অনুবাদ প্রভৃতি ... যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। ১৯২০ সালে ভারতের সাহারান পুর মাদ্রাসা হতে টাইটেল ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯২৩ হতে ১৯৪২ পর্যন্ত কলকাতা বাঙ্গালা সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত তিনি সাতকানিয়া থানার চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসার প্রধান পরিচালকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

Obituary

CHITTAGONG, March ... Maulana Muhammad Fazlullah, Chief Nazim of Chunati Hakimia Senior Madrasah under Sarkania thana died on Sunday morning reports BSS.

Maulana Fazlullah (R) has been suffering from old age diseases for long time. He left behind his widow, six sons, four daughters and a large number of relatives and admirers. He was laid to rest in a graveyard near the madrasah on Monday afternoon.

Maulana Fazlullah a scholar wrote a number of books which include 'Islam in the eyes of science' and Arabic grammar. He also translated into Bengali a number of books on Hadith.

He took his Title degree from Saharanpur Madrasah of India in 1920 and has been the Superintendent of Calcutta Aliya Madrasah from 1925 to 42. He had been the Chief Nazim of Chunati Hakimia Madrasah since 1948.

দৈনিক জনমত

৪ঠা মার্চ মওলানা ফজলুল্লাহ (রঃ) এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী

(বার্তা পরিবেশক)

আগামী ৪ঠা মার্চ প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ও সাতকানিয়া থানার চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান পরিচালক (নাজিম) মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহঃ) এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হবে।

এই উপলক্ষে চুনতি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মরহুমের জীবনের উপর ... ইসলামী ... বাংলাদেশ ... ১৯২২ পর্যন্ত কলকাতা সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। ... থানার মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক (নাজিম) ছিলেন।

দৈনিক জনমত

মৌলানা ফজলুল্লাহ (রঃ) এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী

আগামীকাল প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাতকানিয়া থানার চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান পরিচালক (নাজিম) হজরত মৌলানা ... (রঃ) এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হবে। এই উপলক্ষে চুনতি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মরহুমের জীবনের উপর এক সেমিনারের আয়োজন করেছেন। এছাড়া সকালে তাঁর বাবুনগরস্থ বাসভবনে এক কোরানখানি অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য যে মরহুম মওলানা ... ইসলামী ... গ্রন্থ রচয়িতা হিসাবে ... বাংলা ভাষায় ... অনুবাদ প্রভৃতি ... যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। ১৯২০ সালে ভারতের সাহারানপুর মাদ্রাসা হতে টাইটেল ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯২৩ হতে ১৯৪২ পর্যন্ত কলকাতা বাঙ্গালা সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত তিনি সাতকানিয়া থানার চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসার প্রধান পরিচালকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম দৈনিক পূর্বকোণ

আজ মওলানা ফজলুল্লাহ (রঃ) এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী

(সংবাদ দাতা)

আজ ৪ঠা মার্চ প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ও সাতকানিয়া থানার চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান পরিচালক (নাজিম) মওলানা মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রঃ) এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হবে।

এই উপলক্ষে চুনতি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মরহুমের ...

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর মৃত্যু বার্ষিকীর ওপর বিভিন্ন পত্রিকার সংবাদ

٧٨٦ — ١٩٢٩

محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم - کی غرض ومفاد

(১) নবী (সঃ) কেমন, তাহার শান বর্ণনা।

(২) সীরত কি ?

(৩) সীরতের মহফিল কেন ?

الجواب الاول

(الف) کنت کنزاً مخفیا ۱ اثر نور احمد ست — کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف

اول ۱ و اولی ۲ بعرفان نیز دانش گشته ست

বাক্য فاحببت ان اعرف এর সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য তিনি হলেন

(ب) جستجو ۳ با شوق و عظمت اولین از نور اوست — فعلا وسجد

باز اظهار ۴ عبودیت (عبودیت) ہم ہویدا از وی ست

(ج) باز ۵ شکر نعمت منعم ازو گشته عیان — فقال الحمد لله

نیز ذکر ۶ اسم ذات رب ازو گشته بیان

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

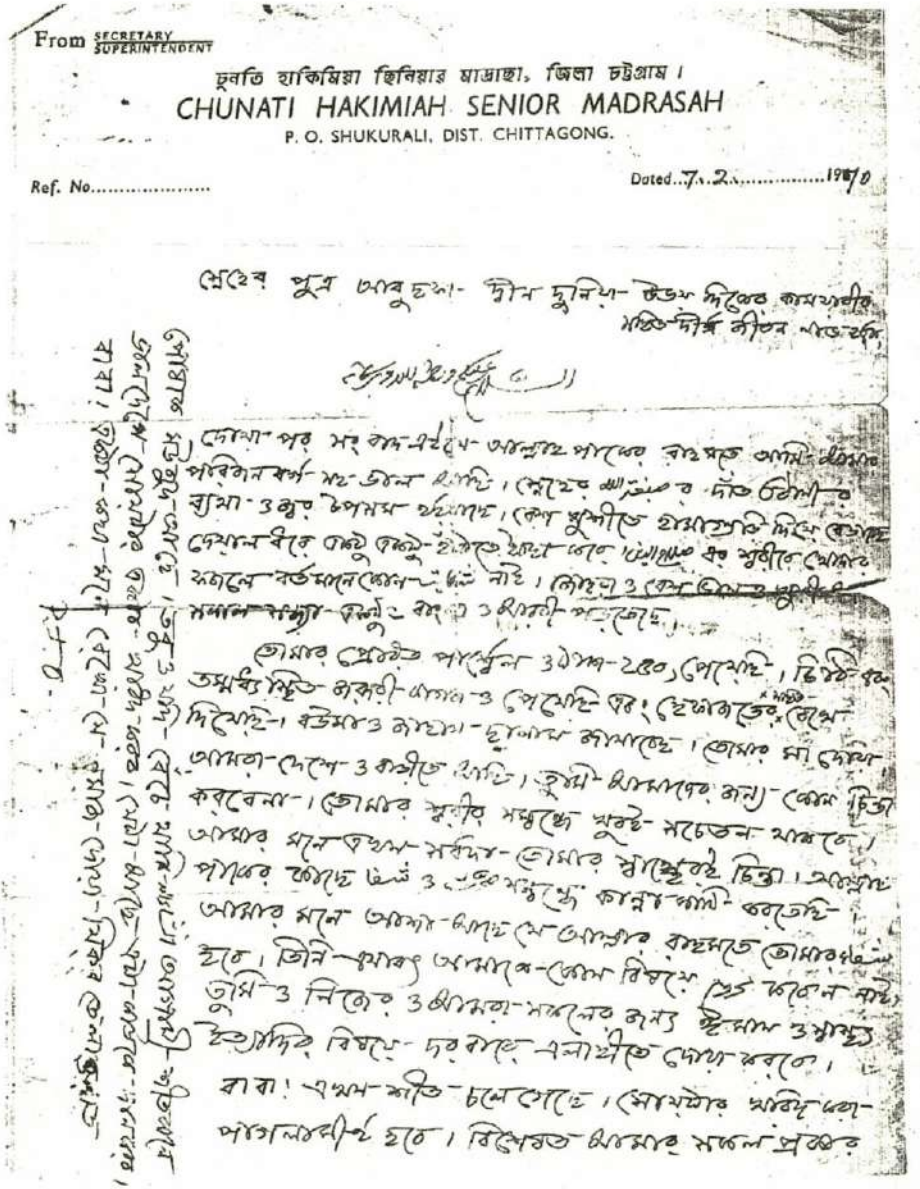

From SECRETARY SUPERINTENDENT

চুনতি হাকিমিয়া ছিনিয়ার মাদ্রাছা, জিলা চট্টগ্রাম।

CHUNATI HAKIMIAH SENIOR MADRASAH

P. O. SHUKURALI, DIST. CHITTAGONG.

Ref. No.....

Dated..7..2.....1970

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক তাঁর স্নেহের পুত্র আবু ছফাকে লেখা চিঠি

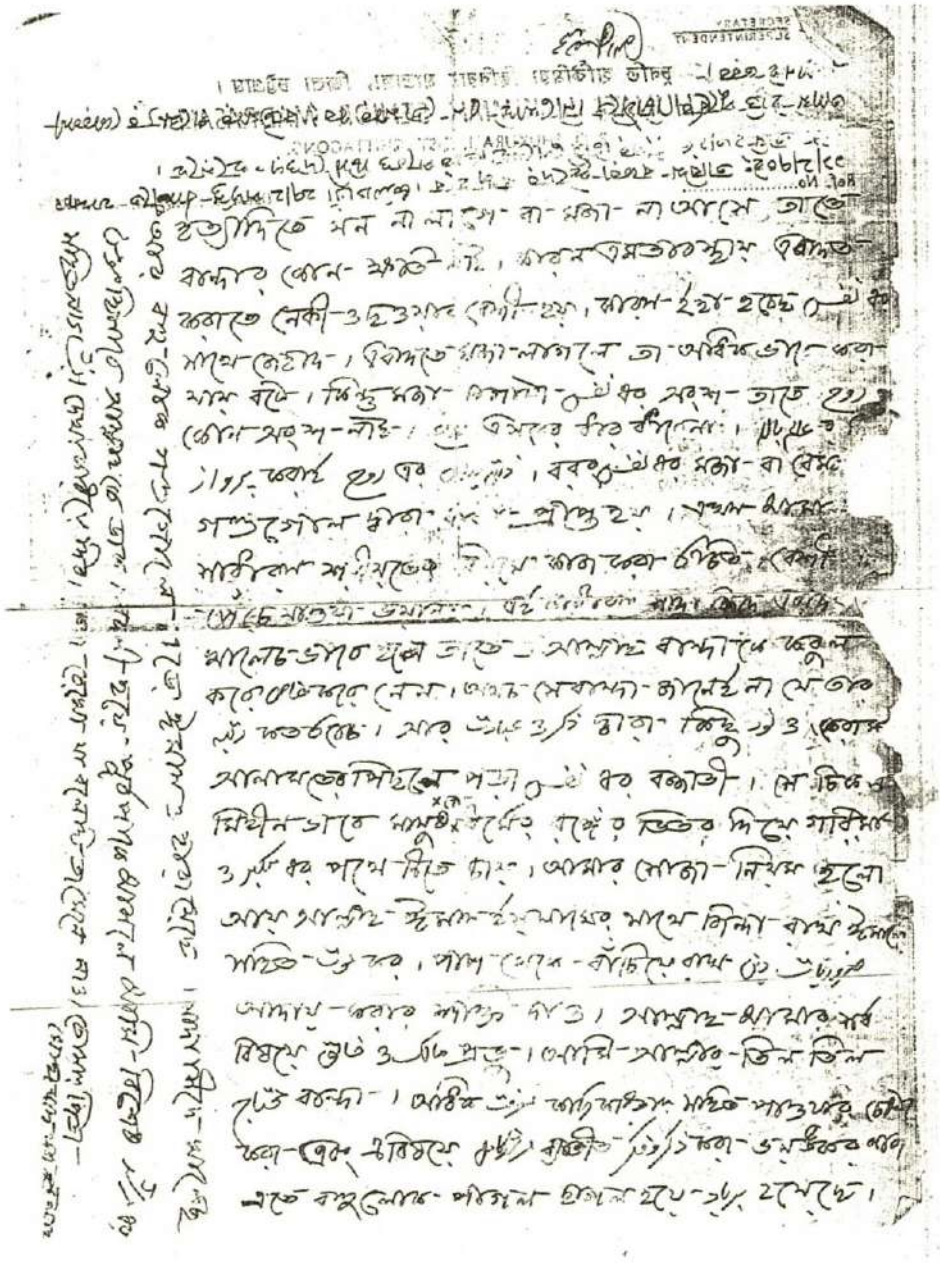

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক তাঁর স্নেহের পুত্র আবু ছফাকে লেখা চিঠি

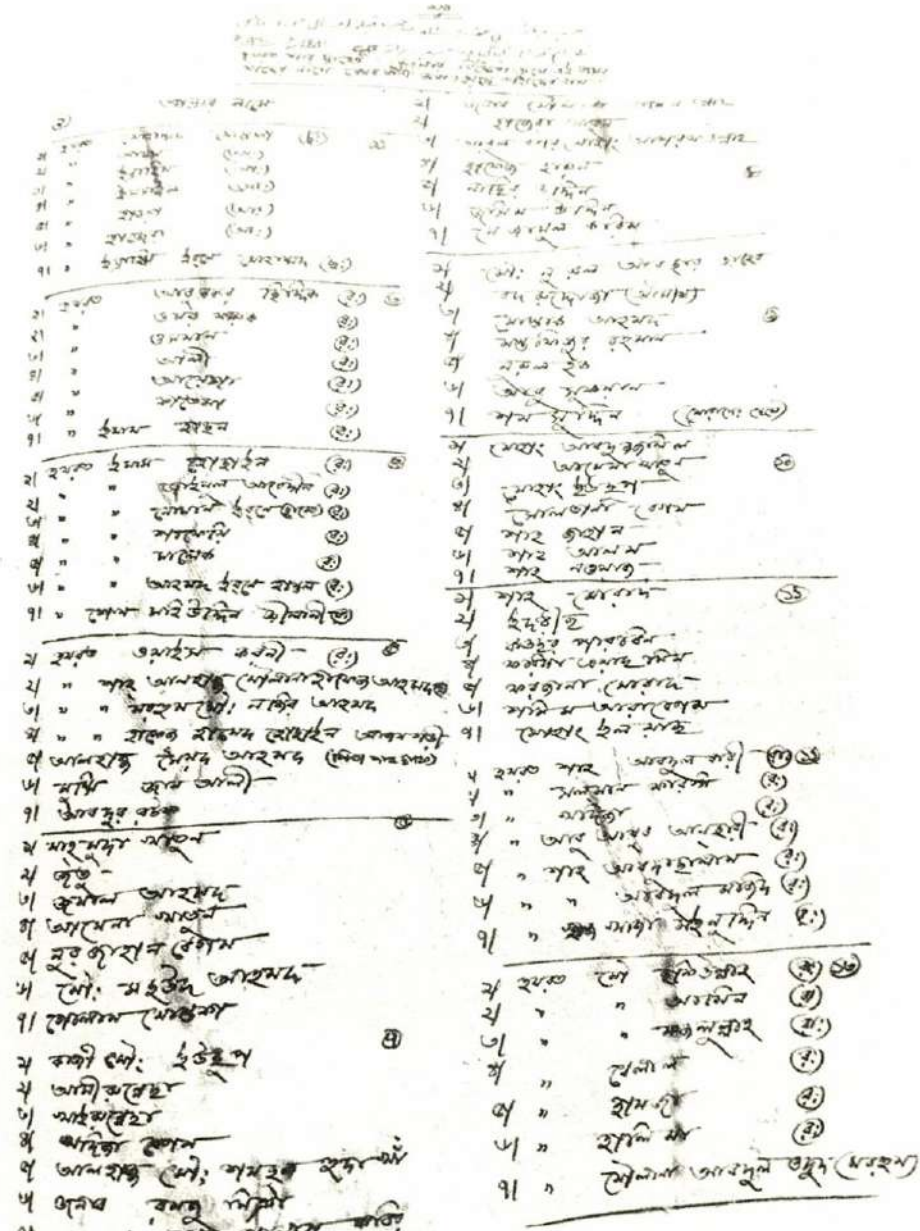

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর ইন্তেকালের পরও শাহ সাহেব রহ. যতদিন জীবিত ছিলেন আল্লামার নামে কুরবানি দিতেন। উপর্যুক্ত তালিকায় তা দৃশ্যমান।

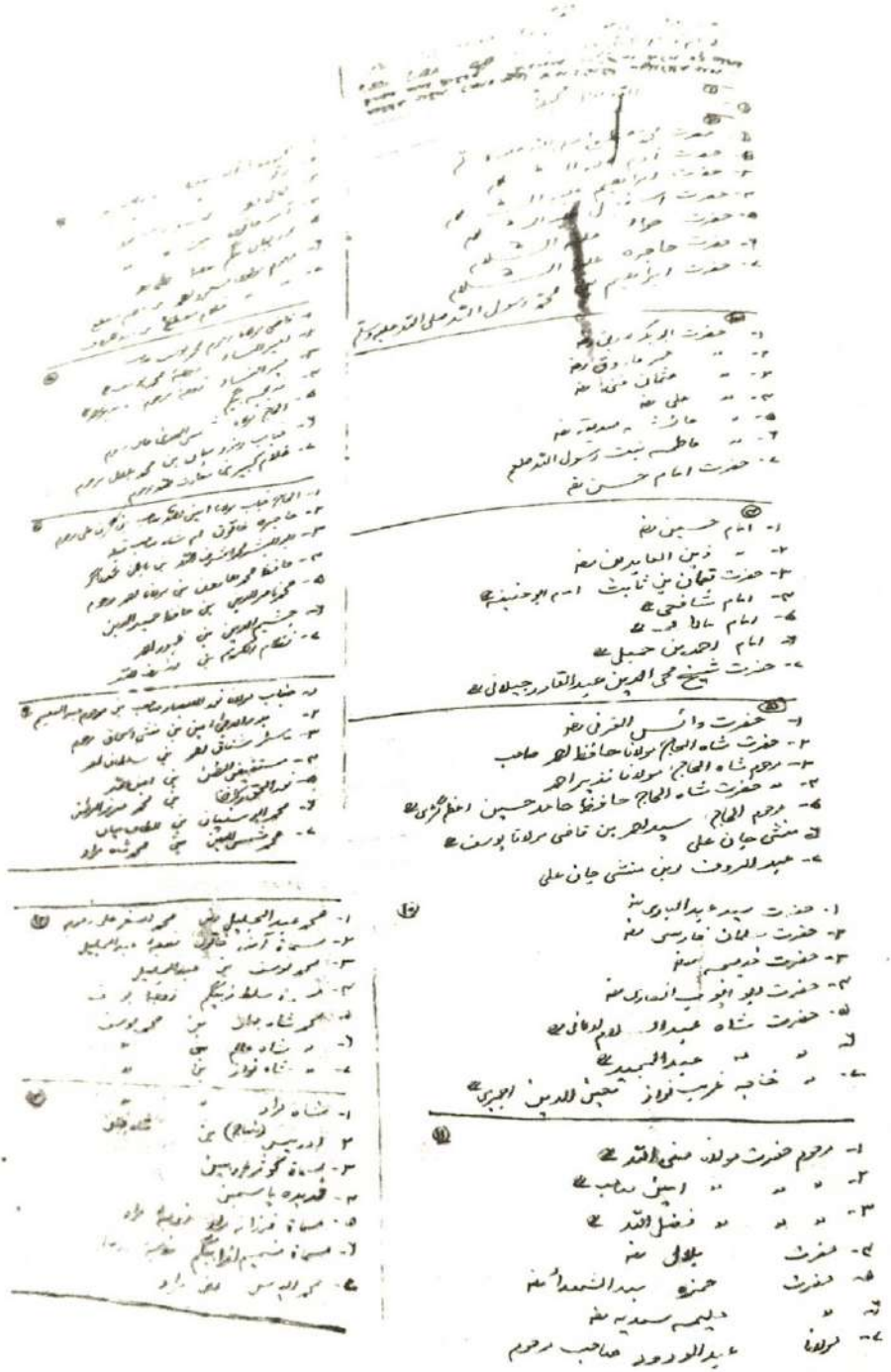

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর ইন্তেকালের পরও শাহ সাহেব রহ. যতদিন জীবিত ছিলেন আল্লামার নামে কুরবানি দিতেন। উপর্যুক্ত তালিকায় তা দৃশ্যমান।

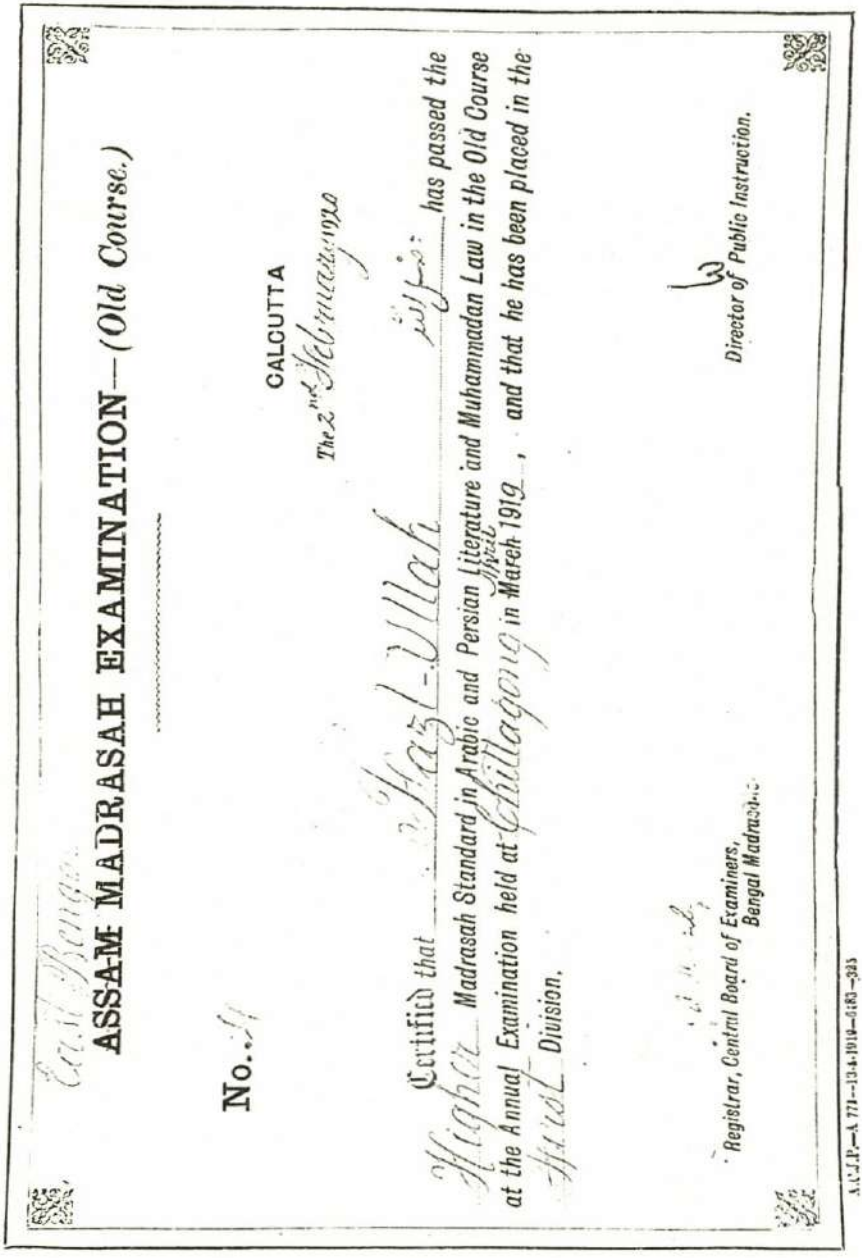

Calcutta Madrasah Form No. 46B.

ASSAM MADRASAH EXAMINATION—(Old Course.)

No. 4

CALCUTTA

The 2nd February 1920

Certified that Fazl-Ullah has passed the Arabic Madrasah Standard in Arabic and Persian Literature and Muhammadan Law in the Old Course at the Annual Examination held at Chittagong in March 1919, and that he has been placed in the Aula Division.

Registrar, Central Board of Examiners, Bengal Madrasahs.

Director of Public Instruction.

A.C.J.P.—A 771—13-4-1919—6183—343

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর শিক্ষাসনদ

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর শিক্ষাসনদ

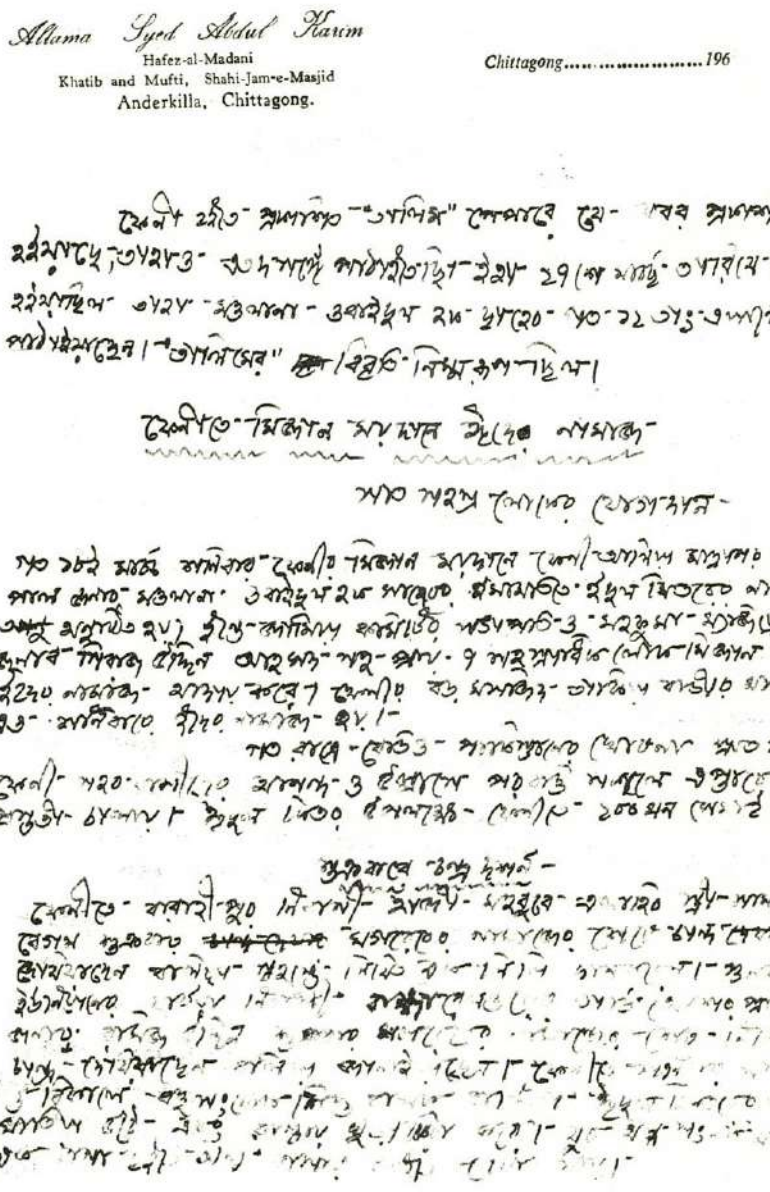

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর কাছে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের তৎকালীন খতিব মাওলানা সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানী রহ. এর লিখিত চিঠি

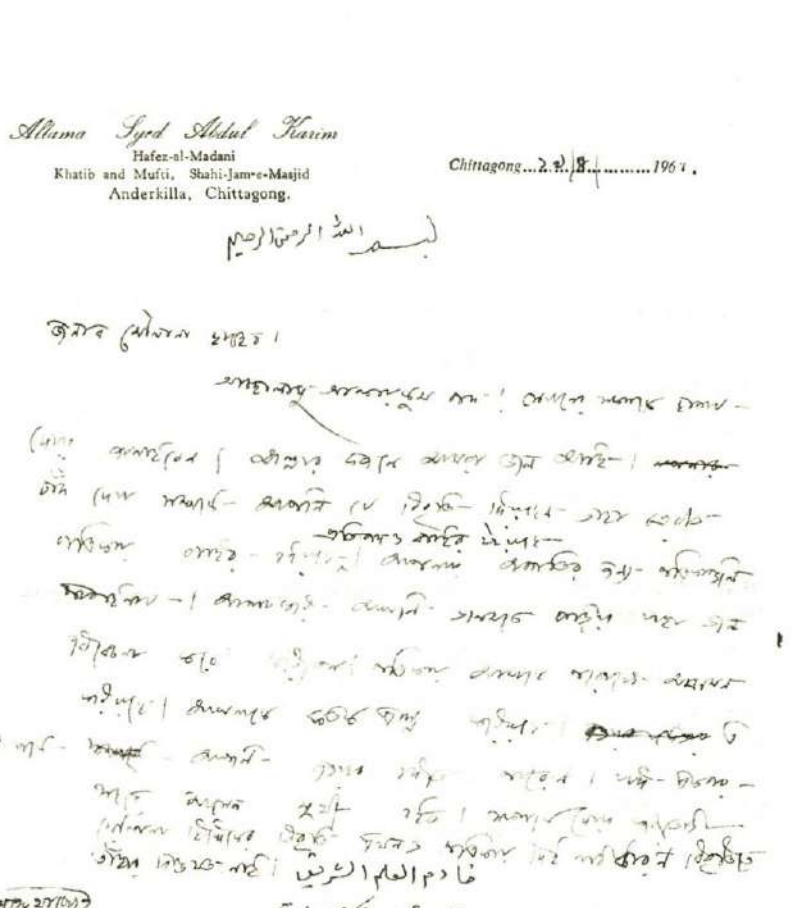
Allama Syed Abdul Karim
Hafez-al-Madani
Khatib and Mufti, Shahi-Jame-Masjid
Anderkilla, Chittagong.

Chittagong...2.2.8.....1961.

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর কাছে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের তৎকালীন খতিব মাওলানা সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানী রহ. এর লিখিত চিঠি

Allama Syed Abdul Karim
Hafez-al-Madani
Khatib and Mufti, Shahi-Jam-e-Masjid
Anderkilla, Chittagong.

Chittagong...[illegible]...1961.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حبیب لبیب حرمین مکرمین و معزز الحج مولانا افضل اللہ صاحب دام اللہ لطفہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سلام بعد گذارش یہ ہے کہ مدت طویل گذر رہا ہے آپکے نام والا سے
ناواقف ہوں امید قوی ہے کہ آپ بعافیت اہل و عیال بخیر و عافیت ہوں گے
اب لوگوں کے دعا سے بحمد اللہ خیریت سے ہوں دربار اقدس میں ہمارے لئے
دعا کریں۔ عبد الرحمن کے ساتھ ایک دن چٹگام آئے تھے [illegible]
آپکے بال بچوں اور اہل و عیال کے لئے میرا سلام و بعد دعا اور وہاں کے
تمام احباب و معتقدین کو لیکن ہمارے سلام و دعا کے زیادہ کیا و سلام فقط

خادم العلم الشریف فی المسجد النبوی
مبلغ الشریع المحمدی — السید عبد الکریم
حافظ المدنی

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর কাছে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের তৎকালীন খতিব মাওলানা সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানী রহ. এর লিখিত চিঠি

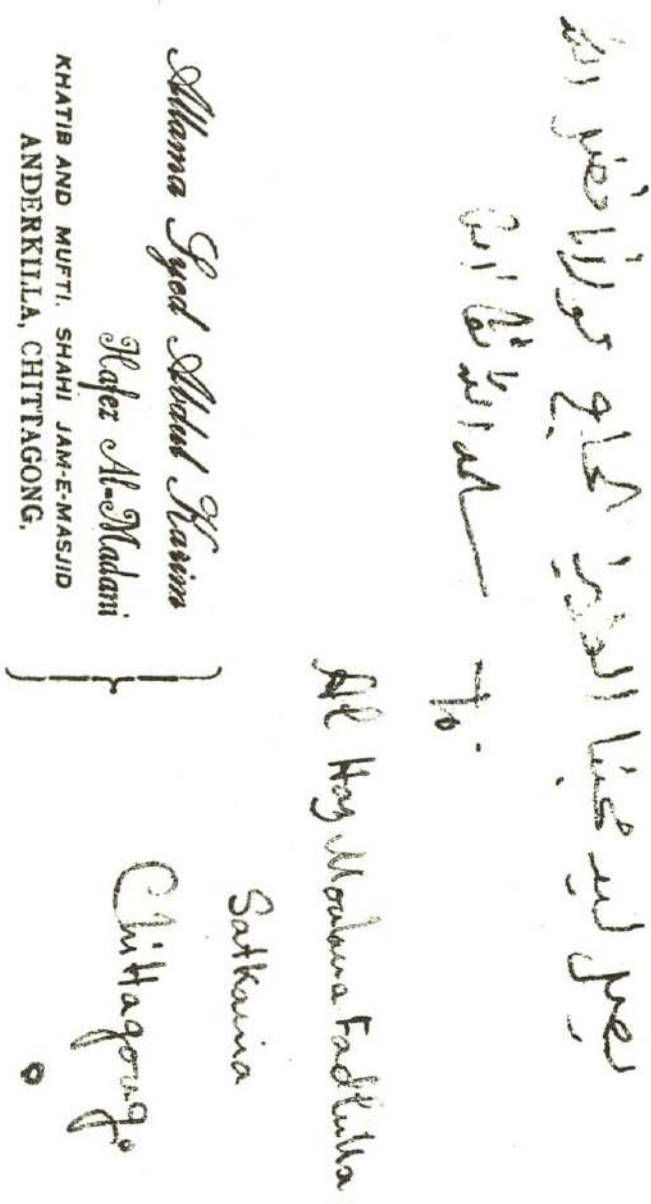

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর কাছে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের তৎকালীন খতিব মাওলানা সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানী রহ. এর লিখিত চিঠি

و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا ۔

انجمن طلباء سابقین چنوتی حکیمیه سینیر مدرسه چاٹگام کا

تاریخی اجتماع

زیر صدارت—استاذنا المحترم جناب مولینا **محمد فضل الله** صاحب مد ظله العالی
سابق سپرنٹنڈنٹ مدرسه هذا

تاریخ—۲۰ جنوری سنه ۱۹۶۳ع مطابق ۲۳ شعبان المعظم سنه ۱۳۸۲ھ
بروز یکشنبه بوقت ۱۱ بجے

جناب عالی ! السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

گذشته ماه اکتوبر سنه ۱۹۶۲ع کی ایک مبارک گھڑی میں مدرسه حکیمیه کے چند فارغ شده طلبه کا ایک جلسه منعقد هوا تھا جس میں مذهبی درسگاهوں کے بارے عموماً اور چنوتی حکیمیه سینیر مدرسه کے عروج و ترقی کے متعلق خصوصاً تبادله خیالات کیا گیا ۔ بالاخر اس نتیجے پر پہنچے که هم سب باہمدگر گلزار حکیمی اپنے قدیمی آشیانه میں جمع هوکر اپنے اپنے صحیح خیالات اور تجربے کا جائزه لیکر همارے مقاصد کو کامیاب بنانیکا تهیه کر لیں ۔ بنا بریں آپ سے خاص طور پر شرکت کی التجا هے ۔

نیازمند

محمد بدر الکمال سکریٹری

انجمن طلباء سابقین چنوتی حکیمیه سینیر مدرسه، ضلع چاٹگام ۔

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর কাছে আনজুমানে তোলাবায়ে সাবেকীন'র পক্ষ থেকে লিখিত চিঠি

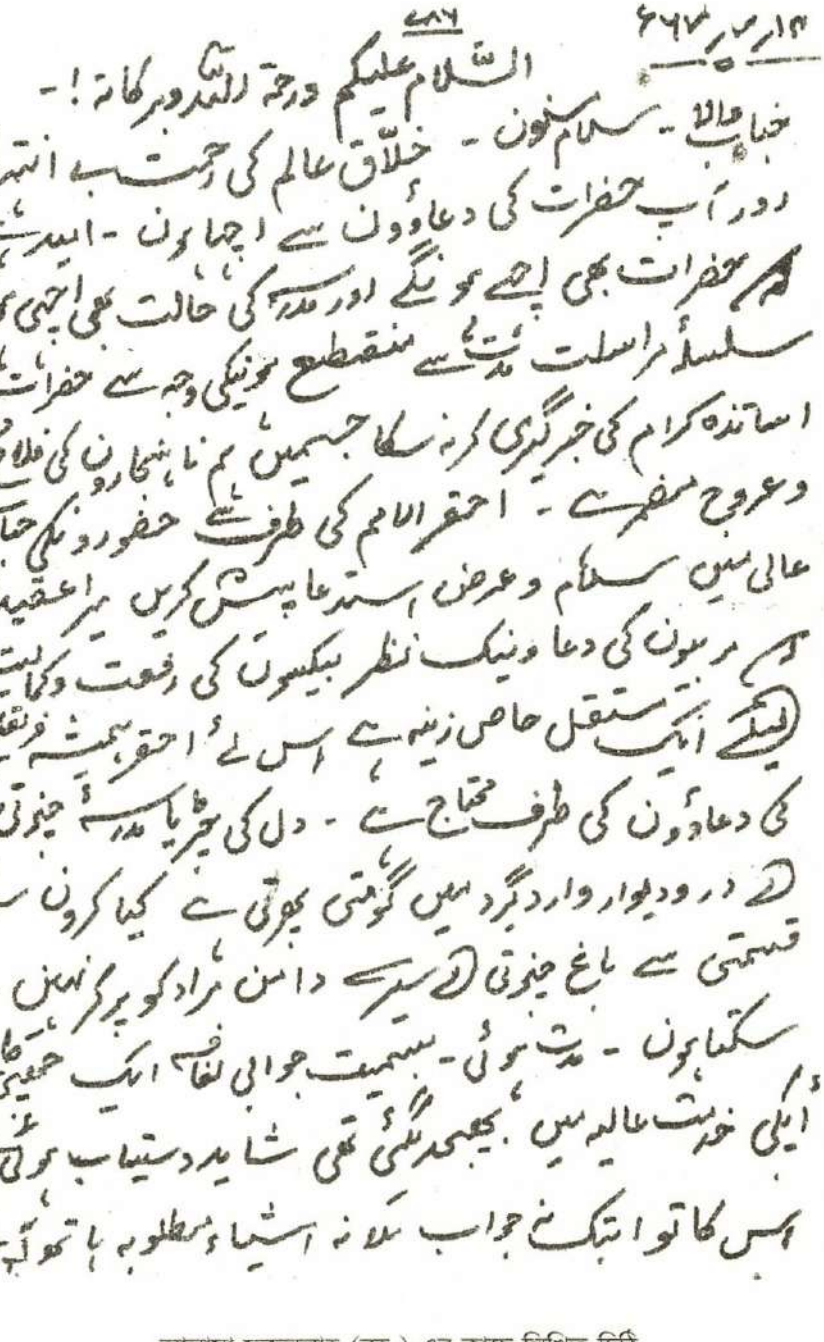

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর কাছে লিখিত চিঠি

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর কাছে লিখিত চিঠি

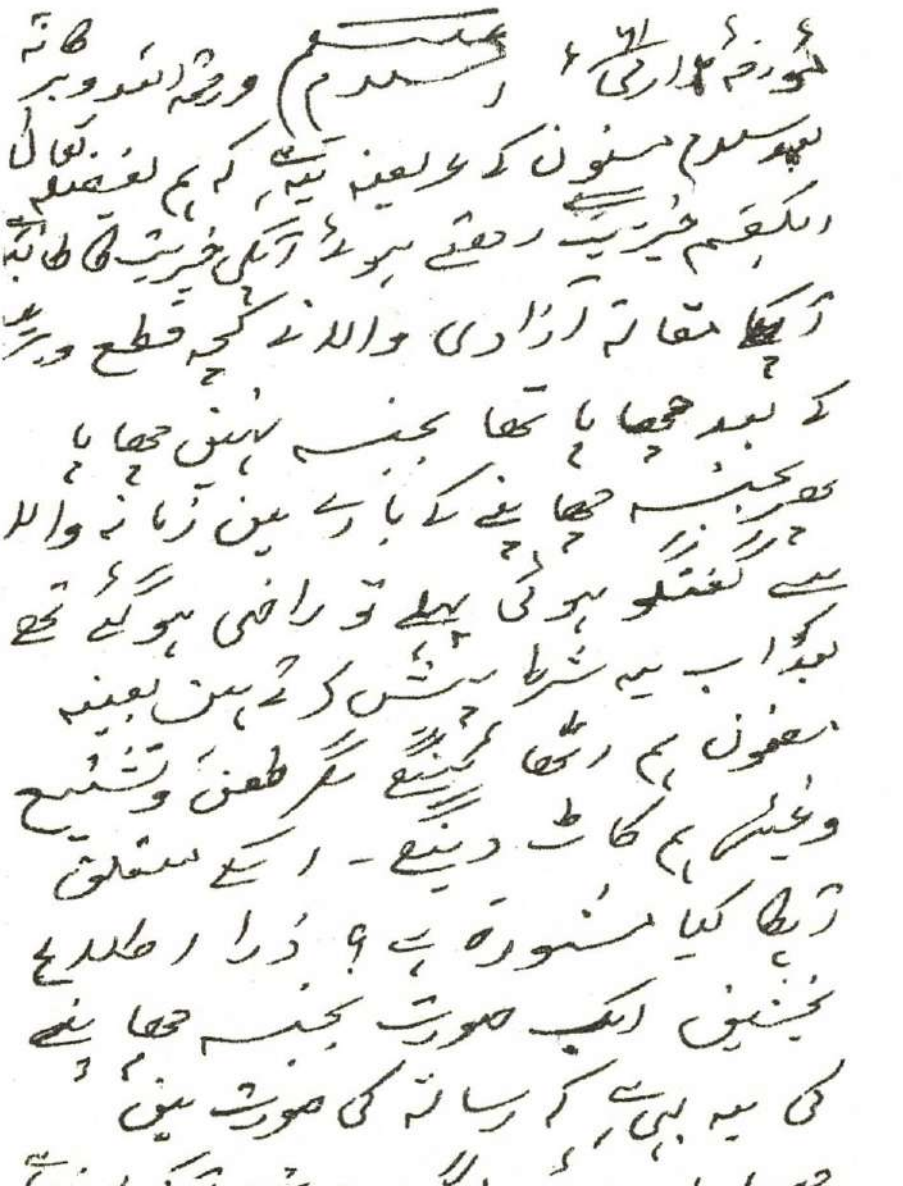

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর কাছে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের তৎকালীন খতিব মাওলানা সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানী রহ. এর লিখিত চিঠি

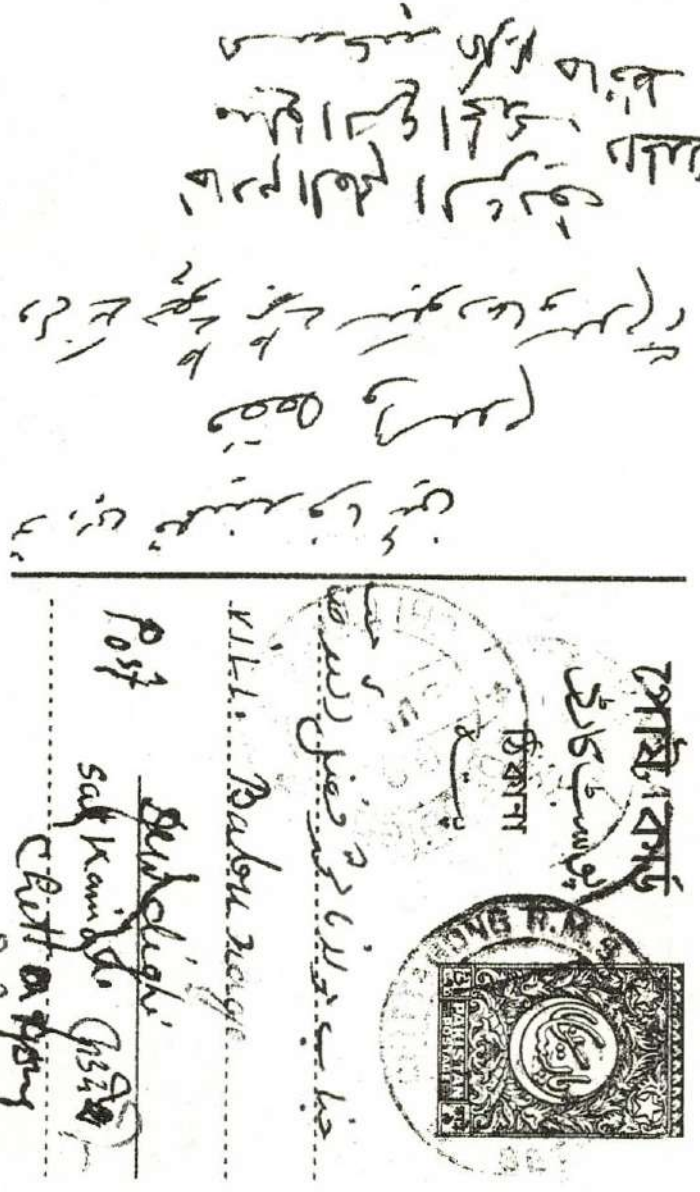

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর কাছে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের তৎকালীন খতিব মাওলানা সাইয়িদ আবদুল করিম মাদানী রহ. এর লিখিত চিঠি

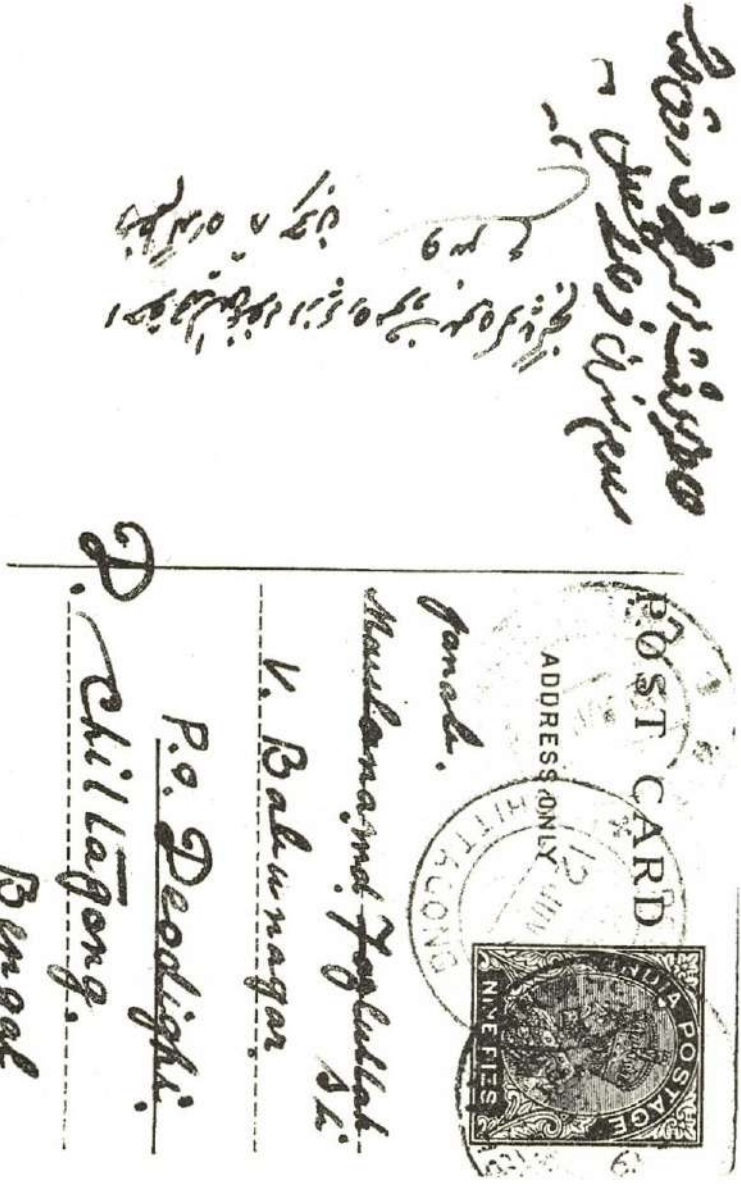

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) কাছে আকড়া মাদরাসার হেড মাওলানা ইয়াসিন আযমগড়ির লিখিত চিঠি

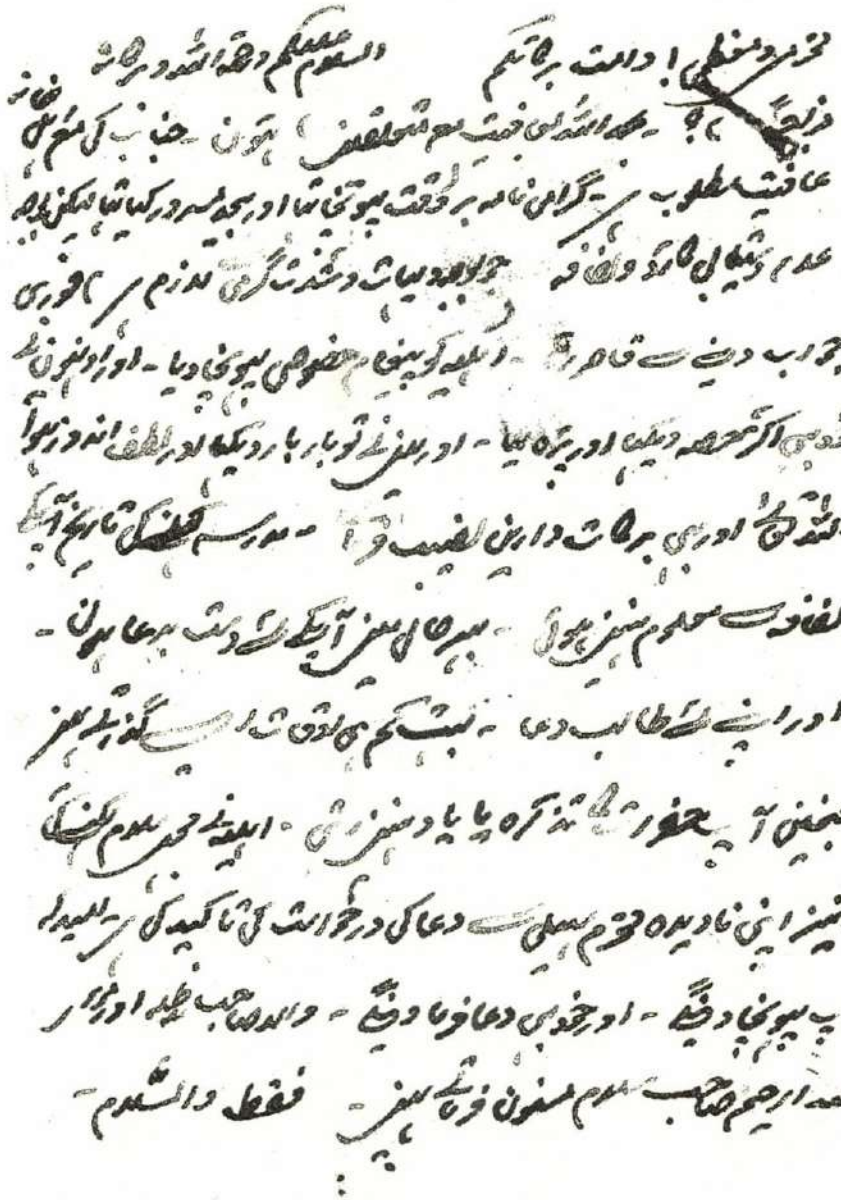

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) কাছে আকড়া মাদরাসার হেড মাওলানা ইয়াসিন আযমগড়ির লিখিত চিঠি

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورہ مائدہ - یہ سورہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی - مگر اسکی ایک آیت شریف
الیوم اکملت لکم دینکم الآیۃ - حجۃ الوداع کے دن عرفات کے میدان میں نازل ہوئی ہے
حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں اس سورہ پاک کو پڑھا اور فرمایا " ای لوگو،
سورہ مائدہ قرآن مجید کی آخری سورہ ہے - اسمیں جو حلال ہے اسکو حلال سمجھو
اور اسمیں جو حرام ہے اوسکو حرام سمجھو - قرآن پاک کی اور سورتوں کی تو وہی بات
ہے پھر اس سورہ کی تخصیص کا کیا معنی - زیادت اعتنا کیلئے تخصیص کیگئی
کقولہ تعالے ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السموات والارض
منہا اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم - ان چار مہینوں میں ظلم کرنے
کیلئے تاکید کیگئی ہے گرچہ برس کے سب مہینوں میں ظلم جائز نہیں ہے -
دوسرا جواب یہ ہے چونکہ اس سورہ پاک میں اٹھارہ چیزوں کا حکم ہے جو قرآن میں
اور سورتوں میں نہیں ہے اسلئے اسکی تخصیص کیگئی ہے - وہ اٹھارہ چیزیں یہی ہیں
قولہ تعالے - والمنخنقۃ - والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم
وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام وما علمتم من الجوارح مکلبین
وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب وتمام الطہور
فی قولہ اذا قمتم الی الصلوۃ فاغسلوا وجوھکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤسکم
وارجلکم الی الکعبین وان السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما ولا تقتلوا الصید
وانتم حرم - وما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام - وقولہ شہادۃ
بینکم اذا حضر احدکم الموت -
منخنقۃ - گلا گھونٹ کر مارا ہوا - موقوذۃ - چوٹ لگا کر مارا ہوا - متردیۃ - بلندی سے
گر کر مرجائے - نطیحۃ - وہ جو کسی جانور کا سینگ مارنے سے مرجائے - وما اکل السبع -
وہ جسے درندہ پھاڑ کھائے - ما ذبح علی النصب - وہ جانور جو کسی تھان پر (چوکھٹ)
ذبح کیا جائے - جسے بت پرست لوگ کرتے ہیں - وان تستقسموا بالازلام - جو جانور کا گوشت
بطور جوئے کے تیروں کے پاسوں سے آپس میں تقسیم کیا جاتی ہے

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

قوله تعالى واذا حييتم بتحية الآية - كانت العرب تقول "حياك الله" فلما
جاء الاسلام بدل ذلك بالسلام - وانما اختير لفظ السلام على لفظ حياك
الله لانه اعم واحسن واكمل لان معنى السلام السلامة من الآفات فاذا دعا
الانسان بطول حياة بغير سلامة كانت حياته مذمومة منغصة - واذا كان
في حياته سليما كان اتم واكمل فلهذا السبب اختير لفظ السلام -
قوله تعالى على كل شيء حسيبا - والمعنى انه تعالى على كل شيء من رد السلام بمثله
او باحسن منه مجاز -

(فصل في فضل السلام) [illegible] عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رجلا
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم "اي الاسلام خير؟" قال تطعم الطعام وتقرأ السلام
على من عرفت ومن لم تعرف - قوله اي الاسلام خير معناه اي خصال الاسلام خير
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا تدخلوا الجنة
حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا - اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم
افشوا السلام بينكم - عن عبد الرحمن بن غنم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول - ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام
وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام - اخرجه الترمذي وقال حديث
صحيح - وعن ابي امامة - قال امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نفشي السلام اخرجه ابن ماجه

وعن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يسلم الراكب على الماشي - والماشي على القاعد
والقليل على الكثير - وفي رواية البخاري قال يسلم الصغير على الكبير - والمار على القاعد
والقليل على الكثير - واذا التقى رجلان فالمبتدئ بالسلام هو الافضل لما روى
عن ابي امامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بالله عز وجل
من بدأهم بالسلام اخرجه ابو داؤد والترمذي - ويستحب ان يبدأ بالسلام قبل الكلام
والحاجة - والسنة - اذا مر بجماعة صبيان صغار ان يسلم عليهم لما روي عن انس
انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله - اخرجه

قولہ تعالیٰ فلیقاتل فی سبیل اللہ الآیہ ۔ یعنی جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی (اللہ کا ہاتھ)
فروخت کر چکے ہیں، انھیں چاہئے کہ (ایسے لوگوں سے) اختیار نہ کریں، اور (اللہ کی راہ میں جنگ
ف بیان تیسرے آیت بھی واضح کر دی کہ قرآن نے جنگ کا حکم اسلئے نہیں دیا ہے
کہ مسلمان دوسروں پر چڑھ دوڑیں ۔ بلکہ اسلئے کہ مظلوموں اور بیکسوں کی حمایت کریں
اور انھیں ظالموں کے پنجے سے نجات دلائیں ۔ آیۃ عربی "وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ"
کی لئے دو بار بار کہتا ہے "اللہ کی راہ میں لڑو" یعنی اپنی نفس کی خواہشوں کیلئے نہیں
بلکہ اللہ کے عدل و انصاف کے قیام کیلئے لڑو۔

قولہ تعالیٰ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم الآیہ
"جنگ و خونریزی سے ہاتھ روک لو" یعنی لوگ قتل و خونریزی کے عادی تھے ۔ اسلام نے اس
روکا اور اعمال حسنہ کی تلقین کی ۔ اب جب حق و عدالت کی راہ میں جنگ کا حکم دیا گیا
تو منافق اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہیں جنگ سے جی چرانے لگے اور آرزو کرنے لگے کہ کاش
یہ حکم نہ دیا جاتا ۔ قرآن کہتا ہے، ان کی حالت پر غور کرو ۔ انھیں حکم دفاع کی راہ میں تو جنگ
سے انکار نہ تھا بلکہ اسلئے کہ اب حق و عدالت کی راہ میں جنگ کا حکم دیا گیا ہے تو وہ
جی چرا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے خوف سے ایسے کانپ رہے ہیں جیسے کوئی خدا کا ڈر سے کانپے
بلکہ اس سے بھی زیادہ!

قل متاع الدنیا قلیل الآیہ ۔ (اے پیغمبر) تم ان لوگوں سے کہہ دو ۔ جس دنیا کی محبت میں تم موت
سے بھاگتے ہو، اس دنیا کا سرمایہ تو بہت ہی قلیل ہے اور جو کوئی (ان باتوں کی حکم) اللہ سے ڈرے
تو اسکے لئے آخرت کا سرمایہ) بہتر ہے ۔ اور تم پر ذرا برابر بھی کسی کی حق تلفی نہ ہوگی ۔
تم جہاں بھی ہو، موت تمہارا ٹھکانا پا کر رہیگی ۔ اگر تم بلند اور مضبوط محلوں کے اندر چھپ
جاؤ جب بھی اسکی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ۔

قولہ تعالیٰ وان تصبہم حسنۃ الآیہ ۔ مسلمانوں کی جماعت کو جب کبھی کوئی نقصان پیش
آ جاتا ۔ تو منافق اور یہود کہتے یہ سب کچھ پیغمبر اسلام کی وجہ سے ہوا ۔ قرآن کہتا ہے کہہ دو
جو کچھ ہوتا ہے، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے" یعنی خدا نے ہر حالت اور ہر کیلئے احکام و قوانین
مقرر کر دیئے ہیں ۔ جو کچھ پیش آتا ہے، اُن حالات کا لازمی نتیجہ ہے پس یہ بڑی ہی جہالت
اور حماقت کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو ۔ آیۃ ۷۸

قوله تعالیٰ فلا وربک الآیہ - پس (دیکھو) تمہارا پروردگار (کی بات پر) شاہد
کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔

ف یہاں منافقوں کی منافقانہ روش کا ذکر کیا گیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے
کہ جو شخص اللہ کے رسول کے حکم اور فیصلے پر یقین نہیں رکھتا وہ کبھی سچا مومن نہیں ہو سکتا۔
یقین کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ حکم مان لیا جائے بلکہ "لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت"
ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ حکم رسول کے خلاف دل میں کوئی تنگی و خلش بھی محسوس نہ ہو۔

شہید: گواہی دینے والا۔ یعنی ایسا شخص جو اپنے قول و عمل سے سچائی کا اعلان
کرنے والا ہو اور دنیا میں اس کے لئے شہادت و حجت قائم ہو۔

قوله تعالیٰ - یا ایھا الذین امنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا ۝
اے مسلمانو! اپنی حفاظت اور دفاع کا سامان لے لو پھر جب وقت آجائے تو دشمنوں کے مقابلے
میں نکلو، الگ الگ ہو کر یا سب اکٹھے ہو کر (جیسی کچھ مصلحت ہو) اور (دیکھو)
تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ (اگر جنگ میں پکار ہو جائے تو) وہ ضرور قدم پیچھے ہٹائے۔

ف منافقوں کی ان نافرمانیوں کا ذکر ہے جو جنگ کے معاملہ سے تعلق رکھتی ہیں
جماعت میں کچھ لوگ ایمان و یقین سے محروم اور عزم و ہمت سے تہی دست ہوتے ہیں جب
وہ دیکھتے ہیں کہ عزم و ہمت کا کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے تو اپنی کمزوری سے خود بھی باز رہتے
ہیں اور چاہتے ہیں دوسروں کو بھی باز رکھیں۔ پھر جب جماعت قدم اٹھا دیتی ہے، تو
الگ تھلگ رہ کر غیروں کی طرح تماشا دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی حادثہ پیش آگیا تو خوش ہوتے ہیں
کہتے ہیں، اچھا ہوا ہم ان لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہوئے۔ اور اگر کامیابی ہوتی ہے، تو رشک و حسد سے
جل مرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ دیا ہوتا، تو آج کامیابی ہمارا حصہ ہوتا
گویا انکی شخصیت جماعت کی ہستی سے بالکل الگ ہے۔ نہ تو اسکا نقصان انکا نقصان ہے نہ اسکی
کامیابی انکی کامیابی۔

۲ اسلام کے ابتدائی عہد میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کا قرآن اپنے اعمال بیان کرتا ہے اور انھیں
مومن کی بجائے منافق قرار دیتا ہے۔

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর লিখিত পাণ্ডুলিপি হতে

ف مکہ میں جو کمزور لوگ تھے انہیں سے احادیث و تفاسیر میں بعضوں کے نام بھی آئے
ہیں جیسے حضرت ابن عباس اور انکی والدہ اور سلمہ بن ہشام اور ولید بن الولید
اور ابو جندل بن سہیل - آخر حقتعالیٰ نے انکی دعا قبول فرمائی اور بعض کی رہائی کا تو
پہلے ہی سامان ہو گیا اور پھر مکہ معظمہ فتح ہو گیا جس سے سب کو امن اور اعزاز حاصل ہوا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو عامل مکہ مقرر فرمایا - پس اس تفسیر
کے مصداق خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاوے (اور یہی اچھا معلوم ہوتا ہے)
یا حضرت عتاب رضی اللہ عنہ کو کہا جاوے کہ انہوں نے اپنے زمانہ حکومت میں سبکو خوب آرام پہونچایا
— اگر کسیکو وسوسہ ہو کہ جب انکی یعنے مکہ کے کمزور لوگوں کی دعا مستجاب ہونا
مقدر ہو چکا تھا تو پھر مسلمانوں کو اس حکم دینے کا کیا معنی کہ تم انکی خاطر سے لڑو -
کیونکہ نصرت خالق کی ہوتی ہے تو نصرت مخلوق کی کیا ضرورت ہے - جواب یہ ہے -
مطلب آیت کا یہ ہے کہ انکی دعا تو ضرور ہی ہم قبول کرینگے اور ضرور عالم میں
کسی نہ کسی کے ہاتھ یہ کام ہم لینگے - خواہ تم کرو یا نہ کرو - یہ کام تو ضرور ہو کر
رہیگا - لیکن تمہاری خیر خواہی سے کہتے ہیں کہ مفت کی دولت ہاتھ آتی ہے تو تمہاری
شرکت کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں لیکن شرکت کروگے تو عمل بھی ثواب ملجاویگا
ورنہ دوسری جگہ وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم فرما ہی دیا ہے -

قولہ تعالیٰ فلیقاتل فی سبیل اللہ الآیہ - یعنے ان کافر لوگوں سے لڑے جو آخرت
کو چھوڑ کر اسکے بدلے دنیوی زندگی کو اختیار کئے ہوئے ہیں (یعنی اس شخص کو اگر
فوز عظیم کا شوق ہے تو دل دولت کے ہاتھ پاؤں ہلاوے مشقت جھیلے تیغ سنان
کے سامنے سینہ پر لے - دیکھو فوز عظیم کا ہاتھ آتا ہے یا نہیں - اور یوں کہا کہ دل
لگی ہے - پھر جو شخص اتنی مصیبت جھیلے کسی کامیابی کی ہے - کیونکہ دنیا کی کامیابی
اول تو حقیر - پھر کبھی ہے کبھی نہیں - اگر غالب آگئے تو ہے ورنہ نہیں - اور آخرت
کی کامیابی جو کہ ایسے شخص کیلئے موعود ہے ایسی ہے کہ غلبہ بھی ہے اور پھر خالقیت سے
یہ کہ اسکا خاتمہ نہیں ہے - فیقتل او یغلب الآیہ -

ف اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جماعت کی ریاست و پیشوائی کا منصب
رکھتا ہو اسے کیسی کیسی دشواریوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ جب عزم
و عمل کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو ایک گروہ ایسے لوگوں کا پیدا ہو جاتا ہے
جو یقین کا کچا اور ہمت کا کمزور ہوتا ہے۔ جو اطاعت کیجگہ مخالفت
کی روش اختیار کرتا ہے۔ پھر جب اسی صورت حال کی وجہ سے کوئی ناکامی پیش
آجاتی ہے، تو بجائے اسکے کہ اپنی بدعملیوں پر نادم ہوں، سارا الزام اسکے
سر ڈال دیتے ہیں۔ اور مخالفت کا ایک نیا بہانہ ان کے ہاتھ آجاتا ہے۔
اسی لئے آگے چلکر کہا۔ اللہ پر بھروسا رکھو، اللہ کی کارسازی تمہارے لئے کافی ہے
کما قال اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ آیت ۸۳

ف یعنی صاحب عزم کو چاہئے ان باتوں سے دل گرفتہ نہ ہو۔ اللہ پر بھروسہ رکھے
اور اپنے کام میں لگا رہے۔ اسکا عزم و ثبات بالآخر تمام دشواریوں پر غالب
آجائیگا۔

من یطع اللہ فقد اطاع اللہ

اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اللہ کا رسول اسلئے آتا ہے کہ پیغام
حق پہونچا دے۔ اسلئے نہیں کہ لوگوں کے اعمال کا پیمانہ ہو اور انھیں جبراً اپنے
طریقے پر چلائے۔ (ما ارسلناک علیہم حفیظا۔)
جب تمہارے ناقص نمونوں کا یہ حال ہے کہ منہ سے تو اطاعت کا اقرار کرتے ہو،
لیکن راتوں مجلس جما کر مخالفانہ مشورے کرتے ہو۔ تو پھر یہ کیا حق ہے کہ نتائج کیلئے
اللہ کے رسول کو ذمہ دار ٹھہراؤ۔

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর লিখিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি হতে

قوله تعالى لا يكادون يفقهون حديثا - يعني لا يفقهون معاني القرآن وان الاشياء
كلها من الله عز وجل خيرها وشرها -

(افلا يتدبرون القرآن) معنى تدبر القرآن تامل معانيه والتفكر في حكمه
وتبصر ما فيه من الآيات - قال ابن عباس رضي الله عنه افلا يتدبرون القرآن فيتفكرون فيه
فيرون تصديق بعضه لبعض وما فيه من المواعظ والذكر والامر والنهي وان احدا
من الخلق لا يقدر عليه - قال العلماء ان الله تعالى احتج بالقرآن والتدبر فيه على
صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - والحجة في ذلك من ثلثة اوجه - احدها
فصاحة التي عجز الخلق عن الاتيان بمثلها في اسلوبه - الثاني اخباره عن
الغيوب وهو ما يطلع الله تعالى نبيه على احوال المنافقين وما يخفونه من مكرهم
وكيدهم فيفضحهم بذلك وغير ذلك من الاخبار عن احوال الاولين واخبار
وما يأتي في المستقبل من امور الغيب التي لا يعلمها الا الله تعالى - والثالث
سلامته من الاختلاف والتناقض وهو المراد بقوله تعالى (ولو كان من عند غير الله
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) قال ابن عباس يعني تفاوتا وتناقضا - وفي رواية
لو كان من عند مخلوق لكان فيه كذب واختلاف - وقيل معناه لوجدوا في اخباره
عن الغيب بما يكون وبما قد كان اختلافا كثيرا لان الغيب لا يعلمه الا الله تعالى
واذا كان كذلك ثبت انه من عند الله وانه ليس فيه اختلاف - ولا تناقض
وقيل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من حيث البلاغة - والفصاحة
والمعنى لو كان من عند مخلوق لكان على قياس كلام المخلوق - بعضه فصيح بليغ حسن
وبعضه مردود ركيك فاسد فلما كان القرآن جميعه على منهاج واحد في الفصاحة
والبلاغة ثبت انه من عند الله - فلما كان القرآن ليس فيه تناقض واختلاف
علم انه من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره - عالم بما لا يعلمه سواه -

قوله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به -
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث والسرايا - فاذا غلبوا او غلبوا
بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم ثم يشيعونه ويتحدثون به قبل ان يحدث به رسول
الله صلى الله عليه وسلم فيضعفون به قلوب المؤمنين فانزل الله هذه الآية

(ولو ردوه) يعني الامر الذي تحدثوا به (الى الرسول) يعني انهم لم يتحدثوا به حتى يكون
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحدث به ويظهره (والى اولي الامر منهم) يعني ذوي
العقول والرأي والبصيرة بالامور منهم وهم كبار الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي
رضي الله عنهم وقلدهم امر السرايا والبعوث - (وانما قال منهم على حسب الظاهر
ولان المنافقين كانوا يظهرون الايمان فلذا قال والى اولي الامر منهم -)

(لعلمه الذين يستنبطونه منهم) اي يستخرجونه تدبيره بذكائهم وفطنتهم
وتجاربهم ومعرفتهم بامور الحرب وما ينبغي لها وما يدها وهم العلماء الذين
علموا ما ينبغي ان يكتم من الامور وما ينبغي ان يذاع منها -

قوله تعالى لا تبعتم الشيطان الا قليلا - يعني لا تبعتم الشيطان الا قليلا منكم
وهم الذين آمنوا واهتدوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وانزال القرآن
مثل زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وقس بن ساعدة الايادي -

قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك - نزلت في مواعدة رسول الله
صلى الله عليه وسلم ابا سفيان بن حرب - وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
واعده موسم بدر الصغرى لبدر حرب احد وذلك في ذي القعدة - فلما بلغ
الميعاد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الى الخروج فكرهه بعضهم فانزل الله
هذه الآية - فقاتل في سبيل الله يعني لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين
من المؤمنين لا تكلف الا نفسك يعني والوحدك وان لم تجد عدة الخروج
وهو لا يخلف الميعاد - فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين راكبا الى بدر
الصغرى فكفاهم الله القتال ورجعوا سالمين وعاتب الله من تخلف عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على ترك الخروج - وفي الآية دليل على ان النبي
صلى الله عليه وسلم كان استخف الناس واعلمهم بامور القتال ومكايده لان الله تعالى امره بالقتال
وحده ولم يكن استخف الناس كما امره بذلك - ولقد اقتدى به ابو بكر الصديق رضي الله عنه
في قتال اهل الردة من بني حنيفة الذين منعوا الزكاة فعزم على الخروج الى قتالهم ولو وحده

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর লিখিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি হতে

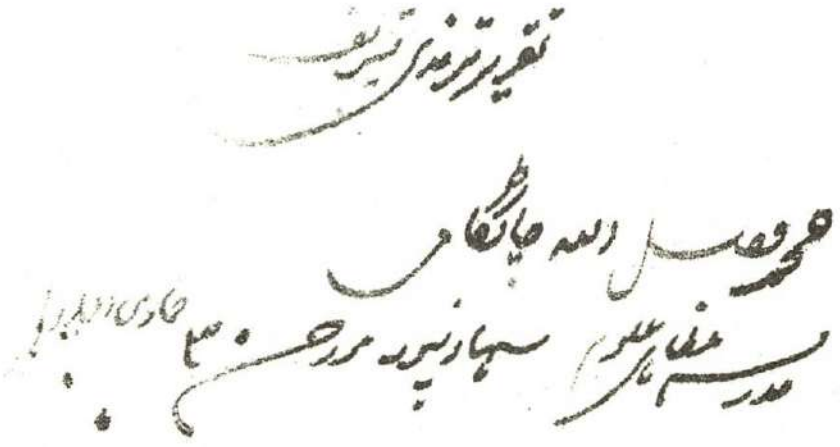

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর সাহারানপুর অধ্যয়নকালীন তিরমিযী শরীফের দরস'র হস্তলিপি

بقية ابواب الحج

باب الحج والنحج الحج بمعنى رفع الصوت بالتلبية وغيرها والنحج سيلان
دم الهدى والاضحية ١٢ باب رفع الصوت بالتلبية قال الشافعي
التلبية سنة وليست بشرط لصحة الحج ولا واجبة ولو تركها فلا دم ولكن فاتته
الفضيلة وقال بعض اصحاب الشافعي هي واجبة يجبر بالدم وقال بعضهم هي
شرط لصحة الاحرام وقال مالك ليست بواجبة ومن تركها لزمه
دم قال الشافعي ومالك ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ
وقال ابو حنيفة لا ينعقد الا بانضمام التلبية او سوق الهدى الى النية ١٢
وفي الهداية ولا يصير شارعا في الاحرام بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية
خلافا للشافعي رح لانه عقد على الاحرام فلا بد من ذكر كما في تحريمة الصلوة
واما الاختلاف في الفاظ التلبية وهو لبيك اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه
الالفاظ هي المنقول من رسول الله صلعم فاختلف العلماء في الزيادة فيها
من الفاظ التعظيم هل يجوز ام لا فقال الطحاوي رح لا ~~بأس~~ بزيادة
~~قال~~ قوما قالوا لا بأس للرجل ان يزيد فيها من الذكر بعد ما اجبت
وهو قول محمد والثوري والاوزاعي (قال الترمذي وقال الشافعي حاكيا

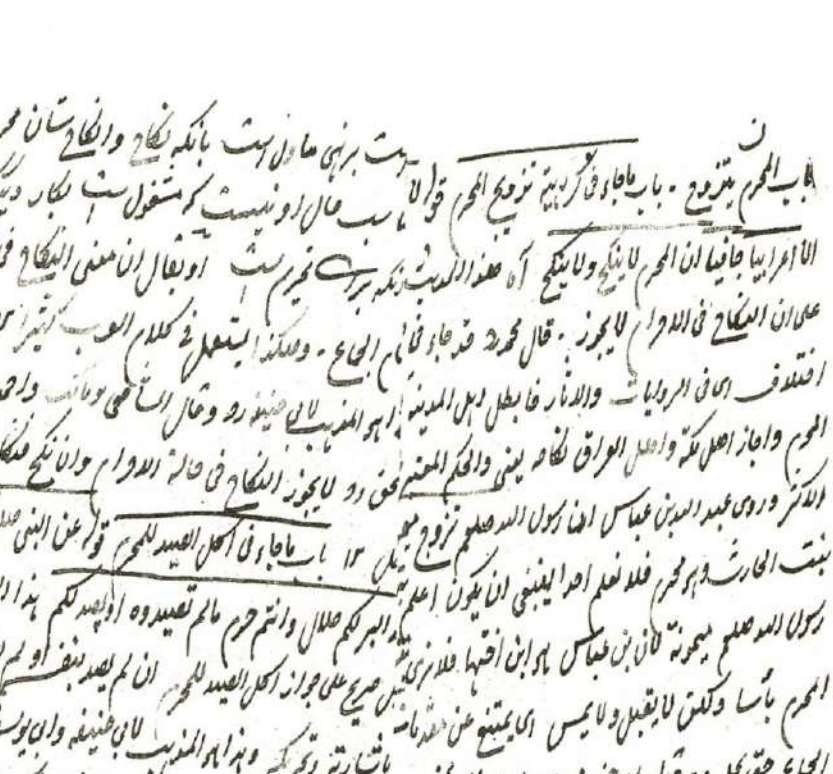

মাযাহির উলুম সাহারানপুরে তিরমিযী শরীফের ক্লাসে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর লেখা

মাযাহির উলুম সাহারানপুরে তিরমিযী শরীফের দরসে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর লেখা

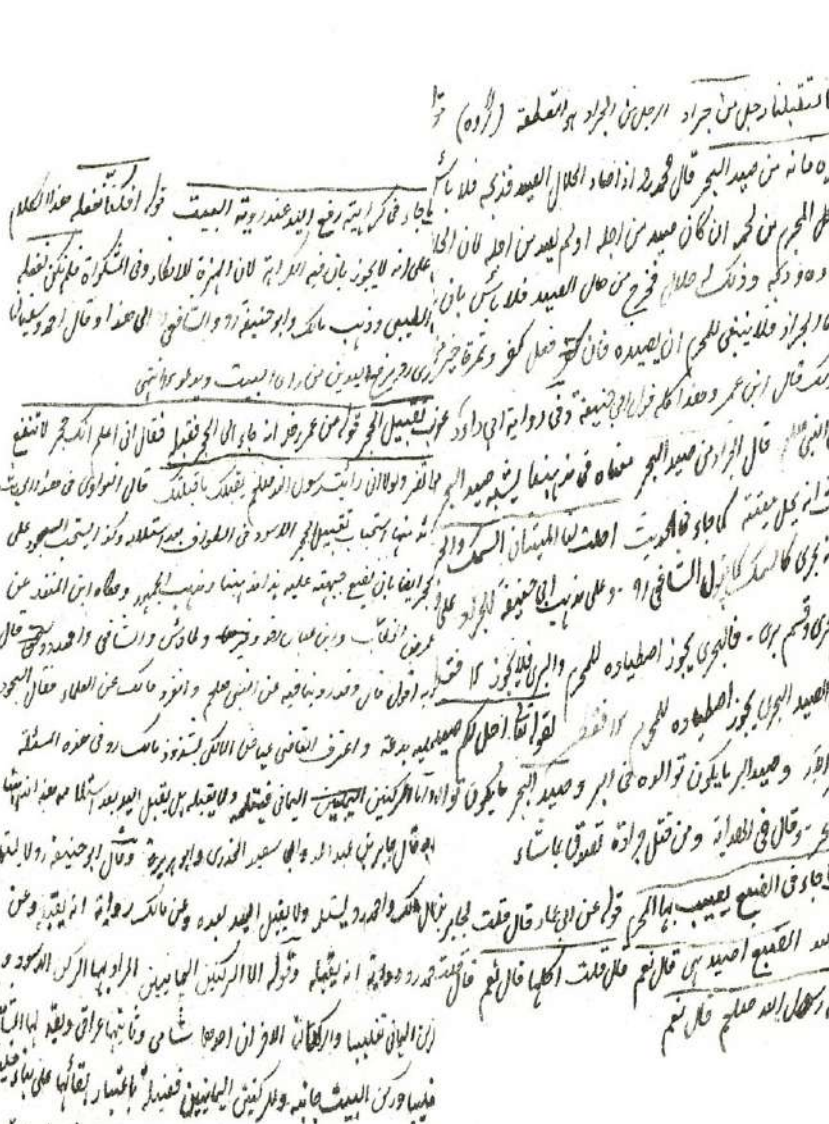

عجالة فكرتي قدمت عندك + فتوردها وان ابيت بنو دي

اظهار التحسر والتاسف

عند وقوع المفارقة بيننا وبين مخدومنا المحترم ومطاعنا المكرم جامع الفضل والكمال حاوي
الاستقامة والاستقلال قائد المدرسين والمدرسين هادي المعلمين والملازمين حسن الخلق
والجاه مولانا المولوي محمد فضل الله ادام الله فضله وكرمه وابقا الطفه ورحمه على المتعلمين
والمتعلمين والمحبين والمتعلمين مادامت الافلاك تدور والكواكب تسير ناظم المدرسة الحكيمية
الواقعة في قرية صنوتي من مضافات جاتغام

مخدومنا المحترم ان الدنيا الدنية قد عمت مخادعها وجمت خداعها فما تركت احدا
وما ابقت فردا وانها قد جبلت لتغدر باحبابها وخلقت لتمكر باصحابها ودارت على الدوام
وعادت ماكرة ومن دناءتها التفريق بين الاحباب والتمزيق بين الاصحاب نبعث الفرقة
التي نزلت علينا فصدعت قلوبنا وساءت المفارقة التي حلت بنا فشتت كبودنا واذهبت عيوننا وادارت
بصائرنا نقول كنا كروح جماعة في ايكة + متمتعين بصحة وشباب + فحل الزمان بنا وفرق بيننا
ان الزمان مفرق الاحباب + مطاعنا المكرم تو انا لجاذبي فلا تنسنا وتنظرنا فاذا رايت فضلا
ونوالا كرم شفيقا ومبارقيا فحبذا كم المودة والمحبة وذلك الشفقة والرافة وقد ميزوني
قلوبا اواصلة وتصريني عيونا نواظرة فلا تقدر هذه الاسرة قليلة ولا تقدر الاوقة بسيرة لانا
حيارى في الصحارى كالجبارى ... من نستحدي ونرى من نقتدي وهذه المدرسة هي التي بناها
فشيد بناءها مخدومنا مكرم الشيخ واستاذنا الحقيق المولى الشهير بمولانا محمد فضل الله زيد
مودته من دين فضله ومزاية لعامة الناس والخاصة فلا جرم نرجو من مودتكم وشرافتكم ونلتجي الى رايتكم
وديانتكم ان لا تروح الاخذ وتتحاوان لا تقصر بالاراء انتهى الى ودوحة سودد اوسعه ... وا
واعلى هذا السودد والمنحة منزلة تكون باعثا لاجر اكم ومضاعفا لاجلالكم في الدنيا اقبا الفوز وفي الاخرة
بعد الموت وايضا هذه المدرسة من مدارس مدارسكم واماكنكم وقد قال النبي الصادق المصدوق الا
بجاهدوني الخيوط الطين بهذا اليمان فكيف يجوز اكم ان تمنع السعي الحذر وتتوانوا في الوطن على الوطن فتجعلوا
في العود الى الوطن اليدا وشمرا واللابث فيما بيننا ... لاجل المعظم تقدر ضرورة ومشت الحاجة
لترك كرونة كم الانتقاد وتقدرها ولا يجوز بردها ولا يحل اهمالها المخطورة ... ولا يبرد
منوعة فلا جرم نرجو اهل الاجراء ونلتجي كل الالتجاء من مكارم اخلاقكم ومحاسن حياتكم الوجوه ... هذا
عاجلا ولا تتعجلا واذ لا تخيبونا ... ولا تحرمونا ... فلا تستغني ... ولا تايس عنك ... لا اليوم ولا بعده ولا ينبغي ان يخلو البال ويخلو الحال اذ الدنيا
قد جرت على اطرادها ... على اطرادها ... بانواع الحوادث والنوائب وحدوثه

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর প্রতি চুনতি মাদরাসা কর্তৃপক্ষের প্রেরিত পত্র

لا يحل له الزنى عند الاكراه الملجئ لان حرمة الزنا ثابتة بالنصوص القطعية من السنن
النبوية والخطابات القرآنية حيث لا يحتمل السقوط بحال ما قط سواء كانت الحالة حالة
الاكراه الملجئ او غيره لانه قتل النفس بغير حق منهي ومن اكره على ذلك فله ان يرض الله تعالى
واسوة فيها جبلا ان الهجرة مشروعة للمستضعفين من عند احكم الحاكمين كيلا يستثقل على عباده
ومن قال بحله عند الاكراه الملجئ فاما نسي ونسي واما طغى وغوى فان كان الاول ثم اطلع
عليه فتاب ورجع فالله احق بالتجاوز عنه وغفرانه وان كان الاخر فانه شديد القدرة
والبطشة بمواخذته وخذلانه لمن تحكم بكفرانه ويعود عليه حكم الكفر والعناد والتمرد
والارتداد باستحلاله هذا ما لخصته من كتب الفقه المعتبرة وانما يستشهد له
ما قال الامام الهمام قدوة علماء الاسلام نجم الملة والدين عمر النسفي اعلى الله درجته
في دار السلام في كتابه العقائد ويجوز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة
اذا لم يكن عن استحلال والا استحلال كفر انتهى وقال العلامة الفهامة سعد الدين
التفتازاني في شرحه للعقائد تحت قوله والا استحلال كفر لما فيه من التكذيب
المنافي للتصديق وبهذا يأول النصوص الدالة على تخليد العصاة في النار او على
سلب اسم الايمان عنهم والله اعلم وعلمه احكم واتم

كتبه عبده الضعيف محمد عبد الحق غفر له الجانكاهي
المدرس الاول في مدرسة مظهر العلوم فاردي بور
بضلع دمكا (بهار واڑيسه) مدرسه جهاوں مئی ۱۹۳۲ء

বিহার থেকে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর কাছে ফতওয়ার আবেদন

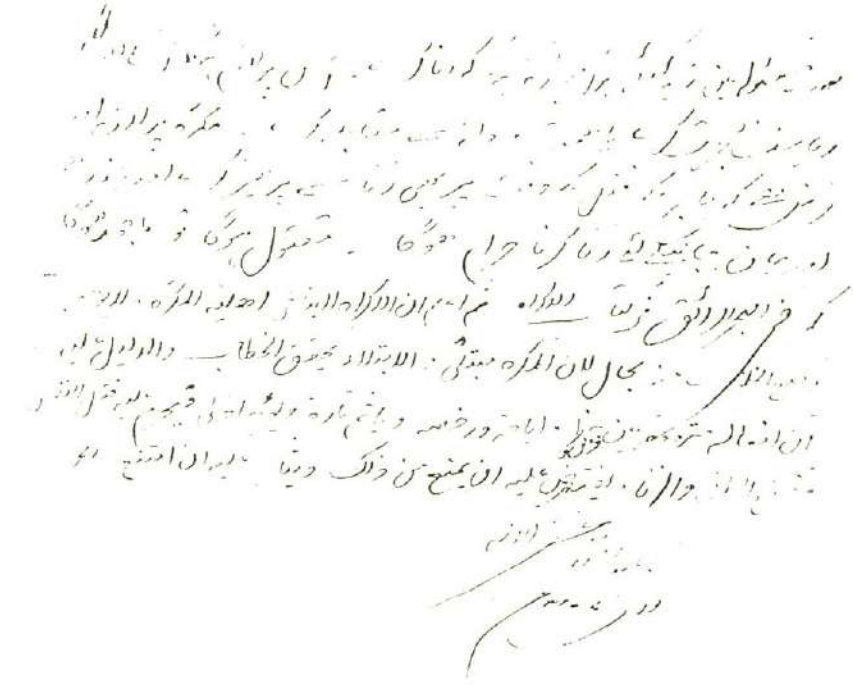

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর প্রদত্ত ফতওয়া

ماقولکم رحمکم اللہ تعالیٰ

دریں مسئلہ کہ زید ایک شخص مفلوک الحال ناتوان تنگدست اور بے یار و مددگار ہے۔ اور اسکے محلہ میں خالد ایک زمیندار ذی اثر بارسوخ خوشحال صاحب جاہ آدمی ہے۔ اپنے احاطۂ زمینداری میں اپنا حکم زبردستی کے ساتھ چلا سکتا ہے۔ کسی کو تاب نہیں کہ اس احاطہ میں اسکے احکام سے انحراف کرے۔ یا اس سے مقابلہ کرے اور مقدمہ لڑے۔ کیونکہ وہ دولتمند ہے اور اسکے یار و مددگار و ہواخواہ بکثرت ہیں اور فرمانبردار بہت۔

اندریں حالت خالد نے زید سے کہا کہ تم کو زنا کرنا ہوگا۔ اور اس پر بجبر و اکراہ زنا کرانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم میرا حکم نہ مانوگے تو ناحق روپیوں کی مالش کرکے تمکو تباہ کر دونگا۔ اپنی زمین پر سے اٹھا دونگا۔ چور ڈاکو کرکے جیلا دونگا۔ مار ڈالونگا۔ قتل کرا دونگا۔ تو کیا ایسی صورت میں زید کیلئے جائز ہوگا کہ زنا کا ارتکاب کرے۔ بینوا توجروا

عمرو جو اپنے کو عالم سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ زید کیلئے ایسی صورت کی حالت میں زنا جائز ہوگا۔ آیا یہ قول صحیح ہے؟ بینوا توجروا

الجواب

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد صورت مسئولہ میں زید کیلئے ارتکاب فعل زنا کا ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ حرمت زنا من قبیل ان حرمات کے ہے جو کسی صورت میں بھی ساقط و قابل رخصت نہیں ہوسکتیں کذا فی کتب الاصول۔ کما فی نور الانوار شرح المنار

الحرمات انواع حرمۃ لا تنکشف ولا تتداخلہا الرخصۃ کالزنا بالمرأۃ فانہ لا یحل بعذر الاکراہ قطعا وایضا

فی بیان انواع الاکراہ وفی بعضہ العمل بہ حرام کالزنا وقتل النفس المحرمۃ المعصومۃ فانہ یحرم فعلہ عند الاکراہ

الملجئ وفی التنقیح والحرمات انواع حرمۃ لا تسقط ولا تتداخلہا الرخصۃ کالقتل والجرح والزنا وفی شرحہ

التوضیح فان ولد الزنا بمنزلۃ الہالک فان انقطاع النسبۃ عن الغیر ہلاک فان اکرہ علی الزنا لا یحل الزنا

وقال الشیخ العلامۃ الفقیہ الاصولی محمد بن عمر حسام الدین الاخسیکثی فی کتابہ المعروف بالحسامی الا ترٰی انہ متردد بین

فرض وحظر واباحۃ ورخصۃ ویاثم فیہ مرۃ ویوجر اخری فلا رخصۃ فی القتل والجرح والزنا بعذر

الاکراہ اصلا وقال المحشی العلامۃ المولانا محمد برکت اللہ اللکنوی الفرنگی محلی رحمہ تحت قولہ وحظر وھذا فیما اذا

اکرہ علی الزنا او علی قتل المسلم فانہ محظور لا یباح اصلا بوجہ من الوجوہ سواء کان الاکراہ

ملجئا او غیر ملجئ کتب اصول کی مرقومہ بالا عبارات سے واضح ہوگیا کہ اکراہ ملجئ کی صورت میں بھی جسمیں خطرہ

قتل یا خوف تلف عضو من الاعضاء ہوتا ہے زنا کرنا حرام ہے۔ اسکے کرنے سے مرتکب کبیرہ کا ہونا کسیطرح جائز نہیں ہوسکتا

شاید کوئی جاہل مدعی علم یہ خیال کرتا ہو کہ اس صورت میں اگر زنا جائز نہ ہو تو زانی مکرہ پر حد کیوں جاری نہیں ہوتی

تو اسکو یاد رکھنا چاہئے کہ نیم حکیم خطرۂ جان اور نیم ملا خطرۂ ایمان ہے۔ ہر مومن پر اگر اپنا ایمان عزیز ہو تو لازم ہے کہ احکام

شرعیہ میں بعد فہم و ادراک کے اپنی زبان کھولے ورنہ سلوت و صموت کو ذریعۂ نجات سمجھے۔ ایسا ہرگز نہ کرے کہ جو زبان

میں آیا کہدیا۔ ہاں اسمیں شک نہیں کہ اس پر حد نہیں جاری ہوتی چنانچہ فتح القدیر میں ہے ثم رجع ابو حنیفۃ رضا

لا يحد المكره ايضا لان السبب الملجئ الى الفعل قائم ظاهرا وهو قيام السيف والانتشار لا يستلزم
الشهوة بل هو محتمل له اذ يكون معه ويكون طبعا الخ وفي الدر المختار ثم الحد لا حد عليه استحسانا
وفي الفتاوى العالمكيرية اذا اكره الرجل على الزنا بامرأة فزنى بها كان ابو حنيفة اولا يقول يجب عليه الحد
ثم رجع وقال لا حد عليه وهو قولهما پس سقوط حد زنا اگر دلیل ہو سقوط حرمت زنا بحالت اکراہ کی تو یہ
حضرات فقہای کرام ہی تو لکھ رہے ہیں کہ زنا ہر حالت میں حرام ہے کسی ضرورت سے بھی کبھی وہ جائز نہیں ہو سکتا اور
نہ تو اسمیں رخصت آسکتی کما فی الدر المختار ولو اکره على الزنا لا يرخص له لان فيه قتل النفس ايضا عما
وفي حاشية رد المحتار المعروف بالشامي تحت قوله ولو اكره اي بملجئ ويدل عليه ما يجئ وتحت قوله ايضا عما
لان ولد الزنا هالك حكما لعدم من يربيه فلا يستباح بضرورة ما قطعا درر انتهى وفي العيني شرح
الكنز ولكن لو اكره على الزنا لا يرخص لان فيه قتل النفس بالضياع لانه يتضرر منه ولد وليس له
اب فيربيه انتهى وفي التكملة حاشية شرح الوقاية في كتاب الاكراه فان كان الفعل مما يحل عند الضرورة
يجوز فعله كاكل الميتة وان لم يحل فان كان مما ينجبر كاتلاف المال فان الضمان خلفه يجوز وان
كان مما لا ينجبر كالقتل للانسان وهتك حرمة والزنا لا يجوز ابدا انتهى وفي الفتاوى السراجية
للعلامة الامام سراج الدين الاوشي ولو اكره على الزنا او القتل اثم ان فعل انتهى تو کیا یہ حضرات ہمارے بھی
نادان ہیں کہ ایسے متعارض باتیں کرتے۔ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ مکرہ کیلئے زنا حلال نہیں ہو سکتا وہ
اگر جان کے خوف سے زنا کر لیتا تو گنہگار ہوگا۔ زنا ہر حالت میں حرام ہی حرام ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ
سقوط حد دلیل سقوط حرمت زنا کی نہیں ہے۔ بلکہ سقوط حد کی وجہ اور ہے۔ بات اسمیں یہ ہے کہ حد سیاست و زجر
کیلئے ہوتی ہے کہ انسان قضای شہوت کیلئے خلاف شرع کاموں کے کرنے کی ہمت نہ کرے اور ضرورت اکراہ میں
زانی مکرہ نے قضای شہوت کیلئے زنا کی ہمت نہیں کی ہے بلکہ بے ہمتی کیوجہ سے بخوف ہلاک زنا اس سے سرزد
ہوا ہے ہر کس فائدہ کے خیال سے اس پر حد جاری کیجائیگی۔ حدود کی حالت تو ایسی ہے کہ ادنی شبہ سے بھی ساقط
ہو جاتی ہیں کما فی شرح العناية للامام اكمل الدين محمد بن محمود البابرتي لان الحد للزجر ولا حاجة
مع الاكراه لان الانزجار كان حاصلا الى ان حصل خوف التلف على نفسه فكان قصده بهذا
الفعل دفع الهلاك عن نفسه لا قضاء الشهوة فيصير ذلك شبهة في اسقاط الحد عنه الخ
اب واضح ہو گیا کہ سقوط حد وجہ سقوط حرمت زنا نہیں ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں زید پر لازم ہے کہ ارتکاب فعل زنا کی ہمت
نہ کرے۔ اگر اس شریر زمیندار سے مقابلہ کی تاب نہیں ہے تو اسکی زمینداری سے نکل جائے۔ الم تكن ارض الله واسعة
فتهاجروا فيها گرچہ اس صورت میں زید کو مالی نقصان پہنچتا ہے لیکن حرمت اسلام کی حفاظت کیلئے اگر کوئی مومن

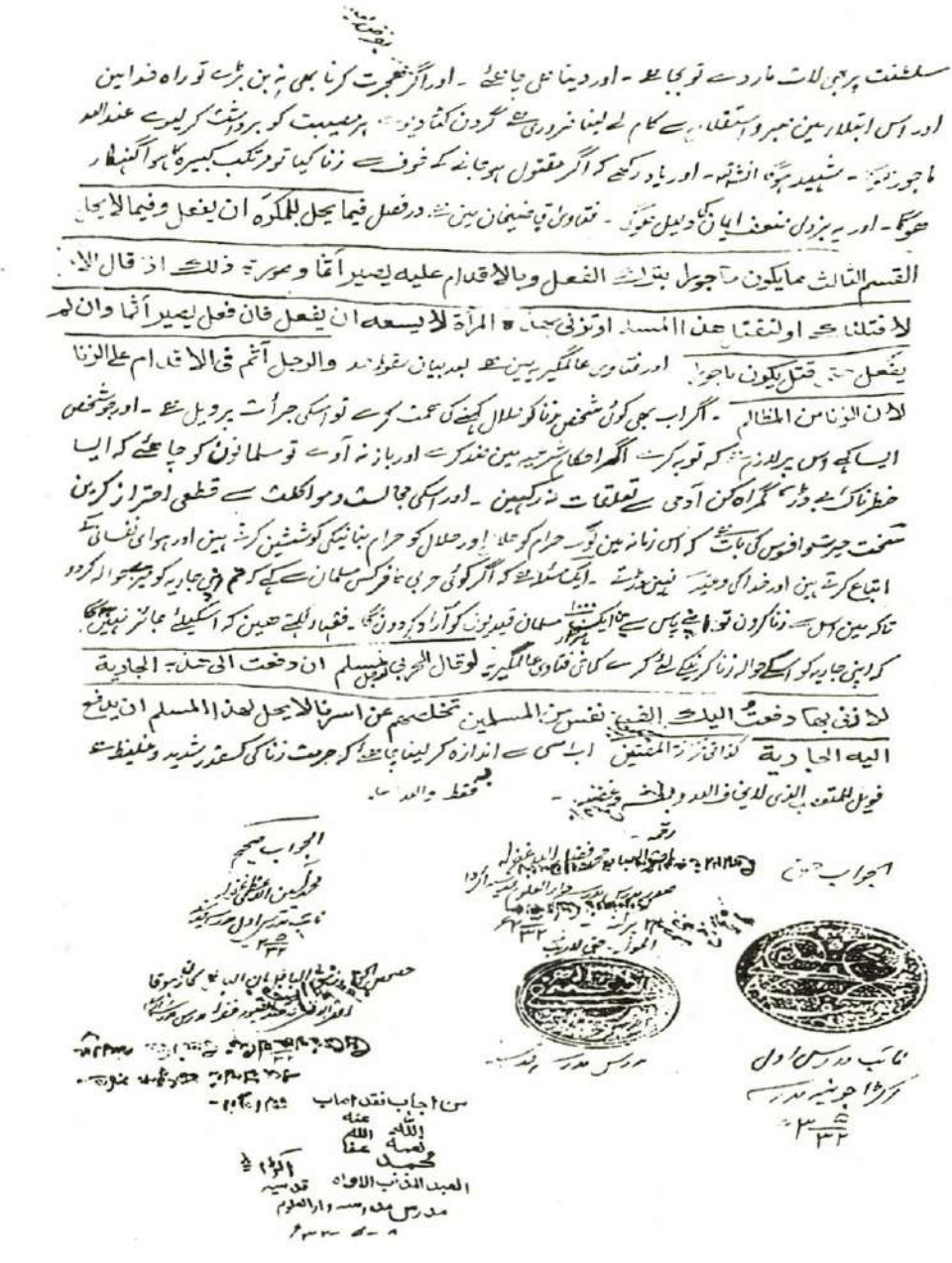

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর প্রদত্ত ফতওয়া

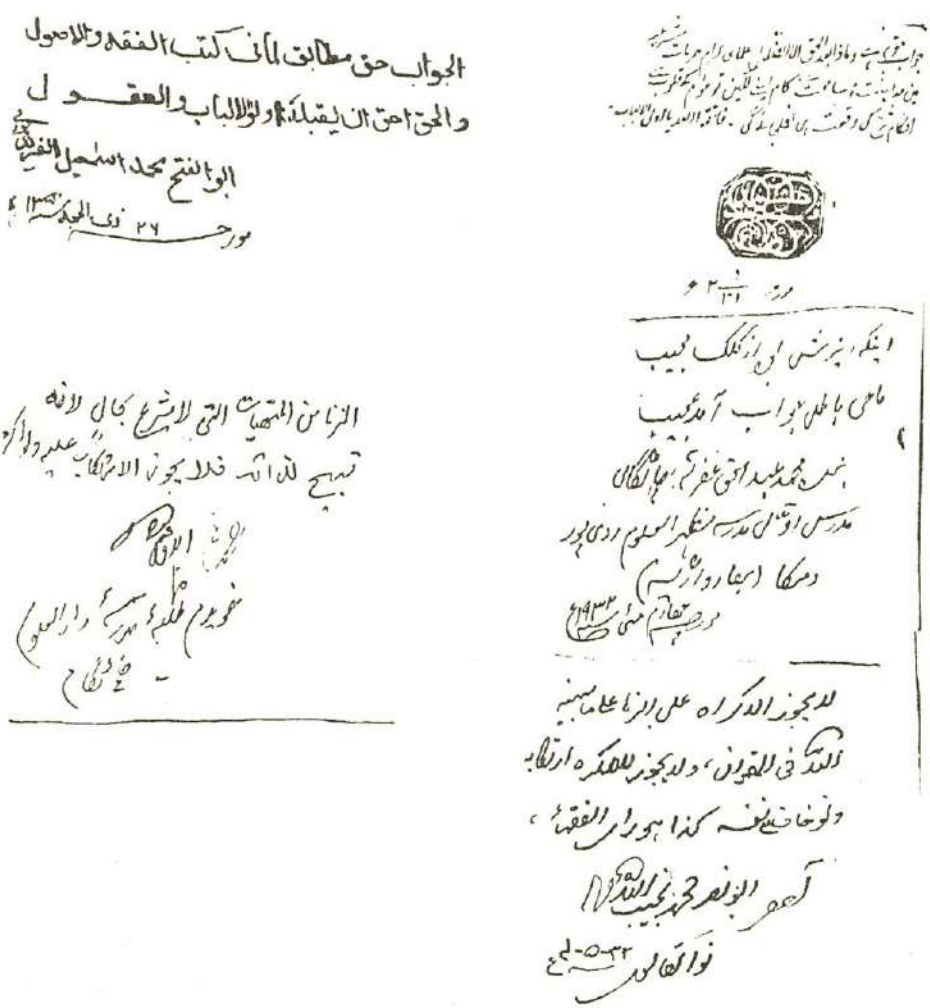

الجواب حق مطابق لما في كتب الفقه والاصول
والحق احق ان يقبلكم اولوا الالباب والعقول
ابو الفتح محمد اسمٰعيل الغزنوي
مورخہ ۲۶ ذی الحجہ ۱۳۳۲ھ

الزنا من المنهيات التي لا شرع بحال لانه
قبيح لذاته فلا يجوز الارتكاب عليه والاكراه
[illegible]
خادم الفقراء
خادم طلبہ مدرسہ دار العلوم
[illegible]

جواب صحیح ہے وما ذالک الحق الا الافادۃ علمائے کرام مدت مدید
میں مدلل ومساوات کلام ایسے کلمین تو موجود ہیں مگر
اختصار کی وقعت ہی اعلیٰ ہے گی۔ فاتحۃ اللہ یا اولی الالباب

مورخہ ۳/۱۲

اینکہ پرسش ایں ارتکاب مجیب
ماحی باطل جواب آمدہ مجیب
بنده محمد عبد الحق غفرلہ بہاولپوری
مدرس اوّل مدرسہ منظر العلوم روہی پور
دمکا (بہاولپور)
مورخہ ۱۴ محرم ۱۳۳۲ھ

لا يجوز الاكراه على الزنا عامًا مبينًا
للحد في القانون، ولا يجوز للمكره ارتكابه
ولو خاف على نفسه كذا هو رأي الفقهاء،
كتبه ابو نصر محمد نجيب الله
نواب كالوى ۲-۵-۳۲ھ

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর প্রদত্ত ফতওয়া

رجل تفوه بنی شان عالم ربانی بما لایلیق به و تکلم بافحش الکلمات وابذاء السبّ والشتم واهانه اشد الاهانة حتی بکشف عورته بین عینیه واجری علی لسانه بکمال الجرأة بعض کلمات الکفر، والواقعة مرقومة منفصلة فی قرطاس علیحدة بلساننا الوطنی مربوط بهذه الفتیا

فیا ایها السادة من العلماء والاعلام من الفضلاء طالعونا بالامعان وافتونا بشریعة الرحمن رحمکم الله تعالی وایانا بالعفو والغفران

المستفتی
بندہ مزید الرحمن غفرلہ

الجواب

اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب . اما الاستفتاء ففیه امور الاول شتمه رجلا عالما بالعلوم الدینیة بافحش الکلمات واهانته اشد الاهانة حتی بکشف العورة بین عینیه وکل ذلک کان بسبب انه دعاه الی الصلح والعدل والانصاف وانه امره بالمعروف ای بطلب الانصاف وترک السب والشتم والثانی کشف العورة الغلیظة بین اعین الناس والثالث اهانته العدل والانصاف والضمان بافحش الکلمات مع انها کلها امور شرعیة یجب احترامها والرابع اهانته اللحیة بالالفاظ الردیئة وبکونها معفاة طویلة فالامر الاول ان ذلک امر شنیع وفعل فضیح یفضی فاعله الی الکفر علی ما افتی به الفقهاء رحمهم الله تعالی وان اخترت الاحتیاط کما اختاره بعض الفقهاء قلت: یخاف علیه الکفر. قال الحصکفی فی الدر المختار: لا یعزر بیا حمار... و استحسن فی الهدایة التعزیر لو الخاطب من الاشراف (العلماء والعلویین) وتبعه الزیلعی وغیره فقال الشیخ ابن عابدین الشامی تحته: انه لو علی وجه المزاح یعزر فلو بطریق الحقارة کفر لان اهانة اهل العلم کفر علی المختار اه ج۳ ص۲۰۳ . قال المولی شمس الدین الخراسانی فی کتابه جامع الرموز شرح النقایة ص۶۵۲ ولا یعزر بیا حمار ویا خنزیر.... قال الفقیه ابو جعفر رحمه الله انه فی الاجنبی اما فی الاشراف فالتعزیر والیه اشار بقوله وقیل لا یعزر بیا حمار وامثاله الا اذا قال العالم بالعلوم الدینیة علی وجه المزاح یعزر فلو قال بطریق الحقارة کفر لان اهانة اهل العلم کفر علی المختار اه ذکر الامام الفخر الرازی حدیثا فی تفسیره

المعروف بالكبير قال عليه السلام فمن اهان العالم فقد اهان العلم ومن اهان العلم
فقد اهان النبي ومن اهان النبي فقد اهان جبريل ومن اهان جبريل فقد اهان الله
ومن اهان الله اهانه الله يوم القيمة وذكر الامام النووي في مقدمة شرحه للمهذب
حديثين (١) عن ابي امامة مرفوعا ثلثة لا يستخفهم الا المنافق ذو الشيبة في
الاسلام وذو العلم وامام مقسط رواه الطبراني في الكبير (٢) وعن عبد الله بن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا
ولم يعرف لعالمنا حقه رواه الترمذي قال الحافظ ابن القاسم بن عساكر ان من اطلق
لسانه في العلماء ابتلاه الله قبل موته موت القلب قال العلامة الشيخ زين
الدين ابن نجيم في البحر ج ٥ صفحة ١٢٣ و يخاف عليه الكفر اذا شتم عالما او فقيها
من غير سبب اه وفي الفتاوى العالمكيرية ج ٣ صفحة ١٦٣ و يخاف عليه الكفر اذا
شتم عالما او فقيها من غير سبب ولا ريب في ان شتمه واهانته عالما ربانيا
في الحادثة المسئولة عنها لم يكن الا بسبب انه دعاه الى الصلح والعدل والانصاف
المامور بها شرعا وامره بالمعروف اى بطلب العدل والانصاف وترك
الشتم والتلفظ بالفحش الكلمات (كما هو ظاهر من السوال) فاهانة العالم في امثال
هذه الصورة تستلزم اهانة العلم والدين البتة وذلك امر فظيع
اشد الفظاعة في الهندية ج ٣ صفحة ١٦٥ اذا خاصم فقيها في حادثة وبين
الفقيه وجها شرعيا وقال ذلك المخاصم اين دانشمندى كه پيش نرود يخاف عليه
الكفر وايضا فيها رجل قال للامر بالمعروف چه غوغا آمد آن قال ذلك على وجه الرد
والانكار يخاف عليه الكفر وفي البحر ج ٥ صفحة ١٢٣ يخاف الكفر على من قال للامر
بالمعروف غوغا على وجه الرد والانكار فاذا خيف الكفر على من انكر
الوجه الشرعي والامر بالمعروف بالالفاظ المذكورة فما بال من انكر تلك الامور
بالسب والاهانة والكلمات الفاحشة والحال انه لم يكن له الا ان يجنح الى
ما دعى اليه من الصلح والانصاف فالحكم عليه لا ايسر من ان يتوب او
يستغفر ويجدد النكاح وان سلمنا الخلاف في كفره لما في الدر المختار
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح واولاده
اولاد زنا وما فيه خلاف يومر بالتوبة والاستغفار وتجديد النكاح -
والامر الثاني ان ستر العورة فرض شرعا فمن كشف عورته بين اعين
الناس فقد ارتكب اثما مبينا وعلم انه لا يستحيي من الله تعالى ولا من عباده مع ان

الحياء شعبة من الايمان وايضا هذا الفعل ينبئ عن غاية دناءة فاعله
فعليه ان يتوب تاب الله عليه وعلى المسلمين ان يسوسه ويزجره
لينزجر الاخساء عن امثال هذه الامور الردية البعيدة عن دائرة التهذيب بمراحل
واما الامر الثالث فحكمه ايضا كالاول يخاف عليه الكفر لان اهانة الامور التي ثبت وجوبها
من الشرع على وجه الرد والانكار كفر فان الصلح والعدل والانصاف كلها واجبة وكذا اضدادها
اى الجدل والظلم والجور كلها محرمة شرعا وقس عليها الضمان ايضا قال ابن نجيم في البحر
ج ١ ص ١١٩ وفي المسايره ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بالفاظ كثيرة
وافعال تصدر عن المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين الخ اه واما الامر الرابع
اهانة اللحية بكونها معفاة طويلة كذلك كفر صريح لان اعفاءها واجب ثابت بالسنة وهو
من اعظم شعائر الاسلام واوضحها وعده النبي صلى الله عليه وسلم من سنن
نبينا ابراهيم عليه السلام وجعل هذه الامور انها مفضية الى الكفر لا يليق بان يكون
مذهبا كما نص بذلك في الهندية ص ١٣٥ ومن اتى بلفظة الكفر وهو لم يعلم انها كفر الا انه اتى بها
عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا للبعض ولا يعذر بالجهل كذا في الخلاصة اه
وفي الرد على الدر ج ٣ ص ٢٢٨ اى تكلم به باختياره غير قاصد معناه .... لان التعمد
ان كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكما لان الشارع جعل بعض المعاصي امارة
على عدم وجوده اه والقول الفصل في هذا الباب انا لا نحب ان نقول لاحد
من اهل القبلة وان صدر عنه بعض مفضيات الكفر انه كافر " بل علينا ان نامره بالتو
والاستغفار وتجديد النكاح احتياطا ولا يسعنا شرعا ان يرغب عن هذه الامور الضرورية
هذا ما خطر بالبال والله عليم بحقيقة الحال

وها انا العبد قصير الباع
قليل الاطلاع ابو البركات
محمد فضل الله عفا الله عنه
١٦ ربيع نبو ١٩٣٦ الميلادية

الجواب صحيح والمجيب
عبد الغفار باري عفي عنه

ماقولكم رحمكم الله تعالى فى هذه المسئلة : —

زيد تزوج هندا فولدت لستة اشهر من يوم نكاحها - فظن زيد ان هذا الولد ليس منه - بل بان عليها قبل نكاحه اياها ظانا ان مدة الحمل لاتتم بالستة - فان غالب مدة الحمل فى هذه الديار تسعة اشهر - وقل ماتكون ثمانية او عشرة - فهم يظنون ان تكميل اعضاء الجنين ونفخ روحه وصلب اعضائه مما لايكون فى اقل من الثمانية - فزوج زوجته واستفسر منها فى الولد من هو ؟ فقالت زنى بى زوج امتى فلان قبل النكاح - اما هذا الفلان ينكر ذلك ويقول هى كاذبة قذفتنى بالزنا وانا برئ منه - فاجيبوا رحمكم الله تعالى من مسائل الذيل

(١) ماحال نسب هذا الولد ؟

(٢) هل هذا الفلان ملزم بالزنا لقولها وهو منكر — ؟ وهل لزمه التعزير بعد الانكار لبراءته من الاتهام المذكور ؟

• • • • • •

الجواب

والله الموفق والمثيب المعين

(١) الولد المذكور ثبت نسبه من زيد شرعا لانه فى الشرع فان اقل مدة الحمل ستة اشهر فى الشرع وان شذ وقوعه فى هذه الدوار فشذ اجماعا بعدهم وقوعه خلافا لما يظنه من الجهل قد ثبت هذا بحديث النبى صلى الله عليه وسلم - قال المولى شمس الدين التمرتاشى فى جامع الرموز اقل مدة استقرار الحمل اى حمل المرأة مما فى البطن من الولد ستة اشهر يومية فان عشرين ومائة لنفخ الروح [illegible] كما فى الحديث فلو جاءت بولد لاقل من ستة اشهر من وقت النكاح لم يثبت نسبه لتيقن العلوق قبل النكاح كما فى الكافى انتهى قال العلامة العينى فى شرح الكنز من قال ان تحقق ان الفرقة خلافة فهى طالق فنكحها فولدت لستة اشهر منذ اليوم يكون لازم نسبه لانها فراش وهو متصور انتهى ففى هذه المسئلة المسئولة نفى زيد نسب الولد منه و وهذه زوجته صدقته فى نفى الولد فلا حد ولا لعان وهو ولدها وحولها باطل شرعا - قال العلامة العينى فى شرح الكنز فى باب اللعان ولو صدقته فى نفى الولد فلا حد ولا لعان

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর প্রদত্ত ফতওয়া

وجود ولد مما لان النسب انما ينقطع حكما اللعان فلم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقان في
ابطاله وفي الفتاوى التمرتاشية في باب اللعان ولو نفى ولد زوجته الحرة فصدقته فلا حد ولا لعان
وهو انما لا يحدان على نفيه كذا في الاختيار شرح المختار ايضا فيها قال اصحابنا لثبوت النسب
ثلث مراتب - احدها النكاح الصحيح وما هو في معناه من النكاح الفاسد والحكم فيه انه يثبت
النسب من غير دعوة ولا ينتفي بجرد النفي وانما ينتفي باللعان فان كانا من لا لعان بينهما
لا ينتفي نسب الولد كذا في المحيط انتهى وفي البحر الرائق اي يثبت نسب ولد المنكوحة حقيقة
اذا جاءت به لستة اشهر او اكثر من وقت التزوج بلا خلاف بين الشيخين اما بالسكوت
من غير اعتراف ولا نفي له واما بشهادة القابلة عند انكار الولادة لان الفراش قائم
والمدة تامة [illegible] او انكر حتى لو نفاه لا ينتفي الا
باللعان لكن اللعان قد سقط في هذا المقام لتعذر يقينها اياه في نفي الولد فلزم نسب الولد
منهما كما مر فلا اعتبار لانكاره فيه - بل لا ينقطع نسب الولد بلعان اللعان ايضا حتى يصرح القاضي
بقطع نسبه منه بعد اللعان في البحر وان اردى عن ابي يوسف رح انه لا بد ان يقول قطعت
نسب هذا الولد عنه بعد ما قال فرقت بينكما وفي المبسوط هذا هو الصحيح لانه ليس من ضرورة
التفريق نفي النسب انتهى

(٢) الفلان المذكور زوج اخت الهند ينكر الزامها بالزنا بل هو يدعي عليها انها كاذبة قد
قذفتني بالزنا وانا بريء منه فلا يثبت عليه ذلك اللزام - وانكار عند القاضي كاف لبراءته -
لا يلزمه القسم ههنا ولا ينبغي له قطعا - قال العلامة العيني في شرح الكنز ولا يجب ايضا باقرار
احد الزانيين ان انكر الآخر عند ابي حنيفة رح مطلقا وعندهما ان ادعى المذكر منعها الشبهة
بان قال تزوجتها فهو كما قال وان انكر بان قال ما زنيت ولم يدر ما يسقط الحد وجب على
المقر الحد دون المنكر لان اقراره صحيح فيجب ولد ان الزنا واحد وقد العدم في حق
احدهما فادرث شبهة العدم وفي الفتاوى العالمكيرية ومن اقر بالزنا بامرأة بعينها

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর প্রদত্ত ফতওয়া

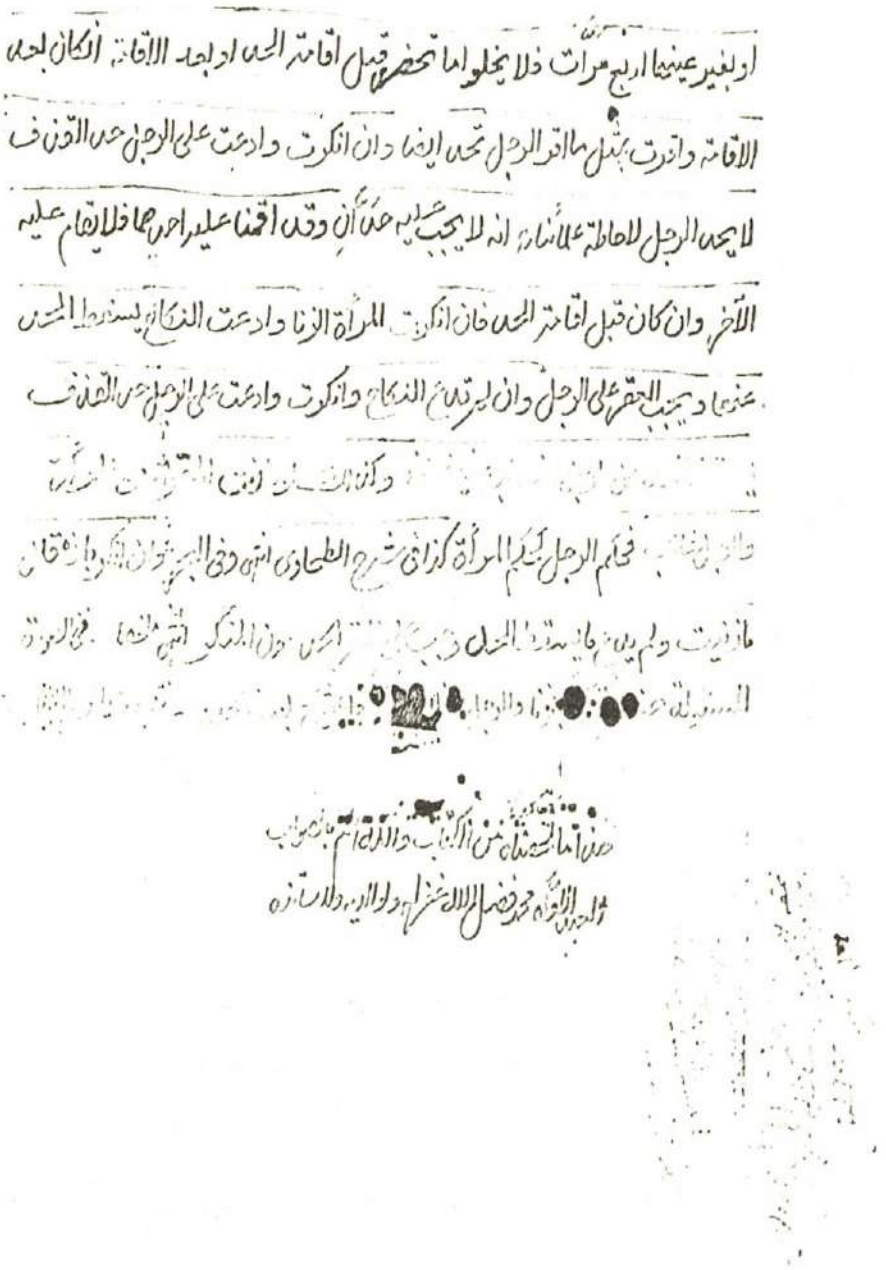

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর প্রদত্ত ফতওয়া

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর প্রদত্ত ফতওয়া

(الف)

تحریر

به مقابلهٔ سوالنامهٔ صادر شده از جانب مجلس انتظامیهٔ عالمهٔ چترتی حکیمیه پشاور

مورخه ۱۰ مئی سنه ۱۹۶۶ء

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর স্বহস্তে লিখিত প্রশ্নপত্র

(۱)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

نقل - سوالنامہ صادر شدہ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۶۶ء
توضیحات

(۱) غایت غور وفکر سے واقعیت آمیز کلمات کے ساتھ جن میں عملی اقدامات کی تلقین ہو جوابات پیش فرماویں - محض مفہومات نظریہ پر اکتفا نہ ہو -

(۲) تحریر جوابات کے وقت سرکاری امدادات وتعلقات کے تصور سے قطع نظر فرماویں پوری آزادی سے اپنے خیالات پیش فرماویں

(۳) جوابات کی تحریر میں اس کا لحاظ ضرور رہیگا کہ طلاب علوم مدارس عربیہ آزاد پاکستان جیسی اسلامی مملکت کے مسلمان باشندے ہیں

سوالات

(۱) اسلامی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ کیا اس میں دینی ودنیاوی تعلیم کا افتراق ہے - ؟

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর স্বহস্তে লিখিত প্রশ্নপত্র

(۲)

(۲) کس مقصد کو پیش نظر رکھکر تعلیم مذکور کی تشکیل و تنفیذ و ترویج
اور کس ملکہ و استعداد اور کن اوصاف کا عالم اس تعلیم سے آپ پیدا
کرنیکے خواہشمند آپ ہیں اور ہونا چاہئے - ؟

(۳) اسلامی تعلیم سے جو مقصد آپکے پیش نظر ہے موجودہ نصاب مدارس و نظام
تعلیم اسکے حصول کیلئے کافی و شافی اور کارآمد ثابت ہوسکے ؟ اگر نہیں
تو کن نقائص کی بنا پر - ؟

(۴) جس ملکہ و استعداد اور جن اوصاف و صلاحیت کے عالم تیار کرنیکا واقعی
ضرورت ہے ایسے عالم کو پیدا کرنیکے لئے فی زمانہ کن علوم و فنون کی تعلیم ہونی چاہئے

(۵) اطفال کو علوم و فنون مذکورہ در جواب چہارم کی تحصیل کے مستعد و قابل بنانے
کے لئے جو ابتدائی و داخلی تعلیم کی ضرورت ہے وہ کتنے سال کی ہو اور اس میں
کیا کیا فن کس ترتیب سے کس اسلوب پر پڑھائے جاویں ؟ (اس کا لحاظ ضرور
ہو کہ نصاب سہل التحصیل نتیجہ خیز ہو اور داخل پنجم پاس کردہ طلباء سے بہر حیثیت
یہ طلبا اعلی تر ہوں - اور داخل ششم پڑھکر امتحان دینا چاہیں بآسانی دے سکیں)

(۶) صفوف مذکورہ در جواب پنجم کی تدریس کیلئے جن اساتذہ کا تقرر ہوگا
وہ کن اوصاف و قابلیت کے مالک ہوں نیز کن شرائط کے ماتحت ان کا تقرر ہو

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর স্বহস্তে লিখিত প্রশ্নপত্র

(۳)

ساتھ ہی ان کی حتمی ذمہ داریوں کی تشریح ہو۔

(۴) جس ابتدائی انقلابی اقدام کا تصور کیا جارہا ہے اسکی خاطر جن جذبات وایثار کی ضرورت ہے جنکا فقدان سلسلۂ عمل میں کسی تاویل کا رہین منت نہیں ہوگا وہ آپ کے اندر موجود ہیں ؟

جوابات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔

تمہید

خداوند جل شانہ کا شکرگذار ہوں کہ ہمارے مدرسہ کے معزز اراکین مجلس عاملہ سب ہی ذی علم وشعور وروشن خیال، عمیق التدبر حضرات ہیں ان کے دلوں میں ایک تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ اسلامی تعلیم کیسی ہو اور جو ہو رہی ہے یہ ثمر آور کیوں نہیں۔! کن نقائص کی بنا پر۔ ؟ اسکی اصلاح کی صورت کیا ہوگی۔؟

(۴)

ہماری قوم کے اطوار زندگی معاشیاتی و معاشرتی حالات، ذہنی کیفیات
اور تزلزل فی الاعتقادات، تسفل فی الاخلاقیات نیز تلاطم ماحولیات
جن اوصاف کے مصلحین علماء کے تشنہ لب ہیں کیا ایسے افراد موجودہ
نظام تعلیم پیدا کر رہا ہے؟ جواب بلکل یہی ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔
میں تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اُن معزز حضرات کو جنہیں اون کے ذی شعور
طبع، صحیح احساسات اور عقل سلیم نے بیقرار کر دیا ہے اور وہ ایک ابتدا
آزمایشی انقلابی حرکت و اقدام کیلئے آمادہ ہو رہے ہیں۔

معزز رکن مجلس علماء عزیز مولوی سلیم خان صاحب نے ایک وقیع مراسلہ
میں اپنے اور اپنے ہمخیالوں کے خیالات کا ایک آئینہ کار ابھار میرے سامنے دیا
اس سے میری عقل غیر دور اندیش کو جن تاثرات کا سامنا ہوا اُن کو سامنے
بنا کر میں نے پہلی فوری مداوائی حرکت کی صورت میں فوراً چند سوالات مرتب
کر لیا اور حضرات مدرسین کرام کے سامنے رکھا کیا اور یوم افتتاح مدرسہ
بعد تعطیل گرما مورخہ ۴ جون ۱۹۶۶ء اتوار سے شنبہ کو ان کے جوابات داخل
دفتر کر دینے کی گزارش کر دی۔ ماشاء اللہ ہمارے اساتذہ مجمع الالوان ہے

(۵)

اسمیں جیسے سن رسیدہ، تجربہ کار، فہیم و مدبر اساتذہ موجود ہیں اس طرح

جوان پرجوش و جذبات، و آزمودہ کار، ذی استعداد ساتھی بھی مطالعات حافظہ میں

استغراق رکھنے والے حضرات بھی حاضر ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ سب حضرات

سوالنامہ مذکور کے مقابلہ میں بہترین، کارآمد، قابل عمل جوابات پیش کریں

گے۔

میں خود چونکہ قلت فرصت، ضعف دماغ اور جسمانی کمزوری کے سبب علالت

حافظہ کے مطالعات و رسائل و رسائل کے پڑھنے سے کنارہ کش رہتا ہوں چاہتا تھا

کہ جوابات لکھنے سے باز رہوں۔ کیونکہ ناآزمودگی کی حالت میں جو کام کیا جائے

اسمیں نقائص زیادہ تر رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس خیال سے کہ میرے احباب

میری معذرت کی شنوائی نہ کریں ایک جواب مرتب کر لیا۔

جواب اول

اسلامی تعلیم سے مراد کتاب و سنت کی تعلیم مع التربیت والتعمیل ہے۔ یہ ہو بہ

ہو وہ تعلیم ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو بلا واسطہ

اور تمام امت کو بالواسطہ دی ہے۔ اب صحابہ کی تعلیم تابعین کو اور تابعین

(٦)

کی تعلیم تبع تابعین کو، محدثین و ائمہ امت و علمائے امت و مدرسین طریقت
کی تبلیغ و تعلیم و تدریس و تربیت امت اسلامیہ کو سب ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت بالواسطہ ہیں اپنی امت کو۔ العلماء
ورثۃ الانبیاء۔ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ بلغوا عنی ولو آیۃ
فلیبلغ الشاھد الغائب وغیرھا نصوص کثیرہ اس پر دال ہیں

اب دیکھنا ہے کہ پس تعلیم میں ایک تعلیم عام ہے جو پوری امت پر اس تعلیم کو
حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس سے ایک انسان مسلمان بنتا ہے اور
مسلمانی زندگی بسر کرتا ہے۔

دیگر تعلیم خاص ہے یہ وہ تعلیم ہے جس سے ایک انسان خود مسلمان بنتا ہے اور مسلمانی
بسر کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں دوسروں کو مسلمان
بناتا ہے، مسلمانی زندگی بسر کراتا ہے اسوۂ رسول کو زندہ رکھتا ہے، مسلمانوں
کو اسلام پر ثابت قدم رکھتا ہے۔

اسی طرح نیابت رسول کی نوعیت بھی دو ہے۔ ایک نیابت عامہ ہے جو
اور یہ فضیلت تقریباً ہر سچا مسلمان کو حاصل ہے۔ ایک ماں جو اپنا چھوٹا سا بچہ کو
کلمۂ توحید و کلمۂ تمجید و کلمات دعائیہ سکھاتی ہے وہ بے شک اس میں

دور الطلاب في تكوين مستقبل الأمة الإسلامية،
شباب اليوم قادة الغد،
الطلاب ومسئولياتهم تجاه الأمهات الحاضرة،
الأوضاع الراهنة في البلاد ومسئوليات الأمة تجاهها،

ROUTINE

	I	II	III	IV	V	VI	VII
Saturday							
Sunday							
Monday							
Tuesday							
Wednesday							
Thursday							
Friday							

Manufactured by:

KARNAFULI PAPER PRODUCTS

166-170, SADARGHAT. CHITTAGONG

PHONE 84015

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর ব্যবহৃত খাতার ছবি

الله اكبر

পাকিস্তান- জিন্দাবাদ- কোরআনী শাসন- কায়েম

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

امابعد :

জনাবে- সদর, হযরাত্ মেহমানানে মোহতরম্- ও উপস্থিত মুসলমান ভাইগণ!

আমি- কর্তব্য-বোধে- সর্ব্বাগ্রে কয়েকটি কথা আপনা-দের সম্মুখে- আরজ করিতে বাধ্য। কথাগুলি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিবেন- যে কিসের জন্য- বাধ্য হইয়া- এই সভা- আহবান করা হইয়াছে। প্রথম কথা হইতেছে- পাকিস্তানের জন্ম বৃত্তান্তের আভাস। খোলাফায়ে রাশেদার যুগের পরিত্র কোরআনী শাসন- প্রচলিত ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করিবার অটল- সঙ্কল্প, অজেয় মনোবল; অদম্য উন্মাদ উদ্যমের সহিত ভারতবর্ষের ৯০ কোটি মুসলমান- জান-মাল- কোরবানী দেওয়ার দৃঢ় পন করিয়া- মুসলিম লীগের হিলালী পতাকা-তলে- জমায়েত হইয়া মুক্ত কণ্ঠে দাবী করিয়াছিল- আমরা পাকিস্তান চাই। আমরা পাকিস্তান হাসেল করিবই। যে-কোন বিনি মূল্যে দুনিয়ার বুকের উপর একটা আদর্শ হুকুমত আমরা কায়েম করিয়া খাল্লাহুর জমিনে আল্লাহুর কানুনের আইন কানুন জারী করিয়া ২জরত আবু বকর ছিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতের নমুনা- বিশ্ববাসীর সম্মুখে- পেশ করিব। অনুদার, পরশ্রীকাতর, সঙ্কীর্ণমনা, মহা-লোভী, শক্তিশালী সংখ্যা-গুরু প্রতিবেশী জাতির শত বাধা, বিদ্বেষ, ছল-চাতুরী, হুমকী ও অত্যাচার এবং চির-ইসলাম বিদ্বেষী, বিকট-কপটী শামক-মণ্ডলী- ফিরিঙ্গীদের কত ষড়যন্ত্রকারী, কারসাজী কত ষোনাজেকী তখন- চলিয়াছিল। কিন্তু কোরআনী হুকুমতের অনুরাগী মুসলমানগন

ضربت مؤمن ۔ ۔ ۔

আল্লামা এজাজ মরহুমের ভাষায়—

توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے + آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا
باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم + سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا

হিন্দুস্থানের ৪ কোটি মুসলমান মাইরাফির ভালভাবেই জানা ছিল যে ভারত বিভক্ত হইয়া হিন্দুস্থান, পাকিস্তান হইয়া গেলে তাহাদের জান মালের উপর এক ভীষণ বরপা না হইয়া যাইবে না। তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা দৃঢ় কণ্ঠে পাকিস্তান প্রস্তাবকে সমর্থন করিলেন। শুধু আল্লাহর পাকের ও তাঁহার রছুলের মোহব্বতের কারণে ও ইছলামী state এর প্রেরণার দ্বারায়ই এতদূর সম্ভব হইয়াছিল।

মরহুম কায়েদে আজামের ওয়াদা বানী ও কোরআনী হুকুমতের ওয়াদা মুসাবাদাদি এই সাব্য ও আমাদের কর্ণকুহরে বাজিতেছে।

সংখ্যা, শক্তি, শিক্ষা, দৌলত সর্ব বিষয়ে দুর্বল মুসলমান ঈমানী শক্তির বলে দুইটি প্রবল বিরোধী শক্তিশালী জাতির মোকাবেলায় পবিত্র কোরআনের মোজেযা স্বরূপ জয়লাভ করিতে সক্ষম হয়, তাহাতেই হইল পাকিস্তানের জন্ম।

لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مومنين -

আজ এই পাকিস্তানে আল্লাহ পাক জল্লা জালালুহুর নাযেল করা কোরআন ও হযরত মুহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ (দঃ) এর পবিত্র বানী সুন্নার বিপরীত আইন করত: আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। আর এই পাকিস্তানের জন্য হিন্দুস্থানের লক্ষ লক্ষ মুছলিম নর নারীকে নৃশংস ভাবে পশুবৎ জবেহ করা হইয়াছে, হাজার হাজার মুসলিম মহল্লা দিন দুপুরে জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সহস্র সহস্র মুসলিম নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করা হইয়াছে, দুর্বলের বাহু আতাপুরুষ,

সত্যই যদি পাকিস্তানের মধ্যে এইরূপ ভাবে কোরআন ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় তাহা হইলে তাওহীদ ও ঈমানী بنيان এ অনুপ্রাণিত أخوة المؤمنون و إنما المؤمنون إخوة এর অনুসারী মুসলিম কওম একদিন সত্যিকার খাটি ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও কওমিয়ত কে ভুলিয়া যাইবে এবং لون, বর্ণ, গোত্র, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ের পূজারী হইয়া পৃথক পৃথক জাতি গঠনে মনোনিবেশ করিবেই। তখন অবশ্যই পাঠানিস্তান, বেলুচিস্তান, সিন্ধিস্তান, পাঞ্জাবিস্তান ও বাঙ্গালিস্তানের আওয়াজ বুলন্দ হইবে। এই কথা ভুলিয়া গেলে চলিবেনা যে পাকিস্তান ইসলাম ও কোরআনের প্রধান কেন্দ্র এবং কোরআন ও ইসলাম পাকিস্তানের প্রধান কেন্দ্র। আপনারা একবার রুশ এলাকার ও গোটা মুসলমানের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করুন। ইসলামের মহান বীর পুরুষ গাজী সানওয়ার পাশা বোখারাকে কেন্দ্র করিয়া মিল্লতে ইসলামিয়ার ভিত্তিতে মধ্য এশিয়ার ভিতর এক বিরাট ইসলামী state প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করিয়া তথাকার মুসলমান গনকে জাগাইয়া তোলেন এবং ইহার জন্য জেহাদ আরম্ভ হয়। কামেমী ধর্মবাদী বাঙ্গাবাত বাসিয়ানরা মুসলমানগনের ঐক্যবদ্ধতা দর্শনে ভীত হইয়া ইহাকে ভাঙ্গিয়া খন্ড খন্ড করিবার কৌশল আরম্ভ করে। বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হইয়া তথাকার গোত্রীয় সর্দার গনকে উসকাইয়া রাজত্বের লোভ দেখাইয়া অনেকগুলি ছোট ছোট state প্রতিষ্ঠা করে। (১) তাজিকিস্তান, (২) জবুকিস্তান (৩) কাসাকিস্তান (৪) তুর্কমানিস্তান (৫) কির্গোজিয়া (৬) তাতারিস্তান (৭) আমরবাইজান ইত্যাদি। প্রচার করাহয় যে এইগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু কোন জায়গা কোন সময়ে কি ফসল হইবে তাহা ও মস্কোর সর্তার বাতীত হওয়ার উপায় নাই।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর লিখিত ভাষণের পাণ্ডুলিপি হতে

মুষ্টিমেয় সংখ্যাগুরুর হাতে হাজার হাজার মুসলমানদের সিন্ধুরা প্রাণ হারাইয়াছে, প্রায় এক কোটি লোক পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থক মুসলিম লীগের কারণে সর্বহারা হইয়াছে এবং এখনও ভারতে মুসলিম-বিদ্বেষী নীতি সবলম্বিত হইতেছে, সেই পাকিস্তানে আজ কোরআনের বর্বরতাকে আইন করিয়া মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে।

انا لله وانا اليه راجعون -

যে কোরআন ও ইসলামের বদৌলতে সারা পাঠান, বেলুচ, সিন্ধী, পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী সকলই একজান একপ্রাণ মিলিত শক্তি শালী মুসলিম কওম গঠিত ও এই ইসলামী জাতিয়তার জ্ঞান দাগিয়া সীমান্তের খান আব্দুল গফ্ফার খানের পখতুনিস্তান দাবীকে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং যেই মুসলিম কওমের মুক্তি বলে আজ ও সীমান্তের পাঠানিস্তান দাবীকে বাতিল প্রমানিত করা হইতেছে, সেই কোরআনের ইসলামের উপর আজ এই আঘাত। আল্লামা ইকবাল মরহুম সতর্কবানী প্রচার করিয়া গিয়াছেন :-

قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں
جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں

অর্থাৎ সমস্তাবে ইসলামের সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আকর্ষণে ও বন্ধনে গঠিত মুসলিম কওম! এই ইসলামের দ্বারাই তোমাদের অস্তিত্ব। যদি এই ধর্ম ইসলাম না থাকে, তাহা হইলে তোমরা থাকিবে না। ধ্বংসপতনের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। আকাশে যে অগনিত তারকারাজির মহাফিল স্থিতি আছে তাহাও তাহাদের অন্তর্নিহিত আকর্ষণের কারণেই বাহাল আছে। যদি সেই আকর্ষণ বিলীন হইয়া যায় তবে এই মহাফিলও অদৃশ্য হইয়া যাইতে বাধ্য।

P.T.O.

শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষার মাদ্রাসা-সমূহ বন্ধ, ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ, হজ্ব বন্ধ। বিশ্বের মুসলমান-গণের সহিত তাহাদের কোন প্রকার সংস্রব নিষিদ্ধ, বড় বড় শহরে মসজিদ সমূহ সিনেমাহল ও নাচঘরে পরিণত। দিবানিশী নাস্তিক-বাদের শয়তানী শিক্ষাই জারী আছে। কমিউনিষ্ট-বাপ্পারাজগণের প্রলোভনে মাতিয়া আল্লাহ, রছুল, কোরআন, হাদীছ, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, পরকাল ছাড়িয়া তাহারা পলায়নপরে। শেষকালে তিনি বোখারাতে অসহায়ভাবে দুশমন কমিউনিষ্ট দরিন্দাগণের হাতে শহীদ হন। তদ্রূপ শিখা পুর মসজিদে ফিরিঙ্গীগণ ও তাহাদের উপর হুকুমত করে এবং নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক সকেল স্কুলি ও মাদ্রাসা খালি করিয়া ছোট ছোট দুর্ব্বল state প্রতিষ্ঠিত করে এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নষ্ট করিয়া তাহাদের উপর বহুদিন হুকুমত করে। এই ভাবে আরবকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া শেষ পর্যন্ত বিশ্বের সর্ব্ব নিকৃষ্ট জাতি ইহুদীগণের হাতে পরাজয়ের লাঞ্ছনা ভোগ করাইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া যাওয়া উচিত। এই কথা অকাট্য সত্য যে কোরআন ও ইসলামকে বাদ দিয়া মুসলমান কখন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। পাকিস্তান ও টিকিয়া থাকিতে পারে না। সমস্তের সাথে তুলনা কোরআন ও সুন্নার বর্ম্মেলাপ কোন আইন আমরা চাইনা চাইনা চাইনা।

মাননীয়

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে আমাদের মেহমানগণে মোহতরম এমতাবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি তাহা বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া আমাদের রূহানী ও ইমানী উন্নতির উদ্দেশ্যে এত কষ্ট স্বীকার করত: অত্র মজলিশে তশরীফ আনিয়াছেন। আমি জামায়াত ও এতদঞ্চলের মুসলমানগণের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক-

ধন্যবাদ জানাইতেছি। আর আমাদের যে সকল মুরব্বীগণ ও উস্তাদী মুরব্বৃন্দ এই সেমিনারের আয়োজনের জন্য সাত কদম হইতে সাবাশ খাটুনী দিয়া আসিতেছেন ~~তাঁহাদিগকে~~ এবং ইহার প্রস্তাব বহন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই দোয়ার সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে, جزاكم الله تعالى جزاءً كاملاً في الدنيا والآخرة -।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

— ০ —

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর লিখিত ভাষণ, পাণ্ডুলিপি হতে

ইহা নাম ও আদর্শ মহাপুরুষ।

বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগের এমিরিটাস ডিরেক্টর, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, খানবাহাদুর আলহাজ্ব মৌলবী আহমদ হুসেন এম, এ, এম, আর, এস, এ; আই, ই, এস, প্রণীত

১ম সংস্করণ

ঢাকা —

নবনূর — নবীন মেসিন-প্রেসে,

শ্রীরাধাকান্ত রসমজুমদার মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৯২৫।

কোরআনের মাহাত্ম্য পৃষ্ঠা ৩১

বঙ্গভাষাবিদ্ [illegible] "লাইফ অব্ মোহম্মদ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "মোহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং বর্ণজ্ঞানশূন্য ছিলেন। অথচ তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ লিখিয়াছেন, মহাকাব্যগুলি, দৈনন্দিন উপাসনা, ব্যবস্থাপুস্তক ও বিরাট ধর্মগ্রন্থ। আদ্যোপান্ত পৃথিবীর [illegible] মানব [illegible] অলৌকিক সাহিত্যরস, জ্ঞান এবং [illegible] জন্য [illegible] মহাকবিদের [illegible]। এই গ্রন্থই [illegible] মোহম্মদের (দঃ) প্রধান [illegible] কর্ম [illegible] দিয়াছেন, ইহা সত্যই অলৌকিক।"

পণ্ডিতবর এবনে খোরাদাদ চতুর্থ খণ্ডে ৩২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "কোরআনের ভাষাকে সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ আরবী বলা হইয়াছে। এবং বাক্য বিন্যাস কৌশলে ও শব্দের সৌন্দর্য্যে ইহা অনুপম। ইহার নীতি শিক্ষা অতি সুন্দর। মনুষ্যগণকে ইহার অনুসরণ করিলেই ধর্ম্মলাভ [illegible] যায়।

ডীরস্টোরলি [illegible] "ইস্লাম মার্চ" গ্রন্থের ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি বাইবেল খৃষ্টানদিগের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কোরআন মুসলমানের উপর কোরআনের প্রভাব তদপেক্ষা অনেক বেশী।"

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

[illegible] 'স্পিরিট অব্ দি ইস্ট' নামক গ্রন্থের মুখপত্রে ইসলাম প্রসঙ্গে লিখেছেন,
"ইসলাম মানবকে [illegible] দ্বারা [illegible] একখানি ব্যবস্থা সংহিতা এবং [illegible] সুপরিচিত সম্প্রদায় স্থাপন প্রকাশ দান করিয়াছে।"

(পৃষ্ঠা ৭০) [illegible] আদম [illegible] বৎসর পূর্বে হযরত নূহ, ৩০০০ বৎসর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম, ২৫০০ বৎসর পূর্বে হযরত মূসা, ১৮০০ বৎসর পূর্বে হযরত দাউদ, ও ৬০০ বৎসর পূর্বে হযরত ঈসা (আ) [illegible] করিয়াছেন।

প্রত্যাদেশ (ওহী) সম্বন্ধে জার্মান পণ্ডিত [illegible]

জার্মান পণ্ডিত পরিচয় [illegible] ডি লেগার্ড তাঁহার 'নোলেডিক্ কেমরিকিয়ুই' নামক গ্রন্থে প্রথম ভাগে হযরত মোহাম্মদের প্রত্যাদেশ (ওহী) প্রাপ্তি [illegible] সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য বলিয়া লিখিয়াছেন।

"হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যে প্রকার [illegible] আমার [illegible] হইতেন, [illegible] উন্মাদ, [illegible] যে [illegible] প্রত্যাদেশ [illegible] ইহার বিপরীত—"

[illegible] মন্তব্য করেন "হযরত মোহাম্মদ (দঃ) উন্মাদ ছিলেন না তাহা অনেকে বিশ্বাসযোগ্য। বিংশবর্ষাধিক [illegible] প্রকাশ [illegible] (দঃ) মোনিবন্ধুর [illegible] দৌত্যে [illegible] উন্মাদ রোগ [illegible] শক্তি দ্বারা [illegible] পারে যে স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধি জন্য তাঁহার সদ্গুণ বিখ্যাত তাহা তাঁহার সহিত সংযোগ করিলে পাই। আত্ম-সম্মান জ্ঞান, সূক্ষ্মবুদ্ধি, [illegible], মানসিক সমতা, এবং অন্যের কর্তৃত্ব তাঁহাতে [illegible] বিদ্যমান ছিল। এই সমস্ত গুণাবলী [illegible] প্রভু ব্যক্তিতে [illegible]। [illegible] তিনি পরমেশ্বর হইতে ব্যবস্থাপক এবং শাসন-কর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত [illegible] বটে, কিন্তু তিনি আত্মার [illegible] ইহার [illegible] স্বীয় [illegible] [illegible] সত্যের [illegible] আছে। [illegible] এবং প্রত্যাদেশ যে [illegible] প্রকার [illegible] প্রস্তুত করে

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

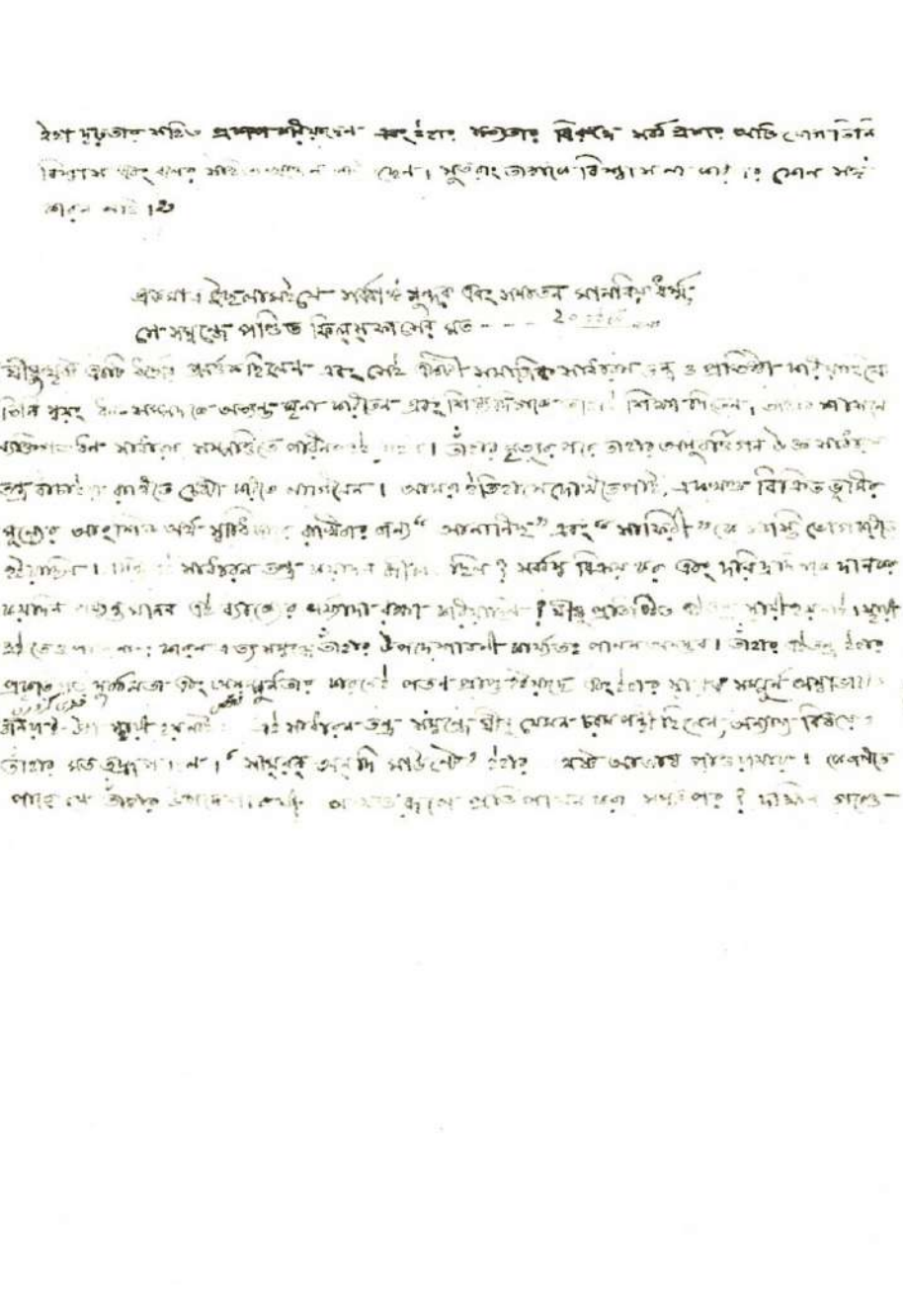

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

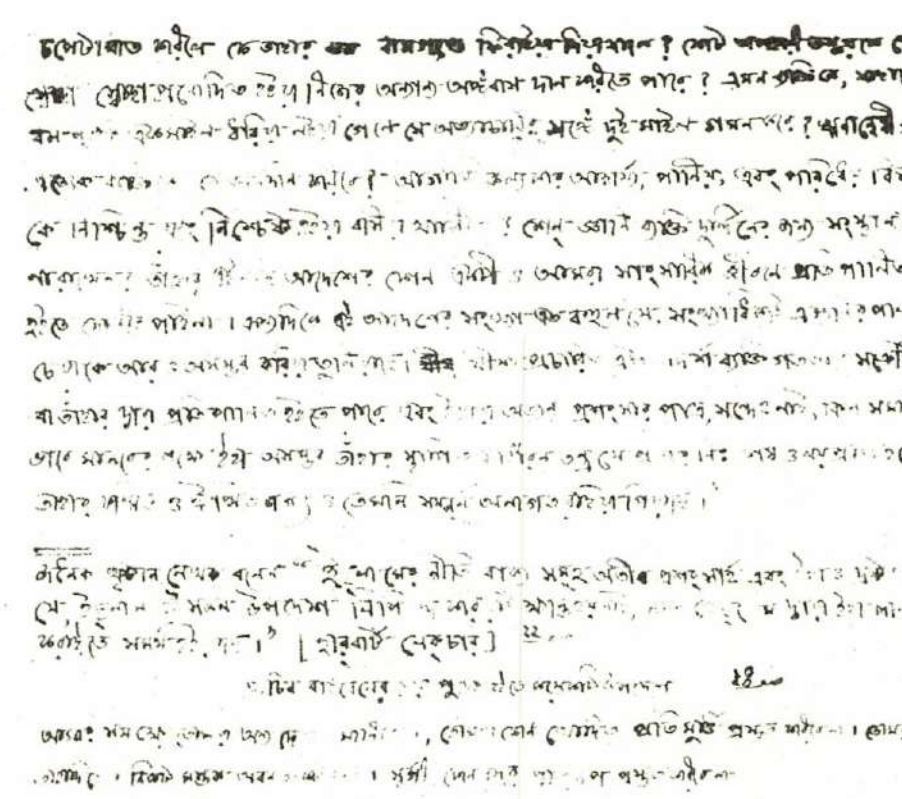

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

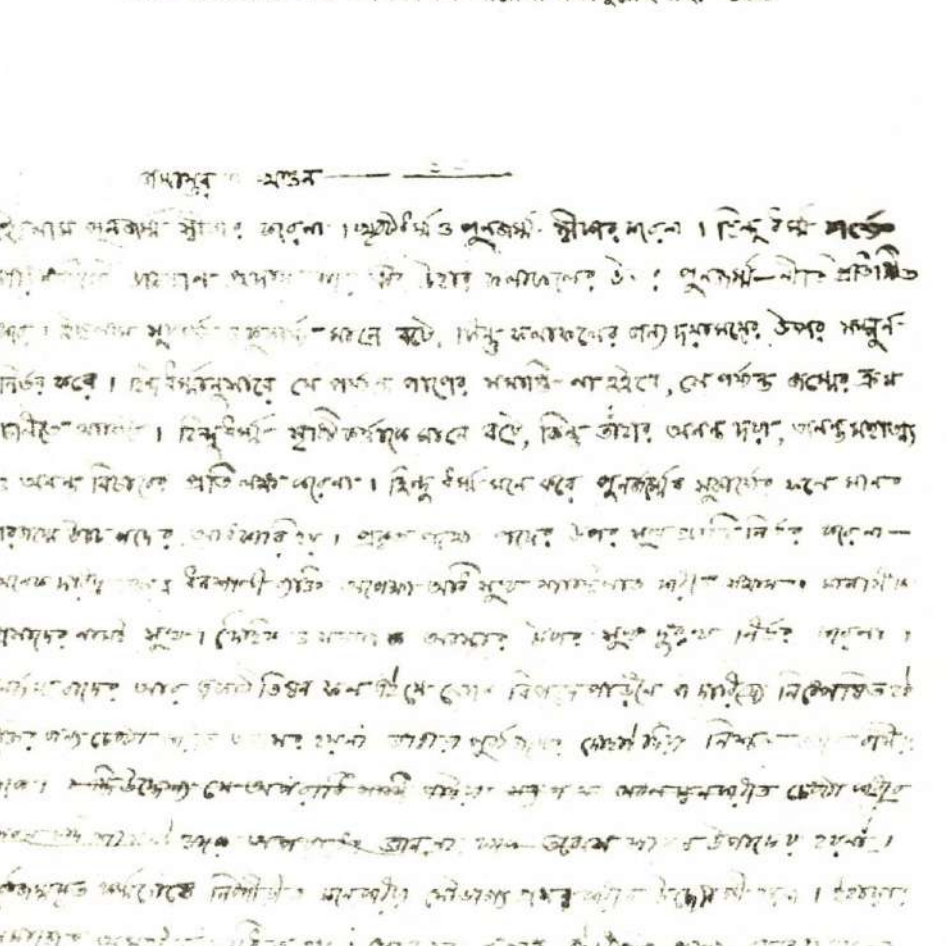

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

বৃটেনরাজ-ওমলা কর্তৃক প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা

ইসলামের সভ্যতা অষ্টম শতাব্দীতে ও বৃটেনরাজ ওমলা বিশেষজ্ঞ উলামা এইমাত্র তাহার প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রা নীতি তাহার রাজত্বকালে প্রচলন। তিনি ৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃটেনের একটি অধীশ্বর ছিলেন। তৎকালীন প্রবর্তিত রাজমুদ্রার অনুলিপি সকল পার্শ্বে প্রদত্ত হইল। উহার বাম পৃষ্ঠায় কলেমা শাহাদাত ও খোরতবার আয়াত আছে। আর পৃষ্ঠায় তাহার মোহর গুলির নাম, রাজার নাম, মুদ্রা প্রাপকের নাম লিখিত আছে।

মুদ্রার ২ পিঠের নকশা

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

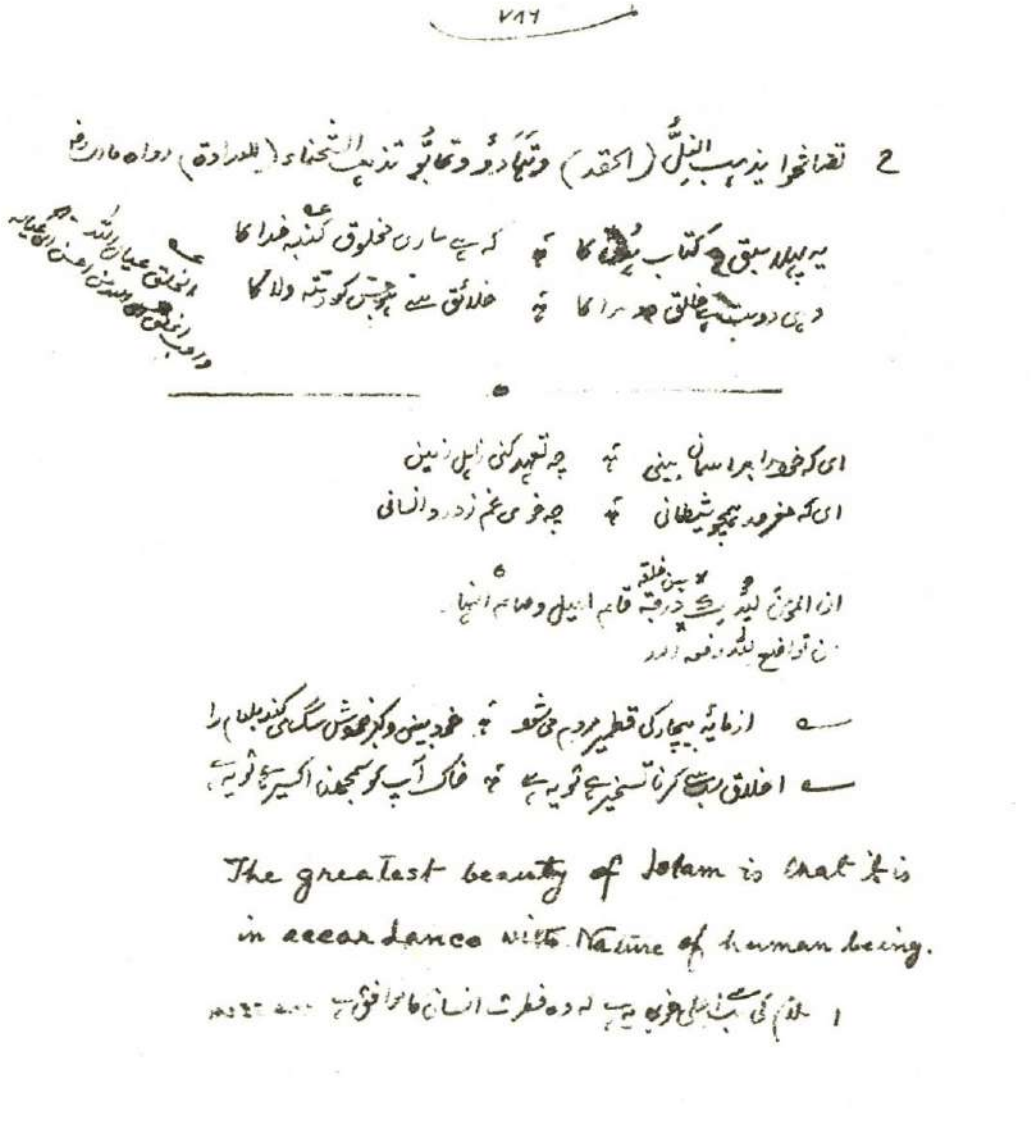

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

خدائی شان

بگوش گل چہ سخن گفتہ کہ خندان ست — بعندلیب چہ فرمود کہ نالان ست
بماہ نو چہ فسون خواند کہ رخشان ست — بروح بود چہ اندوہ کہ گداز ان ست

رباعی

چہ غم بسینۂ دریا بیکران دادی — کہ درد ماہ فلک در دلش بہ طغیان ست
چہ آتش سر کہ او کشید ہمی بینم — کہ تند و جزر از و در جہان بیکران ست

جنون کہ بہ ابر بہاری غلیان ست — بخنده برق زن و ہم بگریہ باران ست

افزونش ہمہ تنبیہ خداوند دل ست — دل نداود کہ ندارد بخداوند اقرار
ہر کہ امروز نہ بیند اثر قوت او — غالب آنست کہ فردا ش نہ بیند دیدار
کہ تواند کہ دہد میوہ رنگین از چوب — یا کہ داند کہ برآرد گل صد برگ از خار

اک امر کن سے تو نے سارا جہان بنایا — ارض و سما بنائے کون و مکان بنایا
ابتک نہ یہ معاملہ ہو سکا کسی سے — ہستی کو تو نے کیسا راز نہان بنایا
لب میں سخن سخن میں تاثیر تو نے بخشی — منہ میں زبان زبان میں حسن بیان بنایا
محو ثنا ہیں ہیں رعنا باغ تنہا — ہر برگ ہر شجر کو تسبیح خوان بنایا

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

ح لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس (بخاری و مسلم)

ح - الراحمون یرحمہم الرحمٰن - ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء (ترمذی)

ح رحم و مہربانی تم اہل زمین پر ح خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر

ح خدا رحم کرتا نہیں اس بشر ح نہ ہو درد کی چوٹ جسکی جگر پر

(ساد)

آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئے قوم حجاز

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

Mr. Shukumaran, Tayaga leader বলেন:-

Islam alone is the centre of hope for the untouchables.

Mr. H.P., P.H.D. হরিপ্রসন্ন- পি, এচ, ডি বলেন:-

If Mohammad was not a massenger of God, then I can say God never sent a Prophet.

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

قال الرابعة البصرية - بلاء المحب عندي نعمة

قال النبي صلى الله عليه وسلم - البلاء كنز من كنوز الله تعالى لا يعطى الا اولياءه

قال النبي صلى الله عليه وسلم - ان الله تبارك وتعالى اذا ابغض عبدا بعث اليه ملكا فقال ظاهر عليه نعمتي فاني ابغضه وابغض صوته وابغض ان يسألني ويدعوني واذا احب عبدا بعث اليه ملكا بالغ عليه مصائبي - فاني احبه واحب صوته و احب ان يسألني ويدعوني — ۱۲

حضرت شفيق بن ابراهيم البلخ گفت — اصحب الناس كما تصحب النار - خذ منفعتها و احذر ان يحرقك — ۱۲

حضرت ابو تراب عسكر محمد خراساني گفت — اذا تواترت على احدكم النعم فليبك على نفسه فقد سلك غير طريق الصالحين - ۱۲

سئل معروف كرخي عن المحبة فقال — المحبة ليست من تعليم الخلق انما هي من مواهب الحق وفضله

قال معروف كرخي - احذر ان تطلب الله الا في زي المسكين

قال عليه الصلاة والسلام - الايمان نصفان - نصف صبر ونصف شكر

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

گرونانک جی فرماتے ہیں - (ترجمہ خواجہ کمال الدین)

The age of the Badas and Purans is gone by.
Now the Quran is only book to guide the world.

মহাকবি ইকবাল বলেন :-

راج سینت پھر پرت دکھائے - آپن مت سب کا سمجھائے - بیچ ایم کوئی بیچ ادھارا - بیچ ابا اون کچھ
تت سلام کوئی - بنا محمد بار نا ہوئے - ما پر سلام جان نہ ہوئے - تلسی بچن لت لت کوئے

(اخر دھارمین بانی کتاب)

—•—

প্রফেসার আর্নোল্ড বলেন :-

The greatest of the religions in the world that advocates the unity (توحید) of God is Islam.

প্রফেসার ইংরেজী ভাষায় চারশো বছর পূর্বে ইউ ভাষায়ীর বলেন :

It was a unique mode in which the Prophet mohammad had established the unity of God.

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

واقعة — على بن فضيل عياض كان رجل زاهداً عابداً خائفاً - كان هو يوماً
فى المسجد الحرام - قرأ قارئ عند زمزم - ويوم القيامة ترى
المجرمين ناكسوا رؤوسهم الآية حين سمع هذه الآية زعق
زعقاً شديداً ومات - قال شيخ الاسلام من مات
عشيقاً فليمت هكذا لاخير فى العشق بلا موت

تفسير كبير — الروح عند الله العرش مبدأه — وتربة الارض اصل جسم البدن
قد الف الباري الحنان بينهما — ليصلحا لقبول الامر والمحن
فالروح فى غربة والجسم فى وطن — فاعرف مقام الغريب النازح والوطن

قالت الرابعة البصرية — وعزتك ما عبدتك خوفاً من نارك ولا رغبة فى
جنتك - بل كرامة لوجهك الكريم ومحبة فيك

— تيغ لا در قتل غير حق براند — در نگردان پس كه غير الله ماند
— ماند الا الله باقى جمله رفت — شاد باش اى عشق شركت سوز رفت

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

ہرگز نم باور نمی آید ز روی اعتقاد ۔ این ہمہ ہا گفتن و دین پیمبر داشتن

ع - اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے - (اسباب غرض علما و جہلا تصوف و امارت طلب سرمایہ داروں نے اسلام کو زخمی کیا۔)

بت گر بنی آرزو خدائی کی ۔ یہاں دیکھو یہ کبریائی کی — (پیران جعلی تو بیا دعوے آنرا می کنند۔)

غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھکو آتا ہے نظر ۔ دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہتیر بھی — (عیب خود نہ بیند تنقید دیگران کنند)

لو کان فی العلم من دون التقی شرف ۔ لکان اشرف خلق اللہ ابلیس

از آن طرف نشود قطرۂ ز دریا کم ۔ وزین طرف برسد تشنہ بسیرابی

پری نہ ہفتہ رخ و دیو در کرشمہ و ناز ۔ بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بوالعجبی ست

چہ یابد مرد را طبع بلند ست مشربے تابے ۔ دلے گرمے نگاہے پاک بینے جانے بے تابے

واعظ قوم بنی وہ پختہ خیالی نہ رہی ۔ برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی

رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی ۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

قال الله تعالى - قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد -

نصاریٰ کی مانند دھوکا نہ کھانا — کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا
بنانا نہ تربت کو میری صنم تم — نہ کرنا مری قبر پر سر کو خم تم
مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی — کہ بندہ بھی ہوں اسکا اور ایلچی بھی

توراۃ باب ۳۳ — تجلی الرب من طور سیناء (فی نبوۃ موسیٰ علیہ السلام)
الکتاب الخامس — وتبارق من ساعیر (ساعیر مولد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام)
وتظاهر من جبال فاران (فی نبوۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

کتاب حبقوق نبی علیہ السلام باب ۳ آیت ۳ — تجلی اللہ تعالیٰ من یمین (نبوت حبقوق علیہ السلام) وتعالی القدس
من فاران - فظهر على السموات وملأ الارض من محامده (رسالۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

نہاں ابر ظلمت تھا مہر انور — اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر

پادری نے پیش کیا - کہ عیسیٰ مصطفیٰ اعلیٰ ہے - کہ این بزرگ زمین دفن و آن بالا آسمان ہے
جواب شاہ عبدالعزیز رح - گفتش کہ این حجت قوی باشد - جائے بہر آب و گہر نہ دریا ست •

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

نتیجۂ غرور

ارأیتم ان اصبح ماءکم غوراً فمن یأتیکم بماء معین قال منافق غرور

فجرحه بالمعول والمعین فلما رام المنافق فی الیل لقتله شخص

وقال فذهبت بماء عینیك فاخرجه بالمعول والمعین وصار

المنافق اعمی من ذلك الیوم - ۱۲

مثنوی

هر که او در پیش این شیر نهان - بے ادب چون گرگ بگشاید دهان

همچو گرگ آن شیر بر درّاندش - فانتقمنا منهم بر خواندش

الٰهی غرق دریای گناهم — تو میدانی و خود هستی گواهم

گناه بے عدد را بار بستم — هزاران بار توبه ها شکستم

گدا خود را اگر سلطان چو دیدم — بدرگاه تو اے رحمان دویدم

بحق آنکه او جان جهان ست — فدائی روضه اش هفت آسمان ست

بذات پاک خود کان اصل هستی ست — از و قائم بلندیها و پستی ست

دلم را محو یاد خویش گردان — مرا حسب مراد خویش گردان

گناهم را تو خود دیدی نگرم — بعفو و فضل خود ای شاه عالم

وصلی الله تعالی علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه وسلم

تو غنی از هر دو عالم من فقیر — توبهٔ این بندهٔ مسکین پذیر

نیست ما را جز تو ای [illegible] — هیچ کس [illegible] آمرزگار

আসম - মুজরিম গুনাহগার

خطاب به بندهٔ نادم و تائب و مشتاق و آه و زاری کنان

آ بندهٔ اندوهگین — از کرده‌ها بیش شرمگین — نادم ز بس تائب حزین — باز آ بباغ رحمتم

گریان و لرزان گشته — خونبار دل بس خسته — شرمنده و بس بسته — باز آ بباغ رحمتم

آ بلبل خوش نغمه خوان — آ عندلیب گلستان — با آه دل نالهٔ کنان — باز آ بباغ رحمتم

آ بندهٔ اندوهگین

آ بندهٔ

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

حدیث — لاتزول قدما عبد (یوم القیامة) (علی الصراط) حتی یسئل عن اربع - عن عمره فیم افناه
وعن علمه ماذا عمل فیه وعن ماله من این اکتسبه وفیم انفقه وعن جسده
فیم ابلاه ۱۲

قال عمر بن احمد بن محمد — انت فی غفلة الامل - لست تدری متی الاجل - لاتغرنک صحة - فهی من اوجع العلل -
کل نفس لیومها - صبحة تقطع الامل - فاعمل الخیر واجتهد - قبل ان یمنع العمل -

— المال ینفذ حله وحرامه - یوماً - ویبقی فی غیر آثامه

قال صلی الله علیه وسلم اذکما قال — من طلب مما لم یخلق اتعب نفسه ولم یرزق فقیل وما هو یا رسول الله
قال سرور یوم بتمامه - ۱۲

قول حکما - الجنة راحة بحتة وسرور محض - والنار الم محض وشدة بحتة
والدنیا معجون مرکب من السرور والالم

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

نالہ کردیم کای تو علام الغیوب — زیر سنگ مکر بد ما را مکوب
یا کریم العفو، ستار العیوب — انتقام از ما مکش اندر ذنوب
گرسگی کردیم آ شیر آفرین — شیر را مگذار بر ما زین کمین
عهد ما بشکست صد بار و هزار — عهد تو چون کوه ثابت برقرار
در عدم کی بود ما را خود طلب — بے سبب کردی عطاهای عجب
جان و نان دادی و عمر جاودان — سائر نعمت که ناید در بیان
بے طلب تو این طلب مان داده — گنج احسان بر همه بگشاده
با طلب چون ندهی ای حی و ودود — کز تو آمد جملگی جود و وجود

اتنا فی دار دنیا نا حسن — اتنا فی دار عقبا نا حسن
یا غیاثی عند کل کربة — یا معاذی عند کل شهوة
یا مجیبی عند کل دعوة — یا ملاذی عند کل محنة
این دعا بشنو ز بنده کاگدا — شربتے بے رنج روزی کن مرا
رزق را میران بسوی این حزین — ابر را باران بسوی هر زمین
کاهلم چون آفریدی ای ملی — روزیم ده هم راه کاهلی
طفل را چون پا نباشد یاورش — آید و ریزد وظیفه بر سرش
روزیے خواهم بناگه بے تعب — که ندارم من ز کوشش جز طلب

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

(১) مرض موسى ع واشتد وجع بطنه فشكا الى الله تعالى فدله على عشب في المغارة فاكل منه
فعوفي باذن الله تعالى. ثم عاوده ذلك المرض في وقت آخر فاكل ذلك العشب فازداد مرضه فقال
يارب اكلته اولا فانتفعت به واكلته ثانيا فازداد مرضي فقال له لانك في المرة الاولى ذهبت
مني الى الملأ. وفي المرة الثانية ذهبت منك الى الملأ. اما علمت ان الدنيا كلها سم قاتل و
ترياقها اسمي (في بركات بسم الله الرحمن الرحيم) تفسير كبير

(২) باشث رابعة ليلة في التهجد والصلوة فلما انفجر الصبح ماتت فدخل السارق دارها واخذ ثيابها وقصد الباب
فلم يهتد الى الباب فوضعها فوجد الباب. ففعل ذلك ثلث مرات فنودي من زاوية البيت ضع
القماش واخرج فان نام الحبيب فالسلطان يقظان - (تفسير كبير) (في بركات بسم الله)

(৩) كان بعض العارفين يرعى غنما. وحضر في قطيع غنمه الذئاب. وعمى الاقتراغنامه. فمر عليه رجل وناداه متى
اصطلح الذئب والغنم. فقال الراعي من حين اصطلح الراعي مع الله تعالى. (كبير في بركات بسم الله)

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

ے بوئے خسرو اقلیم دل شیریں زبان ہو کر ؟ جہانگیری کریگی یہ ادا نور جہاں ہو کر

---

۵) یہودی آمد تقاضای دین کرد - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمود "کہ ہنوز اجل مقررہ دین نرسید صبر کن
تا دین حال شود - یہودی گفت - "أَنْتُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تُعْدُونَ بِالْكِذْبِ" صحابہ
بجوش آمدند وقصد ہلاکش کردند - فَسَكَّنَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعاهم الی الحلم والصبر -
یہودی گفت جملہ علامات نبوت ورسالت در تو شناسائی کردم واین یک علامت باقی بود
کہ اکنون در تو شناسائی کردم - کہ ہرچند جہل وبے ادبی کردہ آید از نبی حلم وعفو افزاید -
فاسلمت الآن واشهد ان لا إله إلا الله وانت رسول الله -

ے آفاقہا گردیدہ ام مہر بتان ورزیدہ ام - بسیار خوبان دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری
ے زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم ؟ کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجاست

آلامہ فضل اللہ کے دو تصورات کے نمونے

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

১ بار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در نماز می گریست و می گفتند :-

اَلَمْ تَعِدْنِیْ اَنْ لَّا تُعَذِّبَهُمْ وَاَنَا فِیْهِمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ

شرح غرر السعادت صفحہ ۴۹۰

۲ در بعضے غزوات انگشت پائے مبارکش را سنگ رسید و خون روان شد - فرمود

هَلْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِیْتِ + وَفِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ مَا لَقِیْتِ

شرح سیر السعادت صفحہ ۲۸۹

یکنوبت از انصار سے چہل صاع خرما قرض بسلف (بقرض) خرید - عند الاحتیاج بخدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ "چیزے حاضر نیست" خواست تا سخنے گوید فرمود اغلظ الساق والاثقل الاخیرا (الامکان) کہ بہتر نیست کسے کہ سلف گرفت منع - پس چہل صاع دیرا بانصاف و چہل صاع خود ادا داد -

(عجیب است آن درشتی و نیز انصاف)

قطعہ

جان فدائے تو کنم ای جان جان ؛ ای عظیم الخلق ای مرغ جہان

جملہ عالم گشتہ بیدیک نگاہ ؛ ای حسینان جہان را زاو پناہ

زان طرف سختی درشتی ناکسم ؛ زین طرف انصاف و نیز مردی

۴ - غریبے آمد و تقاضائے سخت با درشت کلامی کرد - عمر بن الخطاب خواست تا ویرا تادیب کند - نقاش النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم یا عمر کنت اتوجع ان تامرنی بالوفاء - وکان (هو) اتوجع ان تامره بالصبر (اسوۃ فی المیعاد)

تمام مذاہب عالم دعوائے توحید الٰہی کرتے ہیں
لیکن اسکو ایسا غلط کر دیا کہ توحید ہی باقی نہ رہی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلق تنبیہ فرمائی -

قولہ تعالیٰ - قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ -

نصاریٰ کی مانند دھوکا نہ کھانا ؛ کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا
بنانا نہ تربت کو میری صنم ؛ نہ کرنا مری قبر پر سر کو خم
مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی ؛ کہ بندہ بھی ہوں اسکا اور ایلچی بھی

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

بعد وفات حضرت شاہ نظام الدین اولیا انکے جنازہ مقبرہ کو لئے جا رہے تھے۔ پیچھے بڑی جماعت چلی جا رہی
ایک سالک مجذوب انکے مریدان میں سے پروانہ وار جا رہے تھے اور پڑھتے تھے

سرو سیمینا بصحرا میروی سخت بیمہری کہ بے ما میروی
آفتاب گاہ عالم روی تو تو کجا بہر تماشا میروی

کفن اندر سے دونوں ہاتھ نکال کر بلند کیا۔ جماعت عظیم نے یہ خرق عادت دیکھکر متعجب ہوئی۔ انکا پڑھنا
بند کر دیا گیا۔ دونوں ہاتھ کفن اندر چلے گئے۔ سبحان اللہ وحدہ۔

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

Sir P. C. Ray.

Islam has made universal progress from the borders of the pacifice Ocean to those of the Atlantice on account of its Catholice and liberal policy.

মহাত্মা গান্ধী-

যখন পাশ্চাত্য জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, তখন প্রাচ্য জগতে এক মহান ব্যক্তির উদয় হয়। যিনি বিশ্বের বিভিন্ন অংশে প্রেম, শান্তি ও প্রাণ প্রবাহিত করিয়া নিখিল বিশ্বকে সুশীতল আলোকছটায় সমুদ্ভাসিত করিলেন, তিনি আর কেহ নহে, তিনি হইলেন মহানবী; তিনি সর্বপ্রথম জগতকে সাম্য মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন।

মনু সংহিতাতে মনু বলেন-

"স্ত্রীলোক দুর্বলতা ও অসদাচরণের দুষ্টান্ত; তাই বাল্য যৌবনে পিতা-মাতা স্বামী শাসনাধীনে রাখা আবশ্যক।"

ইসলাম ও আদর্শ মহা পুরুষ পৃ: ১৮৪

ইসলাম ও স্ত্রী জাতির অধিকার:-

প্রকৃত পক্ষে মুসলিম স্ত্রীকে যতদূর অধিকার দেওয়া হইয়াছে কোন ধর্মেই তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার মতো নহে।

ইসলাম ও ধর্মান্তর
পৃঃ ১১৮। ১১৫

কোরআন সম্বন্ধে
স্যার টমাস আর্নল্ড বলেছিলেন খ্রীষ্টানরা যীশুর চেয়েও বলেন:

(1) No body can deny that it contains many beautiful sermon

(2) None has any shadow of doubt regarding the unity of God preached by the Quran.

(3) The woman had no position but the Holy Prophet established their position.

হযরত ফাতেমা

বাহতেন:— "তোমার আকাঙ্খা- তোমার স্বামীর আকাঙ্খার-
অনুসরন করিতে। তিনি- তোমার উপর প্রভুত্ব
করিবেন।"

হিন্দু শাস্ত্রে:- (১) "কি স্ত্রী তোমার? কনকরত কামনা"
অতএব, মুক্তি কি? [illegible] স্ত্রী।

(২) "দ্বারং কিমেকং নরকস্য? নারী"
নরকের দ্বার কি? নারী

৩) "বিশ্বাস পাত্রং ন কিমস্তি? স্ত্রী"
[illegible] বিশ্বাসের পাত্র নহে কি? [illegible] স্ত্রী

৪) "কিং তদাবহং প্রাপ্তি সুখোপমং? নারী"
কোন বিষ সুখী (নেই) মনে হয়? স্ত্রীলোক।

৫) প্রাজ্ঞোহি ধীরজন সমস্ত কোরা?
প্রাজ্ঞজন মোহে [illegible] কাহাকে
পণ্ডিত, ধীর সমদর্শী কে? জিনি, যিনি কামিনীর কাম-কটাক্ষ
দ্বারা মোহিত হননা।

৬) বিজ্ঞাগ্রগণ্য বিজ্ঞতমোহপি কোন? নার্য্যা পিশাচ্যা
ন-চ বাধিতুমা ক্ষমঃ। বিজ্ঞগণে বিজ্ঞতম ব্যক্তি কে?
যিনি, যিনি পিশাচী নারীর দ্বারা প্রবঞ্চিত হননা।

৭) কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং কি? নারী। মনুষ্য গণের
বন্ধন হেতু কি? নারী।

৮) ত্যাজ্যং সুখং কি? স্ত্রিশ্লেষ সম্পর্ক। কি সুখ-সম্যকরূপে
ত্যাগ করা উচিত? স্ত্রীসংসুখ।

[illegible]
ভক্ত তুলসীদাস [illegible]

৯) দিন্ কো মোহিনী, রাতকো কামিনী, পলক পলকে লহু চুষে।
দুনিয়া সব বাওরা খোজে খড় খড় কামিনী লোয়ে ॥

※

১) আল্‌বাত্তানী ত্রিকোণ-মিতি শাস্ত্রে "জ্যা" এর পরিবর্তে 'সাইন' 'কোসাইন' ব্যবহার প্রচলন করেন। তাঁহার উদ্যমে "ত্রিকোণমিতি" একটি স্বনির্ভরশীল শাস্ত্রে উন্নীত হয়।

২) মূছা "চাতুরস্রিক সমীকরণ" শাস্ত্র আবিষ্কার করেন। আবার তিনি "গোলক ত্রিকোণমিতি" (Spherical Trigonometry) শাস্ত্রেও একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

৩) আব্বাসদাস্সী "জাবিদ" একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া ইউক্লিডের জ্যামিতি "নক্ষত্র জ্যামিতি" শাস্ত্র পুনরুদ্ধার করেন।

(৪) মুসলিমগণ দ্বারাই অনুবাদ আরবীয় নক্ষত্র সারণীর তালিকা ও মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বজনীর উপর — অসাধারণ অধিকার স্থাপন করিয়াছেন।

বৃহৎ নক্ষত্রগুলি আরবী নামধারণ পূর্বক অদ্যাবধি — আরব পণ্ডিতগণের গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

বৎসরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য, পৃথিবীর আয়তন ফল, সৌরকলঙ্কের আবিষ্কার, সূর্যক্ষেত্রের উৎকেন্দ্রতা, ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতা হ্রাসের হার, ইত্যাদি তাঁহারাই সূক্ষ্মগণনা দ্বারা সর্ব প্রথম নির্ভুলরূপে নির্ণয় করেন।

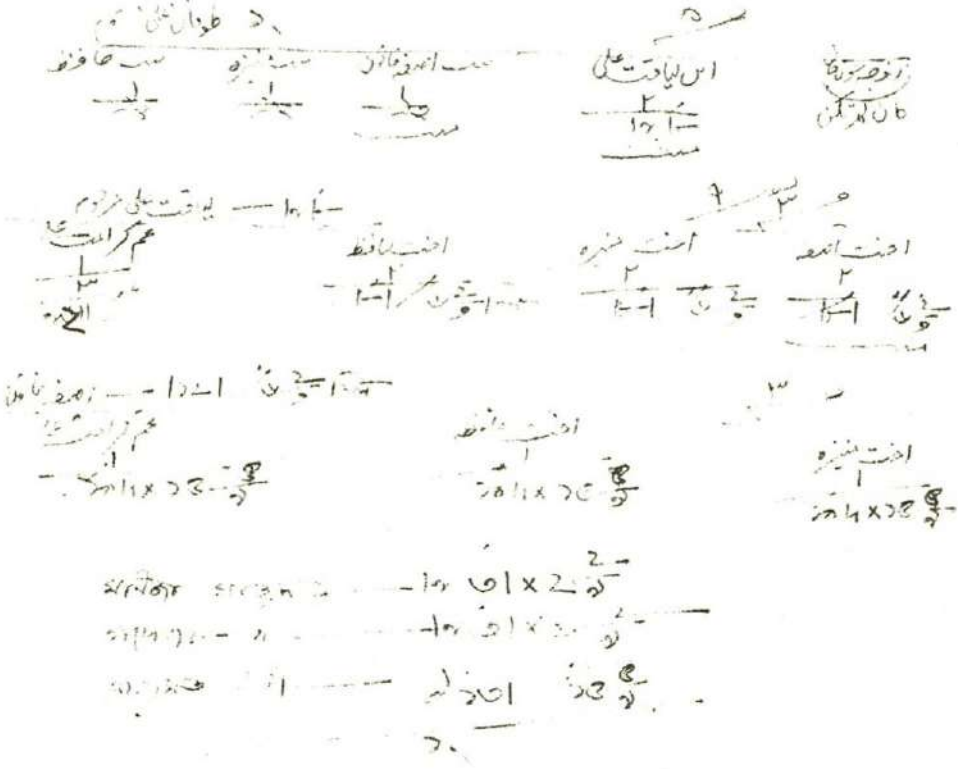

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

বৈজ্ঞানিক লেপ্লেস (Laplace) বলেন-

বাইবেলে মাত্র ধর্মনীতি আছে —

কোরআনে ধর্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শাসননীতি, সমরনীতি, বিচারনীতি, দিনলিপি আইনীতি, সামাজিক সাম্যনীতি, আর্থিক পরিচালনীতি, বাসগৃহের নীতি সমস্তই আছে।

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

সবচেয়ে দাক্ষিণাত্যে তিনি সমরক্ষেত্রে সম্রাট —

ওয়াটারলু তে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা অস্ট্রীয়ান সোলজারদের গুলিতে কর্তন, দেশান্তর, প্রাণে বিনাশ করেছে। ইসলাম ধর্ম কখনও এহেন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেনাই।

M.r. চার্লসিস্ট বলেন :-

"ইউরোপ বাসিগণ কোরআন পড়িয়াদের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিয়াছেন, যদি উহাদের প্রতি দূর, তুর্কী ও অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়গণ তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে প্রাচ্যে ইউরোপীয় ধর্ম লোপ পাইত।"

মিস্টার চেম্বার্স তাঁহার পুস্তকে বলেন পৃঃ ২২৩, ২২৪

ইসলামের আদর্শের আবিচার, অত্যাচার, অহঙ্কার, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, পরিহাস, অর্থলোলুপতা, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, ইত্যাদি দোষ হইতে দূর হইয়াছে। ধৈর্যশীলতা, মহানুভবতা ইত্যাদি সদ্গুণাবলী মানব সমাজে অধিকার পরিপাল।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক কার্লাইল বলেন:-

"ইসলাম অন্ধকারে ডুবিয়া আলোকদ্বারা চতুর্দিক সুশোভিত করিয়াছে। আরব দেশ ইহার প্রভাবে নবজীবন লাভ করে। অজ্ঞানান্ধ আরব ইসলাম গ্রহণে একশতাব্দীর ভিতর পশ্চিমে স্পানিয়া হইতে পূর্বে দিল্লির সিংহাসন পর্যন্ত সকল স্থানে সত্যের আলোকে প্রজ্জ্বলিত করে।"

তাতারী সম্বন্ধে আলোচনা।

তাহারা মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ বিশ্বাস ঘাতকতা করে। ইসলাম ও মুসলমানকে সমূলে বিনাশের কল্পনা করে। তাহাদের ষড়যন্ত্রে যুদ্ধ বা জঙ্গ হয়। যোদ্ধার বাহুতে সমস্ত শক্তি পরাজিত হয়। বিজয়ী ও নিজেই বিজিত তুল্য হয়। তাহারা সাম্যবাদ ইসলামের বিচার মানিয়া সকলে সমর্পিত করে। তিনি তাহাদের মনোনীত বিচারক। তিনি বিচার করেন যে সৈন্যগণকে হত্যা ও অন্যান্যগণকে দাস দাসী করা হউক। ইহাতে ২০০ সৈন্যগণকে হত্যা করা হয় মাত্র। ইহা দেখিয়া মহিলা সমালোচনা করে। তাহাদের অত্যাচার নামে নাই,

সেপ্টী

বিচারক ইহুদী-গণ- দ্বারাই মনোনীত হয়। অপরাধ ছিল- বিশ্বাস ঘাতকতা ও বিদ্রোহ। ক্রমওয়েলের আদেশ ক্রমে ড্রগহেডার আইরিশদিগের হাতের হাজার হত্যাকাণ্ড অসামরিক আবাল-বৃদ্ধবনিতা-সহ যদি-সমীচীন-হইয়া থাকে, বিংশ-শতাব্দিতে মাস্তুরিয়ায় অস্ত্রগত — রাশীয়োক্তে সেনাপতি কর্তৃক ৫ হাজার চীনদেশীয় স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু-হত্যা-কাণ্ড-যাহাদের দ্বারা ঘটিয়াছে, আমেরিকার আদিম অধিবাসী-গণ- স্বধর্ম্ম- পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ- না করাতে শাসক-গণ- কর্তৃক যে- ১২ কোটি- লোক হত্যা করা হয়, ১৯০৭ খৃঃ ধর্ম্ম-যুদ্ধের নামে- ইউরোপীয়গণ- এশিয়াতে যে- লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড করিয়াছিল-, এই সমস্ত জঘন্যতম কাজ- কোন- মুখে- ইসলামীগণের বিরুদ্ধে মুখ- খোলেন? ছিঃছিঃ।

শিক্ষা: জন-ডিভেন-পোর্ট নিয়ম:- ২০০ বৎসর স্থায়ী- ক্রুসেড যুদ্ধ কোন-২ নির্দোষ ব্যক্তি নিহত-হয়নি। ক্রুশধারী-গণ ধর্ম্মের নাম- যে জীবন অত্যাচার করিয়াছে, তাহা লিখিতে লেখনী- অগ্রসর হয় না। ইহার তুলনায় খলিফা যুদ্ধের ২ জন বিশ্বাস-ঘাতক বিদ্রোহীর হত্যা উল্লেখ যোগ্য নয়।

قرآن تحریف سے پاک

শিক্ষার বড়ুয়েল বলেন:-

The Quran is free from Manupulation.

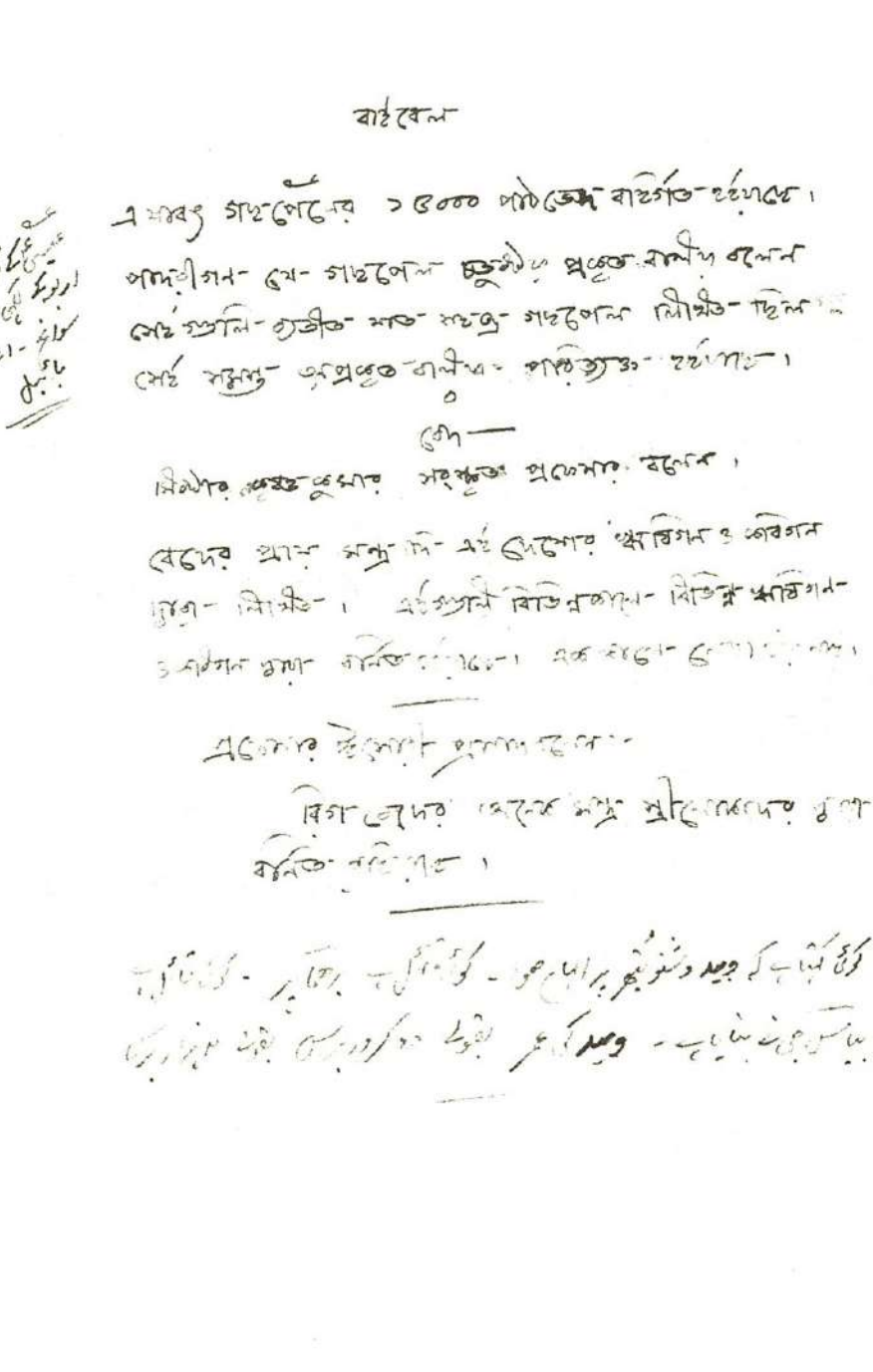

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর পাণ্ডুলিপি হতে

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন

গ্যা লা রি

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের বহুমুখী তৎপরতা

ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হলেও সমাজে একাকী বসবাস করতে পারে না। পদে পদে সে শৃংখলিত এবং অন্য মানুষের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রয়োজনে একে অপরের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব মানুষকে সব বিষয়ে সমান দক্ষতা দান করেননি। তাই মানুষের কল্যাণে মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে গঠন করেছে সমাজ তথা দেশ ও জাতি। এ সমাজে মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও চিন্তাশক্তি এবং বিভিন্ন মানবীয় গুণাবলীর কারণে একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে একে অন্যের সাহায্যে যুগে যুগে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে এগিয়ে এসেছেন।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন এঁদের অন্যতম। তিনি বিদ্যুৎসাহী, পরোপকারী, জনহিতৈষী এবং সমাজসেবক ছিলেন। কোনো ছাত্র বই-পুস্তক কিনতে না পারলে বা যে কোনো ধরনের আর্থিক সমস্যায় পড়লে তিনি ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে তার সমস্যার সমাধান করেছেন। দেশে ও বাইরে যাঁরা তাঁর পূর্ণ আর্থিক সহায়তা ও অভিভাবকত্বে পড়ালেখা সম্পন্ন করেছেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক-প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরা অকপটে তা স্বীকার করেছেন। তাঁর নিজ গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা ও বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তি জনাব মরহুম বুজরুচ মেহের আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) একজন প্রতিবেশী ভক্ত-অনুরক্ত। তাঁর সূত্রে জানা যায়, "১৯৩৯/৪০ সালের দিকে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এলাকার বেশ ক'জনকে কলিকাতায় নিয়ে এসে কর্মসংস্থান এবং পড়ালেখার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি যে ধারারই হোক জ্ঞানার্জনে সহায়তা করতেন। তাঁকে কোনো দিন আর্থিক অনটনে পড়তে দেখা যায়নি। আধিপত্য বিস্তার ও দলাদলীর উর্ধ্বে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন তিনি। শরীআ'ত বিরোধী কার্যকলাপের চরম বিরোধিতা করতেন। বিপদগ্রস্ত এবং অভাবীদের সাহায্যে এগিয়ে আসা ছিলো তাঁর অন্যতম গুণ"।

আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) সমাজ সেবার ধারাবাহিকতা এবং তাঁর দীপ্তিমান জীবন ও স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "নাযেমে আলা একাডেমী"। এটি ধর্মীয়, সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনামূলক প্রতিষ্ঠান।

এ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীর একক প্রচেষ্টায় কুয়েতস্থ "আব্দুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটেবল সোসাইটি" অর্থায়ন করবে মর্মে তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। (অবশ্য পরে বৈদেশিক আরো কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মতৎপরতা ও বিশ্বস্ততায় আস্থাবান হয়ে এ সংস্থাকে অর্থায়ন করতে চুক্তিবদ্ধ হয়।)

ফলে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যাপক ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপির সাহসী পদক্ষেপ এবং প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী, জনাব আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী, জনাব মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী রহ., জনাব কামরুল আলম চৌধুরী, জনাব আবুল আতা মুহাম্মদ এমাদুদ্দিন ও ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সংস্থার নাম পরিবর্তন করে "আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ফাউন্ডেশন" নামকরণ করা হয়। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে এটি সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং ২০০২ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন লাভ করে।

এ ফাউন্ডেশনের একটি সাধারণ পরিষদ, একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। মূলত সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হয়ে থাকে। পরিষদের সকলই অবৈতনিক। স্বেচ্ছাসেবামূলক মানসিকতায় তাঁরা ফাউন্ডেশনের উন্নয়নে কাজ করে থাকেন।

এ প্রতিষ্ঠান ধর্মীয়, সমাজ কল্যাণ, শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনামূলক প্রকল্প। এটি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, আদর্শ গ্রাম প্রকল্প, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে নানাবিধ সেবামূলক কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ সংস্থার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১০০০টির মতো পূর্ণাঙ্গ মসজিদ নির্মাণ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নির্মাণাধীন আছে বেশ কয়েকটি। আর্সেনিকমুক্ত, বিশুদ্ধ ও সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে প্রায় ৬০০০টি গভীর/অগভীর) নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে,

অযুখানা নির্মাণ করা হয়েছে ৯০০টি। গরীব ও অসহায়দের জন্য ২৫০টি গৃহ নির্মাণ। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ক্লিনিক নির্মাণ ৫টি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত গৃহহীন মানুষের জন্য পূনর্বাসন পল্লী নির্মাণ ৫টি। ৭০০জন ইয়াতিমের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ, ২৫ কুরআন শিক্ষার আসরের দায়িত্ব গ্রহণ। ৬০ জন ধর্মভীরু দরিদ্র হাজ্বীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে হজ্বে প্রেরণ। মিয়ানমার হতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য ঘর নির্মাণ ও অন্যান্য সামগ্রী প্রদান। ২০ টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে ব্যাটারি চালিত গাড়ি বিতরণ। ২৫০টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। ৫০টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে ঠেলাগাড়ি বিতরণ। এছাড়া দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, শিক্ষাবৃত্তি, পুরস্কার, চিকিৎসা সাহায্য, বাসস্থান নির্মাণে আর্থিক অনুদান, বই-পুস্তক ক্রয়ে সাহায্য, বিয়ে-শাদিতে আর্থিক অনুদান এবং গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের অধীনে অনূদিত ও সম্পাদিত পুস্তক প্রকাশনসহ ব্যাপক প্রকল্প সম্পাদন করেছে। আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) স্মারক এবং জীবনী গ্রন্থরচনাও এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

নিচে আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং ফাউন্ডেশনের বহুমুখী তৎপরতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ

ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন	চেয়ারম্যান
এডভোকেট জহির উদ্দিন	ভাইস-চেয়ারম্যান
মাওলানা মুহিব্বুল্লাহিল বাকী নদভী	মহাসচিব
অধ্যাপক ড. মোজাফফর নদভী	যুগ্ম-মহাসচিব
অধ্যাপক ড. শফিউল্লাহ কুতুবী	অর্থসচিব
জনাব মাওলানা সালামত উল্লাহ	সাংগঠনিক, গবেষণা ও প্রকাশনা সচিব
জনাব আবুল আতা মুহাম্মদ এমাদুদ্দিন	প্রকল্প সচিব
মিসেস রিজিয়া রেজা চৌধুরী	মহিলা, শিশু ও স্বাস্থ্যসেবা সচিব
জনাব আ.ন.ম সেলিম চৌধুরী	সমাজসেবা ও দপ্তর সচিব
অধ্যাপক শাব্বির আহমদ	প্রচার সচিব
লায়ন আবিদ হোসেন (মানু)	সদস্য
জনাব এরফানুল করিম চৌধুরী	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ ওয়ায়েয	সদস্য

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

জনাব মো. বোরহান উদ্দিন	প্রধান হিসাব রক্ষক
জনাব জরজিস আহমদ চৌধুরী	সিনিয়র হিসাব রক্ষক
ইঞ্জিনিয়ার শাহ এমরান	প্রকল্প প্রকৌশলী
মাওলানা হারুন অর রশিদ	বিদেশবিষয়ক কর্মকর্তা
মাওলানা ইসহাক	বিদেশবিষয়ক সহকারী কর্মকর্তা
মো. জাহিদুল হক	হিসাবরক্ষক
মাওলানা আব্দুস ছবুর	প্রজেক্ট কেয়ারটেকার
মো. আবু বকর ছিদ্দিক	কম্পিউটার অপারেটর
মো. আব্দুল গাফ্ফার	অফিস পিয়ন
মো. জাহাঙ্গীর আলম	অফিস পিয়ন
মো. মাসুদুর রহমান	ড্রাইভার
মো. সোহেল জনি	ড্রাইভার
মো. আরিফুল ইসলাম	অফিস পিয়ন
মো. আবদুস শাকুর	সিকিউরিটি গার্ড

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে ফাউন্ডেশনের অনুদান

চিকিৎসার জন্য আর্থিক অনুদান
বিবাহ ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক সাহায্য
মাদরাসা ও এতিমখানায় আর্থিক সাহায্য
ছাত্রকল্যাণ অনুদান
বসতবাড়ি মেরামতের জন্য আর্থিক অনুদান
বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক অনুদান
মানবিক কারণে আর্থিক অনুদান
ছাত্র-বৃত্তি অনুদান
সাধারণ অনুদান
ইফতারি প্রোগ্রাম প্রকল্প

কুরবানি প্রোগ্রাম প্রকল্প
গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ
বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ত্রাণ বিতরণ
রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় দুঃস্থদের মাঝে ফুড কার্টুন বিতরণ
সোলার লাইট স্থাপন
রোহিঙ্গাদের জন্য শেল্টার, হাসপাতাল, স্কুল ও মসজিদ নির্মাণ এবং গভীর নলকূপ এবং সোলার লাইট স্থাপন
গবেষণা বিভাগের অধীনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা/সংকলন, অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনা
গভীর/অগভীর নলকূপ স্থাপন
দরিদ্র আবাসন প্রকল্প
এতিম প্রতিপালন
অটোরিকশা ও সেলাই মেশিন বিতরণ
স্বনির্ভর আবাসন পল্লী নির্মাণ
স্থানীয়দের জন্য মসজিদ নির্মাণ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন নির্মাণ ইত্যাদি

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত মসজিদ প্রকল্পসমূহের আংশিক তালিকা

১. মসজিদে আল আমান জঙ্গল গুণাগরী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
২. মসজিদে আত-তাকওয়া চাঁনমিয়া সরকার বাড়ি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৩. মসজিদে আন নুর উত্তর কাঞ্চনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৪. মসজিদুল ঈমান বার আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৫. মসজিদে ইখলাস হামেদিয়া মাদরাসা, পুটিবিলা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৬. মসজিদে আবু বকর সিদ্দিক ঢেমশা বোর্ড অফিস, ঢেমশা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৭. মসজিদে বায়তুন নুর (১) তেলিপাড়া, বাবুনগর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৮. মসজিদে ক্বাব বিন মালিক সিকদার বাড়ি, মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৯. মসজিদে আত তাওহীদ বুড়ির বাড়ি, মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
১০. মসজিদে ওমর ফারুক নোয়ারবিলা, চরম্বা লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
১১. মসজিদুল হুদা সিকদারপাড়া, চরম্বা লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
১২. মসজিদুস শুহাদা কেরানিরহাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
১৩. মসজিদে আর রহমান (১) আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
১৪. মসজিদে আমীর হামজা মাথুরাডেঙ্গা, কাঞ্চনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
১৫. মসজিদে সালাম সাধনপুর, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
১৬. মসজিদে ফাতেমা তুজ যাহরা চুনতি মহিলা মাদরাসা, চুনতি লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

১৭. মসজিদে রহমান জঙ্গল পদুয়া, লোহাগাড়া চট্টগ্রাম
১৮. মসজিদে বেলাল হাসান আলী মিয়াজী বাড়ি, কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
১৯. মসজিদে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ চাঁন্দগাজীর বাড়ি, পূর্ব কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
২০. মসজিদে আবু বকর সিদ্দিক (রা.) পাইরাং, বৈলছড়ি, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
২১. মসজিদে সাহাবা পুটিবিলা, এম.চর.হাট, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
২২. মসজিদে আবু হুরাইরা নারিশ্চা, চুনতি, লোহাগাড়া চট্টগ্রাম
২৩. মসজিদে দাওয়াহ ডাকবাংলো, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
২৪. মসজিদে হাসান বসরী আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
২৫. মসজিদে সালমান ফারসি উত্তর আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
২৬. মসজিদে উসমান ইবনে আফফান আধারমানিক, পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
২৭. মসজিদে রিদওয়ান ঠাকুরদিঘীরপাড়া, পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
২৮. মসজিদে খালেদ বিন ওয়ালিদ দরবেশহাট, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
২৯. মসজিদে আলী ইবনে আবু তালিব চরম্বা ইউপি., লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৩০. মসজিদে আবু আইয়ুব আল আনসারী চরতি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৩১. মসজিদে ইমাম গাজ্জালী (র.) পূর্ব রাজঘাটা, চরম্বা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৩২. মসজিদে আবু ওবায়দা বিন আল যাররাহ মন্দাকিনি, ফরহাদাবাগ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
৩৩. মসজিদে খাদিজাহ (র.) মল্লিক সোবহান, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৩৪. মসজিদে সালাউদ্দিন আল আইয়ুবী (১) উত্তর পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতকানিয়া
৩৫. মসজিদে কাউছার ব্যবসায়ীপাড়া, জনার কেউচিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৩৬. মসজিদে আবরার গয়ালমারা, চকরিয়া, কক্সবাজার
৩৭. মসজিদে আবেদীন তুলাতলী, চরতি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৩৮. মসজিদে ইমাম আবু হানিফা (র.) কানাইঘাট, সিলেট
৩৯. মসজিদে সালেহীন চুড়ামনি, জোট পুকুরিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৪০. মসজিদে ইমাম ইবনে খালদুন বরইতলী, চকরিয়া, কক্সবাজার
৪১. মসজিদে আল ফুরকান জলদী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
৪২. মসজিদে উম্মুল কুরা রুপনগর, দেওদিঘী মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৪৩. মসজিদে সাফা সুখছড়ি, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৪৪. মসজিদে তাবেঈন কালুরপাড়া, চরম্বা লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৪৫. মসজিদে সালাউদ্দিন আল আইয়ুবী (২) গারাঙ্গিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৪৬. মসজিদে আর রহমা (২) দক্ষিণ গাছবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম
৪৭. মসজিদে রিয়াদুস সালেহীন পুলিশলাইন, হালিশহর, চট্টগ্রাম
৪৮. মসজিদে মারওয়া বদিরপাড়া, বারদোনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৪৯. মসজিদে মুহাম্মদ বিন কাসেম (র.) উত্তর খিলমঙ্গল, হোসনাবাদ, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম

৫০. মসজিদে কুতাইবা বিন মুসলিম ছিববাড়ি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৫১. মসজিদে রাশেদ চারিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
৫২. মসজিদে ফাতেহীন বরহাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৫৩. মসজিদে আসমাউল হুসনা চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৫৪. মসজিদে আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবু তালেব (২) কালাকাজিপাড়া, টাইমবাজার, মহেশখালী, কক্সবাজার
৫৫. মসজিদে সালেক্বিন ফরেস্ট অফিস গেইট, চুনতি লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৫৬. মসজিদে তারেক বিন জিয়াদ জোড়াপুকুরপাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৫৭. মসজিদে মুজাহেদিন খাগরিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৫৮. মসজিদে ইমাম মুসলিম গাবতলি, পূর্ব কলাউজান, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৫৯. মসজিদে উলামা দুদু ফকির মাদরাসা মসজিদ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৬০. মসজিদে রেসালা গারাঙ্গিয়া, রঙ্গিপাড়া সোনাকানিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৬১. মসজিদে আহলুল কিবলা আফজালনগর, ছদাহা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৬২. মসজিদে হিজরা কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৬৩. মসজিদে উসমা বিন জায়েদ সুঁইপুরা, দুরদুরি, চরতি সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৬৪. মসজিদে আবুজার আল গিফারী নালারকুল, পুটিবিলা লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৬৫. মসজিদে রিয়াজুল জান্নাত সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম
৬৬. মসজিদে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের নোয়াপাড়া, জলদী, বাঁশখালী
৬৭. মসজিদে জাকেরিন নেয়াজারপাড়া, জলদী, বাঁশখালী
৬৮. মসজিদে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মিয়াজানপাড়া, উত্তর রামপুর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৬৯. মসজিদে বায়তুল মামুর ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
৭০. মসজিদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ মিঠাদিঘী, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৭১. মসজিদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কেওচিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৭২. মসজিদে দারুন নাঈম চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৭৩. মসজিদে বেলাল বিন রাবাহ (রা.) পুটিবিলা, জাকারিয়াপাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৭৪. মসজিদে ইবনে তাইমিয়া রতনগঞ্জ, জকিগঞ্জ, সিলেট
৭৫. মসজিদে সাইয়িদ হাসান আর রাহবি উত্তর হাদিগঞ্জ, পটিয়া, চট্টগ্রাম
৭৬. মসজিদে আবু বকর সিদ্দিক (৩) বাদালিয়া, জলদী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
৭৭. মসজিদে শেখ বাশমা খালেদ সাকার আল কাসেমী, নাজিরহাট, চট্টগ্রাম
৭৮. মসজিদে আল ফালাহ বিবিরবিলা, চরম্বা লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৭৯. মসজিদে সিদরাতুল মুনতাহা সাতগড়িয়াপাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৮০. মসজিদে খালেদ বিন ওয়ালিদ মল্লিক সোবহান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৮১. মসজিদে শাহিন গানিম বিন হুমাঈদ চরম্বা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

৮২. মসজিদে মরিয়ম আল উবাইদ উত্তর সুখছড়ি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৮৩. মসজিদে সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস ছমদারপাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৮৪. মসজিদে উম্মুল মুমেনিন আয়েশা (রা.) উত্তর চরতী, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
৮৫. মসজিদে সামীর আল এউজি ওয়া বদর আল মারজুকি বারদোনা, কিল্লারআন্দর, আমিরাবাদ, চট্টগ্রাম
৮৬. মসজিদে আল ইমাম ওয়াত তাকওয়া মাইজবিলা, চরম্বা লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৮৭. মসজিদে গুনায়মা আবদুল্লাহ পুরাতন বিওসি, আমিরাবাদ লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৮৮. মসজিদে হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব পশ্চিম আঁধারমানিক, পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৮৯. মসজিদে উকবা বিন সাঈফ কুমারপাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৯০. মসজিদে আর রাহমা (৩) ডাবুয়া, রাউজান, চট্টগ্রাম
৯১. মসজিদে আল আখইয়ার মাইজপাড়া, কালারমারচরা, মহেশখালী, কক্সবাজার
৯২. মসজিদে বায়তুস সালাম কৈয়ারবিল, চকরিয়া, কক্সবাজার
৯৩. মসজিদে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মুন্সিরহাট, আনন্দপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা
৯৪. মসজিদে আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) (৩) বরইতলী, চকরিয়া, কক্সবাজার
৯৫. মসজিদে আজ জুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) আব্বাসপাড়া, হালিশহর চট্টগ্রাম
৯৬. মসজিদে মায়মুনা বিনতে হারিছ (রা.) খুদুকখালী, ছনুয়া, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
৯৭. মসজিদে আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.) তেয়ারীহাট, পদুয়া লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৯৮. মসজিদে নোমান বিন বশির সিকদারপাড়া, আধুনগর লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
৯৯. মসজিদে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ভৈরব
১০০. মসজিদে তালহা বিন আবদুল্লাহ (রা.) গরিবারজিল, ছোট ঢেমশা সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
১০১. মসজিদে সিরাতুল মুস্তাকিম পুরানগড়, বাজালিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
১০২. মসজিদে আবরার (২) মিয়াজিবাড়ি, খাগরিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
১০৩. মসজিদে ইমাম বুখারী (৩) চিপাতলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
১০৪. মসজিদে জাফর বিন আবি তালেব (রা.) উত্তর ঢেমশা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
১০৫. মসজিদে নুর (২) সৈয়দাবাদ, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম
১০৬. মসজিদে আমিনা রাউজান, চট্টগ্রাম
১০৭. মসজিদে আল কুদস্ আবী সাঈদ জিয়ানগর, পিরোজপুর
১০৮. মসজিদে আবু সাঈদ আল খুদরী মঠবাড়ি, পিরোজপুর
১০৯. মসজিদে রাতুল উত্তর-পশ্চিম চরম্বা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
১১০. মসজিদে খদিজা বিনতে খয়াইলিদ সাতগড়, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
১১১. মসজিদে ফারুক গাটিয়াডেঙ্গা, এওচিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
১১২. মসজিদে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সাতগড়, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
১১৩. মসজিদে উম্মে হাবীবা (রা.) সাঁথিয়া, পাবনা

১১৪. মসজিদে ইউসুফ মোহাম্মদ বিন হুজাইবা বৈলছড়ি, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
১১৫. মসজিদে সিদক কদমরসুল, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
১১৬. মসজিদে আল মতর চাতরী, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম
১১৭. মসজিদে উসামা বিন যায়িদ হাতিয়া, নোয়াখালী
১১৮. মসজিদে সাঈদ সাঈফ তারিক দক্ষিণ ধুরুং, কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম
১১৯. মসজিদে হুদা ওয়াত্তাকওয়া আমিরাবাদ, লোহাগাড়া চট্টগ্রাম
১২০. মসজিদে মাওয়া ছোট হাতিয়া, সোনাকানিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
১২১. মসজিদে আল আনসার ছনখোলা, এওচিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
১২২. মসজিদে আবু বকর সিদ্দিক কলেজ রোড, দক্ষিণ ঢেমশা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
১২৩. মসজিদে ইমাম শাফী দক্ষিণ কেশুয়া, চরতি সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
১২৪. মসজিদে আলী ইবনে আবী তালিব (৪) বিজয়নগর, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
১২৫. মসজিদে হযরত হাফছা (রা.) পূর্ব চাপাছড়ি, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
১২৬. মসজিদে আমমার বিন ইয়াছির বরমা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম
১২৭. মসজিদে মিক্কাত তেপশাবুনিয়া, জিয়ানগর, পিরোজপুর
১২৮. মসজিদে সাঈম মুহাম্মদ সাঈদ আল তুনাজ্জি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
১২৯. মসজিদে জাফর বিন আবী তালিব (২) উত্তর আলীপুর, দাগনভূঁইয়া, ফেনী।
১৩০. মসজিদে জয়নাব উত্তর শালধর, ফুলগাজী, পরশুরাম, ফেনী
১৩১. মসজিদে ওয়াহাতুল ঈমান মল্লাপাড়া, মনকিরচর, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
১৩২. মসজিদে মুনতাহাল খুলুদ বেতুয়াবাজার, চকরিয়া, কক্সবাজার
১৩৩. মসজিদে যায়েদ বিন আরকাম (রা.) হরিণখাইন, পটিয়া, চট্টগ্রাম
১৩৪. মসজিদে আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা সাঁথিয়া, পাবনা
১৩৫. মসজিদে হযরত হানজালা (রা.) দরবেশহাট, রাস্তারমাথা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
১৩৬. মসজিদে জারির ইবনে আবদুল্লাহ কোদালা, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম
১৩৭. মসজিদে ইহসান কুরুশখুল, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম
১৩৮. মসজিদে ফাতেমা হুমাঈদ আবদুল্লাহ উত্তর ঢেমশা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
১৩৯. মসজিদে আল সাকতারি ফকিরখীল, চরম্বা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
১৪০. মসজিদে আয়েশা হাসান আবদুর রহমান চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম
১৪১. মসজিদে কায়েস আবদুল্লাহ আল কুক (রা.) আদাজুরি, কাকপাড় গণকপাড়া, সিকদারমল্লিক, পিরোজপুর
১৪২. মসজিদে মুয়ায বিন জবল (রা.) গুড়িগ্রাম, সাঁথিয়া, পাবনা
১৪৩. মসজিদে ইখলাস হোগলাবুনিয়া হাইস্কুল সাখারিকাঠি, নাজিরপুর, পিরোজপুর
১৪৪. মসজিদে আল ফালাহ মাটিভাঙ্গা, নাজিরপুর, পিরোজপুর
১৪৫. মসজিদে যিন্নুরাইন বৈহরামপুর কলেজ, পিরোজপুর
১৪৬. মসজিদে রাইয়ান মোজাহেদ চৌধুরীপাড়া, পূর্ব গোমদণ্ডী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

১৪৭. মসজিদে ফারুক (২) সোনাকানিয়া, চট্টগ্রাম
১৪৮. মসজিদে নূর (৩) টংকাবতি ফরেস্ট অফিস, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
১৪৯. মসজিদে সালমান ফারসি (২) সাঁথিয়া ডিগ্রি কলেজ, সাঁথিয়া, পাবনা
১৫০. মসজিদে মক্কী মক্কারবাড়ি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন মসজিদ সংলগ্ন অযুখানা প্রকল্পসমূহের আংশিক তালিকা

১. বুড়িরবাড়ি, মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
২. কাঞ্চনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৩. সাতকানিয়া রাস্তার মাথা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৪. ঢেমশা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৫. পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৬. লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৭. কেরানীরহাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৮. কলাউজান, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৯. রাজঘাটা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
১০. ঢেমশা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
১১. পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
১২. হাটহাজারী, চট্টগ্রাম আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি, আরব আমীরাত
১৩. ঠাকুরদিঘীরপাড়, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
১৪. পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
১৫. কাঞ্চনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি, আরব আমীরাত
১৬. গয়ালমারা, চকরিয়া, কক্সবাজার আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি, আরব আমীরাত
১৭. সিলেট শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
১৮. লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি, আরব আমীরাত
১৯. বাজালিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
২০. মল্লিক ছোবহান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি আরব আমীরাত
২১. গারাংগিয়া, সোনাকানিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি, আরব আমীরাত
২২. গাছবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
২৩. লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি, আরব আমীরাত

২৪. হালিশহর, চট্টগ্রাম আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি, আরব আমীরাত
২৫. সিববারী, ছদাহা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
২৬. ফরেস্ট গেইট, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
২৭. জোরপুকুরপাড়, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
২৮. গারাংগিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
২৯. পূর্ব কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৩০. সোনাকানিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৩১. আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৩২. পুটিবিলা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৩৩. চুনতি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৩৪. পুটিবিলা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৩৫. পুটিবিলা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৩৬. আমিলাইশ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৩৭. সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৩৮. নাজিরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৩৯. উত্তর চরতি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৪০. মাইনীকুন্ড লংগদু, বান্দরবান শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৪১. আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৪২. রাউজান, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৪৩. দরবেশহাট, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৪৪. বাঘা উপজেলা, রাজশাহী শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৪৫. চন্দগাছবাড়ি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৪৬. বরইতলী, চকরিয়া, কক্সবাজার শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৪৭. পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত
৪৮. এম-২৬ মসজিদের সাথে সংযুক্ত আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি, আরব আমীরাত
৪৯. এম-৯৮ মসজিদের সাথে সংযুক্ত আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি, আরব আমীরাত
৫০. জিয়ানগর, পিরোজপুর শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন ও মাদরাসা-শিক্ষা ভবন প্রকল্পসমূহের আংশিক তালিকা

১. প্রকল্প নং-৫৭ শারজাহ চ্যারিটি হাউস বিজনিস স্টাডিজ ফ্যাকাল্টি ভবন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (স্থায়ী ক্যাম্পাস)।

২. মাদরাসা নং-১৫ শারজাহ চ্যারিটি হাউস একাডেমিক বিল্ডিং কক্সবাজার ইসলামিয়া মহিলা কামিল মাদরাসা, নিউ সী-বিচ রোড, কক্সবাজার ।

৩. মাদরাসা নং-১৬ শারজাহ চ্যারিটি হাউস একাডেমিক বিল্ডিং কক্সবাজার আদর্শ মহিলা কামিল মাদরাসা, কক্সবাজার সদর।

৪. মাদরাসা নং-১৯ শারজাহ চ্যারিটি হাউস একাডেমিক বিল্ডিং ইমাম বুখারী মাদরাসা, চকরিয়া, কক্সবাজার।

৫. মাদরাসা নং-২০ শারজাহ চ্যারিটি হাউস হোস্টেল বিল্ডিং পদুয়া আমিরাত শিক্ষা কমপেক্সক্স, তেওরীখিল, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৬. মাদরাসা নং-২১ শারজাহ চ্যারিটি হাউস হোস্টেল বিল্ডিং পদুয়া জনকল্যাণ শিক্ষা কমপেক্সক্স, তেওরীখিল, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৭. মাদরাসা নং-২২ শারজাহ চ্যারিটি হাউস একাডেমিক বিল্ডিং আল কুরআন একাডেমী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

৮. মাদরাসা নং-২৩ শারজাহ চ্যারিটি হাউস একাডেমিক বিল্ডিং মক্কারবাড়ি এবতেদায়ী মাদরাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৯. মাদরাসা নং-২৪ শারজাহ চ্যারিটি হাউস একাডেমিক বিল্ডিং বায়তুল আকসা এবতেদায়ী মাদরাসা, বিশ্বব্যাংক কলোনি, আ/এ, খুলশী, চট্টগ্রাম।

১০. মাদরাসা নং-২৫ শারজাহ চ্যারিটি হাউস একাডেমিক বিল্ডিং চরম্বা জামিউল উলুম ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা।

১১. মাদরাসা নং-২৬ শারজাহ চ্যারিটি হাউস একাডেমিক বিল্ডিং দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম।

১২. মাদরাসা নং-০২ আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি, আরব আমীরাত একাডেমিক বিল্ডিং রিয়াজুল জান্নাত মাদরাসা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

১৩. মাদরাসা নং-০৪ আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি, আরব আমীরাত একাডেমিক বিল্ডিং খাগরিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

১৪. মাদরাসা নং-০৫ আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি, আরব আমীরাত একাডেমিক বিল্ডিং হোসাইনিয়া মাদরাসা, জলদী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

১৫. মাদরাসা নং-০৮ আররাহমা চ্যারিটি সোসাইটি, আরব আমীরাত হোস্টেল বিল্ডিং কক্সবাজার আদর্শ মহিলা কামিল মাদরাসা, কক্সবাজার।

১৬. মাদরাসা নং-০১ শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত মাদরাসা

ও হেফজখানা কাসেমুল উলুম মাদরাসা, দেওদিঘি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৭. মাদরাসা নং-০৩ শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসা চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১৮. মাদরাসা নং-০৬ শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত একাডেমিক বিল্ডিং দারুল মা'মারিফ আল ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম।
১৯. মাদরাসা নং-০৭ শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত একাডেমিক বিল্ডিং জামেয়া ইসলামীয়া মা'রেফুল উলুম মাদরাসা, মায়ানমার।
২০. মাদরাসা নং-০৯ শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত একাডেমিক বিল্ডিং উম্মাহাতুল মুমিনিন মাদরাসা, চরম্বা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২১. মাদরাসা নং-১০ শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত একাডেমিক বিল্ডিং সোহবা আস সালেহা, কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২২. মাদরাসা নং-১১ শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত একাডেমিক বিল্ডিং নারিশ্চা, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম ।
২৩. মাদরাসা নং-১২ শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত একাডেমিক বিল্ডিং দেওদিঘি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
২৪. মাদরাসা নং-১৪ শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত একাডেমিক বিল্ডিং মনকিরচর ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদরাসা, মনকিরচর, বাঁশখালী।
২৫. মাদরাসা নং-৩০ শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত একাডেমিক বিল্ডিং মাদরাসাতুস শরফ, মোগরাপাড়া, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
২৬. মাদরাসা নং-৩১ শেখ আবদুল্লাহ আল-নূরী চ্যারিটি সোসাইটি, কুয়েত একাডেমিক বিল্ডিং মাদরাসা বাইতুল করিম আল ইসলামিয়া এতিমখানা ও জামাতুস সালেহা, কর্ণফুলী থানা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

নলকূপ প্রকল্প

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, ঢাকা, কক্সবাজার, সিলেট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ফিরোজপুর, বরিশাল, রাজশাহী, ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা বাগেরহাট, শেরপূর এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ সারা বাংলাদেশে এপর্যন্ত গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে প্রায় ৬০০০ (ছয় হাজার)।

বিভাজন

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া ও লোহাগাড়ায় ৬০%
চট্টগ্রামসহ অন্যান্য জেলায় ৪০%

গভীর ও অগভীর নলকূপসমূহের আংশিক তালিকা

১. ১২৫০ ৩৮৮নং মসজিদে আব্দুল্লাহ রহমত উল্লাহ কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২. ১২৫১ ৩৪১নং মসজিদে আবু বকর সিদ্দিক চরম্বা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।।
৩. ১২৫২ কামাল উদ্দিন পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।।
৪. ১২৫৩ মোহাম্মদ মিঞা মিস্ত্রি তেওয়ারীখিল, পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৫. ১২৫৪ শহিদ মিস্ত্রি তেওয়ারীখিল, পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৬. ১২৫৫ আরিফ উল্লাহ, পিতা: মৃত সৈয়দ নুর উত্তর দরবেশকাটা, ইলিশিয়া, চকরিয়া, কক্সবাজার।
৭. ১২৫৬ কেওচিয়া আশরাফুল উলুম মাদরাসা। কেওচিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।।
৮. ১২৫৭ মাস্টার নুরুল হোছাইন পাহাড়িয়াপাড়া, বিএমচর, চকরিয়া, কক্সবাজার।
৯. ১২৫৮ আবুল কাসেম রূপনগর, ফকিরপাড়া, মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১০. ১২৫৯ ২৪১নং মসজিদ ছদাহা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১১. ১২৬০ জলিল আহমদ মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১২. ১২৬১ ফতেমা বেগম, পিতা: বেলায়ত হোছেন তুলাতলী, চরতি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৩. ১২৬২ জাফর আহমদ, পিতা: মৃত মতিয়ুর রহমান হরিণা, আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১৪. ১২৬৩ হরিণা হাফেজিয়া মাদরাসা হরিণা, আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১৫. ১২৬৪ সৈয়দ আহমদ, পিতা: মৃত হামিদ আলী পুটিবিলা, ছুটারপাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১৬. ১২৬৫ মো. ইলিয়াছ, পিতা: সাহাব মিয়া পুটিবিলা, নালারকুল, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১৭. ১২৬৬ নজির আহমদ, পিতা: সাহেব মিয়া পুটিবিলা, তাঁতিপাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১৮. ১২৬৭ শাহ আলম, পিতা: মফিজুর রহমান পুটিবিলা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১৯. ১২৬৮ সুলতান আহমদ, পিতা: মৃত আবদুল মজিদ মুন্সিপাড়া, নালার কূল, পুটিবিলা, লোহাগাড়া চট্টগ্রাম।
২০. ১২৬৯ জনকল্যাণ ফোরকানিয়া মাদরাসা আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২১. ১২৭০ কালু ড্রাইভার উকিলপাড়া, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২২. ১২৭১ ফারেঙ্গা, মনডুলার চর, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৩. ১২৭২ ফারেঙ্গা, পূর্বপাড়া চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৪. ১২৭৩ জিয়াউদ্দিন আমিলাইষ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
২৫. ১২৭৪ মো. নুরুল হালিম দক্ষিণ সুখছড়ি, দরবার শরীফ, লোহগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৬. ১২৭৫ জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় আমিরাবাদ লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৭. ১২৭৬ আবদুস সবুর হাজীরাস্তা, পুটিবিলা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৮. ১২৭৭ আমিন শরীফ রূপনগর, মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

২৯. ১২৭৮ মাওলানা জুনাইদ পুর্ব গাটিয়াডেঙ্গা, নলুয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৩০. ১২৭৯ ফজল মেম্বার জয়নগর, মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৩১. ১২৮০ মো. ইয়াছিন দক্ষিণ চরতী, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৩২. ১২৮১ মাওলানা ওহীদ আহমদ সুখছড়ি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩৩. ১২৮২ আহমদ আলী জলদী পৌরসভা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
৩৪. ১২৮৩ নুরুল আবছার জলদী পৌরসভা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
৩৫. ১২৮৪ ছিদ্দিক আহমদ দক্ষিণ চরতি, সাতকনিয়া, চট্টগ্রাম।
৩৬. ১২৮৫ আবুল হাশেম জিহাদী চান্দগাঁও, সিএমবি কলোনি, চট্টগ্রাম।
৩৭. ১২৮৬ ৪০৯নং মসজিদ চান্দা চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩৮. ১২৮৭ মো. হারুন, পিতা: ইকবাল আহমদ নাজিরপাড়া, ৯নং ওয়ার্ড, পৌরসভা সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৩৯. ১২৮৮ উলা মিয়া, পিতা: সুলতান আহমদ গোয়াজর পাড়া, ৯নং ওয়ার্ড, পৌরসভা সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৪০. ১২৮৯ সৈয়দুল হক দুরদুরী, চরতি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৪১. ১২৯০ মরহুম মাওলানা শামসুল ইসলাম হেলালী জাফরাবাদ, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
৪২. ১২৯১ আনোয়ার সাইদ গাছবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
৪৩. ১২৯২ মাহবুবুর রহমান জলদী পৌরসভা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
৪৪. ১২৯৩ আনিস উদ্দিন সারেং, পিতা: মোবারক আলী সারেং চান্দনী ভোজেশ্বর, নডিয়া, শরীয়তপুর।
৪৫. ১২৯৪ কুডি মিয়া, পিতা সামসুদ্দিন নড়কালিকতা, ভেজেশ্বর, নডিয়া, শরীয়তপুর।
৪৬. ১২৯৫ পশ্চিম চান্দনী নুরানী মাদরাসা পশ্চিম চান্দনী, ভেজেশ্বর, নডিয়া, শরীয়তপুর।
৪৭. ১২৯৬ মো. লেয়াকত আলী খান, পিতা: আবদু জাব্বার খান, নড়কালিকতা, ভেজেশ্বর, নডিয়া, শরীয়তপুর।
৪৮. ১২৯৭ মো. খলিল ঢালী, পিতা: আইয়ুব আলী ঢালী চান্দনী, ভোজেশ্বর, নডিয়া, শরীয়তপুর।
৪৯. ১২৯৮ মো. হোছেন ছৈয়দ, পিতা: মৃত এলাহী ছৈয়দ শরীয়তপুর, ভোজেশ্বর, নডিয়া, শরীয়তপুর।
৫০. ১২৯৯ পিয়ারা বেগম, স্বামী: মৃত লাল মিয়া খান চান্দনী ভোজেশ্বর, নডিয়া, শরীয়তপুর।
৫১. ১৩০০ মো. মানিক মাতবর, পিতা: আবদু মান্নান মাতবর নড়কালিকতা, ভোজেশ্বর, নডিয়া, শরীয়তপুর।
৫২. ১৩০১ আবদুর বর বেপারী, পিতা: আইয়ুব আলী বেপারী, চান্দনী, ভোজেশ্বর, নডিয়া, শরীয়তপুর।

৫৩. ১৩০২ মো. নুরুল ইসলাম বেপারী, পিতাঃ মৃত হালিম বেপারী, নড়কালিকতা, ভোজেশ্বর, নডিয়া, শরীয়তপুর।
৫৪. ১৩০৩ অজয় বসু ধর বনিক পাড়া, রামপুর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৫৫. ১৩০৪ শামসুল আলম ড্রাইভার মল্লিক ছুবহান, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৫৬. ১৩০৫ আছিয়া বেগম নেয়াজর বাড়ি, মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৫৭. ১৩০৬ কামরুন্নেছা ভোয়ালিয়া পাড়া, রূপকানিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৫৮. ১৩০৭ জাকের আহমদ বাঁশখালী পৌরসভা, জলদী, চট্টগ্রাম।
৫৯. ১৩০৮ মো. আলমগীর, পিতাঃ মৃত নজির আহমদ দক্ষিণ চরতি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৬০. ১৩০৯ রঞ্জিত চৌধুরী, পিতাঃ মৃত জোগেন্দ্র লাল চৌধুরী পূর্ব দুরদুরী, চরতি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৬১. ১৩১০ আবদুল নবী দক্ষিণ চরতি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৬২. ২৪৫১ দেলোয়ার হোসেন ছুট্টো চাকফিরানী বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৬৩. ২৪৫২ আবদুল মান্নান সতিপাড়া, (বলিপাড়া) সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৬৪. ২৪৫৩ এনামুল হক মানিক উজিরপাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৬৫. ২৪৫৪ আনোয়ার আহমেদ, ইউএনওর ড্রাইভার লোহাগাড়া ইউএনও সাহেবের বাসার পার্শ্বে, চট্টগ্রাম।
৬৬. ২৪৫৫ ডা. বাবুল কান্তি পাল মধ্য আমিরাবাদ, পালপাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৬৭. ২৪৫৬ মাওলানাপাড়া জামে মসজিদ দক্ষিণ পুটিবিলা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৬৮. ২৪৫৭ ফরিদ সওদাগর হদ্দলিপাড়া, পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৬৯. ২৪৫৮ আকতার উদ্দিন মতোয়াল্লী বাড়ি, ১নং ওয়ার্ড, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৭০. ২৪৫৯ মো. নোমান কিল্লারআন্দর, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৭১. ২৪৬০ মো. সিরাজুল ইসলাম পশ্চিম ঢেমশা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৭২. ২৪৬১ দেওদিঘি মডেল কেজি স্কুল দেওদিঘি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৭৩. ২৪৬২ আবুল কালাম মন্টু তেলিপাড়া, বাবুনগর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৭৪. ২৪৬৪ বীর বিক্রম জয়নাল আবেদীন উচ্চ বিদ্যালয় নারিশ্চা, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৭৫. ২৪৬৫ শাহ আলম আশ্রয়ণ প্রকল্প মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৭৬. ২৪৬৬ মো. শফিক, পিতাঃ মৃত নুরুল হক ছিটুয়াপাড়া, ৫নং ওয়ার্ড, পশ্চিম ঢেমশা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৭৭. ২৪৬৭ মুহছেনা বেগম ছমদর পাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৭৮. ২৪৬৮ মো. হারুনুর রশিদ, পিতাঃ মৃত সোলতান আহমদ কাতালিয়া, দক্ষিণ সদর, কুমিল্লা।
৭৯. ২৪৬৯ পূর্ব কলাউজান দারুচ্ছুন্নাহ মাদরাসা পূর্ব কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৮০. ২৪৭০ মাদার্শা আশ্রয়ণ প্রকল্প ৩নং ওয়ার্ড মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৮১. ২৪৭১ মঈনুদ্দিন মান্নান মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৮২. ২৪৭২ মো. সালাউদ্দিন সিকদার উত্তর কলাউজান, সিকদারপাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৮৩. ২৪৭৩ মো. নুরুল কবির, পিতাঃ মৃত মফজলুর রহমান তেওয়ারীখিল, পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৮৪. ২৪৭৪ করইয়ানগর চৈতন্য বিহার করইয়ানগর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৮৫. ২৪৭৫ মো. মিজানুর রহমান, পিতাঃ মৃত আহমদ হোসেন পেটান সিকদারপাড়া, দক্ষিণ রূপকানিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৮৬. ২৪৭৬ প্রসেনজিৎ পাল, পিতাঃ মৃত দিজেন্দ্র পাল উত্তর আমিরাবাদ, পালপাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৮৭. ২৪৭৭ আরমান বাবু রোমেল সরকারপাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৮৮. ২৪৭৮ বায়তুল মোক্কারাম জামে মসজিদ ও নুরানী মাদরাসা উত্তর কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৮৯. ২৪৭৯ জসিম উদ্দিন ছিটুয়াপাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৯০. ২৪৮০ দক্ষিণ গারাঙ্গিয়া দাখিল মহিলা মাদরাসা গারাঙ্গীয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৯১. ২৪৮১ জয়তুন্নাহার গরিবারঝিল, ৩নং ওয়ার্ড, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৯২. ২৪৮২ আমিলাইশ কালিবাড়ি মন্দির আমিলাইশ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৯৩. ২৪৮৩ মো. সেলিম, পিতাঃ মৃত আহমদ হোছেন উত্তর মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৯৪. ২৫০৪ রুবি আক্তার, মার্দাশা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৯৫. ২৫০৫ রাশেদা বেগম, স্বামীঃ নুরুল হোসাইন, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৯৬. ২৫০৬ শামসুল ইসলাম মুন্সীরবাড়ি, সরকারপাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৯৭. ২৫০৭ মুহাম্মদ আলী, পিতাঃ মৃত ফরিদুজ্জামান দক্ষিণ তুলাতলী, ৫নং ওয়ার্ড, চরতি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৯৮. ২৫০৮ হুরাইন জান্নাত, পিতাঃ মৃত গুরা মিয়া দক্ষিণ বাক্ষ্মণডেঙ্গা, চরতী, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৯৯. ২৫০৯ কুতুব উদ্দিন, পিতাঃ মৃত আহমদুর রহমান চান্দা ৮নং ওয়ার্ড, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

১০০. ২৫১০ মুহাম্মদ হানিফ, পিতাঃ আহমদ হোসেন আলীনগর ৩নং ওয়ার্ড, এওচিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

ALLAMA FAZLULLAH FOUNDATION

مؤسسة العلامة فضل الله

للأعمال الخيرية والبحوث الإسلامية والنشر

CHITTAGONG, BANGLADESH

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন

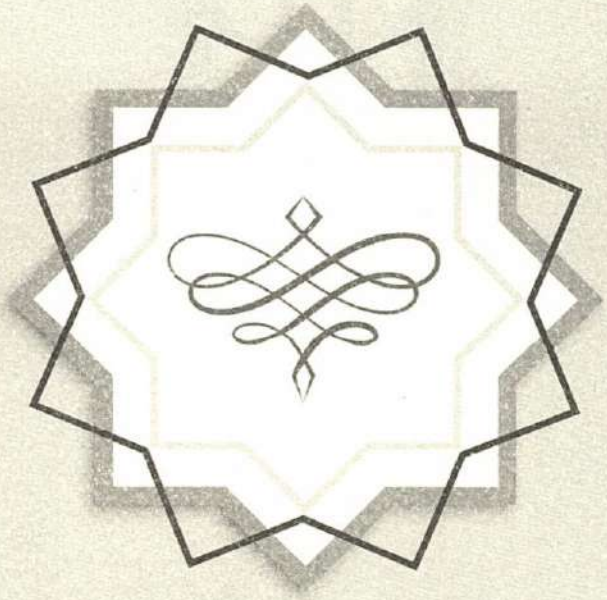

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত মসজিদসমূহের কয়েকটি

রাঙ্গামাটি মাইনিমুখ বাজারে নির্মিত কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ

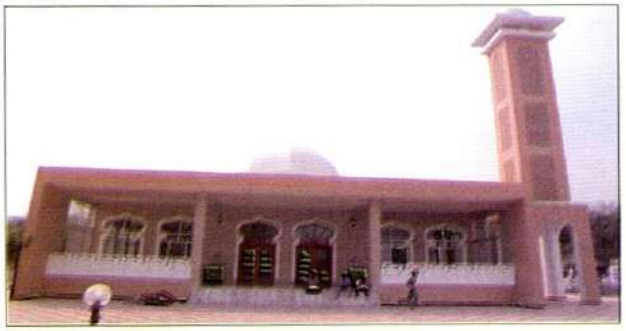

কক্সবাজার পুলিশ লাইনে নির্মিত মসজিদ

চট্টগ্রামস্থ চাকতাই চামড়া গুদামে নির্মিত মসজিদ

কক্সবাজারে নির্মিত মসজিদ

সাতকানিয়া বাবুনগর মক্কার বাড়ী এলাকার নির্মিত মসজিদ

আমিরাবাদ স্কুল রোড, লোহাগাড়ায় নির্মিত মসজিদ

বান্দরবান ক্যান্টনমেন্টে নির্মিত মসজিদ-২

চট্টগ্রামস্থ চাকতাই-এ নির্মিত মসজিদ

কানাইঘাট, সিলেট
নির্মিত মসজিদ

সাবেক খাদ্য মন্ত্রী ড. আব্দুর
রাজ্জাক এমপি'র এলাকায়
নির্মিত মসজিদ

চট্টগ্রামস্থ হালিশহর লাইনে
নির্মিত মসজিদ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের
দক্ষিণ ক্যাম্পাসে
নির্মিত মসজিদ-১

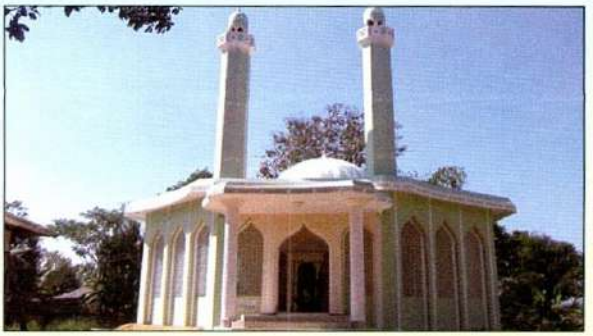

তেওয়ারীখিল, পদুয়া
লোহাগাড়া উপজেলায়
নির্মিত মসজিদ

আমিরাবাদ, লোহাগাড়া
সদরে নির্মিত মসজিদ

বাইতুল ইজ্জত বিডিআর
ক্যাম্পে নির্মিত মসজিদ

হাইদগাঁও, পটিয়ায়
নির্মিত মসজিদ

সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু এমপি'র সুপারিশে পাবনায় নির্মিত মসজিদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পি.এস সাইফুজ্জামান শেখর এমপি এর এলাকা বলরামপুর, মাগুরায় নির্মিত মসজিদ

ষোলশহর রেলস্টেশন নির্মিত মসজিদ চট্টগ্রাম

সাতকানিয়ার এওচিয়ায় নির্মিত মসজিদ

লোহাগাড়া ছমদিয়া মাদ্রাসায় নির্মিত মসজিদ

যোগাযোগ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি'র এলাকা কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালীতে নির্মিত মসজিদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পি.এস সাইফুজ্জামান শেখর এর এলাকা বলরামপুর, মাগুরায় নির্মিত মসজিদ

সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু এমপি'র সুপারিশে পাবনায় নির্মিত মসজিদ

ফটিকছড়িতে
নির্মিত মসজিদ

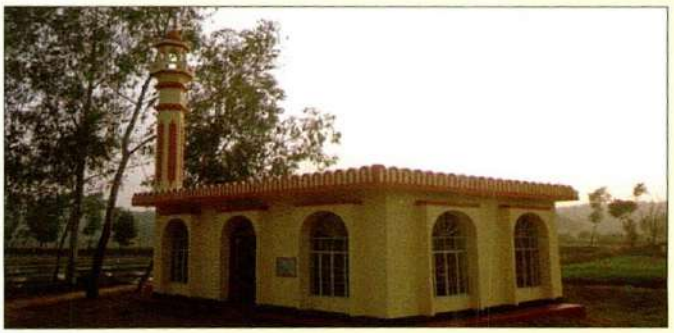

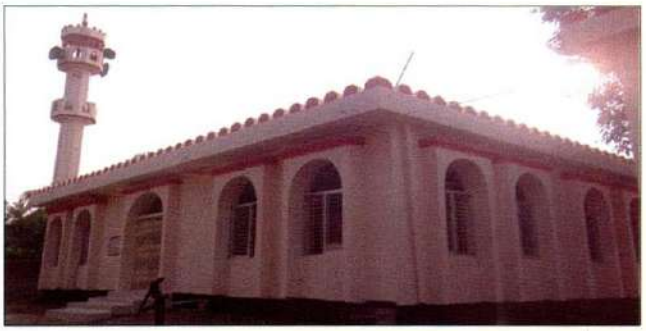

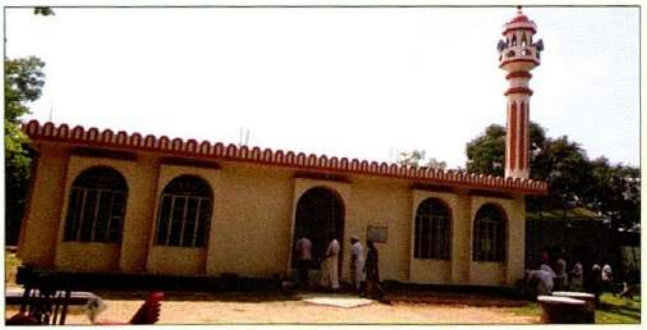

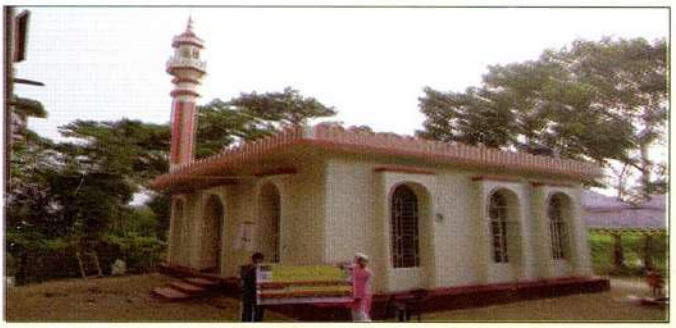

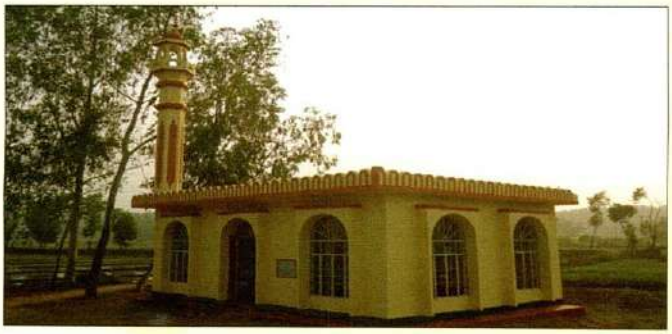

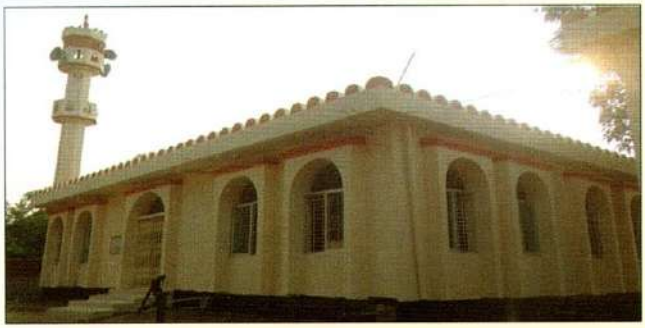

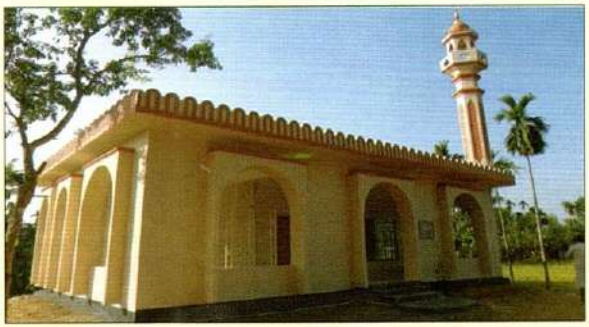

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্মিত কয়েকটি একাডেমিক ভবন

আমিরাত কমপ্লেক্স এ নির্মিত একাডেমিক ভবন, লোহাগাড়া।

কক্সবাজার আদর্শ কামিল মাদরাসা একাডেমিক ভবনের খণ্ডচিত্র

ইসলামিয়া মহিলা কামিল মাদরাসা ককস্‌বাজারে নির্মিত ভবন।

আমিরাত কমপ্লেক্স-এ নির্মিত একাডেমিক ভবন, লোহাগাড়া

আইআইইউসি কুমিরা ক্যাম্পাসে নির্মিত বিবিএ ফ্যাকাল্টি ভবন

আমিরাত কমপ্লেক্স-এ নির্মিত একাডেমিক ভবন, লোহাগাড়া।

আমিরাত কমপ্লেক্স-এ নির্মিত একাডেমিক ভবন, লোহাগাড়া।

কক্সবাজার আদর্শ কামিল মাদরাসা একাডেমিক ভবনের খণ্ডচিত্র

কক্সবাজার আদর্শ কামিল মাদরাসা একাডেমিক ভবনের খণ্ডচিত্র

আমিরাত কমপ্লেক্স-এ নির্মিত একাডেমিক ভবন, লোহাগাড়া।

পদুয়া কমপ্লেক্স লোহাগাড়া

আল-কুরআন একাডেমিতে হোস্টেল কাম একাডেমিক ভবনের নির্মাণ, বোয়ালখালী চট্টগ্রাম।

পদুয়া কমপ্লেক্স
লোহাগাড়া

কক্সবাজার ইসলামিয়া
মহিলা মাদরাসায় নির্মিত
একাডেমিক ভবনের

حفلة افتتاح دورة التدريب المهني

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে নির্মিত পল্লী, দরিদ্র আবাসন অযুখানা ও টয়লেট এবং হাসপাতাল

শরণখোলার আমিরাত
পল্লীর খণ্ডচিত্র-১

শরণখোলার আমিরাত
পল্লীর খণ্ডচিত্র-২

শরণখোলার আমিরাত
পল্লীর খণ্ডচিত্র-৩

শরণখোলার আমিরাত
পল্লীর খণ্ডচিত্র-৪

শরণখোলার আমিরাত
পল্লীর খণ্ডচিত্র-৫

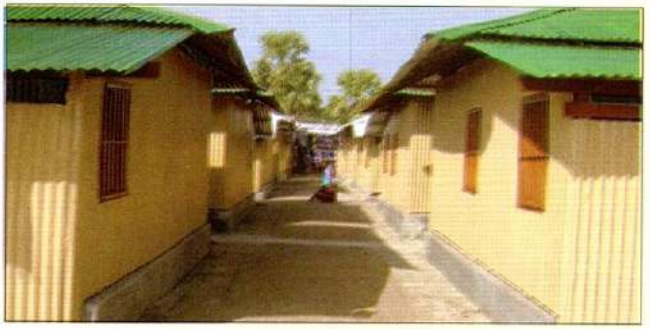

শরণখোলার আমিরাত
পল্লীর খণ্ডচিত্র-৬

আমিরাত পল্লী
হাসপাতাল শরণখোলা

শরণখোলার আমিরাত
পল্লীর খণ্ডচিত্র-৭

শরণখোলার আমিরাত
পল্লীর খণ্ডচিত্র-৮

শরণখোলার আমিরাত
পল্লীর খণ্ডচিত্র-৯

শরণখোলার আমিরাত
পল্লীর খণ্ডচিত্র-১০

শরণখোলার আমিরাত
পল্লীতে নির্মিত মাদরাসা

সিডর আক্রান্ত বাগেরহাট জেলার শরণখোলায় গৃহহীনদের জন্য নির্মিত আমিরাত পল্লী উদ্বোধন করছেন সাবেক খাদ্যমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক ও ড. আবু রেজা নদভী এম.পি

সিডর আক্রান্ত বাগেরহাট জেলার শরণখোলায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন সাবেক খাদ্যমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক ও ড. আবু রেজা নদভী এম.পি

শরণখোলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচির খণ্ডচিত্র

ওআইসি পল্লী- চরমদারিয়া, খাগদী, মাদারীপুর

উদ্বোধন করছেন সাবেক
নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাহজাহান খান
ও ড. আবু রেজা নদভী এম.পি

উদ্বোধনকালে মোনাজাতরত সাবেক
নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাহজাহান খান
ও ড. আবু রেজা নদভী এম.পি
এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ

ফলক উন্মোচন করছেন সাবেক
নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাহজাহান খান
ও ড. আবু রেজা নদভী এম.পি

মাদারীপুর
চরমদারিয়া, খাগদী
ওআইসি পল্লীর
খণ্ডচিত্র-০১

ওআইসি পল্লী- চরমদারিয়া, খাগদী, মাদারীপুর

মাদারীপুর
চরমদারিয়া, খাগদী
ওআইসি পল্লীর
খণ্ডচিত্র-০২

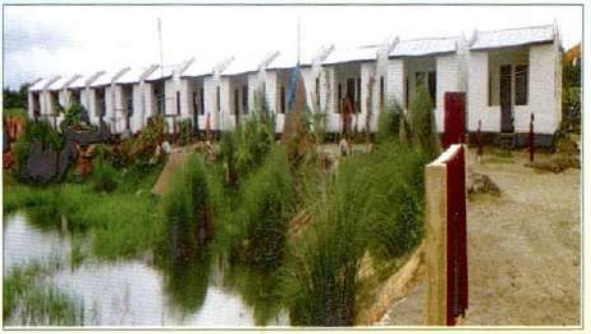

মাদারীপুর
চরমদারিয়া, খাগদী
ওআইসি পল্লীর
খণ্ডচিত্র-০৩

মাদারীপুর
চরমদারিয়া, খাগদী
ওআইসি পল্লীর
খণ্ডচিত্র-০৪

মাদারীপুর
চরমদারিয়া, খাগদী
ওআইসি পল্লীতে
নির্মিত মসজিদ

সাতকানিয়া উপজেলার মাদার্শায় গৃহহীনদের জন্য নির্মিত কাতার আদর্শ পল্লী-০১

উদ্বোধন করছেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ এম.পি ও প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী এম.পি

দাতা সংস্থার অতিথিদের নিয়ে কাতার পল্লী পরিদর্শন করছেন প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী এম.পি

কাতার পল্লীর খণ্ডচিত্র-০১

কাতার পল্লীর খণ্ডচিত্র-০২

কাতার পল্লীর
খণ্ডচিত্র-০৩

কাতার পল্লীর
খণ্ডচিত্র-০৪

কাতার পল্লীর
খণ্ডচিত্র-০৫

কাতার পল্লীর
খণ্ডচিত্র-০৬

সাতকানিয়া উপজেলার চরতির গৃহহীনদের জন্য নির্মিত কাতার আদর্শ পল্লী-০২

গৃহহীনদের কাছে ঘরের চাবি হস্তান্তর করছেন প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী এম.পি

কাতার পল্লী-২ এর খণ্ডচিত্র-০১

কাতার পল্লী-২ এ নির্মিত মসজিদ খণ্ডচিত্র-০২

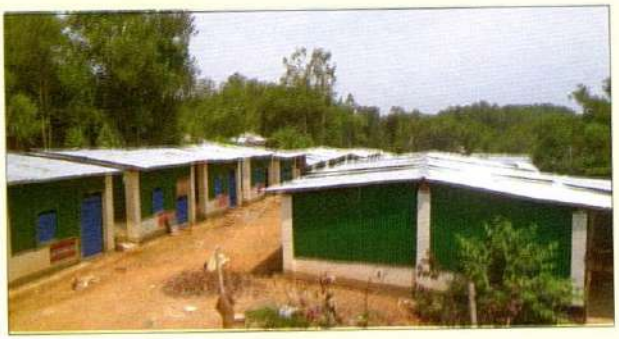

কাতার পল্লী-২ এর খণ্ডচিত্র-০৩

কাতার পল্লী-২ এর
খণ্ডচিত্র-০৪

কাতার পল্লী-২ এর
খণ্ডচিত্র-০৫

কাতার পল্লী-২ এর
খণ্ডচিত্র-০৬

কাতার পল্লী-২ এর
খণ্ডচিত্র-০৭

সাতকানিয়া উপজেলার চরতির গৃহহীনদের জন্য নির্মিত কাতার আদর্শ পল্লী-০৩

কাতার পল্লী-৩ এর
খণ্ডচিত্র-০১

কাতার পল্লী-৩ এর
খণ্ডচিত্র-০২

কাতার পল্লী-৩ এর
খণ্ডচিত্র-০৩

কাতার পল্লী-৩ এর
খণ্ডচিত্র-০৪

লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া চাকফিরানিতে গৃহহীনদের জন্য নির্মিত কুয়েত আদর্শ পল্লী

কুয়েত আদর্শ পল্লী
উদ্বোধন করছেন
ড. আবু রেজা নদভী এম.পি

কুয়েত আদর্শ পল্লী
খণ্ডচিত্র-০১

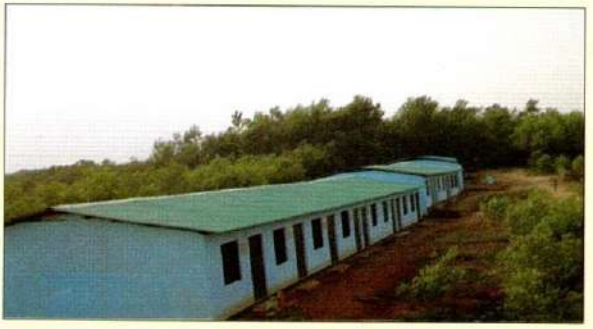

কুয়েত আদর্শ পল্লী
খণ্ডচিত্র-০২

কুয়েত আদর্শ পল্লী
খণ্ডচিত্র-০৩

রহিমা খাতুন
মেমোরিয়াল হসপিটাল
পদুয়া, লোহাগাড়া

আমিরাত পল্লী হসপিটাল
বাগেরহাট

দুস্থদের জন্য নির্মিত
হসপিটাল
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে হজ কর্মসূচি (হাজি প্রেরণ)

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর অযুখানা ও সেনিটেশন প্রোগ্রামের একাংশ

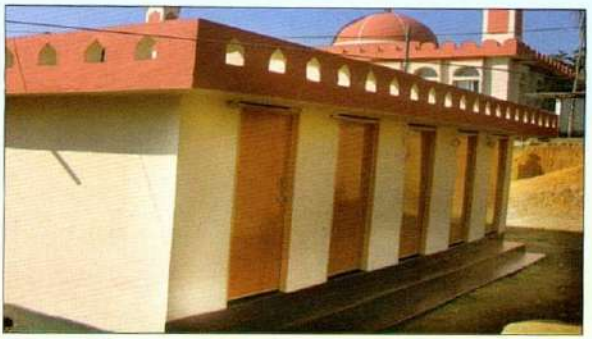

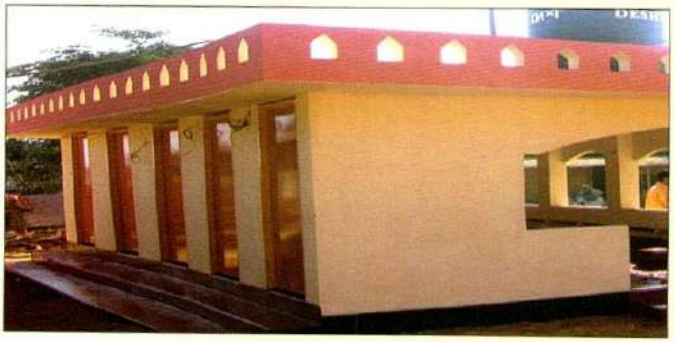

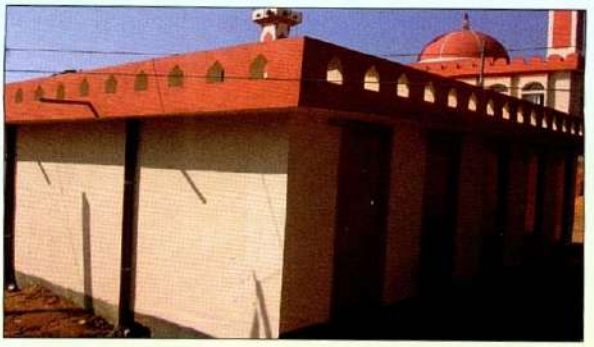

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ ও ইফতার সামগ্রি বিতরণের একাংশ

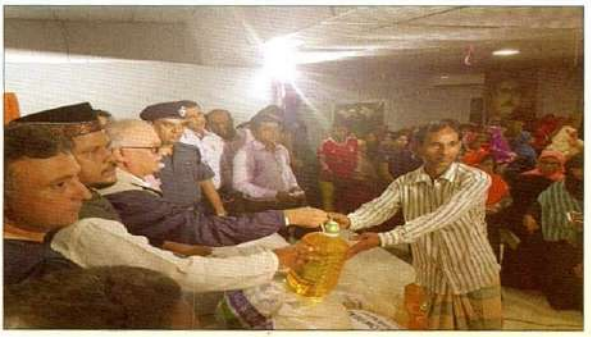

পবিত্র মাহে রমজানে
সাতকানিয়া-লোহাগাড়াবাসীর মাঝে
ইফতার সামগ্রী বিতরণ
সৌজন্যে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে
ত্রাণ বিতরণ করেন

বিতরণ করেন

ত্রাণ বিতরণ করেন
মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি

Turkiye Diyanet Foundation, Turkye
IFTAR PROGRAM-1435/2014
Celebration Area : Chittagong , Bangladesh
ইফতার বিতরণ কর্মসূচি-২০১৪

চাউল বিতরণ

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে ইফতার ও খাদ্যসামগ্রি, কুরবানির মাংস বিতরণ, বিয়ে-শাদিতে আর্থিক সহায়তা, শিক্ষাবৃত্তি এবং শীতবস্ত্র বিতরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিফর্ম প্রদান

مشروع إفطار الصائمين عام ١٤٣٨هـ

Turkiye Diyanet Foundation, Turkye
IFTAR PROGRAM-1435/2014
Distribution Area : Chittagong , Bangladesh
ইফতার বিতরণ কর্মসূচি-২০১৪

পবিত্র মাহে রমজানে
সাককানিয়া-লোহাগাড়াবাসীর মাঝে
ইফতার সামগ্রী বিতরণ
সৌজন্যে

برنامج افطار صائم

সাতকানিয়া,চট্টগ্রাম।

زيارة تلقية وتوزيع الملابس على الايتام

KURBAN
ORGANİZASYONU

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে সুপেয় পানির সুবিধার্থে স্থাপিত গভীর-অগভীর নলকূপের কয়েকটি স্থির চিত্র

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিভিন্ন মাদরাসা ও এতিমখানায় আর্থিক সহায়তা ও বস্ত্র প্রদান

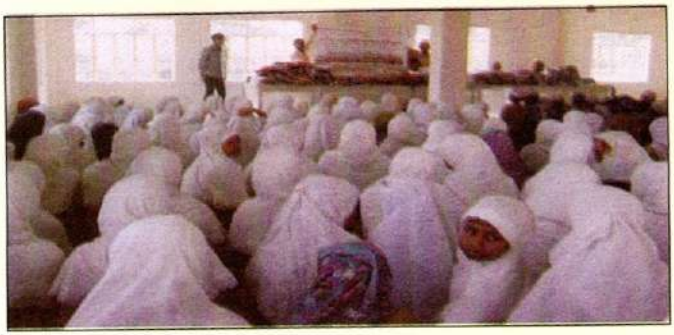

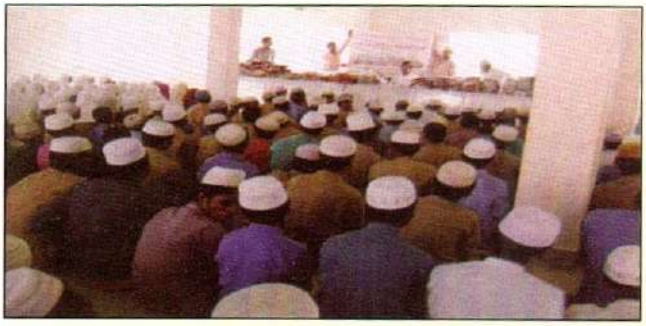

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ত্রাণ কার্যক্রমের কিছু চিত্র

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ওআইসির ত্রাণবিষয়ক কর্মকর্তাদের সাথে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি

INDONESIA SELAMATKAN
Border Area Bangladesh

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর প্রথম কর্মস্থল কলকাতা আকড়া কুদসিয়া আলিয়া মাদরাসার ভবনের কিছু চিত্র

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর প্রথম কর্মস্থল কলকাতা আকড়া কুদসিয়া আলিয়া মাদরাসা পরিদর্শনকালে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. হোছামুদ্দিন

নবাব ওয়াসেল মোল্লা ট্রাস্টের সেক্রেটারির সাথে আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. সম্পর্কে আলোচনা ড. হোছামুদ্দিন

কলকাতা আকড়া
কুদসিয়া আলিয়া মাদরাসা
সংলগ্ন বাজার।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত
মাদরাসার স্থান

কলকাতা আকড়া
কুদসিয়া আলিয়া মাদরাসা
সংলগ্ন বাজার।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব মাদরাসার
হোস্টেলের স্থান

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা
আল মানার, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মাকতাবাতুন-নুর, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
আশরাফিয়া লাইব্রেরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com

বিরল প্রতিভাধর
এক জ্ঞানতাপস

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.

গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী : ০১৮৫৫৮৭৬৪৭০

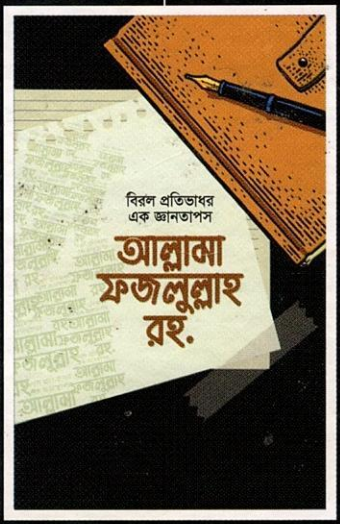

গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ